সীরাত বিশ্বকোষ

(অষ্টম খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

موسوعة سير الانبياء
باللغة البنغالية
المجلد الثامن

সীরাত বিশ্বকোষ

(অষ্টম খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

[SIRAT AL-NABI AND THE ORIENTALISTS (VOL. I-A)
-এর বঙ্গানুবাদ]

মুহাম্মদ মোহর আলী
পি.এইচ.ডি. (লণ্ডন); ব্যারিস্টার এট ল'
অধ্যাপক ঃ ইসলামের ইতিহাস
সেন্টার ফর দি সার্ভিস অব সুন্নাহ এণ্ড সীরাহ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ
(অষ্টম খণ্ড)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় অনূদিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
পৌষ ১৪১০
শাওয়াল ১৪২৪
ডিসেম্বর ২০০৩
ইবিবি প্রকাশনা ৪৩
ইফাবা প্রকাশনা ২১৪৭
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN ঃ ৯৮৪-০৬-০৭৯১-০

বিষয় ঃ জীবন চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH : The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 8th vol. by Dr. Muhammad Mohar Ali (Bar at-Law) and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclo paedia of Sirat Project.

Price Tk. 350.00 December 2003
U$: 15.00

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد :

فيسرني ان اقدم للقراء الكرام هذا المؤلف الجديد في السيرة "سيرة النبى ﷺ والمستشرقون" (العهد المكى) للدكتور محمد مهر على الذى يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالتعاون مع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة .

لقد درس المستشرقون ولا يزالون يدرسون السيرة النبوية للنيل من سيرة النبى ﷺ المطهرة والطعن فى شخصيته واساليبهم تتنوع فاسلوب الهجوم السافر والسب والشتم الذى كان سائدا فى القرن الثامن عشر الميلادى حلّ محله الان اسلوب التعاطف فى الظاهر .

لقد حلل المؤلف فى هذه الدارسة مؤلفات ثلاثة من مشاهير المستشرقين وهم : وليم ميور، و.د.س. مرغوليت، ومونتغمرى واط، وفند مزاعمهم بالنسبة الى السيرة المطهرة بدقة علمية تقتضيها معالجة مثل هذا الموضوع .

اسال الله تعالى ان ينفع به ويجزى خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء لجهوده المواصلة فى خدمة كتاب الله العزيز وسنة رسوله ﷺ المطهرة وسيرته الطيبة .

الدكتور/عبد الله بن عبد المحسن التركى
وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد
والمشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দুরূদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী ﷺ -এর প্রতি যিনি নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি।

পাঠকবৃন্দের খিদমতে 'সীরাতুন্নবী ﷺ ও প্রাচ্যবিদগণ' (মক্কী জীবন) নামে সীরাত বিষয়ক এই নূতন গ্রন্থখানি তুলিয়া ধরিতে পারিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি। গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন ড. মোঃ মোহর আলী এবং প্রকাশ করিয়াছে মারকায খিদমাতুস সুন্নাহ ওয়াস সীরাতুন নাবাবিয়্যা নামক সংস্থার সহযোগিতায় মদীনা মুনাওয়ারাস্থ বাদশাহ ফাহ্‌দ পবিত্র কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প।

প্রাচ্যবিদগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সীরাত-এর সমালোচনা করা এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত করার জন্য যুগে যুগে পবিত্র সীরাতুন্নবী ﷺ অধ্যয়ন করিয়াছে এবং এখনও করিয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে তাহাদের পন্থা ও পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের খোলাখুলি আক্রমণ ও গালিগালাজের পন্থা ও পদ্ধতি বর্তমানে বাহ্যিক সহমর্মিতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

লেখক তাঁহার এই গবেষণাকর্মে তিনজন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ-এর রচনাকর্ম সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহারা হইলেন ঃ উইলিয়াম মূর, ডি.এস. মারগোলিয়থ ও মণ্টগোমারী ওয়াট। সম্মানিত লেখক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র জীবন-চরিত সম্পর্কে তাহাদের অভিযোগসমূহকে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, এই ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য যাহা সঠিক ও উপযুক্ত চিকিৎসারূপে বিবেচিত।

মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন ইহাকে উপকারী গ্রন্থ হিসাবে কবুল করেন এবং খাদেমুল হারামায়ন আশ-শারীফায়ন (পবিত্র মক্কা-মদীনার সেবক)-কে কুরআন, সুন্নাহ ও পবিত্র সীরাত-এর খিদমতে তাঁহার নিরলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য উত্তম জাযা দান করুন।

ডক্টর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী

মন্ত্রী, ইসলামী কার্যক্রম, ওয়াক্‌ফ, দাওয়া ও নির্দেশনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং মহাপরিদর্শক, বাদশাহ ফাহ্‌দ পবিত্র কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ৮ম খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। অসংখ্য দরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানবজাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত।

আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে। হযরত রাসূলে করীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ শান্তির পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেইজন্য প্রয়োজন তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। সেই লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই আমাদের এই পদক্ষেপ। পূর্বে প্রকাশিত খণ্ডগুলির মধ্যে প্রথম ৩টি খণ্ড ছিল হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবন চরিত সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হয় সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনচরিত।

৫ম, ৬ষ্ট, ৭ম ও বর্তমান ৮ম খণ্ডটি তাহারই ধারাবাহিকতা। তবে এই খণ্ডটি মূলত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মদ মোহর আলী কর্তৃক দুই খণ্ডে রচিত Sirat Al-Nabi And The Orientalist গ্রন্থের অনুবাদ।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতবর্গ নিতান্ত বিদ্বেষপ্রসূত হইয়া যুগে যুগে মহামানব হযরত রাসূলে কারীম (স)-এর চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালাইয়াছে। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সুউন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪)।

নির্জলা মিথ্যা, মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও স্বকপোল-কল্পিত অপবাদ দিয়া তাহারা তাঁহার সেই 'মহান চরিত্রে' কলুষতার ছাপ দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাইয়াছে। উইলিয়াম মূইর, ডি.এস. মারগোলিয়থ ও ডব্লিউ. মন্টগোমারী ওয়াট প্রমুখ পণ্ডিত ইংরেজী ভাষায় তাহাদের এইসব চিন্তাধারা তুলিয়া ধরিয়াছেন। ড. এম. মোহর আলী উল্লিখিত পুস্তক রচনার মাধ্যমে সেইসব অপচেষ্টার যথোচিত জওয়াব দিয়াছেন যাহা দুই খণ্ডে মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলাভাষী পাঠকদের তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষ হইতে উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করা হইল। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডটি সীরাত বিশ্বকোষ ৯ম খণ্ড হিসাবে শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে ইনশাআল্লাহ। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন ও কর্মের উপর আরও চারটি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরও দশটি খণ্ড প্রণয়নের পকিল্পনা সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠক সমীপে আন্তরিক দু'আ ও মুনাজাতের বিনীত অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষের ৮ম খণ্ড মৌলিক রচনা নহে। ইহা মূলত অনুবাদ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থকার জনাব ড. মুহাম্মদ মোহর আলী বাংলাদেশের অন্যতম কৃতি সন্তান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এই সাবেক অধ্যাপক সম্প্রতি মুসলিম ইতিহাস রচনায় তাঁহার অমূল্য অবদানের জন্য বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন।

Sirat Al-Nabi And The Orientalist নামক বইটি প্রকাশিত হইলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ হইতে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর একটি খণ্ড হিসাবে ইহার অনুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে ড. মোহর আলী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে তাঁহার বই-এর অনুবাদ প্রকাশের সম্মতি প্রদান করেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট আমাদের সুগভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মূল গ্রন্থটি রচনা করিতে তিনি যেই নিরলস শ্রম দিয়াছেন ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এক কথায় তাহা অনন্য। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ইহা তাঁহার অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও ভালবাসার প্রমাণ। কাল কিয়ামতে ইহা তাঁহার নাজাত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর শাফা'আত লাভের ওয়াসিলা হইতে পারে একথা আমরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি। পরম করুণাময়ের নিকট আমরা লেখকের নিরোগ ও কর্মময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি যাহাতে তিনি এক্ষেত্রে আরও মূল্যবান অবদান রাখিতে পারেন।

এতদসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও অনুবাদকবৃন্দ যাহারা নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। প্রকল্পের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের সকলকে 'আহসানুল জাযা' দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা তাহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। পরম আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ৮ম খণ্ডটিও প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি হাম্দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযুত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল- মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন, শাফীউল মুযনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর ওসীলায় আমরা পেয়েছি হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ আর পৃথিবীর তাবৎ মানবমণ্ডলী পেয়েছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনবোধ।

রাসূলুল্লাহ (স)-সহ অসংখ্য নবী-রাসূল অন্ধকারে নিমজ্জিত ও পথহারা মানবসমাজের পথ প্রদর্শনের জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হইয়াছিল। তাহাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের জীবন চরিতকেই সমগ্র মানবমণ্ডলীর, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ্র সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহ্র জন্য সহজ হয়।

আম্বিয়াকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (১০ ঃ ১৬) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হিদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করিতে দেখি। কুরআনুল কারীমও ঘোষণা দিয়াছে ঃ "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে" (৩৩ ঃ ২১)।

অতএব উত্তম আদর্শের উজ্জ্বলতম নমুনা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনচরিতকে সংরক্ষণের স্বার্থে উম্মাহ্র সচেতন আলিম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিক ইহার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের এক বিরাট অংশ ইহার পেছনে ব্যয় করেন। তাঁহাদের মধ্যে ইব্ন হিশাম, ইব্ন ইসহাক, ইব্ন সা'দ, ইব্ন হায্ম, সুহায়লী, ইব্নুল কায়্যিম, ইব্ন কাছীর, আল-কাসতাল্লানী, আয-যুরকানী প্রমুখ সমধিক প্রসিদ্ধ। আধুনিক সীরাত লেখকদের মধ্যে আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন মাসরূর, কাযী সুলায়মান মনসূরপুরী, আবদুর রউফ দানাপুরী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, ইদরীস কানদেহলবী, মাওলানা আকরম খাঁ, অধ্যাপক আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী প্রমুখ বিখ্যাত।

সীরাত রচয়িতাদের কাতারে অমুসলিম লেখকগণের একটি অংশও আগাইয়া আসেন। তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতদের স্থান শীর্ষে। তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র বসবাসকারী প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমানের ধর্ম, জীবনদর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে, সেই সঙ্গে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জনক ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী (স)-এর জীবনচরিত এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহার বিশাল অবদান সম্পর্কে অবহিত হইবার অপরিমেয় অনুসন্ধিৎসা লইয়া আগাইয়া আসেন। সাধারণত ইহারা Orientalist (প্রাচ্যবিদ) নামেই পরিচিত। আরব বিশ্বে তাহাদিগকেই 'মুসতাশরিকূন' বলা হয়।

প্রাচ্যবিদদের এই তালিকা খুবই দীর্ঘ। তাহাদের মধ্যে যাহারা নানা কারণে মুসলিম বিশ্বে খ্যাত তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ সময় কালের ব্যাপ্তি ও বিবেচনায় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক জনাব ড. মুহাম্মদ মোহর আলী তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে তিনজন শীর্ষস্থানীয় প্রাচ্যবিদ মি. উইলিয়ম ম্যুর, ডি.এস. মারগোলিয়থ ও ডব্লিউ মন্টগোমারী ওয়াট-এর এতদ্সংক্রান্ত অর্থাৎ কেবল সীরাত সংক্রান্ত রচনাবলীকে বাছিয়া লইয়াছেন। অতঃপর তাহাদের লেখার আলোকে তিনি তাহাদের এই সব রচনার পেছনে নিহিত উদ্দেশ্য ও মানসিকতা তুলিয়া ধরিয়াছেন।

তাহাদের আসল উদ্দেশ্য হইল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে তাহাদের অধিকৃত উপনিবেশসমূহে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামের নবী ও তাহাদের ধর্মসম্পর্কে বিভ্রান্ত করা এবং তাহাদেরকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা। এইসব প্রাচ্যবিদ রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি-গালাজ বা নিন্দা করার পূর্বের নীতি ত্যাগ করিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তোলার উপায় হিসাবে সীরাত আলোচনায় আপাত সহনশীল

ও উদার নীতি অবলম্বন করেন। উক্ত নীতির অন্তরালে তাহাদের এক সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে।

প্রাচ্যবিদগণ তাহারা তাহাদের রচনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও গুণাবলীর স্বীকৃতি দিলেও তাঁহার নবী ও রাসূল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না, বরং বিভিন্ন কৌশলে এই ধারণা দিতে প্রয়াস পান যে, যদিও তিনি নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি একজন রাসূল ছিলেন এবং আল্লাহ্র ওহীর প্রাপক ছিলেন, তদসত্ত্বেও তিনি ঐ বিশ্বাসে ভ্রান্তিতে ছিলেন।

ড. মুহাম্মদ মোহর আলী প্রাচ্যবিদদের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রাগুক্ত তিনজনের লিখিত পুস্তক হইতে এই জাতীয় অপচেষ্টার উল্লেখপূর্বক ইহার যথাযথ জওয়াব প্রদানের মাধ্যমে তাহাদের মুখোশ উন্মোচিত করিয়াছেন। ফলে প্রাচ্যবিদদের ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এদেশের শিক্ষিতদের একটি অংশের সামনে তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং আমরাও তাহাদের এতদ্সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফসল সম্পর্কে সতর্ক হইতে পারিব।

Sirat Al-Nabi and The Orientalists শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পরপরই ইহার রচয়িতার সঙ্গে ই.ফা.বা.-এর ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের "সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্পের" আওতায় ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা হয়। তিনি সানন্দে ইহার অনুমতি প্রদান করায় আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরম করুণাময়ের কাছে আমরা উক্ত গ্রন্থকারের সুস্থ, নীরোগ ও কর্মময় দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি। Sirat Al-Nabi Aad The Orientalists রচনা করিতে তিনি যেই নিরলস নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন পরম করুণাময় আল্লাহ ইহার যথাযোগ্য পুরস্কার দিবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য খণ্ডটিসহ ইহার পরবর্তী খণ্ডও হইবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবন পর্যন্ত সীমিত। এ লেখক তাঁহার স্বাস্থ্যগত কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাদানী জীবনের উপর কাজ শুরু করিতে পারেন নাই। আমরা আল্লাহ্র দরবারে লেখকের সুস্থতার জন্য বিনীত মুনাজাত জানাই যাহাতে এই পর্যায়ের অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন এবং প্রাচ্যবিদদের যাবতীয় অপপ্রয়াসের যথাযোগ্য জওয়াব রাখিয়া যাইতে পারেন।

এতদ্সঙ্গে আমরা আমাদের সম্মানিত অনুবাদকবৃন্দের খেদমতে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যাহারা স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহার অনুবাদ সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন। মুহতারাম সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনার দুরূহ দায়িত্ব পালন করিতে যেই নিরলস শ্রম দিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিশেষত ইহার অন্যতম সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহতারাম অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা লইয়াও যেই শ্রম দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। আমরা তাঁহার সুস্থতার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করিতেছি।

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান মহাপরিচালক বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম সাহেবকেও আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইসলামী বিশ্বকোষের সূচনায় ও সফল সমাপ্তিতে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ও অব্যাহত প্রেরণা আমাদিগকে বিপুলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সীরাত বিশ্বকোষের প্রতিও তাঁহার আগ্রহ ও আকর্ষণ সীমাহীন।

অতঃপর সচিব, পরিচালক অর্থ, প্রকাশনা পরিচালক, পরিচালক পরিকল্পনা, লাইব্রেরিয়ান সংশ্লিষ্ট সকল প্রতি তাহাদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সেই সঙ্গে গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাহাদের শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের কোথাও ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হইলে কিংবা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা নজরে আসিলে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আনিবেন এবং পরবর্তী সংস্করণ যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় তজ্জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আমরা সকলের নিকট দোআপ্রার্থী।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

সম্পাদনা

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান

ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

অনুবাদকবৃন্দ

মোঃ আজিজুর রহমান

আফতাব হোসেন

মু. আবদুল মান্নান

ফজলে রাব্বি

আবু মুহম্মদ

সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين .

ভূমিকা

সীরাত এবং প্রাচ্যবিদ্যাতত্ত্ব কোন নূতন বিষয় নহে। বিগত যুগের, এমনকি আধুনিক যুগের পাণ্ডিতগণও বিভিন্ন সময় এই বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন। অতি সম্প্রতি কতিপয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক রচনায় সাধারণভাবে ইসলামী ধ্যান-ধারণা, বিশেষত সীরাত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদগণের আলোচনা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।[১] কতিপয় স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া আরবী ভাষায় আরও বিশেষভাবে সীরাত ও প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে। এই রচনাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় হইলেও সীরাত সম্পর্কে প্রধান প্রধান প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের রচনাবলীর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করণীয় রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন যে, যুক্তি ও প্রমাণের সার্বিক গতি-প্রকৃতি যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতদের ধ্যান-ধারণা ও সিদ্ধান্তসমূহ বিবৃত হইয়াছে। বর্তমান রচনাটি ঐ আলোচনা পদ্ধতিরই একটি চেষ্টা মাত্র।

ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ বিষয়ের ধারণা সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব নাও হইতে পারে। তিনি অপরিহার্যরূপে তাহার যুগের বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতিকে প্রতিবিম্বিত করেন এবং তিনি তাহার পূর্বসূরীদের গবেষণাসমূহের ফলাফলের উপর নির্ভর করেন। কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা অধ্যয়নকারী অনুরূপভাবে ও অপরিহার্যরূপে তাহার পূর্বসূরীদের রচনা অধ্যয়নে ব্যাপৃত হন। সুতরাং দুই বা ততোধিক পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা, একজন আর একজনের সমসাময়িক না হইলেও যাহাদের রচনা একটি বিশেষ সময়কালের ব্যাপ্তিকে ধারণ করে, সেইসব ব্যক্তিত্বের রচনা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য বিবেচনায় নেওয়া অধিক উপযোগী বলিয়া মনে করা হইয়াছে। এই বিবেচনার ভিত্তিতে আমি আমার বর্তমান রচনায় উইলিয়াম ম্যূর (১৮১৯-১৯০৫ খৃ.), ডি. এস. মারগোলিয়থ (১৮৫৮-১৯৪০ খৃ.) এবং ডব্লিউ মন্টগোমারী ওয়াট (জন্ম ১৯০৯ খৃ.)-এর রচনাসমূহ আলোচ্য বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছি। এইসব পণ্ডিতের রচনা মধ্য উনবিংশ শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। উইলিয়াম

---

১. উদাহরণস্বরূপ দ্র. মানহাজুল মুসতাশরিকীন ফিদ-দিরাসাতিল 'আরাবিয়্যা ওয়াল-ইসলামিয়্যা, এরাব বূরো অব এডুকেশন ফর গাল্‌ফ স্টেট্‌স, ২ অংশ, রিয়াদ ১৯৮৫ খৃ.।

ম্যুর-এর রচনা "The Life of Mahomet" সর্বপ্রথম ১৮৫৮ খৃ. প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে এই বিষয়ে সর্বশেষ রচনা মণ্টগোমারী ওয়াট্স-এর "Muhammad's Mecca" ১৯৮৮ খৃ. প্রকাশিত হয়।

প্রথমেই ইহা জোর দিয়া বলা আবশ্যক যে, বর্তমান গবেষণাকর্মে যাহা বিবেচনায় নেওয়া হইয়াছে তাহা এই যে, উপরোল্লিখিত পণ্ডিতদের প্রধান প্রধান রচনাসমূহে যেসব বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে, উহার সবগুলি নহে, বরং শুধু সীরাত সম্পর্কিত আলোচনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য। অনুরূপভাবে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও বর্তমান গবেষণা মূলত সীরাত সম্পর্কে এইসব পণ্ডিতের রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবুও কোন কোন সময় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশেষ বিষয়ের জট খুলিয়া চিহ্নিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য পণ্ডিতদের রচনাও বিবেচনায় আনা হইয়াছে।

মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দী সীরাত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মোড় পরিবর্তনের কাল (turning point) হিসাবে প্রমাণিত। বলা যাইতে পারে যে, এই নূতন যুগ ৮ মার্চ, শুক্রবার ১৮৪০ খৃ. শুরু হয়, যখন টমাস কারলাইল "Heroes and Hero Worship" শিরোনামে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন—পক্ষপাতমূলক গালমন্দ করার মত মনোভাব, যাহা এক শতাব্দী পূর্বে ভলতেয়ারের বক্তৃতাসমূহকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, তুলনামূলকভাবে তাহার কঠোর বিরোধিতা করিয়াছে (Mahomet, 142)। কার্লাইল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্লাইলের পরোক্ষ ইঙ্গিত বা উল্লিখিত বিষয় সাধারণভাবে তাহার সমসাময়িক এবং তাহার পরবর্তী যুগের লেখকগণ কর্তৃক গৃহীত হয়। তাহারা এই সময় হইতে মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিষ্ঠার উপর জোর দেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রাসূল হওয়ার বিষয়টি তাহারা স্বীকৃতি দেন না, বরং কোন না কোন কৌশলে তাহারা এই ধারণা করেন যে, যদিও তিনি নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি একজন রাসূল ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ওহীর প্রাপক ছিলেন, তৎসত্ত্বেও তিনি ঐ বিশ্বাসে ভ্রান্তিতে ছিলেন। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ছিল একটি মনোবৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং যে "ওহীসমূহ" তিনি প্রকাশ করেন তাহা ছিল এক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অথবা স্বজ্ঞার ফল। এইভাবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইউরোপীয় চিন্তাধারার আওতা হইতে অর্থাৎ ইউরোপীয়দের মতে সচেতনভাবে মিথ্যা রাসূল ও জাল লোকের ধারণাগত অবস্থান হইতে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হন একজন সজ্ঞানে মিথ্যা বা ভণ্ড রাসূলে অথবা অবচেতনভাবে মিথ্যা রাসূল অথবা নিদেনপক্ষে একজন নির্দোষ মানুষ হইয়াও প্রতারণা বা মতিবিভ্রমের শিকার হইয়াছিলেন (না'উযুবিল্লাহ)।

দ্বিতীয়ত, মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে মুসলমানদের মধ্যে খৃস্টান মিশনারীদের এক নূতন গভীর তৎপরতা শুরু হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের জরুরী প্রয়োজনসমূহ ইউরোপীয়দেরকে মুসলিম জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে লইয়া আসে। এই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে মুসলমানদেরকে ঐ সময় খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার চক্রান্তস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন ও

মিশনারিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গালিগালাজ বা নিন্দা করার পূর্বের নীতি পরিত্যাগ করিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তোলার পথ অবলম্বন করে এবং এই বিষয়টি সম্ভবত ইসলামের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রত্যয় উৎপাদনযোগ্য বলিয়া ধারণা করা হয়। এইভাবে কার্লাইলের পরামর্শ সময়ের প্রয়োজনে যথাযথ মনে হয়।

উইলিয়াম ম্যুর-এর রচনা একদিকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে এবং অপরদিকে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি তাহার ব্যক্তিগত সক্ষমতার দ্বারা এবং তাহার লেখার দ্বারা ভারতবর্ষে খৃস্টান মিশনারীদেরকে সাহায্য করেন এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। বিশেষ করিয়া তিনি বিখ্যাত খৃস্টান মিশনারী কার্ল গুত্তালেব ফান্ডার (Curl Gottaleb Pfander)-এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যিনি (ফান্ডার) ঐ সময় উত্তর ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশনারী কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উইলিয়াম ম্যুর ১৮৫৪ খৃ. ফান্ডার ও রাহ্‌মাতুল্লাহ কিরানবী (র)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত আগ্রা বিতর্কে (বাহাছ-এ) খৃস্টান পক্ষের অন্যতম সালিশ বা বিচারক ছিলেন। এই বিতর্কের ফলাফল স্পষ্টতই ফান্ডার-এর বিপক্ষে যায় অর্থাৎ বিতর্কে তিনি পরাজিত হন। ফলে তাহার মিশনারী সোসাইটী (দি চার্চ মিশনারী সোসাইটী) কর্তৃক তাহাকে প্রথমে পেশাওয়ারে এবং পরে কনস্টান্টিনোপল-এ বদলী করা হয়।[২] যেমন ম্যুর তাহার রচনার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, তিনি ফান্ডার-এর অনুপ্রেরণায় ও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করেন। এই রচনার প্রথম সংস্করণ ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ এবং ১৮৬১ খৃস্টাব্দের মধ্যে। তথ্যসূত্র এবং প্রাক-ইসলামী যুগের আরব সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্বলিত পরিচ্ছেদসমূহ ছাড়া এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের প্রথমদিকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই তৃতীয় সংস্করণের একটি পরিমার্জিত ভাষ্য ইহার তথ্যসূত্রসহ ১৯২৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিক কালে ১৯৮৮ খৃস্টাব্দের মূল প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হয়।

মারগোলিয়থের রচনা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রকাশিত হয়। তাহার রচনার তৃতীয় ও পরিমার্জিত সংস্করণ "Mohammed and the Rise of Islam" শিরোনামে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৮৫ খৃস্টাব্দে পুনঃ প্রকাশিত হয়। স্বভাবত তাহার রচনা আলোচ্য যুগের মধ্যবর্তী সময়ের।

উইলিয়াম ম্যুর-এর রচনা প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে মারগোলিয়থের পূর্বসূরীদের ধারণা ও মতামতসমূহের অগ্রগতিকে বিবেচনায় নেওয়ার সাথে সাথে তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদগণের চিন্তাধারা সম্বলিত বর্ণনা প্রতিবিম্বিত করেন।

২. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. M.M. Ali, History of the Muslims of Bengal, vol II, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Rihadh 1988, pp 227-233. Rahmatullah এই বির্তকের ভিত্তিতে পরবর্তী কালে তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ইযহারুল হাক্ক' রচনা করেন।

তিনি তাহার আরও কতিপয় নূতন নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও মতামতও উপস্থাপন করেন, যাহা তাহার উত্তরাধিকারী তথা ওয়াট-সহ অনেকেই অবলম্বন করেন এবং পুনঃ বর্ণনা করেন।

উইলিয়াম মন্টগোমারী ওয়াট বর্তমান সময়ে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে একজন নেতৃস্থানীয় ইউরোপীয় লেখক হিসাবে স্বীকৃত। তাহার রচিত গ্রন্থ "Muhammad at Mecca" ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে অতি দ্রুত তাহার দ্বিতীয় রচনা "Muhammad at Medina" ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় : এই দুইটি গ্রন্থই ঐ সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থসমূহ অনেক ইউরোপীয় ভাষায় এবং এমনকি আরবী ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে। এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তাহার আরও অন্যান্য রচনাকর্ম রহিয়াছে, যেগুলির কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তাহার সর্বশেষ রচনা "Muhammad's Mecca" ১৯৮৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, এইসব পণ্ডিতের রচনাকর্মের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন আমাদেরকে মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীতে সীরাত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মনোভাব ও অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং ইহার পরবর্তী অংশে, এমনকি মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাহাদের ধারণা ও মতামতসমূহের ক্রমবিকাশও প্রকাশিত হয়।

বর্তমান গ্রন্থের এই খণ্ডটি রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কী জীবনের বর্ণনাসম্বলিত। সূচীপত্রের বিবরণী হইতে ইহা লক্ষণীয় যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কী জীবনকালকে মূল ঘটনাবলী ও ঘটনার ক্রমোন্নতি অনুসারে ৭টি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এই পরিচ্ছেদসমূহের উদ্দেশ্য সীরাতের পরিপূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন। মূলত ইহা এমনভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে যাহাতে ঐসব আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের ধারণা ও মতামত সম্পর্কিত আলোচনা সাধারণ পাঠকগণ বুঝিতে সক্ষম হন। তাহাদের ধারণাসমূহ আলোচনা করিতে গিয়া আমি তাহাদের যুক্তি ও কারণসমূহ যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করার এবং তাহাদের নিজেদের আলোচ্য বক্তব্যের সূত্র ধরিয়াই তাহাদেরকে মুকাবিলা করার চেষ্টা করিয়াছি।

আমি বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স-এর কর্তৃপক্ষের প্রতি, বিশেষ করিয়া ইহার সুপারভাইজার জেনারেল সম্মানিত ড. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদিল মুহসিন আত-তুর্কী এবং ইহার মহাসচিব ড. মুহাম্মাদ সালিম ইব্‌ন শুদায়্যিদ আল-আওফীকে এই রচনা প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আন্তরিক কতৃজ্ঞতা জানাইতেছি। এই গ্রন্থের রচনা প্রকল্পে সহায়তা দানের জন্য ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মদীনা মুনাওয়ারা কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করিয়া ইহার প্রেসিডেন্ট ডঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ্ আল-উবায়দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি "Centre for the Service of Sunnah and Sirah" -এর পরিচালক ড. মারযূক ইব্‌ন হায়্যাছ আয-যাহ্‌রানীকে তাঁহার অব্যাহত সাহায্য এবং এই প্রকল্প সম্পন্ন করার উৎসাহ যোগানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করিতেছি। আমি এই কেন্দ্রের সকল সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করিয়া সীরাত বিভাগের দুইজন সহকর্মী, শায়খ সাফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী এবং শায়খ আহমাদ আবদুল্লাহ বাজুরকে রেফারেন্সসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও আরবী ভাষা ফ্যাকাল্টির ড. ভি. আবদুর রাহীমকে আমাকে উৎসাহিত এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার স্ত্রী রাজিয়াকে অব্যাহতভাবে উৎসাহ দান ও সকল সম্ভাব্য পন্থায় সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এই রচনা প্রস্তুতকরণের জন্য আমাকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইহার উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গ্রন্থাগার, "Centre for the Service of Sunnah and Sirah" -এর গ্রন্থাগারে, মসজিদে নববীর গ্রন্থাগারে, মদীনা মুনাওয়ারার ইমাম মুহাম্মাদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির দাওয়াহ্ ফ্যাকাল্টির ওরিয়েন্টাল সেকশনের গ্রন্থাগার, "School of Oriental and African Studies, London-এর গ্রন্থাগারে এবং বৃটিশ লাইব্রেরীতে (বৃটিশ মিউজিয়াম) কাজ করিতে হইয়াছে। সর্বত্রই আমি সৌজন্যপূর্ণ আচরণ লাভ করিয়াছি এবং প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাইয়াছি। আমি সকল লাইব্রেরী ও ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

মসজিদে নববী
১৯ যুলকা'দা, ১৪১৩ হি.
১০ মে, ১৯৯৩ খৃ.।

এম. এম. আলী

শব্দসংক্ষেপ

আল-আযরাকী — আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহ্মাদ' আল-আযরাকী, আখবার মাক্কা ওয়ামা জাআ ফীহা মিনাল আছার, সম্পা. রুশদী আস-সালিহ মুলহিস, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯।

আল-ফাসী — আবূ তায়্যিব মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আত-তাকী আল-ফাসী, আল-'ইকদুছ ছামীন ফী তারীখ আল-বালাদ আল-আমীন, ৮ খণ্ডে, কায়রো ১৩৭৯-১৩৮৮ হি.।

B.S.A.O.S — Bulletin of the school of Oriental and African Studies, London.

বুখারী — আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসাম'ঈল আল-বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী (হাদীছ নম্বর ফাতহুল বারীর ক্রমানুসারে প্রদত্ত)।

ইব্ন হিশাম — আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, সম্পা. মুহাম্মাদ আস-সাক্কা প্রমুখ, ২ খণ্ডে, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫।

ইব্ন সা'দ — মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মানী' আবূ 'আবদুল্লাহ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ৮ খণ্ডে, বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৫।

J.R.A.S. — Journal of Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London.

M.W. — The Moslem World, Hartford Seminary Foundation, Connecticut, U.S.A.

মুসলিম — আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নায়সাবূরী, সাহীহ মুসলিম (ফুয়াদ 'আবদুল বাকী কর্তৃক সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সমাপ্ত সংস্করণের হাদীছের ক্রমিক সংখ্যা অনুসরণ করা হইয়াছে, ইস্তাম্বুল, তা. বি.)।

মুসনাদ — আবূ 'আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন মুহাম্মাদ, মুসনাদ আল-ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল ওয়া বিহামিশিহী, মুনতাখাব কানযুল উম্মাল, ৬ খণ্ডে, পুরাতন সংস্করণ, তা. বি।

সুহায়লী	আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল হাসান আল-খাছ'আমী, আর-রাওদুল উনুফ ফী তাফসীর আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ লি-ইব্ন হিশাম, সম্পা. তা-হা 'আবদুর রউফ সা'ঈদ, ৪ খণ্ডে, বৈরূত ১৩৯৮ হি.।
T.G.U.O.S.	Transactions of the Glasgow University Oriental Society, Glasgow.
তায়ালিসী	সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইবনুল জারূদ আবী দাউদ. মুসনাদ আবী দাউদ আত-তায়ালিসী, বৈরূত, তা. বি।
তিরমিযী	আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরাহ, আল-জামে' আস-সাহীহ ওয়া হুয়া সুনান আত-তিরমিযী, সম্পা. আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির, ৪ খণ্ডে, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৩৯৮/১৯৮৭।
Watt, M. at M.	W. Montgomary Watt, Muhammad at Mecca, Oxford, Clarindon press, ১৯৮৮ খৃ.।
Watt, M's M.	W. Montgomary Watt, Muhammad's Mecca, Edinberg ১৯৮৮ খৃ.।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

THE SOURCES AND THE BACKGROUND

সীরাতের উৎস ও পটভূমি

প্রথম অধ্যায়

সীরাতের উৎস

আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন ও কর্মের তথ্যাবলীর তিনটি প্রধান উৎস রহিয়াছে। এইগুলি পবিত্র কুরআন , হাদীছ এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিবরণ যাহা সীরাত বা মাগাযী নামে অভিহিত। হাদীছ সংকলন ও সীরাত/মাগাযী সাহিত্য উপাদানের দিক হইতে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত এইগুলি বিভিন্ন "বর্ণনাকারী" হইতে সংগৃহীত। এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত উভয়কে এক ও অভিন্ন শ্রেণীবিন্যস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।[১] কিন্তু উভয়ের মধ্যে দুইটি পৃথক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

প্রথমত, হাদীছ সঙ্গ্রহগুলি ধর্মতত্ত্ব উপদেশমূলক (doctrinal), বিচার সংক্রান্ত (Juridical) ও আইন সংক্রান্ত (legal) বিষয় হিসাবে অথবা প্রতিবেদনসমূহের (report) মূল সূত্র-পরম্পরা অনুযায়ী সন্নিবেশিত। পক্ষান্তরে সীরাত সংকলনের উপাদানগুলি মোটামুটিভাবে সময়ানুক্রমিক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরম্পরা অনুযায়ী সন্নিবেশিত।

দ্বিতীয়ত, হাদীছ সংকলনসমূহে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে বর্ণনাকারীদের সূত্র-পরম্পরার প্রতি এবং অন্যান্য প্রশ্ন ও নীতির প্রতি, যাহা বর্ণনাসমূহের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করে। অরপদিকে, সীরাত শাস্ত্রের সূত্র সংক্রান্ত নীতি সব সময় পালন করা হয় নাই। যদিও একই মনীষী উভয় (হাদীছ ও সীরাত সংক্রান্ত) কাজে জড়িত ছিলেন। সীরাত শাস্ত্রের অনুকূলে একটি সুবিধা রহিয়াছে। কেবল সীরাত শাস্ত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন কাহিনীর সময়ানুক্রমিক কাঠামো (framework) রহিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের এমন কিছু দিকের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে যাহা হাদীছ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এই তিনটি উৎস পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন ও কর্মের যথার্থ ধারণা পাইবার নিমিত্তে সবগুলিকেই বিবেচনায় আনিতে হইবে।

এক ঃ আল-কুরআন

উৎপত্তির দিক দিয়া পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্‌র বাণী। ইহা সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ সূরারূপে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরিয়া ফেরেশতা জিবরীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নাযিল হইয়াছে।[২] নাযিল হওয়ার সংগে সংগে কুরআনের প্রতিটি আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখস্থ করিয়া লইতেন। আল-কুরআন এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমদিকে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ মুখস্থ করিতে সময় সময় এতটা উদগ্রীব হইয়া পড়িতেন যে, ফেরেশতা জিবরীল উচ্চারণ করামাত্র তিনি ত্বরিত গতিতে বাক্যসমূহ পুনরাবৃত্তি করিতে শুরু করিতেন।[৩]

আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা স্মৃতিতে ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ তাঁহাকে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনেক সাহাবীও পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইহা করার আশু প্রয়োজন এইজন্য ছিল যে, সালাতে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা দীন ইসলামের শুরু হইতেই মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য ছিল। ক্রমে ক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার অনেক অনুরক্ত অনুসারী সমগ্র কুরআন মুখস্থ করিয়া লইলেন। তৎকালীন আরবদেশে ও বিশ্বের অনেক স্থানে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু, সাহিত্যকর্ম, বংশতালিকা, আচার-ঐতিহ্য মুখস্থ এবং মুখে মুখে পরবর্তী বংশধারার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। মুখস্থ করার নৈপুণ্য আরবদের বৈশিষ্ট্য ছিল। মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া রমযান মাসে, তখন পর্যন্ত আল-কুরআনের যতটুকু নাযিল হইয়াছিল তাহার সবটাই আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জীবনের শেষ রমযান মাসে জিবরীলের সামনে সমগ্র কুরআন দুইবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন।[৪] তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি জিবরীলের মারফৎ প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুসমূহ ইহার বর্তমান আকারে সূরায় ও খণ্ডে সন্নিবেশিত করেন।

কেবল ইহাই নহে যে, পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা হইয়াছিল; সূচনা হইতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআনের আয়াতসমূহ উপযুক্ত ও প্রাপ্ত দ্রব্যাদি, যেমন গাছের পাতা, বাকল, পশুচর্ম, অস্থি, প্রস্তর ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অবশ্য প্রথম প্রত্যাদেশেই কুরআনের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাহাতে, অন্য বিষয়ের মধ্যে, কলমের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ ও সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়।[৫] অধিকন্তু নূতন প্রত্যাদেশসমূহের প্রধান যৌক্তিকতা এই যে, যেহেতু পূর্বের নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহ তাহাদের অনুসারীদের দ্বারা বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, সেই হেতু ইহা স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূতন প্রত্যাদেশের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে দ্বিগুণ যত্নবান হইবেন, যাহাতে অনুরূপ বিকৃতি ও পরিবর্তন না ঘটে। বস্তুত কুরআন নিজের এই বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে এবং বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ হইতে ইহার চূড়ান্ত পবিত্রতা ও অনাক্রম্যতা সম্পর্কে ঘোষণা দেয়। বস্তুত আল-কুরআন একটি বিস্ময়কর প্রামাণিক গ্রন্থ। কোন মিথ্যাই সম্মুখ বা পশ্চাৎ হইতে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) ইহার সমীপবর্তী হইতে পারে না।[৬] এইভাবে কুরআন স্মৃতিতে এবং সংগে সংগে লিপিতে সংরক্ষিত হইয়াছিল। বেশ পূর্ব হইতেই প্রায় নাযিল হওয়ার শুরুতে কুরআনের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অনুসারীদের মধ্য হইতে বেশ কয়েকজনকে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।[৭] নাযিলকৃত আয়াত-এর লিখিত দলীলসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজের এবং তাঁহার বহু অনুসারীর নিকট রক্ষিত ছিল। ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব বাড়ীতে তাঁহার ক্রুদ্ধ ভ্রাতা উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের আগমনে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কুরআনের আয়াত লিখিত কাগজ লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অতঃপর

উমার শান্ত হইলে ফাতিমা তাহা ভাইকে দেখাইয়াছিলেন। ইসলামের যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর নিকট ইহা সুবিদিত। ইহা রাসূলুল্লাহ -এর ইসলাম প্রচারের প্রায় ষষ্ঠ বর্ষের ঘটনা। সময় গড়াইয়া চলিলে প্রত্যাদেশসমূহ সংগৃহীত হওয়ার সাথে এই ধরনের লিখিত দলীলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ -এর মদীনায় হিজরতের পর আনসারগণের মধ্য হইতে চারজনকে বিশেষ করিয়া কুরআন সংগ্রহ এবং ইহা নিজেদের নিকট সংরক্ষণ করার জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছিল।[৮] বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখিত ও একটি পাত্রে সংরক্ষিত সমগ্র কুরআন রাসূলুল্লাহ -এর কাছেও ছিল। মোটামুটি সমগ্র কুরআনের এই ধরনের লিখিত দলীল রাসূলুল্লাহ -এর বেশ কয়েকজন অনুসারীর নিকটও ছিল।

রাসূলুল্লাহ -এর ইন্তেকালের প্রায় সংগে সংগে কয়েকটি আরব গোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ ও মদীনার আধিপত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রচেষ্টা চালাইলে যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাহা রিদ্দার যুদ্ধ নামে খ্যাত। রিদ্দার যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয শাহাদতবরণ করেন। ফলে কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টি নূতন করিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের প্রস্তাবমতে প্রথম খলীফা আবূ বাক্‌র (রা) সূরা ও আয়াত হিসাবে সন্নিবেশিত, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ শিখাইয়াছিলেন ও হাফিযগণ শিখিয়াছিলেন, কুরআনের অবিকল পাঠ পাওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করিলেন। যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ -এর অধীনে একজন লিপিকর ছিলেন। এই কাজ তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইল। তিনি লিখিত বিষয়বস্তু হাফিযগণের আবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলেন এবং এইভাবে আল-কুরআনের মূল কপি প্রস্তুত করিলেন। আবূ বাক্‌র (রা)-র জীবদ্দশা পর্যন্ত ইহা তাঁহার নিকট ছিল। তৎপর উমরের নিকট এবং উমারের ইন্তেকালের পর তাঁহার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-র নিকট ইহা সংরক্ষিত থাকে।[৯]

উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে (২৪-৩৫ হি.) দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে কুরআন পাঠের বিভিন্ন ধরন পরিলক্ষিত হয়। তিনি হাফসা (রা)-র নিকট রক্ষিত কুরআনের মূল কপির প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া, কুরআন পাঠে বিভিন্নতা কোথাও দেখা গেলে তাহা প্রত্যাহার ও নিবৃত্তি করিয়া, বিভিন্ন প্রদেশে কুরআনের মূল কপির প্রতিলিপি অবিলম্বে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার ভূমিকা ছিল শুধু আল-কুরআনের মূল কপি প্রকাশের, কুরআন সংগ্রহকারী হিসাবে নহে, সংকলনকারী তো দূরের কথা। তখন হইতে একই কুরআন লিখিতভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, যেভাবে সমগ্র কুরআন মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত ও বংশ-পরম্পরায় প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। মুদ্রণ শিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং ফটোযান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক পুনরুৎপাদন ও পুরুদ্ধিকরণ প্রণালী সত্ত্বেও মুখস্থের রীতি আজও প্রচলিত রহিয়াছে। অবশ্যই কুরআন মুখস্থ এবং ইহা শিখিবার ও শিখাইবার উপর রাসূলুল্লাহ পরম ধর্মীয় গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহার ফলে, এমনকি আজিও, মুসলমানগণের মধ্যে সমগ্র কুরআনের লক্ষ লক্ষ হাফিয দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিকেও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন যিনি তাহাদের পবিত্র গ্রন্থ হইতে একটিমাত্র অধ্যায় মুখস্থ আবৃত্তি করিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ -এর সময়

হইতে আজ পর্যন্ত সব গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে সারা রমযান মাস ব্যাপিয়া তারাবীহ্ নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন আবৃত্তি করা অব্যাহত রীতি হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানগণ তাহাদের পবিত্র গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করিতে এত বেশী ব্যাগ্রতা ও সতর্কতা দেখাইয়াছেন যে, সারা দুনিয়ায় আর কোন ধর্মের মানুষ তাহা পারে নাই।

এইভাবে আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও নিশ্চিত সমসাময়িক দলীল। যে কেহ সীরাত বুঝিতে আগ্রহী হইলে তাহাকে অবিরত আল-কুরআনের প্রসংগ আনিতেই হইবে।[১০] ইহা কখনও ধারণা করা যাইবে না যে, আল-কুরআন ইতিহাসের গ্রন্থ, আত্মজীবনী হওয়া তো দূরের কথা। অবশ্যই ইহা বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয় এবং কি রচনাশৈলীতে, কি প্রকাশ ভঙ্গিমায়, কি অধ্যায় ও খণ্ডবিন্যাসে, কি বিষয় ও প্রসংগ আলোচনায়, ইহা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বর্ণনা এই যে, ইহা আল্লাহ্ভীরুদের জন্য দিকনির্দেশনা।[১১]

এতদসত্ত্বেও আল-কুরআনে বহুভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও কর্মের তথ্য রহিয়াছে। প্রথমত, ইহা মানবজাতির প্রতি তাঁহার শিক্ষা ও বার্তা, মানুষের বিশ্বাসের সংস্কার ও পুনর্গঠন, চিন্তা, জীবন ও আচরণ, যাহা আল্লাহ্র নির্দেশে গড়িয়া উঠে, তাহার একটি অবয়ব ধারণ করে। অন্য কথায় ইহা নবী ও আল্লাহ্র দূত হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভূমিকার সর্বোত্তম প্রতিবিম্ব।

দ্বিতীয়ত, নবীর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী, প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত, আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রণালী প্রচারক, সতর্ককারী, বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ বহনকারী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ, তাহাদের আপত্তি, নবীর নিকট তাহাদের উদ্ভট দাবি, আপত্তি ও দাবির জওয়াব, বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন, নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, নবীকে হত্যা করার চেষ্টা, সংকুচিত অবস্থার সৃষ্টি (যাহার দরুন মুসলমানদের ও নবীকে মক্কা হইতে হিজরত করিতে হইয়াছিল), অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ, এই সকল সংগ্রাম ও যুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য লাভ, মক্কাবাসীদের সংগে সম্পাদিত চুক্তি ও পরিণামে তাহাদের নবীর নিকট আত্মসমর্পণ এবং নবী কর্তৃক আল্লাহ প্রদত্ত কার্যভার সমাপন, এই সবেরই অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিবরণ আল-কুরআন ধারণ করিয়া আছে। শুধু এইগুলিই নহে, বরং নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যক্তিগত জীবন, তাঁহার এতিম অবস্থা, তাঁহার পূর্বের দারিদ্র্য ও পরবর্তীতে প্রাচুর্য, পত্নীগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক, তাঁহার পত্নীগণের একজনের প্রতি মিথ্যা অপবাদ, এমনকি একজন বিনীত জিজ্ঞাসুর প্রতি ক্ষণিক অমনোযোগ—এসবের বর্ণনাও আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও মিশনের এমন কোন দিক নাই যাহা আল-কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয় নাই—অবশ্য নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ ব্যতীত এর ব্যতিক্রম। বস্তুত কুরআনের প্রত্যেক বিষয় অথবা বিষয়ের অংশ নাযিল হইয়াছিল নবীর জীবনের সুনির্দিষ্ট উপলক্ষ্য ও ঘটনার উপর।

তৃতীয়ত, অতীতের মানুষ ও সভ্যতা, পূর্ববর্তী নবী ও রাসূল ও তাঁহাদের সংগ্রাম, পূর্বের অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভংগী ও তাহাদের পরিণাম, অতীত ঘটনা, যথা আবরাহার কা'বাঘর ধ্বংস করার

নিমিত্ত মক্কা অভিযান, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের মত সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং তৎকালীন আরবদের প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি ও কুসংস্কার ইত্যাদির উল্লেখও আল-কুরআনে আছে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নবীর জীবন ও মিশনের প্রয়োজীয় পটভূমির বিবরণ পাওয়া যায়।

একটি ঐতিহাসিক দলীল হিসাবে আল-কুরআনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাকে অন্যান্য সমসাময়িক বা নিকট সমসাময়িক ধরনের দলীল ও আত্মজীবনীর মত 'কূটনীতি', 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা' এবং 'জাতীয়' অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের অজুহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে কখনও আড়াল করা হয় নাই। পক্ষান্তরে মানুষের নিকট ইহা তাৎক্ষণিক প্রকাশ ও প্রদান করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল এবং কার্যত এইভাবেই ইহা প্রকাশিত ও মানুষের গোচরীভূত হইয়াছিল। দুই কারণে এই সত্যটি গুরুত্ব বহন করে।

প্রথমত, ইহা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ -এর সমালোচকদের এই ইঙ্গিতের বিরোধিতা করে যে, রাসূলুল্লাহ তাঁহার মিশন বা প্রচারের অগ্রগতি এবং নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরিপক্ক হওয়ার কারণে আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সংশোধন, পরিমিত বা পরিবর্তন করিয়াছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ যদি কুরআনের বিষয়বস্তু সময় সময় বা দৃশ্যত রূপান্তরিত বা পরিবর্তন করিতেন, তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষ তো বটেই, তাঁহার নিজের অনুসারিগণও তাঁহার ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন।

দ্বিতীয়ত, যদি আল-কুরআন এমন কিছু বিবৃত করিত যাহা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের জ্ঞাত বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে যায়, তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁহার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ণ হইত এবং তাঁহার মিশন বা প্রচার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত, যেমনটি তাঁহার শত্রু অবিশ্বাসী কুরায়শ সর্দারগণ সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাঁহাকে অপদস্থ করিতে সদা প্রস্তুত ছিল। এক্ষণে উদাহরণস্বরূপ, যখন আল-কুরআন বলে, প্রত্যাদেশ পাইবার পূর্বে মুহাম্মাদ নবীর ভূমিকা পালনের কোন উচ্চাশা পোষণ করিতেন না বা কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন নাই অথবা তিনি কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নাই এবং একজন "অক্ষরজ্ঞানহীন" ব্যক্তি ছিলেন, তখন এই তথ্য চূড়ান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ অন্যথায় তাঁহাকে সংগে সংগে অস্বীকার করা হইত এবং তাঁহার নিজের লোকজন, যাহারা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহাকে উপহাস ও অপমান করিতেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসমানী কিতাব হওয়া ছাড়াও এই চূড়ান্ত সমসাময়িকতায় আল-কুরআন নিজেই নিজের অসামান্য প্রমাণ। সুতরাং কুরআনে ধারণকৃত মুহাম্মাদ -এর জীবন ও কর্মের উপর কোন তথ্য বা দৃষ্টিপাত অবশ্যই অন্যসব তথ্যের উৎস অপেক্ষা প্রশ্নাতীত প্রাধান্য পাইবে।

সে যাহাই হউক, আল-কুরআন মহানবী -এর জীবনের ও কর্মের কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেয় না। এই কারণেও কাল গণনা (Chronology) জন্য আমাদিগকে হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে, যাহা সুন্নাহ্ হিসাবেও অভিহিত।

দুই ঃ হাদীছ (সুন্নাহ)

'হাদীছ' বলিতে বুঝায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ও কর্মের বিবরণ, তাঁহার অভ্যাস ও অন্য যে কোন ব্যক্তির কথা ও কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন। ইহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী ও তাঁহাদের নিটকতম পরবর্তীদের বর্ণনা, কর্ম ও অনুমোদন সংক্রান্ত বিবরণের প্রতিও প্রযোজ্য। ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষীও অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা প্রদত্ত বিধায় ইহা প্রধানত ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। প্রায়শ এইসব বিবরণ এত জাজ্বল্যমান ও বিস্তারিত যে, তাহাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকার কথা নহে। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াহ্শী নিজেই বর্ণনা দেন কিভাবে তিনি হামযা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (রা)-কে উহূদের যুদ্ধে হত্যা করেন এবং কিভাবে ইসলাম কবুলের পর এই কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইয়ামামার যুদ্ধে[১২] মুসায়লামা আল-কায্যাবকে হত্যা করেন অথবা যখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম নিজের বর্ণনা দেন, কিভাবে কুরায়শদের ঘোষিত এক শত উষ্ট্র পুরস্কার লাভের প্রলোভনে নবীকে হত্যা করিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে বর্শা ও তীর দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া নবীর অনুসন্ধানে বাহির হন এবং নবীর কোন অনিষ্ট সাধনে কেমন করিয়া যে আলৌকিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়েন ও অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন[১৩], তাই এইসব বর্ণনায় সন্দেহ থাকার কথা নহে।

আল-কুরআন মানুষের নিকট ইহার অর্থ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার জন্য নবীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়[১৪] এবং সমগ্র নবী জীবন ব্যাপিয়া তিনি তাহা করেন। এই কার্য সম্পাদনে তিনি আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, নিজের খেয়াল বা কল্পনার বশবর্তী হইয়া কিছুই বলিতেন না। তাঁহার অনুসারিগণ গভীর মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেন ও সযত্নে স্মরণ রাখিতেন। তাঁহাদের অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা ও কথা এমনভাবে লিখিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইলেন[১৫] যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। তিনি তাহাদের এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন, যাহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা ও কথা পবিত্র কুরআনের সহিত মিশ্রিত হইয়া না পড়ে।[১৬] ইহা পরিষ্কার যে, সাহাবীদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা ও কথা লিপিবদ্ধ করার অভ্যাস ছাড়াও আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াত নাযিল হওয়ার সংগে সংগে লিপিবদ্ধ করা হইত। শুধু তাহাই নহে, বাহিরের কোন কিছু পবিত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সহিত যাহাতে মিশিয়া না যায়, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজের ব্যাখ্যাও নহে, তাহা সুনিশ্চিত করিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যত্নবান হইতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পর সাহাবী ও অন্যান্য অনুসারিগণ তাঁহার বিবৃতি ও নির্দেশ স্মরণ এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে অধিক প্রয়াসী হন। তাঁহাদের অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবৃতি ও উক্তির লিখিত স্মারকলিপি রাখিতেন। হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তাবিঈ (সাহাবীদের নিকটতম পরবর্তী বংশধর) কর্তৃক পদ্ধতিগতভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে।[১৭] আমরা

নিশ্চিতভাবে জানিতে পারি যে, আবান ইব্ন উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (জন্ম ১৫-২০ হিজরীর মধ্যবর্তী কাল) মাগাযী সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা সংগ্রহ ও প্রচার করেন। তিনি আবূ বাক্র ইব্ন হায্মসহ অনেককে ফিক্‌হ শিক্ষাদান করেন এবং হাদীছের আলোকে বিচারপূর্বক রায় প্রদান করেন।[১৮] একই সময়ে 'উরওয়া ইবনুয যুবায়র (জন্ম ২৬ হি.) নামে আবান ইব্ন উছমানের এক কনিষ্ঠ সমসাময়িক ব্যক্তি মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্ হিসাবে যশস্বী হন। জে. হরোভিজের মতে, "কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কই তাঁহাকে এমন একটি অবস্থানে লইয়া যায় যেখান হইতে তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের অসংখ্য বিবরণ লাভ করেন।[১৯] প্রথমত, তাঁহার পিতা, তাঁহার মাতা ও সর্বোপরি তাঁহার খালা আয়েশা (রা)-র নিকট হইতে, যাঁহার কাছে গমন করিতে ও প্রশ্ন করিতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না"।[২০] উরওয়ার বহু সংখ্যক বিবরণ আমাদের নিকট আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাঁহার পুত্র হিশাম ও ইব্ন শিহাব আয-যুহ্রী মারফত।

সেই সময় আরও অনেকে হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে নিজেদের নিবেদিত করিয়াছিলেন। এই প্রসংগে আবূ বাক্র ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন হায্ম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতামহ 'আমর ইব্ন হাযমকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের লোকদেরকে দীন ইসলাম শিক্ষাদান করার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, আবূ বাক্র ব্যবহার শাস্ত্রের (Jurisprudence) জ্ঞান আবান ইব্ন 'উছমানের নিকট হইতে লাভ করেন। তিনি ৮৬ হিজরীতে মদীনার কাযী হইয়াছিলেন, যখন 'উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) সেখানকার গভর্নর ছিলেন। আবূ বাক্র দীর্ঘকাল ঐ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ৯৬ হিজরীতে তিনি বিচারকের দায়িত্বের অতিরিক্ত মদীনার গভর্নর হন। নিজে একজন বড় মুহাদ্দিছ হওয়া ছাড়াও তিনি তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌কে হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন।

এইরূপে প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে হাদীছ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পঠনের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। অবশ্য এযাবৎ এই সকল কাজ বেশীর ভাগ বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষজ্ঞদের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ব্যাপারে একক চেষ্টার মান ও পরিধি অত্যন্ত বিস্তর ছিল। বর্ণিত আছে যে, ইব্ন শিহাব আয-যুহরী (৫১-১২৪ হি.) বিপুল সংখ্যক হাদীছ সংকলন করেন যাহা রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল। ৯৬ হিজরীতে খলীফা আল-ওয়ালীদের মৃত্যুর পর এই হাদীছ সংগ্রহগুলি বহু সংখ্যক ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে বহন করিতে হইয়াছিল।[২১]

যখন 'উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হইলেন (৯৯-১০১ হি.), তখন সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এই কাজ প্রথম শুরু হয়। তাঁহার নিজের আগ্রহ ও পাণ্ডিত্য, সেই সংগে মদীনার গভর্নর থাকাকালীন অভিজ্ঞতা ও ঐ নগরীর মুহাদ্দিছগণ, বিশেষ করিয়া সুপরিচিত বিচারক (পরে

গভর্নর) আবূ বাক্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারে তাঁহার প্রয়াসকে বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। এই আবূ বাক্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ, সেইসংগে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন শিহাব আয-যুহ্‌রী ও আরও দুইজন মনীষীকে খলীফা সুসংহতভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন।[২২] এই বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ পরিশ্রম সহকারে তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেন এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রারম্ভে প্রচুর হাদীছ সংগৃহীত হইল।

এই প্রাথমিক সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া এবং আরও অন্বেষণ ও কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান চালাইয়া পরবর্তী শতকের মুহাদ্দিছগণ গড়িয়া তুলিলেন হাদীছের এক বিশাল সম্ভার। এইসব সংগ্রহের মধ্যে নিম্নে বর্ণিতগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১। আল-মুওয়াত্তা—মালিক ইব্‌ন আনাস (৯৩-১৭৯ হি.)।

২। আল-মুস্‌নাদ—সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ ইব্‌নুল জারূদ আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী (১৩৩-২০৪ হি.)।

৩। আল-মুস্‌নাদ—আবূ 'আবদিল্লাহ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.)।

৪। আস-সুনান—আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদির রহ্‌মান আদ্‌-দারিমী (১৮১-২৫৫ হি.)।

৫। আস-সাহীহ্—আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.)।

৬। আস-সুনান—আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌নুল আশ'আছ আল-আয্‌দী আস্‌-সিজিস্তানী (২০২-২৭৫ হি.)।

৭। আস-সাহীহ—আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (২০৬-২৬১ হি.)।

৮। আস-সুনান—আবূ 'আবদুর রহ্‌মান আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন বাহার আন্‌-নাসাঈ (২১৪-৩০৩ হি.)।

৯। আস-সাহীহ্—আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মা আস-সুলামী নিশাপুরী (২২৩-৩১১ হি.)।

১০। আস-সুনান—আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন আহ্‌মাদ আত-দারাকুতনী (৩০৩-৩৮৫ হি.)।

১১। আল-মুসতাদরাক—হাকেম 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ নিশাপুরী (৩২১-৪০৫ হি.)।

১২। আস-সুনান—আবূ বাক্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌নুল হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি.)।[২৩]

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যখন হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ চলিতে থাকিল, তখন বেশ কিছু সংখ্যক জাল ও বানোয়াট বর্ণনা ও মূল বর্ণনার পরিবর্তিত অস্তিত্ব লাভ করিল, প্রধানত ব্যক্তিগত, দলগত, গোষ্ঠীগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বৃদ্ধির প্রয়াসে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতির পটভূমি হইতে আগত অসাধু ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের বিধ্বংসী মতলবের ফলস্বরূপ বেশ কিছু জাল বর্ণনা প্রচারিত হইয়া গেল। এইরূপে বহু মিথ্যা বানোয়াট বর্ণনা সেই সংগে ইয়াহূদী-খৃষ্টীয় ঐতিহ্য সংক্রান্ত কাহিনীসমূহ ঐ শতাব্দীগুলিতে লিপিবদ্ধ আল-কুরআন ও ঘটনাপঞ্জীর বেশীর ভাগ ব্যাখ্যার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে মুহাদ্দিছ ও মনীষিগণ এই ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। তাঁহারা এইসব রিওয়ায়াত ও বিবরণগুলিকে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং যে সকল বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল শুধু ঐগুলিকেই তাহাদের সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেন। বস্তুত বহু আগেই তত্ত্বমূলক শিক্ষার একটি স্বাধীন শাখা, উসূলে হাদীছ (হাদীছের নীতি বা বিজ্ঞান সংক্রান্ত) অস্তিত্ব লাভ করে। স্বাধীনভাবে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পদ্ধতির দুইটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হয়। (১) নির্দিষ্ট বিবরণ সংক্রান্ত প্রত্যেক বর্ণনাকারীর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, ধারণক্ষমতা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান[২৪] এবং (২) মূল বিষয়-বস্তু ভিত্তিক সমালোচনা, অভ্যন্তরীণ প্রমাণ, সঙ্গতিপূর্ণ, যাহা আল-কুরআন ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য এবং সাধারণত যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার নীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ[২৫] অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া। এইভাবে তন্ন তন্নরূপে পরীক্ষিত প্রধান সংগ্রহগুলি বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও কর্মের বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের এই বিশাল হাদীছ সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

তিন ঃ প্রাথমিক সীরাত/মাগাযী সাহিত্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও কর্মের বিবরণ পাইবার তৃতীয় উৎস হইতেছে ঘটনাপঞ্জীর প্রাথমিক লেখকদের কিছু রচনাবলী।[২৬] পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে এইগুলিও রিওয়ায়াত বা হাদীছের রূপ ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এইগুলি মোটামুটি কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত। এই ধরনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন রচনাবলী হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময় পাওয়া যায় যখন মদীনার জ্ঞানী-গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে তাঁহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম ও বাণী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এই দুই ধরনের কার্যক্রম অবশ্য একই তাগিদের দুইটি দিক। প্রাথমিক পর্যায়ে মোটামুটি একই মনীষি হাদীছ সংগ্রাহক ও মাগাযী সাহিত্যের সংকলক ছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, প্রথম পর্যায়ে 'মাগাযী' শব্দটি বরং শিথিলভাবে ব্যবহার করা হইত যথার্থ সীরাত ও সেই সংগে সামরিক অভিযান বুঝাইবার জন্য। পরবর্তী কালে এই দুইটি শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

যিনি সর্বপ্রথম নিজেকে মাগাযীর সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন আবান ইব্ন উছমান (জন্ম ১৫-২০ হি.)। যাঁহার সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি মদীনায় (৭৫-৮৩ হি.) খলীফা আবদুল মালিকের গভর্নর ছিলেন। দেখা যায়, তিনি সীরাত সংক্রান্ত বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন বিবরণ ব্যতীত আর কিছুই সংরক্ষিত থাকে নাই। অনুরূপভাবে তাঁহার কনিষ্ঠ সমসাময়িক ও মদীনার বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা সদস্য

'উরওয়াহ ইব্ন আয-যুবায়র ইব্ন আল-আওয়াম (২৬-৯৪ হি.)-ও এই বিষয়ে নিজেকে নিবেদিত করিয়াছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক বিবরণ কেবল সংগ্রহ ও প্রচারই করেন নাই, অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের বহু সুনির্দিষ্ট ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী একত্র করিয়াছিলেন। খলীফা আবদুল মালিক ও আল-ওয়ালীদের প্রশ্নের উত্তরে উরওয়া অনেক লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। ইব্ন ইসহাক, আল-ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ ও আত-তাবারী এই সকল বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এইসব চিঠিপত্রে উরওয়া সাধারণত তাঁহার উৎসের উল্লেখ করিতেন না, যদিও একটি হাদীছ বর্ণনাকালে তিনি স্বাভাবিকভাবে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে তাঁহার উৎস হিসাবে উল্লেখ করেন।[২৭]

তাবি'ঈদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে দুইজন যাঁহারা মাগাযী সম্পর্কে চর্চা করিয়াছিলেন, তাহারা হইলেন শুরাহ্বীল ইব্ন সা'দ (মৃত্যু ১২৩ হি.) এবং ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (৩৪-১১০ হি.)। প্রথমজন যায়দ ইব্ন ছাবিত, আবূ হুরায়রা এবং আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। শুরাহ্বীল মদীনার অভিবাসীদের এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয় না। ইব্ন ইসহাক অথবা আল-ওয়াকিদী কেহই তাঁহাকে উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু ইব্ন সা'দ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুবা হইতে মদীনায় যাত্রার বিষয়ে তাঁহার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২৮] অন্য মনীষী ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ ইরানে জন্মগ্রহণকারী দক্ষিণ আরবীয় ছিলেন এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টীয় ঐতিহ্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে তিনি কিতাবুল মুবতাদা ও কিতাবুল মাগাযী সংকলন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।[২৯] ইব্ন ইসহাক, আত-তাবারী, আল-মাসঊদী, ইব্ন কুতায়বা প্রমুখ তাহাকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ওয়াহ্ব কোথাও তাঁহার বর্ণনার উৎসের উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী পর্যায়ের তাব'উ তাবি'ঈন, অন্ততপক্ষে তিনজন মনীষীর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা হইতেছেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাক্র ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্ম (মৃ. ১৩০/১৩৫ হি.), আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা (মৃ. ১২০ হি.) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব আয-যুহরী (৫১-১২৪ হি.)।

'আবদুল্লাহ্র পূর্বপুরুষদের, বিশেষ করিয়া তাঁহার পিতা আবূ বাক্র ইব্ন মুহাম্মাদ-এর উল্লেখ ইতোমধ্যে করা হইয়াছে। 'আবদুল্লাহ্র পারিবারিক প্রেক্ষাপট মাগাযী সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উপাদান সংগ্রহে তাঁহার সহায়ক হয়। ইব্ন ইসহাক, আল-ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ ও আত-তাবারী সকলেই তাঁহাকে প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে উল্লেখ করেন এবং প্রায়শ তাঁহাকে উদ্ধৃত করেন। হরোভিজের মতে, ফিহ্রিস্তে উল্লিখিত কিতাবুল মাগাযী আবদুল্লাহ্র ভাগিনেয়/ভ্রাতুষ্পুত্র (nephew) 'আবদুল মালিকের সংকলন হিসাবে পরিচিত, কিন্তু ইহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। সম্ভবত ইহা তাহার পিতৃব্য হইতে সংগৃহীত উপাদানে রচিত।[৩০] 'আবদুল্লাহ্র রচনার বিশেষ দিক এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভিযানসমূহের কালানুক্রমিক ধারা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হন, যাহা ইব্ন ইসহাক গ্রহণ করেন।[৩১] আরবের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের

নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠিপত্র 'আবদুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন আর গোত্রের প্রতিনিধিবর্গের বিবরণও দিয়াছেন।[৩২] অবশ্যই তিনি তাহার বর্ণনার বেশীর ভাগের উৎস সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নাই। কখনও কখনও তিনি তাঁহার বিবরণীতে নিজের মতামতও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

আসিম ইব্ন 'উমার ইব্ন কাতাদা ইব্নুন নু'মান মদীনার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতামহ কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। সীরাত ও মাগাযী শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের জন্য আসিম খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।[৩৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভিযানসমূহ ও তাঁহার সাহাবীদের মহৎ কর্ম মানুষের নিকট বর্ণনা করিবার জন্য খলীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয তাঁহাকে দামেশকের মসজিদে নিয়োগ করিয়াছিলেন।[৩৪] ইব্ন ইসহাক ও আল-ওয়াকিদীর মাগাযী শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান উৎস ছিলেন তিনি। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাক্রের ন্যায় 'আসিম প্রায়ই তাঁহার উৎস সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে তিনি নিজের মতামতও মিশাইয়া ফেলিতেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব আয-যুহরী মক্কার বনূ যুহ্‌রা গোত্রের সদস্য ছিলেন।[৩৫] অন্যান্যরা ছাড়াও উরওয়া ইব্নুয যুবায়রের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং কালক্রমে তাঁহার সময়ের মদীনার সমাজে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। তিনি একাধারে হাদীছ শাস্ত্র, কুলজী শাস্ত্র ও মাগাযী শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। অসাধারণ ছিল তাঁহার মেধাশক্তি। সমসাময়িকদের অনেকের ন্যায় তিনিও তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন ও পরবর্তী বংশধরদের নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিতেন। তিনি বহু সংখ্যক হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। তিনি খলীফা 'উমার ইব্ন আবদুল আযীয কর্তৃক ইহা সংকলনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁহার অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে একটি মাগাযী শিরোনাম গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু শুধু উদ্ধৃতিস্বরূপ অন্যান্যদের গ্রন্থে ইহা পাওয়া যায়।[৩৬] এইসব উদ্ধৃতিতে, বিশেষ করিয়া ইব্ন সা'দের বিবরণে দেখা যায় যে, আয-যুহরী কেবল মাগাযী লইয়াই চর্চা করেন নাই, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী লইয়াও চর্চা করিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে, তিনি সীরাত ও মাগাযী শব্দ দুইটির স্বতন্ত্র সীমারেখা টানিয়া দিয়াছেন। আয-যুহরী সাধারণত তাঁহার বর্ণনায় সূত্রের উল্লেখ করেন, কিন্তু কখনও কখনও তাহা অনুল্লিখিত রাখেন।

সুদীর্ঘ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষক জীবনে আয-যুহ্‌রী বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। ইহাদের মধ্যে তিনজন সীরাত/মাগাযী লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাহারা হইলেন মূসা ইব্ন উকবা (৫৫-১৪১ হি.), মা'মার ইব্ন রাশেদ (৯৬-১৫৪ হি.) ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (৮৫-১৫০ হি.)। প্রধানত আয-যুহরীর শিক্ষাধীনে মূসা ইব্ন উকবা মসজিদে নববীতে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য লেখক হিসাবে বিবেচিত। তিনি মাগাযী সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ সংকলন করেন—যাহা টুকরা টুকরা অংশ ও উদ্ধৃতির আকারে পাওয়া যায়। এই সকল উদ্ধৃতি হইতে ইহা পরিষ্কার যে, তাঁহার প্রধান উৎস ছিলেন আয-যুহরী। আল-ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ ও আত্-তাবারী বিবিধ বিষয়ে তাঁহার রচনাবলীর সাহায্য গ্রহণ করেন।

মা'মার ইব্ন রাশেদ বসরায় জন্মগ্রহণ করিলেও ইয়ামানে বসতি স্থাপন করেন। মুহাদ্দিছ হিসাবে সুপরিচিত মা'মার একটি কিতাব আল-মাগাযী সংকলন করেন। পূর্বসূরীদের ন্যায় তাহার রচনাও শুধু উদ্ধৃতি ও অসম্পূর্ণ অংশে টিকিয়া রহিয়াছে। আল-ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ, আত-তাবারী ও বালাযুরীর রচনাগুলির মধ্যে তাহা পাওয়া যায়। তাহার বেশীর ভাগ বিবরণ আয-যুহরী সংক্রান্ত। তিনি বাইবেল সংক্রান্ত ইতিহাস ও কিয়দংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত-পূর্ব জীবনের প্রতি বেশ মনোযোগ দিয়াছেন। তিনি আল-ওয়াকিদীর প্রধান উৎসের অন্যতম।

আয-যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসির এই কারণে সুপরিচিত যে, কেবল তাঁহার গ্রন্থ 'কিতাবুল মাগাযী' মোটামুটি পূর্ণ অবয়বে আমরা পাই ইব্ন হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.)-এর সম্পাদনায়। মুহাম্মাদের পিতামহ ইয়াসির আরবদেশীয় খৃস্টান ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদের পিতা ইসহাক হাদীছের উৎসাহী সংগ্রাহক ছিলেন।

আয-যুহরী ছাড়াও তিনি (ইব্ন ইসহাক) 'আসিম ইব্ন 'উমার ইব্ন কাতাদা ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাক্‌রের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন এবং মিসর ও ইরাক হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য বিবরণ দ্বারা ইহার পরিপূরণ করেন। সরকারীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত না হইলেও তিনি খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূরের (রাজত্বকাল ১৩৬-১৫৮ হি.) জন্য গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৭] ইব্ন ইসহাকের একজন প্রত্যক্ষ ছাত্র আল-বাক্কাঈর (মৃ. ১৮৩ হি.) নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি গ্রন্থের প্রতিলিপির উপর ভিত্তি করিয়া ইব্ন হিশাম তাঁহার সুপরিচিত গ্রন্থ 'আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা' প্রকাশ করেন। ইব্ন হিশাম অবশ্য উল্লেখ করেন যে, গ্রন্থের আয়তন হ্রাস করার খাতিরে তিনি কিছু পরিবর্তন ও কিছু বর্জন করেন। তবে বিষয়বস্তুর কোন মৌলিক পরিমার্জন তিনি করেন নাই। বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পক্ষে আব্বাস (রা)-এর অবস্থান ও যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাঁহার গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিষয়টি (যাহা আত-তাবারী কর্তৃক সংরক্ষিত আছে) তিনি বাদ দেন। 'কিছু লোকের' ভয়ে তিনি এইরূপ করেন। বস্তুত ইব্ন হিশাম যাহা বাদ দিয়া যান তাহার অধিকাংশ আত-তাবারী, আল-আযরাকী প্রমুখের গ্রন্থে সংরক্ষণ করা হইয়াছে।[৩৮]

বিবরণসমূহের সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা থাকিলেও ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থের মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পায় এই কারণে যে, তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে মালিক ইব্ন আনাস ও হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৩৯] ইব্ন ইসহাক নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ইয়াহূদী, খৃস্টান ও পারসিকদের নিকট হইতে তথ্য পান এবং তাহাদের লোককাহিনী ও বিবরণগুলি তাঁহার গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার দেওয়া তথ্য সম্পর্কে তিনি হঠাৎ সন্দেহ প্রকাশ করেন এই বলিয়া ফীমা ইয়ায'উমূনা' (তাহারা যেইরূপ ধারণা করে)।

ইব্ন ইসহাকের বয়োকনিষ্ঠ সমসাময়িকদের মধ্যে আবূ মা'শার (নাজিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আস-সিন্দী, মৃ. ১৭০ হি.)-এর উল্লেখ করা যায়। তিনি 'কিতাবুল মাগাযী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৪০] কিন্তু ইহাও মুখ্যত আল-ওয়াকিদী ও ইব্ন সা'দের গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে ও উদ্ধৃতির আকারে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক যুগের মুসলমান মনীষিগণ আবূ মা'শার সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন।[৪১] ইব্ন ইসহাকের আর একজন কনিষ্ঠ সমসাময়িক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-উমাবী (১১১/১১৯-১৯৪ হি.) 'কিতাবুল মাগাযী' নামে গ্রন্থ সংকলন করেন।[৪২] কিন্তু ইহাও শুধুমাত্র বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃতির আকারে পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্ব (১২৫-১৯৭ হি.) ইয়াহ্ইয়ার সমসাময়িক ও ইব্ন ইসহাকের কনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আর একটি 'কিতাবুল মাগাযী' প্রণয়ন করেন।[৪৩] ইব্ন ইসহাকের বয়োকনিষ্ঠ এবং ইব্ন ওয়াহ্ব ও ইয়াহ্ইয়ার সমসাময়িক ছিলেন খ্যাতনামা গ্রন্থকার 'আবদুর রায্যাক ইব্ন হাম্মাম (১২৬-২১১ হি.)। তিনিও একটি 'কিতাবুল মাগাযী' লেখেন।[৪৪] ইহা পুনর্লিখিত হয় তাঁহার আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে।[৪৫] ইহা সুস্পষ্ট যে, ইব্ন ইসহাকের সময় হইতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন বৃত্তান্ত রচনার প্রক্রিয়া গতিশীল হয়।

প্রাথমিক যুগের মনীষিগণের মধ্যে যাঁহাদের গ্রন্থ মোটামুটি পূর্ণ আকারে টিকিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল-ওয়াকিদী (১৩০-২০৭ হি.)। তিনি খলীফা হারূনুর রশীদ ও আল-মা'মূনের সময়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিখ্যাত মন্ত্রী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ আল-বারমাকীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। আল-ওয়াকিদী বহুমুখী গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি অনেক গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহার মধ্যে আমরা কেবল 'কিতাবুল মাগাযী'-র খোঁজ পাই।[৪৬] আল-ওয়াকিদী তাঁহার গ্রন্থের উৎস হিসাবে যেসব নির্ভরযোগ্য বিশারদ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আয-যুহরী, মা'মার ও আবূ মা'শার অন্তর্ভুক্ত এবং মাঝেমধ্যে মূসা ইব্ন 'উক্বাও রহিয়াছেন। তবে ইব্ন ইসহাক কখনও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যদিও হরোভিজ উল্লেখ করেন, "ওয়াকিদী যে ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই"।[৪৭] ওয়াকিদী অবশ্য বলেন যে, তিনি যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেকের তথ্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদীনার জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে মুসলিম মনীষিগণ অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। প্রায় সর্বসম্মতভাবে একজন ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসযোগ্য লেখক হিসাবে তাঁহাকে বর্জন করা হয় এবং যেহেতু নিজের অভিষ্ট লক্ষ্য সাধনে তিনি অন্যায়ভাবে হাদীছ বিকৃত ও বানোয়াট করিয়াছিলেন।[৪৮] তাহার সচিব ইব্ন সা'দ অবশ্য তাঁহাকে সীরাত ও মাগাযীর একজন প্রামাণ্য গ্রন্থকার হিসাবে বিবেচনা করেন।

শুরুতে আল-ওয়াকিদীর একজন সচিব ও লেখক হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (১৬৮-২৩০ হি.)-এর স্বাধীন ও মূল্যবান রচনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'আত-তাবাকাত আল-কুবরা' গ্রন্থে। এই বিশ্বকোষধর্মী গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ড রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও কর্ম লইয়া রচিত। অন্যগুলি তাঁহার সাহাবীবৃন্দ ও পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কিত অভিধান। যদিও ইহা আল-ওয়াকিদীর লেখাগুলির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, ইব্ন সা'দ তাহার রচনায় বিস্তারিত বিবরণ ও পরিপূর্ণ সূত্রাবলীর সমাবেশ ঘটাইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলিয়া ধরেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি বহু মৌলিক দলীল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করেন। তাহার উপাদানসমূহ অধিক সুবিন্যস্ত। তাহার প্রণীত তাবাকাত বা সাহাবী ও তাবিঈগণের জীবনবৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান, যেহেতু ইহা জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য তথ্য প্রদান করে।[৪৯] মুসলিম মনীষিগণ ইব্ন সা'দের অনুকূলে অভিমত পোষণ করেন। তিনি একজন নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী (রাবী) হিসাবে বিবেচিত।

বিষয়বস্তু বর্ণনায় তত ব্যাপকতা না থাকিলেও ইব্ন সা'দের পরেই ছিলেন ইব্ন আবিদ দুন্য়া (আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুফ্য়ান, জন্ম ২০৮ হি.)। তিনি একখানা 'কিতাবুল মাগাযী' সংকলন করিয়াছিলেন।[৫০] ইহা অবিকল অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। বিখ্যাত মনীষী মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী (২২৪-৩২০ হি.) ইব্ন আবিদ দুন্য়ার বয়োকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু খ্যাতিতে তিনি ইব্ন আবিদ দুন্য়াকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার 'তারীখুর রুসুল ওয়াল-মুলূক' (অথবা তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক) একটি বিশ্বকোষ গ্রন্থ। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে[৫১] রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও কর্মের বিবরণ। ইহার অনেকটা ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তিনি আল-কুরআনের বিশদ ভাষ্য 'জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি কুরআন'-এর রচয়িতা। ইহা এই কারণে অনন্য যে, ইহাই প্রথম কুরআন মাজীদের বিশদ ভাষ্য, যাহা হাদীছসমূহের (আছার) উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে।

বলা হয়, আত্-তাবারীর সহিত সীরাত/মাগাযী রচনার প্রাথমিক যুগের ক্লাসিক্যাল রীতির অবসান ঘটে। তবে লেখালেখির ধারা অব্যাহত থাকে এবং পরবর্তী শতকগুলিতে আরও অনেক সংকলন প্রকাশিত হয়।[৫২] যুগপৎভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব ও মহৎ কর্মের (شمائل ودلائل) এবং সাহাবী ও তাবিঊনের জীবনী সংক্রান্ত রচনাবলী, সেই সংগে আল-কুরআনের ভাষ্য ও হাদীছের আরও সংকলন প্রকাশ পায়।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হইতে ইহা পরিষ্কার যে, পদ্ধতিগতভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সীরাত/মাগাযী রচনা কমপক্ষে প্রথম হিজরী শতকের মধ্যবর্তী সময়ে যুগপৎভাবে শুরু হয়। উভয় কার্যক্রমই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের কথা, কর্ম ও অভ্যাস সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের একই স্পৃহা হইতে শুরু হয়। বস্তুত একই শ্রেণীর মনীষিগণ প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবে এই উভয় ধরনের কর্মে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু ঐ সকল হাদীছ যেগুলির সহিত মতাদর্শগত (doctrinal) বা আইনগত (legal) সম্পৃক্ততা ছিল, উহা সংগ্রহ ও রেকর্ডভুক্ত করিতে উহার সূত্র পরম্পর পরীক্ষা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে বেশী সতর্ক ছিলেন। ঐতিহাসিক ধরনের বর্ণনার বিষয়ে তাঁহারা ততটা কড়াকড়ি আরোপ করিতেন না।

পবিত্র কুরআন, হাদীছ এবং ক্লাসিক্যাল সীরাত ও অধীনস্থ রচনাবলী পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন ও কর্মের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাইবার লক্ষ্যে

আমাদেরকে এই তিনটি উৎসের সবগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। বস্তুত ইব্ন ইসহাক/ইব্ন হিশামের রচনাবলী হইতে শুরু করিয়া পবিত্র কুরআন ও হাদীছসমূহ উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে সীরাত সংক্রান্ত পরবর্তী সকল রচনায়।

যদিও কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও কর্মের পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না, তথাপি ইহা বিশুদ্ধতা ও সমকালীনতা সংক্রান্ত একটি অসামান্য মহাগ্রন্থ। যে কোন সূত্র, এমনকি সহীহ্ হাদীছে প্রাপ্ত তথ্য বা মতামত অবশ্যই যতদূর সম্ভব আল-কুরআনের আলোকে পরীক্ষা ও যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ইহার পরিপন্থী কোন কিছু অথবা কুরআনের ঘটনা, তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত অর্থের সহিত সামঞ্জস্যহীন সবকিছু অবশ্যই অশুদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

যদিও হাদীছ ও সীরাত/মাগাযী সাহিত্য উভয়ই বিবরণীর সংকলন, তথাপি সহীহ হাদীছের বিবরণকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। কারণ বিশুদ্ধতা নিরূপণের নীতির উপর অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এইগুলি স্বীকৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে। যদি হাদীছ সংকলনের কোন বর্ণনাসূত্র ও অন্য পরীক্ষার প্রেক্ষিতে সীরাত শাস্ত্রের একই বিষয়ের বর্ণনা অপেক্ষা দুর্বলতর হয়, তাহা হইলে সীরাতের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে হইবে। শুধু ঐতিহাসিক নহে, অন্যান্য ধরনের অনুসন্ধানেও এই সাধারণ নীতি অনুসৃত হয় ঃ 'দুর্বল প্রমাণকে সবল প্রমাণের নিকট জায়গা ছাড়িয়া দেওয়া' (A weaker evidence must yield place to the stronger)। সীরাত শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে এই নীতির নিম্নরূপে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ঃ

(১) যেখানে কোন বিষয়ে বা ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ হাদীছ পাওয়া যায় সেখানে উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এমন বিবরণের তুলনায় ইহাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

(২) যেখানে একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক বিশুদ্ধ বর্ণনার বিভিন্ন মত পাওয়া যায়, তবে সেই এক বা একাধিক মতকে, যাহার অনুকূলে কুরআনের সমর্থন পাওয়া যায়, অপেক্ষাকৃত কম প্রামাণ্য বর্ণনা হইতে প্রাধান্য দিতে হইবে।

(৩) উপরিউক্ত ২নং নীতি একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক সমান দুর্বল বিবরণীর এইরূপ ভিন্নতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(৪) যেখানে আল-কুরআন বা কোন সহীহ হাদীছ কোন পয়েন্ট বা বিষয়ে তথ্য প্রদান করে না, সেখানে সীরাত শাস্ত্রে প্রাপ্ত বিবরণ বা তথ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, যদিও তাহা বিশুদ্ধতার সমস্ত শর্ত পূরণ করে না।

সীরাত/মাগাযী রচনাবলী বর্ণনার সংকলন হইলেও ইহাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি রহিয়াছে। (এক) এই রচনাগুলি মোটামুটি একই উপাদান সমৃদ্ধ; পরবর্তী প্রত্যেকটি রচনা বেশীরভাগ পূর্ববর্তী রচনার পুনরাবৃত্তি। ইহাতে নূতন বিষয় ও তথ্য সামান্য মাত্র। এই কারণে ইব্ন ইসহাক/ইব্ন হিশামের গ্রন্থাদি পূর্বসূরীদের রচনার উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত হওয়াতে পরবর্তী গ্রন্থাদি এইগুলিকে অতিক্রম বা রহিত করিতে সক্ষম হয় নাই। সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইহা অদ্যাবধি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন চরিতের প্রশস্ত খসড়া চিত্রের মূল হিসাবে রহিয়াছে গিয়াছে।

(দুই) বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে তথ্য ও উপকরণের অভিন্নতা এই ইঙ্গিত দেয় যে, সীরাত ও মাগাযী শাস্ত্রের রচনাগুলির বহু গ্রন্থ আমাদের হস্তগত না হইলেও সম্ভবত সেই কারণে কোন গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় লুপ্ত হয় নাই।

চার ঃ উৎস ও প্রাচ্যবিদগণ

ইহা সুবিদিত যে, কোন কোন প্রাচ্যবিদ বেশ কিছু মূল আরবী গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি উদ্ঘাটন, সম্পাদনা ও প্রকাশ করিতে সহায়ক হইয়াছিলেন। এইখানে তাহাদের কাজের ঐ দিকগুলি পুনরাবৃত্তি করার কোন অভিপ্রায় নাই, এই বিষয়ে তাহাদের কাজের মূল্যমান হ্রাস করা তো দূরের কথা। এখানে রাসূলুল্লাহ -এর জীবন-চর্চার উৎস ও এইগুলি প্রয়োগের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান দিকগুলি দেখানোর কেবল একটি চেষ্টা করা হইয়াছে।

উল্লেখ না করিলেও চলে, প্রাচ্যবিদগণ আল-কুরআনকে আল্লাহ্র বাণী হিসাবে স্বীকার করেন না। তাহারা যদি বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবত তাহারা আর প্রাচ্যবিদ থাকিতেন না। অপরপক্ষে তাহারা কোন না কোন কৌশলে ইহা আরোপ করার চেষ্টা করেন যে, রাসূলুল্লাহ আল-কুরআনের রচয়িতা। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা কতকগুলি দূর কল্পনার অবতারণা করেন, যাহা প্রধানত নিম্নরূপ ঃ

(১) তদানীন্তন আরবে প্রচলিত ইয়াহূদীবাদ ও খৃস্টীয় ধ্যানধারণা হইতে আল-কুরআনের (তথা ইসলামের) উৎপত্তি হইয়াছে।[৫৩]

(২) রাসূলুল্লাহ -এর সমাজ-ধর্ম সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা রাসূলুল্লাহ -এর সময়, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা হইতে উৎসারিত।

(৩) রাসূলুল্লাহ তাঁহার সাহিত্য-রীতি প্রধানত কয়েকজন প্রাচীন আরব কবির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) আল-কুরআনের ভাষা সম্পূর্ণ খাঁটি আরবী নহে, যেমনটি দাবি করা হয়, বরং ইহাতে প্রচুর বিদেশী শব্দ আছে।[৫৪]

বস্তুত এই প্রশ্নগুলি মুহাম্মাদ -এর নবুওয়াতের সমগ্র প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপট এবং ওহী প্রাপ্তির ধরন সম্পর্কিতও। অতএব এইগুলি এই গ্রন্থের যথোপযুক্ত স্থানে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে।[৫৫]

ঊনবিংশ শতক হইতে প্রাচ্যবিদদের মধ্যে আল-কুরআনের মূল পাঠ কালানুক্রমিকভাবে পুনরায় সাজানোর আর একটি প্রবণতা দেখা দেয় (তাহাদের ধারণামতে) মুহাম্মদ -এর চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভংগীর ক্রমবিকাশের সন্ধানে। থিয়োডর নলডেকে ইহার পথিকৃৎ। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া এ. রডওয়েল আল-কুরআনের অনুবাদকার্য করেন।[৫৬] অন্যরা, যথা জি. ওয়েল[৫৭] এবং ডব্লু মুইর[৫৮] ইহাতে প্রায় একই সাথে কাজ করেন।

অবশ্য এই ধারাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছান রিচার্ড বেল।[৫৯] বেল মূলত দুইটি ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন ছিলেন। যথা ঃ (ক) ওহীর স্বাভাবিক মাত্রা (Unit) সংক্ষিপ্ত স্তবকে ছিল এবং (খ) ঐগুলি

সূরা-য় সংযুক্ত করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ মূল পাঠ 'সংশোধন' করিয়াছেন। এই ধারণায় প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি আল-কুরআনের মূল পাঠকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এইগুলিকে তিনি 'সংকেত শ্রেণী', 'শ্লোগান শ্রেণী', 'দৈবজ্ঞ শ্রেণী' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। বেল তাহার 'সংশোধন' কল্পনার সমর্থনে কতকগুলি ডাহা মিথ্যা অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন। উদাহরণত "তিনি এই মর্মে অমূলক প্রস্তাব খাড়া করিয়াছেন যে, মূল পাঠে 'রিজার্ভেশন' শব্দটি 'ইল্লা' (ব্যতীত) শব্দ দ্বারা পরবর্তীতে যোগ করা হইয়াছে। তিনি অন্যান্য সমজাতীয় স্তবকের ভিতরে (তাহার মতে) দৃশ্যত অপ্রাসংগিক বিষয়ের উপস্থিতির প্রসঙ্গ তোলেন এবং ইহার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা দেন যে, কুরআনের মূল পাঠ এবং সংযোজন একই লেখ্যসামগ্রীর দুই ভিন্ন দিকে লিখিত হওয়ার দরুন সম্পাদনার সময় ইহা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।[৬০] বেল-এর ধারণাকে সাধারণভাবে সমর্থন করিয়া ওয়াট 'সংশোধন' বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং বেল-এর কল্পনাপ্রসূত অনুমানের উপর আরও অনুমান স্তূপীকৃত করেন।[৬১]

বিষয়টির স্বাধীন অনুশীলন দরকার। এখানে একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা যায় যে, 'প্রাচ্যবিদদের উদ্দেশ্য যতটা না সুস্পষ্ট করা, তাহার চাইতে বেশী হইল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা'। ডঃ এম. হামীদুল্লাহ যেমন বলেন, বেল-এর প্রায় সব অনুমানই এত বেশী শক্ত ও আপত্তি দ্বারা বেষ্টিত, যথা 'সম্ভবত', 'মনে হয়' ও অনুরূপ ধরনের যে, একজন পাঠক প্রায়শই বুঝিতে পারেন না লেখক কি বুঝাইতে চাহেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেল-এর Introduction to the Qur'an- এর ৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, "এই শ্লোগানগুলির (sic) তারিখ নির্ণয় করা শক্ত এবং ইহা সন্দেহপূর্ণ। কুরআনে অন্তর্ভুক্ত এইগুলির কোন্‌টি বেশী আগের, যদিও এইগুলির কতকগুলি সেইরূপই হইবে"।[৬২] বেল-এর ধারণার ভ্রান্ত প্রকৃতি স্বীকার করিয়া ওয়াট মন্তব্য করেন, "আমরা যদি এইরূপ সন্দেহ পোষণ করিয়াই থাকি যে, মূল পাঠের বর্তমান রূপ (order) ধারণ করিয়াছে লেখ্য-সামগ্রীর দুই দিক ব্যবহারের দরুন, আমরা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি না কোনটার পিছনে কোনটা ছিল"। "কিছু পদ্যের প্রত্যেক অংশের পৃথকভাবে তারিখ নির্ণয়ের বিষয়টি এখন একটি প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুনঃ পরীক্ষার ক্ষেত্রে, এমনকি একটিমাত্র শব্দের ভিন্ন তারিখও পদ্যের অবশিষ্ট হইতে পারে"।[৬৩]

আল-কুরআনের অংশগুলির এই ধরনের তারিখ নির্ধারণের উপর ভিত্তি করিয়া, যাহাকে প্রাচ্যবিদগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্রমবিকাশ বলিয়া মনে করেন, তাহাই খুঁজিতে চেষ্টা করেন। যেগুলিকে ওয়াট আল-কুরআনের অতি পূর্বের অংশ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইতেই তিনি নিজের বাছাই পর্ব সারেন এবং তাহাকে উপাদান করিয়া এই মর্মে ইঙ্গিত দেন যে, প্রচারের শুরুতে তাওহীদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শুধু অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ধারণা ছিল।[৬৪] সীরাত সংক্রান্ত পর্যালোচনায় প্রাচ্যবিদদের আল-কুরআন ব্যবহারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) হাদীছ ও সীরাত সাহিত্যের তথ্যাবলী পরস্পর মিলাইয়া না দেখিয়া ও সম্পূরণ না করিয়া কুরআনের প্রমাণসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারা বলেন, যেহেতু কোন মক্কী

সূরাতে 'মুহাম্মাদ' নামটি নাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার জীবনকালে নামটি গ্রহণ করেন।[৬৫] অন্যান্য প্রমাণ হইতে কুরআনের প্রমাণকে একই পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মক্কায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন যেমন কঠিন ছিল না, তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হত্যা করারও কোন প্রচেষ্টা ছিল না।

(খ) বিষয়বস্তু হইতে একটি অংশ বাহির করিয়া তাহার স্থলে একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বসাইয়া দেওয়া। আল-কুরআনের দলীল-প্রমাণের এই ধরনের ব্যবহার দ্বারা তাহারা এই ইঙ্গিত দেন, আয়াত ৫৩ ঃ ১১-১৮ (সূরা আন-নাজম)-এ আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন বলিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ দাবি করিয়াছেন।[৬৬]

(গ) অন্য অংশ বাদ দিয়া আয়াতের শুধু একটি অংশ গ্রহণ বা ইহার উপর জোর দেওয়া এবং এই প্রকার আয়াতের প্রতি এমন একটি অর্থ আরোপ করা যাহা সমগ্র আয়াতের প্রকৃত অর্থের বিপরীত। এই ধরনের কার্যকলাপের একটি উদাহরণ এই যে, তাহারা ইঙ্গিত করেন, আয়াত ১৬ ঃ ১০৩ (সূরা আন-নাহ্ল)-এ কুরআন দেখাইয়াছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবীকে শিক্ষাদান করিয়াছে।[৬৭]

(ঘ) সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রতি সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে, উদাহরণস্বরূপ, আয়াত ১৭ ঃ ৭৪ (সূরা আল-ইসরা)-এর এমন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীদের সংগে আপোষ করিবার ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে আল্লাহ্কে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।[৬৮]

(ঙ) অন্যান্য ভাবার্থকে বর্জন করিয়া কেবল একটি ভাব বা শব্দার্থের আবরণের উপর জিদ করিয়া লাগিয়া থাকা। একটি দৃষ্টান্ত ঃ ওহীকে শুধু Suggestions (ইঙ্গিত) অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত বাচনিক যোগাযোগের অর্থে নহে।[৬৯]

প্রাচ্যবিদগণ যেমন আল-কুরআনের ক্ষেত্রে, তেমনি হাদীছের ক্ষেত্রেও সীরাত ও ইসলামের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দ্বিতীয় উৎসকে বিতাড়িত করার প্রয়াস পাইয়াছেন।[৭০] দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, হাদীছশাস্ত্র খুব আগে হইলেও ইসলামের দ্বিতীয় শতকে অস্তিত্ব লাভ করে, ইহার সূত্র পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নহে এবং সব না হইলেও ইহার বেশীর ভাগ বিবরণ রাজনীতি, বদ্ধমূল ধারণা, ব্যবহার শাস্ত্র ও আদর্শগত কারণে ইসলামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে জালিয়াতি প্রসূত। বলিতে গেলে, জে. সাচ্ট (Schacht) ১৯৫০ সালে প্রকাশিত তাহার 'Origins of Muhammedan Jurisprudence গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের বিতর্ক ও ধৃষ্টতাকে চরমে লইয়া গেলেন। পূর্বসূরীদের মতবাদকে পরিপূরণ ও সমর্থন করা ছাড়াও সাচ্ট দুইটি অদ্ভুত ধারণা পেশ করিয়াছেন। যথা ঃ

(ক) ইসলামী আইন ইসলাম ধর্মের আওতার বাহিরে পড়ে, যাহাতে আল-কুরআনকে কার্যত ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের (Jurisprudence) উৎস হিসাবে অগ্রাহ্য করা যায়।

(খ) বাহ্যত ঐতিহাসিক হাদীছও সন্দেহমুক্ত নহে। কারণ (তাহার মতে) ইহাও ব্যবহার শাস্ত্রের বিবেচনায় প্রণীত হইয়াছিল।

মুসলিম মনীষিগণ এইসব তত্ত্ব ও ধারণাকে মোটেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না।[৭১] এমনকি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতও সাচটের চূড়ান্ত উপসংহারকে গ্রহণ করা কষ্টকর বলিয়া মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ, এন. জে. কাউলসন (Coulson) সাচ্টের রচনাকে অন্যথায় অনুমোদন করিলেও এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, তাহার প্রতিপাদ্য 'পদ্ধতিগতভাবে এই ধারণা পর্যন্ত উন্নত যে, 'আইনগত ঐতিহ্যের প্রমাণ আমাদিগকে প্রায় হিজরীর এক শত বৎসর পিছনে লইয়া যায় এবং যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যেক আদেশ-নির্দেশের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করা হয়, তখন একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টি করা হয়, প্রথমদিকের মুসলমান সমাজে আইনের বিকাশের ক্ষেত্রে। বাস্তব দৃষ্টিভংগীর দিক ও বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনা করিলে এই ধরনের শূন্যতার ধারণা গ্রহণ করা দুষ্কর।[৭২]

সাচ্টের মতামত ও ধারণার বিশেষ পর্যালোচনা করিয়াছেন এম.এম. আ'জামী। দেখানো হইয়াছে যে, 'ইসনাদ' (সূত্র) সম্পর্কে সাচ্টের অভিমত ভ্রান্ত[৭৩] এবং 'জীবন্ত ঐতিহ্য' (Living Tradition) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ইহার অভিক্ষেপ সম্পর্কে তাহার ধারণা মোটেও সুপ্রতিষ্ঠিত নহে।[৭৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনির্দিষ্ট বিচার সম্পর্কীয় কর্ম (Juridical activities)-ও সেই সংগে ইসলামের প্রথম শতকের আইন সংশ্লিষ্ট (Legal) সাহিত্যের প্রসংগে দেখানো হইয়াছে যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে আইনের ভিত্তি আল-কুরআন ও সুন্নাহ নহে, সাচ্টের এই ধারণা ভ্রান্ত। সাচ্টের নিজস্ব যুক্তি এবং তাহার বর্ণিত বিষয়বস্তু ও সূত্রগুলিকে বিশদভাবে উদ্ধৃত করিয়া আ'জামী এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিকারী যুক্তির সহিত প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সাচ্ট প্রতি ক্ষেত্রে তাহার যুক্তি-তর্ককে বিষয়বস্তুর বাহিরে লইয়া গিয়াছেন বা বিষয়বস্তুকে ভুল বুঝিয়াছেন বা ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অন্যথায় তাহার ধারণা ও উপসংহারকে এমনভাবে পেশ করিয়াছেন যে, ঐগুলির সমর্থনে তিনি যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করেন তাহা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আরও দেখা যায় যে, আইনজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, যেমন ইমাম মালিক সম্পর্কে অভিমত গড়িয়া তুলিতে তাঁহাদের নিজস্ব রচনাবলীর উপর সাচ্ট নির্ভর করেন নাই, নির্ভর করিয়াছেন তাঁহাদের সম্পর্কে সমসাময়িক বা নিকট সমসাময়িকগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর।

হাদীছ সম্পর্কে গোল্ডজিহার-সাচ্ট-এর এইরূপ ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন ধারণার উপর নির্ভর করিয়া এইগুলিকে প্রাচ্যবিদগণ সচরাচর নবীর জীবন-চরিতের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীছের প্রতি এই দৃষ্টিভংগী এবং আল-কুরআন সম্পর্কে তাহাদের ধারণা সাধারণত সীরাত সাহিত্যের প্রতি তাহাদের মনোভাবকেই নির্ধারিত করে। এইভাবে এক শ্রেণীর পণ্ডিত এই অবস্থান নেন যে, সীরাত সাহিত্য মূলত জীবনেতিহাসের ধারায় হাদীছের উপাদান হইতে সাজানো হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু হাদীছ সাহিত্য নির্ভরযোগ্য নহে এবং তাহা যে কোন ক্ষেত্রে কেবল কুরআনের উপাদানের সম্প্রসারণ মাত্র, সেইহেতু আল-কুরআন রাসূল-জীবনের একমাত্র স্বাধীন উৎস। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যেহেতু আল-কুরআন সময়ানুক্রমিক বিস্তারিত বিবরণ দেয় না এবং নিজেকে সীমিত রাখে প্রসংগের পরোক্ষ উল্লেখের মধ্যে মাত্র, সেইহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সঠিক বৃত্তান্ত

কদাচিৎ জানা যায়। অন্য কথায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে একটি প্রায় অনতিক্রম্য ঐতিহাসিক 'সমস্যা' রহিয়া গিয়াছে।[৭৫]

এই গ্রুপের সহিত ভিন্নমত পোষণ করিয়া, প্রাচ্যবিদগণের অন্য গ্রুপটি, আল-কুরআনের মূল্যকে অস্বীকার না করিলেও, সীরাত-সাহিত্যকে মহানবী ﷺ-এর জীবনীর প্রধান উৎস বলিয়া গণ্য করেন। ওয়াট এই অবস্থার একটি সারসংক্ষেপ এইভাবে দেন ঃ "বাস্তব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের জীবনীকারগণ যাহা করিয়াছেন তাহা হইল..... সীরাত প্রদত্ত চিত্রের প্রশস্ত বাহ্যিক সীমারেখার বিশুদ্ধতাকে গ্রহণ ও ইহাকে একটি অবকাঠামো হিসাবে ব্যবহার করা এবং ইহার ভিতরে যতদূর সম্ভব কুরআনের উপকরণ দিয়া পূর্ণ করা। অধিকতর বিচক্ষণ পদ্ধতি হইতেছে কুরআন ও প্রথমদিকের চিরাচরিত বিবরণকে পরিপূরক উৎস হিসাবে সম্মান প্রদর্শন..."।[৭৬]

উপরে ব্যবহৃত 'প্রথম দিকের চিরাচরিত বিবরণ' (The early traditional accounts) কথাটি সীরাত সাহিত্য প্রসংগে বলা হইয়াছে, হাদীছ প্রসংগে নহে, যাহার জন্য ওয়াট অন্য একটি শব্দ 'anecdotes' (ক্ষুদ্র সত্য কাহিনী) ব্যবহার করিয়াছেন।[৭৭] সীরাত সাহিত্যের বিবরণের সমর্থনে ওয়াট, মনে হয়, তাহাকে রক্ষা করিয়াছে যাহাকে পারিবারিক 'ইসনাদ' (সূত্র) রীতি বলা হয়,[৭৮] যদিও সাধারণত অন্যান্য প্রাচ্যবিদদের ন্যায় তিনিও হাদীছশাস্ত্রের ইসনাদ রীতিকে অতি অল্প মূল্যের বলিয়া মনে করেন।

প্রথম গ্রুপের পণ্ডিতগণ তাহাদের এই চিন্তাধারায় সত্যের কাছাকাছি পৌছান যে, সীরাতশাস্ত্র কমবেশি হাদীছ শাস্ত্রের আর একটি ভাষ্য। কিন্তু তাহারা খুব ভুল করেন যখন তাহারা মনে করেন যে, স্বাধীন ঐতিহাসিক উপাদানের কিছুই সীরাত শাস্ত্রে নাই। বিশেষ উল্লেখ্য, তাহারা ভুল করেন যখন তাহারা ধরিয়া লন, যেমন তাহাদের মুখপাত্র বলেন, "যে খৃষ্টীয় ঐতিহাসিক সূত্র যাহা আলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও যিশুর ঈশ্বরত্বকে সত্যায়িত করে", ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার জন্য ঠিক তাহাই করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং "ইতোপূর্বে বিদ্যমান ধর্মমত ও বিচার সংক্রান্ত হাদীছ সংগৃহীত ও কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়"।[৭৯] আলাদাভাবে, অনুমানের বিশুদ্ধতার প্রশ্নে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি একই রকম অলৌকিকত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য অভিসন্ধিমূলকভাবে পূর্বেই প্রস্তুত উপাদান লইয়া সীরাত শাস্ত্র রচিত হয় নাই।

তদ্রূপ দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতগণ সঠিক, যখন তাহারা বলেন যে, সীরাত শাস্ত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের বিস্তৃত রূপরেখা প্রদান করে। কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত, যখন তাহারা মনে করেন যে, সীরাত শাস্ত্র, যদিও সাহিত্যের অবয়ব হইতে ভিন্ন, মূলত হাদীছ শাস্ত্র হইতে পৃথক অথবা এই দুইটির ক্রমবিকাশ হইয়াছে ভিন্ন দুইটি পৃথক ভাগে (Water light), দুই ভিন্ন সময়ে, প্রথমটি গোড়ার দিকে ও পরেরটি পরবর্তী সময়ে। যেমন পূর্বেই দেখানো হইয়াছে, সীরাতশাস্ত্র সংকলন শুরু হয় নবী ﷺ -এর হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের একই তাকিদ হইতে এবং হাদীছ সংগ্রহ ও

সংরক্ষণের কাজ সাথে সাথে শুরু হয়; অতি বিলম্বে হইলেও ইসলামের প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং একই দলের মনীষিগণের দ্বারা।

সীরাত শাস্ত্রের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভংগী থাকিলেও কার্যত উভয় দলের মনীষিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনী আলোচনায় তিনটি উৎসের সবগুলিই কমবেশি ব্যবহার করেন। সীরাত শাস্ত্রের (হাদীছ শাস্ত্রেরও) বিবরণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাহারা প্রায় একই পদ্ধতি গ্রহণ করেন, যেমন তাঁহারা করেন আল-কুরআনে বর্ণিত প্রমাণ সংক্রান্ত বিষয়ে। তাই তাহারা প্রায়শ (ক) একই বিষয়বস্তুর উপর একটি বিশেষ বিবরণ আলাদা করিয়া লন, ইহাকে পরস্পর না মিলাইয়া অথবা কুরআনের বা অন্য প্রমাণের সম্পূরক না করিয়া; (খ) দৃষ্টিকৌণিক মিল থাকিলে, সংশ্লিষ্ট বিবরণের বিশুদ্ধতার প্রশ্নটি বিবেচনা না করিয়া বা একই বিষয়ে অন্যান্য বিবরণ (যাহার মধ্যে ভিন্নমত প্রদানের প্রবণতা আছে) বিবেচনায় না আনিয়া, দুর্বলতর, এমনকি সকল বিবরণের ব্যবহার করেন; (গ) বিষয়বস্তু বহির্ভূত বিবরণ নেন এবং ইহার ভ্রান্ত ও অসমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেন; (ঘ) একটি নির্দিষ্ট ভংগীকে সমর্থনের নিমিত্তে বিবরণের মাত্র একটি অংশগ্রহণ করেন, সমগ্র বর্ণনা (যাহা একটি ভিন্ন চিত্র দিত) না লইয়া এবং (ঙ) ইহা করিতে বর্ণনাকারী বা গ্রন্থকারদের উপর মতলব আরোপ করেন, যাহা কোনভাবেই সপ্রমাণিত নহে।

বর্তমান গ্রন্থে আরও অগ্রসর হইলে, কি সীরাত কি হাদীছ সংক্রান্ত প্রাচ্যবিদদের বর্ণনার সব ও প্রত্যেকটি দিক সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিবে।

অনুবাদ ঃ আজিজুর রহমান

তথ্যসূত্র

১. A.J. Wensinck, for instance, includes the works of Ibn Hisham, Al-Waaqidi and Ibn S'ad in his Well-known Index to Hadith Literature.

২. See for discussion on the nature of Quranic revelation, infra, ch. XX, sec. III.

৩. Q. 75 : 16-18.

৪. Bukhari, nos. 1902, 4997, 4998.

৫. Q. 96 : 4-5.

৬. Q. 41 : 41-42 وَاِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ . لاَ يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ

৭. দেখুন M. Mustafa al-A'zami, Kuttab al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallama, Beirut 1394.

৮. Bukhari, nos. 3810. 3996, 5003, 5004; Muslim, no 2465; Musnad, III, 233, 277; Tayalisi, no. 2018.

৯. Bukhari, nos. 4986, 4989, 7191.

১০. এই বিষয়ে দেখুন Shaykh Muhammad Ali al-Harkan, Al-Sirah al-Nabawiyyah fi al-Quran al-Karim, in Al-Buhuth wa al-Dirasat al-Muqaddama li al-Mutamar al-Alami al-Thalith li al-Sirah al-Nabauiyyah, Doha, Muharram,1404 H, pt. III, pp 7-10.

১১. Q. ২ : ২ (هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ)

১২. Bukhari, no. 4072.

১৩. Ibid. no. 3906.

১৪. Q. 16 : 44 (وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ)

১৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন Bukhari, no. 111, 113; Musnad, II, 192, 207, 215, 403.

১৬. Muslim, no. 3004.

১৭. বিস্তারিত দেখুন M.M. A'zami, Studies in Early Hadith Literature, Indianapolis 1978 and Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature : Its Origin, Development, Special Features and Criticism, Calcutta University 1961 (revised edition published by the Islamic Texts Society, Cambridge 1993.

১৮. Ibn S'ad, V, 151; Al-Dhahabi, Siyar, IV, 351-53.

১৯. উরওয়ার মাতা আসমা (রা) ছিলেন আয়েশা (রা)-র জ্যেষ্ঠ ভগিনী।

২০. J. Horovitz, in Islamic Culture, I, 1927 p. 547.

২১. Ibn Sa'd, II, 389.

২২. দেখুন Ibn Hajar, Fath al-Bari, I, 160.

২৩. এই প্রসঙ্গে আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.) সংকলিত আল-জামে' এবং ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজা (২০৯-২৭৩ হি.) সংকলিত সুনানের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ দুইটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত (সম্পাদনা পরিষদ)।

২৪. This line of investigation led to the emergence of an extensive biographical literature (Tabaqat and books of Rijal).

২৫. উদাহরণস্বরূপ দেখুন Al-Hakim Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd Allah al-Naysaburi, Al-Madkhal ila M'arifat al-Iklal, (ed. j Robson) London 1953. Also Al-Hakim's Kita M'rifat Ulum al-Hadith (ed. Sayyid Mu'azzam Husayn). Second impression, Madina 1379/1977.

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন J. Horovitz, "The Earliest biographies of the Prophet and their authors" (tr. from German by Marmaduke Pickthal), in Islamic Culture, I, 1927, pp 535-559; II, 1928. pp 22-50, 164-182 and 495-523.

২৭. Recently the available fragments of Urwah's Writings have been collected by M.M. A'zami and published under the title : Maghazi Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallama. Riyadh 1401.

২৮. Ibn Sa'd, I, 237.

২৯. A fragment of the latter work was discovered by C.H. Becker which is preserved in Heidelberg, দেখুন Islamic Culture, I, p 558.

৩০. Ibid, II, 1928, p .26, citing Fihrist, 226.

৩১. Al-Tabari, Tarikh, III, 152-153 (1/1756).

৩২. Ibid, 120-121 (1/1717-1718).

৩৩. Ibn Qutaybah, al-Ma'arif, 466; al-Dhahabi, Siyar, V, 240.

৩৪. Ibn Hajar, Tahdhib, V, 54.

৩৫. আয-যুহরীর পূর্বপুরুষের ধারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বপুরুষ কিলাব ইব্ন মুররাহ-এর সহিত মিলিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাতা আমিনা ও প্রসিদ্ধ সাহাবী সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) যুহরা গোত্রভুক্ত ছিলেন। যুহরা ছিলেন মক্কায় কুরায়শের প্রতিষ্ঠাতা কুসাই ইব্ন কিলাবের ভাই।

৩৬. সম্প্রতি মাগাযীর উপর আয-যুহরীর লেখার কিছু অংশ সংগৃহীত হয় এবং ডঃ সুহায়ল যাক্কার কর্তৃক মাগাযী আন্-নাবাবিয়্যাহ শিরোনামে সম্পাদিত হয় (দামেশক ১৪০১/১৯৮১)।

৩৭. Ibn Qutaybah, Al-Ma'arif, p 492. See for a detailed study on Ibn Ishaq, J. Fuck, Muhammad Ibn Ishaq, Frunkfurt-am-Main 1925.

৩৮. A. Guillaume, in him Life of Muhammad : A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah (London 1955), has attempted to compile Ibn Ishaq's work from different sources including that of Ibn Hisham but excluding his editions and explanations. Recently Dr. Suhayl Zakkar has edited a version of Ibn Ishaq's work, as reported by Yunus Ibn Bukayr, under caption Kitab al-Siayr Wa al-Maghazi of Ibn Ishaq, Damascus 1398/1978.

৩৯. Ibn Qutaybah, al-Ma'arif, 492; Ibn Hajar, Tahdhib, IX, 42-43.

৪০. Al-Dhahabi, Siyar, VII, 435-436; XII, 609.

৪১. Ibn Hajar, Tahdhib, X, 420-422; Al-Dahabi, Siyar, VII, 437.

৪২. al-Dhahabi, Siyar, 344 : IX, 139, XX, 195; XXIII, 88.

৪৩. Ibid, IX, 225.

৪৪. Ibid, XIX, 306; XXII, 357.

৪৫. al-Musannaf, V, 313-492.

৪৬. The first third of the work was edited and published by Von Kremer in the Bibliotheca Indica series under caption; Waqidi's History of Muhammad's Campaigns, Calcutta 1850. An abridged German version was published by Julius Wellhausen under title : Muhammad in Madinah (Berlin 1882). Recently the complete work has been edited in three volumes by Marsden Jones.

৪৭. Islamic Culture, II, 518.

৪৮. Ibn Hajar, Tahdhib, IX, 363-368; al-Dhahabi, Mizan II, 425-426.

৪৯. Edited by Sachu and others, Lieden 1924-28. A good reprint is that of Dar Sadir, Beirut 1405/1985 in 9 volumes.

৫০. Al-Dhahabi, Siyar, A'lam al-Nubala; XIII, 403.

৫১. Of the Dar al-M"arif Cairo 1978 edition, II volumes.

৫২. See for a list of the more important of these works, Bibliography to the present work.

৫৩. প্রায় সব প্রাচ্যবিদ এই মত পোষণ করেন। একত্র বিবরণ পাওয়া যায় এইখানে ঃ

(ক) Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, Edinburgh 1926, reprinted, London 1968.

(খ) C.C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam, New York 1933; Reprinted with F. Rosenthal's Introduction, 1967.

৫৪. A. Jeffery, Foreign Vocubulary of the Quran, Borado1937.

৫৫. দেখুন Chapters IV. XI. XII. XIV, XX.

৫৬. A. Rodwell, The Coran, Translation with Suras arranged in Chronological order, London 1876. The first Muslim to follow suit appears to be Mirza Abul Fazl (of Bengal). See his The Quran, Arabic Text and English Translation, arranged chronologically, 1911 (British Museum cat. no. 14512 d15).

৫৭. G. Weil, Historische-kritische Einletung in den Koran, Bielefeld and Leipzig. 1878.

৫৮. W. Muir, The Coran, its Composition and Teaching, Lonod 1878.

৫৯. R. Bell, Introduction to the Qura'n, Edinburg University Press 1953.

৬০. Ibid, 74-78, 83.

৬১. W.M. Watt, "The dating of the Qur'an : A review of Richard Bell's Theories,". J.R.A.S, April 1957, pp 46-56. See also his revised edition of Bell's Introduction to the Qura'n, Edinburg University Press 1970.

৬২. M. Hamidullah's review of Bell's Introduction to the Quran, The Islamic Quarterly, vol. no. 4, Dec. 1954, pp 239-243 (the observation is on p. 240).

৬৩. Watt, "The Dating of the Qura'n etc." op. cit., 53, 55.

৬৪. নীচে দেখুন, চ্যাপটার ২৩, সেকশন ১ ও ২।

৬৫. নীচে দেখুন, চ্যাপটার ৬, সেকশন ২।

৬৬. নীচে দেখুন, চ্যাপটার ৮, সেকশন ৫।

৬৭. নীচে দেখুন, চ্যাপটার ১১, সেকশন ৪।

৬৮. Infra, Chapter XXXI, section III.

৬৯. নীচে দেখুন, Chapter XVIII, section III.

৭০. দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখুন Ignaz Goldziher, Mohamedanische Studien (first published 1890), vol II, translated into English by C.R. Barber and S.M. Stern under title Muslim Studies, vol II, London 1971; and A. Guillaume, The Traditions of Islam : An Introduction to the study of the Hadith Literature, Oxford 1924.

৭১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, Mohsin Abd al-Nazir, Dirasat Goldziher fi al-Sunnah wa makanatuha al-ilmyyah (Arabic text), unpublished ph.D thesis, University of Tunis, 1404/.....; and M. Luqmam Salafi, Naqd al-Hadith, inda al-Muhaddithin sanadan wa matanan wa dahd maza'im al-Mustashriqin, Riyadh 1924.

৭২. N. J. Coulson, A History of Islamic Law, London 1964, pp 64-65. আরও দেখুন তাহার "European Criticism of Hadith Literature" in the Cambridge History of Arabic Literature : Arabic Literature to the end of the Umayyad period, Cambridge 1983, pp 317-321.

৭৩. M.M. A'zamai, Studies in Early Hadith Literature, Beirut 1968, Chaps VI, VII.

৭৪. M.M. A'zami, On Schacht's Origins of Muhammedan Jurisprudence, King Saud University, Riyadh & Jown Willy & Sons, Inc, New York 1985.

৭৫. দেখুন দৃষ্টান্তস্বরূপ Regis Blachere, La Probleme de Mahomet Essai de biographie critique du foundateur de' Islam, Paris 1952.

৭৬. W.M. Watt, Mat. M, XV. আরো দেখুন তাহার "The materials used by Ibn Ishaq" in Bernard Lews & P.M. Holt (eds.), Historians of the Middle-East, London 1962, p. 23-34.

৭৭. Watt, Mat M, XI.

৭৮. Watt, "The reliability of Ibn Ishaq's sources" in La vie Du Prophet Mahomet, Colloque de stransbourg, October 1980 (pp. 31-43), pp. 40-41. Similar support to the isnad system is given also by Maxime Rodinson in "A Critical Survey of Modern Studies on Mohammad" in Marlin Swartz (ed.) Studies In Islam, London 1981 (pp. 23-85), pp. 44.

৭৯. C.H. Becker, Quoted in Historians of the Middle East, op. cit., p. 23.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটভূমি

এক ঃ দেশ ও জাতি

আরবদেশ বিশ্বের বৃহত্তম উপদ্বীপ। ইহার আয়তন ইউরোপ মহাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে। ইহা সিনাই ভূমি ও মিসরের মাধ্যমে আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত। উপদ্বীপটি তিনদিকে জলভাগ পরিবেষ্টিত, পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব সাগর (পারস্য উপসাগর) ও দক্ষিণে আরব সাগর। ইহার উত্তরের সীমাকে আমরা পশ্চিমে আকাবা হইতে পূর্বে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) ও দিজলা (টাইগ্রিস) নদী অববাহিকা অবধি টানা একটি রেখা হিসাবে কল্পনা করিতে পারি। ভৌগোলিক দিক হইতে সিরিয়া ও ইরাকের মরুভূমি এই উপদ্বীপের অংশ। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, এককালে এই মরু একদিকে সাহারা ও অন্যদিকে মধ্য ইরান ও গোবি মরুভূমির সহিত একীভূত ছিল। পরে ভূতাত্ত্বিক কারণে ভূ-খাদ সৃষ্টি হওয়ায় উহা লোহিত সাগরে পরিণত হওয়ায় ঐ সুবিশাল গোটা মরু অঞ্চল আলাদা হইয়া যায়। কিন্তু তবুও সেজন্য এই অঞ্চলের উষর প্রকৃতি তেমন বদলায় নাই।

আরব উপদ্বীপ দক্ষিণ ও পশ্চিমে নানা উচ্চতার পর্বতশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে এইসব পর্বতের কোন কোনটির উচ্চতা ১৪,০০০ ফুট ও উত্তরে আনুমানিক ১০,০০০ ফুট। দক্ষিণে হাদরামাওত হইতে এই পর্বতশ্রেণী উপকূল রেখার প্রায় সমান্তরালে ইয়ামান, আসীর অঞ্চল ও গোটা হিজায ঘুরিয়া, বিশেষত মক্কা ও তায়েফ হইয়া সিনাই, ফিলিস্তীন, জর্দান, সিরিয়া ও লেবাননের পর্বতশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলেও, বিশেষত উমানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাহাড়ের অস্তিত্ব রহিয়াছে। উমানের আল-আখদার পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা আনুমানিক ১০,০০০ ফুট। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল খুবই খাড়াভাবে উঠিয়া যাওয়ায় উপকূল বরাবর একটি সংকীর্ণ ও উর্বর সমতলভূমি রহিয়াছে। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল ভূ-সমতল হইতে আনুভূমিক ৪০০০ ফুট উঁচু ও সমুদ্র হইতে আনুমানিক দেড় শত মাইল ভিতরে অবস্থিত। উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল এক বিশাল মালভূমি। এই এলাকার প্রধান মালভূমির নাম নাজ্‌দ। মালভূমি অঞ্চল ক্রমশ পূর্ব উপকূলের দিকে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ ও উত্তরের পর্বতশ্রেণী ভারত মহাসাগর হইতে প্রবাহিত মৌসুমি বায়ু প্রবাহকে বাধা দেয়। ওদিকে আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর হইতে শীতকালীন বায়ু প্রবাহকে বাধা দেওয়ার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই মৌসুমী ও শীতকালীন বৃষ্টিপাত উপদ্বীপের প্রত্যন্ত অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। আর তাই উপদ্বীপের বেশিরভাগ অঞ্চলেই অল্প বৃষ্টিপাত হয়, যদিও মক্কা, মদীনা, তায়েফ ও রিয়াদে মাঝে মাঝে প্রবল বর্ষণ হইয়া থাকে। সুদূর অতীতে এই উপদ্বীপ ভূখণ্ড সম্ভবত অপেক্ষাকৃত বেশী আর্দ্র ছিল, বৃষ্টিপাতও বেশি হইত। কেননা এই অঞ্চলে বহু ওয়াদী বা

নদীখাতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আর সত্যিকারের মরুভূমি বলিতে এই উপদ্বীপে তিনটি প্রধান মরু অঞ্চল রহিয়াছে। এইগুলি হইল ঃ উত্তরে আন-নুফূদ, দক্ষিণে আর-রাব'উল খালী (শূন্য প্রান্তর) যাহা প্রায় গোটা ফ্রান্সের আয়তনের সমান ও আদ-দাহ্না। আদ-দাহ্না মরুভূমিটি কার্যত উল্লিখিত দুই মরুভূমির মধ্যবর্তী যোজক মরুবিশেষ। আদ-দাহ্না পূর্ব-মধ্যাঞ্চল বরাবর বিস্তৃত। আরব উপদ্বীপের অবশিষ্ট অঞ্চল স্তেপ তৃণভূমি। এখানকার, বিশেষত মধ্য, পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে বিশাল বিশাল এলাকা ফাটলময় লাভাগঠিত। তৃণভূমির মাঝে আছে অসংখ্য উর্বর মরূদ্যান ও জনবসতি। দক্ষিণ ও পশ্চিমে এবং উপকূল বরাবর উল্লেখযোগ্য উর্বর অঞ্চল আছে। সাধারণভাবে আরবদেশ পৃথিবীর অন্যতম সবচেয়ে উষ্ণ ও শুষ্ক দেশ। জলবায়ু বেশ চরমভাবাপন্ন ঃ গ্রীষ্মে অত্যন্ত গরম, শীতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা। শীতকালে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের কোন কোন এলাকার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও নিচে নামিয়া যায়।

মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পরিষ্কার বোঝা যায়, আরবদেশ কেবল স্থলভাগের মাধ্যমে নয়, বরং সাগরের মাধ্যমেও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত। ১৫শ-১৬শ শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের আগে অবধি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপকেই গোটা বিশ্ব বলিয়া মনে করা হইত। আরবদেশ তখনকার এই পুরাতন বিশ্বের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, স্মরণাতীত কাল হইতেই এই উপদ্বীপকে ঘিরিয়া বিকশিত হয় বেশ অনেকগুলি প্রাচীন সভ্যতা—পশ্চিমে নীল অববাহিকার মিসরীয় সভ্যতা, উত্তরে ফিনিশীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতা এবং উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলে যথাক্রমে দিজলা-ফোরাত অববাহিকার ব্যবিলনীয় সভ্যতা, পারসিক সভ্যতা ও সিন্ধু অববাহিকার সভ্যতা। আর ইহা হইতে আরও দূরে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ছিল চৈনিক সভ্যতা। প্রাচীন কালে আরবদেশ ছিল সে সময়কার "সভ্য" জগতের একেবারে কেন্দ্রস্থল। আধুনিক কালের গবেষকদের গবেষণা সমীক্ষা হইতে জানা যায়, আরবদেশের মধ্যাঞ্চল হইতে অভিবাসী হইয়া আসা সেমিটিক জাতির লোকেরাই মিসরীয়, ফিনিসীয়, অ্যাসিরীয় ও ব্যবিলনীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করে। ইহা ছাড়াও অতি প্রাচীন কাল হইতেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সহিত আরবদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারত ও 'দূরপ্রাচ্য' হইতে সামুদ্রিক জাহাজগুলি আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলিতে ভিড়িত ও লোহিত সাগরে চলাচল করিত। অন্যদিকে উল্লিখিত তিন মহাদেশের সঙ্গেই আরবদেশ স্থল বাণিজ্যপথে যুক্ত ছিল। আরবদেশের অবস্থান ছিল বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যপথ বরাবর। আরববাসীরা বহির্বিশ্বের ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করিত। আরবের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক দিক হইতে যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

আরবের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাবলী ও ইহার জলবায়ুর কারণে এই দেশে তেমন বিদেশী অনুপ্রবেশ ঘটে নাই। ফলে আরবের অধিবাসীরা যুগ-যুগান্তরের কালপরিক্রমায় নিজেদের নৃতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা অটুট রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, আরবই হইল সেমিটিক জনসমষ্টির [নূহ ('আ)-এর পুত্র সামের বংশোদ্ভূত] আদি নিবাস ও

লালনভূমি। অধ্যাপক ফিলিপ কে. হিট্টির মতে, সেমিটিক শব্দটি হালে পাশ্চাত্যে সাধারণভাবে ইয়াহূদীদের বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতেছে। কারণ তাহারা এখন বিপুল সংখ্যায় আমেরিকায় বসবাস করিতেছে। কিন্তু এই শব্দটি আরবের অধিবাসীদের বেলাতেই অধিকতর যথার্থভাবে প্রযোজ্য। কারণ, আরবের অধিবাসীরাই অন্য যে কোন জনগোষ্ঠী অপেক্ষা বেশী সেমিটিক দেহবৈশিষ্ট্য, আচরণ, রীতি-প্রথা, চিন্তানুশীলনের ধারা ও ভাষা নিজেদের মাঝে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। "আরবরা লিখিত প্রামাণিক ইতিহাসের সকল কাল পরিক্রমায় কার্যত অভিন্ন রহিয়াছে"।[১]

আরবদেশের ইতিহাস ও জনশ্রুতি অনুযায়ী, আরবের অধিবাসীদেরকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়। একভাগে রহিয়াছে আরবীয়দের হারাইয়া যাওয়া বা বিলুপ্ত পূর্বপুরুষেরা যাহাদেরকে বলা হয় আল-'আরাবুল বাইদাহ (বিলুপ্ত আরবীয়)। ইহারা সুপ্রাচীন কালে এই উপদ্বীপে বসবাস করিত এবং তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে। তাহাদের গোটা জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। এই বিলুপ্ত আরবীয়দের দৃষ্টান্ত হইল 'আদ ও ছামূদ, তাসম, জাদিস, আমলাক ও আরও অন্যান্য কিছু গোত্র, যাহাদের বাঁচিয়া থাকা কোন উত্তর পুরুষের কোন সন্ধান মিলে নাই। আল-কুরআনে বারবার এইসব হারাইয়া যাওয়া জনগোষ্ঠীর উল্লেখ রহিয়াছে, বিশেষত 'আদ ও ছামূদ জাতির। 'আদ জাতির লোকেরা দক্ষিণ আরবের হাদারামাওত অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে। ছামূদ জাতির লোকেরা উত্তর আরবে, বিশেষত আল-হিজর অঞ্চলে বাস করিত। নবী হূদ ('আ)[২] ও সালিহ ('আ)[৩] যথাক্রমে এই আদ ও ছামূদ জাতির জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন। সাম্প্রাতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হইতে আল-কুরআনের এই দাবির সত্যতারই কেবল প্রমাণ মিলে নাই, বরং প্রাচীন আরবীয় জনশ্রুতি ও আরব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের এই বিলুপ্ত পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার সত্যতাও প্রমাণিত হইয়াছে। ৭১৫ খৃস্ট-পূর্বাব্দের অ্যাসিরীয় শাসক ২য় সারগনের এক উৎকীর্ণ লিপিতে ছামূদ জাতির কথা উল্লিখিত আছে। টলেমি ও প্লিনিও ছামূদ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন।[৪]

অস্তিত্বশীল আরবদেরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ (১) আল-'আরাবুল 'আরিবাহ বা আদিবাসী আরব ও (২) আল-'আরাবুল মুসতা'রিবাহ বা স্বাভাবিকীকৃত আরব। প্রথম শ্রেণীর আরবরা কাহ্তানের (বাইবেলে উল্লিখিত যোকতান)[৫] পুত্র ইয়াশজুবের পুত্র ইয়ারুবের বংশধর। ইহাদেরকে তাই সাধারণভাবে কাহতানী আরব বলা হয়। কাহতানী আরবদের আদি নিবাস ইয়ামান। বিখ্যাত সাবীয় ও হিম্য়ারী রাজ্য এবং এই রাজ্যদ্বয়ের অত্যন্ত উন্নত সভ্যতা ছিল এই কাহ্তানী আরবদের সৃষ্টি। কুরআন মজীদে এই সাবীয়দের[৬] সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে।

স্মরণাতীত কাল হইতেই অবশ্য বহু কাহ্তানী আরব তাহাদের আদি নিবাসভূমি ছাড়িয়া আরব উপদ্বীপের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে। আরও পরবর্তী কালে আরবদের এই ধরনের অন্যত্র গমনের হার, বিশেষত মা'রিব বাঁধের প্রথম ভাঙ্গন ও খৃস্টীয় প্রথম শতকের পর নৌ-বাণিজ্যে আরবরা রোমকদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর বাড়িয়া যায়। এইভাবে যেসব আরব মাঝে মাঝেই

অভিবাসনে অন্যত্র চলিয়া যায় তাহাদের মধ্যে আয্‌দ্‌ গোত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এই গোত্রের একটি শাখা বনূ ছা'লাবা (ثعلبة) ইব্‌ন আমর সর্বপ্রথম আছ-ছা'লাবিয়্যা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করিলেও তাহারা পরে মদীনায় গমন করে। তাহাদেরই বংশধর হইল বিখ্যাত আওস ও খাযরাজ গোত্র যাহারা ইতিহাসের একটি পর্যায়ে মহানবী ﷺ-এর সাহায্যকারী বা আনসার হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। আয্‌দ্‌ গোত্রের আরেকটি শাখা বনূ হারিছা ইব্‌ন আমর হিজাযে বসতি স্থাপন করিয়াও তাহারা বনূ খুযা'আ নামে অধিকতর পরিচিত লাভ করে। তাহারা কালক্রমে বনূ জুরহুম গোত্রকে বিতাড়িত করিয়া মক্কা দখল করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাহ্‌তানী গোত্রের নাম বনূ লাখ্‌ম। বনূ লাখ্‌ম আল-হিরা অর্থাৎ ইরাকের আধুনিক কুফা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এখানে তাহারা আরব ও পারস্য সাম্রাজ্যের (আনু. ২০০-৬০২ খৃ.) মধ্যবর্তী একটি রাজ্য স্থাপন করে। আরও একটি শক্তিশালী গোত্রের নাম বনূ গাসসান। এই গোত্রটি সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া সেখানে গাস্‌সানী রাজ্য স্থাপন করে। এই গাস্‌সানী রাজ্যও বায়যানটাইন সাম্রাজ্য ও আরবের মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে অবস্থিত ছিল। পারস্যের সাসানী সম্রাট খুসরাও পারভেয ৬১৩-৬১৪ খৃষ্টাব্দে দামেশ্‌ক ও জেরুসালেমসহ গাস্‌সানী রাজ্য অঞ্চল দখল করিলে গাস্‌সানী রাজ্যের পতন ঘটে।

অন্য যে দুই শক্তিশালী কাহ্‌তানী গোত্র আরবে বসতি স্থাপন করে তাহাদের নাম বনূ তা'ঈ ও বনূ কিনদাহ। বনূ তা'ঈ উত্তর আরবে 'আ'আ ও সালামা পার্বত্যাঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করে। আর সেই কারণেই পর্বত দুইটি তা'ঈ পর্বত নামে পরিচিত। কিংবদন্তীতুল্য খ্যাতিসম্পন্ন হাতিম তা'ঈ এই গোত্রের লোক [বিশিষ্ট সাহাবী 'আদী (রা) এই হাতিম তাঈর পুত্র]। অন্যদিকে বনূ কিনদাহ মধ্য আরবে বসতি স্থাপন করে এবং সেখানে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজ্যের শাসকরা মালিক খেতাব ধারণ করেন যাহা ঐ অঞ্চলের শাসকদের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী।

স্বভাবীভূত আরব বা আল-'আরাবুল মুসতা'রিবা নবী ইবরাহীম ('আ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবী ইসমাঈল ('আ)-এর বংশধর। তবে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, তাহারা দক্ষিণের কাহ্‌তানী গোত্রের লোকদের তুলনায় পরবর্তী কালে আরবে আসে নাই; বরং তাহারা কাহ্‌তানী গোত্রগুলির গোটা আরব উপদ্বীপে ছড়াইয়া পড়ার বহু আগেই আসে। আরও মনে রাখা দরকার যে, নবী ইবরাহীম ('আ) মোটেও অনারব ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেমিটিক বংশোদ্ভূত। তিনি বহুকাল আগে দিজলা-ফোরাত অববাহিকায় (ব্যবিলনিয়া) অভিবাসনে আগত এবং সেখানে বসতি স্থাপনকারী সেমিটিক আরব বংশের লোক। সেদিক হইতে বিবেচনায় তাঁহার মক্কায় আগমনপূর্বক পুত্র ও স্ত্রীকে বসতি স্থাপন করানোর বিষয়টিকে তাঁহার পূর্বপুরুষের আদি আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন বলা যায়। ইসমাঈল বংশধরদেরকে স্বভাবীভূত আরব বলা ঠিক নয় এই কারণে যে, তাহারা মূলত অ-সেমিটিক গোত্রভুক্ত বহিরাগত লোক, বরং উহা বলা হয়, তাঁহার পূর্বপুরুষরা বহুকাল আগেই আরব ত্যাগ করে শুধু এই কারণেই।

দুই ঃ কা'বাঘর ও ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য

ব্যবিলনিয়া হইতে নবী ইবরাহীম ('আ)-এর সিরিয়া-ফিলিস্তীনে (কেনান) ও পরে মিসরে এবং সর্বশেষে ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার স্ত্রী হাজেরা ও ইসমা'ঈলকে দেখিতে মক্কায় আসার কাহিনী সুপরিজ্ঞাত। ইবরাহীম ('আ)-এর এই যুগান্তকরী পরিভ্রমণ শুরু হয় মোটামুটি দ্বিতীয় সহস্র খৃস্ট-পূর্বাব্দে। তিনি ঐ সময় স্বগোত্রীয় লোকজনকে প্রথমবারের মতো মূর্তি ও অন্যান্য বস্তু, যেমন মহাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক পূজা করিতে নিষেধ করেন এবং একক স্রষ্টার ইবাদত করার আহ্বান জানান।[৭] তাঁহার আহবানে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাঁহাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। তবে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁহাকে নিরাপত্তা দানপূর্বক রক্ষা করেন।[৮] একমাত্র তাঁহার স্ত্রী সারা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র লূত তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে[৯] ইবরাহীম ('আ) তাঁহার স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূতকে সঙ্গে লইয়া সিরিয়ার হারানে (বর্তমান হাররান) ও পরে সেখান হইতে কিনানে (ফিলিস্তীন) যান। তিনি উভয় স্থানেই আল্লাহ্‌র উল্লিখিত বাণী প্রচার করেন এবং কেবল তাঁহাকেই উপাসনার জন্য স্থানীয় লোকজনের প্রতি আহবান জানান। ইহার পর তিনি মিসরে যান। সেখানকার শাসক গোড়ার দিকে তাঁহার সাথে দুর্ব্যবহার এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অশুভ চক্রান্ত করিলেও পরে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শাসক হাজেরা (হাজার) নাম্নী এক মহিলাকে ইবরাহীম ও সারাকে উপহার হিসাবে দান করেন। হাজেরা মূলত একজন শাহ্যাদী ও এক শাসকের স্ত্রী ছিলেন। তবে মিসরীয় শাসক[১০] এক যুদ্ধে তাঁহাকে বন্দী করেন। ইব্রাহীম হাজেরাকে লইয়া ফিলিস্তীনে ফিরিয়া আসেন এবং পরে তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এই যাবত ইবরাহীম ('আ)-এর কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করিলে তিনি তাঁহার সেই মুনাজত কবুল করেন। তিনি তাঁহাকে এই মর্মে সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তাঁহার এক ধৈর্যশীল সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।[১১] অতঃপর হাজেরা অন্তঃসত্তা হইলে সেই খবরে সারা তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁহাকেই এইভাবে ভাগ্যবতী করেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী, একজন ফেরেশতা হাজেরা সকাশে আসিয়া তাঁহাকে এই মর্মে সুসংবাদ জানান যে, তাঁহার গর্ভে ইবরাহীম ('আ)-এর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। আর তাঁহার নাম রাখিতে হইবে ইসমাঈল।[১২] যথাসময়ে হাজেরা ইব্রাহীমের প্রথম সন্তান প্রসব করেন। শিশুর নাম রাখা হয় ইসমাঈল। তখন ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বৎসর।

ইবরাহীম ('আ) মিসর হইতে ফিরিয়া আসা অবধি লূত ('আ) বরাবরই তাঁহার সহিত ছিলেন। পরে লূত আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নবুওয়াত লাভ করেন। তাঁহাকে মরু সাগরের সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বাণী প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। লূত ('আ) ঐ অঞ্চলের পাপাচারে মগ্ন লোকজনের প্রতি বারংবার তাহাদের নিজেদেরকে সংশোধন করিয়া সুপথে আসার ও আল্লাহ্‌কে মান্য করার আবেদন জানাইলেও তাহারা সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত

আল্লাহ ঐসব অবাধ্য, গোঁয়ার অধিবাসীদেরকে তাহাদের আবাসভূমিসহ ধ্বংস করিয়া দেন। তবে লূত ('আ) ও তাঁহার কথায় ঈমান আনয়নকারী অনুসারীগণ ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায়।[১৩] এই ঘটনা ইসমাঈল ('আ)-এর জন্মের বার বা তের বৎসর পর সংঘটিত হয়। এসব ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য-প্রমাণ আজিও ঐ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইসমাঈলের জন্মের পর সারা হাজেরার প্রতি ক্রমেই বেশি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠেন। তাই ইব্‌রাহীম ('আ) হাজেরা ও পুত্র সন্তানকে সারার নিকট হইতে পৃথক করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ইহার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নির্দেশনায় ইবরাহীম ('আ) হাজেরা ও ইসমাঈলকে লইয়া ফিলিস্তীন হইতে যাত্রা করিয়া মক্কা উপত্যকায় পৌঁছানোর পর শিশু ইসমাঈল ও তাহার মাতাকে কিছু খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া আসেন সেখানেই আজ রহিয়াছে পবিত্র কা'বাগৃহ। ঐ সময় স্থানটিতে কোন মানুষের বসতি ছিল না। হাজেরা ইবরাহীম ('আ)-এর কাছে অবশ্য জানিতে চাহিয়াছিলেন, কেন তিনি তাঁহাকে সেখানে ফেলিয়া যাইতেছেন। জবাবে ইবরাহীম ('আ) তাঁহাকে জানান, তিনি ইহা করিয়াছেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইচ্ছায়। পূণ্যবতী ও আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হাজেরা স্বেচ্ছায় অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি একই সাথে আস্থা প্রকাশ করিয়া বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহাদেরকে ধ্বংস করিবেন না।[১৪]

আল্লাহ অবশ্যই হাজেরা ও তাঁহার শিশু সন্তান ইসমাঈলকে অসহায় রাখেন নাই। মা ও শিশুর সহিত থাকা সামান্য খাবার পানি অচিরেই ফুরাইয়া গেলে মা হাজেরা পানির সন্ধান করিতে থাকেন। তিনি পানির সন্ধানে পরম নিরুপায় হইয়া নিকটবর্তী সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছোটাছুটি করিতে থাকেন। তাঁহার এইরকম ছোটাছুটি সাতবার পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈল ('আ) তাঁহার সামনে উপস্থি হইয়া মাতা ও পুত্রের জন্য যমযমের কুয়ার পানি প্রস্রবণের আকারে বাহির করিয়া দেন। এই পানির উৎস কূপের ব্যবস্থা হওয়ায় উহা হইতে সত্যিকার অর্থে মক্কায় হাজেরা ও তাঁহার সন্তানের শান্তিপূর্ণ জীবনের সূচনা হইল। কেননা তখনকার দিনে (বা তাহার পরেও) পানি ছিল আরব মরুতে সবচেয়ে দামী সম্পদ। অচিরেই জুরহুম নামীয় ইয়ামানের এক কাহ্‌তানী গোত্রের লোকেরা এই অঞ্চল দিয়া যাইতেছিল। তাহারা ইহার আগে লক্ষ্য করে যে, একটি পাখি যমযম কুয়ার জায়গার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। তাহারা উহা হইতে সঠিকভাবেই অনুমান করিতে সক্ষম হয় যে, সেখানে পানি আছে। তাহারা সেখানে আসে ও সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য হাজেরার অনুমতি গ্রহণ করে।[১৫] এইভাবে যমযম কূপের আশপাশ এলাকায় জনবসতি গড়িয়া ওঠে। আর অতি শীঘ্রই স্থানটি এক গুরুত্বপূর্ণ বণিজ্যকেন্দ্র হইয়া ওঠে। স্থানটি অত্যন্ত সুবিধাজনকভাবে ইয়ামান হইতে বাণিজ্য পথের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। ইসমাঈল জুরহুম গোত্রের লোকজনের মাঝে লালিত-পালিত হন। তাঁহাদের নিকট হইতে বিশুদ্ধ আরবী ভাষাও আয়ত্ত করেন। তিনি বড়ো হওয়ার পরপর দুই বিবাহ করেন। তাঁহারা ছিলেন জুরহুম গোত্রের কন্যা। ইসমাঈলের দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন গোত্র প্রধান মুদাদ ইব্‌ন আমরের কন্যা।

ইতোমধ্যে ইবরাহীম ('আ) মক্কায় যাওয়া-আসা করিতে থাকেন। মাঝে মাঝেই এই আসা-যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার সন্তান ও স্ত্রীর[১৬] খোঁজ-খবর লওয়া। তিনি এরকম একবার

মক্কায় আগমন করার পর স্বপ্নে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ লাভ করেন। ঐ সময় ইসমাঈলের বুঝিতে শেখার বয়স হইয়াছে। আল্লাহ তাঁহার ঐ প্রত্যাদেশে তাঁহার প্রিয়তম ও একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে বলিলেন। তিনি প্রত্যাদেশের বিষয় ইসমাঈলকে জানাইলে ধর্মপ্রাণ পিতার পুণ্যবান পুত্র, যিনি নিজেও হইবেন আল্লাহ্‌র একজন নবী, নির্দ্বিধায় উহাতে নিজ সম্মতি ব্যক্ত করিয়া পিতাকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য বলিলেন। সেই অনুযায়ী ইবরাহীম ('আ) ইসমাঈলকে উপযুক্ত একটি জায়গায়[১৭] লইয়া গিয়া মাটিতে শয়ন করাইয়া দিলেন। ইসমাঈলের মুখ রহিল মাটির দিকে। ইবরাহীম ইসমাঈলের গলায় যখন ছুরি হানিতে উদ্যত তখন এই মর্মে আল্লাহ্‌র আহবান ইবরাহীমের নিকট পৌছাইল যে, তিনি ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে ইসমাঈলের পরিবর্তে কোন পশু কুরবানী[১৮] দিতে হইবে। এই পরীক্ষা ছিল পিতা ও পুত্র উভয়ের জন্য এবং তাঁহারা উভয়ে প্রশংসনীয়ভাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ ইবরাহীমকে আরও সুসংবাদ প্রদান করিলেন যে, তিনি সারার গর্ভে আরও একটি পুত্র সন্তান লাভ করিবেন, যদিও সেই সময় নাগাদ ইবরাহীম ও সারা খুবই বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।[১৯] এমনি করিয়া সারার গর্ভে ইবরাহীমের আরও একটি পুত্রের জন্ম হয় যাঁহার নাম ছিল ইসহাক। ঐ সময় ইসমাঈল ছিলেন ১৪ বৎসরের তরুণ।

ইবরাহীম ('আ) আরেকবার মক্কায় আসিলে আল্লাহ তাঁহাকে ইবাদতের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন।[২০] তদনুযায়ী তিনি পুত্র ইসমাঈলের সহযোগিতায় কা'বাঘর নির্মাণ করেন। তাঁহারা পিতা-পুত্র কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহাদের এই সৎকর্ম গ্রহণ করার, তাঁহাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনম্র ও অনুগত রাখার এবং তাঁহাদের বংশধরদের মধ্য হইতে এমন এক জনসমষ্টির অভ্যুদয় ও তাঁহাদের মধ্য হইতে এমন এক নবীর আগমন কবুল করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করেন, যে নবী ঐ জনসমষ্টিকে কলুষমুক্ত করিয়া তাহাদেরকে আল্লাহ্‌র পাক কালাম পাঠ করিয়া শুনাইবেন ও তাহাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করিবেন।[২১] তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট আরও এই মর্মে মুনাজাত করেন, আল্লাহ যেন মক্কা ও ইহার সংলগ্ন এলাকাকে শান্তি ও নিরাপত্তাময় করিয়া তুলেন এবং এখানকার অধিবাসীদেরকে পর্যাপ্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন, " যাহাতে তাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে তাহাদের ঈমান রাখিতে পারে।"[২২] কা'বাঘর নির্মাণ সমাপ্ত হইলে আল্লাহ ইবরাহীম ('আ)-কে নির্দেশ দেন তিনি যেন গোটা মানবজাতির জন্য কা'বাঘর তাওয়াফ ও হজ্জকে তাহাদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে ঘোষণা করেন।[২৩] ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম ('আ) কা'বাঘর তাওয়াফ করাকে তৌহীদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পালনীয় ধর্মীয় প্রথা হিসাবে প্রবর্তন করেন।

কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ ইবরাহীম ('আ) ও তাঁহার উভয় পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাককে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। তিনি তাঁহাদের জানান যে, তাঁহাদের বংশধররা বহু জাতিতে পরিণত হইবে।[২৪] বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী দুই পুত্র দুই ভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করেন। এই দুই পুত্র তাঁহাদের পরিণত বয়স পাওয়া অবধি ইব্‌রাহীম ('আ) সুদীর্ঘ কাল বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইসমাঈল ও ইসহাক ('আ) তাঁহাদের পরিবার গড়িয়া তোলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী, ইবরাহীম ('আ) ১৭৫ বৎসর আয়ু লাভ করেন। অবশেষে তিনি ইন্তিকাল করিলে তাঁহার দুই পুত্র একত্রে তাঁহাকে দাফন করেন।[২৫]

ইসমাঈলও দীর্ঘায়ু লাভ করেন। তিনি ১৩৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ১২ পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার এই ১২ পুত্রের বংশধরগণ ১২টি গোত্রে পরিণত হয়।[২৬] তাহারা ও তাহাদের বংশধরগণা মক্কায় বসবাস করিত। তবে তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে তাহারা আরবের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে। ইসমাঈলের ১২ পুত্র হইতে উদ্ভূত গোত্রগুলির মধ্যে তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবাত ও কায়দার (ওল্ড স্টেটামেন্টে বর্ণিত কেদার) গোত্রই সবচেয়ে বেশি উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। নাবাতের বংশধররা মক্কা হইতে উত্তরাভিমুখে অভিবাসনে গমন করে এবং কালক্রমে তাহারা বিখ্যাত নাবাতীয় রাজ্য (৬ষ্ট খৃস্ট-পূর্বাব্দ হইতে ১০৫ খৃ.) প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল পেত্রা।

কায়দার-এর বংশের লোকেরা তাহাদের উত্তরপুরুষ 'আদনানের সময় অবধি সুদীর্ঘ কাল মক্কায় ও তদসন্নিহিত এলাকাগুলিতেই থাকিয়া যায়। 'আদনান সম্ভবত ছিলেন কায়দার-এর গোত্রের ৩৮তম পুরুষ। 'আদনানের বংশধররা 'আদনানের পুত্র মা'আদ্দ ও পৌত্র নিযারের মাধ্যমে সংখ্যায় এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা এক সময় বহু গোত্রে বিভক্ত হইয়া বাহরায়ন ও ইরাকসহ গোটা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এইসব গোত্রের মধ্যে যে গোত্রগুলি পরবর্তী কালে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয় তাহারা তাহাদের আদি পুরুষ 'আদনানের নামে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে থাকে এবং সেভাবে তাহাদেরকে 'আদনানী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই 'আদনানী বংশ উদ্ভূত বিখ্যাত গোত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ তাগলিব, বাক্র ইব্ন ওয়াইল, কায়স ইব্ন আয়লান, সুলায়ম, হাওয়াযিন, গাতাফান, তামীম, হুযায়ল ইব্ন মুদরিকা, আসাদ ইব্ন খুযায়মা, ছাকীফ ও কুরায়শ (ফিহর ইব্ন মালিক ইবনুন নাদর ইব্ন কিনানা-এর পুত্র)। এই সকল গোত্রেরই আদি উৎস 'আদনান এবং 'আদনানের মাধ্যমে তাহারা ইসমাঈল ও ইবরাহীম ('আ)-এর বংশধর।

বস্তুতপক্ষে ইব্রাহীম ('আ)-এর এই ধারাটি আরবদের সমাজ জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই ধারা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐক্যের প্রতীক, যদিও তাহারা অসংখ্য স্বতন্ত্র গোত্রে বিভক্ত। আরবদের ব্যবহারিক জীবনে নানাভাবে এই বিষয়টির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি গোত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তাহাদের বংশলতিকার ধারাবাহিকতা সযত্নে রক্ষা করে এবং এই বংশলতিকায় তাহারা কিভাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশের সহিত সম্পর্কিত উহা প্রদর্শন করে। তাহারা ইবরাহীমের রীতি বা সুন্নাত হিসাবে সার্বজনীনভাবে খৎনা করাইয়া থাকে। সকল গোত্রের সকল মানুষ বিশ্বাস করিত, কা'বার নির্মাতা ছিলেন ইবরাহীম ('আ) আর এই কা'বাকে তাহারা তাহাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বিবেচনা করিত। তাহারা এই কা'বাগৃহে, এমনকি অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির সাথে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কল্পিত মূর্তিও স্থাপন করে। ইবরাহীমের ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া সকল আরব কা'বা ও মক্কায় তাহাদের হজ্জযাত্রা পালন করিয়া থাকিত। তাহারা পশু কুরবানী দিত ও কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করিত। মূতিপূজায় কার্যত ডুবিয়া গেলেও তাহারা আল্লাহ্র নাম ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা আল্লাহ্কে সর্বোচ্চ প্রভু হিসাবে গণ্য করিত যাহা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মাঝে ইবরাহীম ও ইসমাঈল ('আ) প্রবর্তিত একত্ববাদের ক্ষীণ অস্তিত্ব

থাকারও সাক্ষ্য বহন করে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, মহানবী ﷺ কুরআনের মূল পাঠের মাধ্যমে কাফিরদেরকে তাহাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীমের (মিল্লাতা আবীকুম ইবরাহীম) সত্যিকার ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়া যাওয়ার আহবান জানান। তখন কিন্তু তাহারা যে ইবরাহীমেরই বংশধর সে বিষয়টি লইয়া কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই, যদিও তাহারা মহানবী ﷺ-এর সর্বপ্রকারে বিরোধিতা করিতে সদাপ্রস্তুত ছিল। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য। কেননা একজন আরবের কাছে তাহার পূর্বপুরুষের মিথ্যা পরিচয় দান অপেক্ষা আর কিছুই অধিক ঘৃণ্য ছিল না।

তিন ঃ ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে মক্কা ও আরব

নবী ইসমাঈল ('আ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁহার বংশধররা কিছু কালের জন্য মক্কার শাসন পরিচালনার নিয়ন্ত্রক থাকে। পরবর্তী কালে তাহাদের মাতুল কুলের গোত্র বনূ জুরহুম তাহাদের নিকট হইতে সেই ক্ষমতা কাড়িয়া নেয়। আর উহার পর হইতে বনূ জুরহুম কয়েক শত বৎসর মক্কা শাসন করিতে থাকে। বনূ বাক্‌র ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা-র সাথে জোট বাঁধিয়া বনূ খুযা'আ বনূ জুরহুম গোত্রের লোজনকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করে। মক্কা হইতে চলিয়া যাইবার সময় বনূ জুরহুম মাটিতে ঢাকিয়া দিয়া ও সেখানে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মসহ দুটিই স্বর্ণমৃগ মাটি চাপা দিয়া যমযম কূপটি ধ্বংস করিয়া যায়। এইভাবে কূপটি ও উহার অবস্থান দীর্ঘকাল মানুষের দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া যায়।

বনূ খুযা'আ ইহার পর দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী মক্কার সমাজযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। পরিশেষে কুরায়শ গোত্রের কুসায়্যি ইব্‌ন কিলাব বনূ কিনানা গোত্রের সহায়তায় বনূ খুযা'আ গোত্রকে মক্কা হইতে উৎখাত করে। এই কুসায়্যি ছিলেন ইসমাঈলের বংশধরের প্রধান শাখাভুক্ত গোত্রের সদস্য। এই ঘটনা ঘটে মহানবী ﷺ -এর জন্মের আনুমানিক দুই শত বৎসর আগে। কুসায়্যি তাহার পতাকাতলে কুরায়শ বংশের সকলকে সমবেত করিয়া মক্কা ও আশপাশ এলাকায় তাহাদিগকে অভিবাসিত করেন। তিনি মক্কা ও কা'বার প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ঐতিহ্যগত কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই কার্যকলাপ প্রধানত ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) আল-হিজাবাহ অর্থাৎ পবিত্র কা'বাগৃহের চাবি সংরক্ষণ ও কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ;

(২) আস-সিকায়াহ অর্থাৎ হজ্জের সময় হজ্জযাত্রীদের জন্য পানি সরবরাহের দায়িত্ব ও সেই সাথে যমযম কূপ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা;

(৩) আর-রিফাদাহ অর্থাৎ হজ্জ মৌসুমে হাজ্জীদিগকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ ও তাহাদের আহারের ব্যবস্থার দায়িত্বাবলী;

(৪) আন-নাদওয়াহ অর্থাৎ নাগরিক জীবনের বিষয়াবলীর আলোচনা, নিষ্পত্তি ও সিদ্ধান্তের জন্য গোত্রসমূহের সলাপরামর্শ সভা ডাকার অধিকার;

(৫) আল-লিওয়া অর্থাৎ যুদ্ধে নেতৃত্বদান এবং গোত্র-পতাকা বহনের অধিকার।

কুসায়্যি তাহার চার পুত্রের সহায়তায় উল্লিখিত সকল কার্যকলাপ পালন করিতেন। তিনি কা'বার নিকটে গোত্রসমূহের পরামর্শ সভার জন্য ইহার দরজাগুলি কা'বামুখী করিয়া একটি ভবনও নির্মাণ করান। এই ভবনের নাম দেওয়া হয় 'দারুন নাদওয়াহ'। যুদ্ধ ও শান্তিকালীন সকল বিষয় সেই সাথে মক্কার বেসামরিক প্রশাসন সম্পর্কিত সকল বিষয় 'দারুন নাদওয়া'তে আলোচিত ও এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত।[২৭] প্রত্যেক গোত্রপ্রধান তাহার গোত্রের পক্ষ হইতে এই পরামর্শ সভায় বক্তব্য পেশ করিতেন। এই পরামর্শ পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত সর্বসম্মতিক্রমে। হজ্জ মৌসুমে কুসায়্যি তাহার কুরায়শ গোত্রের সদস্যদের প্রতি আগত হাজ্জীদের জন্য খাদ্য, পানীয় ও আহারের ব্যবস্থা করিতে, বিশেষত হাজ্জীগণ যখন মীনায় অবস্থান করেন সেই সময়ের জন্য একই খাতে চাঁদা প্রদানের আহবান জানাইতেন এই বলিয়া যে, তাঁহারা এখানে সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান। বস্তুত কুসায়্যি এই রীতির প্রবর্তক এবং এই ব্যবস্থা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরও অব্যাহত থাকে।

আগেই বলা হইয়াছে যে, কুসায়্যির চার পুত্র ছিল ঃ 'আবদুদ দার, 'আব্‌দ মানাফ, 'আবদুল 'উয্‌যা ও 'আব্‌দ্‌। এই চার পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র 'আব্‌দ মানাফ ছিলেন কুরায়শদের স্বাভাবিক নেতৃত্বদানের গুণের অধিকারী। তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁহার পিতা কুসায়্যির জীবদ্দশাতেও তিনি জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠেন। অবশ্য কুসায়্যি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আবদুদ দারকে তাহার নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। স্থির হয় যে, অতঃপর তিনি কুসায়্যির উল্লিখিত সকল কার্যকলাপ ও মক্কা প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করিবেন।[২৮] কুসায়্যির চার পুত্রের সকলেই এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নেন। কুসায়্যির মৃত্যুর পর আবদুদ দার উল্লিখিত সকল কার্য পালন করেন। 'আবদুদ দারের মৃত্যুর পর অবশ্য তাহার পুত্র (বনূ আবদুদ দার) ও 'আব্‌দ মানাফের পুত্রদের (বনূ 'আব্‌দ মানাফ) মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিষয়ে কুরায়শ গোত্র বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের একটি দল বনূ 'আবদ মানাফের দাবি সমর্থন করে। অন্যরা বনূ 'আবদুদ দারের দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। বনূ 'আব্‌দ মানাফের পক্ষে সমর্থন জানায় বনূ আ'সাদ ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসায়্যি, বনূ যুহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব, বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কিলাব ও বনুল হারিছ ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইবনুন নাদর। অন্যদিকে বনূ 'আবদুদ দারের প্রতি সমর্থন জানায় বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকজা ইব্‌ন মুররা, বনূ সাহম ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব, বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ও বনূ আদিয়্যি ইব্‌ন কা'ব। এই দুই পক্ষীয় গোত্রগুলি পরস্পর বিরোধী জোট গড়িয়া তোলে।

'আব্‌দ মানাফের জোট আল-মুতায়্যাবূন নামে অভিহিত হয়। কারণ, কথিত বিবরণ অনুযায়ী এই জোটের সদস্যরা তাহাদের হাত পেয়ালাপূর্ণ সুগন্ধিতে ডুবাইয়া বনূ 'আব্‌দ মানাফকে সমর্থনের শপথ নেয়। আর প্রতিপক্ষ আবদুদ দারের জোট পরিচিত হয় আল-আহলাফ বা মৈত্রী নামে। কেননা তাহারা বনূ আবদুদ দারকে সমর্থনের জন্য এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে জোট (হিলফ) গঠন করে। দুই প্রতিপক্ষ যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন লইয়া সশস্ত্র সংঘাতে উদ্যত, এমনি সময়ে তাহাদের মাঝে সুবিবেচনাবোধ প্রবল হইয়া উঠিলে উভয় পক্ষে একটি শান্তিপূর্ণ আপসরফা

হয়। এই নিষ্পত্তি অনুযায়ী বনূ 'আব্দ মানাফকে আস-সিকায়াহ ও আর-রিফাদাহ এই দুই কার্য পালনের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। অন্য তিন কার্য, যেমন আল-হিজাবাহ, আন্-নাদওয়াহ ও আল-লিওয়া-র দায়িত্ব বনূ 'আবদুদ দারের হাতে রহিয়া যায়। ইসলাম কায়েম হওয়ার আগে অবধি এই ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

আস-সিকায়াহ ও আর-রিফাদাহর দায়িত্ব দেওয়া হয় বনূ 'আব্দ মানাফের হাতে এবং এই ক্ষমতা পরিচালনা করেন 'আব্দ মানাফের দ্বিতীয় পুত্র হাশিম। কেননা হাশিমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'আব্দ শাম্স-এর আর্থিক দুর্গতির কারণে তাহাকে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে প্রায় সর্বদাই বিদেশ ভ্রমণে থাকিতে হইত। হাশিম তাঁহার পিতার মতো অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরায়শদের স্বাভাবিক মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করিতেন। তিনি বায়যান্টীয় ও আবিসিনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরপর কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ফলে কুরায়শদের বাণিজ্যিক তৎপরতা আরবের উত্তর ও দক্ষিণে, বিশেষত সিরিয়া ও আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। হাশিম বৎসরে দুইবার বিদেশে প্রধান বাণিজ্য যাত্রার প্রথা প্রবর্তন করেন, একবার শীতে ও আরেকবার গ্রীষ্মকালে। হাশিম এই ধরনের বাণিজ্য সফরে থাকার সময়ে গাযায় ইন্তিকাল করেন।

আস-সিকায়াহ ও আর-রিফাদাহ-এর দায়িত্ব অতঃপর হাশিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আল-মুত্তালিব ইব্ন 'আব্দ মানাফের উপর বর্তায়। ভাইয়ের মত আল-মুত্তালিব মেধা ও মননে সমান গুণের অধিকারী ছিলেন। কুরায়শ গোত্রের লোকেরা তাঁহাকে আল-ফায়েদ বলে সম্বোধন করিত। কারণ তিনি ছিলেন মহানুভব ও দানশীল এবং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও। তাহার ইন্তিকালের পর আস-সিকায়াহ ও আর-রিফাদাহ্র দায়িত্ব বর্তায় হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিবের উপর যিনি ছিলেন মহানবী ﷺ -এর পিতামহ।

'আবদুল মুত্তালিব দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং তাঁহার উপর ন্যস্ত উল্লিখিত দুই দায়িত্ব অর্ধ শতকেরও বেশি কাল পালন করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব ছিল যমযম কূপের পুনর্খনন ও কূপটিকে পুনর্বহাল করা। বনূ জুরহুম যমযম কূপ ধ্বংস করার ও উহার উপরে মাটিচাপা দেওয়ার পর হইতে উহা আর ব্যবহৃত হয় নাই, জনসাধারণের কাছেও ইহার অস্তিত্ব হারাইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে কুরায়শগণের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের দুই দেবদেবী ইসাফ ও না'ইলার মূর্তি কা'বার যেখানটায় তাহারা ও তাহাদের পূর্ববর্তীরা তাহাদের দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত সেখানে স্থাপন করে। এই মর্মে বিবরণ পাওয়া যায় যে, পরপর তিন রাত্রি আবদুল মুত্তালিবকে স্বপ্নযোগে যমযম কূপ পুনর্খননের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উহার অবস্থান সম্পর্কেও তাহাকে জানানো হয়। সেই অনুসারে মুত্তালিব ঐ স্থানটির খনন পরিচালনা করেন। এই কাজে তাঁহাকে সে সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র আল-হারিছ সাহায্য করেন। তিনি কিছু দূর খননের পর মাটিতে জুরহুম গোত্রের লোকদের মাটিচাপা দিয়া রাখা অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম এবং সোনার নির্মিত দুইটি মৃগমূর্তির সন্ধান পান। আরও গভীরে খননের পর যে মূল পাথরটি দিয়া যমযম কূপের পানি প্রবাহের মুখটি আটকানো ছিল সেটির সন্ধান পাইয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠেন এবং তাঁহার এই সাফল্যের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করেন।

কুরায়শরা অবশ্য গোড়ার দিকে তাহাদের পশু বলি দেওয়ার স্থানটি এইভাবে বিঘ্নিত করার জন্য আপত্তি জানাইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিতে পাইল যে, 'আবদুল মুত্তালিব সঠিকভাবেই কূপটির সন্ধান পাইয়াছেন তখন তাহারা এই কূপের পানিতে তাহাদের একটা অংশীদারিত্ব এই বলিয়া দাবি করে যে, কূপটির মালিক তো প্রকৃতপক্ষে তাহাদের একই পূর্বপুরুষ ইসমাঈল ('আ)। তবে 'আবদুল মুত্তালিব তাহাদের এই প্রস্তাবে সায় দিলেন না এই যুক্তিতে যে, আল্লাহ কর্তৃক তাহাকে মনোনীত করা হইয়াছে কূপটিকে পুনর্বহাল ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। বিষয়টির শেষপর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়, তীর নিক্ষেপ বা লটারির মত দৈবাৎ পন্থায়। আর এই প্রক্রিয়াতেও ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল আবদুল মুত্তালিবের প্রতি। অতঃপর কুরায়শগণ শান্তিপূর্ণভাবে যমযমের মালিকানা ও প্রশাসনের কর্তৃত্ব 'আবদুল মুত্তালিবকে ছাড়িয়া দেয়। তিনি কা'বাগৃহের দরজার পাশে সোনার মৃগমূর্তি দুইটি স্থাপন করেন। ইহা ছিল কা'বাগৃহের দ্বারকে স্বর্ণ দ্বারা অলংকৃত করার প্রথম ঘটনা।[২৯]

যমযম কূপের পুনর্খননের ঘটনায় 'আবদুল মুত্তালিবের মর্যাদা ও প্রভাব বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। পানির এই স্থায়ী উৎসের উপর এই মালিকানার ফলে আস-সিকায়াহ ও আর-রিফাদাহ্‌র দায়িত্ব পালনেও তাঁহার বিশেষ সুবিধা হয়। আসলেও 'আবদুল মুত্তালিবের আমলে এই দুই কার্যক্রম মক্কার নগর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া উঠে। ইহা ছাড়াও অর্ধ শতকেরও বেশি কাল ধরিয়া এই দুই কার্যক্রম পালন করার ফলে আবদুল মুত্তালিব গোটা আরবজাহানে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। ইহা ছাড়া তাঁহার বয়স, প্রজ্ঞা ও বিত্তের কারণেও তিনি অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই কুরায়শ গোত্রের কার্যত প্রধান হইয়া ওঠেন।

যমযম কূপ পুনর্খনন ছাড়াও 'আবদুল মুত্তালিবের আমলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রহিয়াছে ইয়ামানের আবিসিনীয় গভর্নর আবরাহার মক্কা আক্রমণ। আবরাহা সানায় (صنعاء) এক সুবিশাল গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল। ঐ গির্জার নাম দেওয়া হয় আল-কুল্লায়স। আবরাহা দৃঢ় সংকল্প লইয়াছিল যে, অধিকাংশ ধর্মকর্ম ও ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বেশিরভাগ যাত্রীই যেন আরবদের তীর্থস্থান ও বাণিজ্যপথ ছাড়িয়া সেদিকে যায়। তাহার এই গির্জা একজন আরব অপবিত্র করিয়াছে এই অজুহাতে সে মক্কার কা'বাগৃহ ধ্বংসের জন্য হাতি ও ঘোড়াসহ এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। সে মক্কার পথে তাহার বাহিনীসহ রওয়ানা হইলে কোন কোন আরব গোত্র তাহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে তাহাদের সকলেই পরাজিত হয়। তায়েফ হইয়া আবরাহা শেষাবধি তাহার বাহিনী ও হস্তীযুথসহ মক্কার কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছিয়া মক্কা নগরীর উপকণ্ঠ এলাকায় যাহা পাইল তাহা লুণ্ঠন ও যাহাকে পাওয়া গেল তাহাকে বন্দী করে। আবদুল মুত্তালিবের দুই শত উটও এই সময় লুণ্ঠিত হয়। অতঃপর আবরাহা নগরে দূত পাঠায় নগর প্রধানকে এই বার্তা জানাইতে যে, যুদ্ধ করার কিংবা মক্কার নগরবাসীকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা তাহার (আবরাহার) নাই। সে শুধু আসিয়াছে কা'বাঘর ধ্বংস করার জন্য। তাই নগরবাসীরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

'আবদুল মুত্তালিব ইতোমধ্যে মক্কার বিভিন্ন গোত্রপ্রধানদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং ঐ পরামর্শ সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আবরাহার অপ্রতিরোধ্য বাহিনীকে বাধা দেওয়া

নিষ্ফল। তাই আবরাহার দূত নগরে আসিলে মক্কার প্রধান হিসাবে কথা বলার জন্য 'আবদুল মুত্তালিবকে দেখাইয়া দেওয়া হয়। আবরাহার দূত 'আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে সাক্ষাত করিলে তিনি দূতকে জানাইয়া দিলেন যে, আবরাহার সহিত যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা কুরায়শদের নাই, বরং তিনি একটা শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিই চান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহার শিবিরে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইল। এই সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, নিজের কয়েক পুত্র ও অন্যকতক নেতাদের সংগে লইয়া তিনি দূতের সহিত আবরাহার শিবিরে গেলে আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের ব্যক্তিত্ব ও মেযাজে এতই চমৎকৃত হইল যে, সে নিজে তাহার শাসকের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া মেঝেতে পাতা একটি আসনে দুইজনে একত্রে আলোচনায় বসে। আবরাহা 'আবদুল মুত্তালিবের নিকট তাহার বক্তব্য জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, তাঁহার যে দুই শত উট লুণ্ঠন করা হইয়াছে তাহা তাঁহাকে যেন ফেরত দেওয়া হয়। ইহাতে আবরাহা রীতিমত বিস্মিত ও হতাশ হইয়া বলিল, সে তো বরং আশা করিয়াছিল কুরায়শ নেতা কা'বার কি হইবে সেই বিষয়ে বলিবেন ও অনুনয় করিবেন কা'বাঘর যেন ধ্বংস না করা হয়।

'আবদুল মুত্তালিব শান্তভাবে জবাব দিলেন, তিনি পশুগুলির মালিক, কা'বাঘরের নহেন। কা'বার প্রভু ও তাহার রক্ষাকর্তা রহিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনিই কা'বার নিরাপত্তা ও হেফাজতের বিষয়টি দেখিবেন। নিজ বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বে গর্বিত ও আহ্লাদিত আবরাহা উদ্ধতভাবে জানাইয়া দিল, কা'বার প্রভু তাঁহার বাহিনীর কাছে কিছুই নয়। 'আবদুল মুত্তালিব শুধু মৃদু সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, বিষয়টি লইয়া মাথাব্যথা আবরাহার এবং নিরাপত্তা দেখার কাজ হইল কা'বার প্রভুর। আবরাহার সহিত এইভাবে আলোচনাশেষে 'আবদুল মুত্তালিব মক্কা নগরে ফিরিয়া আসিয়া কুরায়শ জনসাধারণকে তাহাদের বাড়িঘর ছাড়িয়া পাহাড় চূড়ায় ও বিভিন্ন উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করার ও আবরাহা কা'বাগৃহের কি করে তাহা প্রত্যক্ষ করার পরামর্শ দিলেন। 'আবদুল মুত্তালিব নিজে তাঁহার ঘর ছাড়ার আগে কা'বাগৃহে যাইয়া কা'বার দরজা স্পর্শ করিয়া মুনাজাত করিলেন এবং প্রভু যাহাতে তাঁহার উপাসনাগৃহ নিজেই রক্ষা করেন সেই প্রার্থনা জানাইলেন।[৩০]

আসলেই আল্লাহ কা'বাগৃহ রক্ষায় হস্তক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার উপাসনাগৃহ হেফাজত করিলেন। আবরাহা যখন গোটা নগরে তীব্রগতিতে আক্রমণ চালাইতে উদ্যত তখন দেখা গেল এক ঝাঁক পাখী (আবাবীল) আকাশে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের ঠোঁটে ও পায়ের নখরে আঁকড়ানো দুইটি করিয়া সিজ্জীল (কৃষ্ণ পাথর)। এই পাথর বর্ষণ করিয়া চলিল পাখিরা আবরাহার বাহিনীর উপর। যে-ই এই পাথরের আঘাত পাইয়াছে তাহাকেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। আর তাহার লাশ দ্রুত পচিয়া উঠিয়াছে। এইভাবে হামলাকারী বাহিনীর প্রায় সবটাই ধ্বংস হইয়া যায়। আবরাহা নিজে কোনমতে হাতিতে করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিতে সমর্থ হইলেও অল্পকাল পরেই সিজ্জীল পাথরের আঘাতজনিত কারণে প্রাণ হারায়। এই অলৌকিক ও স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে যেই বৎসর মহানবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেন সেই বৎসর (৫৭০-৭১ খৃ.)। এই ঘটনার চিত্রবৎ বর্ণনা রহিয়াছে আল-কুরআনের সূরা ১০৫-এ (আল-ফীল)।[৩১]

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পরিষ্কার যে, মক্কা কমপক্ষে আড়াই হাজার বৎসরেরও প্রাচীন এক জনবসতি। মহানবী ﷺ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মক্কা শহরের নাগরিক জীবন অনেকটাই গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের অনুরূপ ছিল। মক্কার পত্তনের পর হইতে ইহার অধিবাসীরা প্রধানত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। মক্কার আদি বসতি স্থাপনকারী বনূ জুরহুম এবং ইসমাঈল বংশধর, পরবর্তী কালে যাহারা প্রথম মক্কায় বসতি স্থাপন করে, তাহাদের কেহই যাযাবর ছিল না। তাহারা মক্কার কাছাকাছি এলাকায় বসতি স্থাপন করে। কা'বার অবস্থানের ফলে ধর্মীয় তাৎপর্য ও জনপদটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের ধারে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যিক তাৎপর্যের কারণেই মক্কাকে লইয়া বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল মক্কা দখল করিয়া জনপদটি নিয়ন্ত্রণ করা। অন্যথায় মক্কা এক বিরান ও পাহাড়ী এলাকা। এখানে কোন চাষাবাদের সম্ভাবনাও যেমন নাই, তেমনি অন্য কোন অর্থনৈতিক আকর্ষণও নাই। তবে সেজন্য মক্কা ও কুরায়শ গোত্রের উৎপত্তির মূলে যাযাবর জনগোষ্ঠী রহিয়াছে এবং তাহারা পরে ইসলামের অভ্যুদয়ের অল্পকাল আগে বা সূচনায় ওখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে।

বস্তুতপক্ষে আরব উপদ্বীপ ইতিহাসের আলোকে আসার পর হইতেই ইহার জনসমষ্টিতে একটা দ্বৈতভাবের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হইয়া ওঠে। আমরা আরবে নিবাসী ও তুলনামূলকভাবে সভ্য জনসমাজ ও লোকালয়ের (হাদার) পাশাপাশি যাযাবর ও ভ্রাম্যমান (বাদ্ও) জনগোষ্ঠীকেও লক্ষ্য করি। প্রাচীন ও সুপরিতি রাজ্য, যেমন দক্ষিণে মিনিয়া (১২০০ খৃ. পূর্বাব্দ-৬০০ খৃ. পূর্বাব্দ), সারায়ী (৯৫০ খৃ. পূর্বাব্দ-১১৫ খৃ. পূর্বাব্দ), কাতাবা ও (১০০ খৃ. পূর্বাব্দ-১১৫ খৃ.), হাদরামাওত (১৮০ খৃ. পূর্বাব্দ-৩০০ খৃ.) ও হিম্য়ারী (১১৫-৫২৫ খৃ.) এবং উত্তরে নাবাতীয় (৪০০ খৃ. পূর্বাব্দ-১০৬ খৃ.) গাসসানী (২৭১-৬৩০ খৃ.) ও লাখমী (২৭১-৬২৮ খৃ.) ছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ গোত্র বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং তাহারা সুনির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহে তাহাদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদের নিজ নিজ রাজধানীসহ দুর্গও ছিল। এইসব গোত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গোত্র হইল ঃ বনূ কুদা'আ (উত্তর-পশ্চিম আরব), বনূ কাল্ব (উত্তর আরব), বনূ রবী'আ ও বনূ বাক্র ইব্ন ওয়াইল (উত্তর-পূর্ব আরব), বনূ তাঈ (উত্তর-মধ্য আরব), বনূ হানীফা (পূর্ব আরব, আল-ইয়ামামা), বনূ কিনদাহ (মধ্য আরব), বনূ হাওয়াযিন ও বনূ সুলায়ম (মধ্য ও দক্ষিণ-মধ্য আরব), বনূ খুযা'আ ও বনূ গিফার (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী পশ্চিম আরব)। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বনূ কিনদাহ-এর শাসকরা বাদশাহ উপধি ধারণ করিত। বনূ বাকর ইব্ন ওয়াইল শক্তি-সামর্থ্যের সঙ্গে কখনও কখনও পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তির সহিত তুলনীয় ছিল। সকলেই জানেন, বনূ হানীফা মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মৃত্যুর পর ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। ইহা ছাড়াও আরও কিছু নিবাসী গোত্র ছিল। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ মদীনার (ইয়াছরিব) আওস ও খাযরাজ, তায়েফের বনূ ছাকীফ, উত্তর আরবের বনূ আব্স, পশ্চিম আরবের বনূ কিনানা, উত্তর আরবের বনূ গাতাফান ও দক্ষিণ আরবের বনূ আদ-দাওস। মদীনায় হিজরতের আগে মহানবী ﷺ এই ধরনের স্থায়ী নিবাসী ও সুরক্ষিত দুর্গের মালিক গোত্রগুলির সাহায্য ও সমর্থন চাহিয়াছিলেন।[৩২] তিনি সত্যিকার অর্থে যাযাবর ও

বেদুঈনদের কাছে তেমন সাহায্য-সহযোগিতা চাহেন নাই। আদ-দাওস গোত্রের তুফায়ল ইব্ন 'আমর বাস্তবিকপক্ষে মক্কায় মহানবী -এর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়ার পর তাঁহাকে মক্কা ছাড়িয়া তাহাদের গোত্রের শক্তিশালী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন।[৩৩] মহানবী অবশ্য সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। মক্কা, তায়েফ, ইয়াছরিব (মদীনা), খায়বার, তায়মা, তাবূক, ফাদাক, দূমাতুল জানদাল ইত্যাদির মত জনপদগুলি ছিল ইসলামেরও অভ্যুদয়ের বহুকাল আগে হইতেই স্থায়ী জনপদ। প্রাক-ইসলামী আরবের পরিস্থিতি অনেকাংশেই প্রাচীন ভারতবর্ষের মত ছিল। আরব উপদ্বীপে ছিল অনেক ছোট ছোট ও অতি ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাজনৈতিক সত্তা। তবে ভারতের পরিস্থিতির সাথে আরবের পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, বিভিন্ন গোত্র অধ্যুষিত জনপদ ছাড়া আরবের বিশাল বিশাল অঞ্চল ছিল জনশূন্য। এসব অঞ্চলে বেদুঈন ও যাযাবরেরা তাহাদের পশুচারণ করিত, ডাকাতি-লুণ্ঠনে লিপ্ত ছিল কিংবা এক গোত্র অন্য গোত্রের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। সর্বোপরি পশুচারণ, বাণিজ্য বা লুটেরা বৃত্তির সুযোগ সন্ধানে যাযাবর ও বেদুঈন শ্রেণীর লোকেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

তবে যাযাবরগণ বেদুঈন কিংবা স্থায়ী নিবাসী যাহাই হউক, সকল গোত্রের লোকজনের সামাজিক ব্যবস্থাটি ছিল গোত্রভিত্তিক। একটা বেশ বিপুল সংখ্যক লোক লইয়া গঠিত হইত গোত্র। তাহাদের সকলের আদি ও প্রত্যন্ত পূর্বপুরুষ অভিন্ন ছিল। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই এই গোত্র কয়েকটি গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত হইত। এই ধরনের প্রতিটি গোষ্ঠী গঠিত হইত খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত কিছু পরিবার লইয়া, যাহাদের পূর্বপুরুষ অভিন্ন থাকিত। গোত্র ও গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় কড়াকড়িভাবে আলাদা ও স্পষ্ট করিয়া রক্ষা করা হইত। এই ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গোত্র, গোষ্ঠী ও পারিবারিক বংশতালিকা সংরক্ষণের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। এমনকি একজন সাধারণ ব্যক্তিও তাহার ২০ হইতে ২৫তম পূর্বপুরুষের বংশলতিকা মুখস্থ রাখিত, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। কোন মর্যাদাবান লোকের কাছে আশা করা হয় যে, তিনি তাহার ৫ হইতে ১০ জন পূর্বপুরুষের নাম, যেমন আবদুল্লাহ-র পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুক ইত্যাদি উল্লেখ করিতে পারিবেন।[৩৪] এই বংশলতিকার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব আরোপ করার কারণে এই বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ বা বিশারদ শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। তাহাদেরকে 'নুসসাব' (বংশবৃত্তান্ত বিশারদ) বলিয়া অভিহিত করা হইত। তাহাদের কাজ ছিল বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী ও পরিবারের বংশলতিকা সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রকাশ করা। মক্কায় হযরত আবূ বাক্র (রা) ছিলেন এই রকম একজন নুসসাব। বলা প্রয়োজন যে, এইসব গোত্র, গোষ্ঠী বা পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। তাই মাতৃতান্ত্রিক ধারার বংশতালিকার সন্ধান আরবে খুব কচিৎ পাওয়া যায়।

গোত্র ছিল কার্যত আধুনিক কালের একটি রাষ্ট্রের সমমর্যাদা সম্পন্ন। একজন ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়, তাহার অধিকার ও কর্তব্য এবং সর্বোপরি তাহার হেফাজত ও নিরাপত্তা সবকিছুই তাহার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কোন ব্যক্তিকে যদি কোন গোত্র বা গোষ্ঠী বহিষ্কার করে কিংবা তাহাদের বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির দশা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির মত

হইত। এই অবস্থায় যে কেহ শাস্তির আশংকা ছাড়াও তাহার উপর অন্যায় করিতে পারিত, আটক করিতে পরিত, এমনকি হত্যাও করিত পারিত। অপরপক্ষে গোত্রের কোন ব্যক্তির উপর কোন অন্যায় করা হইলে অনিবার্যভাবে সে অন্যায় সংশিষ্ট গোটা গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রতি অন্যায় হিসাবে গণ্য হইত। আর যদি অন্যায়কারী অন্য আরেকটি গোত্রের বা গোষ্ঠীর সদস্য হইত তাহা হইলে ঐ গোত্র বা গোষ্ঠী সকলে সম্মিলিতভাবে ঐ অপরাধের জন্য দায়ী হইত। সাধারণত এক গোত্রের কোন ব্যক্তি অন্য কোন গোত্রের লোককে হত্যা করিলে তাহার পরিণতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট দুই গোত্র ও তাহাদের মিত্রদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তের বিরোধ দেখা দিত। ব্যক্তির গুণ-উৎকর্ষ ও কীর্তির বিষয়গুলি তাহার গোত্র বা গোষ্ঠীর জন্য সম্মান ও মর্যাদার বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। অন্যদিকে গোত্র ও গোষ্ঠীর অনুরূপ সাফল্য ও গুণের বিষয়গুলিও ব্যক্তির মর্যাদা ও গৌরবে প্রতিফলিত হইত একজন গোত্র ও গোষ্ঠী বহির্ভূত ব্যক্তিও একটি গোত্র বা গোষ্ঠীর মিত্র (হালীফ) অথবা আশ্রিত (মাওলা) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। গোত্র অবশ্য কোনভাবেই সর্বাত্মকবাদ বা কিছু শ্রমিক বা জনশক্তির সমষ্টিমাত্র ছিল না। গোষ্ঠী ও তাহার বর্গগুলির মত পরিবারগুলিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল আর সেই কারণে ব্যক্তি পর্যায়ের মানুষও বেশ অনেকখানি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি সুবিধা ভোগ করিত।

গোত্রের সদস্য অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করার শর্তসাপেক্ষে ব্যক্তি তাহার নিজ পছন্দ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হইত, সম্পত্তি কাহাকেও দিয়া দিতে পারিত, বিবাহ করিয়া নিজ পরিবারের পত্তন করিতে পারিত এবং নিজ পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী কাজ করিতে ও অবাধে তাহার নিজ পেশা বা জীবিকায় নিয়োজিত হইতে পারিত। এক্ষেত্রে আমরা আধুনিক কালের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বর্ণপদক জয়ের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ঐ ব্যক্তির স্বর্ণপদক জয় শুধু তাহার নিজ ব্যক্তির কৃতিত্বই নয়, বরং সে কৃতিত্বে তাহার দেশ ও জাতিও অংশীদার। ঠিক একইভাবে গোত্রের কোন ব্যক্তির কোন দৈহিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্য বা কীর্তি কেবল তাহার নিজের প্রশংসা বা সুখ্যাতির বিষয় নহে, বরং একই সঙ্গে তাহা তাহার গোষ্ঠী বা গোত্রের জন্যও সুখ্যাতি ও গৌরবের বিষয়। আজিকার আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক যেমন তাহার দেশ ও জাতিকে দুশমনের আক্রমণ হইতে রক্ষায় যুদ্ধ করিতে দায়বদ্ধ, ঠিক তেমনি একটি গোত্রের সদস্যও তাহার গোত্র বা গোষ্ঠীর জন্য লড়িতে বাধ্য। অবশ্য ইহার পরেও গোত্রের কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে গোত্রের যুদ্ধে শরিক না হওয়ার সিদ্ধান্ত লইতে পারিত। সে ঐ লড়াইয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিত এবং যুদ্ধে শরিক হওয়ার বিষয়টি এড়াইয়া যাইতে পারিত। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিতে পারি যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বু'আছের যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগ দেয় নাই।

গোত্রের নেতা নির্বাচিত হইত একজনের বংশমর্যাদা, বয়স, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী ও উৎকর্ষের ভিত্তিতে। গোত্রপ্রধান অবশ্য স্বৈরাচারী ছিলেন না। সাধারণভাবে গোত্রের বিষয়াবলী, বিশেষত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত গোষ্ঠী প্রধানদের সহিত সলাপরামর্শক্রমে। একইভাবে বিভিন্ন পৌর ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত।

গোত্রে ও গোত্রের বাহিরে একজন ব্যক্তির অবস্থান ও মর্যাদা নিরূপিত হইত তাহার মুরূআহ-এর ব্যাপ্তি ও পরিসরের ভিত্তিতে। এই মুরূ'আহ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা মধ্যযুগের ইউরোপে শিভালরি (chivalry) বা মহৎ সাহসিকতা বা গুণ বলিতে যাহা বুঝায় সেই একই তাৎপর্য বহন করে। সাধারণত কোন ব্যক্তির মুরূ'আহ-এর অভিব্যক্তি ঘটিত যুদ্ধে সাহসিকতা, এমনকি দারিদ্র্যের মধ্যে আতিথেয়তা এবং জীবন ও বাকপারদর্শিতার ঝুঁকি লইয়া হইলেও বিশ্বস্ততা রক্ষা ইত্যাদির মাঝে। যে ব্যক্তি এইসব গুণে ভূষিত তাহাকে কামিল বা পরিপূর্ণ বা আদর্শ ব্যক্তি বলা হইত।[৩৫] মদীনার বনূ আওফের সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ছিলেন অনুরূপ একজন কামিল ব্যক্তি। গোত্র সদস্যদের বাকপারদর্শিতার অভিব্যক্তির অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা। একজন কবি তাহার গোত্রে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আর এক ধারণায় এই কাব্যগুণের অধিকারী এই ব্যক্তিটি ছিলেন তাহার গোত্রের মুখপাত্র। তাহার কবিতার মাধ্যমে কবি সাধারণত তাহার গোত্র ও গোষ্ঠীর আদর্শচিত্র ও গৌরবগাথা তুলিয়া ধরিতেন এবং গোত্রের যুদ্ধ জয়ের প্রশংসাগীতি রচনা করিতেন। কবিতার মধ্য দিয়া গোত্রের আনন্দ ও দুঃখ-বেদনা, অনুভূতি ও বিপর্যয় জনিত মনোবেদনার প্রকাশ ঘটিত। গোত্র কবিরা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় মিলিত হইতেন ও উকাজের মত বিখ্যাত মেলায় সমবেত হইয়া তাহারা তাহাদের সেরা কাব্যগাথা আবৃত্তি করিতেন। আরবরা খুবই কাব্যভক্ত ছিল। কাব্য প্রতিযোগিতায় সেরা কাব্যের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইত এবং অসাধারণ কাব্য রচিত হইল সে কবিতা সোনার হরফে লিখিয়া কা'বাগৃহের দেওয়ালে টানাইয়া দেওয়া হইত। আর সে কারণেই এই ধরনের কবিতাগুলির নাম হইত মু'আল্লাকাত বা ঝুলন্ত। এইভাবে কা'বাঘর কেবল আরবদের জন্য অভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রই ছিল না, কা'বা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্য গুণের প্রকাশস্থলও ছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের কয়েক শতক আগে মাত্র দশজন কবির রচনা মু'আল্লাকাত শ্রেণীভুক্ত হইতে সক্ষম হয়।[৩৬]

প্রাচীন কালে কোন দেশে কোন ছোটখাটো রাজ্যের বেলায় যেমন তেমনি আরবেও গোত্রগুলি প্রায়ই একে অন্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। গোত্র অহংকার ও গৌরব, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, আরেকটি গোত্রের স্বার্থ বিকাইয়া একটি গোত্রের স্বার্থ চরিতার্থ করার ইচ্ছা, খুনের বদলা জনিত বিরোধ, মরূদ্যান, কূপ, পশুচারণভূমি বা উর্বর জমি কিংবা অনেক সময় পার্শ্ববর্তী বায়যান্টীয় ও পারস্য সাম্রাজ্যের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার মতলবে প্রদত্ত উস্কানি ও প্ররোচনার কারণেই সাধারণত গোত্রগুলির মধ্যে এই ধরনের অন্তর্কলহ লাগিয়া থাকিত। আরবগণ এই ধরনের অত্যন্ত বড় রকমের সংঘাত বা যুদ্ধের দিবসকে তাহাদের গৌরব-মহিমা ও বীরত্বের স্মৃতি হিসাবে গণ্য করিত। তাহারা এইসব দিবসকে বলিত আয়্যামুল আরাব। এই ধরনের দিবসের দৃষ্টান্ত হিসাবে বনূ তাগলিব ও বনূ বাকরের মধ্যে বাসূস যুদ্ধ, বনূ আব্‌স ও বনূ যুয়্য়ানের মধ্যে (৫ শতকের শেষের দিকে) দাহিস ও আল-গাবরা যুদ্ধ, কুরায়শ ও বনূ কিনানা এবং বনূ হাওয়াযিন-এর মধ্যে (৬ষ্ঠ শতকের শেষের দিকে[৩৭]) ফিজার যুদ্ধ, বনূ বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে (৬১০ খ্রি.) যূকার যুদ্ধ এবং মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে (৬১৭-৬১৮ খৃ.[৩৮]) বুয়াস যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের যুদ্ধগুলি অনুষ্ঠিত হয় এক পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও বীরত্বের প্রর্দশনী হিসাবে, অন্য পক্ষকে সাধারণত খতম করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। এই

ধরনের বেশিরভাগ যুদ্ধেই খুব একটা রক্তপাত ঘটিত না, যদিও সংঘাত, বিরোধ ও বৈরিতার জের চলিত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কিংবা বংশ-পরম্পরায়। অনেক সময় বৈরিতার একটি পক্ষ তাহার অপর পক্ষকে হত্যার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিত। আর এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইত দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কত বেশি সংখ্যক লোক ক্ষতিপূরণদানকারী পক্ষের তুলনায় নিহত হইয়াছে সেই হিসাবের ভিত্তিতে।

আরবের জনসমষ্টির দুইটি সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্তির কথা আগেই বলা হইয়াছে। ঠিক সেই ধারার অনুসরণে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনও তেমনি দুইটি সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারায় বিন্যস্ত ছিল। স্থায়ী নিবাসী জনসাধারণ নিয়োজিত ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও সেইসাথে কৃষিকর্মে। বিশেষত তায়েফ ও মদীনার উর্বর এলাকাগুলিতে কৃষিকাজ চলিত। অন্যদিকে যাযাবর ও বেদুঈন গোত্রগুলি প্রধানত নিয়োজিত ছিল পশুচারণে। তাহারা ভেড়া, ছাগল ও উট পালন করিত এবং পশুচারণের জন্য প্রয়োজনীয় তৃণভূমি ও পানির সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে চলাচল করিত। অবশ্য এই স্বাতন্ত্র্য একটি পরিসর অবধি সত্য, তাহার বাহিরে নহে। মক্কা ও তায়েফের মত এলাকার স্থায়ী নিবাসীরাও ছাগল-ভেড়া এবং উট পালনে নিয়োজিত ছিল। একইভাবে বেদুঈন গোত্রের লোকেরাও দেশের ভিতরের ও বাহিরের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিত। বাস্তবিকপক্ষে আরববাসিগণ তাহাদের জীবনযাত্রার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য স্থায়ী নিবাসী জনপদের ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করিত। বেদুঈন গোত্রের লোকেরা ফেরি করিয়া বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন বার্ষিক মেলায় তাহাদের নিজেদের তৈরী নানা দ্রব্যাদিসহ আমদানী পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনাও করিত। অন্যদিকে স্থায়ী নিবাসী জনপদগুলির ব্যবসায়িগণ বেদুঈন নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলির মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়া বাণিজ্যপথগুলিতে বাণিজ্য কাফেলার নিরাপদ চলাচলের জন্য বেদুঈনদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করিত। হাশিম ইব্ন 'আব্দ মানাফ বায়যান্টীয় ও আবিসিনীয় কর্তৃপক্ষের সহিত কয়েকটি ধারাবাহিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেন।[৩৯] তিনি বাণিজ্য কাফেলা চলাচলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বেশ কয়েকটি বেদুঈন গোত্রের সঙ্গেও চুক্তি সম্পাদন করেন। এমনকি কিছু সুদূর ও প্রত্যন্ত এলাকায় উকাযের মত মেলায় বাণিজ্য কাফেলা পাঠানোর জন্য কোন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির নিশ্চয়তার (যামিন) প্রয়োজন হইত। হেরো হইতে উকায মেলায় যাত্রী বাণিজ্য কাফেলার জামিন হিসাবে দাঁড়ানো দুই স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই ফিজার-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৪০]

মক্কা ধর্মীয় ও সহিংসতামুক্ত স্থান হওয়ায় ইহা ছিল এক ধরনের খোলা ও মুক্ত বাজার। এখানে দূরবর্তী অঞ্চল হইতে আগত ব্যবসায়ীদের জন্য এই ধরনের কোন আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তার প্রয়োজন হইত না। ইহার পরও অবশ্য মক্কার অন্যতম নেতা বনূ সাহমের আল-আস ইব্ন ওয়াইল এক ইয়ামানী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ঘটনার আলোকে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে হিলফুল-ফুযূল নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়।[৪১]

আরবে কৃষিপণ্যের অভাব, ইহার জলবায়ু এবং বহির্বিশ্বে ইহার ভৌগোলিক অবস্থান আরববাসীদিগকে স্বভাব ব্যবসায়ী করিয়া তুলিয়াছিল। বহু প্রাচীন কাল হইতেই আরবের অধিবাসীরা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যে মধ্যবর্তীর ভূমিকা পালন করিয়াছে এবং স্থল ও নৌ উভয় পথেই বাণিজ্য পরিচালনা করিয়াছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সহিত। এই বিষয় ইতিহাসে সুপরিচিত। খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোমানরা ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর হইয়া পরিচালিত নৌবাণিজ্য আরবদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লয়। তবে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি হইতে বায়যান্টীয় পারসিক সাম্রাজ্যে স্থলবাণিজ্য আরবদের হাতেই থাকিয়া যায়।

মক্কা ছিল আরবদের ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র। এই মক্কা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও উন্নতি লাভ করে। বিভিন্ন সূত্রের বিবরণ হইতে স্পষ্ট ও পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে মক্কার নেতারা ছিলেন বড় ব্যবসায়ী ও সওদাগর, যাহাদের বাণিজ্য কাফেলা দক্ষিণে ইয়ামান ও আবিসিনিয়া এবং উত্তরে সিরিয়া, হিরা-পারস্য অবধি চলাচল করিত। খোদ মহানবী ﷺ তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। সিরিয়ায় খাদীজা (রা)-র বাণিজ্য কাফেলার নেতৃত্ব দেন পঁচিশ বৎসর বয়সী মুহাম্মাদ, বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত। মক্কা বিভিন্ন দেশের পণ্য অনুপাতে কয়েকটি বড় বাজারে বিভক্ত ছিল। ঐসব বাজারে ঐসব দেশের পণ্য পাওয়া যাইত। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, দার মিসর বা মিসর বাজারে মিসরীয় পণ্যসামগ্রী রাখা হইত এবং সেগুলির বেচাকেনা চলিত।[৪২]

ইসলাম-পূর্ব আরবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাণিজ্যও চলিত। মক্কায় বার্ষিক হজ্জের মৌসুমে আরবরা সেখানে তাহাদের পণ্যের পসরা লইয়াও সমবেত হইত। তাহারা এখানে এক ধরনের জাতীয় উৎসবে মিলিত হইত। এই সময়ে যে বাণিজ্যিক লেনদেন অনুষ্ঠিত হইত তাহার পরিমাণ কোন অংশে খাটো করিয়া দেখা যায় না। চারটি পবিত্র মাস জুড়িয়া এই ধরনের বাণিজ্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা চলিত। এই সময় উকায, মাজান্না ও জুল-মাজাযে বিরাট বিরাট বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হইত। উকায মেলা চলিত ২০ দিন ধরিয়া। এই মেলায় বিরাট সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃক্তিক উৎসব ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত এবং নানা পণ্যসামগ্রী ও পসরার বিকিকিনি চলিত। এই মেলায় বহু দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও বাণিজ্য কাফেলা আসিত। মক্কার কা'বাঘর ছাড়াও আরবরা আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলে আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন দেবদেবীর মন্দির তথা ধর্মতীর্থ স্থাপন করে। এইগুলির মধ্যে ছিল তায়েফের আল-লাত, নাখলার আল-'উয্যা এবং কুদায়দ-এ মানাত-এর মন্দির।এইসব স্থানও একাধারে ধর্ম ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এইসব স্থানে উপযুক্ত মৌসুমে ধর্মকর্ম ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসিতে থাকে। ইয়াহুদীদের মধ্যে তো ছিলই, প্রাক-ইসলামী আরবদের মধ্যেও সূদ প্রথার প্রচলন ছিল। মক্কা ও তায়েফের নেতাগণ সূদের মহাজনী কারবার করিত, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দীন ইসলাম সূদ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করে এবং ঐ সময়ের মুসলমানদের প্রতি মূলধনের উপর তাহাদের যে সূদ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ দেয়।[৪৩]

আরবদের খাদ্য ছিল উট, ছাগল ও ভেড়ার গোশ্‌ত ও দুধ। সর্বোপরি তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর। বস্তুত খেজুর ও দুধই ছিল আরবদের সাধারণ খাদ্য। আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে খেজুর প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইত (এখনও হইয়া থাকে)। কেবল মদীনা ও তাহার আশপাশ এলাকায় প্রায় এক শত জাতের খেজুরের চাষ হইত। আরবের অন্যান্য কৃষিজাত ফসল ছিল গম, যব ও কোন কোন স্থানে জনার বা জোয়ার। ইয়ামানে সুগন্ধি ধুনা, আসীর অঞ্চলে আরবী গঁদ এবং তায়েফের উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে আঙ্গুর, বেদানা, আপেল, খোবানি ও তরমুজ উৎপাদিত হইত। মহানবী ﷺ তায়েফ হইতে তাঁহার ধর্মপ্রচার মিশন হইতে ফিরিবার পথে মক্কার দুই নেতা রাবী'আর পুত্র উত্‌বা ও শায়বার এক দ্রাক্ষাবাগানে বিশ্রাম লইয়াছিলেন।[৪৪] ওমান ও আল-হাসায় কিছু ধানও উৎপাদিত হইত। ইংরেজি রাইস (rice) শব্দটি মূলত আরবী রুয (رز) শব্দ হইতে উদ্ভূত। আল-কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, প্রাক-ইসলামী আরবরা রীতি অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যাশিত ফসল ও গবাদি পশু সম্পদের একাংশ (আল-হার্‌ছ ওয়াল-আন'আম) তাহাদের দেবদেবীর জন্য এবং অতি সামান্য অংশ আল্লাহ্‌র জন্য রাখিয়া দিত।[৪৫] উট, ছাগল ও ভেড়ার মত গৃহপালিত পশু ছাড়াও ঘোড়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত আরবী ঘোড়া অত্যন্ত উন্নত জাত ও উৎকর্ষের জন্য এখনও বিখ্যাত। উট আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় ও উপকারী প্রাণী। উট ছিল আরবদের গোশ্‌ত ও দুধের প্রধান উৎস। ইহা ছাড়াও উটের চামড়ায় তাহাদের তাঁবু ও আশ্রয় তৈরি হইত। উষর ও বৈরী মরুপথে উটই ছিল তাহাদের প্রধান বাহন। উট এমনিভাবে সৃষ্ট এক প্রাণী যাহা শীতের দিনে মরুভূমির মধ্য দিয়া একটানা পঁচিশ দিন ও গ্রীষ্মে পাঁচদিন পানি গ্রহণ না করিয়া চলিতে পারে। উটের শরীরও মরুঝড় সাইমুম ও বালিঝড়ে টিকিয়া থাকার মত করিয়াই সৃষ্ট। আল্লাহ্‌র অন্যান্য অসাধারণ সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এই লক্ষণীয় সৃষ্টির প্রতিও আল-কুরআন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।[৪৬] আরবদের সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ করা হইত তাহাদের উটের সংখ্যার মালিকানা অনুসারে। বিবাহের কনের জন্য যৌতুক, রক্তপণ এবং আরও অনেক লেনদেন পরিচালিত হইত উটের সংখ্যার মাধ্যমে, যদিও মুদ্রা, যেমন দীনার ও দিরহাম অপরিচিত ছিল না। বস্তুতপক্ষে মুদ্রা ব্যবহৃত হইত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে। বিভিন্ন জাতের ও বয়সের উটের জন্য আরবী ভাষায় প্রায় এক হাজার শব্দ রহিয়াছে।

চার ঃ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি ঃ জাহিলিয়া

আরব জনসমষ্টির ও অর্থনীতির (কৃষি ও বাণিজ্য) দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের সহিত মিল রাখিয়া ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে আরবদের ধর্মবিশ্বাস ও রীতিপ্রথার মধ্যে দ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল—তাহাতে ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের সুনিশ্চিত অস্তিত্ব। ঐ সময়ের বা পরবর্তী কালের অন্য কোন জনসমষ্টিই ইব্‌রাহীমি ধারাকে এত ভালো ও নিবিড়ভাবে স্মরণ ও ধারণ করিয়া রাখে নাই। তবুও যুগপৎ ইহাও সত্য যে, তাহারা বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী হইয়া পড়ে এবং ইহার সহিত যত রকম কুপ্রথা ও কুসংস্কার সম্ভব তাহাও তাহাদের মাঝে প্রবেশ করে।

বাস্তবিকপক্ষে ইসমাঈল ('আ)-এর বংশধরগণ তাঁহার পিতা ইব্রাহীম ('আ)-এর প্রবর্তিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ রীতি পালন করিয়া যাইতে থাকে। অবশ্য কয়েক শতাব্দীর কালপরিক্রমায় ক্রমেই তাহারা তাহাদের মূল ধর্মবিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে এবং দুঃখ-দুর্দশার সময়ে বা কোন অন্যায়ের প্রতিকার পাওয়ার জন্য সহজে নাগালে পাওয়া যায় এমন দেবতার সান্নিধ্য লাভ, কোন বীর বা পূর্বপুরুষকে দেবত্ব আরোপ, প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখে অসহায়ত্বে সান্ত্বনা, সর্বোপরি তৎকালে বুদ্ধিবৃত্তিক, দৈহিক ও বৈষয়িক দিক হইতে শ্রেষ্ঠ গণ্যদের রীতি-নীতির প্রভাবে স্থূল মননের স্বাভাবিক প্রবণতার শিকার হয়। অতীতে যেসব 'সভ্য' জনসমষ্টি আরবদের চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া ছিল তাহারা ও সমসাময়িক অন্যান্য জনসমষ্টির সকলেই আচ্ছন্ন ছিল কোন না কোনভাবে একই বহু ঈশ্বরবাদী বিশ্বাস ও আচরণে। ডঃ ইসমাঈল রাযী আল-ফারূকী বলিয়াছেন, "প্রাক-ইসলামী যুগের আরবরা যেখানেই গিয়াছে সেখানেই তাহারা স্রষ্টার উত্তরণের ধারা লঙ্ঘন লক্ষ্য করে। এখন যেসব আরবের মাঝে এই প্রবণতা সুপ্ত ছিল তাহারা প্রতিবেশী দেশ ও জনপদে তাহাদের প্রবণতার সমর্থন পাইয়া আরও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং ঐ পড়শীদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। এইভাবে তাহাদের বায়যান্টীয় খৃস্টান পড়শীরাই তাহাদের কাছে কা'বাঘরের সংরক্ষণ করার জন্য দেবদেবীতুল্য মানবমূর্তি বিক্রয় করে।[৪৭]

বনূ খুযা'আ গোত্র মক্কা দখলের পর, বিশেষত তাহাদের নেতা 'আমর ইব্ন লুহায়্যি সেখানে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করে।[৪৮] ইব্ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, 'আমর একবার সিরিয়ায় যাইয়া লক্ষ্য করে, সেখানকার লোকজন মূর্তিপূজা করিতেছে। সে তথাকার লোকজনের নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তাহারা জানায়, মূর্তিপূজা করিলে বৃষ্টিপাত ঘটে, ফসলের সুবিধা হয়, যুদ্ধে বিজয় লাভ করা যায়। মূর্তির কাছে এইসব বিষয়ে প্রার্থনা করিলে সুফল লাভ হয়। 'আমর ইহাতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে এই ধরনের একটি মূর্তি দেওয়ার জন্য তাহাদেরকে অনুরোধ জানায় যাহাতে তাহার আরব লোকজন মূর্তিপূজা করিতে পারে। এই অনুরোধে 'আমরকে তাহারা যে মূর্তিটি দেয় তাহার নাম হুবাল। 'আমর এই মূর্তিটি মক্কায় লইয়া আসে। সে মক্কার লোকজনকে এই মূর্তির পূজা করিতে বলে। নেতা ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য আমরের কথায় তাহারা ঐ মূর্তির পূজা শুরু করিয়া দেয়।[৪৯]

এ কাহিনী হইতে বাস্তব তথ্য প্রকাশ পায় যে, পড়শী দেশ ও অন্যান্যদের নিকট হইতে বহু ঈশ্বরবাদী আচার ইসমাঈলের বংশধরদের মাঝে স্থান করিয়া লয়। একজন আধুনিক বিদ্যুৎব্যক্তি এই কাহিনীকে সমর্থন জানাইয়া বলিয়াছেন, মূর্তির আরবী প্রতিশব্দ হইল সানাম। এই শব্দটি "স্পষ্টত আরামীয় 'সেলেম' শব্দ হইতে পরিগৃহীত"।[৫০]

আরও এক বিবরণ অনুসারে, 'আমর ইব্ন লুহায়্যি ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসর দেবতারও পূজার প্রবর্তন করে। এইসব দেবমূর্তির একদা পূজা করিত নূহ নবীর অবিশ্বাসী জনসম্প্রদায়। কথিত আছে, এক জিন 'আমরকে এই মর্মে সংবাদ দেয় যে, এই দেবমূর্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে জেদ্দার অমুক স্থানে। জিন তাহাকে ঐসব মূর্তি সেখান হইতে আনিয়া সেসবের

পূজা করার জন্য বলে। 'আমর সেই অনুযায়ী জেদ্দায় যাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে মূর্তিগুলি দেখিতে পায়। সে সেগুলিকে মক্কায় আনিয়া স্থানীয় লোকজনকে সেগুলির পূজা করার জন্য নির্দেশ দেয়।[৫১] এই দেবমূর্তিগুলির সত্যসত্যই নূহ ('আ)-এর জনসম্প্রদায় পূজা করিত। কেননা কুরআনে পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাহারা জ্যোতিষ্ক পূজায় বিশ্বাসী এক ধরনের ধর্মমতবাদী সম্প্রদায় কিংবা তাহারা প্রাকৃতিক শক্তি পূজা কিংবা কোন মানবিক গুণ বা উৎকর্ষে দেবত্ব আরোপে বিশ্বাসী।[৫২] এই ধরনের জনসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল নূহ নবীর ('আ) লোকজনের দেশ প্রাচীন আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ায়।[৫৩] ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বলিয়া কথিত এক বিবরণের বরাতে বলা হইয়াছে, দেবমূর্তির নামগুলি প্রকৃতপক্ষে নূহ ('আ)-এর সম্প্রদায়ের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম, যাহাদের উপর পরবর্তী কালে দেবত্ব ও মাহাত্ম্য আরোপ করিয়া তাহাদের মূর্তি গড়িয়া পূজা করা হয়।[৫৪] আবারও এসব বিবরণে একদিকে ইসমাঈলের বংশধররা কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের পূর্ববর্তী ও অন্যান্যদের বহু ঈশ্বরবাদে লিপ্ত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় 'আমর ইব্ন লুহায়্যির ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বহু ঈশ্বরবাদের একবার সূচনা হওয়ার পর নানা আকার ও প্রকারে আরবদের মধ্যে বহু ঈশ্বরবাদী আচার-রীতি অনুপ্রবেশ করে। ইব্ন ইসহাক প্রস্তর পূজার এই বিস্তৃতির কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইসমাঈল ('আ)-এর বংশধরগণ যখন নানা কারণে মক্কা হইতে অন্যত্র বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয় তখন তাহাদের প্রতিটি জনগোষ্ঠী মক্কা ত্যাগের আগে পবিত্র কা'বাগৃহের এক টুকরা করিয়া পাথরের খণ্ড কা'বার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। ইহার পর তাহারা যেখানে তাহাদের নূতন বসতি স্থাপন করে সেখানে কোন এক উপযুক্ত জায়গায় এই পাথরের খণ্ডগুলি রাখিয়া কা'বাগৃহের মত প্রদক্ষিণ করার একটা রেওয়াজ গড়িয়া তোলে এবং স্থানটি তাহাদের নিকট বিশেষ পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়। ক্রমে তাহাদের বংশধরগণ এইসব পাথরকে পূজা করাই কেবল শুরু করে নাই, তাহারা যে কোন বিশেষ পাথরেরও পূজা করিতে থাকে। এইভাবে তাহারা ইবরাহীমের আদি ধর্ম বিস্মৃত হয় এবং তাহাদের ধর্মাচরণ পাথর ও মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয়।[৫৫]

চূড়ান্ত পর্যায়ে তাহাদের প্রতিটি গোত্র ও গোষ্ঠীর জন্য এবং বাস্তবিকপক্ষে প্রতিটি পরিবারের জন্য বিশেষ দেবদেবীর মূর্তির প্রচলন হয় যাহা তাহারা পূজা করিতে থাকে। মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে আনুমানিক ৩৬০টি মূর্তি কা'বাগৃহের মধ্যে ও আশেপাশে স্থাপিত ছিল। এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূর্তিটি ছিল হুবালের। মনুষ্যাকৃতির এই বিরাট মূর্তির একটি হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কুরায়শরা উহা স্বর্ণ দিয়া পুনঃনির্মাণ করে। কা'বার আঙিনায় রাখা আরও দুইটি মূর্তির নাম আগেই বলা হইয়াছে ঃ ইসাফ ও নাইলা। এই দুই মূর্তি মূলত যমযম কূপের স্থানটিতে স্থাপিত ছিল। পরে এই দুইটি মূর্তি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের কাছাকাছি কোথায়ও স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাক-ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, ইসাফ ও নাইলা ছিল আসলে বনূ জুরহুম গোত্রের এক পুরুষ ও এক নারীর প্রতিকৃতি যাহারা কা'বার ঐ স্থানটিতে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হইয়া কা'বার পবিত্রতা নষ্ট করায় তাহারা পাথরে পরিণত হয়।[৫৬]

কা'বাঘরকে তাহাদের অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তিনিবাস করিয়া তোলা ছাড়াও আরবরা বলিতে গেলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি গৌণ কা'বাও (তাওয়াগীত) গড়িয়া তোলে। আর সেগুলির প্রতিটির জন্য একেকটি অধিষ্ঠাতা বা অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী নির্ধারণ করা হয়। আরবরা বিভিন্ন নির্ধারিত সময়ে এইসব ধর্মীয় স্থলে উপস্থিত হইয়া সেগুলি প্রদক্ষিণপূর্বক সেখানে পশু বলি দিত এবং অন্যান্য বহু ঈশ্বরবাদী আচার-রীতি পালন করিত। এইসব ধর্মীয় স্থলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তায়েফের আল-লাত, নাখলা-এর আল-উয্যা ও কুদায়দের নিকট আল-মানাত মন্দির। এইসব মন্দিরের দেবদেবীর আদি উৎস অনিশ্চিত। ইবনুল কালবী বলেন, আল-লাত মানাত অপেক্ষা পরবর্তী কালের, আল-'উয্যা আল-লাত ও আল-মানাতের পরবর্তী কালের।[৫৭] কিন্তু তিন দেবমূর্তির মধ্যে আল-'উয্যা সর্বকনিষ্ঠ হইলেও কুরায়শদের কাছে আরবের সকল মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে মহৎ (আ'যম) ও গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি। কুরায়শ ও কিনানা গোত্রও এই দেবমূর্তির সেবায়েত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল।[৫৮] আল-কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে আরবদের এই তিন দেবীর কথা উল্লেখ রহিয়াছে।[৫৯] আরও কিছু আধা বা নিম-কা'বার মত ধর্মস্থল ছিল আরবদের। এইগুলির মধ্যে ছিল তাবালাহের যুল-খালাসা (মক্কা হইতে সাত রজনীর যাত্রাপথ), তাঈ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ফিল্স, ইয়ামান-এর সানায় অবস্থিত রিয়াম, বনূ রবী'আ ইব্ন কা'ব অঞ্চলে রুজ্জা, বনূ বাক্র ও বনূ তাগলিবের সিনাদাদের কয়েকটি কা'বা (যুল-কা'বাত) এবং নাজরানের বনুল হারিছের কা'বা।[৬০]

এইসব গৌণ কা'বা ছাড়াও আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে আরও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু বিশেষ দেবতার কয়েকটি অধিষ্ঠানস্থল ছিল। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ রুহাতে (ইয়ানবু'), সুয়ার মন্দির, দুমাতুল জানদালের ওয়াদ্দ, জুরাশের ইয়াগূছ (বনূ তাঈ অঞ্চলে), ইয়ামানের হামদানের ইয়াউক (সানা হইতে উত্তরে দুই রজনীর পথ), ইয়ামানের হিম্য়ারী অঞ্চলে (বালখা') নাস্র এবং খাওলানের উমায়নিস বা 'আম আনাস ও তানুফার সা'দ।[৬১]

প্রাক-ইসলামী আরবরা এইসব মূর্তির অথবা নানাভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিত। তাহারা এইসব দেবদেবীর কাছে ঐকান্তিকও সানুনয় প্রার্থনা নিবেদন করিত, তাহাদের সম্মুখে নতজানু হইত, অর্ঘ্য-নৈবেদ্য দিত, তাহাদের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য প্রার্থনা করিত এবং এই বিশ্বাসে তাহাদের প্রীতি ও অনুগ্রহ উৎপাদনে প্রয়াসী হইত যে, তাহারা তাহাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনে সক্ষম। আরবরা এই সব দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত বেদীমূলে পশু উৎসর্গ করিত, তাহাদের মন্দিরে দেবতার অধিষ্ঠানস্থল প্রদক্ষিণ করিত এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর বাছিয়া লইত। এই কাজটি দেবমন্দিরেও করা হইত। তাহারা এইসব দেবদেবীর নামে নিজেদের নামও রাখিত। যেমন 'আব্দ ইয়াগূছ, 'আবদুল 'উয্যা ইত্যাদি। তবে এমনি করিয়া বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজায় মগ্ন হইলেও প্রাক-ইসলামী আরবরা প্রাচীন গ্রীক বা হিন্দুদের মত কোন জটিল ও সুবিস্তৃত পৌরাণিক কাহিনী কিংবা দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া কোন ধর্মতত্ত্বও গড়িয়া তুলে নাই। প্রাক-ইসলামী কাব্য

ও জনশ্রুতিমূলক সাহিত্যেও এই ধরনের কোন উপাদানের সন্ধান মিলে না। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা ইসমাঈলীয় আরবদের একান্ত স্বকীয় কিছু ছিল না, বরং এইগুলি ইবরাহীম ('আ)-এর ধারার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়টির সর্বোত্তম প্রমাণ রহিয়াছে, আরবদের বহু ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের আচার-রীতির জটাজুটের মধ্যেও ইবরাহীম ('আ) প্রবর্তিত বিশ্বাসের ধারার অভ্রান্ত চিহ্নাবশেষ। এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল, সর্বশক্তিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস।[৬২] আর সেই সহিত আরবরা ফেরেশতা ও জিনের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী ছিল। মহাদুর্যোগের সময় প্রাক-ইসলামী আরবরা, এমনকি সরাসরি আল্লাহ্র অপার করুণা এবং সাহায্য প্রার্থনাও করিত।[৬৩] তাহারা কখনও কখনও আল্লাহ্র নামে শপথও করিত।[৬৪] আর প্রায়ই তাহারা তাহাদের নামে আল্লাহ শব্দটি যুক্ত করিয়া রাখিত। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আবদুল্লাহ' এই প্রাক-ইসলামী নামটির কথা উল্লেখ করা যায়। বিশেষত, সাম্প্রতিক কালে উত্তর আরব অঞ্চলে বেশ কিছু উৎকীর্ণ লিপি উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহাতে কিছু আল্লাহ শব্দযুক্ত নাম পরিলক্ষিত হইয়াছে।[৬৫] এই উৎকীর্ণ লিপিগুলির সবই ইবরাহীমের পরবর্তী আমলের। এই উৎকীর্ণ লিপিগুলি আরবদের মাঝে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণার অস্তিত্ব থাকার সন্দেহাতীত প্রমাণ।[৬৬] ইবরাহীমের ধারার অন্যান্য অবশেষ হইল, মক্কার কা'বার প্রতি (প্রাক-ইসলামী) আরবদের সার্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ, কা'বা প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ), উমরাহ পালন, হজ্জ পালন ও হজ্জের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য ইবরাহীমিয় রীতি-প্রথা পালন। যেমন আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া, মুজ্দালিফায় বিরতি, মীনায় অবস্থান, মীনায় থাকাকালে পশু কুরবানী, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার দৌড়াইয়া যাওয়া-আসা, মাথা কামানো ইত্যাদি। ইহা ছাড়া খতনা করানো ও 'আশূরার দিনে রোযা রাখা ইবরাহীম ('আ)-এর প্রবর্তিত রীতি।[৬৭] এইগুলি আরবরা সর্বজনীনভাবে পালন করিয়া থাকে।

বহু ঈশ্বরবাদী বিশ্বাস ও রীতি প্রথার সহিত শত শত বৎসরের ইবরাহীমি ধারার সহাবস্থান সত্ত্বেও অবশ্য আরবে শেষ পর্যন্ত কোন মিশ্র ধর্মতত্ত্ব গড়িয়া উঠে নাই। যে চিত্র ইহা হইতে ফুটিয়া উঠে তাহাকে বলা যায়, কতগুলি বিশ্বাসের জগাখিচুড়ি মাত্র। আর তাহার সহিত ঐ অসামাঞ্জস্যপুর্ণ বিশ্বাস সমাবেশজাত কিছু উপজাত উপাদান। এই ধরনেই এক উপজাত প্রাক-ইসলামী আদর্শ হইল ঃ দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহ্র আরও নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে।[৬৮] কারণ এইসব দেবদেবী আল্লাহ ও তাহাদের মধ্যবর্তী[৬৯] আর তাহাদের কোন কোন দেবী, ফেরেশতা, এমনকি জিনেরা আল্লাহ্র কন্যা।[৭০] উল্লিখিত মিশ্রবিশ্বাসের আরও একটি উপজাত ফল হইল, আরবদের তাহাদের ফসল ও গবাদি সম্পদের একাংশ (সাধারণত একটি বড় অংশ) তাহাদের দেবদেবীদের জন্য এবং আল্লাহ্র জন্য আরেকাংশ (সাধারণত সামান্য অংশ) আলাদা রাখিয়া দেওয়ার নির্বোধসুলভ রীতি।[৭১] এই বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত হইল, কা'বা প্রদক্ষিণকালে তালবিয়া বা

লাব্বায়কা বলার বহু ঈশ্বরবাদী বিধানগুলি গুলাইয়া ফেলা।[৭২] মক্কাবাসীরা ঐ সময় আরাফাত পর্যন্ত যাইত না; তাহারা কেবল মুযদালিফা পর্যন্ত যাইত। তাহাদের এই ধরনের আচরণের ভিত্তি ছিল তাহাদের মাঝে ধর্মের ক্ষেত্রে স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও তাহাদের পবিত্র এলাকার অধিবাসী হওয়ার উন্নাসিক ধারণা, তাহাদের দেওয়া কাপড় ছাড়া কাহাকেও সাধারণত কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করিতে না দেওয়া এবং নিজেদের এমনকি বিবস্ত্র অবস্থায় কা'বা তাওয়াফের রীতি। এইভাবে বহু ঈশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণার সহিত আল্লাহকে সর্বোচ্চ প্রভু হিসাবে মিশাইয়া ফেলা সম্পর্কে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে, "তাহাদেরকে অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহার শরীক করে।"[৭৩]

আরবদের বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা, তাহাদের আল্লাহ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা এইসব মিলিয়া তাহাদের জীবনধারা ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠে। তাহাদের ঐ সময়কার ধারণা ছিল ইহকালই মানব জীবনের সবকিছু। আর তাহাদের দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও আল্লাহ্‌র প্রতি স্বীকৃতি এইসব কিছুরই ভিত্তি ছিল ইহলৌকিকতা, আর কিছুই নহে। তাহারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিল না, মৃত্যুর পর পুরস্কারে ও দণ্ডে বিশ্বসী ছিল না। আল-কুরআনের ভাষায়, তাহাদের বক্তব্য ও ঘোষণা ছিল[৭৪] : "একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না"।

এই ধারণাগত বিশ্বাসের কারণে চূড়ান্ত জবাবদিহির কোন অস্তিত্ব না থাকায় আরবদের মাঝে সকল উপায়ে, পন্থায় ও অবাধে পার্থিব ভোগ-বাসনা শক্তিশালী হইয়া উঠে। আর সেই কারণেই তাহাদের মাঝে কামুকতা, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার, পরস্ত্রী গমন, অতি পানবিলাস ও জুয়া ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।[৭৫] বহুবিবাহ সীমাহীন হইয়া ওঠে ও নারীর বহু স্বামী রাখাও প্রচলিত হয় (এইক্ষেত্রে একজন নারীর স্বামীর সংখ্যা হইত ১০-এর কম)। এরকম সম্পর্ক হইতে কোন শিশুর জন্মের বেলায়, তাহার মাতা যাকে ঐ সন্তানের পিতা বলিয়া ঘোষণা করিত তাহাকে তাহার পিতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইত।[৭৬] কোন কোন ক্ষেত্রে পুত্রসন্তান লাভের জন্য একজন স্বামী তাহার স্ত্রীকে পরপুরুষগামী হওয়ারও অনুমতি প্রদান করিত।[৭৭]

আরব সমাজে নারীর মর্যাদা আদৌ ঈর্ষণীয় ছিল না, যদিও আরব নারী বহু আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি, প্রাক-ইসলামী কাব্যে প্রেমিকার প্রতি হৃদয়ের অঢেল, উচ্ছ্বসিত অর্ঘ্য নিবেদন করা হইলেও আরব নারীকে সাধারণত অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হইত। একজন পুরুষ কতজন স্ত্রী গ্রহণ করিবে তাহার কোন সীমা ছিল না। পুরুষ তাহার পছন্দমত যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। একইভাবে পুরুষ তাহার খেয়াল-খুশিমত যখন তখন স্ত্রীকে তালাক দিত। এই ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাই একজন পুরুষ রক্তের সম্পর্ক নির্বিশেষে বিবাহ করিতে পারিত এবং করিতও। অনেক সময় দুই সহোদর বোন এক পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিত। পুত্রেরা তাহাদের সাবেক স্ত্রী ও বিধবাকে (মাতা ছাড়া) বিবাহ করিত। নারী তাহার পূর্বপুরুষ বা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ

করিবে এমন কোন বিধিবিধান ছিল না। কন্যা সন্তানের জন্মকে অশুভ বিবেচনা করা হইত, কন্যা সন্তানকে পছন্দ করা হইত না।[৭৮] সবচেয়ে অমানবিক বিষয় এই ছিল যে, বহু আরব ইয্যতের তথাকথিত আশঙ্কা ও দারিদ্র্যের ভয়ে তাহাদের কন্যা শিশু সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত।[৭৯] ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে এই বর্বর প্রথা মক্কা ও তাহার আশপাশ এলাকায় কিছুটা হ্রাস পায় বলিয়াও মনে করা হয়। তবে আরবের অন্যত্র এই প্রথার প্রচলন ছিল। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে, অনেক বহু-ঈশ্বরবাদী[৮০] পরিবারে (لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ) এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বনূ তামীমের কায়স ইব্ন 'আসিম নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁহার ৮ হইতে ১২টি কন্যাকে জীবন্ত কবর দেন।[৮১]

জবাবদিহিতা নাই, এই ধারণার কারণে তৎকালীন আরবে একান্ত নির্বিচারে হত্যার এবং অন্যের সম্পত্তি ও সম্পদ লুটপাট ও চুরির ঘটনা ঘটিত। এইসব অনাচারের একমাত্র প্রতিকার হিসাবে ছিল গোত্র পর্যায়ে প্রতিশোধ ও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের রীতি। আরবদের মধ্যে কিছু কুসংস্কার ও বিবেকবর্জিত রীতিরও প্রচলন ছিল। তাহারা গণক ও জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করিত এবং কোন কাজ করিতে হইলে, যেমন বিবাহ বা কোন গন্তব্যে যাত্রার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট দেবদেবীর মূর্তির সামনে তীর ছুঁড়িয়া বা লটারি করিয়া দৈব পর্যায়ে সিদ্ধান্ত লইত। ব্যাপক পর্যায়ে জুয়া ও লটারির প্রচলন ছিল। কোন একটি বিশেষ জিনিসে, যেমন যবেহ করা পশুর গোশতে তাহাদের ভাগ নির্ধারণ করার জন্য আরবরা লটারী করিয়া বা তীর ছুঁড়িয়া তাহা নির্ধারণ করিত। এই পদ্ধতির আওতায় বণ্টনযোগ্য গোশত বিভিন্ন অসম ভাগে ভাগ করার পর তীরের মথায় কোনটি বেশি পরিমাণ, কোনটির মাথায় কম পরিমাণ লিখিয়া লক্ষ্য বস্তুতে ঐ তীরগুলি ছোঁড়া হইত কিংবা আধুনিক লটারির টিকেটের মত তীরগুলির মধ্য হইতে নির্বিচারে তুলিয়া লইয়া গোশতের ভাগ নির্ধারণ করা হইত।

আরও এক অদ্ভুত আরবীয় রীতির নাম হাবালুল হাবালা। ইহার আওতায় একটি গর্ভবতী উট বিক্রয় করা হইত এই শর্তে যে, উটটি যদি কোন মাদি উট শাবকের জন্ম দেয় এবং উষ্ট্রী আবার গর্ভধারণ করে তাহা হইলে মূল উটের দাম পরিশোধ করিতে হইবে।[৮২] আরও এক কুসংস্কার ও বহু ঈশ্বরবাদী আরব প্রথা ছিল ঃ কোন বিশেষ উট, ছাগল বা ষাঁড়কে আস-সাইবাহ, আল-বাহীরাহ, আল-ওয়াসীলাহ ও আল-হাম নামে অভিহিত করা। যদি কোন উষ্ট্রী পরপর ১০টি মাদি শাবক প্রসব করিত এবং ইহার মাঝে কোন পুরুষ শাবক না জন্মিত তাহা হইলে ঐ উষ্ট্রীটিকে নিষেধাত্মক আস-সাইবাহ নামে অভিহিত করা হয়ত। এই উষ্ট্রীটিকে অতঃপর কোথাও ভ্রমণের কাজে বাহন হিসাবে কিংবা বোঝা বহনের কাজে ব্যবহার করা যাইত না। তাহার লোম ছাঁটা যাইত না এবং এই উষ্ট্রীর দুধ একমাত্র মেহমান ছাড়া আর কেহ পান করিতে পরিত না। পরে যদি এই উষ্ট্রী আরেকটি মাদি শাবকের জন্ম দিত তাহা হইলে সেই শাবকটির নাম হইত আল-বাহীরাহ। তাহার বেলায়ও উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি প্রযোজ্য হইত।

কোন ছাগী একইভাবে পাঁচবারের গর্ভধারণ সূত্রে দশটি ছাগী শাবকের জন্ম দিলে তাহার বেলায়ও একই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইত ও তাহার নাম দেওয়া হইত আল-ওয়াসীলাহ। কোন ষাঁড় পরপর দশটি বকনা বাছুরের জন্ম দিলে তাহার বেলায়ও একই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইত ও তাহার নাম দেওয়া হইত আল-হাম।[৮৩] আল-কুরআন এই ধরনের রীতি-প্রথার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছে।[৮৪] আরবদের এইসব রীতি ও বিশ্বাস, বিশেষত তাহাদের বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস, কামুকতা, ব্যভিচার, জুয়াসক্তি,চৌর্যবৃত্তি, লুটপাট, তাহাদের কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দান, তাহাদের গোত্রচেতনা ও উত্তেজনা এবং রীতিপ্রথাকে আল-কুরআনে জাহিলিয়্যা[৮৫] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই ছিল তৎকালীন আরবের সমাজ-ধর্মীয় পরিস্থিতির সাধারণ চিত্র। খৃস্টান, ইয়াহূদী, মাযদীয় (জরথুষ্ট্র প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদ) ও সাবীয় ধর্মমতও ঐ সময়ে সীমিত আকারে এই উপদ্বীপে প্রবেশ করে। প্রধানত বায়যান্টীয় কর্তৃপক্ষের ইশারা ও উদ্যোগে উত্তরাঞ্চলীয় কিছু আরব গোত্র, বিশেষ করিয়া গাস্সানী ও হিরার অধিবাসীরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। হিরা রাজ্যের কোন শাসক খৃষ্ট ধর্মমত গ্রহণ করেন। আরবের দক্ষিণে ইয়ামানে খৃস্টধর্ম প্রবর্তিত হয় প্রধানত ইয়ামানে আবিসিনীয় বিজয় ও দখলের পর (৩৪০-৩৭৮ খৃ.)। ইয়ামানের পার্শ্ববর্তী নাজরান অঞ্চলে একেশ্বরবাদ ভিত্তিক খৃস্টধর্মের প্রবর্তন করেন সিরিয়া হইতে আগত ফায়মিয়ূ্য নামে এক মিশনারি।[৮৬] এই এলাকার বেশ কিছু লোক খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। মহানবী ﷺ -এর আবির্ভার কালেও মক্কায় কিছু কিছু খৃস্টান ছিল আর কিছু কিছু লোক নূতন করিয়া খৃস্টধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিল।

আরব উপদ্বীপে তেমন কেহই এই সময়ে ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ না করিলেও ইয়াহূদীরা অন্যত্র হইতে এই উপদ্বীপে আগমন করে। এই অভিবাসন প্রধানত দুইটি কালপর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। একটি কালপর্যায় ছিল ৫৮৭ খৃস্ট-পূর্বাব্দে ব্যবিলনীয় শাসকের ফিলিস্তীন দখলের পর, আরেকটি ৭০ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাসের ফিলিস্তীন জয় ও জেরুসালেম ধ্বংসের পর। কয়েকটি ইয়াহূদী গোত্র আরবে আগমন করিয়া ইয়াছরিব (মদীনা), খায়বার, তায়মা ও ফাদাকে বসতি স্থাপন করে। তাহারা এখানে আসিয়া ধর্মপ্রচার হইতে পুরাপুরি বিরত থাকে নাই। জনশ্রুতি অনুযায়ী তাহারা এক হিময়ারী শাসককে ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত করে। তাহার নাম আবূ কারিব আস'আদ কামিল (তুব্বা') (৩৮৫-৪২০ খৃ.)। উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালাইতে মদীনায় আসিলে এই হিময়ারী শাসক ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করে। দুইজন ইয়াহূদী ধর্মপ্রচারক ইয়ামানে ইয়াহূদী ধর্ম প্রচারের জন্য তাহার সঙ্গে পাঠানো হয়।[৮৭]

ইয়ামানে এই দুই ইয়াহূদী ধর্মপ্রচারক কতদূর সাফল্য লাভ করে তাহা স্পষ্টত জানা যায় না। তবে আস'আদ কামিলের এক বংশধর যূ-নুওয়াস ইয়াহূদী ধর্মের এক বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করে। শুধু ইয়ামানের খৃস্টানদের উপরই নিপীড়ন-অত্যাচার চালায় নাই, বরং নাজরানের খৃস্টানদের মাঝেও গণহত্যা চালায়। এই বর্বর গণহত্যাকালে অগ্নিময়[৮৮] গভীর খাদে

বিপুল সংখ্যক খৃস্টানকে নিক্ষেপ করে। যূ-নুওয়াসের এই অসহিষ্ণুতায় ইয়ামানে বায়য়ান্টীয় ও আবিসিনীয় সাম্রাজ্যের যৌথ হস্তক্ষেপ ঘটে। ফলে ইয়ামানে যূ-নুওয়াসের শাসনের অবসান ঘটে এবং সে দেশে দ্বিতীয় বারের মত আবরাহার নেতৃত্বে আবিসিনীয় দখলদারিত্বের সূচনা ঘটে। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আবরাহা গোটা ইয়ামানে খৃস্টধর্ম কায়েমের সংকল্প লইয়া সান'আয় এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করে এবং কা'বাগৃহ ধ্বংসের জন্য ৫৭০-৭১ খৃস্টাব্দে মক্কায় এক অভিযানে নেতৃত্ব দেয়।

মাযদাঈ বা জরথুস্ত্রের ধর্ম পারস্যে প্রচলিত ছিল। উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল অঞ্চল ও বাহরায়নের কিছু লোক এই ধর্ম গ্রহণ করে। ২২৫ খৃস্টাব্দে পারস্যবাসী ইয়ামান পদানত করিলে সেখানেকার কিছু লোক জরথুস্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করে। সাবা ধর্ম সম্পর্কে কুরআনে কিছু উল্লেখ আছে।[৮৯] এই ধর্মটি সম্ভবত ব্যবিলন কিংবা দক্ষিণ আরবের কোন প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস। এই ধর্মবিশ্বাসীরা জ্যোতিষ্ক-নক্ষত্র পূজা করিত। ইসলামের অভ্যুদয়কালে এই ধর্মমতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। যাহা হউক, এই ধর্মটি আরব উপদ্বীপে বিজাতীয় ধর্মবিশ্বাস বলিয়া গণ্য ছিল। ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, কোন আরব তাহার পূর্বপুরুষের অনুসৃত ধর্ম পরিত্যাগ করিলেই তাহাকে বলা হইত, সে সাবী ধর্মাবলম্বীতে পরিণত হইয়াছে।[৯০]

অবশ্য এইসব ধর্ম সাধারণভাবে আরবদের জীবন ও সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। বিশেষত খৃস্টান ও ইয়াহূদীরা তাহাদের মধ্যে হানাহানি, অসহিষ্ণুতা, মতবিরোধ এবং ঈসা ('আ) ও মূসা ('আ)-এর মূল শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হইবার কারণে তাহাদের অবস্থান দুর্বল করিয়া ফেলে। প্রজ্ঞার অধিকারী আরব খৃস্টানদের কাছে যীশু ও মেরির মূর্তিপূজা ছাড়া এবং খৃস্টান অবতারবাদ ও ত্রিত্ববাদ কতগুলি মূর্তিকে একত্রে পূজা করা ও আল্লাহ্‌কে সর্বোচ্চ প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া বৈ কিছুই মনে হয় নাই। ইয়াহূদী ধর্মের বেলায়ও পরিস্থিতি একই রকম ছিল। এই ধর্ম একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন। এই ধর্মেও উযায়রকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে দাবি করা হইয়াছে। আর তাই এই ধর্মও দৃশ্যত সমান বহু ঈশ্বরবাদী। ইসলামের অভ্যুদয়ের ঠিক আগে বেশ কিছু লোক ইবরাহীম ('আ)-এর সত্যিকার ধর্মবিশ্বাসের সন্ধানে বাহির হইয়া আসে এবং তাহারা হানীফ নামে পরিচিত হয়।[৯১] এই লোকগুলির আবির্ভাবকে যদি আমরা ইবরাহীম ('আ)-এর ধর্মবিশ্বাসের ধারার অস্তিত্ব এবং আরবে খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের অবস্থানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফল বলিয়াও মনে করি তাহা হইলেও হানীফরা কার্যত সকলেই এই উভয় ধর্মের দিক হইতে তাহাদের মুখ ফিরাইয়া লইলেও তাহাতেই বোঝা যায় যে, তাহারা সমসাময়িক কালের প্রজ্ঞার অধিকারী আরব মানসে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়।

পাঁচ ঃ আরব উপদ্বীপের বাহিরের জগত

আরব আর যাহাই হউক গোটা বিশ্ব নয়। আর কেবল আরবরাই যে জাহিলিয়া বা আঁধারে আচ্ছন্ন ছিল তাহাও নহে। আরও দেশ, ভূভাগ, জনসমষ্টি ছিল এই উপদ্বীপের বাহিরেও যেখানেও ছিল জাহিলিয়ার পরিবেশ। ঐ সময়কার বিশ্ব আদর্শিক ধারণায় মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত

ছিল। পশ্চিমে ছিল বায়যান্টাইন এবং রোমক সাম্রাজ্য ঃ এই দুই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পূর্বে আধুনিক ইরাক হইতে পশ্চিমে আটলান্টিক উপকূল (আফ্রিকা বাদে) অবধি। এই অঞ্চলের পূর্বে ছিল রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী পারস্য সাম্রাজ্য—ইহা পশ্চিমে ইরাক হইতে পূর্বে সিন্ধুনদ উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৃতীয় অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্বে চীন ও ভারত, যাহা অবশিষ্ট বিশ্বের কাছে ছিল খুবই কাঙ্খিত। ইহা ছাড়াও দূরপ্রাচ্যে ও দূর পাশ্চাত্যে ছিল আরও নানা জাতি ও নানা দেশ। যতটুকু আমরা এইসব দেশ ও জনসমষ্টি সম্পর্কে জানি তাহাতেই বলা চলে, এইসব দেশ ও জনসমষ্টির অবস্থাও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে খুব একটা ভাল ছিল না।

বিশ্ব দৃশ্যপটের প্রবীণ বিষয় ছিল বায়যান্টাইন ও পারস্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহারা ছিল সমসাময়িক কালের দুই প্রধান পরাশক্তি। তাহাদের সংঘাতের মূল প্রাচীন। গ্রীস ও পারস্যের মধ্যকার অতীত সংঘাতের (গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ) মধ্যে ইহার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। রোমক শক্তি গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হওয়ার পর সংঘাতের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারও রোমের উপর বর্তায়। ৪৬৭ খৃস্টাব্দে পাশ্চাত্যের রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচ্যে রোমক (বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের) পত্তন হয়। আর ইহার রাজধানী স্থাপিত হয় কনস্ট্যান্টিনোপলে। তখনও এই সাম্রাজ্যের পারসিক সাম্রাজ্যের সহিত সংঘাতের একই উত্তরাধিকার ইহার উপর বর্তায়। পাশ্চাত্যে রোমক সাম্রাজ্যের অবসানের পর ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় কিছু জাতির লোক সাবেক পাশ্চাত্য রোমক সাম্রাজ্যে দ্রুত তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। ইহারা হইল ঃ অস্ট্রো-গথ (পূর্বাঞ্চলীয় গথ), ভিসিগথ (পশ্চিমাঞ্চলীয় গথ), ভাইকিং, ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডল (ইহা হইতে ইংরেজি ভ্যাণ্ডালিজম শব্দটির উৎপত্তি)। 'সভ্য' রোমকরা এসব জাতির লোককে আধুনিক জার্মান, ফরাসী, স্পেনীয় ও ইংরেজ জাতির পূর্বসূরী মনে করিত। বার্বার (বর্বর) ও আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এইসব জাতির ৫ম হইতে ১০ম শতাব্দীর ইতিহাসকে ইউরোপের 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক যে, আরবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ঐ সময়ে যখন ইউরোপ অন্ধকার যুগ অতিক্রম করিতেছিল।

এইসব অঞ্চল অবশ্য লক্ষণীয় বৈষয়িক সভ্যতার অধিকারী ছিল না, তাহা নহে। ভারত ও চীন গ্রীক-রোমক ও পারসিক সভ্যতার সমকক্ষ সভ্যতার অধিকারী ছিল। অনুরূপভাবে আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, ফিনিসিয়া ছাড়াও উত্তর আরবে পেত্রা পালমীরা এবং দক্ষিণ আরব ও মিসর বৈষয়িক সভ্যতায় পিছাইয়া ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের আদান-প্রদান ছাড়াও বৈষয়িক সভ্যতার অন্যান্য উপাদানেরও অংশীদার ছিল অন্যান্য জাতির সঙ্গে। একইভাবে অন্যান্য জাতির লোকও, আরবরা ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী যে ধরনের জাহিলিয়া পরিবেশে ছিল, সেই ধরনের পরিবেশ, ধর্মবিশ্বাস, আচার-রীতি ও অভ্যাসেরও অংশীদার ছিল।

জাহিলিয়ার সবচেয়ে দুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময় উপাদান ছিল বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা। আর সেইসাথে ছিল সকল কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস ও আচার-রীতি। এইসবই কেবল আরবদেরই একান্ত

বিষয় ছিল না, বরং আরও বৈষয়িকভাবে উন্নততর জাতিসমূহের জনসমাজেও ব্যাপকভাবে তাহা প্রচলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতা দিজলা-ফুরাত সভ্যতার অংশীদার ছিল গিলগামেশ ও অন্যান্য অভিন্ন দেবদেবীর মাধ্যমে। গ্রীক ও ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদের আওতাভুক্ত দেবদেবীদের মধ্যে মিল রহিয়াছে। যেমন হিন্দু বরুণ দেবের যথার্থ গ্রীক বিকল্প হইল অ্যাপোলো। গ্রীকরা যেমন তাহাদের মূর্তিপূজার বিষয়টিকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দিয়াছে ও আদর্শায়িত করিয়া তুলিয়াছে এক বিস্তৃততর ধর্মতত্ত্ব ও পুরাকাহিনী রচনার মাধ্যমে, তেমনি প্রাচীন ভারতের কথিত হিন্দুরাও তুলনীয় ও জটিল ধর্মতত্ত্ব এবং পুরাকাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে।

বস্তুপক্ষে, বহু ঈশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা ও কুসংস্কার ভারতে ব্যাপকভাবে শিকড় গাড়ে। ঋকবেদ হইল হিন্দুদের চার বেদের প্রাচীনতম গ্রন্থ।[৯২] ইহাতে একেশ্বরবাদের আবশ্যিক আভাস থাকিলেও তাহা হিন্দুদের দৃষ্টি পুরাপুরি এড়াইয়া যায়। আর ইহার পরিবর্তে তাহারা যাহা কিছু ধারণাযোগ্য বস্তু তাহার সবকিছুতেই, যেমন পাথর, গাছ, নদী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, রাজন্য, পশু, এমনকি জননেন্দ্রিয়তেও তাহারা দেবত্ব আরোপ করিত। তাহারা নানা আকার-আকৃতিতে এই সবের ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং বিস্তৃত আচার-রীতি সহকারে এই সবের পূজা-অর্চনা করে। একটি কালপর্যায়ে পুরাকাহিনী অনুযায়ী দেবদেবীর সংখ্যা দাঁড়ায় তেত্রিশ কোটিতে, যদিও এই দেবদেবীর সংখ্যা সমসাময়িক কালের জনসংখ্যার বেশি। মূর্তির প্রতি তাহাদের নিষ্ঠার কারণে হিন্দুরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের মতই চমৎকার ভাস্কর হইয়া উঠিয়াছে নিঃসন্দেহে। হিন্দুরা তাহাদের কিছু বিশিষ্ট পূর্বপুরুষকে আদর্শ ও মূর্তি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং তাহারা এইসব মূর্তিকে ঈশ্বরের অবতাররূপে কল্পনা করিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষেও হিন্দুরাই সর্বপ্রথম ঈশ্বরের অবতার ও পূনঃঅবতাররূপে আবির্ভাবের তত্ত্ব প্রদান করে। অন্যান্যের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। তাহারা মানুষরূপে ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আরবদের মত হিন্দুরাও সর্বোচ্চ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহারা তাহা করিয়াছে তিন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা দেবতার, যেমন ব্রম্মা, বিষ্ণু ও শিবের ত্রিত্বের আকারে। আরবরা কিছু পশুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে। ঐসব প্রাণীর কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের পর তাহাদের ব্যবহার নিষিদ্ধ। হিন্দুরাও কিছু পশুকে দেবতা হিসাবে পূজা করিত। গরু তাহাদের দেবতা। আর তাই হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে, কিন্তু গবাদির অন্যান্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নাই, যদিও ঋকবেদের আমলে ব্রাহ্মণদের গোমাংস পরম হরষে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করা লক্ষ্য করা গিয়াছে।[৯৩] বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা প্রথার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় মতবাদ সাধারণ মানুষকে, বিশেষত একেবারে নিম্নশ্রেণীর শূদ্র মানুষগুলিকে মানবেতর জীবনের গভীরতম তলে অবনমিত করিয়াছে। এই সমাজে বহুবিবাহও প্রচলিত ছিল। নারীর অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। পরস্ত্রী গমন ও ব্যভিচার-এর প্রচলন ছিল বহুল। হিন্দুরা তাহাদের কন্যা শিশু সন্তানকে জীবন্ত কবর না দিলেও তাহাদের বিধবাদেরকে, কমবয়সী হউক বা বয়সী হউক, তাহাদের মৃত স্বামীর লাশের সহিত পোড়াইয়া মারিয়াছে।[৯৪]

বর্ণপ্রথার বাড়াবাড়ি ও হিন্দুধর্মের অন্যান্য অপব্যবহারের প্রতিবাদ হিসাবে কপিলাবস্তু নগরের (উত্তর ভারত) শাক্য গোত্রের রাজকুমার সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ হিসাবে সুপরিচিত, ৫৬৫-৪৮৬ খৃ.

পূর্বাব্দ) বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গঃ সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম, সৎ শ্রুতি ইত্যাদির উপদেশ প্রচার করেন। তিনি জটিল ধর্মতত্ত্বের আলোচনা পরিহার করেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কেও নীরব থাকেন। তাহার মৃত্যুর পর অচিরেই তাহার শিক্ষার বিকৃতি ঘটে। আর হিন্দুধর্মের প্রভাবে খোদ গৌতমকে ঈশ্বরের অবতার হিসাবে গণ্য করা হয়। বুদ্ধরা তাহার মূর্তিপূজা করিতে শুরু করিয়া দেয়। সপ্তম শতাব্দী নাগাদ ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী হিন্দু প্রতিক্রিয়ার সুবাদে সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধধর্মকে কার্যত তাহার জন্ম ও লালনভূমি হইতেই বহিষ্কার করা হয়। ভারতের কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৌদ্ধরা তাহাদের অস্তিত্ব কোনরকমে টিকাইয়া রাখিতে পারিলেও তাহাদের অনুসৃত ধর্ম অনেকটা বিকৃত ও মূর্তিপূজা প্রধান হইয়া ওঠে এবং তাহা দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও চীনে স্থানান্তরিত হয়।

চীনে তাও (Taoism) ও কনফুসিয়াসের ধর্মীয় মতবাদের এক অদ্ভূত মিশ্রণ প্রচলিত ছিল। পরে চীনে বিকৃত আকারে বৌদ্ধ মতবাদ তৃতীয় ধর্মীয় প্রবণতা হিসাবে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী কালে অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম আর তেমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। কনফুসিয়াস ও তাওয়ের মতবাদে বহু মূর্তিপূজামূলক আচার-রীতি ও কুসংস্কার বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠে। সর্বোপরি যাদুবিদ্যা ও সম্মোহনের বিষয় ধর্মীয় জীবনে প্রধান হইয়া উঠে। আর এগুলি আয়ত্ত ও প্রয়োগ করার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে যাজক শ্রেণী। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছে এই যাজক শ্রেণীর লোকদের একটা আধা ঈশ্বর ভাবমূর্তি বজায় রাখা। এই সবের আনুকূল্যেই চীনের সম্রাটগণ তাহাদের নিজ প্রজাসাধারণের ঈশ্বর হিসাবে দাবি করার সুযোগ পায়। আর সাধারণ মানুষ তাহাদের অনুগত থাকিয়া তাহাদের কার্যত পূজা করে।

তখনকার তৃতীয় বিশ্বে যখন এই ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক পরিস্থিতি তখন অন্য দুই বিশ্বের অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। পারসিক সাম্রাজ্য জরথুস্ত্রের শিক্ষা প্রধানত বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার রচনা বলিয়া কথিত আবেস্তার কোন মূল আকারের অস্তিত্ব নাই। জেন্দ (তখন অবলুপ্ত) ভাষায় পারসিক যাজক শ্রেণী আবেস্তার একটি সংযোজনী রচনা করিয়া সংকলন আকারে প্রকাশ করে। এই রচনাটিই জেন্দ-আবেস্তা নামে পরিচিত। তবু এই রচনারও মাত্র কয়েকটি কপির অস্তিত্ব ছিল আলেকজাণ্ডারের পারস্য অভিযানের সময়। আলেকজাণ্ডার যখন পারসিপোলিস দখল করে তাহা পোড়াইয়া ধ্বংস করেন তখন এই কপিগুলিও ধ্বংস হইয়া যায়। এই ঘটনা ৩৩০ খৃস্ট-পূর্বাব্দের। জেন্দ-আবেস্তার একটি বিকল্প রচনা পরবর্তী কালে প্রস্তুত করা হয়। আলেকজাণ্ডারের পারস্য আক্রমণের ফলে ঐ দেশে যে বিভ্রান্তি, গোলযোগ ও অরাজকতা দেখা দেয় তাহাতে একদিকে অগ্নিপূজা ও অন্যদিকে শুভশক্তির দেবতায়ন ব্যাহত হয়। আর এই শুভশক্তির দেবতায়নকে 'আহুরা মাজদা' নামে অভিহিত করা হয় এবং অশুভ শক্তিকে 'আহুরামান' নামে অভিহিত করা হয়।[৯৫] এই আহুরা মাজদা ও আহুরা মানের সঙ্গে আরও যুক্ত হয় বহু

মূর্তিপূজামূলক ও কুসংস্কারাচ্ছান্ন রীতিপ্রথা যাহার সহিত হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারের মিল রহিয়াছে। শুভের দেবতা আহুরা মাজদা ও সেইসঙ্গে অগ্নিপূজাও করা হইত। বিভিন্ন মন্দিরে আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য কতকগুলি বিশেষ স্থানে ইহা করা হইত আহুরা মাজদা ও আহুরা মানের সম্মানে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে মাযদাক নামে এক চিন্তাবিদ কিছুটা সাম্যবাদী সংস্কার প্রবর্তন করার পর সমাজে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পায়। মাযদাকের ধারণা ছিল যে, সমাজের সকল সমস্যা ও অশুভের কারণ মানুষের সুন্দরী নারী সম্ভোগের এবং বিত্ত ও বিষয়সম্পত্তি লাভের লালসা। তাই সে বিবাহ প্রথা তুলিয়া দিয়া যে কোন পুরুষের জন্য যে কোন নারী সম্ভোগের ব্যবস্থা করার সপক্ষে মত প্রকাশ করে। একমাত্র শাসক বা রাজা ছাড়া আর সকলের সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তাহার মতে, কেবল শাসকেরই সম্পদ-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য রাখার অধিকার থাকিবে। তবে ৫৩১ খৃস্টাব্দে পিতা কো'বাদের মৃত্যুর পর সম্রাট আনুশিরওয়ান (নওশেরওয়া) ক্ষমতার উত্তরাধিকার লাভ করিলে তিনি এই প্রক্রিয়া দ্রুত উল্টাইয়া দেন। সম্রাট আনুশিরওয়ানের বিশাল ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ও দৃষ্টান্ত তাহার অজেয় সামরিক ক্ষমতা সত্ত্বেও গোটা পারস্য ও পারসিক সাম্রাজ্য জুড়িয়া ব্যাপক সামাজিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা চলিতেই থাকে।

গ্রীক-রোমক বা বায়যান্টিয়াম সাম্রাজ্যে খৃস্ট ধর্মই ছিল প্রধান ধর্ম। তবে এই ধর্মে ঈসা ('আ)-এর মূল শিক্ষা ছিল না বরং তাহার মধ্যে গ্রীক, রোমক বহু ঈশ্বরবাদী ধ্যানধারণা মিশ্রণ ঘটানো হয় যাহার নেপথ্য নায়ক ছিলেন সাধু পল (পৌল)। বায়যান্টাইন খৃস্ট ধর্মে যেসব বৈশিষ্ট্যসূচক নব উদ্ভাবনা যোগ করা হয় তাহা হইল ঃ যীশু খৃস্ট ঈশ্বরের অবতার, তিনি মানুষের আকারে জন্মগ্রহণ করেন, ত্রিত্ববাদ ও পাপ মোচন। বহু আধুনিক পণ্ডিত এখন স্বীকার করেন যে, এই অবতার ও ত্রিত্বতত্ত্ব গ্রীকদের নিকট হইতে পরিগ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এইসব ধ্যান-ধারণা হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ধর্মকে সহজে গ্রহণযোগ্য ও জনসাধারণের কাছে, বিশেষ করিয়া গ্রীক-রোমক জনসাধারণের কাছে উপাদেয় করিয়া তোলার জন্য এই বহু মতবাদী সমন্বয় ঘটানো হয়। ইহার কারণ গ্রীক ও রোমক জনসাধারণের মধ্যে বহু ঈশ্বরবাদের এক দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রহিয়াছে। বায়যান্টাইন কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্য গড়া, টিকাইয়া রাখা এবং বারবার জাতীয় গোষ্ঠী ও অন্যান্য জাতির লোকদের আনুগত্য ধরিয়া রাখার জন্যই এই ধরনের একটি ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করে। আর তাই তখন হইতে ধর্মের নামে সাধু পৌলের মতবাদের জয়যাত্রা সূচিত হয়। ৩২৫ খৃস্টাব্দে নিসিয়া ধর্মসভায় এই তত্ত্ব ও তত্ত্ব সংক্রান্ত পবিত্র পাঠগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার পরেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ পুরাপুরি দূর করা সম্ভব হয় নাই। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল নেস্তরীয় খৃস্ট ধর্ম মতাবলম্বী বিরুদ্ধবাদীরা। তাহাদের বক্তব্য ছিল, খৃস্টের দ্বৈত প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য যাহারা সমর্থন করে তাহাদের

উপর দমন-নীপিড়ন চালানো হইতেছে। অধিকাংশ নেস্তরিয় খৃস্টান তাই বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী পারস্য সাম্রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে বায়যান্টীয় খৃস্টান কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের সামন্তদের অত্যাচারে নিপীড়িত ইয়াহূদীরা পারস্য, আরব ও অন্যত্র দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এই ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এবং যে খৃস্টীয় মতবাদ কনস্টান্টিনোপল সমর্থন করে তাহার প্রতি ঘৃণার বিষয়টি পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে বায়যান্টিয়ামের নিরন্তর সংঘাত হইতে প্রমাণিত। ধর্মে অবিশ্বাসী আরব এবং আরবের ইয়াহূদীদের সহানুভূতি তাই সাধারণত পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতি বেশি ঝুঁকিয়া ছিল।

বায়যান্টিয়ামের সম্রাট সাম্রাজ্যের সর্বত্র চমৎকার গির্জা নির্মাণ করেন। এইসব গির্জায় যীশু ও মেরীর মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদী প্রশংসাগীতির মাধ্যমে একত্রে ঐ দুই মূর্তির পূজা করা হয়। ইহা ছাড়া জননী ঈশ্বরীর গির্জাও নির্মাণ করা হয়। বায়যান্টিয়াম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে একত্রে ঐ দুই মূর্তির পূজা করা হয়। বায়যান্টিয়ান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতির মূল স্বপ্ন ছিল বিশ্বব্যাপী এক সাম্রাজ্য ও এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা। আর এই রাষ্ট্রনীতির কারণেই খৃস্টান আবিসিনিয়ার মাধ্যমে ইয়ামান তথা দক্ষিণ ইয়ামানে দুইবার হস্তক্ষেপ করা হয়। এই অভিযান কার্যত অনেকটা পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য যুদ্ধ প্রকৃতিরও বলা চলে। ৫৭০-৭১ খৃস্টাব্দে কা'বাগৃহের বিরুদ্ধে আবরাহার বিপর্যয়কর সামরিক অভিযানের পর আবিসিনীয়-বায়যান্টীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ইয়ামানে প্রতিরোধ গড়িয়া উঠে। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন সায়ফ ইব্‌ন যী ইয়াযান। তাহার অনুরাধে সাড়া দিয়া পারস্য সম্রাট সমুদ্র পথে ইয়ামানে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এই সাহায্যপুষ্ট ইয়ামানীরা তাহাদের দেশে আবিসিনীয় শাসনের অবসান ঘটায়[৯৬] ইহার পর বায়যান্টিয় কর্তৃপক্ষ খোদ মক্কায় খৃস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠার শেষ বড় রকমের প্রয়াস হিসাবে উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছের মাধ্যমে মক্কার সরকারে পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু উছমানের নিজ গোত্র বনূ আসাদ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে।[৯৭]

আরব উপদ্বীপের চারপাশের পৃথিবীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল এই রকম। এই আলোচনায় স্পষ্ট যে, তখনকার গোটা বিশ্বে কম-বেশী প্রায় সর্বত্র বহু ঈশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা, কুসংস্কার ও অমানবিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, যে পরিবেশের ইসলামী-আরবীয় ভাষ্য বা শিরোনাম হইল 'জাহিলিয়্যা'। তাই ইসলামের অভ্যুদয় ছিল আরবদের নিকট একদিকে যেমন বিপ্লব, তেমনি ইহা সারা বিশ্বে আধিপত্য করার সাসানীয় ও বায়যান্টিয় সম্রাটদের কাছে এক প্রবল বাধা ও হতাশা। তাহাদের বিশ্বজনীন সাম্রাজ্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ইসলামের অভ্যুদয়ে ধুলিস্যাৎ হইয়া যায়।

অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন

তথ্যসূত্র

১. P. K. Hitti, History of the Arabs, **১ম প্রকাশ ১৯৩৭ খৃ.**, 10rh ed. 1970, 11th print, 1986, pp. 8-9।

২. আল-কুরআনের ১১ নং সূরা তাঁহার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই সূরার আয়াত ৫০-৬০ বি.দ্র.। আরও দ্র. ৭ ঃ ৬৫-৭২; ২৫ ঃ ১২৩-১৪০ ও ৪৬ ঃ ২১-২৬।

৩. দ্র. কুরআন, ৭ ঃ ৭৩-৭৯; ১১ ঃ ৬১-৬৮; ২৪ ঃ ১৪১-১৫৯; ২৭ ঃ ৪৫-৫৩।

৪. First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, VII, p, 736.

৫. কাহ্তান ঃ নূহ ('আ)-এর পুত্র সাম; সামের পুত্র আরফাখশাদ, আরফাখশাদের পুত্র শালিখ; শালিখের পুত্র আবির; আবিরের পুত্র কাহ্তান।

৬. কুরআনের সূরা নং ৩৪-এর নামকরণ তাহাদের নামে হইয়াছে। বিশেষত দ্র. সূরার আয়াত ১৫-২১; আরও দ্র. ২৭ ঃ ২২।

৭. কুরআন, ৬ ঃ ৭৪, ৮০-৮৩; ১৯ ঃ ৪১-৫০; ২১ ঃ ৫১-৭১; ২৬ ঃ ৭০-৮২; ২৯ ঃ ১৬-১৮, ২৪-২৫; ৩৭ ঃ ৮৩-৯৮।

৮. কুরআন, ২১ ঃ ৬৮-৭০।

৯. কুরআন, ২১ ঃ ৭১।

১০. ইব্ন খাল্দূন, তারীখ, ২/১ খ.,৭৯; ইব্ন সা'দ, ১খ., ৪৮, ৪৯।

১১. কুরআন, ৩৭ ঃ ৯৯-১০০।

১২. Genesis (বাইবেলের আদিপুস্তক), 16 : 7-11.

১৩. কুরআন, ৬ ঃ ৮৬ ঃ ৭ ঃ ৮০-৮৪; ১১ ঃ ৭৭-৮৩; ১৫ ঃ ৫৭-৭৭; ২১ ঃ ৭৪-৭৫; ২৬ ঃ ১৬০-১৭৫; ২৭ ঃ ৫৪-৫৮; ২৯ ঃ ২৬, ২৮-৩৫; ৩৭ ঃ ১৩৩-১৩৮; ৫১ ঃ ৩১-৩৭; ৫৪ ঃ ৩৪-৩৯; ৬৬ ঃ ১০।

১৪. বুখারী, নং ৩৩৬৪।

১৫. বুখারী, নং ৩৩৬৫।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. কোন কোন বিবরণ অনুযায়ী ইহা মিনায় অবস্থিত। আবার অনেকের মতে ইহা মারওয়া পাহাড়ের কাছে অবস্থিত। আল-কুরআনে সুনির্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; ৩৭ ঃ ১০৩ (أَسْلَمَا)।

১৮. কুরআন, ৩৭ ঃ ১০২-১০৭।

১৯. কুরআন, ৩৭ ঃ ১১২-১১৩।

২০. বুখাবী, নং ৩৩৬৫।

২১. কুরআন, ২ ঃ ১২৭-১২৯।

২২. কুরআন, ২ ঃ ১২৬।

২৩. কুরআন, ২২ ঃ ২৭।

২৪. Genesis, 12 : 2; 16 : 10.

২৫. Genesis, 25 : 7-9.

২৬. ওল্ড টেস্টামেন্টে ইসমাঈল ('আ)-এর বারো পুত্রের নাম উল্লেখ করার পর বলা হইয়াছে ঃ এগুলি ইশমায়েলের পুত্রদের নাম, তাহাদের শহর, দুর্গপ্রাসাদের নাম। এই বারোজন ছিলেন তাহাদের নিজ নিজ জাতির শাসক (আদিপুস্তক, ২৫ ঃ ১৬)।

২৭. ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯-১৩০।

২৮. প্রাগুক্ত, ১৩১-১৩২।

২৯. প্রাগুক্ত, ১৪২-১৪৭।

৩০. প্রাগুক্ত, ৪৮-৫২।

৩১. প্রাগুক্ত, ৪৯-৫২। আল-কুরআনে পাপী জনসম্প্রদায়ের উপর সিজ্জীল প্রস্তর বর্ষণের আরও উল্লেখের জন্য দ্র. ঃ ১১ ঃ ৮২ ও ১৫ ঃ ৭৪। শেষোক্ত দুই আয়াতের বর্ণনায় লূত ('আ)-এর জন-সম্প্রদায়ের উপর আপতিত শাস্তি সম্পর্কিত।

৩২. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ৩৫।

৩৩. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ৩৫, ২য় ভাগ।

৩৪. দীন ইসলাম কায়েম হওয়ার পরেও প্রথাটি অব্যাহত থাকে।

৩৫. ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫-৪২৬।

৩৬. এই কবিদের নাম ঃ (১) তারাফা ইবনুল আব্দ, গোত্র ঃ বাক্র (মৃ. ৫০০ খৃ.); (২) ইমরুল কায়স, বনূ কিনদা গোত্রের রাজা হারিছের পৌত্র (মৃ. ৫৪০ খৃ.); (৩) 'উবায়দ ইবনুল আবরাস (মৃ. ৫৫৫ খৃ.); (৪) আল-হারিছ ইব্ন হিললিজা, গোত্র ঃ বনূ বাক্র (মৃ. ৫৮০ খৃ.); (৫) 'আমর ইব্ন কুলছূম, গোত্র ঃ বনূ তাগলিব (মৃ. ৬০০ খৃ.); (৬) আন-নাবিগা আয-যুব্য়ানী, গোত্র ঃ বনূ যুব্য়ান (মৃ. ৬০৪ খৃ.); (৭) আনতারা ইবনুশ শাদ্দাদ, গোত্র ঃ বনূ 'আব্স (মৃ. ৬১৫ খৃ.); (৮) যুহায়র ইব্ন সুলমা, গোত্র ঃ বনূ মুযায়না (মৃ.৬১৫ খৃ.); (৯) আল-আ'শা (মায়মূন ইব্ন কায়স, মৃ. ৬২৯ খৃ.) ও (১০) লাবীদ ইব্ন রাবী'আ, গোত্র ঃ বনূ 'আমের ইব্ন সা'সা'আহ (মৃ. ৬৬২ খৃ.)। সর্বশেষ উল্লিখিত কবি ইসলাম গ্রহণের পর কবিতা রচনা ত্যাগ করেন। এই কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্র. R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge 1988 edn., pp. 103-125.

৩৭. নিম্নে দ্র. অধ্যায় ৭, তৃতীয় ভাগ।

৩৮. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ৩৫, ৩য় ভাগ। প্রায় সকল আয়্যাম সংক্রান্ত সর্বোত্তম, আধুনিক ও সমন্বিত বিবরণের জন্য দ্র. মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ মাওলা বেগ ও অন্যান্য বিরচিত "আয়্যামুল 'আরাব ফি'ল-জাহিলিয়্যা, কায়রো, তা.বি.।

৩৯. ইব্‌ন সা'দ, ১ম খণ্ড, ৭৮।

৪০. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ৭, ৩য় ভাগ।

৪১. নিম্নে দ্র. অধ্যায় ৭, ৪র্থ ভাগ।

৪২. আল-আযরাকী, ২য় খণ্ড, ২৬৩।

৪৩. কুরআন, ২ ঃ ২৭৫-২৭৯; ৩ ঃ ১৩০; ৩০ ঃ ৩৯।

৪৪. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ৩৫, ১ম ভাগ।

৪৫. কুরআন, ৬ ঃ ১৩৬।

৪৬. কুরআন, ৮৮ ঃ ১৭।

৪৭. Ismail Razi al-Faruqi and Lois Lamya al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam, New York 1986, p. 83.

৪৮. বুখারী, নং, ৩৫২১, ৪৬২৩-৪৬২৪; মুসলিম, নং ২৮৫৬; মুসনাদ (২য় খণ্ড), ২৭৫-২৭৬; (৩য় খণ্ড), ৩১৮, ৩৫৩, ৩৭৪; (৫ম খণ্ড), ১৩৭।

৪৯. ইব্‌ন হিশাম, (১ম খণ্ড), ৭৭। আল-কালবীর বর্ণনা অনুসারে, 'আমর একবার গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় কোন এক ব্যক্তি তাহাকে সিরিয়ার একটি প্রস্রবণে গোসল করার পরামর্শ দেয়। ঐ ব্যক্তি জানায়, প্রস্রবণের পানিতে গোসল করিলে আমর নিরাময় লাভ করিবে। পরামর্শ অনুযায়ী আমর সিরিয়ায় গিয়া ঐ প্রস্রবণের পানিতে গোসল করার পর আরোগ্য লাভ করে। ঐ সময় সে লক্ষ্য করে যে, সেখানকার লোকজন মূর্তিপূজা করিতেছে। লোকজনের নিকট সে ইহার কারণ জানিতে চাহে। ইবনুল কালবী, কিতাবুল আসনাম, সম্পা. আহমাদ যাকী পাশা, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৪, পৃ. ৮।

৫০. Hitti, History of the Arabs, 1980, reprint, p. 100 and n. 2.

৫১. ইব্‌ন হাজার, ফাতহুল বারী (৬ষ্ঠ খণ্ড), ৬৩৪।

৫২. কুরআন, ৭১ ঃ ২৩।

৫৩. আলোচনার জন্য দ্র. First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, I, 379-380; A. Yusuf Ali, The Holy Quran, text, Translation and Commentary, Islamic Foundation, Liecester, 1975, pp. 1619-1623 (Appendix XIII of Surah 71).

৫৪. বুখারী, নং ৪৯২০।

৫৫. ইব্‌ন হিশাম, (১ম খণ্ড), ৭৭।

৫৬. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৮২; ইবনুল কালবী, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, ২৯।

৫৭. ইবনুল কালবী, প্রাগুক্ত, ১৬, ১৭। First Encyclopaedia of Islam (Vol. I, 380-এর লেখকের মতে, আরবের দেবতা আল-লাত গ্রীক দেবী লেটো, সূর্য দেবতা অ্যাপেলোর মাতার উৎস।

৫৮. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৮৩; ইবনুল কালবী, প্রাগুক্ত, ১৮।

৫৯. কুরআন, ৫৩ ঃ ১৯-২০।

৬০. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৮৩-৮৯; ইবনুল কালবী, প্রাগুক্ত, ৩০, ৪৫-৪৭।

৬১. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৭৮-৮৩।

৬২. কুরআন, ২৩ ঃ ৮৪-৮৯; ৩১ ঃ ২৫।

৬৩. কুরআন, ১০ ঃ ২২; ৩১ ঃ ৩২।

৬৪. কুরআন, ৬ ঃ ১০৯।

৬৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. F.V. Winnet, Allah before Islam, M.W, XXVIII (1938), 239-248.

৬৬. p. K. Hitti-এ সব উৎকীর্ণ লিপি, কুরআনের কিছু সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং কুরায়শদের মাঝে 'আবদুল্লাহ, এই নামের অস্তিত্ব থাকার বিষয় উল্লেখের পর বলিয়াছেন, "স্পষ্টতই আল্লাহ কুরায়শদের গোত্র দেবতা ছিলেন" (Hitti, op. cit., 101)। তাহার এই মন্তব্য একদিকে বিভ্রান্তিকর ও অন্যদিকে অগ্রহণযোগ্য। কারণ তিনি যেসব উৎকীর্ণ লিপির কথা বলিয়াছেন সেগুলি কুরায়শদের নয়। আবার 'আবদুল্লাহ নামটিও একান্তভাবে তাহাদের নয়। কুরায়শদের বাহিরেও এই নামের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাহাদের কথা তো বলা বাহুল্য, মদীনার মুনাফিকদের নেতার নামই ছিল 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই!

৬৭. বুখারী, নং ৩৮৩১।

৬৮. কুরআন, ৩৯ ঃ ৩ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

৬৯. ১০ ঃ ১৮ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَ عِنْدَ اللّٰهِ

৭০. ১৬ ঃ ৫৭ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ আরও দ্র. ৩৭ ঃ ১৪৯-১৫৪; ৪৩ ঃ ১৬; ৫২ ঃ ৩৯।

৭১. কুরআন, ৬ ঃ ১৩৬।

৭২. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৭৮।

৭৩. কুরআন, ১২ ঃ ১০৬ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

৭৪. কুরআন, ২৩ ঃ ৩৭ اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ
বাস্তবিকপক্ষে কুরআনে এরকম বহু আয়াত আছে যেগুলি অবিশ্বাসীদের এই ধারণার উল্লেখ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. ৬ ঃ ২৯; ১৭ ঃ ৪৯; ১৭ ঃ ৯৮; ২৩ ঃ ৩৫; ২৩ ঃ ৮২; ৩৭ ঃ ১৬; ৩৭ ঃ ৫৩; ৩৭ ঃ ৫৮-৫৯; ৪৪ ঃ ৩৫; ৫০ ঃ ৩; ৫৬ ঃ ৪৭ ও ৬৪ ঃ ৭। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বহু বিশদ আয়াত রহিয়াছে পুনরুত্থান ও আল-হাশরের দিন সম্পর্কে।

৭৫. আল-কুরআন এই প্রথার নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়াছে (দ্র. ৫ ঃ ৩; ৫ ঃ ৯০; ১৭ ঃ ২৩; ২৪ ঃ ২-৩; ২৫ ঃ ৬৮ ও ৬০ ঃ ১২)।

৭৬. বুখারী, নং ৫১২৭।

৭৭. প্রাগুক্ত।

৭৮. কুরআন, ১৬ ঃ ৫৮-৫৯।

৭৯. কুরআন, ৬ ঃ ১৩৭; ৬ ঃ ১৫১।

৮০. কুরআন, ৬ ঃ ১৩৭।

৮১. আন-নুমায়রী (আল-বাস্‌রী) আবূ যায়দ উমার ইব্‌ন শাববাহ (১৭৩-২৬২ হি.), তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ, সম্পা. এফ. এম. শালতূত, ২য় ভাগ, ২য় মুদ্রণ, মদীনা, তা.বি., পৃ. ৫৩২; উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, ২২০; আল-ইসাবা, ৩য় খণ্ড, ২৫৩ (নং ৭১৯৪)। আরও দ্র. আদ-দারিমী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৩-৪।

৮২. বুখারী, নং ৩৮৪৩। মহানবী ﷺ এই ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ করেন।

৮৩. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৮৯।

৮৩. কুরআন, ৫ ঃ ১০৩; ৬ ঃ ১৩৯।

৮৫. কুরআন, ৩ ঃ ১৫৪; ৫ ঃ ৫০; ৩৩ ঃ ৩৩; ৪৮ ঃ ২৬; এবং বুখারী, নং ৩৫২৪।

৮৬. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩১-৩৪।

৮৭. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭।

৮৮. এই ঘটনার উল্লেখের জন্য দ্র. কুরআন, ৮৫ ঃ ৪।

৮৯. কুরআন, ২ ঃ ৬২; ৫ ঃ ৬৯; ২২ ঃ ১৭।

৯০. বুখারী, নং ৩৫২৩; মুসনাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪১; ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।

৯১. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ৮, ১ম ভাগ।

৯২. অন্য তিন বেদ হইল ঃ সাম, যজু ও অথর্ব।

৯৩. Rajendralal Mitra, Beef in Ancient Indai, J.A.S.B., 1872, pp 174-196.

৯৪. সতীদাহ নামের এই অমানবিক প্রথা ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের ১৮২৯ সনের আইনে নিষিদ্ধ করা হয়।

৯৫. আহুরা, এই পারসিক শব্দটি অসুর-এর নমনীয় রূপ। হিন্দুরা অসুর বলিতে দানব/ রাক্ষসকে বুঝাইয়া থাকে। এই দুই ভিনদেশী শব্দের মধ্যে মৌলিক কারণ, উভয় ভাষাই ইন্দো-আর্যভাষা পরিবারের সদস্যের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুদের দেবতা বা দেওতা শব্দটির অর্থ ঈশ্বর যাহা মূল লাতিন শব্দ ডেইটির অনুরূপ অর্থবাহক।

৯৬. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬৩-৬৮।

৯৭. নিম্নে দ্র., পৃ. ৩৩০-৩৩৪।

তৃতীয় অধ্যায়

পটভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ

প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ আরবের প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের উপর, বিশেষত প্রাচীন দক্ষিণ ও উত্তর আরবের সভ্যতাগুলির উপর বেশ কিছু কাজ করিয়াছেন। একই উদ্দেশ্যে তাহারা বিভিন্ন খননকার্যও পরিচালনা করিয়াছেন। এইসব খনন হইতে কিছু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহারা প্রাচীন আরবী ভাষা সম্পর্কে সমীক্ষাপূর্বক সেইগুলি সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এই বিষয়ে কোন বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নাই। এই অধ্যায়ে মহানবী ﷺ ও ইসলামের আবির্ভাবের সহিত অপেক্ষাকৃত সরাসরি সম্পর্কিত বিষয়ে বেশ কয়েকজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদের অভিমত সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।[১] উক্ত বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সবিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে ঃ

(১) জাহিলিয়্যা সম্পর্কিত ধারণা;

(২) ইসমাঈল ('আ)-কে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানীসহ কা'বাগৃহ ও ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য;

(৩) মহানবী ﷺ -এর উপর ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের ও সাধারণভাবে তৎকালীন পরিবেশের প্রভাব; এবং

(৪) ইসলামের অভ্যুদয়ের আর্থ-সামাজিক বা জড়-জাগতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

এই চারটি বিষয়ের মধ্যে তিন নম্বর বিষয়টি মহানবী ﷺ -এর যৌবন ও তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগের জীবনের বর্ণনা সম্পর্কিত লেখায় এই গ্রন্থের শেষের দিকে আলাদাভাবে আলোচিত হইয়াছে।[২] ৪নং বিষয় অর্থাৎ ইসলামের অভ্যুদয়ের জড়জাগতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়টি বিবেচিত হইয়াছে পরবর্তী অধ্যায়ে। আর সেইসঙ্গে ইহার কিছু কিছু বিষয়ও আরও পরে হারবুল ফিজার বা হিলফুল ফুযূল প্রসঙ্গে এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির[৩] সঙ্গে কুরআনের প্রথম দিকের ওহী বা শিক্ষার সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। সেই কারণে বর্তমান অধ্যায়ে অবশিষ্ট দুই বিষয় ঃ জাহিলিয়্যা এবং ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য সম্পর্কে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

এক ঃ জাহিলিয়্যা

প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ সাধারণত জাহিলিয়্যা কথাটির অনুবাদ করিয়াছেন 'অজ্ঞানতা, বর্বরতা' হিসাবে। তাহারা জাহিলিয়্যা বলিতে ইসলামের আগের কালপরিক্রমাকে নির্দেশ করিয়াছেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকের লেখক আর. এ. নিকলসন আরবের ইতিহাসকে তিনটি কালপর্যায়ে ভাগ

করিয়াছেন ঃ সাবায়ী ও হিময়ারী আমল (৮০০ খৃ.পূর্বাব্দ–৫০০ খৃস্টাব্দ), প্রাক-ইসলামী আমল (৫০০-৬২২ খৃ.) এবং মুহাম্মাদী আমল। এক টীকাভাষ্যে তিনি উল্লেখ করেন, "কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে আদম ('আ) হইতে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সময়কে জাহিলিয়্যা আমল বুঝায়। আর সংকীর্ণ অর্থে ইহা প্রাক-ইসলামী আমল"।[৪] তাঁহার লেখার পরের এক পর্যায়ে অবিশ্বাসী (কাফের) আরবদের ইতিহাস ও কিংবদন্তী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন, "মুসলমানগণ জাহিলিয়্যা বলিতে আরব ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিক হইতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সময়কে বুঝাইয়া থাকে"। ইহার পর তিনি উল্লেখ করেন যে, গোল্ডজিহার অবশ্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'জাহল' এই আরবী শব্দটি ইল্‌ম বা জ্ঞান-এর অর্থের বিপরীতার্থ বুঝায় না, বরং হিল্‌ম (প্রজ্ঞা)-এর বিপরীত অর্থ বুঝায়। আর সে কারণে জাহল শব্দটি দ্বারা যত না অজ্ঞানতা হিসাবে বুঝিতে হইবে উহা হইতেও বেশী করিয়া বন্যতা বা বর্বরতা হিসাবে। অর্থাৎ গোত্র অহঙ্কার ও অশেষ গোত্রবিবাদ, প্রতিশোধ গ্রহণের সংস্কৃতি এবং বিধর্মী-অবিশ্বাসীদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, ইসলাম যাহা দূর করিতে চাহিয়াছে সেগুলিকে বুঝিতে হইবে।[৫] এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নিকলসন প্রাক-ইসলামী কাব্য হইতে উদ্ধার করা উপাদান অবলম্বনে বিধর্মী আরবদের ইতিহাস ও কিংবদন্তীর বর্ণনা দিয়াছেন।

নিকলসনের ঘনিষ্ঠ অনুসরণে আনুমানিক আরও ২৫ বৎসর পর লিখিতে গিয়া পি. কে. হিট্টি একইভাবে আরব ইতিহাসকে তিনটি প্রধান কাল পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (১) সাবায়ী আমল; (২) হিময়ারী আমল ও (৩) ইসলামী আমল। ইহার পর তিনি কার্যত নিকলসনের সঙ্গে গলা মিলাইয়াই বলিয়াছেন, "জাহিলিয়্যা এক ধারণায় আদম ('আ)-এর সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়া মুহাম্মাদ ﷺ -এর মিশন অবধি বিস্তৃত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে জাহিলিয়্যা বলিতে সেই কাল-পরিক্রমাকে বুঝাইয়া থাকে যখন আরবে কোন প্রকার শৃঙ্খলা, শাসন, কোন নিষ্ঠ নবী, কোন ঐশী গ্রন্থ ছিল না। বস্তুত দক্ষিণ আরবে ঐ সময়ে এক সংস্কৃত ও শিক্ষিত সমাজের অস্তিত্ব ছিল। কাজেই সেখানে অজ্ঞানতা ও বর্বরতা ছিল এমনটি বলা কঠিন।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "মহানবী ﷺ ঘোষণা করেন যে, যাহা কিছু পূর্বে ছিল ইসলাম উহার সবকিছু মুছিয়া ফেলিবে, যাহার অর্থ প্রাক-ইসলামী সকল ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ নিষিদ্ধ করা হইবে"। তিনি অবশ্য একই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, "ধ্যান-ধারণা একেবারে নিশ্চিহ্ন করা খুবই কঠিন; বিশেষ করিয়া কোন একক ব্যক্তির আপত্তিই অতীতকে বাতিল করার জন্য যথেষ্ট নয়"।[৬]

এইভাবে নিকলসন ও হিট্টি উভয়েই জাহিলিয়্যাকে প্রধানত একটি কালপর্যায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। হিট্টি এই কালপরিক্রমার একটি নিজস্ব সংজ্ঞাও দিয়াছেন। পরবর্তী কালের লেখকগণ মোটামুটি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন বলা যায়। তাহারা জাহিলিয়্যা বলিতে তাই আরব ইতিহাসের একটি বিশেষ কালকে বুঝিয়াছেন। উল্লেখ আবশ্যক যে, চিরায়ত ধারণা মুসলিম লেখকগণও কোন কোন সময় জাহিলিয়্যা আমলকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে তাঁহারা

এই জাহিলিয়্যার ব্যাপারে আরও কতগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এইগুলি হইল, অভ্যাস-রীতি-আচার, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। আরব ইতিহাসের একটা কালপর্যায়ে এই উপাদানগুলির সম্মিলিত উপস্থাপনাকেই তাঁহারা জাহিলিয়্যা বলিয়াছেন। তবে এই কালপর্যায় কোন সুনির্দিষ্ট কাল সীমায় সীমিত নহে।[৭]

বাস্তবিকপক্ষে মহানবী ও তাঁহার আশু উত্তরাধিকারীদের আমলেও জাহিলিয়্যাকে ইতিহাসের কোন কাল বুঝাইত না, বরং বিশেষ অভ্যাস এবং রীতি-আচরণের বিষয়গুলিকেই জাহিলিয়্যা বলিয়া বিবেচনা করা হইত। তবে সে যাহাই হউক, মুসলিম ঐতিহাসিকগণও ইতিহাসের কোন এক মেয়াদের আলোচনাতেও জাহিলিয়্যাকে কখনও ৫০০ থেকে ৬২২ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল বলিয়া চিহ্নিত করেন নাই বরং এই মেয়াদ শনাক্ত করিয়াছেন নিকলসন। কেননা তিনি বলিয়াছেন, "দ্বিতীয় মেয়াদ অর্থাৎ প্রাক-ইসলামী আমলকেই (৫০০-৬২২) মুসলিম লেখকগণ 'জাহিলিয়্যা' অর্থাৎ 'অজ্ঞানতা ও বর্বরতার যুগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন"। অথচ কোন চিরায়ত মুসলিম ঐতিহাসিক এই সংজ্ঞায় জাহিলিয়্যাকে সংজ্ঞায়িত করেন নাই।

এই বিভ্রান্তির জন্য সম্ভবত "জাহিলিয়্যা' শব্দের অযথার্থ ইংরাজি অনুবাদ হইতে। কেননা জাহিলিয়্যার ইংরাজি অনুবাদ হইল 'অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা' (Ignorance) বা বর্বরতা (Barbarism)। ইসলামী টেকনিক্যাল পরিভাষাগুলি এই ধরনের অযথার্থ ইংরাজি বা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। জাহিলিয়্যার ইংরাজি অনুবাদ 'অজ্ঞানতা' বা 'বর্বরতা'। মূল আরবী শব্দগুলির এহেন অনুবাদের কারণেই নিকলসন স্পষ্টত উপলব্ধি করেন যে, ইংরাজি শব্দগুলি সাবায়ী ও হিম্‌য়ারী সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। আর তাই তিনি এই সভ্যতাগুলিকে অজ্ঞানতা ও বর্বরতার যুগের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কেননা দক্ষিণ আরবের হিম্‌য়ারী ও সাবায়ীরা এক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহারা ছিল শিক্ষিত ও হরফজ্ঞান সম্পন্ন জনসমষ্টি।

একই ধারণা গোল্ডজিহারকেও সম্ভবত অনুপ্রাণিত করিয়াছে এই উল্লেখে যে, জাহিলিয়্যাকে 'ইলম শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না, বরং হিল্‌ম শব্দের বিপরীতার্থক ধরিতে হইবে। তাহার বক্তব্য হিল্‌ম্ শব্দের অর্থ 'সভ্য মানুষের নৈতিক যৌক্তিকতা'। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গোল্ডজিহারের এই সংজ্ঞাও কড়াকড়ি ধারণায় গোটা প্রাক-ইসলামী আরবের বেলায় প্রযোজ্য হইতে পারে না। আরবদের অনেকেই হিল্‌ম-এর অধিকারী না থাকিলেও তাহাদের অধিকাংশই আদর্শ হিসাবে হিল্‌মকে যথেষ্ট মর্যাদা দিত, অনেকে এই গুণ বা উৎকর্ষের অধিকারীও ছিল।

ইহা ছাড়াও এই সংজ্ঞার প্রবণতা হইল জাহিলিয়্যার কয়েকটি সবিশেষ মৌলিক উপাদানকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া। এইগুলি হইল ঃ বহু ঈশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা, ব্যভিচার এবং অন্যায়ভাবে অন্যদেরকে তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি একান্তভাবেই জাহিলিয়্যার সংজ্ঞাভুক্ত, যদিও সর্বদাই 'শিক্ষিত' ও 'সংস্কৃতিবান' সমাজ বহির্ভূত নাও হইতে পারে।

হিট্টি জাহিলিয়্যার একটি সংশোধিত সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাহার এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, জাহিলিয়্যা হইল "ইতিহাসের একটি কালের মেয়াদ, যে মেয়াদে আরবে কোন সুশাসন ছিল না, কোন ঐশী প্রেরণাপ্রাপ্ত নবী ছিলেন না, কোন প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থও ছিল না"।

এই সংজ্ঞাও কার্যত জাহিলিয়্যার কয়েকটি একান্ত মৌলিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নাই। তাই বড়জোর এই সংজ্ঞাকে একটা উদ্ভাবন বলা যায়। আদিতে জাহিলিয়্যার অর্থ লইয়া যে বিভ্রান্তি ছিল সেই একই বিভ্রান্তির ফল হিসাবে এই সংজ্ঞা উদ্ভূত। অর্থাৎ জাহিলিয়্যার অর্থ অজ্ঞানতা বা বর্বরতা। তাই ইহা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি হিট্টির পরবর্তী মন্তব্যও তেমনই বিভ্রান্তিকর। তিনি তাহার এই মন্তব্যে বলিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ ঘোষণা করেন, "তাঁহার প্রচারিত নূতন ধর্ম ইতোপূর্বে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার সব কিছুরই অবসান ঘটাইবে"। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্বে যাহা কিছু ঘটিয়াছে মহানবী ﷺ উহার সকল কিছুই মুছিয়া ফেলেন নাই বরং উহার উল্টা মহানবী ﷺ -ও ইসলামে বহু প্রাক-ইসলামী (জাহিলিয়্যা নয়) ব্যবস্থা ও রীতির অনুমোদন দিয়াছেন ও বহাল রাখিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যে মিশন ও বার্তা লইয়া আসিয়াছিলেন সেগুলি বহাল রখিবার সহিত সেগুলি পরিপূর্ণ করিতেও প্রয়াসী হইয়াছেন। হিট্টির উল্লিখিত সর্বশেষ মন্তব্যটি যেহেতু স্পষ্টতই ভ্রান্ত, সেহেতু এই মন্তব্য ভিত্তিক তাহার অন্যান্য মন্তব্য, যেমন 'কোন এক ব্যক্তির ভেটোই অতীতকে বাতিল করার জন্য যথেষ্ট শক্তি ধরে না' এই মন্তব্যও অযথার্থ ও অনাহুত।

যদি 'জাহিলিয়্যা' এই টেকনিক্যাল পারিভাষিক শব্দটির অনুবাদ করিতেই হয় তাহা হইলে উহার প্রতিশব্দ হইবে ঃ 'ভুল' বা 'বিপথে চালনা'। এগুলিই সম্ভবত জাহিলিয়্যার প্রকৃত অর্থের অধিকতর কাছাকাছি হইবে। তবে এইরূপ অনুবাদ করার খুব একটা অনিবার্য প্রয়োজনীয়তাও নাই, বরং এই শব্দের ব্যবহার রীতি, কুরআন ও মহানবী ﷺ -কে এবং প্রথম দিকের মুসলমানগণ কোন কোন বিশেষ বিশ্বাস, অভ্যাস ও রীতি তথা এই সবের পরিস্থিতিকে বুঝাইবার জন্য যেভাবে শব্দটির ব্যবহার ও প্রয়োগ করিতেন সেইসব অনুসরণ করিয়াই জাহিলিয়্যার ধারণাটির যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব, কোন ঐতিহাসিক মেয়াদের বিচারে নহে। এই বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আবিসিনিয়ার শাসকের দরবারে জাফর ইব্ন আবী তালিব (রা) কর্তৃক সেখানে হিজরতকারী মুসলমানদের পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যে। তিনি তাঁহার বক্তব্যের শুরুতে বলেন, "আমরা জাহিলিয়্যার লোক। আমরা মূর্তিপূজা করিতাম, মৃত প্রাণী আহার করিতাম, ব্যভিচার ও বিবাহিত-অবিবাহিতে যৌনাচারে (ফাওয়াহিশ) লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছেদ করিতাম (কাত্'উ রাহ্ম), নিরাপত্তার জন্য স্বীকৃত নিয়মবিধি আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সবল দুর্বলকে গ্রাস করিতাম।" এই যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হইল সেগুলি জাহিলিয়্যারই বৈশিষ্ট।[৮]

অনুরূপভাবে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রশ্নে অন্যতম আদি ব্যাখ্যাকার ও মুফাসসিরকুল শিরোমণি 'আবদুল্লাহ ইব্ন্ 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, "যদি কেহ 'জাহাল' শব্দের

অর্থ বুঝিতে চাহে তাহা হইলে তাহার উচিত হইবে কুরআনের ৬ নম্বর সূরা আল-আন'আমের ১৩০ নং আয়াত পাঠ করা।[৯] এই আয়াত, বিশেষ করিয়া ১৩৬ হইতে ১৩৯ আয়াতে আরবদের বহু ঈশ্বরবাদী আচার-রীতি, কোন প্রাণীর ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা, কন্যা সন্তান হত্যা করা ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও হাদীছে ব্যবহৃত বিভিন্ন টেকনিক্যাল শব্দ সম্পর্কে অন্যতম প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ ইবনুল আছীর অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, জাহিলিয়্যার অর্থ 'এক রকমের হাল-অবস্থা বা বিরাজমান পরিস্থিতি যে পরিস্থিতির মধ্যে আরবরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ছিল'।[১০]

জাহিলিয়্যা বলিতে বিশ্বাস, অভ্যাস ও আচার-রীতি সম্পর্কিত বিরাজমান পরিস্থিতিকে বুঝায়। আর এই কারণেই জাহিলিয়্যা বলিতে কোন সুনির্দিষ্ট যুগ বা কোন নির্দিষ্ট জনসমষ্টিকে বুঝায় না। অতীতে আরবদের মাঝে জাহিলিয়্যা ছিল। এই জাহিলিয়্যা অনুরূপভাবে তাহাদের সমসাময়িক অন্যান্য অনেক জনসমষ্টির মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পরেও কোন কোন অঞ্চল ও জনসমাজে জাহিলিয়্যা অব্যাহত থাকে।[১১]

দুই ঃ ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিষয়

(ক) মুইর (Muir) -এর অভিমত পর্যালোচনা

অবশ্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল ইব্‌রাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের অভিমত। সাধারণত তাহারা স্বীকার করেন না যে, ইবরাহীম ('আ) মক্কায় আসিয়াছিলেন। তাহারা স্বীকার করেন না যে, বিবি হাজেরা ও তাঁহার পুত্র ইসমাঈল ('আ) আদৌ কখনও মক্কায় আসিয়াছিলেন, ইবরাহীম ('আ) আদৌ তাঁহাদের সেখানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন বা তিনি মক্কার কা'বাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহারা আরও দাবি করেন যে, ইসমাঈল নহেন, ইসহাককেই কুরবানী করার জন্য ইবরাহীম ('আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই অভিমতগুলিও অবশ্য প্রাচ্যতত্ত্বের মতই পুরাতন বিষয়। মুইর এই পুরাতন অভিমতগুলিকে উহাদের আধুনিক আঙ্গিক ও আকৃতি প্রদান করিয়াছেন। আর তাহার পরবর্তী লেখকগণ এই বিষয়ে প্রধানত তাহার যুক্তিতর্ক ও অনুমানগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।[১২] মার্গোলিয়থ লিখিয়াছেন, কা'বাঘরের সহিত ইবরাহীম ('আ)-এর সম্পর্কের পুরাকাহিনীটি দৃশ্যত পরবর্তী কালের কল্পনার ফল। আর এই কল্পনার কাজটি করা হইয়াছে কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজনে।[১৩] আরও যাহারা এই মতেরই আরও বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জে. ডি. বেট ও রিচার্ড বেলের নাম উল্লেখ করা যায়। বেট এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র রচনাকর্ম প্রস্তুত করেন যাহার শিরোনাম ছিল ঃ Enquiries into the Claims of Ishmael।[১৪] তিনি এই রচনায় সমুদয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ইবরাহীম ও ইসমাঈল ('আ)-এর কুরবানী সম্পর্কিত ঘটনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন কার্যত প্রায় সেই সকল কিছুরই সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। তবে রিচার্ড বেল আভাসে বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই

বিষয়ে কুরআনের আয়াতগুলি মহানবী ﷺ -এর পরবর্তী জীবনে মদীনায় অবস্থানকালে সংশোধন করা হয়।[১৫]

স্পষ্টত এই বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনা আবশ্যক। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের উদ্দেশ্যও পরিসর অনুযায়ী এই অংশে মুইরের অভিমত বিবেচনায় সীমিত থাকিবে, যে অভিমত তাহার পরবর্তী কালের লেখকরা মূলত বিশদায়ন ও পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র।

ওল্ড টেস্টামেন্টে (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) সন্নিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে মুইর বলেন, ইবরাহীম ('আ) যখন হাজেরাকে ফেলিয়া আসেন তখন হাজেরা ও তাঁহার পুত্র আরবের উত্তরে পারান নামে এক নির্জন এলাকায় বাস করিতেন।[১৬] তিনি আরও বলেন যে, "ইসমাঈলের প্রতি পার্থিব সমৃদ্ধির যে ঐশী ওয়াদা করা হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হয়। তাঁহার ১২ পুত্র ১২ জন রাজ্যশাসক তথা রাজা হন। আর তাঁহার বংশধরগণ অসংখ্য গোত্রের প্রতিষ্ঠা করে। ইসমাঈলের বংশের এইসব গোত্র, ইবরাহীম ('আ)-এর অন্যান্য গোত্র ও সমান্তরাল গোত্রসমূহ, মুইরের বর্ণনামতে, লোহিত সাগরের শেষ প্রান্ত হইতে ফোরাত নদীর মোহনা অবধি বিস্তৃত উত্তর আরবে বাস করিত"।[১৭] তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য এবং তাহার কা'বাঘর নির্মাণের সহিত জড়িত কাহিনী ইসলামের অভ্যুদয়ের অনেক আগেই আরবদের মাঝে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছিল।[১৮] তবে তাহার অভিমত এই যে, ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য ইসলামের আবির্ভাবের আগে প্রচলিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহার মতে, ইবরাহীম ('আ)-এর অনেক পরে প্রচলন লাভ করে। এই প্রসঙ্গে মুইর উল্লেখ করিয়াছেন যে, উত্তর ও মধ্য আরবের গোত্রগুলির একটা বড় অংশের উৎপত্তি ইবরাহীম বা তৎসংশ্লিষ্ট বংশ হইতে হইলেও তাহাদের ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য ইবরাহীম ('আ)-এর সময় হইতে ২০০০ বছরের সময়ের কোন প্রামাণ্য উপকরণের অস্তিত্ব নাই।[১৯] আর তাই উহার পর তিনি তাহার নিজস্ব অনুমানমূলক বিবরণ প্রদানে মনোনিবেশ করিয়াছেন।[২০]

তাঁহার অনুমান-কল্পনামূলক 'বাস্তব তথ্যাদি' নিম্নরূপ ঃ তিনি বলেন, মক্কায় অনেক আগেকার বসতকারী ছিল। তাহাদের অনেকে ইয়ামানের লোক। তাহারা সাবীয় ধর্মবিশ্বাস সঙ্গে লইয়া আসে। তাহারা পাথর ও মূর্তিপূজা করিত। আর এগুলিকে যমযম কূপের সহিত সম্পর্কিত করা হয়। কেননা এই যমযমই ছিল তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির উৎস। এই যমযমের নিকট তাহারা তাহাদের উপাসনালয় কা'বাঘর প্রতিষ্ঠা করে। সাবীয় মতবাদের প্রতীক হিসাবে কা'বাঘরের সহিত রহস্যঘেরা কৃষ্ণপ্রস্তর বা হাজারে আসওয়াদকে সম্পর্কিত করা হয়। ইহার সহিত উপর হইতে স্থানীয় আচার-রীতিগুলি আরোপিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক উপাদানগুলি আসে আরব সভ্যতার লালনভূমি ইয়ামান হইতে।[২১] পরে উত্তরাঞ্চল হইতে নাবাতীয় বা ইসমাঈলী কোন সমান্তরাল গোত্র যমযম কূপ ও বাণিজ্য কাফেলার অবস্থানের অনুকূল হওয়ার কারণে আকৃষ্ট হইয়া মক্কায় বসতি স্থাপন করে। এই গোত্রটি তাহাদের কাফেলায় ইবরাহীম ('আ)-এর কিংবদন্তী লইয়া

আসিয়া তাহা স্থানীয় পর্যায়ে প্রচলিত সংস্কার ও প্রথার সহিত জুড়িয়া দেয়। "আর ইহা হইতেই উৎপত্তি হয় কা'বায় মিশ্র ধরনের নানা দেবদেবীর পূজার এবং উহার সহিত ইসমাঈলী নানা কিংবদন্তী ও রীতিরও মিশ্রণ ঘটে। ইহারই বিরাট সুযোগ গ্রহণ করেন মুহাম্মাদ (ম্যাহোমেট)।[২২]

এই 'কল্পিত ধারণার' সমর্থনে মুইর আরও বেশ কিছু অনুমান যোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আরবে ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য ব্যাপক পর্যায়ে ও সর্বজনীনভাবে অস্তিত্বশীল ছিল। তবে ইবরাহীম ('আ)-এর সেই সুপ্রাচীন আদর্শ আরবদের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার কোন স্বতন্ত্র ও অনাপেক্ষ প্রমাণাদি কোন বিশেষ গোত্র বা কোন গোত্রের সহিত সম্পর্কিত গোত্রসমূহের মধ্যেও পাওয়া যায় না। তাই ইবরাহীমের ঐতিহ্য আরবদের হাতে আসার কোন 'সম্ভাবনা দেখা যায় না'। তাহার মতে, বরং এরকম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে, ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য ইয়াহূদীদের নিকট হইতে পরিগ্রহণ করা হয় এবং তাহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে এই ঐতিহ্যকে সঞ্জীবিত রাখা হয়।[২৩]

তিনি এরকম মত প্রকাশ করার পরপরই বলেন যে, কা'বার প্রতি এত ব্যাপক ধর্মীয় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি হইতে মনে হয়, নিশ্চয় ইহার সূচনা হইয়াছিল অতি প্রাচীন যুগে। তাই ইহাও বলিতে হয় যে, মক্কার ধর্মীয় উপাসনার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য রীতি-ঐতিহ্যও, যেমন কা'বা, উহার কৃষ্ণ প্রস্তর, কা'বাগৃহের একান্ত পবিত্র এলাকার সীমা (হারাম) ও পবিত্র মাস অনুরূপভাবে প্রাচীন।[২৪]

ইহার পর তিনি কা'বার ও কা'বা সম্পর্কিত আচার-রীতির সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণের প্রয়াসে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বরাত দিয়াছেন। হেরোডোটাস (৫ম খৃ. পূর্বাব্দ) আরবদের দেবীদের মধ্যে প্রধান দেবীর নাম আলিলাত বা আল-লাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই সুপ্রাচীন যুগেও আরবে উহা পূজা-উপাসনার এক জোরদার প্রমাণ। আলীলাত ছিল মক্কার দেবী।[২৫] অতঃপর মুইর গ্রীক লেখক ডিওডোরাস সিসিলাসের বরাত দিয়াছেন। তিনি ১ম খৃষ্ট পূর্বাব্দে লেখেন যে, আরবে 'একটি মন্দির ছিল যে মন্দিরের প্রতি সকল আরব বিশেষ শ্রদ্ধাবান'। মুইর এই বিষয়ে বলেন, এই মন্দির অনিবার্যভাবেই কা'বাগৃহ। কেননা "আমাদের এমন আর কোন মন্দিরের কথা জানা নাই যাহার বিষয়ে সকল আরব সর্বজনীনভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করে।[২৬] পরিশেষে মুইর বলিতে চাহিয়াছেন যে, মূর্তিপূজা আরবে ছিল সুপ্রাচীন ও ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত বিষয়। তিনি ইব্‌ন হিশামের (ইব্‌ন ইসহাকের) বরাত দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইয়ামান হইতে দূমা (দূমাতুল জানদাল) অবধি আরবের বিভিন্ন স্থানে, এমনকি হিরা অবধি বিক্ষিপ্তভাবে মূর্তিপূজার জন্য নিবেদিত মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। এই মন্দিরের কতকগুলি ছিল কা'বার অধস্তন মন্দির এবং এইসব মন্দিরের ধর্মীয় আচার-রীতিও ছিল মক্কার অনুরূপ।[২৭]

মুইর এইসব বাস্তব তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে বলেন, "আরবদের সংস্কার-সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলিতে ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ প্রস্তরে চুম্বন, কা'বাঘর

প্রদক্ষিণ এবং মক্কা, আরাফাতের ময়দান ও মিনায় পালনীয় অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান, পবিত্র এলাকা বা হারাম শরীফের মাহাত্ম্য ইত্যাদির সহিত ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের কোন কল্পনাযোগ্য যোগসূত্র পাওয়া যায় না কিংবা তাঁহার বংশদরদের তাঁহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা উহার সহিতও মক্কার উল্লিখিত আচার-রীতির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। তাহার মতে, এইগুলি স্থানীয় রীতি-আচার কিংবা আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্যমান মূর্তিপূজার পদ্ধতির সহিত সম্পর্কিত। এইগুলি বনূ জুরহুম বা অন্যরা তাহাদের সঙ্গে করিয়া মক্কায় লইয়া আসে, আর সেই সময়ে ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য দেশজ উপাসনার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময় হইতে প্রথমবারের মত মক্কায় কুরবানীর আচার-রীতি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। কিংবা বলা যায়, এইভাবেই ইবরাহীম ('আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত বিষয়াদি কোন না কোনভাবে মক্কাবাসীদের ধর্মাচরণের সহিত সম্পর্কিত হয়।[২৯] এইভাবে মক্কায় এই ধারাটি কায়েমি হইয়া যাওয়ার পর মক্কার বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে মধ্য আরবের বেদুঈনগণ মক্কা অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর ক্রমে ক্রমে এই ঐতিহ্যগুলি ও স্থানীয় সংস্কারগুলিও জাতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়। অবশেষে এই ধারা আরবের ধর্মে পরিণত হয়।[৩০] পরিশেষে মুইর এই মত প্রকাশ করেন যে, মহানবী ﷺ কেবল এই 'অভিন্ন ক্ষেত্রে' অবস্থান লইয়া আরবদের ব্যাপক উপাসনার সাথে ইসরাঈলের বিশুদ্ধ আস্তিক্যবাদের মধ্যে একটি সংযোগসূত্র রচনা করেন। আর এই প্রক্রিয়ায় কা'বার ধর্মীয় আচার-রীতি বহাল রাখিয়া তাহা হইতে মূর্তি উপাসনার সকল প্রবণতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।[৩১]

স্পষ্টত মুইরের এই তত্ত্ব চারটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যেমন (ক) বহু ঈশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মীয় আচার-রীতি ইসমাঈলী গোত্রগুলি মক্কায় আসার বহু আগে হইতেই সেখানে অস্তিত্বশীল ছিল; (খ) কা'বাঘরও ইহার সহিত সম্পর্কিত ধর্মীয় আচার-রীতিগুলি বহু ঈশ্বরবাদী ও সেগুলি মূলত দক্ষিণ আরব হইতে আসিয়াছে যেগুলির কোন সম্পর্ক ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের সহিত আছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না; (গ) একটি ইসমাঈলী অভিবাসী গোত্রই ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য কা'বার রীতির উপর আরোপ করিয়াছে এবং (ঘ) ইহার পর এই সংমিশ্রিত ধর্মীয় প্রথাকে আরবরা তাহাদের জাতীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

মুইর যেসব বাস্তব তথ্য ও যুক্তি-তর্কের সমাবেশ করিয়াছেন সেগুলি অবশ্য তাহার তত্ত্বের এই চারটি অনুমানের সমর্থক নয়। প্রথম অনুমানটির ব্যাপারে মুইর তিনটি বাস্তব তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত তিনি বলিয়াছেন, ৫ম খৃস্ট-পূর্বাব্দের গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বর্ণিত আরবীয় দেবী আল-ইলাত (Alilat)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। মুইর বলিয়াছেন, হেরোডোটাস সুনির্দিষ্টভাবে মক্কার কথা বলেন নাই। তাহার মতে, আল-ইলাত দেবী এবং মক্কার (প্রকৃতপক্ষে তায়েফের) সুপরিচিত দেবী আল-লাত মূলত একই দেবী। এখানে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে এই মর্মে যে, হেরোডোটাস প্রকৃতপক্ষে উত্তর আরব প্রসঙ্গে ঐসব উক্তি করিয়াছেন।

আর যদি তাহার ঐ বিবরণকে মোটামুটি গোটা আরব উপদ্বীপ সম্পর্কিত বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয় এবং আল-লাত একই দেবী বলিয়া গ্রহণও করা হয় তাহা হইলেও সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খৃস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহার অর্থ মুইরের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এই সময়টি ইবরাহীম ('আ)-এর ১৫০০ বৎসর পরের।

মুইরের দ্বিতীয় বাস্তব তথ্য অনুযায়ী, খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর লেখক ডিওডোরাস সিসিলাস আরবদের সর্বজনীনভাবে পূজনীয় এক "মন্দিরের" কথা বলিয়াছেন। মুইর সঠিকভাবেই এই মন্দিরটিকে কা'বাঘর বলিয়াছেন। কিন্তু সিসিলাসের এই সাক্ষ্য কালের বিচারে আমাদিগকে আরও পিছনে লইয়া গিয়াছে অর্থাৎ আমরা খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে উপনীত হইয়াছি।

মুইরের তৃতীয় বাস্তব তথ্য এই যে, বহু ঈশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদী মন্দিরগুলি গোটা আরবের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ছিল। তাহার এই বাস্তবতা উল্লেখের সূত্র হইল ইব্ন হিশাম (প্রকৃতপক্ষে ইব্ন ইসহাক)। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, ইব্ন হিশাম তথা ইব্ন ইসহাক মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের আগেকার আমলের বিরাজমান অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক বা অন্য কোন প্রামাণ্য সূত্র প্রচ্ছন্ন অর্থেও ইহা বলিতে চাহেন নাই যে, জাহিলিয়্যা পরিস্থিতি স্মরণাতীত কাল হইতে বিরাজমান ছিল। তাই মুইরের উল্লিখিত কোন বাস্তব তথ্যই আমাদেরকে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে লইয়া যাইতে পারে না। এই কথাও বলা যায় না যে, মক্কায় ইসমাঈলী গোত্রসমূহের অভিবাসী হওয়ার যে কথা উল্লেখ করা হয় তাহা এত পরে অর্থাৎ পঞ্চম খৃস্ট-পূর্বাব্দের মত সময়কালে বা উহার আরও পরে ঘটে। মুইর নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইসমাঈল ('আ)-এর অন্যতম পুত্র কেদারের বংশধররা উত্তর ও মধ্য আরবে সংখ্যায় এতই বিপুল হইয়া উঠে যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে কথিত ইয়াহূদীরা ঐসব অঞ্চলের আরব গোত্রগুলিকে সাধারণত কেদারীয় বলিয়া উল্লেখ করিত।[৩২]

আধুনিক সমালোচকদের মতে, খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পরে লেখা নয়, এমন অস্তিত্বশীল ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হইয়াছে, জাহিলিয়্যা পরিস্থিতি মক্কাসহ মধ্য ও উত্তর আরবে পূর্ব হইতেই বহু কাল ধরিয়াই বিরাজমান ছিল। তাহাদের মতে, ঐসব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে ইসমাঈলী গোত্রগুলির ছড়াইয়া পড়ার সময় হইতে এই পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। ইসমাঈলী গোত্রগুলি তাই বলা যায় যে, অবশ্যই তাহারা খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর আগেই মক্কায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

মুইরের দ্বিতীয় অনুমান ছিল, 'কা'বাঘর ও কা'বার ধর্মীয় আচার-রীতিগুলি বহু ঈশ্বরবাদী। মক্কার অধিবাসীরা মূলত দক্ষিণ আরব বা ইয়ামানের লোক। ইবরাহীম ('আ)-এর সহিত তাহাদের কোন যোগসূত্র নাই'। বিষয়টি কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু তাহার এইসব ধারণা সঠিক তো নয়ই, বরং বিভ্রান্তিকরও বটে। কা'বা ও ইহার ধর্মীয় রীতি-আচরণ মুইরের মত অনুযায়ী অবশ্যই সুপ্রাচীন। ইহা সন্দেহাতীত। তিনি এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু তাই

বলিয়া উহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, কালের দিক হইতে কা'বাঘর ও উহার ঐতিহ্য ইবরাহীম ('আ)-এর পূর্বের কিংবা এগুলির আদি উৎপত্তি দক্ষিণ আরবে। কা'বার আদি উৎস দক্ষিণ আরবে ইহা প্রমাণের জন্য তিনি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করেন নাই। যদি ইয়ামানে অস্তিত্বশীল কোন কিছুর অনুকরণে কা'বা ও উহার রীতিসমূহের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াই থাকিত, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে মূল মন্দিরের অন্তত কিছু নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইত কিংবা প্রাচীন বিবরণে উহার উল্লেখ থাকিত। আর উহা সত্য হইয়া থাকিলে গোড়ার দিকে মন্দিরটির গুরুত্ব ও মর্যাদা মক্কার কথিত অনুকরণমূলক কা'বাঘর অপেক্ষা অনেক বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু এরকম প্রাচীন ও মাহাত্ম্যসম্পন্ন কোন মন্দিরের অস্তিত্ব ইয়ামান কিংবা আরবের অন্যত্র কোথাও ছিল বলিয়া কোন সূত্রে, এমনকি প্রাচীন গ্রীক লেখকদের লেখা হইতেও জানা যায় না।

ডিওডোরাসের লেখায় যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ রহিয়াছে সেগুলিতে ফিরিয়া আসি। তিনি আরবে সর্বজনীন পর্যায়ে মান্য ও শ্রদ্ধাভাজন একটিমাত্র মন্দিরের কথাই বলিয়াছেন। ইহার মত বা ইহা অপেক্ষা মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠতর মন্দিরের কথা তিনি বলেন নাই। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে গোটা আরব জুড়িয়া বিভিন্ন স্থানে মূর্তিপূজা ভিত্তিক কয়েকটি মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। ইব্ন ইসহাক এইসব মন্দিরের বর্ণনা দিয়াছেন। মুইরও এইসব মন্দিরের কথাই বলিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে আব্রাহার ইয়ামানী 'কা'বা'ও রহিয়াছে। তবে এইসব মন্দিরের সবগুলিই মক্কার কা'বাঘরের পরবর্তী কালে ও মক্কার কা'বার অনুকরণেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইহার পরে, পূর্বে নহে। মুইর তাই স্পষ্টত ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া দিয়াছেন এই মর্মে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া যে, মক্কার কা'বা মূলত ঐসব মন্দিরেরই অন্যতম মন্দির। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ঐসব মন্দির ছিল কা'বার অধস্তন প্রতিষ্ঠান। আর উহাদের "ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের রীতিও মক্কার আচার-অনুষ্ঠানের অনুরূপ"।

বাস্তবিকপক্ষে এইসব মন্দিরের কোনটিই কা'বা ঘরের তুলনায় প্রাচীন নহে। আর আরবরাও মনে করে না যে, এইসব মন্দিরের কোনটি কা'বার সমান প্রাচীনত্ব এবং মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের দাবিদার। এই বাস্তবতাই এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, মন্দিরগুলি আসলে কা'বার অনুকরণে স্থাপন করা হইয়াছিল, মন্দিরগুলি দেবদেবীর অধিষ্ঠাস্থল হিসাবে স্থাপন করা হইয়াছিল এবং মন্দিরগুলির দেবদেবীও স্বাভাবিক কারণেই মক্কার কা'বায় ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীরই অনুরূপ ছিল। এই মন্দিরগুলির অনুকরণ করিয়া কা'বায় দেবমূর্তি স্থাপন করা হয় নাই। ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য লেখকের এই বিষয়ের বিবরণেও এরূপ পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে।

বহুকাল আগে হইতেই আরবের চতুর্দিকের দেশগুলিতে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কা'বাঘর মূলত মূর্তিপূজামূলক একটি মন্দির ছিল বলিয়া মূইর যে দাবি করিয়াছেন উহা প্রমাণ করিতে হইলে আরও যে কিছু আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দরকার—মুইর তাহা উপস্থাপন করেন নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা কেবল আমাদেরকে

পুনরায় সেই খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লইয়া গিয়াছে যাহা নূতন কিছু নহে। ইহা করিয়াই তিনি প্রচ্ছন্ন অর্থে বলিতে পারেন না যে, কা'বাঘর পঞ্চম খৃস্ট-পূর্বাব্দ বা এরকম সময়ে নির্মিত হইয়াছিল।

মুইর স্বীকার করিয়াছেন যে, আরবের ইসমাঈলী গোত্রগুলি আগে হইতেই "আল্লাহ্ সম্পর্কে অবগত" ছিল। আসলেও এইসব জ্ঞান তাহাদের ছিল। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইসমাঈলী গোত্রগুলি ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হইলেও তাহারা বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রভু হিসাবে আল্লাহ্কে ভুলিয়া যায় নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় যে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আরবরা কা'বা ঘরকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছে। অন্য সব ধর্মস্থল বা মন্দির একেক নির্দিষ্ট দেবদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত হইলেও, যেমন আল-লাত, আল-উয্যা, আল-ওয়াদ্দ-এর মন্দির বলিয়া অভিহিত করিলেও, কা'বাগৃহ কখনও কোন দেবতা বা দেবীর নামে সম্বোধিত হয় নাই। এমনকি কুরায়শদের গোত্র-দেবতা হুবালের নামেও কা'বাকে কখনও সম্বোধন করা হয় নাই। কা'বা যদি আদিতে সত্যই কোন দেব-দেবীর নামে নির্মিত হইত তাহা হইলে কা'বা শরীফের সহিত ঐ দেব বা দেবীর নাম জড়িত থাকিত। ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না যে, ইসমাঈলী গোত্রগুলি পরবর্তী কালে যে সময়ে কা'বা 'মন্দির' ও কা'বার রীতি-বিশ্বাসের উপর ইবরাহীম ('আ)-এর রীতি-বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে চাপাইয়া দিয়াছে তখন সেই দেব বা দেবীর নাম মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। যখন ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের সহিত কা'বার কথিত সমন্বয় করা হয় তখনই কা'বা সম্পর্কিত মূর্তির নামও জুড়িয়া দেওয়াই হইত বরং যুক্তির দিক হইতে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কা'বার মূর্তিপূজার সহিত সম্পর্কিত কথিত আদি পরিচয় প্রমাণ করার প্রয়াসে মুইর বলিয়াছেন যে, 'আরবের স্থানীয় বিশ্বাস ও সংস্কার ছিল সাবায়ী। তাহারা মূর্তি ও জোতিষ্ক বা নক্ষত্র পূজা করিত। আর এইসবই মক্কার ধর্মের সহিত সম্পর্কিত'।[৩৩] ইহা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। মুইর আরবের যে ধর্মীয় পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই আরবের বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। তবে সেগুলি যুগপৎ একই সময়ে ও সর্বত্র সমানভাবে প্রচলিত ছিল না। সাবায়ী ধর্মমত ও এই ধর্মের আওতায় নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্ক পূজা প্রচলিত ছিল দক্ষিণ আরবে। তবে এই ধর্ম কিভাবে বা কেমন করিয়া মক্কার ধর্মের সহিত সম্পর্কিত ছিল মুইর তাহা দেখান নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন, ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগের দিকে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে ইয়ামানে পশু বলি দেওয়া হইত। আর সাতবার কা'বা প্রদক্ষিণের বিষয়টি সম্ভবত সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথ আবর্তনের প্রতীকী কল্পনায় করা হইয়া থাকিবে।[৩৪]

ইয়ামানে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে পশু বলিদানের বিষয়টিকে কিভাবে মক্কার ধর্মের সহিত সম্পর্কিত করা যায় উহা বোধগম্য নহে। মক্কার কাফিরগণ অবশ্য তাহাদের দেব-দেবীর

উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কোন প্রকারেই কখনও সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্র পূজার অঙ্গ হিসাবে সেই বলি দিত না। দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পশু, এমনকি নরবলি দেওয়ার প্রথাটি এমনকি ইবরাহীম ('আ) তাঁহার সন্তানকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবানী দিতে মনস্থ করার ঘটনার আগেও বহু প্রাচীন জাতির লোকজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চয় কেহ এমন কথা বলিবে না যে, ঐ প্রাচীন লোকদের কিংবা ইবরাহীম ('আ)-এর কুরবানী সাবায়ী রীতির প্রতীক মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে সাবায়ী মতবাদ কথাগুলির উদ্ভব ঘটিয়াছে সাবীয়দের মধ্য হইতে। ইতিহাসে যাহাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সাধারণত কা'বাঘর প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক যে কাল সাধারণত নির্দেশ করা হইয়া থাকে উহারও বহু কাল পরে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, জ্যোতিষ্ক পূজা প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সাবীয় মতবাদ বলিতে গেলে কার্যত হেলেনীয় মতবাদেরই দক্ষিণ আরবীয় বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নহে।

মুইরের এই বক্তব্য আরও বিস্ময়কর যে, 'কা'বাঘর সাতবার প্রদক্ষিণের বিষয়টি সম্ভবত সৌরমণ্ডলীয় গ্রহের কক্ষপথ আবর্তনের প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত'। কেননা এমন কোন আভাস কোথাও পাওয়া যায় না যে, সাবীয় বা অন্য কোন জ্যোতিষ্ক পূজক প্রাচীন জাতি তাহাদের জ্যোতিষ্ক পূজার অংশ হিসাবে কোন বস্তুকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিত। আর প্রাচীন মক্কাবাসী বা অন্যরা 'গ্রহের কক্ষ আবর্তনের বিষয় সম্পর্কে জানিত' এই ধারণাও একান্ত অমূলক। যদি উহাই হইয়া থাকে, যদি মক্কাবাসীর আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানই থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আদৌ জ্যোতিষ্ক পূজা করিত না।

আরবে মূর্তিপূজা কেন্দ্রিক মন্দিরের অস্তিত্বের বর্ণনা দিয়াছেন ইব্ন ইসহাক। তাহার বর্ণনামতে, মক্কা হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার সময় ইসমাঈলী গোত্রগুলি কা'বা ঘরের কিছু পাথর তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। উহার উল্লেখ করিয়া মূর্তিপূজা ও পাথর পূজা সম্পর্কে মুইর বলেন, পাথর পূজার এই ব্যাপক প্রবণতা হইতে সম্ভবত কা'বাগৃহে কৃষ্ণ প্রস্তর সম্পর্কিত সংস্কারের উদ্ভব ঘটিয়া থাকিবে।[৩৫] ইতোপূর্বে বর্ণিত মুইরের সাক্ষ্য কোনভাবেই ইহা প্রমাণ করে না যে, আরবের মূর্তিপূজামূলক মন্দির এবং উহার সহিত সম্পর্কিত পাথর বা পাথরের তৈরী মূর্তিপূজার প্রচলন কা'বার আগে নির্মিত ও প্রচলিত হইয়াছিল। মুইর আরও নিদারুণ ভুল করিয়াছেন এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া যে, কা'বার কৃষ্ণ প্রস্তর পাথর পূজারই প্রতীক। কৃষ্ণ প্রস্তরের উৎপত্তি যেখানেই হউক কিংবা আরবে পাথর পূজার আদি উৎপত্তি যাহাই হউক, প্রাক-ইসলামী আরবে মক্কা বা আরবের আর কোথায়ও কৃষ্ণ প্রস্তরটিকে পূজা করিতে দেখা যায় নাই।

কৃষ্ণ প্রস্তরে চুম্বনের বিষয়টিকে প্রস্তর পূজা বলা যায় না। ইহা কার্যত কা'বাগৃহ বা ইহার আশপাশ প্রদক্ষিণ করার সূচনা মাত্র। আর এই তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণের কাজটি কা'বা গৃহের বা ইহার আশেপাশে অধিষ্ঠিত কোন সুনির্দিষ্ট দেবতার জন্য করা হয় না। আল্লাহ্র ঘর প্রদক্ষিণের

জন্যই কেবল ইহা একান্ত ও সর্বতোভাবে করা হইয়া থাকে। আর ইহাই হইল ইসলামের আবির্ভাবের আগে ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য ও মূর্তিপূজামূলক রীতি-আচারের অদ্ভুত সহাবস্থানের একমাত্র নজীর। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ধর্মীয় পরিস্থিতি ঠিক অনুরূপ ছিল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ইবরাহীম ('আ) এক দেশ হইতে অন্য দেশ সফরকালে তাঁহার রীতিই ছিল যেখানেই তিনি যাত্রাবিরতি করিতেন সেখানেই আল্লাহ্র উপাসনার উদ্দেশ্যে একটি স্থান চিহ্নিত করিতেন (ওল্ড টেস্টামেন্টের ইংরেজি ভাষ্য অনুযায়ী an altar unto God বা আল্লাহ্র উপাসনার জন্য উদ্দিষ্ট চত্বর)।[৩৬] এই উপাসনার স্থানগুলি প্রস্তরের প্রতীকে চিহ্নিত। এই ক্ষেত্রে পাথরগুলি যে স্তম্ভের আকারে নির্মাণ করা হইত তাহা বাইবেলের আদিপুস্তক ২৮ ঃ ১০ ও ১৮-২২-এর বর্ণনায় স্পষ্ট। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইয়াকূব ('আ) যখন বিরশেবা হইতে হানান সফরে যান তখন তিনি রাত্রে একটি জায়গায় যাত্রাবিরতিমূলক অবস্থানকালে একটি পাথরখণ্ড বালিশ হিসাবে মাথার নিচে রাখিয়া শয়ন করিতেন। পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি উহা দিয়া একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার উপর তৈল ঢালিয়া দিতেন। আর ঐ স্তম্ভের স্থানটিকে তিনি Beth-El (আল্লাহ্র ঘর) নামে অভিহিত করিতেন। তিনি আরও ঘোষণা করিতেন, "এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি যে জায়গায় উহা হইবে 'ঈশ্বরের গৃহ'।[৩৭]

প্রকৃতপক্ষে এই পাথর ছিল কার্যত অনেকটাই ভিত্তিপ্রস্তর। এই ধরনের পাথর বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ঐসব স্থানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনালয় স্থাপন। কা'বা গৃহের কৃষ্ণ প্রস্তরও এই ধরনেরই একটি প্রস্তরখণ্ড যাহা দিয়া ইবরাহীম ('আ) আল্লাহ্র গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩৮] কা'বার কৃষ্ণ প্রস্তর পাথর পূজার প্রতীক যেমন নহে, তেমনি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব ('আ) আল্লাহ্র উপাসনার জন্য প্রস্তর স্থাপনের কারণে পাথর পূজারী হইয়া গিয়াছেন—কোনভাবেই ইহা কল্পনা করা যায় না।

কা'বা ঘরের সহিত সম্পর্কিত আচার-রীতিগুলির সহিত ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য কিংবা তাঁহার বংশধরদের যেসব নীতি তাঁহার নিকট হইতে পাইবার কথা সেগুলির সহিত কা'বার আচার-রীতির কোন অনুমানযোগ্য সম্পর্ক নাই, এই গোঁড়া ও অন্ধ বক্তব্য একান্তই ভ্রান্ত। কৃষ্ণ প্রস্তর, ইহার সহিত ইবরাহীম ('আ) এবং সেসব ধ্যান-ধারণা, আচার-রীতি ও নীতি যাহা কিছু ইবরাহীম ('আ)-এর বংশধরদের তাঁহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবার কথা সেগুলির সম্পর্ক ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত সাক্ষ্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আর পশু কুরবানীর প্রথাটিও ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের সহিত একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে ইবরাহীম ('আ)-এর অভিপ্রায়ের বিষয়টি ওল্ড টেস্টামেন্ট ও কুরআনে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত আছে।

এখানেও ইবরাহীম ('আ)-এর ধর্মীয় আচার-রীতি ও মূর্তিপূজকদের আচার-রীতির সহাবস্থান লক্ষণীয়। অবিশ্বাসী তথা আরব কাফিরগণ বিভিন্ন স্থানে দেব-দেবীর বেদীতে পশুবলি দিত ঠিকই,

কিন্তু তাহারা হজ্জের সময় মিনায় যে পশু উৎসর্গ করিত উহা একান্তভাবেই ইরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যে। ইহা সাধারণভাবে কোন বিশেষ বা সকল দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান নহে। আর মিনা বা আরাফাতে এমন কোন দেব-দেবীর বেদীও ছিল না এইসব বলির জন্য। বাস্তবিকপক্ষে হজ্জের সময় মিনায় অবস্থান বা আরাফাতে অবস্থান এবং সেই সময়ে কুরবানী দেওয়ার কাজটি কোন বিশেষ দেবদেবী বা একাধিক দেবদেবীর জন্য করা হইত না। এখানকার আচার-অনুষ্ঠান পরিচালিত হইত একান্ত বিশুদ্ধভাবে ইবরাহীম ('আ)-এরই ঐতিহ্যে।

কুরবানীর বিষয়ে মুইরের মন্তব্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি সাবীয় ধর্মমত ও মক্কার ধর্মমতের সঙ্গে কল্পিত সম্পর্ক দেখানোর প্রয়াসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'অনেক পরে অর্থাৎ খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর দিকে ইয়ামানের অধিবাসীরা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে বলি দিত।' কিন্তু যখন তিনি ইঙ্গিত দিতেছেন যে, ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য ইসমাঈলী বংশধর গোত্রগুলি কা'বা ও কা'বায় প্রচলিত কথিত ধর্মীয় আচার-রীতির সহিত জুড়িয়া দিয়াছে, তখন এই কথাও বলিয়াছেন যে, কুরবানী ও অন্যান্য প্রথা এই প্রথমবারের মত প্রবর্তিত হইল কিংবা অন্তত এইসব রীতি-প্রথার সহিত ইবরাহীম ('আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত।[৩৯] মুইরের এই মন্তব্য বাস্তবিকপক্ষেই তাঁহার তত্ত্ব বা মতবাদের দুর্বলতার স্বীকারোক্তি বিশেষ। তিনি এই বক্তব্যে ইহাও স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, "কুরবানী ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার-রীতিও ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের সহিত একান্তই সম্পর্কিত"।

মুইরের তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তব্য, যেমন "ইবরাহীমের ঐতিহ্য আগে হইতে মক্কায় প্রচলিত মূর্তিপূজামূলক আচার-রীতি কা'বার রীতির সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মক্কায় পরবর্তী কালে বসতি স্থাপনকারী ইসমাঈলী একটি গোত্র এই কাজটি করে। আর এই ঐতিহ্য আরও পরবর্তী কালে 'ক্রমান্বয়ে' আরব গোত্রগুলি গ্রহণ করে। কারণ মক্কার বাণিজ্যিক প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির কারণে এইসব আরব গোত্রের লোক মক্কায় আসিয়া বসতি স্থাপন করে"।

মুইরের উপরিউক্ত যুক্তি আরও অধিক যুক্তিবিবর্জিত ও উদ্ভট। কেননা এই দুই অনুমানই তাহার অন্য একটি বক্তব্যের বিরোধী। মুইরের সেই বক্তব্যটি এই যে, "কা'বার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি এতই ব্যাপক ছিল যে, উহা দৃষ্টে ধরিয়া লওয়া যায়, কা'বার রীতি-প্রথাগুলির সূচনা নিশ্চয়ই অতি প্রাচীন কালে হইয়া থাকিবে।"[৪০]

আর ইহাও উল্লেখ করিবার বিষয় যে, মুইর যেমন একদিকে আগে হইতে কা'বা ঘরের অস্তিত্বের কথা ও তথায় ব্যাপক ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা বলিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যের অস্তিত্বের কথাও বলিয়াছেন। তাহার বক্তব্য অনুযায়ী, ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আচার-রীতি পরবর্তী কালে কা'বার মূর্তিপূজা ভিত্তিক রীতি-প্রথার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহাতেও উহার অসঙ্গতি ও

সমস্যা দূর হয় না। আরব গোত্রগুলি যদি সুপ্রাচীন কাল হইতেই কা'বা ও কা'বার রীতি-প্রথাগুলি ব্যাপকভাবে মানিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহারা ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যমূলক আচার-রীতিগুলি কেবল ইবরাহীমের নামেই এত সহজে তাহাদের সনাতন রীতির সহিত যোগ করিয়া লইবে ইহা আর যাহা হউক স্বাভাবিক নয়। অথচ ঠিক ইহাই হইল মূলত মুইরের প্রতিপাদ্য। ইসমাঈলী গোত্রের লোকজন মক্কায় বসবাসের জন্য আসিয়া সেখানকার ধর্মীয় ব্যবস্থায় ইবরাহীম ('আ)-এর নাম বসাইয়া দিল বলিয়া ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্য মক্কায় চালু হইয়া গেল, মুইর ইহা বলিতে চাহিয়াছেন; বরং এই সম্ভাবনাই প্রবলতর যে, ইসমাঈলী গোত্রের এই ধরনের অসঙ্গত প্রয়াসে মক্কায় সর্বজনীন পর্যায়ে আপত্তি উঠিবারই কথা। এই আপত্তি ও বাধা আসার কথা মক্কার মূর্তিপূজক জনসম্প্রদায় ও আরব গোত্রগুলির তরফ হইতে।

মুইর এই সমস্যাটি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। আর সেই কারণেই তিনি একদিকে এই বাস্তবতা ভিত্তিক তথ্য মানিয়া লইয়াছেন যে, উত্তর ও মধ্য আরবের গোত্রগুলি উৎপত্তির দিক হইতে সাধারণভাবে ইবরাহীম ('আ)-এর বংশোদ্ভূত। কারণ ইয়াহূদী ও ওল্ড টেস্টামেন্ট তাহাদেরকে ইবরাহীম ('আ)-এর পুত্র ইসমাঈলের পুত্র কায়দার বা কেদারের বংশধর হিসাবে উল্লেখ করিয়া থাকে। অন্যদিকে তিনি তাহার মতবাদকে এই পরিস্থিতিতে একটি ভিত্তি দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এই বক্তব্য দিয়া যে, "ইবরাহীম ('আ)-এর সহিত রক্তের সম্পর্কের স্মৃতি তাঁহার সেই অতি পুরাতন যুগ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণের ধারায় কোন বিশেষ গোত্র বা 'গোত্র সমবায়ে' উত্তরিত হইয়াছে, এমনটি 'সম্ভব' নহে"। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে, মুইর বলিয়াছেন, "বরং এই সম্ভাবনাই অধিক যে, ইবরাহীম ('আ)-এর ঐতিহ্যগত ধারণা ইয়াহূদীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের সহিত মাঝে মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া ধারণাটিকে উজ্জীবিত রাখা হইয়াছে"।[৪১]

বস্তুত সেমিটিক আরবদের মত স্বীকৃত এক রক্ষণশীল জনসমাজ অন্য সকল জনসমাজের তুলনায় বেশী করিয়াই তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে না, এমন সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেননা তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের বংশলতিকা পিছনে বহু কাল অবধি স্মৃতিতে সযত্নে ধারণ করিয়া রাখে। সেই তাহারাই কা'বা ঘরের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনে ও উহার আচার-রীতিগুলি পালনে অবিচল থাকিবে এবং একই সাথে ইবরাহীম ('আ) হইতে তাহাদের উৎপত্তির সত্যিকারের বাস্তবতা ভুলিয়া যাইবে, ইহা সম্ভব নহে। কোন সঞ্জীবিত ঐতিহ্যের ইহা স্বভাব নহে যে, ইহা কোন বিশেষ গোত্র সমবায়ের কোন স্বতন্ত্র সাক্ষ্য-প্রমাণের ধারা হিসাবে উত্তরিত হইবে। বরং এই ধরনের ঐতিহ্যের উত্তরণ বা হস্তান্তর ঘটিয়া থাকে বংশ হইতে বংশানুক্রমে "জনস্মৃতি ও শ্রুতি দ্বারা, কোন বিশেষ গোত্র বা গোত্র সমবায়ের স্মৃতি বা সাক্ষ্য দ্বারা নহে"।

মুইরের মত কাল্পনিকভাবে ইহাও বলা ঠিক নহে যে, আরবরা ইবরাহীম ('আ) থেকে তাহাদের উৎপত্তির কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার স্মৃতি 'ইয়াহূদীদের' নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিয়াছে

এবং তাহাদের সহিত মাঝে মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া সেই স্মৃতিকে 'উজ্জীবিত' রাখিয়াছে। কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী তাহাদের পূর্বপুরুষকে ভুলিয়া গেলে তাহারা অন্তত আরেক জনসমাজের পূর্বপুরুষকে মানিয়া লইতে পারে না। বলা বাহুল্য সেই কারণটি মুইর নিজেই বলিয়াছেন, এই মানিয়া লওয়ার কাজটি কোন স্বতন্ত্র ও আরও সাক্ষ্য-প্রমাণের ধারা-ছাড়া সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহূদীদের সহিত মধ্য ও উত্তর আরবের আরব উপজাতিগুলির যোগাযোগ কেবল 'কখনও কখনও যোগাযোগের' বিষয় ছিল না। খৃস্টীয় যুগ শুরুর আগের গোটা সময় বরাবর উত্তর ও মধ্য আরবের ইয়াহূদী ও কেদারীয় গোত্রগুলির লোকদের একে অন্যের মধ্যে নিরন্তর যোগাযোগ ছিল। আর তাহারা তাহাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ('আ) সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং সেই স্মৃতি রক্ষা করিয়া চলিত। তবে সে যাহা হউক, এইসব প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াও আমরা যদি মুইরের বক্তব্য আগাগোড়া অনুসরণ করি, তাহা হইলেও ইহা ধরিয়া লওয়া একান্ত যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, ইয়াহূদীরা যদি কোন সময়ে হইলেও আরব উপজাতির লোকজনকে সাধারণ পূর্বপুরুষ ও মহাপিতা ইবরাহীম ('আ) হইতে তাহাদেরকে উৎপত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় তাহারা তাহাদের বলিয়া থাকিবে যে, ইবরাহীম ('আ) বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং আগে হইতে (কল্পিত) অস্তিত্বশীল কা'বা ও তাহার রীতি-প্রথার সহিত ইবরাহীম ('আ)-এর কোন সম্পর্ক নাই। তাহা হইলে তেমন আরবজাতির লোকেরা ইবরাহীমকে কা'বা ও ইহার রীতি-প্রথার সহিত সম্পর্কিত করিত না, ইবরাহীম যে তাহাদেরই পূর্বপুরুষ এমনকি ইহা মনে করাইয়া দিলেও।

কিন্তু মুইরের বিবরণ ও অন্যান্য সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী যেহেতু আরব উপজাতিগুলি ইসলামের আবির্ভাবের আগে বহু কালই কা'বার রীতি-আচারের সহিত ইবরাহীম ('আ)-কে সম্পর্কিত রাখিয়াছে সেহেতু মুইরের বক্তব্যের সাধারণ অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যায়, ইয়াহূদীরা যখন আরবদেরকে ইবরাহীম ('আ)-এর সহিত তাহাদের সম্পর্কিত কথা মনে করাইয়া দিয়াছে তখন ইহাও নিশ্চয় বলিয়া থাকিবে যে, কা'বাঘর ও ইহার সহিত সম্পর্কিত ধর্মীয় রীতি-আচার ইবরাহীম ('আ) হইতেই উদ্ভূত।

মুইরের প্রস্তাব বা বক্তব্যের অযৌক্তিকতার এখানেই শেষ নহে। তিনি বলেন যে, "ইসমাঈলী গোত্র যখন মক্কায় বসতি স্থাপন করিতে আসে তখন তাহাদের কাফেলায় তাহারা ইবরাহীম ('আ) সম্পর্কিত জনশ্রুতিমূলক ঐতিহ্যও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। তারপর তাহারা সেই জনশ্রুতি স্থানীয় সংস্কার ও বিশ্বাসে আরোপ করে"। এমনি করিয়া মুইরের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, ইসমাঈলী গোত্রগুলি যখন মক্কায় বসতি স্থাপন করিতে আসে তখনও কিন্তু উহারা ভুলিয়া যায় নাই যে, তাহারা ইবরাহীম ('আ)-এর বংশ হইতে উদ্ভূত। তাই সঙ্গতভাবেই ইহার সহিত আরও যোগ করা যায় যে, তাহারা নিশ্চয়ই এই বাস্তবতাও বিস্মৃত হয় নাই যে, ইবরাহীম ('আ) বহু ঈশ্বরবাদী ছিলেন না। কাজেই নিশ্চয় এমন অবস্থায় তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিকে পূর্ব হইতে অস্তিত্বশীল (মনে করা হয়) বহু ঈশ্বরবাদী কা'বা ও ইহার রীতি-আচারের সহিত সম্পর্কিত

করিয়া অপবিত্র করিবে না। ইহা আরও বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, কা'বা ও ইহার প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-প্রথার প্রতি আরবরা বহু কাল হইতেই সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল। এই অবস্থায় আরব উপজাতিগুলির সহিত যদি তাহাদের মিশিয়া যাইবার উদ্দেশ্যই থাকিত কিংবা উদ্দেশ্য উহার বিপরীত হইত তাহা হইলে তাহারা সেই ক্ষেত্রে স্বভাবতই ইবরাহীম ('আ)-এর স্মৃতিকে নেপথ্যে ফেলিয়া রাখিয়া বরং কা'বার রীতি-আচার যে রকম রহিয়াছে ঠিক হুবহু সেইভাবেই গ্রহণ করিত। কারণ এরকম কিছু করায় তাহাদের হারাইবার কিছুই ছিল না। ইহাতে যেমন তাহারা তাহাদের বসতিচ্যুত হইত না, তেমন মক্কার লাভজনক ব্যবসায়ের সুবিধাও হারাইত না। কিন্তু যেহেতু তাহারা উহা করে নাই, বরং তাহারা ইবরাহীম (আ) হইতে উদ্ভূত কা'বাঘর ও কা'বার রীতিপ্রথা যেমন প্রচলিত মানিয়া লয় তাহারা তাহাদের উদ্ভব ইবরাহীম হইতে এই সত্য স্মৃতিতে ধরিয়া রাখুক বা না রাখুক আরও যেহেতু আরব গোত্রগুলিও ইবরাহীম হইতে উদ্ভূত কা'বা ও কা'বার রীতি-প্রথাগুলি গ্রহণ করে ইবরাহীমের শাখা তথা ইয়াহূদীদের সঙ্গে তাহাদের বরাবরের যোগাযোগ রক্ষা করে, সেহেতু স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত কেবল ইহাই হইতে পারে যে, তাহারা উহা করে এই কারণে যে, তাহারা জানিত কা'বা ও কা'বার রীতি-আচারগুলি ইবরাহীম হইতে উদ্ভূত। কাজেই একটি ইসমাঈলী গোত্রের পরবর্তী কালে মক্কায় যাইয়া বসতি স্থাপন সম্পর্কিত মুইরের তত্ত্বের এই যৌক্তিক বিশ্লেষণ, তাহার অন্যান্য ধারণা ও অনুমান এবং যেসব বাস্তবতার কথা তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সেগুলির আলোকে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য তাহা হইল, কা'বা ও উহার রীতি-আচারগুলি ইবরাহীম (আ) হইতে উদ্ভূত।

(খ) ওল্ড টেস্টামেন্টের সাক্ষ্য-প্রমাণ

মুইরের আলোচিত উল্লিখিত তত্ত্ব ও অনুমানগুলির ভিত্তি হইল জেনিসিস (আদিপুস্তক) ২১ ঃ ২১ সন্নিবেশিত তথ্যাদি। মুইর বলিয়াছেন, 'আবরাহাম যখন হ্যাগারকে আরবের উত্তরে পারানের নির্জন প্রদেশে তাহার পুত্রসহ ছাড়িয়া আসিলেন'।[৪২] জেনেসিস-এর উল্লিখিত অনুচ্ছেদটিতে কেবলমাত্র বলা হইয়াছে, 'ইসমাঈল ও তাহার মাতা পারানের নির্জন ভূমিতে বাস করেন'। 'আরবের উত্তরে' কথাগুলি মুইরের নিজের। তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন অন্যান্য খৃস্টান লেখক ও বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ পারান বলিয়া যে অঞ্চলকে নির্দেশ করিয়াছেন বোধগম্য কারণেই তাহাদের ঐ বর্ণনার ভিত্তিতে। ওল্ড টেস্টামেন্টের তিন জায়গায় অন্যান্য ঘটনা প্রসঙ্গে পারানের উল্লেখ রহিয়াছে।[৪১] কিন্তু এই তিন জায়গায় কোথাও পারান নামটি বলিতে উহা ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা স্পষ্ট নহে। তাই জেনেসিস-এর ২১ ঃ ২১-এ উল্লিখিত পারান, যেখানে হাজেরা (রা) ও ইসমাঈল (আ) বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার সঠিক অবস্থান নির্দেশের উপর 'তাঁহারা কোথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন' সেই প্রশ্নের উত্তর নির্ভরশীল।

মুইরের এই রচনা প্রকাশের অল্পকাল পরেই এই বিষয়টি লইয়া বাস্তবিকপক্ষে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন সায়্যিদ আহমাদ খান বাহাদুর।[৪৪] তবে যেহেতু সে সময়ের পর হইতে যুক্তিতর্ক এই যাবত আর তেমন বেশি অগ্রসর হয় নাই সেহেতু সায়্যিদ আহমাদ খান এই ব্যাপারে

যে প্রধান বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করিয়াছেন সেগুলির একটি পর্যালোচনা এবং উহাতে প্রসঙ্গের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য কিছু বাস্তব তথ্য ও বিষয় যোগ করা তাৎপর্যবহ বিবেচিত হইতে পারে। তিনি এই বাস্তবতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন যে, প্রারম্ভিক যুগের মুসলিম ভূগোলবিদগণ পারান নামের তিনটি স্থানের কথা বলিয়াছেন। প্রথম নির্জন স্থান হইল, মক্কা আজ যেখানে অবস্থিত ও উহার সন্নিহিত কিছু পার্বত্য এলাকা। দ্বিতীয়টি হইল, মিসরের পূর্বাঞ্চলের একটি গ্রাম বা আরব পেত্রা। তৃতীয়টি হইল সমরকন্দের একটি জেলা।[৪৫]

তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, খৃস্টান ও বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ পারানের তিনটি ভিন্ন পরিচয় নির্দেশ করিয়াছেন। এগুলির মধ্যে একটি অভিমত অনুযায়ী, "বিরশেবার উত্তর সীমা হইতে মাউন্ট সিনাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত" এক বিশাল অঞ্চল। দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী, বিরশেবা ও পারান অভিন্ন, ইহার আরেক নাম ছিল কাদেশ। তৃতীয় অভিমত ছিল, 'সিনাই পর্বতের পশ্চিম ঢালে অবস্থিত নির্জন অঞ্চল।[৪৬]

প্রথম দুইটি স্থান নির্দেশ স্পষ্ট ভ্রান্ত। কারণ ওল্ড টেস্টামেন্টের খোদ বিবরণ হইতে পরিষ্কার দেখা যায়, পারান একটি স্পষ্টত ভিন্ন এলাকা যাহা খুব বিশাল কোন নির্জন অঞ্চল নহে, যাহা প্রথম স্থানটির বেলায় বলা হইয়াছে। আবার বিরশেবা বা কাদেশ[৪৭] হইতে এই বর্ণনা ভিন্ন। পারানের তৃতীয় স্থাননির্দেশ যাহার আওতায় পারান সিনাই পর্বতের পশ্চিম ঢাল এলাকায় পড়ে, এই স্থান নির্দেশের সাথে এক মুসলিম ভৌগোলিকের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। মুসলিম ভৌগোলিকদের বর্ণনা অনুযায়ী এই পারান ছিল তাঁহাদের উল্লিখিত তিন পারানের অন্যতম। কিন্তু যতদূর সম্ভব এই এলাকাটি অন্তত ঐ সময়ে পারান বলিয়া পরিচিত ছিল না। কেননা মূসা (আ) যখন ইসরাঈলীদের লইয়া মিসর হইতে সিনাই গিয়াছিলেন তখনও এই যাত্রার বর্ণনায় পারান নামের কোন স্থানের উল্লেখ তিনি করেন নাই, যদিও তিনি ঐ একই এলাকার মধ্য দিয়াই অতিক্রম করেন। খুব সম্ভব এলাকাটি মূসা (আ)-এর ঐ অভিযাত্রার পরবর্তী কালে পারান নাম ধারণ করে। আর তাহার কারণ, তখন সেখানে বানূ ফারান নামে এক কাহ্তানী গোত্র বসতি স্থাপন করে।[৪৮]

এই তিন স্থানের কোনটিই অবশ্য হাজেরা ও ইসমাঈলের বসতিস্থল হইতে পারে না। কেননা প্রথমত, ঐ অঞ্চল বা এলাকাগুলির কোনটিতেই এমন কোন জনশ্রুতি বা ঐতিহ্য নাই যাহাতে বলা হইয়াছে ঐ জায়গার কোন একটাতে হাজেরা ও ইসমাঈল বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, মূসা ('আ) ও তাঁহার অনুসারীরা সিনাই হইতে আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা 'তাবেরাহ', 'কিবরোথথাত্তাওয়া' ও 'হাযেরোথ" অতিক্রম করার পর পারানের নির্জন প্রদেশে যাত্রাবিরতি করিয়াছিলেন।[৪৯] কিন্তু ঠিক কোন পথ ধরিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন উহা স্পষ্ট নহে। খোদ খৃস্টান পণ্ডিতগণ কমপক্ষে পাঁচটি ভিন্ন দিকে তাহাদের যাত্রার কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু তাহারা ইসমাঈলের বংশধরেরা "শুর হইতে হবিলা অবধি বা আরব উপদ্বীপ—মিসর সীমান্ত হইতে ফোরাত নদীর মোহনা" পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু

তাহারা ঐ সিদ্ধান্ত দিয়াছেন ভুলবশত। কেননা জেনেসিস ২৫ ঃ ১৮-তে যাহার পরিচয় 'হবিলা' নামে উল্লেখ আছে উহা আসলে ধ্বনিগত কিছুটা মিলের ভিত্তিতে বাহরায়েন দ্বীপপুঞ্জের আভাল বা আউওয়ালকে হবিলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সায়্যিদ আহ্‌মাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হবিলা আসলে ইয়ামানের কাছাকাছি ১৭° ৩০ উত্তর অক্ষাংশ ও ৪২° ৩৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। ইহার নামকরণ হয় যোকতান (কাহতান)[৫০]-এর হাভলা নামক এক পুত্রের নামে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, "ইসমাঈলীরা ইয়ামানের উত্তর সীমান্ত হইতে সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই অঞ্চলটির নাম হেজায। আর ইহাই কথিত পারানের সহিত অভিন্ন যাহার কথা মুসলিম ভৌগোলিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।[৫১] ইহা আরও উল্লেখযোগ্য যে, আর. কিউয়েনেন সম্পাদিত ও লুগদুনি বাটাভোরাম-এ ১৮৫১ সালে প্রকাশিত সামারিটান পেন্টাটিউক-এর আরবী ভাষ্যের এক টীকায় বলা হইয়াছে যে, ফারান ও হিজায এক ও অভিন্ন অঞ্চল।[৫২]

তৃতীয়ত, জেনেসিস ২১ ঃ ১৪-১৫-এর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পরপর দুইটি অনুচ্ছেদ এক ও অভিন্ন উপলক্ষের কথা প্রকৃতপক্ষেই বর্ণনা করিতেছে না। জেনেসিস ২১ ঃ ১৪-র বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, হাজার (হাজেরা) বিরশেবার নির্জন প্রান্তরে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই নয় যে, হাজেরা বিরশেবাতেই ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, তাহার বেশি দূর আর অগ্রসর হন নাই। জেনেসিস ২১ ঃ ১৫-তে বলা হইয়াছে, "পাত্রের পানি শেষ হইয়া গিয়াছিল আর তিনি তাঁহার পুত্রকে একটি ঝোপের নিচে রাখিয়া দেন।" এই বিবৃতি দ্বারাও ইহা বুঝায় না যে, পাত্রে যে পানি লইয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই 'পানিই' এইভাবে নিঃশেষিত হইয়া গেল যাহার জন্য তিনি তাহার 'পুত্রকে একটি ঝোপের নিচে শয়ন করাইয়া রাখিয়া যাইতে' বাধ্য হন। বিরশেবা এমনই এক স্থান যাহা তাঁহার সুপরিচিত। কেননা ইবরাহীম ('আ) তাঁহাকে লইয়া সেখানে দীর্ঘকাল বসবাস করেন। এই বিরশেবা অঞ্চলে বেশ কিছু পানির কূপও ছড়াইয়া ছিটাইয়া ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তি এই কূপগুলি খনন করিয়াছিল। বিরশেবার কূপটি স্বয়ং ইবরাহীম ('আ) খনন করেন। কাজেই সব কূপের কথা হাজেরার না জানা থাকিবার কথা নহে। তাই অল্প সন্ধান করিলেই এলাকার অনেকগুলি কূপের যে কোন কূপ হইতে তিনি আরও পানি পাইতেই পারিতেন। বাস্তবিকপক্ষে ওল্ড টেস্টামেন্টের লেখকরা এখানে দুইটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একের পর এক অনুচ্ছেদে হাজেরার দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য ঘোরাঘুরির কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোরাঘুরি শুরু হইয়াছিল বিরশেবায় ও ইহার শেষ পর্যায়টি ছিল এমন এক স্থানে যেখানে কোন পানি ছিল না কিংবা তাঁহার পাত্রে পানি পূরণের ব্যবস্থাও কোনভাবে করা যাইতেছিল না। তাই এমন চরম দুর্দশা ও হতাশার মধ্যে পড়িয়া তিনি তাঁহার শিশু ইসমাঈলকে একটি ঝোপের কাছে ফেলিয়া রাখেন। বস্তুত তাঁহার স্থান হইতে স্থানান্তর গমনের কাল ও স্থানের দিক হইতে দুইটি ভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে পর পর ঘন সন্নিবিষ্ট দুইটি অনুচ্ছেদে।

চতুর্থত, যে কারণ ও পরিস্থিতিতে হাজেরা ও ইসমাঈলকে তাহাদের গৃহ হইতে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং যাহার বিবরণ ওল্ড টেস্টামেন্টে রহিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, সারাহ ও ইবরাহীম ('আ) যেখানে বাস করিতে থাকেন সেখান হইতে তাহারা বেশ অনেক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া যান। জেনেসিস-এর বর্ণনা অনুযায়ী, সারার ইচ্ছা ছিল, ইসমাঈল যেন তাহার নিজ পুত্র ইসহাকের সহিত অংশীদার হিসাবে ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী না হন। তাই জেনেসিসের বিবরণ অনুযায়ী ইহা ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা যে, ইসমাঈল ('আ) ও তাঁহার বংশধরগণ আরেক বসতি স্থাপন ও তাহাদের বংশ বিস্তার করিবে। জেনেসিসে অত্যন্ত প্রাণবন্ত চিত্রবৎ বর্ণনা রহিয়াছে এই বিষয়টির এইভাবে ঃ

১১. "এই কথায় অব্রাহাম আপন পুত্রের বিষয়ে অতি অসন্তুষ্ট হইলেন"।

১২. "আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, ঐ বালকের বিষয়ে ও তোমার ঐ দাসীর বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইও না; সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহার সেই কথা শুন; কেননা ইসহাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে"।

১৩. "আর ঐ দাসীপুত্র হইতেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব, কারণ সে তোমার বংশীয়"।

১৪. "পরে অব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া রুটি ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাগারের স্কন্ধে দিয়া বালকটীকে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন" ইত্যাদি।[৫৩]

কাজেই জেনেসিসের বর্ণনা হইতে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বস্তুতপক্ষে সারার ইচ্ছাক্রমে নহে, বরং সুনিশ্চিতভাবে ইহা ছিল মহান আল্লাহ্র পরিকল্পনা। তিনিই ইসমাঈলের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়াছিলেন ইবরাহীমকে। তিনিই ইবরাহীমকে নির্দেশ দিয়াছিলেন হাজেরা ও ইসমাঈলকে ভিন্ন দেশে নির্বাসনে পাঠাইতে। ইবরাহীমকে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, "কেননা ইসহাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে"। ইহা ছিল একাধারে ঈশ্বরের তরফ হইতে ইবরাহীমের জন্য সান্ত্বনা, সেইসাথে এই আশ্বাসও যে, ইসমাঈলের নির্বাসনের অর্থ ইবরাহীমের বংশধারার অবসান কিংবা সঙ্কোচন নহে। জেনেসিস-এর এই বর্ণনা, "ইসহাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে" বলিতে ইহা বুঝাইয়াছে যে, ইবরাহীম ('আ) ঐ সময়ে 'যেখানে ছিলেন সেখানে' ইসহাকের মাধ্যমে তাঁহার বংশবৃদ্ধি চলিতে থাকিবে। অন্যদিকে জেনেসিসের অন্য বর্ণনায় এই বাস্তব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে যে, "ইসমাঈল ইবরাহীমের রক্তের ধারক, তবে তাঁহার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিবে ও উহা একটি জাতিতে পরিণত হইবে, তবে তাহা এখানে নহে, অন্য একটি অঞ্চলে"। ঈশ্বরের এই পরিকল্পনার একান্ত প্রাকৃতিক কারণে (আর ইসমাঈলকে তাঁহার পিতার সম্পত্তি হইতে আলাদা রাখিবার সারার ইচ্ছাটিও ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি অংশ) হাজেরা ও ইসমাঈল তাই বিরশেবা ও সিনাইয়ের কোন এক অঞ্চলে বসতি করিবেন তাহা হইতে পারে না। কেননা বিরশেবা ও সিনাই ছিল একান্তভাবেই ইবরাহীম ও সারার কর্মতৎপরতার অঞ্চলগত আওতার মধ্যে। আর তাই হাজেরা ও ইসমাঈলকে অনেক দূরে ও নির্জন বসতিহীন স্থানে পাঠানোই বিধির

পূর্বনির্ধারিত বিধান। জেনেসিস-এ পারান/ফারানের উল্লেখ আছে হাজেরা ও ইসমাঈলের বসতিস্থল হিসাবে। কিন্তু উল্লিখিত কারণেই পারান আর যাহাই হউক খৃস্টান পণ্ডিতদের কল্পনা-অনুমান অনুযায়ী বিরশেবা ও সিনাইয়ের আশপাশে কোথাও হইতে পারে না।

পঞ্চমত, হাজেরা ও ইসমাঈলের বসতির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জেনেসিস ২১-এ একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, হাজেরা যখন একান্ত নিরুপায় ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং ইসমাঈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাঁদিয়া উঠিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাদের আকুতিতে সাড়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে জেনেসিসে বলা হইয়াছে ঃ

১৭. "তখন ঈশ্বর বালকটীর রব শুনিলেন; আর ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে ডাকিয়া হাগারকে কহিলেন, হাগার তোমার কি হইল? ভয় করিও না, বালকটী যেখানে আছে, ঈশ্বর তথা হইতে উহার রব শুনিলেন"।

১৮. "তুমি উঠিয়া বালকটীকে তুলিয়া তোমার হাতে ধর; কারণ আমি উহাকে এক মহাজাতি করিব"।

১৯. "তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন, তাহাতে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইল, আর তথায় গিয়া কুপাতে জল পুরিয়া বালকটিকে পান করাইল"।[৫৪]

এমনি করিয়া আল্লাহ হাজেরা ও ইসমাঈলের জন্য তাঁহারা যেখানে ছিলেন সেখানে একটি পানির কূপের ব্যবস্থা করিলেন (ঈশ্বর শিশুটির রব শুনিলেন যেখানে সে ছিল)। হাজেরাকে কূপটি বাহির করার জন্য আশেপাশে দৃষ্টি ফেলিতে কিংবা দূরে হাঁটিয়া গিয়া সন্ধানও করিতে হয় নাই। "ঈশ্বর তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন" অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহার চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দিলে তিনি (হাজেরা) পানির একটি কূপ দেখিতে পাইলেন। ইহা কোন সাময়িক স্বস্তির বিষয় ছিল না। ইহা ছিল ঈশ্বরের পক্ষ হইতে মাতা ও শিশুর জন্য বিশেষ উপহার যাহা হইবে তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকার ও বসতি করার অবলম্বন। ইহা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ইসমাঈলকে দিয়া একটি জাতি গড়ার জন্য তাঁহার অঙ্গীকার। ঈশ্বর প্রদত্ত পানির কূপটি বিরশেবা বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের কোন কূপ হইতে পারে না কেবল এই কারণে যে, এইসব কূপের কথা ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখ নাই, বরং উল্টা ওল্ড টেস্টামেন্টের অত্যন্ত স্পষ্ট বর্ণনায় বলা আছে যে, এই কূপগুলি মানুষের হাতে তৈরী। ইহা ছাড়াও স্থানীয় এমন কোন জনশ্রুতির অস্তিত্ব নাই যাহাতে বলা হইয়াছে, এখন বা অতীতে কোন সময়ে ওখানে ঐশ্বরিক কারণে সৃষ্ট কোন কূপের অস্তিত্ব ছিল। বিরশেবা অঞ্চলের কোন কূপের সহিত হাজেরা ও ইসমাঈলকে প্রদত্ত ঐশ্বরিক কূপটিকে অভিন্ন করিয়া শনাক্ত করার যে কোন প্রয়াস তাই জেনেসিসে স্পষ্ট করিয়া উক্ত কথা ও অনুচ্ছেদগুলির বক্তব্যের সরাসরি পরিপন্থী। তাই নিশ্চিতভাবে কূপটি কা'বা ঘরের পাশে অবস্থিত যমযম কূপ ছাড়া আর অন্য কোন কূপই হইতে পারে না। হাজেরা ও ইসমাঈলের আমল হইতেই এই কূপ ইসমাঈলের বংশধর ও যাহারা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছে উহাদের জন্য পানির স্থায়ী উৎস হিসাবে বিদ্যমান ছিল। ইহাতে

কেবল একবার স্বল্পকালের জন্য ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে যখন কিছু লোক যমযম কূপটিকে কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ করিয়া দেয়।

সর্বশেষে মক্কার নামকরণ প্রসঙ্গ। কুরআনে মক্কাকে বাক্কা বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫৬] এই বাক্কার উল্লেখ বাইবেলের দাউদের গীতসংহিতা (Psalm of David)-এও রহিয়াছে, আর সেই সাথে কূপেরও উল্লেখ রহিয়াছে। ৮৪ ঃ ৬ চরণে বলা হইয়াছে ঃ "Who passing through the velly of Baca make it a well; the rain also filleth the pools".

"তাহারা বাকা উপত্যকা দিয়া গমন করিয়া তাহা পানির কূপে পরিণত করে; বৃষ্টির পানিতেও নানা জলাধার পূর্ণ হইয়া যায়"।

উল্লিখিত অনুচ্ছেদে 'বাকা' শব্দটি স্পষ্টত কুরআনে উল্লিখিত 'বাক্কা', আর যে কূপের কথা বলা হইয়াছে তাহা যমযম কূপ বৈ আর কিছুই নহে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভূগোল ও ইতিহাস সংক্রান্ত প্রাচীন লেখাগুলিতে মক্কায় প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা হইবার উল্লেখ রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যটি আধুনিক কালেও যে একেবারে অপরিচিত তাহা নহে। ফলে বাইবেলে যে জায়গাটি এইভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহা নিটোলভাবেই মক্কা ছাড়া আর কোন স্থানই হইতে পারে না। বলা হইয়াছে—"বৃষ্টির বারিধারাও জলাধারসমূহ পূর্ণ করিয়া থাকে"।

তাই জেনেসিসের বর্ণনায় কতিপয় বিভ্রাট সত্ত্বেও কুরআনে যেসব মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রহিয়াছে উহা ও অন্যান্য ইসলামী বর্ণনার সহিত জেনেসিসের বর্ণনার সামঞ্জস্য রহিয়াছে।[৫৭] এইসব বর্ণনা সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করে যে, ঐশ্বরিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার আওতায়ই হাজেরা ও ইসমাঈল ('আ) মক্কায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

(গ) ইসমাঈল বা ইসহাক ('আ)?

ইবরাহীম ('আ)-এর সহিত কা'বাঘর ও ইহার আচার-অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নাই, প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ ইহা (তাহাদের উক্ত মনগড়া বিশ্বাস) প্রমাণিত করার জন্য হাজেরা ও ইসমাঈল ('আ)-এর মক্কায় বসতি স্থাপনের বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করেন। তাহারা ইহাও অস্বীকার করেন যে, ইবরাহীম ('আ) ইসমাঈলকে কুরবানী দিতে মনস্থ করেন নাই। তাহারা ইহাও বলিতে চাহিয়াছেন এই বক্তব্যকে পোক্ত করার জন্য যে, ইসহাকই হইতেছেন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত শিশু ও ইসহাকই কেবল ঐশ্বরিক আনুকূল্যের পাত্র। কিন্তু ইসমাঈলীরা ইসলামের বহু কাল আগেই যে মক্কা ও সাধারণভাবে গোটা আরবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, এই অনস্বীকার্য সত্য ও বাস্তবতার সম্মুখীন হইয়া প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের মক্কা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ইসমাঈলীদের পরবর্তী কালে তথায় গমনপূর্বক বসতি স্থাপনের তত্ত্ব হাজির করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে সমান অবিসংবাদিত বাস্তবতা যে, ইসমাঈলের বংশধরগণ সত্যই ঈশ্বরের অঙ্গীকার অনুযায়ী ব্যাপক বংশবিস্তার করিয়া এক বিরাট জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—ইহার মুকাবিলায় প্রাচ্যবিদগণ আশ্রয় লইয়াছেন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ

তত্ত্বের। আর এই অবকাশে বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ ও সেই সাথে প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণও বলিতে চাহিয়াছেন যে, ঈশ্বর ইসমাঈলের অনুকূলে যে পার্থিব সমৃদ্ধির অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা ইসমাঈলের ১২ পুত্র ও তাহাদের অসংখ্য বংশধরদের মাধ্যমে পূরণ হইয়াছে। কিন্তু ইসহাকই কেবল ছিলেন ঈশ্বরের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় আশীর্বাদের উদ্দিষ্ট। প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের এই বক্তব্য ছাড়াও তাহারা যে ইসমাঈলকে ইবরাহীমের উদ্দিষ্ট কুরবানীর বস্তু করার বিরোধিতা করিয়াছেন উহার প্রধান অবলম্বন হইতেছে জেনেসিস ২২, বিশেষ করিয়া ২২ ঃ ২-এর বক্তব্য।

'পার্থিব' ও 'আধ্যাত্মিক বিষয়'এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য আসিয়াছে মূলত 'সাম্রাজ্য' ও প্যাপাসির (পোপতন্ত্র, যাজকতন্ত্র) মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধ্যান-ধারণা হইতে। এই তত্ত্ব বা ধারণা অনুযায়ী, পার্থিব বা জড়জাগতিক বিষয় সম্রাটের এখতিয়ারাধীন, আর আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের এখতিয়ার হইতেছে ঈশ্বর বা পোপের রাজ্য। 'সাম্রাজ্য ও প্যাপাসির এই দ্বৈততা, ইহাই ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মূলে সক্রিয়। এই ধারণার ভাল দিক যাহাই থাকুক না কেন, ইহার কট্টর অনুসরণ ও ইতিহাসের ঘটনাবলীর বাস্তবতার নিরিখে ইবরাহীমের পুত্রদের সহিত সেই অস্পষ্ট আদিম অতীতে ঈশ্বর কী নির্ধারণ করিয়াছিলেন তাহার প্রয়োগ ঘটা সম্ভব ছিল না।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার সবকিছু ওল্ড টেস্টামেন্টের বিবরণ অনুযায়ী প্রমাণিত হয় নাই। সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলিতে ভাসা ভাসা দৃষ্টিপাত করিলেও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ইসমাঈল ও ইসহাক উভয়কেই আল্লাহ একই অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছিলেন। সেখানে এমন কিছুই নাই যাহাতে বলা হইয়াছে, আল্লাহ ইসহাকের ব্যাপারে এমন অঙ্গীকার করেন যাহা তাঁহার পূর্ববর্তী ইসমাঈলের ব্যাপারে করেন নাই; বরং ওল্ড টেস্টামেন্টের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি সতর্কতার সহিত পাঠ করিলে দেখা যাইবে, ইসমাঈলের প্রতি আল্লাহ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার সেই অঙ্গীকারের কয়েকবার পুনরুক্তি করিয়াছেন, এমনকি ইসহাকের জন্মের পরেও। ইহা তাই বোধগম্য নহে যে, বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ কোথা হইতে এমন ধারণা পাইলেন যে, ইসমাঈলকে কেবল পার্থিব উন্নতির অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, আর ইসহাক পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় অঙ্গীকার পাইয়াছিলেন।

এখানে দুই-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্মের বহু কাল আগে ইবরাহীম ('আ) তাঁহার বংশধরদের বিষয়ে আল্লাহ্র রহমত করিয়াছিলেন। জেনেসিস, ১২ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

১. "সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈত্রিক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল"।

২. "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবে"।

৩. "যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে"।

৪. "পরে অব্রাম সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে যাত্রা করিলেন; এবং লোটও তাহার সঙ্গে গেলেন। হারণ হইতে প্রস্থান কালে অব্রামের পঁচাত্তর বৎসর বয়স ছিল"।[৫৮]

হাজেরা যখন ইসমাঈল ('আ)-কে গর্ভে ধারণ করেন তখনও প্রভুর সেই অঙ্গীকার আরও সুনির্দিষ্ট ভাষায় কয়েকবার পুনরাবৃত্ত করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ ইসমাঈলের নাম রাখেন। এই সম্পর্কিত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুচ্ছেদটির (১৬ ঃ ১০-১১) পাঠ নিম্নরূপ ঃ

১০. "সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও বলিলেন, আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি করিব যে, বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে"।

১১. "সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইশ্মায়েল (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবে, কেননা সদাপ্রভু তোমার দুঃখ শ্রবণ করিলেন"।[৫৯]

তৃতীয়ত, আল্লাহ্র এই অঙ্গীকারটি হইয়াছিল রহমত প্রদর্শনের অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করিয়া। এই রহমত প্রদান করা হইয়াছিল ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে, ইসহাকের জন্মের বহু পূর্বে। ঐ সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল ৯৯ বৎসর ও ইসমাঈলের ১৩ বৎসর। এই অঙ্গীকারটি সম্পাদিত ও চূড়ান্ত হয় প্রতীকী খৎনার মাধ্যমে। ইবরাহীম ও ইসমাঈল ('আ) এই আনুষ্ঠানিকতাও পালন করেন ইসহাকের জন্মের আগে। আর সেই উপলক্ষে ও সময়ে আল্লাহ পিতা অবরামের নাম আবরাহামে (ইবরাহীম) পরিবর্তিত করেন। এই বিষয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের পাঠ (আদিপুস্তক, অধ্যায় ১৭) নিম্নরূপ ঃ

১. অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন ও কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও। ২. আর আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, ও তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব। ৩. তখন অব্রাম উবুড় হইয়া পড়িলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন, দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবে। ৫. তোমার নাম অব্রাম (মহাপিতা) আর থাকিবে না, কিন্তু তোমার নাম অব্রাহাম (বহু লোকের পিতা) হইব; কেননা আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করিলাম। ৭. আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব। ৯. ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমিও আমার নিয়ম পালন করিবে, তুমি ও তোমার ভাবী বংশ পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবে। ১০. তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক

পুরুষের ত্বকচ্ছেদ হইবে। ২৪. অব্রাহামের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদন কালে তাঁহার বয়স নিরানব্বই বৎসর। ২৫. তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদন কালে তাহার বয়স তের বৎসর। ২৬. সেই দিনেই অব্রাহাম ও তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েল, উভয়ের ত্বকচ্ছেদ হইল। ২৭. আর তাঁহার গৃহজাত এবং পরজাতীয়দের নিকটে মূল্য দ্বারা ক্রীত তাঁহার গৃহের সকল পুরুষেরও ত্বকচ্ছেদ সেই সময়ে হইল"।[৬০]

এইভাবে ইবরাহীম ও তাঁহার বীজ ইসমাঈলের সহিত আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়। আর ঐ অঙ্গীকার মোহরাঙ্কিত করা হয় ইসহাকের জন্মের আগে প্রতীকী খৎনার মাধ্যমে। বাস্তবিকপক্ষে, ঐ উপলক্ষে আল্লাহ ইবরাহীম ('আ)-কে সারার গর্ভে তাঁহার আরও এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন এবং বলেন যে, তাহার সহিতও অঙ্গীকার করা হইবে। এখন এই সম্পর্কিত জেনেসিস-এর মূল পাঠটি লক্ষ্য করুন ঃ [৬১]

১৫. আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা (রাণী) হইল। ১৬. আর আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের (আদিমাতা) হইবে, তাহা হইতে লোকবৃন্দের রাজগণ উৎপন্ন হইবে। ১৯. তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইসহাক (হাস্য) রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। ২১. কিন্তু আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে সেই ইসহাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থাপন করিব (আদিপুস্তক, ১৭ অধ্যায়)।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, উল্লিখিত অনুচ্ছেদে ঈশ্বরের বাণীগুলিতে বলা হইয়াছে, "আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব" (অর্থাৎ ইসহাক, জেনেসিস ১৭ ঃ ১৯) এবং "সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই ইসহাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থাপন করিব" (জেনেসিস ১৭ ঃ ২১)। এই বাণীগুলি ঈশ্বর ইবরাহীম ও তাঁহার বংশধরের সঙ্গে যে চুক্তি আগেই করিয়াছেন উহারই পুনরুক্তি প্রকৃতির। কেননা আরও বলা হইয়াছে ঃ "তাঁহার পরে বংশপরম্পরায় এক চিরস্থায়ী অঙ্গীকারের জন্য" যাহা উল্লিখিত অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে (অর্থাৎ জেনেসিস ১৭ ঃ ৭, ৯-১১)। জেনেসিস ১৭ ঃ ১৯ ও ২১-এর বর্ণনাগুলিতে আল্লাহ কর্তৃক ইবরাহীম ('আ)-কে প্রদত্ত এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, ইসহাক ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকেও ঐ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে যে অঙ্গীকার ইতোমধ্যে ইবরাহীম ও তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের সহিত চূড়ান্ত হইয়াছিল তাঁহাদের উভয়েরই একই দিনে খৎনার মাধ্যমে। তাই এই বিবৃতিগুলিকে কোনভাবেই এই অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে না যে, আল্লাহ ইবরাহীম ও ইসমাঈলের সহিত অঙ্গীকার বাতিল করিয়া দিয়াছেন অথবা তিনি ইবরাহীমের সহিত আগে সম্পাদিত অঙ্গীকার বাতিল বা সংশোধন করিয়া ইসহাকের সহিত নূতন করিয়া অঙ্গীকার

করিতেছেন। ইহা ছাড়া আরও তিনটি বিষয় হইতে ইহা পরিষ্কার যে, উল্লিখিত বিবৃতিগুলির অর্থ ইসহাকের সহিত সম্পাদিত অঙ্গীকারের প্রশ্নে ধারাবাহিকতা ও সম্প্রত্যয় মাত্র। বিষয় তিনটি হইল ঃ

(ক) ইসমাঈল ('আ) ও তাঁহার বংশধরদের বেলায় যে অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে ইসহাকের জন্মের পর;[৬২]

(খ) ইসহাক ('আ)-এর জন্মের পর ইবরাহীম ('আ) তাঁহার জন্মের ৮ম দিবসে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার খৎনা করিয়া কেবল তাহাকে ঐ অঙ্গীকারের আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন;[৬৩]

(গ) আর ইহার পর এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র অঙ্গীকার অতঃপর একান্তভাবে ইসহাক ও তাঁহার বংশধরদের ক্ষেত্রেই বুঝিতে হইবে। ইসহাকের জন্ম ও অঙ্গীকারে তাঁহার অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পাঠ নিম্নরূপ ঃ

১. "পরে সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে সারার তত্ত্বাবধান করিলেন; সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, সারার প্রতি তাহা করিলেন। ২. আর সারা গর্ভবতী হইয়া ঈশ্বরের উক্ত নিরূপিত সময়ে অব্রাহামের বৃদ্ধকালে তাঁহার নিমিত্ত পুত্র প্রসব করিলেন। ৩. তখন অব্রাহাম সারার গর্ভজাত নিজ পুত্রের নাম ইসহাক, হাস্য, রাখিলেন। ৪. পরে ঐ পুত্র ইসহাকের আট দিন বয়সে অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহার ত্বকচ্ছেদ করিলেন। ৫. অব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়" (আদিপুস্তক, ২১ অধ্যায়)।[৬৪]

এইভাবে ইসহাককে আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁহার জন্মের ৮ম দিবসে খৎনা সম্পন্ন করার মাধ্যমে ইবরাহীমের সহিত ইতোমধ্যে যে অঙ্গীকার সম্পন্ন হইয়াছিল সেই 'অঙ্গীকার'-এর আওতায় আনার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। জেনেসিস বা অন্য কোথাও এমন কিছুই নাই যাহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ইসহাকের সহিত পৃথক ও একান্ত কোন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বা তাঁহার পিতার সহিত ইতোপূর্বে যে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল উহা বাতিল বা সংশোধন করা হইয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে ইহাই একমাত্র অঙ্গীকার যাহা আল্লাহ ইবরাহীমের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং এই অঙ্গীকারের আওতায় ইবরাহীম ও তাঁহার প্রথম পুত্র ইসমাঈলের অঙ্গীকারের আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে তাঁহাদের পিতা-পুত্রের একই সাথে একই দিনে খৎনা সম্পন্ন হইয়াছিল। অন্যদিকে ইসহাকের খৎনা হইয়াছিল এক বৎসর পরে, তাঁহার জন্মের পর। ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্য যে সমান ও একই ঐশী প্রতিশ্রুতি ও আশিস ছিল তাহা নিম্নে উল্লিখিত বর্ণনাগুলি হইতেও পরিষ্কার হইবে ঃ

(১) ইবরাহীমের কোন পুত্রসন্তান জন্মিবার আগেই তাঁহাকে পুত্রসন্তানের ঐশী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়;

(ক) "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব......এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে" (জেনেসিস, ১২ ঃ ২-৩)।

(খ) "আমি তোমার বংশকে এই দেশ (কন্নান) দিব" (জেনেসিস, ১২ ঃ ৭)।

(গ) "আর তাঁহার বংশধরগণ হইবে আকাশের তারকারজির মতই অসংখ্য" (দ্র. জেনেসিস, ১৫ ঃ ৫)।

(ঘ) ঈশ্বর ইবরাহীমকে বলিলেন ঃ "মিসরের নদী অবধি মহানদী, ফরাত নদী পর্য্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম" (জেনেসিস, ১৫ ঃ ১৮)।

(২) ইসমাঈলের জন্মের পর ও অঙ্গীকার প্রদানের সময় যখন আল্লাহ ইবরাহীমকে প্রতিশ্রুতি দান করেন ঃ

"আর তুমি এই যে কনানদেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব" (জেনেসিস, ১৭ ঃ ৮)।

(৩) ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্মের পর, উভয়ের কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ ছাড়াই আল্লাহ ইবরাহীম ('আ)-কে প্রতিশ্রুতি দেন ঃ

"...আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব এবং তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব..... আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে...." (জেনেসিস, ২২ ঃ ১৭-১৮)।

(৪) ঈশ্বর আশীস দিলেন ঃ

হাজারকে (জেনেসিস, ১৬ ঃ ১০-১১);

সারাহকে (জেনেসিস, ১৭ ঃ ১৫-১৬);

(৫) ঈশ্বর একটি পুত্র সন্তানের শুভ সংবাদ দিলেন---

হাজারকে (জেনেসিস, ১৬ ঃ ১০-১১);

সারাহকে (জেনেসিস, ১৭ ঃ ১৬-১৯);

(৬) ঈশ্বর নাম দিলেন ঃ

ইস্মায়েল (জেনেসিস, ১৬ ঃ ১১);

ইসহাক (জেনেসিস, ১৭ ঃ ১৯);

(৭) ঈশ্বর বংশবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিলেন...

হাজারকে (জেনেসিস, ১৯ ঃ ১০);

সারাহকে (জেনেসিস, ১৭ ঃ ১৬);

(৮) ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি---

ইসমাঈলকে ঃ "আমি তাহাকে ফলবান করিয়া, তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব" (জেনেসিস, ১৭ ঃ ২১)।

“আমি উহাকে এক মহাজাতি করিব” (জেনেসিস, ২১ ঃ ১৮; আরও দ্র. জেনেসিস, ২১ ঃ ১৩)।

ইসহাককে ঃ এমন ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি নাই।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে ইহা পরিষ্কার যে, উল্লিখিত সদৃশ প্রতিশ্রুতিগুলি করা হইয়াছিল ইসমাঈল ও ইসহাক উভয়কেই। আর উভয়কেই ইবরাহীমের সহিত আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিতে সমানভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইসব বর্ণনায় এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে, ইবরাহীমের কেবল জ্যেষ্ঠ ও প্রথম পুত্রকে সাময়িকভাবে আশিসপুষ্ট করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। আর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাককে পার্থিব ও পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার রহমতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে যেসব ঘটনার বর্ণনা যে বিন্যাসে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিভাত হইয়াছে ঃ

প্রথমত, আল্লাহ ইবরাহীমের সহিত যখন অঙ্গীকার করেন তখন ইবরাহীমের বয়স ছিল ৯৯ ও তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের বয়স ১৩। দ্বিতীয়ত, এই অঙ্গীকার সম্পাদনের পরেই আল্লাহ ইবরাহীমকে সারার গর্ভে তাঁহার আরও এক পুত্রের সুসংবাদ দিলেন।

এই দুইটি বিষয় কুরআনে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে বলা হইয়াছে, আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম ('আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁহার সহিত অঙ্গীকার করেন যখন তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই পরীক্ষার অন্যতম ছিল তাঁহার পুত্রের কুরবানী এবং এই ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সারার মাধ্যমে আর এক পুত্রের সুসংবাদ দেন (দ্র. ৩৭ ঃ ১০২-১১৩)।

অবশ্য উল্লিখিত ঐ দুই ঘটনার মধ্যে এক আপাত বিরোধ দেখা যায়, জেনেসিসে ইবরাহীম ('আ)-এর পুত্র কুরবানী দানের অভিপ্রায় সংক্রান্ত বর্ণনায়। জেনেসিসে ইবরাহীমের সহিত আল্লাহ্র সম্পাদিত প্রতিশ্রুতি, ঐ একই দিন ইবরাহীম ও তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের খৎনা এবং ইসহাকের জন্ম ও তাঁহার খৎনা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়ার পর কুরবানীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জেনেসিসে এই বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

১. “এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন।... ২. তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে লইয়া, মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্ব্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর” (আদিপুস্তক, অধ্যায় ২২)।

জেনেসিসের এই অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ ইসমাঈল আল্লাহ্র নিমিত্ত কুরবানীর জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করেন, বরং তাহাদের বক্তব্য হইতেছে ইসহাককেই কুরবানীর জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু জেনেসিস-এর ২২ ঃ ২ বিশেষ অনুচ্ছেদটি স্পষ্টত

স্ববিরোধী। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'তোমার একমাত্র পুত্র ইসহাক'। এখন কথা হইতেছে ইবরাহীমের জীবনের কোন পর্যায়েই ইসহাক ইবরাহীমের একমাত্র পুত্র ছিলেন না। কেননা ইসহাকের জন্ম হইয়াছে তখন যখন ইসমাঈলের বয়স ১৪ বৎসর। আর ইবরাহীম যখন ১৭৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন তখন ইসমাঈল ও ইসহাক উভয় ভ্রাতাই জীবিত।

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, জেনেসিসের উক্ত বর্ণনায় প্রমাদ ঘটিয়াছে। হয় এই বর্ণনায় 'একমাত্র' শব্দটি থাকা উচিত ছিল না অথবা পুত্রের নাম ইসহাকের পরিবর্তে 'ইসমাঈল' থাকা উচিত ছিল। কিন্তু 'একমাত্র পুত্র' শব্দটি জেনেসিসের ঐ অধ্যায়ে আরও দুইবার (জেনেসিস ২২ ঃ ১২, ২২ ঃ ১৬) উল্লিখিত হইয়াছে। আর এই দুই ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ ইবরাহীমের প্রতি তাঁহার সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তানকে তাঁহার (আল্লাহ্র) উদ্দেশ্যে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার (ইবরাহীমের) মনোভাবে কোন পরিবর্তন না হওয়ার জন্য। আর ঠিক এই কারণেই আল্লাহ ইবরাহীমকে বিশেষ করিয়া তাঁহার আশিসধন্য করিয়াছেন। আল্লাহ তাঁহাকে একই উপলক্ষে বলেন, "আকাশের তারকাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব... আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে; কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ"।[৬৫]

তাই ইহার মধ্যে আর কোনই সংশয় থাকিতে পারে না যে, ইবরাহীমের কেবল একমাত্র পুত্রকেই কুরবানী দেওয়ার জন্য বলা হইয়াছিল। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, জেনেসিসের ঐ অধ্যায়ের পরবর্তী দুই উল্লেখে ইবরাহীমের পুত্রের নামোল্লেখ নাই। স্পষ্টতই জেনেসিসের এই বিবরণের লেখায় লিপিকরের ভুল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নামটি হওয়া উচিত ছিল ইসহাকের পরিবর্তে ইসমাঈল। কারণ ইসমাঈলই ১৪ বৎসর ধরিয়া ইবরাহীমের একমাত্র পুত্র ছিলেন। জেনেসিসের ২২ ঃ ২ অনুচ্ছেদের লেখায় এই ভুলটি সম্ভবত বাইবেলের মূল লেখকের হাতে ঘটে নাই, উহা সম্ভবত ঘটিয়াছে পরবর্তী লিপিকর বা গ্রন্থনাকারী/সঙ্কলকের হাতে যিনি লেখার মূল পাঠ ইসহাকের অনুকূলে বদলাইয়া দিয়াছেন।

এখন এই ভুলটি যদি ইসহাকের নামের পরিবর্তে ইসমাঈল লিখিয়া শুধরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে জেনেসিসের গোটা ঐ অধ্যায়টি অসঙ্গতিমুক্ত হয় এবং জেনেসিসের ১৬ ঃ ১০ অনুচ্ছেদের বিবরণ অনুযায়ী ইসমাঈলের ব্যাপারে "আমি তোমার অতিশয় বংশবিস্তার করিব" এবং আবার ১৭ ঃ ২০ অনুচ্ছেদে একটু সামান্য সংশোধিত আকারে "আমি তাহার অত্যধিক বংশবিস্তার করিব" ইত্যাদি অঙ্গীকারের প্রকৃতির সহিত অধ্যায়টির গোটা বিবরণ খাপ খাইয়া যায়। আল্লাহ্র এই অনুগ্রহের সহিত জেনেসিসের ২২ ঃ ১৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুগ্রহের যে মিল, যেমন "আমি তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব" যাহা ইবরাহীমের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত লক্ষণীয়। ইসমাঈলের প্রতি এই বিশেষ আশিসের যথোপযুক্ততা বাস্তবে যাহা ঘটিয়াছে তাহার আরও সুপ্রকাশ ঘটিয়াছে। যদিও ইসহাকের বংশে আরও নবী ও শাসকের আগমন ঘটিয়াছে যাহা

আল্লাহ বিবি সারাহকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তবু ইহা সত্য যে, ইসমাঈলের বর্ধিত সন্তান-সন্ততিদের মাঝে তাঁহার বংশধরদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির ঐশ্বরিক অঙ্গীকার অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইসমাঈলের বংশধরগণই ইসহাকের বংশধরদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি করিয়া ও আরও অধিকতর বিস্তৃত অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছে।

জেনেসিসের ২২ অনুচ্ছেদে একমাত্র পুত্র বলিতে যে ইসমাঈলকে বুঝানো উচিত তাহা খোদ জেনেসিসে বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ ও ধারাবিন্যাস হইতেই স্পষ্ট। প্রথমত, ইবরাহীমের সহিত আল্লাহ তাঁহার অঙ্গীকার সম্পাদনের পর তিনি তাঁহার (ইবরাহীমের) বিশ্বাসের গভীরতা যাচাই করিতে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার অনুগ্রহ বর্ষণের কথা বলিবেন, ইসমাঈল ও ইসহাক নামে দুই পুত্র দানের সুসংবাদ প্রদান করিবেন এবং পুত্রদ্বয়কে তাঁহার অশেষ আশিসে স্নাত করিবেন তাহা নিরর্থক। আল্লাহ ইবরাহীমকে তাঁহার উপর তাঁহার সকল অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষণের আগেই ও সর্বোপরি, তাঁহার সহিত এক চিরস্থায়ী অঙ্গীকারে উপনীত হইবার আগেই ইবরাহীমের ঈমান ও বিশ্বাসের প্রমাণ লইবেন, তাহার পূর্বে নহে—ইহাই বরং যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব সম্মত।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার প্রথম নবজাত সন্তানকে এক দূরদেশে নির্বাসনে পাঠাইবার জন্য পিতা ইবরাহীমকে নির্দেশ দানের পর আবার আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সেই ইবরাহীমকে তাঁহার অপর পুত্র ইসহাককেও কুরবানী দিতে আদেশ করা নিতান্তই নির্দয় ও অসঙ্গতিপূর্ণ। আর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ হাজেরা ও ইসমাঈলকে নির্বাসনে প্রেরণের সময় ইবরাহীমের দুঃখে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, 'ইসহাকের বংশ তোমার বংশ হিসাবে পরিচিত হইবে' অর্থাৎ তাহারা যেথায় রহিয়াছে সেখানেই তাহারা থাকিবে ও বংশবৃদ্ধি করিবে বলিয়া তিনি ইবরাহীমকে আশ্বাস দেওয়ার পর তিনি ইসহাককে কুরবানী দিতে আদেশ দিবেন ইহা উল্লিখিত উক্তির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এভাবে জেনেসিস-এর ২২ অনুচ্ছেদের মধ্যেই যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং ঘটনাবলীর সার্বিক ধারাবিন্যাস ও যুক্তি মিলাইয়া যাহা বুঝা যাইতেছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহাকে কুরবানী দিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছিলেন সে ইবরাহীমের প্রথম ও একমাত্র পুত্র সন্তান, আর তিনি ইসমাঈল ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, যাহাকে কুরবানী দিতে বলা হইয়াছে এবং কুরবানী দেওয়ার জন্য ইবরাহীম প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ অবশ্য তাহাদের নানা তত্ত্ব দিয়াছেন জেনেসিস-এ উল্লিখিত "একমাত্র পুত্র" বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিবার জন্য। এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি করিয়া যে যুক্তির অবতারণা তাহারা করিয়া থাকেন তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভিত্তি হইল নিউ টেস্টামেন্টের নিম্নোক্ত বর্ণনা ঃ[৬৬]

"লিখিত আছে যে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল, একটি দাসীর পুত্র, একটি স্বাধীনার পুত্র। কিন্তু ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মিয়াছিল" (গালাতীয়, ৪ ঃ ২২-২৩)।

আগে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "ক্রীতদাসী" বলিয়া যে শব্দটি রহিয়াছে তাহা বাইবেলে ইবরাহীমের স্ত্রীর প্রতি আরোপের ব্যাপারে ঠিক নহে। ইহা ইসমাঈলের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত।[৬৭]

বিশেষ করিয়া ইবরাহীমের সহিত হাজেরার বিবাহের পর, খোদ বাইবেলই সাক্ষ্য দিতেছে যে, "সারী....হাগারকে লইয়া আপন স্বামী অব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন" (আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ৩)।[৬৮]

হাজেরা একজন নবীর বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত হইলেন। আর তাই ইসমাঈল ছিলেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির বৈধ পুত্রসন্তান। অতএব কোনভাবে ইসমাঈলকে ইবরাহীমের জারজ সন্তান (নাউযু বিল্লাহ) বলা ও সেই একই কারণে ইসমাঈলকে ইবরাহীমের পুত্র হিসাবে স্বীকার করা যাইবে না, ইহা হইবে একান্ত উদ্ভট, একাধিক নবীর জনক ইবরাহীমের স্মৃতির জন্য অবমাননাকর এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে 'ইসমাঈল ইবরাহীমের' 'বীজ' ও 'পুত্র' বলিয়া বারংবার যে উল্লেখ রহিয়াছে উহার সরাসরি বিরোধী। বাইবেলে ইহা সেই "পুত্র" যাহাকে আল্লাহ বারংবার আশিসধন্য করিয়াছেন, বারবার তাঁহাকে 'জাতি'তে পরিণত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহার নিরতিশয় বংশবৃদ্ধির, তাঁহার বংশ হইতে ১২ জন শাসক সৃষ্টির। এই অবস্থায় ইসমাঈল গোত্র পরিচয়হীন থাকিবেন, কেবল বাইবেলে কোন বিশ্বাস নাই বা আল্লাহ্র বাণীতে আস্থা নাই এমন ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহ ইহা আর যাহাই হউক মানিয়া নিতে পারে না। অধিকন্তু বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথম সন্তানের অধিকার ইসমাঈলে বর্তাইয়াছে। কেননা ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকে এবং তাহাদের একজন 'ঘৃণিত' ও আরেকজন 'প্রিয়পাত্রী' হইয়া থাকে এবং দুই স্ত্রীর গর্ভে যদি দুই বা ততোধিক পুত্র সন্তান থাকে এবং প্রথম পুত্রসন্তানটি 'ঘৃণিত স্ত্রীর' গর্ভজাত হয় তাহা হইলে ঐ পুত্রসন্তানটি উত্তরাধিকারী হিসাবে অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় দ্বিগুণ উত্তরাধিকারের স্বত্বান হইবে।[৬৯] এখানে আবারও গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিতে হয় যে, ইসহাক আল্লাহ্র আধ্যাত্মিক রহমত বা আশিসের একান্ত অধিকারী এমন দাবি একান্তই ভ্রান্ত ও বালসুলভ।

নিউ টেস্টামেন্টের উল্লিখিত উদ্ধৃত বর্ণনায় যে প্রচ্ছন্ন তারতম্যই থাকুক না কেন, ইসমাঈল যেমন কেবল বিবাহ বহির্ভূত সংসর্গজনিত উপায়ে জন্ম নেন নাই, তেমনি ইসহাকও কেবল অঙ্গীকারধন্য হইয়া ভূমিষ্ঠ হন নাই। তাঁহারা উভয়েই তাহাদের পিতা-মাতার একান্ত বৈধ সন্তান। তাঁহাদের উভয়ের মাতা হাজার ও সারাহ আল্লাহ্র আশিসধন্য। তাঁহাদের উভয়কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং আল্লাহ তাঁহাদের উভয়কেই তাহাদের স্বস্ব গর্ভে নিজ পুত্র সন্তান আসিবার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। উভয় সন্তানের নাম নির্বাচন করিয়াছিলেন আল্লাহ এবং তিনিই দুই মাতাকে তাহাদের নিজ নিজ পুত্রের নামকরণের কথাও জানাইয়াছিলেন। আর এইভাবেই ইসমাঈল ও ইসহাক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন 'অঙ্গীকারে' ও 'দেহজ সংসর্গের' যুগপৎ উভয় কারণে।

যদি ইসহাক বেশি করিয়াই অঙ্গীকারের ফলে এই ধরায় আসিয়া থাকেন এবং আল্লাহ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ইবরাহীমকে দিয়া থাকেন, ইবরাহীমের প্রমাণিত ধর্মবিশ্বাসের বা ঈমানের কারণে, যাহা ওল্ড টেস্টামেন্ট ও কুরআন উভয়ই বলিতেছে, তাহা হইলে ইহা আরও অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, আল্লাহ সেক্ষেত্রে ইবরাহীমকে বলিবেন ইসহাককেই কুরবানী দিতে। কেননা ইসহাককে পুত্র হিসাবে ইবরাহীম পাইয়াছিলেন পুরস্কার ও অনুগ্রহ হিসাবে।

পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইসহাকের অনুসারীদের বংশধরদের মধ্যে তাহাদের ধর্মীয় কোন আচার-অনুষ্ঠানে কোনও রকম কুরবানী দেওয়ার মত কিছু করা হয় না। পক্ষান্তরে

ইসমাঈলের বংশধর ও তাহাদের অনুসারিগণ সারা বিশ্বে প্রতি বৎসর কুরবানীর ঘটনাটি আরবী পঞ্জিকার শেষ মাসের দশম তারিখে স্মৃতি হিসাবে পালন করিয়া থাকেন। তাহারাই অন্যদের বিপরীতে তাহাদের বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক নামায-ইবাদতে ইবরাহীম ও তাঁহার বংশধরদের (ইসহাকসহ) প্রতি আশিসবাণী পাঠ করিয়া থাকেন এবং এইভাবে তাহারা ইবরাহীমকে আল্লাহ যাহা বলিয়াছিলেন "এইভাবে তাহাদের বিশ্বাস প্রমাণ করে"।[৭০]

অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন

তথ্যসূত্র

১. বেশিরভাগ তথ্যের সমন্বিত বিবরণের জন্য দ্র. তারীখুল আরাব কাবলাল ইসলাম, ৮খ, বাগদাদ ১৩৬৯-১৩৭৮ হিজরী।

২. পরবর্তী দ্র. অধ্যায় ১১।

৩. পরবর্তী দ্র. অধ্যায় ৯ ও ২।

৪. R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (1907), 1988, reprint, p.xxiv

৫. প্রাগুক্ত, ৩০; Goldziher, Muammedanische Studien -এর বরাতে, ১খ., পৃ. ২২৫।

৬. P. K. Hitti, History of the Arabs (1937), 10th edition, 1986 reprint, p. 87.

৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আত-তাবারী, পূ.স্থা., ২২ ঃ ৪।

৮. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৩৩৬।

৯. বুখারী, নং ৩৫২৪।

১০. ইবনুল আছীর (আবুস সা'আদাত আল-মুবারাক ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জাযারী, ৫৪৪-৬০৬ হি.)। আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, সম্পা. তাহির আহমাদ আল-জাওযী ও মাহমূদ মুহাম্মাদ আত-তানাহী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩, তা. বি.।

১১. দ্র. মুহাম্মাদ কুতব, জাহিলিয়াত আল-কারনিল ইশরীন, কায়রো ১৩৮৪ হি.।

১২. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. A. Guillaume, Islam, London 1964, pp. 61-62; P. Lammens, L'Islsm, Croyance et Instiutions, Beirut 1926, pp. 28, 33.

১৩. D. S. Margoliouth, Mohammed and Rise of Islsm, 3rd edition, London 1905, p. 104. এই গ্রন্থের পরের দিকের অংশে এই সুনির্দিষ্ট মন্তব্য আলোচিত হইয়াছে। পরে দ্র. অধ্যায় ১৪, ভাগ ১ও ২।

১৪. ১ম প্রকাশ, লণ্ডন ১৯২৬ খৃ.; পুন ঃ প্রকাশ ১৯৮৪ খৃ.।

১৫. R. Bell, "The Sacrifice of Ishmael", T.G.U.O.S., vol. X, 29-31; and "The Origin of the Id al-Azha", M.W., 1933, pp. 117-120.

১৬. W. Muir, The Life of Mahomet, Ist edn., London 1858, p. cxi, citing Gen. xxi : 25, xxv: 18.

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. প্রাগুক্ত, p. cxv; cxxv.

১৯. প্রাগুক্ত, p. cxvi.

২০. মুইর সুনির্দিষ্টভাবে এই শব্দটি দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন; একবার p cxxv-তে, আবার p. cxxvi-তে। তিনি তাহার বিবরণকে "মক্কা ও সেখানকার ধর্মের উত্থানের অনুমিত ইতিহাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে গ্রন্থের ১ম সংস্করণের p. ccxiv ও T.H. Weir (London 1923), সম্পাদিত গ্রন্থের ৩য় সংস্করণের p. civ-র পাদটীকা দ্র.।

২১. প্রাগুক্ত, ১ম সংস্করণ, p. ccxv.

২২. প্রাগুক্ত, p. cxxv. cxxvi.

২৩. প্রাগুক্ত, p. cxv, আরও দ্র. cxxiv-cxxv.

২৪. প্রাগুক্ত, p. ccxii.

২৫. প্রাগুক্ত, p. ccx.

২৬. প্রাগুক্ত, p. ccxi.

২৭. প্রাগুক্ত, p. ccxiii.

২৮. প্রাগুক্ত, p. ccx.

২৯. প্রাগুক্ত, p. ccxvi.

৩০. প্রাগুক্ত, p. ccxv.

৩১. প্রাগুক্ত, p. ccxviii.

৩২. প্রাগুক্ত; আরও দ্র. Isaiah 21:16-17.

৩৩. মুইর, পূ. গ্র., p. ccxii.

৩৪. প্রাগুক্ত.

৩৫. প্রাগুক্ত, pp. ccxiii-ccxiv.

৩৬. Gen. 12 : 6-8; 13 : 4; 13 : 18. আরও দ্র. 25 : 25 যাহাতে ইসহাক ('আ) কর্তৃক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি 'বেদী' নির্মাণের কথা আছে।

৩৭. Gen. 28:10, 18-19.

৩৮. দ্র. মুহাম্মাদ সুলায়মান মানসূরপুরী, রাহমাতুল্লিল আলামীন (উর্দূ), দিল্লি ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৪৪।

৩৯. মুইর, পূ. গ্র., p. ccxvi, আরও দ্র. পূর্ববর্তী পৃ. ৭২।

৪০. মুইর, পূ. গ্র., p. ccxii.

৪১. দ্র. পূর্ববর্তী, পৃ. ৭১।

৪২. মুইর, পূ. গ্র., p. cxi. মুইর ভুলক্রমে তাঁহার পাদটীকায় Gen. 21 : 25, বরাত দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা হওয়া উচিত 21 : 21.

৪৩. দ্র. Gen. 14 : 6; Num., 10 : 12, Num. (গণনাপুস্তক), 12 : 16.

৪৪. Syed Ahmad Khan Bahadur, Essay on the Historical Geography of Arabia, London, Trubner & Co., London 1869.

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪। আরও দ্র. ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, শিরো. 'ফারান'।

৪৬. সায়্যিদ আহমাদ, পূ. গ্র., পৃ. ৭৬, বরাত Kitto's Cyclopaedia of the Bible and The Peoples' Bible Dictionary.

৪৭. সায়্যিদ আহমাদ, পূ. গ্র., পৃ. ৭৭-৭৯। আরও দ্র. Gen. 14 : 5-7; Deut. 33-2; Hab. 33 : 2, Num. 10-12, 11 : 1-3, 6.

৪৮. সায়্যিদ আহমাদ, পূ. গ্র., পৃ. ৮৫।

৪৯. See Exod. 15:32; 17 : 8; 18:5; 19:2 and Num. 10:12; 11:34; 12:16; 13:26 and 14:25.

৫০. সায়্যিদ আহমাদ, পূ.গ্র., পৃ. ৮০। আরও দ্র. Gen. 10:29.

৫১. সায়্যিদ আহমাদ, পূ. গ্র., পৃ. ৮০।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

৫৩. Gen. 21:11-14.

৫৪. Gen. 21:17-19.

৫৫. স্পষ্টতই হাজেরা (রা) নিমীলিত চোখে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনায় সুগভীরভাবে মগ্ন ছিলেন।

৫৬. আল-কুরআন, 3:96.

৫৭. এই ধরনের স্পষ্ট প্রমাদ ঘটিয়াছে ইসমাঈলকে যখন নির্বাসনে পাঠানো হয় তাঁহার মায়ের সঙ্গে তখন তাঁহার বয়স প্রশ্নে। Gen. 21:5-9 অনুযায়ী ঐ সময়ে ইসমাঈলের বয়স আনুমানিক ১৬ বৎসর, অথচ Gen. 21:16, 19, 20-তে দেখা যায়, ইসমাঈল ঐ সময়ে 'শিশু' (বালক) মাত্র। পরের এই অভিমত সঠিক।

৫৮. Gen. 12:1-4.

৫৯. Gen. 16:10-11.

৬০. Gen. 17:1-5, 9-11, 24-27.

৬১. Gen. 17:15-16, 19-21.

৬২. Gen. 17:20; 21:13; 21:18.

৬৩. দ্র. Gen. 15:12.

৬৪. Gen. 21:1-5.

৬৫. Gen. 22:17-18.

৬৬. Galatians 4:22-23.

৬৭. উপরে দ্র., পৃ. ৩৩।

৬৮. Gen. 16:3.

৬৯. Deut. 21:15-17.

৭০. Gen. 12:3.

চতুর্থ অধ্যায়

দীন ইসলামের উত্থান সম্পর্কে জড়বাদী ব্যাখ্যা

এক ঃ প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ওয়াট তাঁহার রচনার শুরুতেই তাহার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও ঘোষণা দিয়াছেন এই বলিয়া, "একজন একেশ্বরবাদী" হিসাবে তিনি এই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি "ইতিহাসের নিরপেক্ষতায় জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচ্ছন্ন" বলিয়া মনে করেন না। তবে কিছু কাল ধরিয়া মুহাম্মাদের এক নূতন জীবনী রচনার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া আসিতেছে। কারণ বিগত অর্ধ শতক বা অনুরূপ কাল-পরিক্রমায় ঐতিহাসিকগণ "ইতিহাসের অন্তর্নিহিত জড় উপাদানসমূহের বিষয়ে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন"। তিনি আরও বলেন, এমনকি তাহার মত যাহারা স্বীকার করেন না, "এই ধরনের যেসব উপাদান ঘটনাপ্রবাহের গতি নির্ধারণ করে তাহাদেরকে এইগুলির গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে"। তাই তিনি দাবি করেন, তাহার রচিত মুহাম্মাদের জীবনচরিত-এর "বৈশিষ্ট্য" এই যে, "তাহার লেখায় এইসব বৈষয়িক উপাদানের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং অতীতে যেসব প্রশ্নের অবতারণা কচিৎ করা হইয়াছে সেইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছে"।[১]

ওয়াটের নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইতিহাসে নিহিত বৈষয়িক উপাদানের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশের প্রবণতারই অনুসরণ করিয়াছেন তিনি। তাহার লেখা মহানবীর জীবনীতে তিনি নূতন কি সংযোজন করিলেন তাহা পরিদৃষ্ট হইবে—আমরা যদি মহানবী ﷺ ও ইসলামের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে তাহার পূর্ববর্তীরা কি কি প্রধান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন ঐগুলির প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করি।

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য তত্ত্বটি আমরা পাইয়াছি হিউবার্ট গ্রিমের (Hubert Grimm) লেখায়। ১৮৯২ সালে তিনি ইসলামের অভ্যুদয় সম্পর্কে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন। তাহার এই বক্তব্য অনুযায়ী মহানবী ﷺ ও ইসলামের আবির্ভাব ছিল 'বিত্তবান' ও 'বিত্তহীন' (Haves & Have-nots)-এর মধ্যে সাধারণ সংঘাতেরই এক সরল ফল।[২]

এই ধরনের অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যার গলদ ও অযথার্থতার বিষয়গুলির দিকে ত্বরিৎ ও নিষ্পত্তিমূলকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেন সি স্নুক হারগ্রোনযে।[৩] তাহার সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের পর হইতে প্রাচ্যতত্ত্ব বিশারদগণ এই ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন। যুগপৎ তাহারা এই বিষয়ের প্রতিও মনোনিবেশ করেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে অন্ততপক্ষে কয়েক দশক কাল প্রধানত ব্যবসায়ী ও সওদাগর জনসমাজ ছিল।

এই বাস্তব তথ্যটির উপর আরও সুনির্দিষ্ট ও বিশেষভাবে আলোকপাত করিয়াছেন জে. ওয়েলহাওসেন। তিনি মক্কার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কারণ হিসাবে কুরায়শদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বর্ণনা অনুযায়ী, পানি কেমন করিয়া কূপ হইতে তুলিতে হয় এবং পানির প্রবাহ পথে প্রতিবেশীদের পানি কেমন করিয়া প্রবাহিত করাইতে হয় এইসব বিষয় কেবল কুরায়শরা অন্যদের তুলনায় সুপরিজ্ঞাত ছিল।[৪]

এই একই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন সি. সি. টোরি-ও। তিনি কুরআনে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক পারিভাষিক শব্দাবলী ও অন্যান্য বাক্যালঙ্কারমূলক শব্দ বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, মক্কায় তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় রকমের আর্থিক লেনদেনের পরিবেশ বিরাজ করিতেছিল।[৫] মক্কার প্রাক-ইসলামী জনসমাজের বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর নূতন করিয়া গুরুত্ব আরোপ এবং সেই সাথে আরব জনজীবনে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের প্রভাবকেই প্রাধান্য দেওয়ার সাধারণ প্রবণতা বজায় থাকার চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে। এই নূতন চিন্তাধারা অনুযায়ী নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ধর্ম প্রাগ্রসরমান মক্কাবাসী এবং আল-লাত ও আল-'উযযা দেবীর একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, যাহারা বৃহত্তর বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত, তাহাদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত ও কালের দাবির সহিত বেখাপ্পা বলিয়া প্রতিভাত হয়।[৬]

এইসব অভিমতের প্রতিফলন বজায় রাখিয়া মার্গোলিয়থ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লিখিয়াছেন, "মক্কার পরিবার-প্রধানরা বিদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশে এক যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রতিনিধিতুল্য হইয়া উঠে। কেননা বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিটি উপলক্ষে অর্জিত মুনাফা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বিলি-বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এবং মক্কাবাসীরা ঐ অর্থ ব্যয় করিত, সঞ্চিত রাখিত অথবা নূতন কোন ফটকাবাজিতে বিনিয়োগ করিত।[৭] তিনি আরও বলেন, মক্কার জনসমাজের এই "সুস্থ" বৈশিষ্ট্যের কারণে মক্কায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও মদীনায় তাহা তাৎক্ষণিক সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়। মদীনা তৎকালে বৎসরের পর বৎসর গৃহযুদ্ধের[৮] কারণে দুর্গতির মধ্যে নিপতিত ছিল।[৯] এই বিষয়ে মার্গোলিয়থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঃ

"মক্কার দূরদর্শী নেতাদের নেতৃত্বে মক্কার বিত্ত ও ক্ষমতা যদি ক্রমাগত বাড়িয়াই যাইতে থাকে, তাহা হইলে তেমন পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীদেরকে এমন সব দেশ হইতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হয় যেসব দেশে বর্বর বিবেচিত ধর্ম লইয়া তাহারা তৃপ্ত থাকিবে। ইহা আর যাহা হউক সম্ভব নহে। তবুও বাস্তবতা এই যে, মক্কাবাসীর পুরাতন ধর্মই তাহাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির উৎস ছিল। ইহা সত্য হইয়া থাকিলে খৃস্টধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম তাহাদের ধর্মের বিকল্প হইবে, তাহা বাস্তবসম্মত নহে। তবুও ঐ সময় নাগাদ মুহাম্মাদ ﷺ লক্ষ্য করেন যে, এই দুই আলোকপ্রাপ্ত ধর্মকে ডিঙাইয়া অন্য ধর্ম প্রতিষ্ঠাই স্পষ্টত ঐ সমস্যার আদর্শ সমাধান। আর সেই সঙ্গে সম্পদ-সমৃদ্ধির পুরাতন উৎসটিকেও বহাল রাখা প্রয়োজন। তবে মক্কার ব্যবস্থা মোটেও পশ্চাদপদ তো ছিলই না, বরং রোমক সাম্রাজ্যের ধর্মীয় পদ্ধতি অপেক্ষাও আগাইয়া ছিল"।

ইহা অবশ্য সত্য যে, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীরা প্রধানত বণিক সম্প্রদায় ছিল। তবে উল্লিখিত লেখায়, বিশেষ করিয়া সি.সি. টোরির লেখায় এই বাস্তব বিষয়টির অতিরঞ্জন ঘটানো হইয়াছে। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, বিশেষত কুরআনে কৃষি সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ ও চিত্রকল্পসমূহ তথাকথিত বাণিজ্যিক-ধর্মতাত্ত্বিক পারিভাষিক শব্দাবলীর তুলনায় কম প্রাণবন্ত ও সজীব নহে।[১০] কুরআনে গোটা জড়জাগতিক জীবনকে কর্ষিত কৃষিভূমির সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যেখান হইতে ইহকাল ও পরকালের ব্যবস্থা সংগ্রহ করা যায়।[১১]

একত্ববাদ (তাওহীদ) কুরআনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। আল্লাহ্র অপার মহিমা ও রহমতের বারংবার উল্লেখ করিয়া একত্ববাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কুরআনে বলা হইয়াছে, আসমান হইতে আল্লাহ্র রহমত ও প্রাচুর্য বর্ষিত হয় এবং উহা দ্বারা তিনি বন্ধ্যা ধরাপৃষ্ঠকে ফুলফল, তরুলতা ও শস্যাদিতে প্রাণবন্ত ও সজীব করিয়া তোলেন। এমনকি বেহেশতকে সাধারণত এক সুচর্চিত ও সুবিন্যস্ত উদ্যান হিসাবে বর্ণনা করা হইয়া থাকে, যে স্থান সুস্বাদু ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই নিসর্গের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে অসংখ্য স্রোতস্বিনী। আল্লাহ যেমন পৃথিবীর মৃত্তিকা হইতে নানা উদ্ভিদ ও তরুলতা সৃষ্টি করেন, তেমনি করিয়াই তিনি পুনরুত্থান দিবসে মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন।[১২] এমনকি সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াকে তথা মানবজাতির ধারাকে চির প্রবহমান রাখার প্রক্রিয়াকে 'একজন মানুষের তাহার নিজ কৃষিজমিতে[১৩] চাষাবাদের' সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই ধরনের অভিব্যক্তি ও বিবৃতির ভিত্তিতে কোন একজনের পক্ষে সমান আস্থার সাথে ইহাও বলা সম্ভব যে, কুরআনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে মূলত কৃষি পটভূমি হইতে।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অবশ্য আরেক বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তেও পৌঁছায়। কুরআনের অন্য কোন সূত্রে সন্নিবেশিত একক কোন তথ্যে অতি গুরুত্ব আরোপ করিলে, আবার অন্য দিকগুলিকে উপেক্ষা করা হইলে তাহা গোটা পরিস্থিতির আরও এক ভুল ও বিকৃত দৃশ্যপটের জন্ম দিতে বাধ্য। ইহার সমভাবে সঠিক দৃষ্টান্ত হইল মার্গোলিয়থ উল্লিখিত বক্তব্য। ইহার প্রধান ত্রুটি হইল, ইসলামের অভ্যুদয়ের এই কারণ যেমন ইহা একদিকে উল্লেখ করিয়াছে, তেমনি মক্কার 'ব্যর্থতার'ও একই কারণ উল্লেখ করিয়াছে। মার্গোলিয়থের মতে, "মক্কা জনপদ যেহেতু একটি বাণিজ্যিক বসতি হিসাবেই উন্নতি লাভ করিতে থাকে, সেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ ঐ একই কারণে যেই সামাজিক ও ধর্মীয় অসঙ্গতি দেখা দেয় সেই সমস্যারই এক 'আদর্শ সমাধান' দেন এমন এক 'পদ্ধতি' দ্বারা যে পদ্ধতি বা ব্যবস্থা বিত্তের আদি উৎস অক্ষুণ্ন রাখিয়া দেয় এবং একই সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ব্যবস্থা হইতে যাহা উন্নততর প্রতিভাত হয়। কিন্তু মক্কায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর এই মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ মক্কা ছিল এক 'সুস্থ' বাণিজ্য বসতি"।

এখানে যে স্ববিরোধিতা লক্ষণীয় তাহা কেবল উল্লিখিত দুই অনুমানেরই মৌলিক অসত্যতার আভাস দেয়। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে মার্গোলিয়থ যেমনটি কল্পনা করিয়াছেন, মক্কার জনপদ তেমন সুস্থ যেমন ছিল না, তেমনি মুহাম্মাদও মক্কার আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও উহার

আদিম ধরনের ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যকার বিষমতার ভারসাম্যহীনতাতেই কেবল ভারসাম্য বিধায়ক কোন সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান নাই এমন এক ব্যবস্থামাত্র করিয়া যাহাতে বিত্তের আদি সূত্রটি অক্ষত রাখা হয়।

মক্কার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে সাড়া দেওয়াই যদি মুহাম্মাদ ﷺ -এর ভূমিকা হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত ও মক্কা হইতে উৎখাত হইতে হইত না যাহা মার্গোলিয়থ দাবি করিয়াছেন।

মার্গোলিয়থের রচনা প্রকাশিত হইবার অল্প কালের মধ্যেই সি. এইচ. বেকার একান্তভাবে এক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন যাহার প্রধান বক্তব্য হইল পার্শ্ববর্তী দেশগুলির উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার। ইসলামের আবির্ভাব এক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ববহ নহে। বেশ অনেক কাল আগে দক্ষিণ আরবের কিছু গোত্রের লোকজনের মদীনা, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক) দেশান্তর গমন এবং দক্ষিণ আরবের জন-পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া বেকার এই মর্মে বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন যে, খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবদের যে বহির্মুখী সম্প্রসারণ ঘটে "উহা ছিল আরবের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের কারণ জনিত সেমিটিক লোকদের সর্বশেষ বড় ধরনের দেশান্তর গমনের ঘটনা"। তাহার মতে, "এই ঘটনা ছিল কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমা জুড়িয়া এক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়বিশেষ"। তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্ম নহে, খাদ্যের আকাল ও লিপ্সাই ছিল আরবদের নূতন করিয়া বহির্মুখী সম্প্রসারণের বাধ্যবাধকতা আরোপকারী বিষয়। তবে ইসলাম এই উদ্দেশ্যে "অত্যাবশক ঐক্য ও শক্তির" মত উপকরণ সরবারহ করে। ইসলাম এই জন-স্থানান্তর গমনের ক্ষেত্রে "দলীয় শ্লোগান ও সাংগঠনিক" প্রেরণা যোগায়"।[১৪]

বেকারের এই তত্ত্বে স্পষ্টতই অনেক দুর্বলতা রহিয়াছে। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাককালে এই তত্ত্বগুলি মক্কার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উপেক্ষা করে। সুদুর দক্ষিণ আরবের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ে সাধারণীকরণের মাধ্যমে সমগ্র উপদ্বীপের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই তত্ত্বে দক্ষিণ আরবীয় গোত্রগুলির উত্তর দিকে দেশান্তর গমন এবং সপ্তম শতাব্দীর আরবের বিস্তারের মধ্যকার সময়ের বিস্তর ব্যবধানকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। বেকার এই ধারণাকে যথেষ্ট প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে, ইসলামের অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র আরবে চরম অর্থনৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়াছিল। তদুপরি পরবর্তী কালের বিস্তার সঠিকভাবে দেশান্তর গমন বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। যদি বেকারের বর্ণনা অনুযায়ী ইহা সত্য হয় যে, ইসলাম ধর্ম নহে, বরং ইহার রাজনৈতিক প্রভাব প্রথমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, অতঃপর ইহা সমানভাবে সত্য যে, সেই রাজনৈতিক প্রভাব কোন দেশান্তরের ঘটনা ছিল না। কারণ প্রাথমিক যুগে আরবদের বিজিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করায়ও নিষিদ্ধতা কার্যকর ছিল। অবশ্য বেকারের তত্ত্ব এক দিক হইতে গ্রিম-এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত। ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, সমস্ত আরব উপদ্বীপে সকল অধিবাসীই বিত্তহীন ছিল যাহারা বিত্তবান প্রতিবেশীর ভূমি দখলের জন্য ঝাপাইয়া পড়িত। ইহাতে মুইর, মার্গোলিয়থ

প্রমুখের এই ধারণার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নবী করীম ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উচ্চাভিলাষীরূপে সমস্ত আরবে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন, যে 'ঐক্য' ও 'ক্ষমতা' নব্য সম্প্রসারণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

বেকারের এই তত্ত্বের দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট। ইহাতে ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে গোটা আরবে সাধারণ অর্থনৈতিক অবক্ষয় দশা চলিতেছিল বলিয়া বেকার যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তেমন ব্যাপক স্বীকৃতি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহার বিপরীতক্রমে ওয়েলহাওসেন-টোরি-মার্গোলিয়থ প্রমুখ প্রাচ্যবিদ মক্কার বাণিজ্যিক বিকাশের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াই দেখা যায়। মক্কার এই বাণিজ্যিক উন্নতির বুনিয়াদেই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটিয়াছে। বেকার-এর অল্পকাল পরের লেখক এইচ. ল্যামেন্স এই তথ্যের ক্ষেত্রে এক নূতন মাত্রা যোগ করিয়াছেন। আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপের পানি হজ্জযাত্রীদের নিকট বিক্রয় করিতেন বলিয়া মার্গোলিয়থ যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহারই কিছুটা স্ফীতি ঘটাইয়া ল্যামেন্স বলেন, সিকায়াহ-র আওতায় সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগাইয়া হজ্জযাত্রীদের[১৫] যমযমের পানি ব্যবহারের উপর কিছু কর ধার্য করিয়া বিত্ত সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ল্যামেন্স আরও সুনির্দিষ্টভাবে গোটা পশ্চিম আরবে মক্কার বাণিজ্যিক গুরুত্বের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, মক্কা কুরায়শদের রাজনৈতিক নৈপুণ্য ও সেই সাথে সামরিক শক্তির কারণে তাহারা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের যাযাবর বেদুঈন গোত্রগুলির উপর আধিপত্য অর্জন করিয়াছিল।[১৬] তিনি আরও বলিয়াছেন, মক্কা বাণিজ্যিক কেন্দ্র তো ছিলই, সেইসাথে আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে সেখানে জটিল আর্থিক কার্যক্রমও পরিচালিত হইত।[১৭] তিনি এই বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতাকে অনেক সময় গোত্র স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়া হইত। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্র সংহতিতে অবক্ষয় সূচিত হয় এবং সমানুপাতিকভাবে মক্কার জনসমাজে ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে 'ব্যক্তিবাদের' বিকাশ ঘটে।[১৮]

তাৎক্ষণিকভাবে ইহাও উল্লেখ আবশ্যক যে, যমযমের পানি ব্যবহারের জন্য হজ্জযাত্রীদেরকে কর প্রদান করিতে হইত, এই দাবির সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য কর্তৃপক্ষীয় উৎস বা সূত্রের অস্তিত্ব নাই। সে যাহাই হউক, ল্যামেন্স যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন এবং যেসব সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন সেসবের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালের এক লেখক অত্যন্ত যথার্থ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ল্যামেন্স "কুখ্যাত অনির্ভরযোগ্য লেখক যাহার নাম কিছু সতর্কতা বা অনুমোদন ছাড়া কদাচিৎ উচ্চারিত হয়"।[১৯]

তবু ল্যামেন্স ও তাহার পূর্ববর্তীদের বক্তব্য ইসলামের অভ্যুদয়ের আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বেলায় আরও প্রয়াসে প্রভাব রাখিয়াই চলিয়াছে। এমনি করিয়া একদিকে ওয়েলহাওসেন, টোরি ও মার্গোলিয়থ এবং অন্যদিকে ল্যামেন্স ও তাহার সমগোত্রীয় লেখকদের

অভিমতের প্রতিফলন ঘটাইয়া আর. বেল ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, (ক) মক্কার বিত্ত ও সমৃদ্ধির অভ্যুদয় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা; (খ) জড়জাগতিক জীবনযাত্রার ব্যাপারে মক্কার সহিত সংস্কৃতিবান দেশগুলির যোগাযোগ ছিল। আর এইসব দেশের অবস্থান ছিল আরব সীমান্তের ঠিক বাহিরে; (গ) এইসব দেশের ধর্মীয় জীবনের কোন প্রভাব যদি মক্কাবাসীদের উপর পড়িয়া থাকে তাহা হইলে উহা ছিল সম্ভবত নেতিবাচক, যাহার ফলে মক্কার পুরাতন ধর্ম ক্ষুণ্ন হইয়াছিল; (ঘ) বিত্ত জনিত নব সমৃদ্ধি মক্কার পুরাতন জীবনযাত্রার মহানুভবতা সাম্যের মত বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের উপর ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং (ঙ) মুহাম্মাদ ﷺ মক্কাবাসীদের "বৈষয়িক বিষয়ে বিত্তবান অথচ আধ্যাত্মিক বিষয়ে পশ্চাদপদ" লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মন-মানসে উন্নততর আলোকপ্রাপ্ত দেশবাসীর[২০] ধর্মীয় জ্ঞান স্থানান্তরের চেষ্টায় নিয়োজিত হন।

শেষোক্ত দুইটি বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বেল সুনিদিষ্টভাবে মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধর্মীয় কার্যকলাপের সূচনার আলোচনায় লিখিয়াছেন, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রহমত ও করুণায় মানুষের নির্ভরশীলতায় ও "নিঃসন্দেহে ধর্মীয় অবক্ষয় এবং বিত্তের নব প্রবাহ, অহঙ্কারী ও উদ্ধত কুরায়শদের কল্যাণমূলক দায়-দায়িত্বের অবহেলায় আকৃষ্ট হইয়া ধর্মীয় শক্তির পুনরুজ্জীবনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন"। বলা আবশ্যক যে, "কুরায়শদের ইতোপূর্বেকার কল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন মক্কার জনসমাজের গোত্রজীবনে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখিয়াছিল এবং তাহাতে গোটা জনজীবনের কাঠিন্য অনেকটাই প্রশমিত ছিল"। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার মিশনের লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য "যাহারা ইতোমধ্যে একত্ববাদী ও একক প্রভুর উপাসক" তাহাদের ধ্যান-ধারণার শরণ লইয়াছিলেন"। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ উচ্চাভিলাষ লইয়া একত্বের উপাসনা[২১] তাঁহার নিজের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নামিয়াছিলেন তাহাদের সহিত বেল একমত নহেন। তিনি উল্লেখ করেন, "এই ধারণার ব্যাপারটি হইবে সূচনার সহিত ফলাফলকে তালগোল পাকাইয়া ফেলা"। কেননা বেলের মতে, নিঃসন্দেহে প্রথম হইতেই মুহাম্মাদ ﷺ -এর "লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় এবং সে লক্ষ্য রাজনৈতিক নানা পাঁয়তারামূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও মৌলিক দিক হইতে শেষাবধি অক্ষুণ্ন ছিল যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে মুহাম্মাদ ﷺ নিজে জড়িত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাতে সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন"।[২২]

এমনিভাবে গুরুত্ব আরোপের তাৎপর্য হইল, গোড়া হইতেই মহানবী ﷺ রাজনৈতিক প্রেরণায় কাজ করেন নাই। গোড়া হইতে শেষাবধি তাঁহার লক্ষ্য ছিল "ধর্মীয়"-এই দুই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিয়া বেল বাস্তবিকপক্ষে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইয়াছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ কেবল প্রচুর ধনাগমের পটভূমিকায় তাঁহার নিজ জনসমাজের আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলী সামাধানের চেষ্টা করিয়াছেন ধর্মীয় শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া—এই বক্তব্য দিয়া বেল মূলত তাহার পূর্ববর্তী, বিশেষত মার্গোলিয়থের অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র।

তাহার বক্তব্য এই যে, এক নূতন ধর্মব্যবস্থা দিয়া তিনি তাঁহার আর্থ-সামাজিক সংস্কার প্রকল্প বাস্তবায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন। বেলের অন্যান্য বক্তব্যও কম-বেশি তাহার পূর্ববর্তীদের অভিমতের পুনরুক্তি। তাই মক্কা সাম্প্রতিক কালে বিত্ত ও সমৃদ্ধির নূতন স্তরে উন্নীত হওয়ার পর কুরায়শরা যে "সংস্কৃতিবান বিভিন্ন দেশের সংস্পর্শে ছিল" সেহেতু তাহাদের নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির আদিমতা বা প্রাচীনতা সম্পর্কে তাহাদেরকে কিছু সচেতন করিয়া তোলে। এইসব দেশের সঙ্গে এই ধরনের যোগাযোগে, বিশেষ করিয়া ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ তাহাদের পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে। মহানবী ﷺ কেবল তাহার জনগণের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক পশ্চাৎপদতার মাঝে অস্তিত্বশীল অসংলগ্নতা দূর করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর উহা করিতে প্রেরণা গ্রহণ করিতে গিয়া "যাহারা ইতোমধ্যে একত্ববাদের উপাসক" (অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃস্টান) ছিলেন তাহাদের নিকট হইতে ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন, এই ধরনের প্রতিটি ও সকল বক্তব্যই ইতোপূর্বে দিয়াছেন বেল-এর পূর্বসূরী মুইর, মার্গোলিয়থ, টোরি ও অন্যরা। ইহা ছাড়া বিত্তের নয়া প্রবাহ কুরায়শদেরকে স্বার্থপর, অহঙ্কারী এবং তাহাদের পুরাতন জীবনের দয়াধর্ম ও সাম্যের ব্যাপারে উদাসীন করিয়া তোলে বলিয়া যাহা তিনি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা স্পষ্টত "গোত্রগত সংহতি ও ব্যক্তিবাদের" বিকাশের অবক্ষয় সংক্রান্ত ল্যামেন্স-এর অভিমতের এক ধরনের টীকাভাষ্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

মনে হয় বেল সর্বশেষ বক্তব্যটি দিতে কুরআনের গোড়ার দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। কুরআনের এইসব আয়াতের কয়েকটিতে কুরায়শ নেতাদের জড়জাগতিকতার এবং অভাবী ও ইয়াতীমদের জন্য তাহাদের সহানুভূতি ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কুরআনে কোথাও এমন কোন আভাস নাই যে, কুরায়শ নেতাদের ইহজাগতিকতা অথবা তাহাদের কর্তব্যের প্রতি অবহেলা তথাকথিত নূতন সম্পদের কারণে হইয়াছিল। বেল এই মর্মে ধারণা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় যে, যেহেতু আমরা প্রাক-ইসলামী আরব আতিথেয়তা, মহানুভবতা ও দানশীলতা সম্পর্কে এত শুনিয়াছি সেহেতু "নবলব্ধ" বিত্ত অবশ্যই কুরায়শদেরকে অহঙ্কারী, উদ্ধত এবং বেল-এর ভাষায়—তাহাদেরকে "পুরাতন জীবনের দয়াধর্ম ও সাম্যের চেতনার" ব্যাপারে অহঙ্কারী, উদ্ধত ও উদাসীন করিয়া থাকিবে।

তবে এই সিদ্ধান্ত দুইটি কারণে ভ্রমাত্মক। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, পুরাতন যুগের আরব জনসমাজ কেবলই সদগুণে ভরা ছিল। ঐ সমাজে কোন অনাচার, ভ্রান্তি ও অবিচার ছিল না। অথচ বাস্তবিকপক্ষে প্রাক-ইসলামী আমলে এমন কাল্পনিক আদর্শ আরব সমাজ আদৌ ছিল না। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, পুরাতন আরব সমাজে বঞ্চনা, প্রতারণা, লোভ, কৃপণতা, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যের অধিকার লঙ্ঘন ও সম্পত্তি গ্রাস ইত্যাদির মত বিপরীত দোষও ঐ সমাজে, বিশেষ করিয়া বেদুঈন যাযাবর গোত্রগুলিতেই বিদ্যমান

ছিল, যদিও এই বেদুঈনদের আর যাহাই হউক মক্কার উল্লিখিত নূতন বিত্তে তাহাদের কোন অবস্থা পরিবর্তনের কোন কথা থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, মক্কার কুরায়শদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মহানবী ﷺ -এর প্রপিতামহ হাশিম কর্তৃক বায়যান্টীয় কর্তৃপক্ষ, ইয়ামান, আবিসিনিয়া[২৩] ইত্যাদি দেশের সহিত কয়েক দফা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পর মক্কার বাণিজ্য সম্প্রসারণ এক নব পর্যায়ে উপনীত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত হইলেও ইহার অর্থ অবশ্য ইহা নহে যে, মক্কার কুরায়শদের এই নূতন বিত্ত হঠাৎ করিয়া প্রবাহিত হইতে শুরু করে এবং তাহারা এমন বিপুল বিত্তের অধিকারী হয় যাহার পরিণামে মক্কাবাসীদের দয়াধর্ম ও সাম্যনীতির পুরাতন ঐতিহ্য বাতিল হইয়া যায়। কেননা, যে কোন ও প্রতিটি জনসমাজে বিত্ত ও সমৃদ্ধি আসিলেই উহার অনিবার্য পরিণাম হিসাবে মহানুভবতার অবক্ষয় ও স্বার্থপরতার প্রসার ঘটায় না। আর ইহাও উল্লেখ আবশ্যক যে, গোত্রগত সংহতি সত্ত্বেও গোত্রের ব্যক্তি/সদস্যও দান ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারীরা তাহাদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে বেশ স্বাধীনতা ভোগ করিত। আর তাহারা গোত্রস্বার্থের উপরে তাহাদের ব্যক্তিস্বার্থকে সাধারণত বড় করিয়া দেখিত না। কথাটিকে এইভাবেও বলা যায় যে, "স্বার্থপরতা" ও "ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদ" যাহার কথা ল্যামেন্স বলিয়াছেন ও বেলের লেখায় প্রচ্ছন্ন, এইসব বস্তুর বেশ ভাল রকমের অস্তিত্ব ছিল প্রাক-ইসলামী জনসমাজে। মোটকথা এইসব বৈশিষ্ট্য নূতন ঘটমান ঘটনাপ্রবাহের কেবল একান্ত বিষয় বলা যায় না, সেগুলি আসিয়াছে বাণিজ্যের নয়া সম্প্রসারণের অনুষঙ্গ হিসাবে। যাহা বাস্তবিকপক্ষে সত্য তাহা হইল, প্রাক-ইসলামী জনসমাজে সম্ভবত কালের প্রতিটি জনসমাজ ও দেশের মতই ভালো-মন্দের যুগপৎ সমাবেশ ছিল। কুরআন পূর্ববর্তী সকল ঐশী প্রত্যাদেশের মত ভাল বা উৎকর্ষের অনুমোদন দেয় ও উৎসাহিত করে এবং মন্দের নিন্দা করে ও সংস্কার সাধন করে।

দুই ঃ এই মূলতত্ত্বে মণ্টগোমারী ওয়াট-এর অবদান

উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে ইসলামের জড়বাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সমাবেশে ওয়াট-এর অবদান উপলব্ধি করা সহজ হইবে। বৈষয়িক উপকরণগুলির ব্যাপারে "পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছেন" বলিয়া ওয়াট যে দাবি করিয়াছেন তাহা একদিকে তাহার পূর্ববর্তীদের উল্লিখিত অভিমতের প্রতিফলন, তেমনি অন্যদিকে গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপনায় সকল বিভিন্ন মতামতের অভিযোজন ও সমন্বয়ও বটে। তাই পূর্ববর্তীদের অভিমতসমূহের বিশদায়ন করিতে গিয়া ওয়াট বাস্তব তথ্যাদিকে প্রভাবিত করিয়া উল্লিখিত অভিমতগুলির পাঠের সাথে জবরদস্তিমূলক খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর অভিমতগুলি তাহার বক্তব্যে আত্মস্থ করিতে গিয়া এমন কিছু বিষয় তাহার মনোযোগ এড়াইয়াছে যাহার ফলে তাহার বক্তব্য অন্যান্য বাস্তবতার সহিত সাংঘর্ষিক।

গোড়াতেই বলা যায়, ওয়াট ল্যামেন্সের এই রায় মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন, "ইসলামের অভ্যুদয়কালে মক্কা কেবল একটি বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্রই ছিল না, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কেন্দ্রও ছিল। এই আর্থিক কেন্দ্রে জটিল ধরনের আর্থিক লেনদেন অনুষ্ঠিত হইত"।[২৪]

মনে রাখা দরকার, অন্যান্য প্রাচ্য বিশারদদের মধ্যে মার্গোলিয়থও মক্কার বাণিজ্যিক বিকাশের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ওয়াট ল্যামেন্সের এই অভিমতও গ্রহণ করিয়াছেন যে, কুরায়শ গোত্র পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য আরবের প্রতিবেশী গোত্রগুলির মধ্যে প্রাধান্য ভোগ করিত। তবে ল্যামেন্স কুরায়শগণ তাহাদের আধিপত্য বলবৎ করিতে ও তাহা বজায় রাখার জন্য দাসদের লইয়া গঠিত এক ভাড়াটে সেনাবাহিনী লালন করিত বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ওয়াট প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ল্যামেন্স-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, উহার পরিবর্তে ল্যামেন্স অন্য একটি বিষয়, যথা কুরায়শদের রাজনৈকিত নৈপুণ্য বা হিল্‌ম তত্ত্বের অবতারণা করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, "কুরায়শদের আধিপত্য তাহাদের ব্যক্তিগত সামরিক সামর্থ্যেই নিহিত ছিল না, বরং উহা নিহিত ছিল যে কোন বৈরী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সমবেত সামরিক শক্তি সমাবেশ ও প্রয়োগে তাহাদের সামর্থ্যে"। এই সামরিক শক্তির উৎস ছিল বিভিন্ন গোত্র সমবায় বা গোত্রমৈত্রীর মধ্যে। তাহারা মৈত্রী গড়িয়া তোলে তাহাদের বাণিজ্যিক উদ্যম ও উদ্যোগের ভিত্তিতে। ওয়াটের মতে, ইয়ামান, সিরিয়া ও অন্যত্র চলাচলকারী কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলির জন্য পথ-প্রদর্শক, সঙ্গী প্রহরা কাজ ও উষ্ট্রচালক হিসাবে বহু সংখ্যক বেদুঈনের প্রয়োজন ছিল। আর সে কারণে তাহারা একজন বেদুঈন সর্দারকে তাহাদের এলাকা দিয়া বাণিজ্যিক কাফেলা চলাচলের এবং পানি ও অন্যান্য রসদ সরবরাহের জন্য অর্থ প্রদান করিত। এমনি করিয়া কুরায়শগণ বেদুঈন গোত্রগুলিকে তাহাদের বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কভুক্ত করে। বেদুঈনগণও দ্রুত এক্ষেত্রে তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। মক্কার সাথে বেদুঈন গোত্রগুলির "এই সংহতিবোধ" কুরায়শ গোত্রপ্রধানদের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আঁতাত এবং মক্কার ব্যবসায়-বাণিজ্যের যৌথ মূলধনী সংস্থায় বেদুঈন গোত্রপ্রধানদেরকে শেয়ার বরাদ্দ দানের মধ্য দিয়া মক্কার আরও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।[২৫]

মক্কার ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক প্রয়াসকে "যৌথ মূলধনী কোম্পানী" বলিয়া মূলত যিনি আখ্যায়িত করেন তিনি হইলেন মার্গোলিয়থ।[২৬] অবশ্য ওয়াট কেবল "মক্কার পরিবার/খানা প্রধানের" কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াট এই মক্কার পরিবার প্রধানদের মধ্যে প্রতিবেশী ও বেদুঈন গোত্রগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি অবশ্য এমন কোন দৃষ্টান্তের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই যে দৃষ্টান্তে "বেদুঈন গোত্রপ্রধানগণ মক্কার যৌথ মূলধনী সংস্থা হইতে শেয়ার পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়"। আবদুল মুত্তালিবের মত মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাহাদের প্রতিবেশী কোন কোন গোত্রের সহিত বৈবাহিক মৈত্রী সম্পাদন করেন এবং এই ধরনের প্রতিবেশী গোত্রের সহিত কুরায়শদের মাঝে মাঝে মৈত্রী স্থাপিত হয়। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত গোত্রগুলি মক্কার বাণিজ্য কাফেলাগুলিতে মাঝে মাঝে অংশীদার হইবে এমন সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদিও আমাদের কখনও ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, যাযাবর বা বেদুঈন জীবন

দর্শনের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক কার্যত থাকিতে পারে না। সে যাহাই হউক, মাঝে মাঝে মক্কার বাণিজ্য কাফেলার যৌথ উদ্যোগ বা সামরিক মৈত্রী বা গোত্র মৈত্রীসমবায়ে এই ধরনের রায় বা কল্পনা খুবই কষ্টকল্পিত। গোত্রগুলির সহযোগিতার প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, এই ধরনের মৈত্রী বা গোত্রমৈত্রী সমবায়ের কুরায়শ প্রতিবেশী গোত্রগুলির উপর তাহাদের সামরিক শক্তির প্রভাব আরোপ করা হয়—এমন বক্তব্য একান্তই স্ববিরোধী।

ওয়াট কুরায়শদের বাণিজ্য কার্যকলাপ এবং মক্কায় ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লইয়া তাহাদের আন্তগোত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগসূত্র সন্ধান প্রয়াসে বলিয়াছেন যে, "মক্কার বাণিজ্য প্রধান জনসমাজে ক্ষমতার জন্য বরাবরই সংঘাতের অস্তিত্ব ছিল"। তিনি যদিও উল্লেখ করেন নাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মিশন এই ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য গতানুগতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারই একটি পর্যায়মাত্র, তবুও কার্যত তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম হইতেই কোন না কোনভাবে একজন রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন সেহেতু অন্ততপক্ষে প্রধান বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।[২৭] এইসব প্রধান বিষয় বা কুরায়শদের মধ্যকার "রাজনৈতিক গ্রুপিংগুলির" অন্যতম হিসাবে ওয়াট বানূ খুযা'আর নিকট হইতে মক্কার নিয়ন্ত্রণ কুসাই কর্তৃক ছিনাইয়া লওয়া, তাহার উত্তরাধিকারী বানূ আবদুদ দার ও বানূ আব্দ মানাফের মধ্যে কা'বার বিভিন্ন পদ ও কা'বার প্রশাসনিক কার্যাবলী লইয়া দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আল-আহলাফ ও আল-মুতায়্যাবূন নামে তাহাদের দুইটি গ্রুপ গঠন এবং এই বিষয় লইয়া তাহাদের শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় উপনীত হওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন।[২৮] ওয়াট এই ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী কালের হিলফুল ফুযূল গঠনের ঘটনাপ্রবাহের সম্পর্ক থাকার বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন।[২৯]

মক্কার বিষয়াবলীর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলিতে গিয়া ওয়াট অবশ্য আল-লিওয়া, আস-সিকায়া, আর-রিফাদা ইত্যাদির মত ঐতিহ্যিক পদের গুরুত্বকে খাটো করিয়াছেন, যদিও তাহার মত মার্গোলিয়থ ও ল্যামেন্স-এর মতের, বিশেষ করিয়া ল্যামেন্স-এর প্রতিধ্বনি বৈ আর কিছুই নহে। ওয়াট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আস-সিকায়া পদের আওতায় অর্থাগমের সুযোগ ছিল। কেননা হজ্জযাত্রী কর্তৃক যমযম কূপের পানি ব্যবহারের জন্য কর হিসাবে কিছু অর্থ আদায় করিতে হইত।[৩০] ইহার পর আরও এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মক্কা নগরীর বিষয়াবলীর পরিচালনায় ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব, তাহার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গুণাবলী তাহার নিজ শাখা গোত্রের শক্তি-সামর্থ্য ও ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করিত। ওয়াটের বর্ণনা অনুযায়ী, বানূ 'আব্দ শাম্স ও বানূ মাখযূম ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মিশন শুরু হওয়ার সময়ে মক্কার নেতৃস্থানীয় গোত্রগুলির মধ্যে শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী। এই সময়ে বানূ 'আবদ শাম্স-এর আবূ সুফ্য়ান ছিলেন কূটনীতি, বাণিজ্য ও অর্থ বিষয়ে যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তায় মক্কার নীতি নির্ধারণে আধিপত্যের অধিকারী। ওয়াট এমনকি আবূ সুফ্য়ানের এই অবস্থানগত মর্যাদাকে এথেন্সের পেরিক্লিসের মর্যাদার সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৩১]

আরও সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় এই যে, ওয়াট মক্কার ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য আন্ত-গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়কে তাহাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে আন্ত-গোত্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও অনুমান করিয়াছেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাণিজ্যিক জনসমাজে এই "রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব ক্রমান্বয়ে অন্যান্য গোত্রগুলির মধ্যকার সম্পর্ককেও প্রভাবিত করিয়াছে, যাহারা পরবর্তী কালে মক্কার বাণিজ্য কাফেলাগুলির সংস্পর্শে আসে। ইহা ছাড়াও তাহারা যেসব বৃহৎ শক্তির বাজারে আরব গোত্রগুলির পণ্য যাইত সেইসব বৃহৎ শক্তির সংস্পর্শে আসে"।[৩২] তিনি আরব গোত্রগুলির সহিত যে "মৈত্রী সমবায়ের" কথা বলিয়াছেন এবং যাহার উল্লেখ বক্ষমাণ রচনায় ইতোপূর্বে করা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে উহার পরিচয়ই তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বাণিজ্যিক পর্যায়ে আন্ত-গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই একই মূল ভাবটিকে তিনি বৃহৎ শক্তি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি দাবি করিয়াছেন যে, মক্কায় আবরাহার আক্রমণের সময় 'আবদুল মুত্তালিব আবিসিনিয়ার এই আক্রমণকারীর[৩৩] নিকট হইতে নিজের জন্য অনুকূল ব্যবসায়িক সুবিধা আদায়ের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।[৩৩] মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার যুব বয়সে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্র হইতে উৎখাত হইয়াছিলেন বলিয়া ওয়াট যে ধারণা দিয়াছেন উহারও নেপথ্যে একই ধারণা ক্রিয়াশীল ছিল।[৩৪] আন্ত-গোত্রীয় ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেপথ্যে তিনি একই অনুমান করিয়াছেন। ওয়াট ইহার বিশদায়ন করিয়াছেন হারবুল ফিজার ও হিলফুল ফুযূল সম্পর্কিত তাঁহার নিজ তত্ত্বে।[৩৫]

পরবর্তী অধ্যায়ে হারবুল ফিজার ও হিলফুল ফুযূল সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা রহিয়াছে।[৩৬] আবরাহার মক্কা অভিযানকালে আবদুল মুত্তালিবের ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াটের ধারণার অযৌক্তিকতা সম্পর্কেও এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।[৩৭] ইহা ছাড়াও তাহার ধারণায় মহানবী ﷺ তাঁহার সবচাইতে লাভজনক ব্যবসায়কার্য হইতে উৎখাত হইয়াছিলেন—এই মর্মে তাহার ধারণার আপাত যৌক্তিকতা ও স্ববিরোধী প্রকৃতির আসল চেহারা যথাস্থানে উন্মোচিত করা হইবে।[৩৮]

মক্কাবাসীদের রাজনৈতিক দলাদলির ঘটনা, যেমন কুসাই কর্তৃক মক্কা হইতে বানূ খুয্‌আকে উৎখাত, বানূ আবদুদ-দার ও বানূ আব্‌দ মানাফের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আল-আহলাফ ও আল-মুতায়্যাবূন ইত্যাদি গঠনের ঘটনা আদৌ মক্কাবাসীদের নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে উদ্ভূত নহে, বরং ইহার উৎপত্তি কা'বাঘরের ও মক্কার নগর প্রশাসন সম্পর্কিত পদ ও ক্ষমতার লড়াই হইতে। এই বিরোধেরও নিষ্পত্তি হয় সমঝোতার মাধ্যমে। বস্তুতপক্ষে হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ কর্তৃক বায়যান্টীয় ইয়ামানী কর্তৃপক্ষের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের আগে কয়েকটি আরব গোত্র উল্লিখিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর কুরায়শরা বাস্তবিকপক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য পরিসর ও ব্যাপ্তির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক তৎপরতায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। হাশিমের মক্কার বাণিজ্য উদ্যোগে আরব গোত্রগুলির সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বের যে চিত্র

আমরা পাই তাহাতে এমন কোন ধারণা আদৌ মিলে না যে, কুরায়শদের একটি গোত্রের একটি গ্রুপের বিরুদ্ধে আন্তগ্রুপ দ্বন্দ্বজনিত কারণে মৈত্রী কার্যকর হয়। মক্কা নগরীর চৌহদ্দির মধ্যে কুরায়শ বংশের বিভিন্ন গোত্র ক্ষমতা ও প্রভাবের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেও কুরায়শদের দুই প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে কখনও কথিত "বাণিজ্য যুদ্ধ" অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে কথিত বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও বিষয়টি কখনও তাহারা অন্য দেশের দরবারে বা বাজারে কিংবা বিজাতীয় গোত্রের নিকট উত্থাপিত করে নাই। এই ধরনের কাজ করিলে ইহা তাহাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ, বিশেষত অন্যান্য গোত্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক এবং মক্কার কাফেলা গোত্রীয় এলাকা গমনকালে নিরাপত্তার জন্য আত্মহত্যামূলক বিষয় হইত। কুরায়শ গোত্রগুলির কোন গোষ্ঠী তাহাদের অন্য কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্যেই কোন বিদেশী শক্তি বা বেদুঈন গোত্রের সহিত আঁতাত করে নাই। 'উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ একবার বায়যান্টীয় শক্তির সহায়তায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে তাহার নিজ গোত্র বানূ আসাদই বরং তাহার পক্ষ ত্যাগ করে এবং ঐ চক্রান্তে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৩৯]

মক্কার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ওয়াট যেভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন সে বিষয়ে বলা যায়, তিনি স্পষ্টত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোত্র বানূ হাশিমকে গৌণ ভূমিকায় দেখানোর স্পষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। আর এই কারণেই কা'বাঘর ও মক্কা নগর প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদগুলির কাজকে খাটো করিয়া দেখানো হইয়াছে। একই সাথে আস-সিকায়া নামে যে পদটি ছিল বানূ হাশিমের দখলে সেই পদের আওতায় কেবল মক্কার হজ্জযাত্রীদের নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায়ের সুযোগমাত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কটাক্ষপাতের সঙ্গে সঙ্গে আবরাহার মক্কা অভিযানকালে তাহার নিকট হইতে আবদুল মুত্তালিবের বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ তোলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বানূ হাশিমকে অপবাদ দেওয়া। একই উদ্দেশ্যে আবদুল মুত্তালিব আবরাহার তথা আবিসিনীয় আক্রমণের পরেও প্রায় পাঁচ বৎসরসহ মোট অর্ধ শতকেরও বেশি কাল কী করিয়া মক্কার কার্যত প্রধানের পদে বহাল রহিয়া গেলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেমন করিয়া আধিপত্য বজায় রাখিলেন তাহার কোন প্রকার উল্লেখই ওয়াট করেন নাই। এমনকি তাহার মৃত্যুর পরও বানূ হাশিম গোত্র কা'বা প্রশাসনে নানা ধরনের ঐতিহ্যিক ভূমিকা পালন করা ছাড়াও মক্কার নানা বিষয়ে অত্যন্ত প্রধান ও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম প্রচার মিশনের অন্তত সপ্তম বৎসর অবধি সকল গোত্রের সম্মিলিত বিরোধিতার মুখেও বানূ হাশিম-এর সফল মর্যাদাগত অবস্থান রক্ষার ঘটনায়। এইসব তথ্যের কোনটিরই উল্লেখ ওয়াটের মক্কার বিষয়াবলী সংক্রান্ত বর্ণনায় নাই।

কুরায়শ এবং খোদ মক্কা নগরী গুরুত্ব ও অবস্থানগত এমন মর্যাদা ভোগ করিয়াছে কেবল সেখানে কা'বাগৃহ অস্তিত্বশীল ছিল বলিয়া, বিষয়টি বিতর্কাতীত। এই কা'বার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল

সকল আরববাসী। তাহারা মক্কা সফর করিত এবং বৎসরে একবার হজ্জ পালন করিত। মক্কার অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য সামগ্রিকভাবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগ সংশ্লিষ্ট ছিল আল্লাহ্‌র গৃহ কা'বার সহিত। অতএব সুনিশ্চিতভাবেই কা'বার প্রশাসন এবং বার্ষিক হজ্জ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করিয়া হজ্জ মৌসুমে খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করা ছিল মক্কানগরীর বিষয়াবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শহরের নাগরিক জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ও সকল মনোযোগের দাবিদার কাজটির দায়িত্ব ছিল কুরায়শদের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে বানূ হাশিমের। এই কাজ বা পদটির গুরুত্ব কতখানি তাহা আরও স্পষ্ট হইবে যদি ইহা মনে রাখা হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ধর্মীয় বিষয় যাহারা নিয়ন্ত্রণ করিত তাহাদেরকেই সংশ্লিষ্ট জনসমাজে সবচেয়ে উন্নত অবস্থানের মর্যাদার অধিকারী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হইত। "ধর্মীয় বিষয়াবলীর" প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ কখনও সঙ্কীর্ণ ধারণায় একান্তভাবে "ধর্মীয়" প্রকৃতির ছিল না। আর এই কাজগুলিকে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়াও মনে করা হইত। ওয়াট অবশ্য মক্কার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তাহার লেখায় এইসব বিষয় পুরাপুরি উপেক্ষা করিয়াছেন।

বিপরীতক্রমে তিনি তাহার মনোযোগ প্রধানত সন্নিবেশিত করিয়াছেন মালা (ملا) অর্থাৎ নগরীর বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিষদের গুরুত্বের প্রশ্নে। এই মালা বা বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিষদ কার্যত ছিল আন-নাদওয়া যাহা মক্কার বিষয়াবলী প্রশাসন কর্তৃপক্ষের পাঁচ বা ছয়টি বিভাগের অন্যতম চিরায়ত বিভাগ। মালার কার্যাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে যাইয়া ওয়াট বলিয়াছেন যে, নগরীর বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে কোন গোত্রের গুরুত্ব ও প্রভাব নির্ভর করিত ঐ গোত্রের ব্যক্তি সদস্যদের বিত্ত ও বুদ্ধিমত্তার উপর।

ধনসম্পদ ও বুদ্ধিমত্তা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে বিবেচ্য ছিল নিঃসংশয়ে যাহা সকল যুগের সকল সমাজের ক্ষেত্রেই সত্য ও বাস্তব। কিন্তু বানূ 'আব্‌দ শাম্‌স ও তাহাদের মিত্রগোত্রগুলি মালা বা বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদের অধিবেশন বা সমাবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। ইহা তাহারা করিত কেবলই এইসব গোত্রের সদস্যরা কূটনীতি, বাণিজ্য ও আর্থিক বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে বিত্ত ও মেধার অধিকারী বলিয়া নহে, বরং প্রধানত তাহারা ঐ ভূমিকা পালন করিত আহ্‌লাফ ও মুতায়্যাবূনের মধ্যে সম্পাদিত আপোষ-রফাক্রমে। আর একই ভিত্তিতে আন-নাদওয়া ও আল-লিওয়ার কাজগুলির দায়িত্ব প্রদান করা হয় বানূ আবদ শাম্‌স গোত্রকে। এখানে উল্লেখ যথার্থ যে, সকল গোত্রের সম্মতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাইত না। ওয়াট এই সম্মতির বিধানটির উল্লেখ করিয়াছেন ঠিকই, তবে এই সাথে আরও উল্লেখ করিলে ভালো করিতেন যে, মক্কায় আবরাহার আক্রমণের সময় 'আবদুল মুত্তালিব প্রকাশ্যে আবরাহার সহিত দর কষাকষির যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাহা তিনি নিশ্চয় সকল গোত্রের সম্মতিক্রমেই করিয়াছিলেন। ইহার সহজ-সরল কারণটি হইল, 'আবদুল মুত্তালিব আর যাহাই হউক এককভাবে মক্কার নগর জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বড় সিদ্ধান্ত লইতে পারেন না।

পরিশেষে ওয়াট স্পষ্টত মক্কার অন্যান্য নেতাকে উপেক্ষা করিয়া আবূ সুফ্য়ানের মর্যাদা ও অবস্থানকে স্ফীত করিয়াছেন। আবূ সুফ্য়ান কোনক্রমেই মক্কার পেরিক্লিসের মর্যাদা পাইতে পারেন না তো বটেই, তিনি মহানবী ﷺ -এর মদীনায় হিজরতের আগে অবধি মক্কার দৃশ্যপটে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে উদিত হইতেই পারেন নাই। মক্কায় মহানবী ﷺ -এর হিজরতের আগে তাঁহার বিরোধিতায় নেতৃত্বে ছিল আবূ জাহ্ল্, উতবা ইব্ন রাবী'আহ, আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, এমনকি বানূ হাশিমের আবূ লাহাব; আবূ সুফ্য়ান মোটেও নহে। এইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওয়াটের মক্কার বিষয়াবলী সংক্রান্ত বিবরণ স্পষ্টত পক্ষপাতদুষ্ট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ওয়াটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি, কুরায়শদের নিজেদের মধ্যে আন্ত-গোত্রগত বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলিয়া যদি ধরিয়াও লওয়া হয় তবুও বলিতেই হইবে যে, সেই কাঠামোর পরিসরে ওয়াট তাহার ধ্যান-ধারণার বিস্তার করিয়াছেন, ধারণা পরিগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারই পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে, বিশেষ করিয়া এই ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন যে ঃ

(ক) মক্কায় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও বিত্তের নবপ্রবাহ পুরাতন যুগের দয়াধর্ম ও দানশীলতার গুণকে ধ্বংস করিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা স্থান করিয়া লইয়াছে; বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও সেই সাথে বহির্বিশ্ব এবং ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মের সহিত যোগাযোগের কারণে মক্কার পৌত্তলিক ধর্ম ও গোত্রগত সংহতিতে অবক্ষয় দেখা দেয়;

(গ) নব জড়বাদী বিকাশ এবং আদিম আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার মাঝে এইভাবে অসঙ্গতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এইগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়;

(ঘ) এই ধরনের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ ﷺ মূলত আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য এক ধর্মীয় সমাধান প্রদান করেন;

(ঙ) এই মিশন সম্পন্ন করিতে যাইয়া মুহাম্মাদ ﷺ ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্ম হইতে ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেন।

এইগুলি হইল ওয়াটের পূর্বসূরীদেরই অভিমত। ওয়াট ইসলামের সামাজিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় পটভূমিকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন ঐসব অভিমতেরই বিশদায়নের মাধ্যমে।[৪০] তাহা ছাড়া তিনি তাহার বক্তব্যে কুরআনের প্রথম দিকের অবতীর্ণ আয়াতগুলির বক্তব্যের সঙ্গে আলোচ্য কালের পরিস্থিতির সহিত সম্পর্ক খুঁজিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।[৪১] সামাজিক পটভূমির আলোচনায় ওয়াট দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে গোত্র সংহতিতে একটা অবক্ষয় ঘটে এবং আনুপাতিকভাবে ব্যক্তিবাদ বিকশিত হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, গোত্র সংহতির ধারণাটি "সাধারণভাবে মক্কা নগরীর জন্য প্রযোজ্য", তাহা কখনও সর্বাত্মক ছিল না। গোত্রের সদস্যরা সাধারণত যান্ত্রিকভাবে আত্মকেন্দ্রিক নহে, বরং তাহারা স্বার্থপরতাপ্রবণ মানুষ যাহা ল্যামেনসের ভাষায় "ব্যক্তিবাদ"। তাই যদি কখনও গোত্র সদস্যরা তাহাদের নিজ ও একান্ত স্বার্থকে গোত্র

স্বার্থের উপরে স্থান দিয়া থাকে উহা অস্বাভাবিক নহে।[৪২] ইহা ছাড়াও যদিও মক্কার সেরা ব্যক্তিদের কার্যকলাপে গোত্র সংহতির বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হইত তবুও ইহাও সত্য যে, তাহাদের ধ্যান-ধারণায় কিছু ব্যক্তিবাদী ধারণার উদয় ঘটিয়াছিল। আর এই ব্যক্তি স্বার্থপ্রবণতা লালিত হইয়াছিল মক্কায় তৎকালীন বাণিজ্যিক পরিবেশে। এইজন্য ওয়াট বলিয়াছেন যে, আবূ লাহাব তাহার গোত্রের অভিমতের সহিত একমত ছিল না। সে মহানবী ﷺ -এর বিরোধিতা করে, উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছের প্রতি বিরোধিতা তাঁহার নিজ গোত্রের মধ্য হইতেই আসে" এবং তাহাদের গোত্রের অসম্মতি, এমনকি পিতা-মাতার অসম্মতি সত্ত্বেও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।[৪৩]

ঐ একই সময়ে আরও "একটি কৌতুহলোদ্দীপক নূতন বিষয় মক্কায় পরিলক্ষিত হয়"। উহা হইল অভিন্ন বৈষয়িক স্বার্থের ভিত্তিতে সংহতি ও একতাবোধ। এই কারণেই ব্যবসায়ে অংশীদারির ব্যাপারটি অনেক সময় গোত্র সম্পর্ক জলাঞ্জলি দিয়াও গড়িয়া উঠে। বৈষয়িক স্বার্থের এই অভিন্নতাবোধই আহ্‌লাফ ও মুতায়্যাবূন সংগঠনকে তাহাদের বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনুপ্রাণিত করে। এই বৈষয়িক স্বার্থের অভিন্নতাবোধই তাহাদের দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া বদর যুদ্ধের পর একটা কোয়ালিশন সরকার গঠনে প্রেরণা জোগায়। এইসব কিছুরই তাৎপর্য এই ছিল যে, এতদিন রক্তের আত্মীয়তা যে বন্ধন হিসাবে কাজ করিতেছিল উহার বাঁধন শিথিল হইয়া যায় এবং কোন এক নূতন ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখা দেয়।[৪৪] ওয়াট[৪৫] তাহার চূড়ান্ত বক্তব্যে বলিয়াছেন, "আমরা যদি ইসলামের উৎপত্তির সহিত মক্কার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্পর্কসূত্র সন্ধানে প্রয়াসী হই"—

"তাহা হইল সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই উহার কারণ মক্কায় নববিত্ত ও ক্ষমতার প্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। উহা করিলে আমরা দেখিব যে, যাযাবর অর্থনীতি সওদাগরি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে মোড় নিয়াছে। মুহাম্মাদ ﷺ -এর সময়ে অবশ্য মক্কার জনসমাজে সামাজিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় মনোভাবে কোন পুনঃসমন্বয় ঘটে নাই, বরং মক্কার জনসমাজের আচরণ তখনও বহুলাংশেই যাযাবর জনসমাজের আচরণের অনুরূপ ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁহার কতিপয় সমসাময়িক ব্যক্তি যে উদ্বেগ অনুভব করেন তাহা নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মানুষের সচেতন মনোভাব ও তাহাদের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যকার বৈপরীত্যের কারণে ঘটে"।

প্রাক-ইসলামী "নৈতিক আদর্শ"[৪৬] এবং "ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি"[৪৭] সম্পর্কে এইসব ধারণাই কমবেশি তাহার লেখায় প্রকাশ পাইয়াছে। ওয়াট উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলিয়াছেন ঃ

(ক) সাধারণভাবে ইহা স্বীকার্য যে, পুরাতন পৌত্তলিক ধর্মকে অবক্ষয় দশায় ধরিয়াছিল;[৪৮]

(খ) মুরু'আ (ব্যক্তিত্ব)-র নৈতিক আদর্শও অবক্ষয় দশায় পড়িয়াছিল। এই মুরু'আর আদর্শাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল মহানুভবতা, দানশীলতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি যাহা গোত্রীয় মানবতাবাদেরই

অনুরূপ। এইসব আদর্শ ও ব্যক্তিবাদের (স্বার্থপরতা, হীনতা ও কার্পণ্য)[৪৯] বিকাশের কারণে গোত্রীয় মানবধর্ম ক্ষয়িষ্ণু হইতে থাকে;

(গ) আরবদের মাঝে একত্ববাদী প্রাক-প্রবণতা আবশ্যিকভাবে প্রধানত ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে আসিয়াছিল"।[৫০]

এখানে বলা অনাবশ্যক যে, ওয়াটের উল্লিখিত বক্তব্যগুলি তাহার পূর্ববর্তী, বিশেষত মার্গোলিয়থ ও বেলের অত্যন্ত অনুরূপ। খৃষ্টান ও ইয়াহূদী প্রভাবের বিষয়টি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে।[৫১] এখানে এই মূল অনুমান, যেমন মক্কার বাণিজ্যিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির কারণে ব্যক্তিবাদের প্রসার ঘটে, গ্রহণযোগ্য নহে। আবার ব্যক্তিবাদের জন্য মক্কার গোত্র সংহতিতে ফাটল ধরে এবং মুরু'আর (ব্যক্তিত্বের) পুরাতন আদর্শ অবক্ষয়ের মুখে পড়ে, এই দাবিও উল্লিখিত কারণেই গ্রাহ্য নহে।

প্রথমত, বৈষয়িক স্বার্থের অভিন্ন কারণ জনিত ঐক্যবোধের ফলে আহলাফ ও মুতায়্যাবূনকে দুই তরফে তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া সমঝোতা করিতে হইয়াছে বলিয়া ওয়াট সঠিকভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি একই ধরনের উপলব্ধি কুরায়শ গোত্রগুলিকে বদরের যুদ্ধে পরাজয় বরণের পর "কোয়ালিশন সরকার" গঠনে বাধ্য করিয়া থাকে তাহা হইলে "নূতন বিষয়" অবশ্য কোনভাবেই ওয়াটের ধারণার মত "কৌতুহলোদ্দীপক" হইতে পারে না। প্রায় এক শতকের কালপরিক্রমায় দুইটি ঘটনা ঘটে। ইহার একটি হইল মহানবী ﷺ -এর ৫২ বৎসর বয়সে বদরের যুদ্ধ। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ্‌র বয়স ছিল আনুমানিক ২৫ বৎসর। আবদুল্লাহ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিতা আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের বয়সও অনুরূপভাবে ২৫ বৎসরের মত। হাশিমের যৌবনকালে আহলাফ ও মুতায়্যাবূনের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি হয়। এই বিষয়টিও উপেক্ষার নহে যে, কুরায়শদের বাণিজ্য প্রয়াসের সম্প্রসারণ ঐ সমঝোতা বা নিষ্পত্তির ঘটনার পরও প্রধানত হাশিমের বিচক্ষণ নীতি ও নেতৃত্বের সুবাদে ঘটে। অভিন্ন বৈষয়িক স্বার্থভিত্তিক ঐক্যবোধ কিংবা বলা যায়, ওয়াট যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন উহা মহানবী ﷺ -এর আমলের কোন নূতন ঘটনা নহে কিংবা উহার উৎপত্তি বাণিজ্যিক বিকাশ হইতেও ঘটে নাই। এই ধরনের সাধারণ জ্ঞান কিংবা বাস্তবতাবোধ সাধারণত আরবজাতি, বিশেষত কুরায়শদের মত কঠিন ও মরু পরিবেশে বসবাসকারী লোকজনের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, অভিন্ন বৈষয়িক স্বার্থজনিত ঐক্যবোধ হাশিমের আমলে ও বদরের যুদ্ধের পরেও কুরায়শদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। এই কারণে ইহা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে যে, একই কুরায়শ গোত্রগুলি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছোটখাটো বিষয় লইয়া মক্কায় তাহাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ অব্যাহত রাখিবে ও এই বিরোধ বিদেশী রাষ্ট্রের দরবারে ও বেদুঈন গোত্রগুলির সমীপে উত্থাপন করিবে। অভিন্ন বৈষয়িক স্বার্থের অভিন্ন চেতনা নিশ্চয়ই তাহাদের এই ধরনের বিবাদ-বিরোধে লিপ্ত হইবার অপরিণামদর্শিতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দিবে। ইতিমধ্যেই উল্লেখ

করা হইয়াছে যে, নিজেদের গোত্রস্বার্থের বিরুদ্ধে যাইয়া কোন কুরায়শ গোত্র কখনও কোন বিদেশী শক্তি বা কোন বেদুঈন গোত্রের সহিত কোনরূপ বাণিজ্যিক বা সামরিক চুক্তি করিয়াছে এমন কোন নজির নাই।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ে অংশীদারির বেলায় অনেক সময় গোত্র সম্পর্ক উপেক্ষিত হইয়াছে, এমন কথা বলা এবং ব্যক্তিবাদের বিকাশের বেলায় ইহার দৃষ্টান্ত দিয়া ওয়াট একটি মৌলিক ভুলের ধাঁধায় বৃথাই শ্রম ও সময় অপচয় করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় তিনি বলিতে চাহেন যে, এই ঘটনার আগে কুরায়শদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ গোত্র সম্পর্ক-পরম্পরা ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু উহা বাস্তবিকপক্ষে কখনও ঘটে নাই। কুরায়শ উপজাতি বা গোত্র কখনও এমনভাবে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। তাহারা ব্যবসায় করিয়াছে গোত্রের সদস্য ও ব্যক্তি হিসাবে, তাহাদের গোত্রের নামে বা পক্ষে নহে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। বিদেশগামী একটি বাণিজ্য কাফেলায় কয়েকজন ব্যবসায়ী অন্তর্ভুক্ত থাকিত। আর তাহারা বলিতে গেলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হইত বিভিন্ন গোত্রের লোক, যাহাদের সঙ্গে থাকিত পরিবারবর্গ ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। এই কাফেলাকে কেবল এই ধারণাতেই কোম্পানি বলা যায় যে, ইহা ছিল ব্যবসায়ীদের একটা সাহচর্যবিশেষ, যাহা আর যাহাই হউক তাহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত মূলধনের মিলিত পুঁজির ধারণা ভিত্তিক কোন যৌথ মূলধনী সংস্থা নহে, বরং এই কাফেলাকে একত্রে ভ্রমণের যৌথ উদ্যোগ বলা চলে, যাহাতে নিরাপত্তা পাওয়া যায় ও অন্যান্য সুবিধাও পাওয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে প্রতিটি ব্যবসায়ী ব্যক্তি তাহার নিজ মূলধন দিয়া ব্যবসায় করিত এবং সেইসাথে তাহাদের ব্যবসায়ে অনুপস্থিত অংশীদারের মূলধন লইয়াও তাহারা ব্যবসায় করিত। যেমন বিভিন্ন গোত্রের ব্যক্তিবিশেষে বিবাহের ভিত্তিতে মৈত্রী বা আঁতাত গড়িয়া উঠিতে পারে, তেমনি একইভাবে তাহারা অংশীদারি ব্যবসায়েও চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে, হইয়াও থাকে। আর তাহা গোত্রগত মৈত্রী ক্ষুণ্ন না করিয়াও সম্ভব। বিষয়টি নূতন কোন কিছু নহে এবং তাহাতে গোত্রসম্পর্ক ক্ষুণ্ন না হইবারও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

চতুর্থত, ওয়াট ল্যামেন্স-এর অনুসরণে স্বার্থপরতা বা কারও নিজ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টিকে স্বাতন্ত্রবাদ বলিয়া সবকিছু গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যায় ওয়াট আবূ লাহাবের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আবূ লাহাব তাহার গোত্রের বিরুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতা করে। উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ তাহার গোত্রের তুলনায় ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে এবং প্রথম যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন তাহারা তাহাদের গোত্র বা পরিবারের অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের ঐ নূতন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলি অন্তত একটি বিষয়ে হইলেও গলদপূর্ণ। একদিকে আবূ লাহাবের ইসলাম বিরোধিতায় এত বিভ্রান্তিকর ও স্ববিরোধী আচরণ এবং অন্যদিকে প্রথমদিকে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের এতখানি নিষ্ঠায় ইসলাম গ্রহণ অভিন্ন কোন বিষয়ের বা একই

ধরনের ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদের কারণে হইতে পারে না। আবূ লাহাব ও উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ যাহা করিয়াছিল নিঃসন্দেহে তাহা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত, কিন্তু ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের বিচার-বিবেচনা যাহাই হউক না কেন নিশ্চয়ই স্বার্থপরতা বা নিজ বৈষয়িক স্বার্থ দেখার জন্য তাহারা তাহা করেন নাই। এমনকি তাহাদের কাজকে যদি ব্যক্তিবাদের লক্ষণ বলিয়াও ধরা হয় তাহা হইলেও ল্যামেন্স ও ওয়াট যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইহার উৎস ও প্রেরণা আবশ্যিকভাবে নিশ্চয়ই এমন কিছু যাহা বাণিজ্য বা নূতন অর্থাগমের সহিত সম্পর্কিত ছিল না। অন্য কথায়, তাঁহারা উভয়ে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের কথা বলিয়াছেন তাহা স্মরণাতীত কাল হইতে আরবদের মাঝে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ অস্তিত্বশীল ছিল উহার সহিত অভিন্ন।

তাই বাণিজ্যিক উন্নতি ও প্রগতি ব্যক্তিবাদের অভ্যুদয় ঘটায় এবং যাহার কারণে গোত্র সংহতি ও মুরু'আর আদর্শ ক্ষুণ্ন হইয়াছে এবং সেই অবকাশে নূতন ভিত্তিতে জনসমাজের পুনর্গঠনের সুযোগ হইয়াছে বলিয়া যে বক্তব্য দেওয়া হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক। ঐ ঐতিহাসিক কালপরিক্রমায় যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বোধগম্য তাহা আরব উপজাতীয় সমাজের সহজাত প্রকৃতি। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই অস্তিত্বশীল। স্বার্থপরতা, কার্পণ্য, ক্রূরতা, অভাবী ও অশক্ত মানুষের ব্যাপারে ঔদাসীন্যের মত দোষ, দানশীলতা, মহানুভবতা, আতিথেয়তা ও বিশ্বস্ততার মত মানবীয় মহৎ গুণাবলী তৎকালের আরব সমাজে পাশাপাশি সহাবস্থান করিয়াছে। তাই গোত্র সংহতির কোন অবক্ষয় যেমন ঘটে নাই, তেমনি সমাজ সংহতি ব্যবস্থার কোন বিকল্প সংস্থান কোন আশু ও বোধগম্য আবশ্যকতাও দেখা দেয় নাই। ইহা ছাড়া "মক্কার অভ্যুদয়ে সেখানে যাযাবর অর্থনীতি হইতে সওদাগরি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্তরণ ঘটিয়াছে" বলিয়া যে বক্তব্য দেওয়া হইয়াছে উহা কার্যত এক জটিল পরিস্থিতির সরলায়ন ও ভ্রমাত্মক উপস্থাপনাবিশেষ। যাযাবর জনসমাজের পাশাপাশি ব্যবসায় কার্যকলাপ ও বাণিজ্যবাদী ব্যবস্থা স্মরণাতীত কাল হইতেই আরবে অস্তিত্বশীল ছিল বলিয়াই দেখা যায়।[৫২] মহানবী -এর শত বৎসর আগে তাঁহার প্রপিতামহের পিতা হাশিম পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ও কিছু বেদুঈন গোত্রের সহিত কয়েক দফায় কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন যাহা বাস্তবিকপক্ষেই ছিল উত্তম বাণিজ্যিক ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আর ইহাকে যাযাবর জনসামাজিক বৈশিষ্ট্য হইতে কোনক্রমে নূতন বাণিজ্য সমাজে রূপান্তর বুঝায় না।

বাস্তবিকপক্ষে ওয়াট মার্গোলিয়থ ও বেল-এর এই তত্ত্বকে যৌক্তিক প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, মক্কার নূতন পরিস্থিতির কারণে সেখানকার পুরাতন সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, গ্রিমে (Grimme) মক্কায় ইসলামের আবির্ভাবের যে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার কিছু উপাদানও ওয়াট তাঁহার বক্তব্যে আত্মস্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আর এইভাবে ওয়াট প্রয়াস পাইয়াছেন প্রথমদিকে

অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের আয়াতগুলির সহিত সমসাময়িক পরিস্থিতির[৫৩] একটা সম্পর্ক প্রদর্শন অথবা তিনি যে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ দিয়াছেন উহার যৌক্তিকতা প্রদান করিতে।

ওয়াট কেবল ব্যক্তিবাদের বিষয়েরই পুনরুক্তি করেন নাই কিংবা সংহতির অবক্ষয়সহ উহার বিস্তারিত বিশদায়নই করেন নাই, তিনি বরং আরও অগ্রসর হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, বাণিজ্যবাদের বিকাশের কারণে মক্কায় একান্ত বিশুদ্ধ অর্থে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকিলেও "ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে" এবং ধনীদের মধ্যে বা খুব বেশী ধনী নয় বা খুব বেশি গরীব নয় এমন লোকজনের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায়[৫৪] এবং এই পরিস্থিতির পটভূমিকায় দীন ইসলাম সমাজের একেবারে তৃণমূল পর্যায় তথা সবচেয়ে গরীবদের মধ্য হইতে নহে, বরং মধ্য স্তরের জনগণের সমর্থন লাভ করে। ইহা তাই 'যাহারা বিত্তবান' ও 'যাহারা নিতান্তই বিত্তহীন' তাহাদের মধ্যকার, বরং 'যাহাদের ছিল' ও 'যাহারা প্রায় সচ্ছল'[৫৫] তাহাদের মধ্যকার সংগ্রামের বিষয়। এই বক্তব্য সন্দেহতীতভাবেই মক্কায় ইসলামের আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে গ্রিমে তাঁহার যে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন উহার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে ওয়াটের বক্তব্যে ইহার ঈষৎ সংশোধন করা হইয়াছে মাত্র। এইসব অবশ্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইসলাম প্রচার মিশনের প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রথমদিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলির বিষয়বস্তুও। ওয়াটের এই বক্তব্য ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য উল্লিখিত কারণে এই রচনার শেষদিকে আলোচিত হইয়াছে।[৫৬]

অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন

তথ্যসূত্র

১. Watt, M. at M., Introduction, x-xi, এমনকি জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সতর্ক সংশয় প্রকাশ সত্ত্বেও ওয়াট সমালোচনা এড়াইতে পারেন নাই। তাহাকে এইজন্য তাহার সমগোত্রীয় লেখকদের মধ্যে মার্কসবাদের "Episcopalean clergyman" of Marxism বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে (G.H. Busquet-এর মন্তব্য; সূত্র ঃ Maxime Rodinson. A Critical survey of modern studies on Muhammad," Studies on Islam, ed. Marlin Swartz, O.U.P. 1981, p.47) রডিনসন স্বঘোষিতভাবে একজন জড়বাদী হইলেও তিনি ওয়াটের বক্তব্যের 'তীক্ষ্ণতা' ও 'প্রাঞ্জলতার' সুখ্যাতি করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬, ৪৭) এবং ওয়াটের লেখা হইতে তাহার দৃষ্টিভঙ্গি তিনি তাহার নিজ রচনা Muhammad-এ পরিগ্রহণও করিয়াছেন।

২. Hubert Grimme, Mohammed (Darstellungen etc., Band 7), vol. I, Munster 1892, Ch. 1, especially p. 14.

৩. C. Snouck Hurgronje, "Une nouvelle biographie de Mohammed, R.H.R., 1894, pp. 48-70, reproduced in Hurgronje, Selected Works etc., Leiden 1957, pp.109-149.

৪. J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, 2nd edition, Berlin 1897, p.93. quoted in Margoliouth, op. cit., p. 32.

৫. C.C. Torrey, The Commercial-Theoligical Terms of the Koran, Leiden 1892.

৬. Margoliouth, op. cit., p.24.

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. কুরআন ২ ঃ ৭১, ২ ঃ ২২৩, ২ ঃ ২৬৪-২৬৬, ৬ ঃ ১৩৬-১৩৮, ৬ ঃ ১৪১; ১৩ ঃ ৩-৪, ১৬ ঃ ১১, ১৮ ঃ ৩২-৪২, ২৬ ঃ ১৪৬-১৪৮, ৩৪ ঃ ১৫-১৬, ৩৬ ঃ ৩৩-৩৬, ৪৪ ঃ ২৫-২৭; ৪৮ ঃ ২৯, ৫০ ঃ ৭-১১, ৫৬ ঃ ৬৩-৬৪, ৬৮ ঃ ২২, ৭১ ঃ ১১-১২, ৭৮ ঃ ১৬ ইত্যাদি।

১১. কুরআন, ৪২ ঃ ২০।

১২. কুরআন, ৩৫ ঃ ৯, ৫০ ঃ ১১।

১৩. কুরআন, ২ ঃ ২২৩।

১৪. The Cambridge Medieval Histiry, vol. II (ed. H.M. Gwatkin and J.P. Whitney), Cambridge 1913, pp. 330-332.

১৫. H. Lammens, La Mecque a la Veille de l'Hegire, Beirut 1924, p.55.

১৬. প্রগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

১৮. H. Lammens, Le Berceau de l'Islam : l'Arabie Occidentale a la Veille de l'Hegrie, Rome 1914, pp. 187 ff., cited in Watt, M.at M., p. 18.

১৯. Patricia Crone, Meccan trade and the rise of Islam, Oxford 1987, p.3.

২০. R. Bell, "Who were the hanifs", M.W., 1930, pp. 121-122.

২১. R. Bell, "The beginning of Muhammad's religious activity", T.G.U.O.S., VII (pp. 16-24), p.23.

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২৩. Patricia Crone, প্রাগুক্ত, বাস্তবিকপক্ষে তিনি অসহনীয় চরম মনোভাবে আক্রান্ত হইয়া এই মর্মে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "মক্কার বাণিজ্যিক কার্যকলাপ" সংক্রান্ত বরাবরের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিটি "ইসলামের আবির্ভাবের আনুমানিক ছয় শত বৎসর আগে দক্ষিণ আরব ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির মধ্যকার বাণিজ্যিক লেন-দেনের প্রাচীন বিবরণের ভিত্তিতে এই বিষয়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছে।

২৪. Watt, M, at M, 3.

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

২৬. উপরে দ্র. পৃ. ৯৬, আরও দ্র. Margoliouth, op. cit.. 30-31.

২৭. Watt, M. at M., 4.

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৮।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৩৩. নিম্নে দ্র. পৃ. ১৩৮-১৩৯।

৩৪. নিম্নে দ্র. অধ্যায় ৮, পৃ. ২।

৩৫. Watt. M. at M., 6-8. 14-16.

৩৬. দ্র. অধ্যায় ৯।

৩৭. নিম্নে দ্র. পৃ. ১৩৯-১৪০।

৩৮. নিম্নে দ্র. পৃ. ১৮৯-১৯০।

৩৯. Watt. M. at M., 15-16.

৪০. Watt, M. at M., 16-24.

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৯৬।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৯।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, ২৪, ২৫।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৫১. নিচে দ্র. অধ্যায় ১১।

৫২. আমরা এখানে প্যাট্রিসিয়া ক্রোনির তত্ত্বটির বিষয় আবার স্মরণ করিতে পারি। তিনি উহাতে বলিয়াছেন, আরবের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের যে প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় উহা ইসলামের আবির্ভাবের আনুমানিক ছয় শত বৎসর আগের।

৫৩ Watt. M. at M., 72-96.

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৫৬. দ্র. অধ্যায় ২৪।

দ্বিতীয় ভাগ

BIRTH, BOYHOOD AND YOUTH

জন্মগ্রহণ, বাল্যকাল ও কৈশোর

পঞ্চম অধ্যায়

বংশপরিচয়, জন্ম ও শৈশব

এক ঃ বংশপরিচয়

মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশের ততোধিক সম্ভ্রান্ত বানূ হাশিম গোত্রের সম্ভ্রান্ততম পরিবারে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন।[১] মক্কায় কুরায়শের এমন কোন গোত্র ছিল না যাহার সহিত তাঁহার রক্ত বৈবাহিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ছিল না।[২] তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, তিনি হাশিমের পুত্র, তিনি আব্দ মানাফের পুত্র, তিনি কুসায়্যি-এর পুত্র, তিনি কিলাবের পুত্র, তিনি মুররাহ-র পুত্র, তিনি কা'বের পুত্র ছিলেন ইত্যাদি। এইরূপে তাঁহার বংশধারা নবী ইসমাঈল (আ) ও ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত পৌছিয়াছে। তাঁহার মাতা আমিনা ছিলেন ওয়াহ্বের কন্যা, তিনি আবদ মানাফের পুত্র, তিনি যুহ্রাহ্-র পুত্র, তিনি কিলাবের পুত্র, তিনি মুররাহ্-র পুত্র ছিলেন ইত্যাদি। তিনি (ওয়াহ্ব) যুহ্রা গোত্রের নেতা ছিলেন। সুতরাং পিতা ও মাতা উভয়ের বংশধারা কিলাব ইব্ন মুররাহ-তে মিলিত হইয়াছে। তাঁহার বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ[৩]

আন-নাদর মালক৮ মিলকান আব্দ মানাফ
মালিক
ইয়াখলিদ (?)
ফিহ্র (কুরায়শ)
আস-সালত (?)
গালিব
মুহারিব
আল-হারিছ
(বানুল হারিছের আদি পুরুষ)
লু'আয়্যি
তামীম
(আল-আদরাম)
কায়স
কা'ব
'আমের
(বানূ 'আমেরের আদি পিতা)
(অপর পাঁচ পুত্র)
আইদাহ, সামাহ, সা'দ 'আওফ ও আল-হারিছ?)
মুররাহ
'আদিয়্য
(বানূ 'আদিয়্যির আদিপিতা)
হুমায়স
'আমর
সাহম
(বানূ সাহমের আদি পিতা)
জুমাহ
(বানূ জুমাহ্র আদি পিতা)
কিলাব
তায়ম
(বানূ তায়মের আদি পিতা)
ইয়াকাযাহ
মাখযূম
(বানূ মাখযূমের আদি পিতা)
কুসায়্যি
যুহরাহ
(বানূ যুহরাহ্র আদি পিতা)
'আবদুদ্ দার
(বানূ আবদুদ দারের
আদি পিতা)
'আব্দ মানাফ
'আবদুল উয্যা
(বানূ আসাদের
আদি পিতা)
'আব্দ
'আবদ মানাফ
ওয়াহ্ব
'আব্দ শাম্স
(বানূ আব্দ শামস-এর
আদি পিতা।
হাশিম৫
আল-মুত্তালিব
নাওফাল
উমায়্যা
(বানূ উমায়্যার আদি পিতা)
রাবী'আ
'আবদ আল-মুত্তালিব
আল-হারিছ
৭জন অপর সাত পুত্র
আবূ লাহাব
'আবদুল্লাহ
আল-আব্বাস
প্রমুখ৬
আমিনা
মুহাম্মাদ

'আদনানের দশম অধস্তন পুরুষ ফিহ্র কুরায়শ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই তাঁহার সকল বংশধর কুরায়শ বা কুরায়শ গোত্র নামে পরিচিতি লাভ করে। ফিহ্র-এর ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ কুসায়্যি ছিলেন মহানবী ﷺ-এর পিতামহ 'আবদুল মুত্তালিবের প্র-পিতামহ। এই কুসায়্যি-ই, যেরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, মক্কায় কুরায়শদের বসতি স্থাপন, সেখানে তাহাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং মক্কার জনজীবনের পাঁচটি ঐতিহ্যবাহী কার্য নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কিভাবে এই কার্যগুলি পরবর্তীতে কুসায়্যি-এর বংশধর বানূ 'আবদ মানাফ ও বানূ 'আবদুদ দার কর্তৃক ভাগাভাগির ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়াছিল এবং কিভাবে মহানবীর প্র-পিতামহ হাশিম আস-সিকায়া ও আর-রিফাদা-র কার্যাবলী পালন ছাড়াও, উত্তরে বায়যান্টাইন কর্তৃপক্ষ ও পারস্য এবং দক্ষিণে ইয়ামান ও আবিসিনিয়ার শাসকদের সহিত একাধিক সংখ্যক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে কুরায়শদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি কুরায়শদের বাণিজ্যপথে অবস্থিত আরব গোত্রসমূহের সহিতও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।[৭]

হাশিম তাঁহার এক বাণিজ্যিক সফরের সময় ইয়াছরিবের (মদীনা) বাজার পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি এক মহিলার সৌন্দর্য ও কর্তৃত্বমূলক ব্যক্তিত্বে অভিভূত হন। তিনি উক্ত মহিলাকে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ে নিজ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করিতে দেখেন। এই মহিলা ছিলেন বানূ 'আদিয়্যি ইব্ন আন-নাজ্জার গোত্রের সালামা বিন্ত 'আমর। পূর্বে তাহার 'উহায়হা ইব্নুল জুলাহ্-র সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা। হাশিম তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। মহিলা স্বীয় আভিজাত্য ও নিজ লোকদের মধ্যে তাহার গুরুত্বের কারণে এই শর্তে সম্মতি দান করেন যে, তাহাকে তাহার নিজ বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। হাশিম ইহাতে সম্মত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং ব্যবসায় ও অন্যান্য বিষয় দেখাশুনার জন্য তাহাকে মদীনায় অবস্থান করিবার অনুমতি দিলেন। সেখানে তিনি পরবর্তী কালে হাশিমের এক পুত্র সন্তানের জন্মদান করেন। শিশুর নাম রাখা হয় শায়বা। স্বাভাবিকভাবে হাশিম শিশুটিকে তাহার মাতার নিকট লালন-পালনের জন্য রাখিয়া দিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, কৈশোরে পদার্পণ করিলে তাহাকে মক্কায় নিয়া আসিবেন। যখন সেই সময় আসন্নপ্রায় তখন হাশিম গাযায় (তখন সিরিয়ার, বর্তমানে ফিলিস্তীনের অন্তর্ভুক্ত) এক বাণিজ্যিক সফরে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করিয়া ইন্তিকাল করেন। পুনরায় উল্লেখ্য যে, হাশিমই কুরায়শদের জন্য বৎসরে প্রধান দুইটি বাণিজ্য সফরের প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন ঃ একবার গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ও বায়যান্টাইন অঞ্চল অভিমুখে এবং দ্বিতীয়বার শীতকালে ইয়ামান ও আবিসিনিয়া অভিমুখে।[৮]

আস-সিকায়া ও আর-রিফাদার কার্যাবলী এখন হাশিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আল-মুত্তালিবের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি তাহার পরলোকগত ভ্রাতার পুত্র শায়বাকে যথাসময়ে মদীনা হইতে মক্কায় লইয়া আসেন। তিনি যখন ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন তখন লোকেরা ঠাট্টার ছলে বলাবলি করিতেছিল যে, ছেলেটি আল-মুত্তালিবের ক্রীতদাস ('আবদুল মুত্তালিব)। আল-মুত্তালিব জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মুখে ছাই পড়ুক, সে তো আমার

ভাই-এর পুত্র" ।[৯] তখন হইতে ছেলেটির আসল নাম ঢাকা পড়িয়া যায় এবং সাধারণ্যে 'আবদুল মুত্তালিব নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভাই হাশিমের ন্যায় আল-মুত্তালিবও আস-সিকায়া ও আর-রিফাদার কার্যাবলী কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের সহিত সম্পাদন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐ সকল কার্য সম্পাদনে এইরূপ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, কুরায়শগণ তাহাকে আল-ফায়দ (মহৎ হৃদয়) নামে আখ্যায়িত করে।[১০] অনেক দিন যাবত উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের পর তিনি ইয়ামানের রাদমান নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। সেখানে তিনি এক বাণিজ্য মিশনে গমন করিয়াছিলেন। তাহার অবশিষ্ট ভ্রাতা নাওফালও তাহার মৃত্যুর অল্প কালের মধ্যে ইনতিকাল করেন।[১১]

'আবদুল মুত্তালিব এই সময় একজন পরিণত বয়সের যুবক। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন এবং একই সঙ্গে তাঁহার মধ্যে কর্তৃত্বমূলক উপস্থিতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও একজন জন্মগত নেতার অন্যান্য গুণের সমাহার ঘটিয়াছিল। তিনি আস-সিকায়া ও আর-রিফাদার দায়িত্বে অভিষিক্ত হন। তাঁহার ব্যবস্থাপনায় এই দুইটি কার্য মক্কার জনজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি গণকার্যে পরিণত হয়। তাঁহার প্রধানতম সাফল্য, যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যমযম কূপের পুনঃখনন।[১২] ইহা সামগ্রিকভাবে কুরায়শ গোত্রকে সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি দান করিয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার একটি অভাব ছিল। যমযম কূপ পুনঃখননকালে তাঁহার মাত্র একজন পুত্র ছিল এবং তিনি আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহাকে যেন অন্তত দশজন পুত্র সন্তান দান করা হয়। কথিত আছে যে, 'আবদুল মুত্তালিবের অধিক সংখ্যক পুত্রের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল ছিল যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যদি কমপক্ষে দশটি পুত্র সন্তান দান করা হয় তাহা হইলে তিনি একজনকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবানী করিবেন। অংশত তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষার কারণে তিনি পরপর চারজন স্ত্রী গ্রহণ করেন ঃ একজন বানূ 'আমের হইতে, দুইজন বানূ খুযা'আ হইতে এবং চতুর্থজন ফাতিমা বিন্ত 'আমর ইব্ন 'আইদকে বানূ মাখযূম হইতে। আল্লাহ তাঁহার প্রার্থনা মনজুর করেন। কালক্রমে তাঁহার দশ (এবং আরও অধিক) পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দশম এবং তখন পর্যন্ত কনিষ্ঠতম ছিলেন 'আবদুল্লাহ এবং তিনি ছিলেন 'আবদুল মুত্তালিবের মাখযূমী স্ত্রী ফাতিমার গর্ভজাত। 'আবদুল্লাহ নিখুঁত স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠনের অধিকারী এক অসাধারণ সুদর্শন বালক ছিলেন। তিনি বড় হইতেই 'আবদুল মুত্তালিব তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁহার সকল পুত্রকে কা'বা ঘরের নিকটে লইয়া আসেন এবং কোন্ পুত্রকে কুরবানী করিবেন তাহা নির্বাচনের জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে লটারী অনুষ্ঠান করেন। লটারীতে 'আবদুল্লাহ্র নাম উঠে যিনি ছিলেন পিতার কনিষ্ঠতম ও প্রিয়তম পুত্র।[১৩]

'আবদুল মুত্তালিব তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপর হন, পরে যাহাতে স্নেহ ও ভালবাসার কারণে বাধাগ্রস্ত না হন। কিন্তু কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ইহার বিরোধিতা করিলেন এবং কঠোরতম বিরোধিতা করিলেন বানূ মাখযূম নেতা আল-মুগীরা ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন

মাখযূম। কারণ 'আবদুল্লাহ ছিলেন তাহাদেরই কন্যা ফাতিমা বিন্ত 'আমর ইব্ন 'আইদ-এর পুত্র।[১৪] অবশেষে 'আবদুল মুত্তালিব একদিকে আল্লাহ্র সহিত তাঁহার প্রতিজ্ঞা এবং অন্যদিকে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কঠোর বিরোধিতা হইতে উদ্ভূত জটিলতার সমাধান খুঁজিয়া পাইবার জন্য ইয়াছরিবের (মদীনা) এক প্রসিদ্ধ মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। মহিলা তাঁহাকে এই বলিয়া পরামর্শ দেয় যে, তিনি যেন একদিকে ১০টি উট এবং অন্যদিকে 'আবদুল্লাহকে রাখিয়া লটারী অনুষ্ঠান করেন এবং যতক্ষণ লটারী উটের অনুকূলে না যায় ততক্ষণ প্রতিবারে উটের সংখ্যা ১০টি করিয়া বৃদ্ধি করেন।

আবদুল মুত্তালিব বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কা'বার নিকট গমন করিয়া পরামর্শ মোতাবেক লটারী অনুষ্ঠান করেন। লটারীতে উটের সংখ্যা যখন ১০০-তে পৌঁছায় তখন লটারী উহাদের অনুকূলে যায়। কিন্তু 'আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে আল্লাহ্র অভিপ্রায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইতে চাহিলেন। তাই তিনি আরও দুইবার লটারী অনুষ্ঠান করিলেন এবং প্রতিবারেই লটারী উটের অনুকূলে প্রমাণিত হইল। এইভাবে ১০০ উটের কুরবানীর বিনিময়ে 'আবদুল্লাহ্র জীবন রক্ষা পাইল।[১৫] এই সুবিখ্যাত ঘটনার কারণেই মহানবী পরবর্তী কালে বলিতেন, তিনি দুই কুরবানীকৃত ব্যক্তিত্বের পুত্র ঃ নবী ইসমাঈল (আ) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব।

আল-মুগীরার পক্ষে তাহাদের কন্যার পুত্র 'আবদুল্লাহ্র জীবন রক্ষার্থে আগাইয়া আসা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুকাল পরে আল-মুগীরার পুত্র আল-ওয়ালীদের পক্ষে 'আবদুল্লাহ্র পুত্রের বিরোধিতা করা সমভাবেই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ছিল।[১৬] আল-ওয়ালীদ তাহার পিতার নীতির পরিবর্তন করিলেও ইহার তো কোন পরিবর্তন সম্ভব ছিল না যে, বানূ হাশিম ও বানূ মাখযূম উভয় গোত্রের রক্তই 'আবদুল্লাহ্র শিরায়-উপশিরায় সমভাবে প্রবাহিত ছিল এবং এই দুই রক্তধারার সহিত শীঘ্রই তৃতীয় এক রক্তধারা বানূ যুহরার রক্তধারা মিলিত হইতে চলিল। কারণ 'আবদুল্লাহ শীঘ্রই পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার বয়স এখন বিশের কোঠার প্রথমদিকে এবং 'আবদুল মুত্তালিব তাঁহার পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। বানূ যুহরা নেতা ওয়াহ্ব ইব্ন আব্দ মানাফের কন্যা আমিনার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। যথাসময়ে 'আবদুল্লাহ ও আমিনার মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। 'আবদুল মুত্তালিব নিজে কিছুকাল পূর্বে আমিনার চাচাতো বোন ও ওয়াহ্বের ভাই উহায়ব ইব্ন 'আব্দ মানাফের কন্যা হালাহ্কে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই সকল আনন্দঘন ঘটনা শেষ হইতে না হইতেই মক্কা ও সাধারণভাবে আরব সমাজ আবরাহা কর্তৃক মক্কা ও কা'বা অভিযানের কারণে দারুণভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে।[১৭] কা'বার বিরুদ্ধে আবরাহার ধ্বংসাত্মক অভিযান অন্তত তিনটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কা'বার গুরুত্ব লোপ পাওয়ার পরিবর্তে বরং উহার গুরুত্ব ও মর্যাদা এখন আরবদের নিকট অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং

ইহার সহিত কুরায়শদের মর্যাদাও সাধারণভাবে আরবদের নিকট বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, মক্কার সমাজে 'আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্ব ও কা'বা গৃহের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসাবে তাঁহার অবস্থান এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট ও সমর্থিত হয়। তৃতীয়ত, এই ঘটনা মহানবী ﷺ -এর জীবন-ইতিহাসে এবং অতঃপর ইসলামের ইতিহাসে শেষ আশ্রয় হিসাবে পরিগণিত। কারণ তিনি হস্তীবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন।

দুই ঃ জন্ম ও শৈশব

মহানবী ﷺ-এর পিতা 'আবদুল্লাহ হস্তীর ঘটনার এক বৎসরেরও কম সময়ের পূর্বে আমিনাকে বিবাহ করেন। দাম্পত্য জীবন খুব বেশী দিন উপভোগ করা তাঁহাদের ভাগ্যে ছিল না। স্ত্রীর সহিত কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া 'আবদুল্লাহ এক বাণিজ্য সফরে সিরিয়া গমন করেন এবং ফিরতি যাত্রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। বাণিজ্য কাফেলা তাঁহাকে ইয়াছরিবের (মদীনা) বানূ 'আদিয়্যি ইব্ন আন-নাজ্জার গোত্রে তাঁহার পিতার মাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনের নিকট রাখিয়া যায়। অল্পদিন পর সেখানেই 'আবদুল্লাহ উক্ত অসুস্থতায় ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স খুব বেশী হইলে পঁচিশ বৎসর ছিল।[১৮] আমিনার গর্ভে সেই সময় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ মাত্র কয়েক মাসের ছিলেন। 'আবদুল্লাহকে মদীনায় সমাহিত করা হয়। মহানবী ﷺ তাঁহার জন্মের পূর্বেই ইয়াতীম হইলেন।

উৎস গ্রন্থসমূহ সাধারণভাবে একমত যে, মহানবী ﷺ হস্তীবর্ষের রবীউল আওয়াল মাসের কোন এক সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।[১৯] ইহা এখন একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, মহানবী ﷺ -এর মদীনায় হিজরত ৬২২ খৃস্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, যখন তিনি তাঁহার জীবনের ৫৩তম বৎসর অতিবাহিত করিতেছিলেন। এই শেষোক্ত সন হইতে পিছনদিকে হিসাব করিলে এবং ৫৩ চান্দ্র বৎসরকে ৫১ সৌর বৎসরের সমান ধরা হইলে তাঁহার জন্মের সাল হয় ৫৭১ খৃ.। রবীউল আওয়াল মাসের সঠিক দিন সম্পর্কেও মতপার্থক্য রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ইব্ন ইসহাক ১২ তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, আল-ওয়াকিদীর বরাতে ইব্ন সা'দ ১০ তারিখ বলিয়াছেন এবং মাসউদী ৮ তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২০] ৮ ও ১২ তারিখের মধ্যবর্তী সময়কাল এবং মহানবী ﷺ সোমবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই তথ্যের ভিত্তিতে আরও হিসাব করা হইয়াছে। মিসরের মাহমূদ পাশা আল-ফালাকী কর্তৃক পরিচালিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব অনুসারে ৫৭১ খৃস্টাব্দের রবীউল আওয়াল মাসের ৮ ও ১২ তারিখের মধ্যবর্তী একমাত্র সোমবার ৯ তারিখে পড়ে।[২১] এই হিসাব গ্রহণ করিয়া বহু সংখ্যক মনীষী মনে করেন যে, মহানবী ﷺ সোমবার ৯ রবীউল আওয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সহিত দ্বিমত পোষণকারী মনীষিগণও রহিয়াছেন যাহারা মনে করেন যে, ৫৩ চান্দ্র বৎসর ৫২ সৌর বৎসরের সমান হইবে। আর তাই তাহারা মার্চ/এপ্রিল ৫৭০ খৃ. জন্মতারিখ নির্ধারণ করেন।[২২] কিন্তু প্রথমোক্ত মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

বর্ণিত আছে যে, আমিনা তাঁহার শিশুর জন্মের পূর্বে স্বপ্নে কিংবা ফেরেশতা কর্তৃক অদিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি যেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁহার নাম রাখেন মুহাম্মাদ (অথবা আহমাদ)[২৩] এবং পিতামহ 'আবদুল মুত্তালিব একইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।[২৪] এইরূপ স্বপ্ন দেখা মোটেও অস্বাভাবিক নহে। অনেকে আজকালও এইরূপ স্বপ্ন দেখেন যাহা লক্ষণীয়রূপে সত্যে পরিণত হয়। বাইবেলেও হযরত ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীদের জন্মের ব্যাপারে অনুরূপ স্বপ্নের উল্লেখ রহিয়াছে। যাহা হউক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ভাবী নবীর জন্মের প্রায় অব্যবহিত পরেই তাঁহার মুহাম্মাদ নাম রাখা হয় এবং বিকল্প স্বরূপ তাঁহাকে জীবনের প্রাথমিক দিনগুলি হইতেই 'আহমাদ' নামে অভিহিত করা হয়।[২৫] মহানবী ﷺ -এর জন্মের সময় সংঘটিত কিছু অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃতিক ঘটনারও বিবরণ রহিয়াছে।[২৬]

তদানীন্তন মক্কার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারসমূহের এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহাদের নবজাত শিশুদিগকে দুগ্ধ পান ও লালন-পালনের জন্য উপযুক্ত সেবিকার হেফাজতে রাখা হইত। মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁহার জন্মের পর কিছু দিনের জন্য ছুওয়ায়বা নামীয় মহানবীর চাচা আবূ লাহাবের জনৈকা ক্রীতদাসীর দুধ পান করান। বর্ণিত আছে যে, আবূ লাহাব তাহার পরলোকগত ভাই 'অবদুল্লাহর পুত্রের জন্মগ্রহণে এইরূপ খুশী হইয়াছিল যে, সে তাহার এই ক্রীতদাসীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এই ক্রীতদাসী মহানবীর অপর এক চাচা হামযাকেও, যিনি মহানবীর প্রায় সমবয়সী ছিলেন, দুধ পান করাইয়াছিলেন। কিছুদিন পর মহানবীকে কুরায়শের হাওয়াযিন শাখার বানূ সা'দ গোত্রের হালীমা বিন্‌ত আবূ যু'আয়বের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করা হয়। তাহারা হুদায়বিয়ার উন্মুক্ত ও স্বাস্থ্যকর সমভূমি এলাকায় বাস করিতেন এবং নির্ভেজাল আরব সংস্কৃতি ও নিজেদের ভাষার উচ্চ মানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হালীমার স্বামী ছিলেন আল-হারিছ ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন রিফা'আহ (সম্ভবত আবূ কাবশাহ্ নামেও অভিহিত ছিলেন)। এই দম্পতির নিজেদের 'আবদুল্লাহ্ নামে একটি পুত্র সন্তান এবং উনায়সা ও হুযাফা নামে দুইটি কন্যা সন্তান ছিল। শেষোক্ত কন্যাটি সাধারণ্যে শায়মা নামে অধিকতর পরিচিত ছিলেন। তিনি ও তাঁহার মাতা প্রধানত শিশু মুহাম্মাদের ﷺ দেখাশুনা করিতেন।[২৭] মহানবী ﷺ তাঁহার শেষ জীবনে শায়মা ও দুধ সম্পর্কের অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[২৮]

মুহাম্মাদ ﷺ প্রথমে দুই বৎসর হালীমার তত্ত্বাবধানে ও লালন-পালনাধীনে ছিলেন। এই সময় হালীমা শিশু মুহাম্মাদকে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর আমিনার নিকট নিয়া আসিতেন বেড়াইবার জন্য এবং শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য দেখিয়া তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য। প্রথম দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পর হালীমা শিশুকে আমিনার নিকট চূড়ান্তরূপে ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে লইয়া আসেন। কিন্তু আমিনা মক্কার তৎকালীন অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং শিশুর সন্তোষজনক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের কারণে তাঁহাকে আরও কিছুদিন হালীমার নিকট রাখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন। হালীমা শিশুকে ফেরত পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কারণ তিনি ইতোমধ্যে এই অসাধরণ স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ও মধুর আচরণবিশিষ্ট বালকটির জন্য দৃঢ় মাতৃসুলভ স্নেহ ও মমতা অনুভব

করিতেছিলেন। এইরূপে তিনি তাঁহার দুধ সম্পর্কীয় পিতা-মাতার নিকট আরও দুই বৎসর বা অনুরূপ কাল অবস্থান করেন।

দুধ সম্পর্কীয় পিতা-মাতার সহিত তাঁহার এই দ্বিতীয় মেয়াদের অবস্থানকালে তাঁহার জীবনে এক অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হয়। ইহা শাক্কুস সাদর বা বক্ষ বিদারণ নামে পরিচিত।[২৯] ঘটনার বিস্তারিত বিষয় ও উহার তারিখ ও স্থান সম্পর্কে বর্ণনাকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।[৩০] এই ঘটনার অল্পদিন পরেই হালীমা তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট চূড়ান্তরূপে ফেরত প্রদান করেন।

তিন ঃ বাল্যকাল ও সিরিয়া ভ্রমণ

হালিমার তত্ত্বাবধান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী ﷺ তাঁহার মায়ের সান্নিধ্য ও ভালবাসা খুব বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। ছেলের দায়িত্ব গ্রহণের পর মাত্র দেড় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এমন সময় তাঁহাকে লইয়া আমিনা পারিবারিক পরিচারিকা উম্মু আয়মানসহ মদীনায় তাঁহার স্বামীর মাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনের নিকট বেড়াইতে যান। কিন্তু মদীনা হইতে ফেরত আগমনের পথে আমিনা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। পারিচারিকা উম্মু আয়মান মহানবী ﷺ-কে লইয়া মক্কায় ফেরত আসেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণ ইয়াতীম হইলেন যখন মাত্র শৈশব অতিক্রম করিয়া বাল্যে পদার্পণ করিয়াছেন। মাতৃহারা হইবার সময় তিনি মাত্র ছয় বৎসরের বালক ছিলেন।

বালকটির দায়িত্ব এখন স্বাভাবিকভাবেই পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের উপর বর্তায়, যিনি তখন প্রায় ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ ছিলেন। এই বৃদ্ধ লোকটি ইয়াতীম বালককে সকল প্রকার যত্ন ও ভালবাসা দান করেন এবং সকল সময় তাঁহাকে সাহার্যে রাখেন। বর্ণিত আছে যে, 'আবদুল মুত্তালিব অধিকাংশ সময় কা'বার ছায়াতলে তাহার জন্য বিছানো চাদরের উপর বসিয়া অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার চতুর্দিকে বসিতেন কিন্তু তাহার সম্মানার্থে চাদরের উপর বসিতেন না; কিন্তু বালক মুহাম্মাদ ﷺ উহার উপর বসিতেন। তাঁহার চাচাগণ তাঁহাকে উহা হইতে সরাইয়া নিতে চাহিলে 'আবদুল মুত্তালিব তাহাদিগকে বারণ করিতেন এবং বলিতেন, তিনি বালকটির মধ্যে ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন এবং তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া তাঁহাকে আদর করিতেন। বালক মুহাম্মাদ তাঁহার নিকট বসিয়া যাহা করিতেন তাহা দেখিয়া 'আবদুল মুত্তালিব আনন্দ বোধ করিতেন।[৩১]

'আবদুল মুত্তালিবের ইতোমধ্যেই অনেক বয়স হইয়াছে এবং তিনি দুই বৎসর পর বিরাশি বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবনাবসান অত্যাসন্ন তখন তিনি বিশেষ করিয়া বালক মুহাম্মাদের ﷺ দায়িত্ব তাঁহার চাচা আবূ তালিবের উপর অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, আবূ তালিব 'আবদুল্লাহ্‌র সহোদর ভাই ছিলেন।[৩২] মহানবী ﷺ মাত্র আট বৎসরের বালক ছিলেন যখন তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে ছাড়িয়া চিরতরে বিদায় নেন। আবূ তালিব

তাঁহাকে নিজের পুত্রের মত মনে করিতেন এবং যেরূপ পরে দেখা যাইবে, তাঁহার নিজের ও মহানবীর জীবনের সংকটতম মুহূর্তেও তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। মহানবী ﷺ তাহাকে চাচাতো ভাইদের, বিশেষ করিয়া আবূ তালিবের পুত্র জাফর ও 'আলীর সহিত বড় হইয়া উঠেন, যাঁহারা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ঘনিষ্ঠতম বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

এই কচি বয়সে মহানবী ﷺ -এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। একমাত্র এইটুকু জানা যায় যে, তিনি কখনও কখনও নিজ চাচাতো ভাইদের সহিত মেষ চরাইতেন। ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে যে, এই বয়সের অন্যান্য শিশুদের ন্যায় তিনি অপ্রয়োজনীয় ও অলস খেলাধূলা ও ক্রীড়ায় নিজেকে নিয়োজিত করিতেন না। তিনি কখনও কোন ব্যক্তির নিকট অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তিনি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছেন এইরূপ কোন তথ্যের উল্লেখ কোথায়ও নাই।

তাঁহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বর্ণিত একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে চাচা আবূ তালিবের সহিত এক বাণিজ্য কাফেলায় তাঁহার সিরিয়া সফর। মহানবী ﷺ তখন প্রায় ১০ কিংবা ১২ বৎসর বয়সের বালক ছিলেন। ইব্ন ইসহাক কর্তৃক প্রদত্ত তাঁহার এই সফরের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ একবার আবূ তালিব একটি বণিক দলের সহিত সিরিয়া গমনের পরিকল্পনা করেন। যখন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন এবং বণিক দল যাত্রার জন্য প্রস্তুত, তখন বালক মুহাম্মাদ ﷺ এমনভাবে তাঁহার চাচার নিকট থাকার আবদার ধরিলেন যে, তাঁহার জন্য চাচার দয়া হইল এবং তাঁহাকে লইয়াই তিনি সফরে রওয়ানা হইলেন।

বাণিজ্য দলটি এক সময় বুসরা আগমন করে, সেখানে বাহীরা নামক জনৈক খৃস্টান পাদ্রী তাহার জন্য নিবেদিত কোন এক গীর্জা বা গুহায় বাস করিতেন। তিনি খৃস্ট ধর্ম ও উহার ধর্মগ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন। পূর্বে অনেকবার কুরায়শ বণিক দল একই পথে এবং তাহার বাসস্থানের নিকট দিয়া গমন করিয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও তাহাদের সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ দেখান নাই। কিন্তু এইবার তিনি তাহাদিগকে বিশেষ মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং ইহার কারণ এই ছিল যে, "মনে করা হয়" যে, তিনি বণিক দলটিতে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রকোষ্ঠ হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বণিক দলটি আগমন করিতেছে, আর এক খণ্ড মেঘ দলের লোকদের মধ্যে একমাত্র মহানবী ﷺ-কে ছায়াদান করিয়া আসিতেছে। দলটি সেই প্রকোষ্ঠের নিকট আসিল এবং একটি বৃক্ষের নিচে থামিল, মেঘখণ্ডটিও অমনি সেখানে থামিল এবং বৃক্ষের শাখাগুলি মহানবী ﷺ-কে সূর্যের তাপ হইতে রক্ষা করার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল।

বাহীরা খৃস্ট ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত অনাগত নবীর লক্ষণসমূহ বালকের মধ্যে শনাক্ত করিয়া দলটির জন্য এক ব্যয়বহুল ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তাহাদিগকে উক্ত ভোজে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তিনি বিশেষভাবে বলিলেন, যেন ভোজে কেহ অনুপস্থিত না থাকেন। তাহা সত্ত্বেও দলটি যখন বাহীরার স্থানে গমন করে তখন মহানবী ﷺ-কে মালপত্রের নিকট রখিয়া যায়।

তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, মহানবী ﷺ এত অল্প বয়সের যে, তাঁহার ভোজসভায় উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নাই।

বাহীরা যখন দেখিতে পাইলেন যে, মহানবী ﷺ তাহার মেহমানদের মধ্যে নাই তখন তিনি তাহাদের নিকট জানিতে চাহিলেন সকলেই আসিয়াছেন কিনা এবং তাহাকে এই কথা বলাতে যে, একমাত্র একটি ছেলেকে মালপত্রের নিকট রাখিয়া আসা হইয়াছে, তিনি তাঁহাকেও আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহার এই অনুরোধ রক্ষা করা হইল। মহানবী ﷺ আগমন করিলে বাহীরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং লোকদের সহিত তাঁহাকে বসাইলেন। বাহীরা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও খৃস্ট ধর্মগ্রন্থে অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত নবীর লক্ষণ হিসাবে বর্ণিত অন্যান্য জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

লোকজন আহার শেষ করিয়া চলিয়া গেলে বাহীরা মহানবী ﷺ -এর সহিত আলাপ করেন, তাঁহাকে তাঁহার নিজের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন এবং অত্যন্ত প্রীত হন যে, উত্তরগুলি "তাহার বিবরণ সম্পর্কে বাহীরা যাহা জানিতেন তাহার সহিত" মিলিয়া গিয়াছে। অতঃপর পাদ্রী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পৃষ্ঠদেশে তাকাইলেন এবং তাঁহার দুই স্কন্ধের মধ্যখানে, ধর্মগ্রন্থে "ঠিক যে স্থানের বর্ণনা রহিয়াছে নবুওয়াতের মোহর" দেখিতে পাইলেন। বাহীরা তারপর বালকের চাচা আবূ তালিবের নিকট গমন করেন এবং ছেলেটির সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আবূ তালিব যখন বলিলেন যে, ছেলেটি তাঁহার পুত্র, বাহীরা মন্তব্য করিলেন, তাহা হইতে পারে না। "কারণ ইহা হইতে পারে না যে, এই ছেলের পিতা জীবিত আছেন"। তারপর আবূ তালিব বলিলেন যে, ছেলেটি তাঁহার ভাতিজা এবং তাঁহার জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা মারা গিয়াছেন। "আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন" বাহীরা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "আপনার ভাতিজাকে লইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যান এবং ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সতর্কতার সহিত প্রহরায় রাখুন। কারণ আল্লাহ্র কসম! তাহারা যদি তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং তাঁহার সম্পর্কে আমি যাহা জানি তাহা জানিতে পারে তাহা হইলে তাহারা তাঁহার অনিষ্ট করিবে। আপনার এই ভাতিজার জন্য এক মহান ভবিষ্যৎ অপেক্ষমান। সুতরাং তাঁহাকে দ্রুত বাড়ী লইয়া যান।"

তাঁহার চাচা তাঁহাকে দ্রুত সেখান হইতে লইয়া আসেন এবং সিরিয়ায় তাঁহার ব্যবসায়িক কাজ শেষ করিয়া মক্কায় ফেরত লইয়া আসেন। ইব্ন ইসহাক আরও লিখিয়াছেন যে, "ধারণা করা হয়" আরও তিনজন আহলে কিতাব মহানবী ﷺ -এর মধ্যে তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিল যাহা বাহীরা দেখিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিকট আসার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বাহীরা তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন।[৩৩]

ঘটনাটি কমবেশি একইভাবে অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।[৩৪] জামে' আত-তিরমিযীর বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে যে, দলটি গীর্জার নিকট যাত্রাবিরতি করামাত্র বাহীরা তাহাদের নিকট আগমন করেন, দলের মধ্যে মহানবী ﷺ-কে শনাক্ত করেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, "এই

হইলেন বিশ্বের নেতা, আল্লাহ্র দূত, যিনি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরিত হইবেন।” কুরায়শ দল বিস্ময়ে হতবাক হইয়া বাহীরার নিকট তাহার এইরূপ মন্তব্যের কারণ জানিতে চাহিল। তিনি উত্তরে বলিলেন, তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন হইতে দলটি মক্কা ত্যাগ করিয়াছে তখন হইতে পথিমধ্যের প্রতিটি গাছ ও প্রতিটি পাথর মহানবীর ﷺ সাম্মানে মস্তক অবনত করিয়াছে এবং নবীর সহিত সম্পর্ক না থাকিলে গাছ ও পাথর কখনও এইরূপ আচরণ করিত না। আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাহীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একটি গাছের ছায়া মহানবী ﷺ -এর সহিত একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে এবং কয়েকজন “রোমক” মহানবী ﷺ -এর সন্ধানে আগমন করিয়াছিল। কারণ তাহারা তাহাদের ধর্মগ্রন্থ হইতে জানিতে পারিয়াছিল যে, প্রতিশ্রুত নবীর ঐ সময় আবির্ভূত হইবার কথা। বিবরণ এই বলিয়া শেষ হইয়াছে যে, বাহীরা আবূ তালিবকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করিলেন ছেলেটিকে এমন দেশে লইয়া না যাইবার জন্য যেখানে শত্রুভাবাপন্ন ইয়াহূদীরা সংখ্যায় প্রচুর এবং আবূ তালিব তাঁহাকে মক্কায় ফেরত প্রেরণ করিলেন এবং আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহার সহিত বিলাল (রা)-কে পাঠাইলেন।[৩৫]

উল্লিখিত ঘটনার অনেক বিষয়েরই সত্যতা সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা বিদ্যমান, যদিও মহানবী ﷺ -এর চাচার সহিত সিরিয়া ভ্রমণ এবং বাহীরার সহিত সাক্ষাতের ব্যাপারে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। ইব্ন ইসহাক তাহার বর্ণনায় তথ্যপূর্ণ বর্ণনার পূর্বে একবার করিয়া অন্তত পাঁচবার ‘যেরূপ তাহারা মনে করেন’ (فيما يزعمون বা يزعمون) সীমিতকরণ সূচক শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। তিরমিযী বর্ণনাটি “ভাল” (حسن) বলিয়া অভিমত প্রদান করিলেও তিনি ইহাকে বিরল (غريب) বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনি ইহা অন্য কোন উৎস হইতে জানেন নাই বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৬] বর্ণনার সর্বশেষ উক্তির—যেখানে আবূ বাক্‌র (রা) মহানবী ﷺ -এর সহিত বিলালকে পাঠাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে—সুস্পষ্ট ভ্রম সম্পর্কে একই সঙ্গে আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.)[৩৭] এবং ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)[৩৮] উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিলাল সেই সময় জন্মগ্রহণই করেন নাই এবং আবূ বাক্‌র মাত্র বালক ছিলেন।

মহানবী ﷺ-এর প্রাথমিক জীবনের অন্য কোন ঘটনার উল্লেখ কোথায়ও নাই।

অনুবাদ ঃ মু. আবদুল মান্নান

তথ্যসূত্র

১. বুখারী, নং ৩৪৯১, ৩৪৯২; মুসনাদ, ১খ., পৃ. ২১০; ৪খ., পৃ. ১০৭, ১৬৬; ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ২০-২৩।

২. বুখারী, নং ৩৪৯৭, ৪৮১৮; মুসনাদ, ১খ., পৃ. ২২৯; ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ২৪।

৩. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৯২-৯৭, ১০৩-১০৪; আত-তাবারী (তারীখ), ২খ., পৃ. ২৩৯-২৭৬ (১খ., ১০৭৩-১১২২); ইব্ন হায্ম আন-আলদালুসী, জামহারাতু আনসাবিল 'আরাব, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮৩, পৃ. ৯-১৫। 'আবদ মানাফ পর্যন্ত সারণীর নামগুলি ইব্ন হাযম কর্তৃক প্রদত্ত ক্রম অনুসারে বাম হইতে ডানদিকে লিখিত। ইহা অবশ্যকীয়ভাবে তাহাদের জন্ম তারিখের ক্রম অনুসারে নহে।

৪. ইব্ন হায্ম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নামটি মাল্ক্, মালিক নহে।

৫. হাশিমের অন্য স্ত্রীগণের গর্ভজাত আরও কয়েকজন সন্তান ছিল।

৬. 'আবদুল মুত্তালিবের ৬ জন স্ত্রীর গর্ভজাত ১৫ জন পুত্র ও ৫ জন কন্যা ছিল। তাহারা হইল ঃ বানূ 'আমের ইব্ন সা'সা'আ গোত্রের সাফিয়্যার গর্ভজাত আল-হারিছ; বানূ মাখযূম গোত্রের ফাতিমা বিন্ত 'আমর-এর গর্ভজাত আজ-যুবায়র, আবূ তালিব, 'আবদুল কা'বা ও 'আবদুল্লাহ এবং পাঁচজন কন্যা বায়দা, উমায়মা, 'আরওয়া, 'আতিকা ও বাররা; বানূ খুযাআ গোত্রের লুবনার গর্ভজাত আবূ লাহাব ('আবদুল 'উযযা); বানূ যুহরা গোত্রের হালা (আমিনার ভগ্নি)-র গর্ভজাত আল-মুকাব্বিম, হাজাল বা খাজাল আল-মুগীরা ও হামযা; বানূ রাবী'আ ইব্ন নিযার গোত্রের নুতায়লার গর্ভজাত দিরার, কুছাম ও আল-'আব্বাস এবং বানূ খুযা'আ গোত্রের মুন'আমিতার গর্ভজাত গায়দাক ও মুস'আব।

কন্যাগণের মধ্যে আল-বায়দা' বানূ 'আবদে শাম্স গোত্রের কুরায়য ইব্ন রাবী'আর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 'উমায়মার বিবাহ হইয়াছিল হাজির ইব্ন রিআব আল-আসাদীর সহিত। 'আতিকার বিবাহ হইয়াছিল বানূ মাখযূম গোত্রের 'উমায়্যা ইব্নুল মুগীরার সহিত; সাফিয়্যার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল বানূ উমায়্যা গোত্রের হারব ইব্ন উমায়্যার সহিত (আবূ সুফ্য়ানের পিতা) এবং হারবের মৃত্যুর পর বানূ আসাদ গোত্রের 'আওওয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদের সহিত (খাদীজার ভ্রাতা)। বাররার বিবাহ হইয়াছিল বানূ মাখযূম গোত্রের আসাদ ইব্ন হিলালের সহিত।

৭. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৮-৩৯।

৮. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৯।

৯. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৩৮।

১০. ঐ, পৃ. ১৩৭।

১১. ঐ, পৃ. ১৩৯।

১২. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪০-৪১।

১৩. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৫৩।

১৪. মাখযূম গোত্রের বর্তমান ভূমিকার অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল পরবর্তী কালে, যখন তাহারা স্বগোত্রীয় আবূ সালামাকে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তখন আবূ তালিব তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন এই কারণে যে, তিনি আবূ তালিবের বোনের পুত্র ছিলেন। আরও পরে মহানবী ﷺ ঘোষণা করেন যে, একজন পুত্র তাহার মাতার পরিবারেরও সদস্য (বুখারী, নং ৬৭৬২ ঃ ابن اخت القوم منهم)। আরও দ্রষ্টব্য মুসনাদ, ২খ., পৃ. ১১৯, ১৭১-১৭২, ১৮০, ২০১, ২২২,

২৩১, ২৪৬, ২৭৫, ২৭৬-২৭৭; ৪খ., পৃ. ৩৯৬, ৪৩০; তিরমিযী, নং ৩৯০১; আন-নাসাঈ, নং ২৬১০, ২৬১১; আদ দারিমী, ২খ., পৃ. ২৪৩-২৪৪।

১৫. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৫৪-১৫৫।

১৬. পরে দ্রষ্টব্য ২৫ম অধ্যায়।

১৭. পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪১-৪২।

১৮. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৯৯।

১৯. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৫৮; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১০০-১০১; তিরমিযী, নং ৩৬১৯; মুসনাদ, ৪খ., পৃ. ২১৫; আবুল ফিদা, ২খ., পৃ. ৫।

২০. ইব্‌ন হিশাম, ১খৃ., পৃ. ১৫৮; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১০০; আল-মাস'উদী, তারীখ, কায়রো ১৩৪৬ হি., পৃ. ৩৯৮।

২১. মাহমূদ পাশা আল-ফালাকী, নাতাইজুল আফহাম ফী তাকবীমিল 'আরাব কাবলাল ইসলাম ইত্যাদি, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যা, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৬ (ফরাসী হইতে আরবীতে অনুবাদ, আহমাদ যাকী আফিনদী), বিশেষ করিয়া পৃ. ৩২-৩৫।

২২. প্রথমোক্ত মত পোষণকারী মনীষীবৃন্দ হইলেন ঃ শিবলী নুমানী, সীরাতুন নবী (মূল উর্দূ), ১ম খণ্ড, আ মগড় (ভারত) ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১৭১-১৭২; আবুল হাসান 'আলী আন-নাদবী, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (ইংরেজী অনুবাদ, এম আহমাদ), লক্ষ্ণৌ ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৯১, টীকা ৪; মুহাম্মাদ আল-কুর্দী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাত সায়্যিদিল মুরসালীন, কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ৯; মোহাম্মাদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (মূল বাংলা), ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ২২৪-২২৫। শেষোক্ত মত পোষণকারীদের মধ্যে রহিয়াছেন উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মাদ আল-গাযালী, ফিক্‌হুস সীরাহ, ৭ম মুদ্রণ, ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৬০; মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল The Life of Muhammad (ইংরেজী অনুবাদ, ইসমাঈল রাযী আল-ফারূকী), কুম, ইরান, তা.বি, পৃ. ৪৭-৪৮।

২৩. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৫৭-১৫৮; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১০৪; ইব্‌ন হিব্বান, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা ওয়া আখবারুল খুলাফা, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ. ৪৩।

২৪. আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১ খ., পৃ. ১০৫।

২৫. বুখারী, নং ৪৮৯৬; মুসলিম, নং ১২৪, ২২৫; মুসনাদ, ৪খ., পৃ. ৮০, ৮১, ৪০৪; ৫খ., পৃ. ৪০৪; তিরমিযী, নং ২৮৪০; দারিমী, ২খ., পৃ. ৩১৭-৩১৮; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১০৪-১০৫।

২৬. মুসনাদ, ৪খ., পৃ. ১২৭, ১২৮; ৫ খ., পৃ. ২৬২; তায়ালিসী, নং ১১৪০; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১০২।

২৭. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৬০-১৬১; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১০৮, ১১০-১১২; দারিমী, ভূমিকা, পৃ. ৮; মুসনাদ, ৪খ., পৃ. ১৮৪।

২৮. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১১৪-১১৫।

২৯. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৬৪-১৬৫; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১১২; মুসনাদ, ৩খ., পৃ. ১২১, ১৪৯, ২৩৮; ৪খ., পৃ. ১৮৪; মুসলিম, নং ২৬১; নাসাঈ, নং ৪৪৮, ৪৫২; দারিমী, ভূমিকা, পৃ. ৮।

৩০. এই সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল বারী, ৫ খ., পৃ. ২৪৪-২৪৫।

৩১. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৬৮।

৩২. ঐ, পৃ. ১৭৯।

৩৩. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৭০-১৭৩।

৩৪। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ২৭৮-২৭৯; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১২১; তিরমিযী, নং ৩৬২০ (৫ম খণ্ড, মিসরীয় সংস্করণ, ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৫৯০-৫৯১)।

৩৫. তিরমিযী, নং ৩৬২০ (৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯০-৫৯১)।

৩৬. ঐ কিতাব, তাঁহার মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

(هذ احديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه) .

৩৭. আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ২খ., ৫৮১ (নং ৪৯৩৪)।

৩৮. ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৭৬-৭৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমর্যাদা, নাম ও শৈশব সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণ

প্রাচ্যবিদগণ মহানবী ﷺ-এর জীবনের নিতান্ত সূচনা স্তর সম্পর্কে অনেকগুলি ধারণা ও প্রস্তাবনার অবতারণা করিয়াছেন। এই ধারণাসমূহ প্রধানত তাঁহার বংশমর্যাদা, তাঁহার নাম, মৃগীরোগের অপবাদ (শাক্‌ক্ আস-সাদর), বাহীরার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং আরও কিছু শৈশবকালীন বিষয় সংক্রান্ত। নিম্নে এইগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

এক ঃ বংশমর্যাদা প্রসঙ্গে

মহানবী ﷺ-এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের অভিমত প্রসংগে প্রথমেই যে জিনিসটি নজরে পড়ে তাহা হইল তাঁহাদের ইহা প্রমাণ করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা যে, তিনি মক্কার একটি গুরুত্বহীন ও অখ্যাত বংশের লোক ছিলেন। সর্বাপেক্ষা জোরালোভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন মার্গোলিয়থ।[১] তাহার প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) "কুরআনে কুরায়শগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে, কেন তাহাদের নিকট এমন একজন নবী প্রেরণ করা হইয়াছে যে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক নহে"।[২]

(খ) মহানবী ﷺ যখন তাঁহার ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানরত তখন কুরায়শগণ তাঁহাকে তুলনা করিয়াছে "গোবর-গাদায় উৎপন্ন তালবৃক্ষের সহিত"।[৩]

(গ) মক্কায় বিজয়ীবেশে প্রবেশের দিন মহানবী ﷺ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আজ পৌত্তলিক যুগের রক্তের আভিজাত্যের অবসান হইল"। ইহা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনি নিজে অভিজাত রক্তের ছিলেন না।[৪]

(ঘ) কিছু সংখ্যক ভক্ত কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত উপাধি 'প্রভু ও আমাদের প্রভুর পুত্র' তিনি নিজে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।[৫]

(ঙ) তাঁহার পিতামহ "আবদুল মুত্তালিব অর্থ ঋণদান ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন, যে পেশার সম্মান আরবদের চোখে অতি নগণ্য ছিল" এবং তিনি যদি যমযম কূপ খনন করিয়াও থাকেন এবং উহার পানি উহার সহিত উটের দুধ, মধু বা কিশমিশ মিশ্রণ করিয়া পানযোগ্য করিয়াও থাকেন তবুও ইহা মনে করা যায় না যে, "তিনি বিনা পারিশ্রমিকে এই ঝামেলায় নিজেকে জড়াইয়াছিলেন"। অতএব ইহা দেখা যাইবে যে, পানি দানকারী ও আপ্যায়নকারীর পদগুলি, যাহা পরবর্তী লেখকগণ মক্কার সম্মানজনক পদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, একটি ব্যবসায়ে পরিণত

হইয়াছিল এবং তাহা সম্মানজনক ছিল না। কারণ মহানবী ﷺ পরবর্তীতে পানি বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।[৬]

(চ) 'আবদুল মুত্তালিব বা "আল-মুত্তালিবের ক্রীতদাস" নামটির যদিও "এক কল্পিত ব্যাখ্যা" ঐতিহাসিকগণ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু সম্ভবত ইহাকে এই অর্থে বুঝিতে হইবে যে, এই নামের ব্যক্তিটি এক সময় প্রকৃতই ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরে মুক্তিপ্রাপ্ত ও হাশিমী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হন।[৭]

(ছ) মহানবী ﷺ-এর শত্রুগণ যখন তাঁহাকে অপমান করিতে চাহিত তখন তাহারা তাঁহাকে "আবূ কাবশার পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিত এবং ইহার মধ্যে কোন প্রকার আঘাত লুক্কায়িত ছিল। তবে অপমানের প্রকৃতি কি ছিল তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না।[৮]

মহানবী ﷺ-কে নিম্ন বংশজাত প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মার্গোলিয়থের উদ্ভাবিত প্রমাণসমূহ কষ্ট-কল্পিত, অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং প্রকৃত তথ্যের বহুল বিকৃতি ও তাহা গোপন করার ভিত্তিতে রচিত। সুতরাং প্রথম যুক্তিটিই কুরআনের একটি আয়াত (নং ৪৩ ঃ ৩১)-এর অর্থের অযৌক্তিক বিকৃতি ও পরিবর্তনের উপর নির্মিত যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ .

"এবং তাহারা বলিল, কেন এই কুরআন দুই নগরীর (মক্কা ও তায়েফ) প্রতিপত্তিশালী লোকের উপর নাযিল হইল না?"[৯]

অবিশ্বাসীদের একই আপত্তি আয়াত নং ৩৮ ঃ ৮-এও বিবৃত হইয়াছে যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ "আমাদের মধ্য হইতে কি তাহার উপর কুরআন (আয-যিক্র) অবতীর্ণ হইয়াছে?"[১০]

এই দুইটি আয়াতের কোথায়ও অথবা কুরআনের কোথায়ও সামান্যতম ইঙ্গিতও নাই যে, কুরায়শ অবিশ্বাসিগণ তাঁহার বংশমর্যাদার প্রশ্ন তুলিয়াছিল কিংবা বলিয়াছিল যে, তিনি নবী হইবার উপযুক্ত নহেন। কারণ, যেরূপ মার্গোলিয়থ বিকৃতি করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই"। উভয় আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, তাহারা মহানবী ﷺ-কে দুই নগরীর নেতৃস্থানীয় লোকদের একজন হিসাবে গণ্য করে নাই এবং উহাদের এইরূপ বলার কারণ, তাহাদের অদ্ভুত মত অনুযায়ী, একমাত্র বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিই আল্লাহ্র বাণীর প্রাপক হওয়া উচিত ছিল। এমনকি তাহারা তাহাদের এই ভুল ধারণা হইতে আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে যাহা ৩৮ ঃ ৮ আয়াতের অব্যবহিত পূর্বের আয়াত ৩৮ ঃ ৪-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদেরই মত কোন মানুষ আল্লাহ্র নবী হইতে পারে না।[১১]

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ .

"তাহারা বিস্ময়বোধ করিতেছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতেই একজন সতর্ককারী আসিল"।

ইহা স্বীকৃত বিষয় যে, মহানবী তাঁহার সমাজে কোন নেতা ছিলেন না, বিশেষ করিয়া তাঁহার চাচা আবূ তালিব, আবূ লাহাব এবং বানূ 'আব্দ শাম্স ও বানূ মাখযূম গোত্রের অন্যান্য ঘনিষ্ট আত্মীয়দের উপস্থিতিতে, যাহাদের নিকট তিনি ছিলেন একজন তরুণ পুত্রের অবস্থানে মাত্র। আরও স্মর্তব্য যে, তৎকালীন মক্কা বা আরব সমাজে নেতৃত্ব নির্ধারিত হইত বয়সের প্রবীণত্বের ভিত্তিতে, যাহার মধ্যে অন্য যোগ্যতা, যথা জ্ঞানের পরিপক্কতাও থাকিত বলিয়া ধারণা করা হয়।

মক্কার ন্যায় একটি গোত্রীয় সমাজে এক পরিবার অন্য পরিবার অপেক্ষা নিম্নতর বংশের এইরূপ ধারণা একটি অভিশাপতুল্য। কারণ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত পরিবার ও শাখা গোত্রগুলি সকলে একই এবং খুব দূরের নহে এইরূপ আদি পিতার বংশধর এবং তাহাদের মধ্যে আবার রক্ত ও বিবাহ বন্ধন দ্বারা ঘনিষ্ঠ আন্ত-সম্পর্কও বিদ্যমান। আমরা অবশ্য কবি ও কোন কোন ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ পরিবার বা গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সদম্ভে বলিতে শুনি, কিন্তু তাহা প্রকৃত তথ্য অপেক্ষা বরং আন্ত-গোত্রীয় শত্রুতা ও শূন্যগর্ভ দাবির বহিপ্রকাশ ব্যতীত কিছুই নহে। মহানবী -এর কথিত নিম্ন বংশমর্যাদা প্রমাণকল্পে কুরআন হইতে প্রমাণ উল্লেখ করিতে গিয়া মার্গোলিয়থ তিনটি ভুল করিয়াছেন।

(এক) তিনি কুরআনের আয়াত বা আয়াতসমূহের অর্থের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন, যাহার মধ্যে কোনক্রমেই মহানবী -এর বংশ ও বংশমর্যাদা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের লেশমাত্রও নাই।

(দুই) তিনি মক্কার সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছেন, যেখানে সকল গোত্র ও পরিবার সম্পদ ও প্রভাবে সমান না হইলেও কেহই অন্য কাহাকেও নিম্নবংশজাত বলিয়া মনে করে না বা করিতে পারে না।

(তিন) তিনি সম্ভবত ধারণা করিয়াছেন যে, একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহার সমাজে একজন সম্পদশালী ও প্রভাবশালী লোকও অথবা একজন সম্পদশালী ও প্রভাশালী লোক অবশ্যম্ভাবীরূপে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকও, উভয় ধারণাই সমান ত্রুটিপূর্ণ।

তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তি প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে, মার্গোলিয়থ সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার উল্লিখিত মুসনাদের বর্ণনায়[১২] উল্লেখ করা হইয়াছে যে, একবার একদল আনসার (সাহায্যকারী) মহানবী -এর নিকট আসিয়া বলিলেন, মক্কার লোকেরা তাঁহার সম্পর্কে নানা আজেবাজে কথা বলে। কেহ কেহ তাঁহাকে এমনকি গোবর-গাদায় উৎপন্ন তালবৃক্ষের সহিতও তুলনা করে। ইহাতে মহানবী তাঁহার নিকট উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কে তাহা বলিতে। তাহারা সকলেই উচ্চস্বরে বলিল "আপনি আল্লাহ্র রাসূল"। মহানবী বলিলেন ঃ "আমি মুহাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ্র পুত্র, (যিনি) আবদুল মুত্তালিবের পুত্র"। ইহার পর বলিলেন (এবং এখানে বর্ণনাকারী মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি পূর্বে কখনও মহানবী -কে তাঁহার বংশ সম্পর্কে এইরূপ বলিতে শোনেন নাই) যে, আল্লাহ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম গোত্রের শ্রেষ্ঠতম বংশে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং আমি বংশ হিসাবে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তি হিসাবেও তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ"।

মহানবী ﷺ-এর কথিত নিম্ন বংশমর্যাদা প্রমাণের জন্য মর্গোলিয়থ কর্তৃক এই বর্ণনার ব্যবহার দুইটি প্রধান বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ। (এক) তিনি মহানবী ﷺ-এর ঘোষিত শত্রুদের স্পষ্টত বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন মাত্র, অথচ বিপরীত প্রমাণকারী অন্য অনেক তর্কাতীত প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং (দুই) আরও মারাত্মকভাবে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি তাহার পাঠকদের নিকট গোপন করিয়াছেন যে, যখন মহানবী ﷺ তাঁহার সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য সম্পর্কে জানিতে পারিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিবাদ করেন এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম এইভাবে উচ্চারণ করিলেন যাহাতে কোন সন্দেহ না থাকে যে, তাঁহারা এইরূপ সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁহাদের আর অন্য কোন পরিচিতির প্রয়োজন ছিল না।

বস্তুতপক্ষে আনসারদের অনেকেই, যাহাদের নিকট মহানবী ﷺ উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'আবদুল মুত্তালিবের নিজ মাতৃকুলের আত্মীয় ছিলেন। মহানবী ﷺ সেখানেও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের লোক। মহানবী ﷺ কর্তৃক তাঁহার শত্রুদের বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ এবং তাঁহার অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় পটভূমি সম্পর্কে তাঁহার দ্ব্যর্থহীন ও জনসমক্ষের ঘোষণা সংক্রান্ত অতি প্রকৃত তথ্যকে গোপন করিয়া মার্গোলিয়থ দুঃখজনকভাবে মহানবী ﷺ-এর সপক্ষের একটি সিদ্ধান্তসূচক প্রমাণকে তাঁহার বিপক্ষে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ণনাটি যে মহানবী ﷺ-এর বংশমর্যাদার অনুকূলের অত্যন্ত জোরালো প্রমাণগুলির অন্যতম তাহা ইহা হইতেও প্রমাণিত যে, ওয়েনসিঙ্ক (Wensinck) তাঁহার বহুল পরিচিত গ্রন্থ "হাদীছ শাস্ত্রের বিষয়সূচী"তে যথার্থভাবেই এই বর্ণনাটির শিরোনাম দিয়াছেন মহানবী ﷺ -এর সেই উক্তিকে ঃ "আমি বংশ হিসাবে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তি হিসাবেও তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ"।[১৩]

(গ) নম্বরে উল্লিখিত বিষয় যথা, যেদিন মহানবী ﷺ বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন সেদিন তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আজ পৌত্তলিক যুগের রক্তের আভিজাত্যের অবসান হইল", প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মার্গোলিয়থ স্পষ্টতই ঘোষণাটির ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঘোষণা মহানবী ﷺ এইজন্য দেন নাই যে, তিনি কোন (সম্ভ্রান্ত) বংশের ছিলেন না এবং আমরা একটু পূর্বেই উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি জনসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের শ্রেষ্ঠতম বংশের লোক। আলোচ্য ঘোষণাটি দেওয়া হইয়াছিল পৌত্তলিক যুগের রক্ত লইয়া ঝগড়া-বিবাদের অশুভ পরিণতির মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য যাহা প্রায়শ সম্মান ও বংশ গৌরবের মিথ্যা অহমিকা হইতে উদ্ভূত হইত এবং ইহার উপরেও জোর দেওয়ার জন্য যে, কোন ব্যক্তির সম্মানের প্রতি প্রকৃত দাবি তাহার বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা এবং ইনসাফ ও তাহার কার্যাবলীর মহত্ত্বের মধ্যে নিহিত, তাহার বংশের মধ্যে নহে।

অনুরূপভাবে (ঘ) নম্বরে উল্লিখিত যুক্তিও বিভ্রান্তিকর। যথা স্বয়ং মহানবী 'প্রভু এবং আমাদের প্রভুর পুত্র' উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিল। মহানবী এই ধরনের সম্বোধন সমর্থন করেন নাই। তাহা এই কারণে নহে যে, তিনি কোন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন না, বরং এই কারণে যে, যেমন মার্গোলিয়থ তাঁহার সমর্থনে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন[১৪] উহাতে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত উপাধি "আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক" (রাসূলুল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন উপাধি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মার্গোলিয়থের প্রতারণা স্পষ্ট হইয়া উঠে যদি আমরা কুরআনের ৩৩ ঃ ৪০ আয়াত পুনরায় স্মরণ করি যেখানে মহানবী -কে "অমুকের পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেহই এই আয়াতটিকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া দাবি করে না যে, মহানবী সন্তানহীন ছিলেন, সুতরাং তিনি কাহারও পিতা ছিলেন না। যেরূপ আলোচ্য বর্ণনায় বিদ্যমান, তেমনি কুরআনের এই আয়াতটিতে সুস্পষ্টরূপে আদেশ দান করা হইয়াছে তহাকে অন্য কোন প্রকার সম্বোধনের পরিবর্তে 'রাসূলুল্লাহ' বলিয়া সম্বোধন করিতে।

একইরূপে, (ঙ) নম্বরে প্রদত্ত তাঁহার যুক্তিও প্রতারণাপূর্ণ ও কষ্টকল্পিত। তিনি ইবনুন নাদীম উল্লিখিত একটি দলীলের[১৫] উল্লেখ করিয়াছেন যাহা স্বয়ং আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক লিখিত বলিয়া ধারণা করা হয় এবং যাহাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সান'আ (ইয়ামান)-র হিময়ারী বংশের জনৈক ব্যক্তি তাহার নিকট এক হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ঋণী ছিল। ইহা হইতে মার্গোলিয়থ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "আবদুল মুত্তালিব কিছু পুঁজির মালিক ছিলেন এবং উহা হইতে তিনি কখনও কখনও ঋণ প্রদান করিতেন।"[১৬]

এখন ইবনুন নাদীম উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই দলীলটি আরবী লিপির উন্নতি অনুসন্ধানকালে খলীফা আল-মামূনের কোষাগারে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে কোন প্রকারের ইঙ্গিত নাই যে, 'আবদুল মুত্তালিব উক্ত অর্থ সূদে ঋণ দিয়াছিলেন। লিখিত ঋণ ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণেও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কুরায়শ, বিশেষত বানূ হাশিম ইয়ামান ও আবিসিনিয়ার সহিত ব্যবসায় পরিচালনা করিত। ইহা একেবারেই সম্ভাবনার অতীত যে, মক্কার একজন পুঁজিপতি সেই আমলে এত দূরবর্তী দেশের কোন ব্যক্তিকে সূদে অর্থ ঋণ প্রদান করিবে। তবে একান্ত যদি অনুরূপ ঋণ প্রদান করা হইয়াই থাকে তাহা হইলে দলীলে সূদের হারও অবশ্যই উল্লেখ থাকিত।

কিন্তু মার্গোলিয়থ আবর্তিত ভ্রান্ত যুক্তি দেখান। তিনি বলেন, "তাহার ('আবদুল মুত্তালিবের) নিম্নমানের অবস্থানের সহিত তাহার সম্পদের সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা অনুমান করিতে বাধ্য যে, যে পেশায় তাহার অর্থ অর্জিত হইয়াছে তাহা কোন সম্মানজনক পেশা ছিল না"।[১৭] এইরূপে মার্গোলিয়থ প্রথমে ধরিয়া লইয়াছেন যে, 'আবদুল মুত্তালিব নিম্ন অবস্থানের লোক ছিলেন, যাহা কোন নিরপেক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত নহে। কিন্তু এই প্রাথমিক অবাস্তব ধারণা হইতে আরও আগাইয়া গিয়া মার্গোলিয়থ দ্বিতীয় ধারণা করেন যে, যেহেতু 'আবদুল মুত্তালিব নিম্ন অবস্থানের লোক ছিলেন, তাই তাহার অধিকারে প্রাপ্ত সম্পদ কোন "সম্মানজনক পেশায়" অর্জিত

হয় নাই এবং এই দ্বিতীয় ধারণা হইতে মার্গোলিয়থ তৃতীয় ধারণায় উপনীত হন যে, যেহেতু তাহার সম্পদ কোন সম্মাজনক পেশায় অর্জিত নহে, তাই 'আবদুল মুত্তালিব অবশ্যই একজন নিম্ন বংশের লোক হইবেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন ঐকান্তিক ঐতিহাসিকই এইরূপ অবাস্তব ধারণার গোলকধাঁধার বেড়াজালে যুক্তির ভিত্তিতে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে অপমানিত করার প্রয়াস পাইবেন না। অধিকন্তু মর্গোলিয়থের অন্তর্নিহিত ধারণা যে, প্রাক-ইসলামী যুগের আরবে অর্থ ঋণদান একটি অসম্মানজনক পেশা ছিল, মোটেও সঠিক নহে। ঋণদাতাদের দাবি ব্যর্থ করিয়া দিবার কৌশল সম্পর্কে কবিদের দম্ভোক্তি[১৮] হইতে এই সম্পর্কে তাহার উদ্ভাসিত প্রাণ যুগপৎ প্রশ্নসাপেক্ষ ও অবিশ্বাস্য।

একইরূপে এই কটাক্ষও সমর্থনের অযোগ্য যে, 'আবদুল মুত্তালিব "পানিদাতা ও আপ্যায়নকারী" পদকে, যাহা তাহার অধিকারে ছিল, যমযমের পানি বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি যে এইরূপ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রতি এইরূপ অপবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোন প্রমাণ নাই। অপরপক্ষে যদি তিনি যমযম কূপ খনন ও সংস্কার করিয়া থাকেন এবং উহার পানি জনসাধারণ ও হজ্জযাত্রীদের জন্য সহজ লভ্য করিয়া থাকেন, যেরূপ স্বয়ং মার্গোলিয়থ স্বীকার করিয়াছেন এবং যদি তিনি অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল যাবত হজ্জযাত্রিগণকে পানিদাতা ও আপ্যায়নকারীর পদ অধিকার করিয়া থাকেন, যাহা সকল বর্ণনা অনুসারে তিনি করিয়াছেন, তবে তাহা তিনি নিঃসন্দেহে সার্বিকভাবে মক্কার জনগণের সমর্থন ও মৌন সম্মতিক্রমে করিয়াছেন এবং এই ঘটনা মক্কার সমাজে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য ও নেতৃত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ।

মার্গোলিয়থ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবি তুলিয়াছেন (চ) নম্বরে। তিনি 'আবদুল মুত্তালিব নামের অনুবাদ করিয়াছেন আল-মুত্তালিবের ক্রীতদাসরূপে এবং বলিয়াছেন যে, "এই নামধারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একজন ক্রীতদাস ছিলেন, যদিও পরে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া হাশিমী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।" তিনি এই নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে প্রদত্ত বিবরণ "কল্পনা-প্রসূত" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন,[১৯] কিন্তু তিনি নিজে তাহার ত্রিমুখী কল্পনার সপক্ষে কোন ইতিবাচক প্রমাণ পেশ করেন নাই, যাহা (ক) 'আবদুল মুত্তালিব আসলে একজন ক্রীতদাস ছিলেন; (খ) পরবর্তীতে তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং (গ) তারপর তিনি হাশিমী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হন। এই সকল স্বেচ্ছাচারী ধারণার ভিত্তি কেবল নামের শাব্দিক অনুবাদের উপর স্থাপিত। অনুবাদ সম্পূর্ণ সঠিক নহে, কারণ 'আবদ সাধারণত ক্রীতদাস অপেক্ষা বরং ভৃত্য অর্থে ব্যবহৃত অধিকতর সাধারণ শব্দ, ক্রীতদাসের জন্য অধিকতর সঠিক অভিব্যক্তি হইতেছে রাকীক।

মার্গোলিয়থের কল্পনা যে একেবারেই অবাস্তব তাহা ইহা হইতেও স্পষ্ট যে, সমকালীন মক্কার সমাজে একজন প্রকৃত ক্রীতদাস কদাচিৎ অমুকের 'আবদরূপে সম্বোধিত বা পরিচিত হইত। যে

সকল ক্রীতদাস পরবর্তীতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন বিলাল, 'আম্মার এবং খাব্বাব কখনও তাহাদের স্ব স্ব মনিবের 'আব্দরূপে পরিচিত ছিলেন না। কুসায়্যি-এর একজন পুত্র, যিনি কুরায়শের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, 'আব্দ (বা 'আব্দ কুসায়্য) নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি ক্রীতদাস ছিলেন না কিংবা 'আবদ মানাফও মানাফের "ক্রীতদাস" ছিলেন না। যদি 'আবদুল মুত্তালিব মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং বানূ হাশিমে প্রবেশকারীই হইতেন তাহা হইলে প্রাক-ইসলামী যুগের মক্কায় তাঁহাকে হজ্জযাত্রিগণকে 'পানিদাতা ও আপ্যায়নকারী'র কার্য সম্পাদনকারী কা'বা বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কখনও স্বীকার করা হইত না, মার্গোলিয়থ যতই উক্ত কার্যের গুরুত্ব অস্বীকার করুন না কেন। অথবা 'আবদুল মুত্তালিবও বানূ মাখযূমসহ অতি সম্ভ্রান্ত গোত্রসমূহের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে পারিতেন না, কিংবা কথিত মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের পুত্র আবূ লাহাবও আবূ সুফয়ানের ভগ্নি হারব ইব্ন উমায়্যার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না, যাহাদের সকলকেই মার্গোলিয়থ ও তাহার প্রাচ্যবিদ অনুসারীগণ উচ্চ ও ভাল বংশের বলিয়া মনে করেন।

সর্বশেষ, যেরূপ (খ) নম্বরে প্রদত্ত তাহার যুক্তির ক্ষেত্রে, তদ্রূপ (ছ) নম্বরে প্রদত্ত তাহার যুক্তির ক্ষেত্রেও মার্গোলিয়থ শুধু মহানবী ﷺ-এর শত্রুর ভর্ৎসনাপূর্ণ মন্তব্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন, আর যে ঘটনায় মহানবী ﷺ-কে আবূ কাবশার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ঘটনার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য প্রধান তথ্যসমূহ গোপন করিয়াছেন। মার্গোলিয়থ বলেন, আবূ কাবশার পরিচিতি সম্পর্কে বিশাল অনিশ্চয়তা বিরাজমান। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, অনেকে এই নামটি মহানবী ﷺ-এর পালক পিতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং "পদবীটি" "বেশ সাধারণ্যে প্রচলিত" ছিল।[২০]

প্রকৃত পক্ষে, এই অভিব্যক্তি দ্বারা প্রকৃত কোন ব্যক্তিকে বুঝায় না। "আবূ কাবশার পুত্র" অভিব্যক্তিটি একটি গালিসূচক শব্দ মাত্র ছিল। আরবরা যে সকল লোকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা ক্রোধ পোষণ করিত তাহাদের প্রতি প্রয়োগের জন্য সাধারণভাবে ঐ শব্দটি ব্যবহার করিত।[২১] মার্গোলিয়থের ইঙ্গিত স্পষ্টতই আবূ সুফ্য়ানের মন্তব্যের প্রতি যাহা তিনি গোপনে তাহার সঙ্গীর নিকট করিয়াছিলেন, যখন মহানবী ﷺ-এর নিকট হইতে পত্র পাইয়া হিরাক্লিয়াস তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তাহারা উভয়ে হিরাক্লিয়াসের দরবারে চরমভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছিলেন।[২২] বায়যান্টাইন শাসককে মহানবী ﷺ-এর প্রতি অনুকূল দেখিয়া আবূ সুফ্য়ান চরম বিরক্তিভরে তাহার সঙ্গীকে চুপিচুপি বলিলেন, "আবূ কাবশার পুত্রের বিষয়" হিরাক্লিয়াসের দরবারেও জয়ী হইয়াছে।২৩ মার্গোলিয়থ মহানবী ﷺ-এর কথিত নিম্ন বংশমর্যাদা প্রমাণের জন্য আবূ সুফ্য়ানের উক্ত বিদ্বেষপূর্ণ এবং একান্ত ব্যক্তিগত মন্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু যাহা উল্লেখ করেন নাই তাহা হইল ঃ একই আবূ সুফ্য়ানকে একই সময় এবং একই বর্ণনাতে হিরাক্লিয়াস কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রথম প্রশ্নের জবাবে জনসমক্ষে ঘোষণা করিতে দেখা যায় যে, মহানবী ﷺ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আবূ সুফ্য়ান আরও উল্লেখ

করেন যে, তিনি মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার চেষ্টা করিতেন যদি তিনি (আবূ সুফ্য়ান) হিরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত অন্যান্য মক্কাবাসী কর্তৃক বিরোধিতার আশঙ্কা না করিতেন, যাহাদিগকে হিরাক্লিয়াস বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়াছিলেন—যদি আবূ সুফ্য়ান কোন কিছু অসত্য বলেন তাহা হইলে তাহারা যেন তাহার বিরোধিতা করে। সুতরাং মার্গোলিয়থ নিজের ধারণা প্রমাণের জন্য যে ঘটনা ও বর্ণনার বিকৃতি সাধন করিয়াছেন সেই একই ঘটনা ও বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে মহানবী ﷺ-এর সম্ভ্রান্ত বংশমর্যাদা প্রমাণের জন্য আরেকটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ যাহা তৎকালীন ঘোর শত্রু আবূ সুফ্য়ান বিদেশী রাজ-দরবারে জনসমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন।

ওয়াট (Watt) সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি মনে হয় মহানবী ﷺ-এর বংশমর্যাদা সম্পর্কে মার্গোলিয়থের উপসংহার তাঁহার যুক্তি-প্রমাণের পুনরাবৃত্তি ব্যতীতই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কখনও সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাষায়, আবার কখনও আকারে-ইঙ্গিতে বলিতে চাহেন যে, মহানবী ﷺ অভিজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন না।[২৪] সমাজে মহানবী ﷺ-এর সাধারণ অবস্থান প্রমাণের জন্য ওয়াট কুরআনের ৪৩ ঃ ৩১ নং আয়াতেরও উল্লেখ করেন, যদিও অন্যত্র তিনি (ওয়াট) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার ধর্ম প্রচারের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত আপোষের প্রস্তাব দান করিতে উৎসাহ বোধ করিত। ওয়াট আবরাহার মক্কা অভিযানকালে আবদুল মুত্তালিবের ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন একটি ধারণার অবতারণা করিয়াছেন, অত্যন্ত প্রতিকূল আলোতে তাঁহাকে তিনি উত্থাপন করিয়াছেন। ওয়াট বানূ হাশিম ও অন্যান্য কুরায়শ গোত্র, যথা আব্দ শামস, নাওফাল ও মাখযূম-এর মধ্যে দীর্ঘ বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে, আবরাহার সহিত 'আবদুল মুত্তালিবের আলাপ-আলোচনাকে "কুরায়শের একটি ক্ষুদ্র দলের (দীল ও হুযায়ল গোত্রসহ) দলীয় উদ্যোগ হিসাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যাহা হইতে কুরায়শের মূল স্রোতধারা দূরে সরিয়া রহিয়াছিল। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে 'আবদুল মুত্তালিব সম্ভবত কুরায়শের মধ্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, যথা 'আব্দ শাম্স্, নাওফাল ও মাখযূম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে আবিসিনীয়দের নিকট হইতে সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন.....। আমরা নিশ্চিত নহি, আবরাহা 'আবদুল মুত্তালিবের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা অথবা তাহাকে ততটা শক্তিশালী মনে না করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কিনা। যাহা হউক, অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়...।"[২৫]

বানূ হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংক্রান্ত ওয়াটের মতবাদ (এবং সাধারণভাবে ইসলামের উত্থান সম্পর্কে তাঁহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা) সম্পর্কে আমরা একটু পরেই এই পুস্তকে আলোচনার সুযোগ পাইব।[২৬] এইখানে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, 'আবদুল মুত্তালিবের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। ইহা বলা ভুল এবং সরাসরি উৎসসমূহের পরিপন্থী যে, 'আবদুল মুত্তালিবের ব্যবস্থা গ্রহণ "কুরায়শের মধ্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে আবিসিনীয়দের নিকট হইতে সমর্থন" লাভের জন্য "কুরায়শের একটি ক্ষুদ্র

দলের উদ্যোগ" ছিল। বানূ কিনানা ও বানূ হুযায়লসহ মক্কাবাসীদের এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর যে, তাহারা আবরাহার বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম, মক্কাবাসীদের নেতা ও মুখপাত্র হিসাবে তিনি আবরাহর শিবিরে গিয়াছিলেন।[২৭] অধিকন্তু, আবরাহা নিজেই মক্কায় তাহার দূত প্রেরণ করিয়াছিল উহার "প্রধানের" সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য এবং বাস্তবে মক্কাবাসীদের জীবনহানি এড়াইবার উদ্দেশ্যে কা'বা পরিত্যাগ করিতে তাহার নিকট চরমপত্র হস্তান্তরের জন্য।

'আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক আবরাহার শিবির পরিদর্শন স্বয়ং আবরাহার এই উদ্যোগেরই পরিণতি ছিল। তাহার দূত 'আবদুল মুত্তালিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, কারণ তাঁহাকেই সমগ্র মক্কাবাসীর প্রকৃত প্রধান ও মুখপাত্ররূপে পাওয়া গিয়াছিল। আবদুল মুত্তালিবের সহিত যদি দীল ও হুযায়ল প্রধানগণও গমন করিয়া থাকেন তবে তাহার অর্থ এই যে, তাহারাও আবিসিনীয় আক্রমণকারীকে সশস্ত্র মুকাবিলা না করা এবং কা'বা ধ্বংস না করিয়াই তাহাকে ফেরত গমনে রাজী করাইতে চেষ্টা করার মক্কাবাসী ও প্রতিবেশী গোত্রসমূহের যৌথ সিদ্ধান্ত অনুসারেই আবরাহার শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক উল্লিখিত বর্ণনায় এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যেরও উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাহারা সকলে আবরাহাকে তিহামার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন যদি সে কেবল মক্কা নগরী ও কা'বা আক্রমণ হইতে বিরত থাকেন।

এই সকল ঘটনা ওয়াটের তিনটি ধারণাকেই সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। 'আবদুল মুত্তালিব কুরায়শের একটি ক্ষুদ্র দলে, যেখান হইতে কুরায়শের মূল গোত্রের লোকেরা সরিয়া রহিয়াছিল, প্রধান হিসাবে নহে, বরং তাহাদের সকলের দলনেতা ও মুখপাত্র হিসাবে আবরাহার শিবিরে গিয়াছিলেন। তিনি আবরাহার নিকট হইতে কোন সুবিধা লাভের জন্য সেখানে যান নাই, বরং বেশ কিছু বস্তুগত সুবিধার বিনিময়ে নগরী ও উহার উপাসনালয় ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহাকে রাজী করানোর জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। কুরায়শের পক্ষ হইতে যে আলোচনা উন্মুক্ত ও পরিচালিত হইয়াছিল উহার প্রতি কুরায়শের মূল স্রোত নীরব কিংবা উদাসীন ছিল না।

ওয়াটের ধারণাসমূহ যুক্তিরও পরিপন্থী। আবরাহা স্বীকৃতরূপেই কা'বা ধ্বংস এবং তদ্দারা আরবে মক্কার বাণিজ্যিক প্রাধান্য ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল। এই যেখানে প্রধান বিষয় সেখানে এইরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে, তিনি মক্কাবাসীদের একটি ক্ষুদ্র ও কথিত অগুরুত্বপূর্ণ দলের সহিত, তাহাদিগকে তাহাদের অপেক্ষা একই নগরীর কথিত সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করিয়া, বাণিজ্যিক লেনদেনে সম্মত হইবে। ঐ নগরীর কোন একজনও, যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র সাধারণ জ্ঞান আছে, কিভাবে আবরাহাকে এইরূপ প্রস্তাব দিতে পারে যখন তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মক্কার বাণিজ্যিক অবস্থানের ধ্বংস সাধন এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদের কোন অংশের নহে? আবরাহা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিল এবং সমগ্র পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল তাহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য। সুতরাং তাহাকে যদি আদৌ তাহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হইতে বিরত রাখিতে হয় তাহা হইলে

তাহারই কিছু দৃঢ় আস্থা সৃষ্টিকারী সুবিধাজনক শর্ত লাভ করার কথা। বিপরীতক্রমে নগরবাসীর কোন অংশ তাহার নিকট হইতে কোন সুবিধাজনক শর্ত লাভ করার আশা করিতে পারে না।

অতএব ওয়াট আমাদিগকে যাহা বিশ্বাস করাইতে চাহেন প্রকৃত অবস্থা উহার ঠিক বিপরীত। এবং পুনরায়, নগরীর কথিত অধিকতর শক্তিশালী ও বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠতর গোত্রসমূহ এই অবস্থায় কিভাবে অলস বা নীরব থাকিতে পারিল এবং কেন তাহারা 'আবদুল মুত্তালিবের তৎক্ষণাত অথবা পরবর্তীতে একজন বিশ্বাসঘাতক ও পঞ্চম বাহিনীরূপে নিন্দা করিল না? আবরাহার সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা তো আর কোন গোপন বিষয় ছিল না।

আসলে ওয়াট 'আবদুল মুত্তালিব ও অন্যান্য গোত্রসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তখনকার দিনে প্রথমোক্ত জনের কথিত নিকৃষ্টতর অবস্থা সম্পর্কিত তাহার ধারণায় এতখানি আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয় যে, এই সাধারণ প্রশ্নগুলি তাহার মনে আদৌ রেখাপাত করে নাই। তাহার উক্তি যে, "আমরা নিশ্চিত নই আবরাহা 'আবদুল মুত্তালিবের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা অথবা তাহাকে ততটা শক্তিশালী মনে না করিয়া উহা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন কিনা", বিষয়টিকে বিভ্রান্ত করার একটি সহজ প্রয়াস মাত্র। আসলে ওয়াট মার্গোলিয়থের মতই, সরাসরি তথ্যের উল্লেখ এবং তদ্দ্বারা 'আবদুল মুত্তালিবের তখনকার কথিত বাণিজ্যিক হীন অবস্থা প্রমাণের পরিবর্তে গোলকধাঁধায় আবর্তিত ভ্রান্তযুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, আবরাহার সহিত 'আবদুল মুত্তালিবের আলাপ-আলোচনাকে কুরায়শের একটি ক্ষুদ্র দলের দলীয় উদ্যোগ হিসাবে "ব্যাখ্যা করিতে হইবে" এবং তারপর বলেন, "যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আবদুল মুত্তালিব সম্ভবত কুরায়শের মধ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে আবিসিনীয়দের নিকট হইতে সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন", এবং যেহেতু তিনি ধরিয়া নিয়াছেন এইরূপই হইয়াছে তাই অন্যান্য গোত্রসমূহে, যথা 'আবদ শাম্স্ ও নাওফাল, "দৃশ্যত এই সময় সিরিয়া ও ইয়ামানের সহিত অধিকাংশ বাণিজ্যই অধিকার করিয়া লইয়াছিল, যাহা পূর্বে হাশিম ও আল-মুত্তালিবের অধিকারে ছিল"।[২৮] ইহা সম্পষ্টরূপে গোলকধাঁধায় আবর্তিত যুক্তি প্রদর্শন এবং একটি অপ্রমাণিত ধারণার উপর অন্যটির ভিত্তি স্থাপন।

উপসংহারে, মহানবী ﷺ-এর গুরুত্বহীন বংশে জন্মগ্রহণ এবং "আবদুল মুত্তালিবের সামাজিক হীন অবস্থান সম্পর্কিত মার্গোলিয়থ ওয়াট ধারণা অনেক অকাট্য তথ্য দ্বারা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন, যাহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিম্নরূপ ঃ

(১) কুরায়শের সকল গোত্র একই ব্যক্তি, ফিহর (কুরায়শ), হইতে উদ্ভূত এবং মক্কায় তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব 'আবদুল মুত্তালিবের প্র-পিতামহ কুসায়্যি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) মক্কার কুরায়শের বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব 'আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম কর্তৃক সূচিত হয়, যিনি বায়যান্টাইন কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্যদের সহিত অনেকগুলি বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা উপগোত্রীয় ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিতকরণ ছাড়াও, সিরিয়া, ইয়ামান ও আবিসিনিয়ায় কুরায়শের জন্য বাস্তব বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিত করিয়াছিলেন।

(৩) মক্কার সকল কুরায়শ গোত্র একে অপরের রক্ত ও বিবাহ বন্ধন দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, যাহার ফলে এক গোত্রকে অপর গোত্র অপেক্ষা বংশগতভাবে শ্রেষ্ঠতর কল্পনা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। বিশেষ করিয়া, এমন কোন কুরায়শ গোত্র ছিল না যাহার সহিত মহানবী ﷺ-এর গোত্র বানূ হাশিমের সদস্যগণ উক্তরূপ সম্পর্কিত ছিল না। এইজন্যই তিনি তাঁহার জ্ঞাতি আত্মীয়-স্বজনদের বিরোধিতার মুখে এই বলিয়া তাহাদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে, তিনি নিকটাত্মীয় হওয়ার সুবাদে তাহাদের ভালবাসা ও সুবিবেচনা ব্যতীত তাহাদের নিকট কোন বস্তুগত সুবিধা আশা করেন না।[২৯]

(৪) মহানবী ﷺ-এর পিতামহ 'আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ আবিষ্কার ও পুনঃখনন করিয়াছিলেন যাহা কুরায়শের জীবনের একটি যুগান্তকরী ঘটনা ছিল এবং যাহা সমগ্র আরবজাতির উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব আরও নিশ্চিত করিয়াছিল। 'আবদুল মুত্তালিব অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল যাবত হাজ্জীদের "পানি সরবারহকারী ও আপ্যায়নকারীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যে জন্য তিনি সমগ্র আরবে এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। শুধু তাহার নাম উচ্চারণই তাহার ও তাহার বংশের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। মক্কাবাসীদের প্রকৃত নেতা হিসাবে তাহার সহিতই আবরাহা আলোচনা করিয়াছিল এবং তাহার পরামর্শেই কুরায়শগণ সকলে আবরাহার সৈন্যদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিয়াছিল। আবার এই 'আবদুল মুত্তালিবই সকল কুরায়শের পক্ষ হইতে কা'বাকে আল্লাহ্‌র হেফাজতে অর্পণ ও উহাকে তাঁহার গৃহ হিসাবে রক্ষা করার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আবরাহার সৈন্যবাহিনীর অলৌকিক ধ্বংসপ্রাপ্তিকে স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রার্থনার প্রতি আল্লাহ্‌র সাড়া দান হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সম্পূর্ণ ঘটনাটি সমগ্র আরবজাতির চোখে কা'বাগৃহ ও সামগ্রিকভাবে কুরায়শদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

(৫) 'আবদুল মুত্তালিব প্রায় সকল প্রধান কুরায়শ গোত্রের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার অন্যতমা স্ত্রী 'আবদুল্লাহ্‌র মাতা এবং তদনুসারে মহানবী ﷺ-এর পিতামহী মাখযূমী বংশীয় মহিলা ছিলেন। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর শিরায় তাঁহার পিতামহীর মাধ্যমে বানূ মাখযূমের রক্ত, তাঁহার মাতার মাধ্যমে বানূ যুহরার রক্ত এবং তাঁহার পিতার মাধ্যমে বানূ হাশিমের রক্ত একত্রে প্রবাহিত ছিল। 'আবদুল মুত্তালিবের অন্যান্য পুত্র ও কন্যাদেরও মাখযূম, 'আব্‌দ শাম্‌স-এর ন্যায় প্রধান প্রধান গোত্রসমূহে বিবাহ হইয়াছিল।

(৬) মহানবী ﷺ-এর নেতৃস্থানীয় বিরোধিগণ, যাহাদিগকে প্রাচ্যবিদগণ উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের সদস্যরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ব্যতীত আর কেহই নহে। উদাহরণস্বরূপ বানূ 'আব্‌দ শাম্‌স-এর নেতৃবৃন্দ 'আবদুল মুত্তালিবের নিজ চাচা 'আব্‌দ শাম্‌স-এর বংশধর ছিলেন, বানূ 'আবদুদ দার-এর নেতৃবৃন্দ ছিলেন 'আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিমের নিজ চাচাতো ভাই আসাদের বংশধর।

(৭) সর্বশেষ, আবূ তালিবের নেতৃত্বে একমাত্র বানূ হাশিমই অন্যান্য সকল কুরায়শ গোত্রের বিরোধিতার বিরুদ্ধে মহানবী ﷺ-কে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রায় তিন বৎসরব্যাপী বয়কট ও অবরোধ সফলতার সহিত প্রতিহত করিয়াছিল। অন্যান্য গোত্রসমূহ মহানবী

ﷺ-এর বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ ও তাঁহাকে হত্যা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু কেবল বানূ হাশিমের সহিত তাহাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় তাহারা উহা করার সাহস পায় নাই। বানূ হাশিমের ভাগ্যের উত্থান-পতন সত্ত্বেও উহা তখনও যে সামাজিক ও দৈহিকভাবে মক্কার ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য সকল গোত্রের সমকক্ষ ছিল ইহা অপেক্ষা আর কোন চূড়ান্ত প্রমাণ হইতে পারে না।

সুতরাং ইহা অকারণে নহে যে, মহানবী ﷺ প্রকাশ্যে দাবি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শত্রু আবূ সুফ্‌য়ান প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়াছিল যে, তিনি আরবদের সর্বোত্তম গোত্রের সর্বোত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেই কারণে কোন শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা তাঁহার অনুসারীদের আনুগত্য দাবি করেন নাই। বিপরীতক্রমে, তিনি মানুষের প্রয়োজনীয় সমতার উপর গুরুত্বারোপ করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির অভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তাহার বিশ্বাস, চরিত্র ও কার্যের গুণের মধ্যে নিহিত। ইসলাম তাই কোন 'অভিজাত'' বংশপরিচয়ের প্রতি কোন মিথ্যা মূল্য আরোপ করে না। তাই বলিয়া মহানবী ﷺ-এর অভিজাত বংশপরিচয়কে ঐতিহাসিক বাস্তবতারূপে স্বীকার না করারও কোন কারণ নাই।

দুই ঃ মহানবী ﷺ-এর নাম প্রসঙ্গে

প্রাচ্যবিদগণ একইভাবে মহানবী ﷺ-এর নাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিকারী প্রথম আধুনিক পণ্ডিত সম্ভবত এ্যালয় স্প্রেংগার (Aloy Sprenger)।[৩০] স্প্রেংগার আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা গ্রন্থে[৩১] পুনরুল্লিখিত একটি বর্ণনা হইতে তাঁহার সূত্র আবিষ্কার করিয়া বলেন যে, মহানবী ﷺ-এর প্রথম নাম ছিল "কুছাম", কিন্তু পরবর্তীতে উহা পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় 'মুহাম্মাদ'। স্প্রেংগার তাঁহার এই উক্তি এমনভাবে করিয়াছেন যেন এইরূপ ধারণার উদ্রেক হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় নাম গ্রহণের মধ্যে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল।

এখন ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আল-হালাবী তাঁহার গ্রন্থের একই অধ্যায়ের প্রথমদিকে অপর কয়েকটি বর্ণনার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে দেখা যায় যে, "মুহাম্মাদ" নামটি শিশুর মাতা (আমিনা) ও পিতামহ (আবদুল মুত্তালিব) কর্তৃক সর্বসম্মত ছিল এবং শেষোক্তজন শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে এক ভোজের আয়োজন করেন এবং প্রকাশ্যে শিশুর নাম "মুহাম্মাদ" বলিয়া ঘোষণা করেন।[৩২] এমনকি স্প্রেংগার যে বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন উহাতেও স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, মুহাম্মাদ নামটি শিশুর জন্মের সর্বশেষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইয়াছিল। উক্ত বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ[৩৩]

'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে[৩৪] বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন মহানবী ﷺ-এর জন্মের তিন বৎসর পূর্বে নয় বৎসর বয়সে কুছাম ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব-এর মৃত্যু হয় , তখন আবদুল মুত্তালিব গভীরভাবে শোকাহত হন। সুতরাং যখন মহানবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন 'কুছাম' যতক্ষণ না তাঁহার মাতা 'আমিনা 'আবদুল মুত্তালিবকে জানাইলেন যে,

তিনি স্বপ্নে শিশুর নাম 'মুহাম্মাদ' রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর তিনি (আবদুল মুত্তালিব) তাঁহার নাম রাখিলেন 'মুহাম্মাদ'।

সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, বর্ণনাটিতে শিশুর জন্মের অব্যবহিত পর এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার জীবনের সপ্তম দিনের, যখন 'আকীকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নামের প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছিল, পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল কেবল তাহার বর্ণনা রহিয়াছে।

স্প্রেংগারের সহিত প্রায় একই সঙ্গে মুইর (Muir) মহানবী -এর নাম সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি অবশ্য 'কুছাম' নামের উল্লেখ করেন নাই, তবে অন্যভাবে নাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া 'আহ্মাদ' নাম সম্পর্কে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই শেষোক্ত নামটি মুসলিমগণ কর্তৃক গৃহীত ও তাহাদের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের সহিত তাহাদের মুকাবিলার কারণে। কেননা বাইবেলে তাহাদের নবী সম্পর্কে "কথিত ভবিষ্যদ্বাণী"র সহিত ইহা মিলিয়া যায়। মুইর লিখিয়াছেন ঃ

"এই নামটি (মুহাম্মাদ) আরবদের মধ্যে বিরল ছিল, তবে অজ্ঞাত ছিল না। আরেকটি রূপ আহ্মাদ, যাহা নিউ টেস্টামেন্টের কোন কোন আরবীরূপে 'The Paraclete'-এর ভুল অনুবাদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, মুসলমানদের নিকট প্রিয় শব্দে পরিণত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে। কারণ মহানবী সম্পর্কে এই নামে (তাহারা বলে) তাহাদের গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল"।[৩৫]

এই উক্তির সহিত সংযুক্ত এক টীকায় মুইর আরও বলেন, "আহ্মাদ শব্দটি জন-এর গসপেলের (John's Gospel) কোন কোন প্রাথমিক আরবী অনুবাদে 'সান্ত্বনাদাতা' (The comforter)-এর সূত্রে ভুলক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে.... অথবা মুহাম্মাদের সময়ে কোন মূর্খ বা ফন্দিবাজ ধর্মযাজক উহা মিথ্যা রচনা করিয়া থাকিবে। এই জন্যই এই নামের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, যাহা মুহাম্মাদের জন্য প্রতিশ্রুতি বা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে মনে করা হয়"।[৩৬]

মহানবী সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় পৃথকভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে কেবল মুইরের মন্তব্যের প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সুবিদিত যে, মুসলিম ঐতিহাসিকগণ 'মুহাম্মাদ' নামের নূতনত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ইহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই যে, আরও কয়েক ব্যক্তির নাম 'মুহাম্মাদ' রাখা হইয়াছিল। কারণ তাহাদের পিতা-মাতাগণ ঘটনাক্রমে উত্তমরূপে ওয়াকিফহাল কোন খৃস্টান ধর্মযাজকের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিল যে, একজন নবীর আগমন সম্পর্কে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং তিনি শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার নাম হইবে 'মুহাম্মাদ'।

এই কারণে প্রত্যেক পিতা-মাতাই তাহাদের পুত্রের নাম রাখে 'মুহাম্মাদ' এই আশায় যে, তাহাদের পুত্রই হয়ত একদিন প্রত্যাশিত নবীরূপে আবির্ভূত হইবে।[৩৭] ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনুরূপ নামকরণকৃত ব্যক্তিগণ সকলেই মহানবী -এর সমসাময়িক ছিল এবং তাহাদের

গরিষ্ঠ সংখ্যক মহানবী ﷺ-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।[৩৮] মুইর এই বিষয়ে এবং পিতা-মাতাগণ কর্তৃক তাহাদের সন্তানদের এইরূপ নামকরণের ঐতিহাসিকগণ প্রদত্ত কারণ সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু তিনি ইহাকে "নবীর পূর্বাভাস প্রদর্শনের" জন্য "মুসলমানদের সাধারণভাবে অতি বিশ্বাস ও আকাঙ্খা" হিসাবে নাকচ করিয়া দিয়াছেন।[৩৯]

মুইর এইভাবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ঐতিহাসিকদের সরবরাহকৃত তথ্যের একদিকের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন এবং একই তথ্যের অন্য দিককে প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সরাসরি উল্লেখ করা হইতে বিরত রহিয়াছেন যে, ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মহানবী ﷺ-এর উভয় নাম মুহাম্মাদ ও আহ্‌মাদ তাঁহার শৈশব হইতেই রাখা হইয়াছে এবং পরোক্ষভাবে 'আহ্‌মাদ' নামের উল্লেখ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, ইহা "মুসলমানদের নিকট একটি প্রিয় শব্দে পরিণত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ইয়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলার ক্ষেত্রে", কারণ শেষোক্তদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে নামটি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

কিন্তু যেহেতু আহ্‌মাদ নামটি প্রকৃতই তৎকালীন বাইবেলের আরবী অনুবাদে উল্লিখিত ছিল, তাই মুইর ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আরও দুইটি অবাস্তব ধারণার অবতারণা করিয়াছেন। যথা ঃ ইহা (আহ্‌মাদ) নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখিত "দি প্যারাক্লেট" (The Paraclete)-এর 'ভ্রমাত্মক' অনুবাদ এবং "মুহাম্মাদের সময়ে কোন মূর্খ বা ফন্দিবাজ ধর্মযাজক কর্তৃক ইহা মিথ্যা রচিত"।

স্পষ্টতই মুইর এখানে তাঁহার ধারণার দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে যদি ইহা কেবল বাইবেলের আরবী পাঠের ভুল অনুবাদই হইত তাহা হইলে উক্ত ভুলের নির্দেশকরণই এই বিষয়ে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু মুইর স্পষ্টত নিশ্চিত নহেন। তাই তিনি "মুহাম্মাদের সময়ে কোন মূর্খ বা ফন্দিবাজ ধর্মযাজকের" জালিয়াতির বিকল্প দাবি লইয়া হাজির হইয়াছেন। কিন্তু কেন উক্তরূপ ধর্মযাজক (যদি আদৌ কেহ ছিলেন) মহানবী ﷺ-এর সময়ে বাইবেল অনুবাদ করিতে গিয়া জালিয়াতি করার প্রশ্নসাপেক্ষ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুইর তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার নিজ দাবি অনুসারে অপরিহার্যরূপে এই অনুসিদ্ধান্তে পৌছিতে হয় যে, তথাকথিত ফন্দিবাজ ধর্মযাজক আহ্‌মাদ নামের সহিত মূল পাঠের মিল দেখাইবার জন্য কথিত অনুবাদে উক্ত নামটি কেবল তখনই সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন যদি পূর্বেই মহানবী ﷺ উক্ত নাম ধারণ করিয়া থাকেন। অন্য কথায়, মুইরের নিজ ধারণা অনুসারেই মানিয়া লইতে হয় যে, মহানবী ﷺ ঐ সময় উক্ত নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

মুইরের অপর ধারণা যে, আহ্‌মাদ শব্দটি মুসলমানদের নিকট প্রিয় হইয়াছিল এই কারণে যে, ইহা বাইবেলের কথিত ভ্রান্ত অনুবাদে পাওয়া গিয়াছিল, যাহার অর্থ এই যে, আলোচ্য নামটি পরবর্তীতে গৃহীত হইয়াছিল যখন তাহারা বাইবেলে উহার উপস্থিতি সম্পর্কে জানিতে পারে। অথচ জ্ঞাত তথ্য বা যুক্তি দ্বারা এইরূপ অর্থ কোনক্রমেই সমর্থিত নহে। সহজ কথায় মুইরের দ্বিবিধ ধারণা উহাদের ভাবার্থসহ নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ মহানবী ﷺ আহ্‌মাদ নামটি তাঁহার শৈশবকাল হইতেই ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে কোন এক ফন্দিবাজ ধর্মযাজক নিউ টেস্টামেন্টে উল্লিখিত প্যারাক্লেট (Paraclete) শব্দটির বানোয়াট ও ভ্রান্ত অনুবাদ করেন 'আহ্‌মাদ' হিসাবে

এবং যেহেতু 'আহ্মাদ' শব্দটি নিউ টেস্টামেন্টের আরবী অনুবাদে পাওয়া গিয়াছে, তাই শব্দটি মুসলমানদের নিকট প্রিয় হইয়াছে। এইরূপ গোলকধাঁধার সূত্রে একটি ভ্রান্ত যুক্তি দেখান অপেক্ষা বিভ্রান্তিকর আর কিছুই হইতে পারে না।

আসলে মুইরের ধারণার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, মহানবী ﷺ সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীকে নাকচ ও নিরপেক্ষ করা। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কোন ভ্রান্ত অনুবাদও নহে কিংবা পরবর্তী কালের সৃষ্টও নহে। কুরআনে দাবি করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে পূর্ববর্তী কালের নাযিলকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল এবং "গ্রন্থের লোকদের (আহলে কিতাব) তাহা জানা ছিল"।[৪০] মহানবী ﷺ-এর সমসাময়িক খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণ অথবা মক্কার অবিশ্বাসিগণ, যাহারা মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতার ক্ষেত্রে শেষোক্তদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিত, উক্ত দাবিকে তখন মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ করে নাই। মহানবী ﷺ-এর মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ উভয় নাম কুরআনে উল্লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা মোটেও সঠিক নহে যে, ইহাদের যে কোন একটি নাম পরবর্তী কালে গৃহীত হইয়াছে যখন মুসলমানগণ ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সহিত মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। অথবা এই অভিমত যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রদান করা যায় না যে, মহানবী ﷺ ইহাদের যে কোন একটি নাম তাঁহার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে, যখন তিনি নবূওয়াত প্রাপ্তির দাবি করিয়াছিলেন অথবা মদীনার জীবনে যখন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ জীবনের ঐ পর্যায়ে বাইবেলের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নামকরণের জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত নাম পরিবর্তনের প্রশ্নসাপেক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণের কোন কারণ ছিল না। ঐ পর্যায়ে এইরূপ পদক্ষেপ তাঁহার দাবির প্রতি শক্তি যোগানোর পরিবর্তে কেবল তাঁহার দুর্বলতাই প্রকাশ করিত এবং খুব সম্ভব তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করিত, যদি অনেকের ধর্মত্যাগেরও কারণ না হইত। অধিকন্তু, ইহা তাঁহার প্রতিপক্ষ ও কুৎসা রটনাকারীদের জন্য তাঁহাকে আক্রমণের একটি অতি কার্যকর বিষয়েও পরিণত হইত।

মুইরের এই দুইটি ধারণা ঃ 'আহ্মদ' নিউ টেস্টামেন্টের পাঠের ভ্রান্ত অনুবাদ এবং নামটি পরবর্তী কালের গ্রহণ অথবা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সহিত প্রতিপক্ষীয় হওয়ার সময় মুসলমানগণ কর্তৃক জনসাধারণ্যে প্রচলিতকরণ, পরবর্তী কালের খৃস্টান ত্রুটি স্বীকারকারী ও প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক কোন না কোনভাবে গৃহীত হইয়াছে। তাই একদিকে প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বাইবেলে আসলে ইসলামের নবী সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই[৪১] এবং অন্যদিকে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতের উক্তি "তাঁহার নাম আহ্মদ" (اسمه احمد) পরবর্তী কালের সংযোজন[৪২] অথবা ঐ অংশের আহ্মাদ অভিব্যক্তিটিকে প্রক্ষেপণ বা সংযোজন মনে না করিয়া বিশেষণিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে"।[৪৩]

এখানে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রশ্নে অবতীর্ণ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় যে, শেষোক্ত দুইটি ধারণা সম্পর্কে যতদূর বলা যায় ঐগুলি মুইরের নিম্নোক্ত মন্তব্যেরই সম্প্রসারণ মাত্র যে, আহ্মাদ নামটি পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের নিকট প্রিয় হইয়াছিল।

কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াত "তাহার নাম আহ্মাদ", পরবর্তী কালে সংযোজিত হইবার ধারণা প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর স্থাপিত ঃ

(১) ইব্‌ন ইসহাক (ইব্‌ন হিশাম) যখন বলেন যে, সিরিয়াক (সুরয়ানী) অভিব্যক্তি 'আল-মুনহামান্না' অর্থ "মুহাম্মাদ" তখন তিনি কুরআনের এই বর্ণনার উল্লেখ করেন নাই, যদিও তিনি তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্র যথাযথ প্রাসঙ্গিক স্থানসমূহে স্বাধীনভাবে কুরআনের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন।

(২) ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার বিস্তারিত বিষয়গুলি কুরআনের বর্ণনা হইতে ভিন্নতর। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে শব্দগুলি 'ইসরাঈলের সন্তানদের' উদ্দেশ্যে সম্বোধিত, কিন্তু ইব্‌ন হিশামের গ্রন্থে উহা 'ইনজীলের লোকদের' উদ্দেশ্যে নিবেদিত।[৪৪]

এখন এইরূপ উল্লিখিত যুক্তিগুলির সুস্পষ্ট অসারতাসূচক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ধারণা যে, মুসলমানগণ (আহ্মাদ নামটি) ইসলামের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ইব্‌ন ইসহাক (মৃ. ১৫০-১৫৩) বা ইব্‌ন হিশাম (মৃ. ২১৩-২১৮) হইতে ইঙ্গিত গ্রহণপূর্বক কুরআনের বর্ণনায় সংযোজন করিবে। অধিকন্তু এইরূপ কথিত সংযোজন করার ক্ষেত্রে তাহারা নিশ্চয়ই এমন কোন নাম ব্যবহার করিবে না, যে নামে মহানবী ﷺ তাঁহার সমসাময়িকগণের নিকট পরিচিত ছিলেন না এবং তাহাও ইব্‌ন ইসহাক / ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক 'আল-মুনহামান্না-র অর্থ হিসাবে প্রদত্ত শব্দের পরিবর্তে।

গুথেরী-বিশপ (Gutherie-Bishop) মতের এই সকল বাহ্যিক ত্রুটি অনুভব করিতে পারিয়া ওয়াট দ্রুত তাহার বিকল্প মত লইয়া হাজির হইয়াছেন। তিনি বলেন, 'আহ্মাদ' শব্দটি ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতে নামের পরিবর্তে বরং বিশেষণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আরও বলেন যে, গুথেরী-বিশপ যে উদ্দেশ্য পূরণের আশায় "চেষ্টারত তাহা আরও সহজতর অনুমান দ্বারা পূরণ হইতে পারে। যথা ইসলামের প্রথম শতাব্দীর জন্য আহ্মাদ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য নহে, বরং বিশেষণ হিসাবে মনে করা হইত"।[৪৫] ইব্‌ন সা'দ-এর 'তাবাকাত', ইব্‌নুল আছীরের 'উসদুল গাবাহ' এবং ইব্‌ন হাজার-এর 'তাহযীবুত তাহযীব'-এর ন্যায় গ্রন্থগুলি হইতে প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের জরিপ করিয়া ওয়াট বলেন, "প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে মুসলিম শিশুগণকে বাস্তবে কখনও আহ্মাদ বলা হইত না"। তিনি তাহার বিষয়কে "আরও জোরালো করিয়া" এইভাবে পেশ করিয়াছেন, "ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব যে, মহানবী ﷺ-এর পরে প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে কোন মুসলিম শিশুকে আহ্মাদ বলা হইত"।[৪৬]

ওয়াট উল্লেখ করেন যে, "মুহাম্মাদ নামের ন্যায় আহ্মাদ নামটি জাহিলিয়্যা যুগে বিদ্যমান ছিল"। কিন্তু তিনি বলেন, মহানবী ﷺ-এর সহিত ইহার কোন সংশ্লিষ্টতা থাকিতে পারে না।[৪৭] অনুরূপভাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর রচিত বলিয়া কথিত একটি কবিতায় কোন এক আহ্মাদের উল্লেখ রহিয়াছে যাহার মু'তা যুদ্ধে পতন হইয়াছিল এবং "জনৈকা

অখ্যাত মহিলা কবি" এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন যে আল্লাহ্‌র এবং "মানুষ আহ্‌মাদ"-এর ধর্মকে মিথ্যা বলিয়া গণ্য করিত।[৪৮]

কিন্তু ওয়াট সাহেব হাসসান (রা)-এর কবিতাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন না এবং "অখ্যাত" মহিলা কবির বর্ণনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইভাবে যে, উহাতে কেবল "মহানবী ﷺ-কে সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত" বলিয়া ডাকা হইয়াছে এবং আবশ্যিকভাবে নাম দ্বারা নহে। তাহার ভাষায়, "আহ্‌মাদ-এর ব্যবহারের সম্ভাব্য প্রাথমিক উদাহরণ" হইতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ওয়াট শর্ত জুড়িয়া দিয়াছেন যে, "প্রতিপক্ষীয় কেহ যদি তাহার মতকে খণ্ডন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে কিছু আহ্‌মাদ নাম পেশ করিলেই চলিবে না, বরং ইহাও দেখাইতে হইবে অথবা অন্ততপক্ষে সম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর প্রসঙ্গে নাম হইয়াছে এবং উহা প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা মাত্র নহে"।[৪৯]

শর্তটি স্পষ্টরূপে ব্যতিক্রমধর্মী, যাহা সম্ভবত সামগ্রিকভাবে উক্ত মতের ত্রিবিধ মৌলিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করে।

প্রথমত ঃ মনে হয় ইহাতে স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, আলোচিত গ্রন্থগুলি কেবল নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বিরচিত এবং ঐগুলি ইসলামের প্রথম শতাব্দী ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে জীবিত সকল মুসলমানের নামের নিবন্ধন পুস্তক নহে। স্পষ্টতই কেবল এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কষ্টকর যে, প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে মুসলিম শিশুদেরকে কখনও আহ্‌মাদ বলা হইত না।

দ্বিতীয়ত ঃ শর্তটিতে মনে হয় এইরূপ ধারণার অযৌক্তিকতার স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, যেখানে আহ্‌মাদ নামটি প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত ছিল সেখানে ইসলামের প্রথম শতাব্দী বা অনুরূপ সময়ের জন্য আহ্‌মাদ শব্দটি কোন ব্যক্তির নাম হিসাবে নহে বরং সাধারণ বিশেষণ গণ্য হইত।

ইহা বোধগম্য নহে যে, যদি আহ্‌মাদ প্রাক-ইসলামী যুগে একটি নাম হইয়া থাকে তাহা হইলে উহাকে কেন ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে কেবল বিশেষণিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে অথবা প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা মাত্র মনে করিতে হইবে! ধারণাটি মনে হয় অপর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শব্দটি কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতে বিশেষণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ওয়াট প্রথম ইহা প্রমাণ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি বিপরীত দিক হইতে যুক্তি প্রদর্শন করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রথম মনে করেন যে, শব্দটি ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে একটি সাধারণ বিশেষণরূপে পরিগণিত ছিল এবং তারপর এই অনুমানকে তাহার অপর ধারণার ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া বলেন যে, সুতরাং কুরআনে শব্দটির ব্যবহারও বিশেষণিক। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যদি ইহা প্রমাণিতও হয় যে, কুরআনে শব্দটির ব্যবহার বিশেষণিক অর্থে করা হইয়াছে তাহার অর্থ আবশ্যিকভাবে এই নহে যে, প্রথম শতাব্দীতে উহার ব্যবহার অবশ্যই

একমাত্র সেই অর্থে হইবে, অথবা অন্যভাবে ইহাকে প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতারূপে গণ্য করিতে হইবে।

'আব্‌দুল্লাহ, খালিদ, আল-'আস ইত্যাদির ন্যায় নামসমূহ প্রাক-ইসলামী যুগেও সমভাবে প্রচলিত ছিল এবং এই নামগুলি পরবর্তী কালে মুসলিম শিশুদেরকেও দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতারূপে নহে, বরং উহাদের অর্থ ইসলামী বিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া। অধিকন্তু সা'ঈদ, খালিদ, আল-'আস এবং অনুরূপ অধিকাংশ 'মুসলিম নাম' শব্দ হিসাবে "বিশেষণ" কিন্তু তাহা প্রতিবন্ধক হওয়া দূরের কথা, বরং ব্যক্তিগত নাম হিসাবে উহাদের ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। ইহা আমাদিগকে ওয়াটের শর্তের তৃতীয় অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় নিয়া আসে। যখনই কোন মুসলিম শিশুর নাম রাখা হয় আহ্‌মাদ কিংবা মুহাম্মাদ, ইহা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত যে, মহানবী -এর নামের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ এইরূপ করা হয়। কদাচিৎ স্পষ্টভাবে বলা হয় বা লিপিবদ্ধ করা হয় যে, এই হইতেছে নাম নির্বাচনের কারণ। ওয়াট মনে হয় এই স্বাভাবিক অনুমান স্বীকার করেন এবং উপরোল্লিখিত অস্বাভাবিক শর্ত দ্বারা ইহাকে এড়াইয়া যাওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ছাড়াও ওয়াট তাহার তিনটি মতের সবকয়টিতেই ভুল করিয়াছেন। যথা (ক) মহানবী -এর পরে প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে কোন মুসলিম শিশুকে আহ্‌মাদ বলা হইত না; (খ) এই সমগ্র সময়ব্যাপী শব্দটি কেবল বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত; এবং (গ) কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতে ইহা বিশেষণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথম চ্যালেঞ্জ দানকারী ধারণার ভ্রান্তি সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার প্রত্যেক আন্তরিক ছাত্র মাত্রই বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ও আরবী ছন্দশাস্ত্রের ('আরূদ) প্রতিষ্ঠাতা আল-খালীল ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আমর-এর নামের সহিত পরিচিত। তিনি ১০০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭০ বা ১৭৫ হি. সনে ইনতিকাল করেন। তাহার জীবনী আলোচনাকালে ইব্‌ন খাল্লিকান বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, আল-খালীলের পিতা আহ্‌মাদ প্রথম ব্যক্তি বলিয়া কথিত, মহানবী -এর পর উক্ত নামে যাহার নামকরণ করা হয়।[৫০] মহানবী -এর পর তাহার প্রথম উক্ত নামধারী ব্যক্তি হইবার দাবি সম্পূর্ণ সঠিক বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মহানবী -এর নামানুসারেই তাঁহার উক্তরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল এবং যেহেতু তাহার পুত্র আল-খালীল ১০০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি (আহ্‌মাদ) সর্বশেষ ইসলামের প্রথম শতাব্দীর সত্তর দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

আহ্‌মাদ নামধারী প্রথম মুসলিম শিশুদের একজন, যদি তিনি সেই প্রথম শিশুটিই না হন, ছিলেন আহ্‌মাদ ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব (আল-হাশিমী)। জা'ফার এবং তাঁহার স্ত্রী 'আসমা' বিনত 'উমায়স উভয়ই ছিলেন প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন, যেখানে 'আসমার' গর্ভে চারটি পুত্র সন্তানের

জন্ম হয়। তাহাদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে 'আব্দুল্লাহ, 'আওন, মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ।[৫১] ইসলামে প্রাথমিক যুগের দীক্ষা গ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবাবেগ ও চেতনার প্রেক্ষিতে এইরূপ ধারণা করা যায় না যে, তাহাদের সন্তানদের 'আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও আহ্মাদরূপে নামকরণ কেবল প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা মাত্র ছিল। এমনও বলা চলে না যে, এই ক্ষেত্রে আহ্মাদ-এর ব্যবহার কেবল বিশেষণরূপে ছিল। পক্ষান্তরে ইহা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, তাহারা এই নামগুলি নির্বাচন করিয়াছিলেন। কারণ এইগুলি তাঁহাদের নূতন গৃহীত ইসলামী বিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। বিশেষ করিয়া কনিষ্ঠ দুই পুত্রের নামকরণ যথাক্রমে মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই নাম দুইটি মহানবী ﷺ-এর নামানুসারেই রাখা হইয়াছিল।

অপর একটি অতি প্রাথমিক যুগের উদাহরণ হইল 'আব্দ ইব্ন জাহ্‌ল-এর পুত্রের আহ্মাদরূপে নামকরণ। 'আব্দ এবং তাঁহার স্ত্রী ফুরায়'আহ বিন্ত আবী সুফয়ান প্রাথমিক কালের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মদীনায় হিজরতকারী প্রথম কয়েকজন মুসলমানের মধ্যে 'আব্দ ছিলেন অন্যতম। তাঁহারা যে শিশুর নাম মহানবী ﷺ-এর নামানুসারে রাখিয়াছিলেন তাহা এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট যে, ফুরায়'আহ যখন মহানবী ﷺ-এর প্রশংসাগাথা গাহিতেছিলেন তখন তিনি 'উম্মু আহ্মাদরূপে (আহমাদের মাতা) নিজের পরিচিত হইবার বিষয়টিকে বিশেষ গর্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন। একইরূপে 'আব্দও আবূ আহ্মাদরূপে অধিকতর পরিচিত ছিলেন এবং এই উপনামেই 'আল-ইসাবাহ্' গ্রন্থে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।[৫২]

সময়ের হিসাবে অল্প কিছুদিন পরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী অপর এক আহ্মাদকে আমরা দেখিতে পাই, যিনি তাহার উপনাম (কুন্য়া) আবূ সাখররূপে বেশী পরিচিত ছিলেন। তিনি ইয়াযীদ আর-রাকাশীর নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিতেন।[৫৩] এই শেষোক্ত ব্যক্তি ১১০ বা ১২০ হি. সনে ইনতিকাল করেন।[৫৪] এইরূপে আরও নাম পাওয়া যাইতে পারে যদি উৎসগুলিতে সতর্কতার সহিত সন্ধান করা হয়। উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, প্রায় ১২৫ হি. সনের পূর্বে মহানবী ﷺ-এর নামানুসারে কদাচিৎ কেবল মুসলিম শিশুর নাম 'আহ্মাদ' রাখা হইয়াছে এইরূপ দাবি কতখানি অসমর্থনযোগ্য।

হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর কবিতায়[৫৫] মহানবী ﷺ-কে আহ্মাদরূপে উল্লেখ করার বিষয়টি ওয়াট এই বলিয়া নাকচ করিয়া দেন যে, উক্ত কবিতা প্রামাণ্য নহে। সীরাত সাহিত্যে কাব্যসামগ্রী অবশ্যই সন্দেহজনক।[৫৬] কিন্তু ওয়াট স্বয়ং অন্যত্র উক্ত সামগ্রী হইতে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক বলিয়া এই কারণে গ্রহণ করিয়াছেন যে, অনুরূপ কবিতার যথার্থতার প্রশ্ন ছাড়াও উহাতে বিষয়াদির প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হইয়া থাকে।[৫৭] একই কারণে ইহা বলা যাইতে পারে যে,

উল্লিখিত হাসসান (রা)-এর কবিতায় মহানবী ﷺ-কে সেই নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে নাম তিনি প্রকৃতপক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। কারণ এইরূপ মনে করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে যে, মহানবী ﷺ-এর জন্য নূতন ও তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত নাম প্রচলনের উদ্দেশ্যে কবিতা জাল করা হইয়াছিল। উল্লেখিত কবিতার ক্ষেত্রে ইহা একেবারেই অসম্ভব। কারণ যেমন ওয়াট বলেন, ইহাতে মহানবী ﷺ-কে "মর্যাদাহানিকর স্থান দেওয়া হইয়াছে"।[৫৮] ইহা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এইরূপ রচনায় তাঁহাকে এমন কোন নূতন নাম দেওয়া হইবে না যাহার অর্থ তিনি একজন অতিশয় প্রশংসিত ব্যক্তি।

অপর তথ্যকণিকা অর্থাৎ একজন "অখ্যাত মহিলা কবি"র, যেরূপ তিনি অভিহিত হইয়াছেন,[৫৯] কবিতা প্রসঙ্গে, ওয়াট উহাকে অপ্রামাণ্য মনে করার কোন "স্পষ্ট কারণ" খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু তিনি ইহাকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাইয়াছেন, "সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহানবী ﷺ-এর সময় হইতেই কবিতায়, ছন্দের খাতিরে তাঁহাকে আহ্‌মাদরূপে সময় সময় উল্লেখ করার বিষয়টি আমাদেরকে যেন মানিয়া লইতে হইতেছে। আহ্‌মাদ অর্থ 'অধিকতর বা সর্বাধিক প্রশংসিত' কিন্তু মুহাম্মাদ অর্থ শুধু 'প্রশংসিত'। একজন কবির পক্ষে মহানবী ﷺ-কে 'সর্বাধিক প্রশংসিত' বলা অযৌক্তিক কিছু নহে"।[৬০]

'সুতরাং ওয়াট স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা কবিতায় মহানবী ﷺ-এর আহ্‌মাদরূপে সমকালীন উল্লেখ। কিন্তু তিনি বলেন যে, "ছন্দের খাতিরে" এই অভিব্যক্তিটিকে "ব্যক্তির" (المرء) বিশেষণরূপে এখানে সংযোজন করা হইয়াছে। সাধারণ বৈয়াকরণিক কারণে এই ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য। কারণ যদি ইহাকে বিশেষণরূপে ব্যবহারেরই ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে ইহার পূর্বে 'আল (ال) যুক্ত করিয়া ইহাকে "নির্দিষ্ট" করা হইত, যেরূপ বিশেষ্য আল-মার'-এর ক্ষেত্রে, যাহাকে বিশেষায়িত করা হইয়াছে বলা হইতেছে, নির্দিষ্ট আকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ আরবী ভাষায় মাওসূফ ও সিফাত উভয়ের নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার ক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষার নিয়ম অপরিহার্য। অতএব আলোচ্য কবিতায় 'আহ্‌মাদ' শব্দটিকে মহানবী ﷺ-এর নাম হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ওয়াট বিষয়টিকে "আহ্‌মাদ"রূপে মহানবী ﷺ-এর মাঝেমধ্যে উল্লেখ বলিয়াও বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহা "তাঁহার নিজ সময় হইতেই " প্রচলিত ছিল। মহানবী ﷺ -এর জন্য আহ্‌মাদ "তাহার নিজ সময় হইতেই" ব্যবহৃত হইত এবং ইহা তাঁহার নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইত, তাঁহার জন্য বিশেষণ হিসাবে নহে। ওয়াট ইহা দেখাইবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই যে, মহানবী ﷺ-এর সময় হইতে পরবর্তী কাল পর্যন্ত আহ্‌মাদ শব্দের অনুরূপ সকল ব্যবহারই ছন্দের প্রয়োজনে এবং বিশেষণরূপে করা হইয়াছে।

ইহাও সঠিক নহে যে, ইব্‌ন হিশামের গ্রন্থে কেবল দুইটি স্থানে কবিতায় মহানবীর নাম হিসাবে 'আহ্‌মাদ' ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমনটি ওয়াট ভাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহানবী ﷺ -এর নাম কবিতায় অন্তত পক্ষে নয়টি ভিন্ন স্থানে অনুরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

(১) মহানবী ﷺ-কে তাহাদের নিকট সমর্পণের জন্য আবূ তালিবের উপর কুরায়শ নেতৃবৃন্দের চাপ প্রয়োগ সম্পর্কে আবূ তালিবের কবিতা।[৬১]

(২) নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে 'আমর ইবনুল-জামূহ-এর কবিতা।[৬২]

(৩) বানূ নাযীর সম্পর্কে একটি কবিতা যাহা ইব্‌ন ইসহাকের মতে আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) কর্তৃক রচিত, কিন্তু ইব্‌ন হিশাম যাহাকে অন্য কাহারও রচিত বলিয়া মনে করেন।[৬৩]

(৪ও ৫) 'আব্দুল্লাহ ইবনুয যিব্'আরা কর্তৃক উহুদের যুদ্ধ এবং তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রচিত দুইটি কবিতার প্রতিটিতে একবার করিয়া মোট দুইবার।[৬৪]

(৬, ৭, ৮) কা'ব ইব্‌ন মালিক আল-আনসারী (রা) কর্তৃক হামযার শাহাদাত, খন্দকের যুদ্ধ এবং খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত তিনটি কবিতার প্রতিটিতে একবার করিয়া মোট তিনবার।[৬৫] শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিনি কবিতায় আহ্‌মাদ ও মুহাম্মাদ উভয় নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯) হারিছা এবং ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাত সম্পর্কে হাসসান ইব্‌ন ছাবিত আল-আনসারী (রা)-এর কবিতা।[৬৬]

পুনরায়, কেবল কবিতায়ই নহে, ইব্‌ন ইসহাকের মূল গ্রন্থেও অন্তত দুইটি স্থানে মহানবী ﷺ-এর নাম আহ্‌মাদরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ একটি ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক উদ্ধৃত হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর বর্ণনায়[৬৭] এবং অপরটি কুরআনের ২ ঃ ৪০ নং আয়াত সম্পর্কে তাঁহার নিজ ভাষ্যে।[৬৮] এই আয়াতে ইসরাঈলের সন্তানদের সম্পাদিত 'চুক্তির' কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন ইসহাক এই আয়াতের ভাষ্যে যেভাবে আহ্‌মাদ নামটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তিনি কুরআনের ৬১ ঃ ৬ আয়াত হইতে নামটি গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে মহানবী ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে "যাহার নাম আহ্‌মাদ" ইসরাঈলীদের অবগতি সম্পর্কে বিধৃত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক তাহার গ্রন্থে 'আহ্‌মাদ' নামের এই ব্যবহার গুথেরী বিশপের স্বকপোলকল্পিত ধারণা ঃ 'আহ্‌মাদ নামটি ইব্‌ন্ ইসহাক বা ইব্‌ন হিশাম কেহই ব্যবহার করেন নাই', যাহা ওয়াট সমর্থন ও গ্রহণ করিয়াছেন, নাকচ করিয়া দেয়।[৬৯]

এইরূপে 'প্রায় ১২৫ হি. সন পর্যন্ত মহানবী ﷺ-এর নাম অনুসারে কাহারও নাম আহ্‌মাদ রাখা হয় নাই এবং ঐ সময় পর্যন্ত শব্দটি সাধারণত বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত' এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ পূর্বক ওয়াট কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ইহার সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ নিম্নরূপ করেন ঃ "একজন দূতের সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছি যিনি আমার পরে আসিবেন এবং যাঁহার নাম প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"।[৭০] ওয়াট বলেন, "ইসমুহু আহ্‌মাদ" শব্দগুলির মানসম্পন্ন ব্যাখ্যা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সাধারণভাবে মুসলমানগণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।[৭১] উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ওয়াট দুইটি কারণ পেশ করেন।

(এক) তিনি বলেন, ইব্‌ন ইসহাক মহানবী ﷺ-এর নাম হিসাবে আহ্‌মাদ-এর উল্লেখ করেন নাই এবং মন্তব্য করেন যে, ইহা ধারণা করা যায় না যে, উক্ত ঐতিহাসিক এই নাম সম্পর্কে

অনবহিত ছিলেন। কারণ তাঁহার সমসাময়িক মূসা ইব্‌ন ইয়া'কূব আল-জামি' (মৃ. ১৫৩-১৫৮ হি.) কর্তৃক বর্ণিত ও ইব্‌ন সা'দ কর্তৃক উল্লিখিত একটি হাদীছে মহানবী ﷺ-এর নাম হিসাবে আহ্‌মাদ-এর উল্লেখ রহিয়াছে। ওয়াট যুক্তি দেখান যে, "সুতরাং ইহা বোধগম্য যে, ইব্‌ন ইসহাক আহ্‌মাদ নামের উল্লেখে হঠাৎ বিরত রহিয়াছেন এই কারণে নহে যে, তিনি সে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, বরং এই কারণে যে, তিনি কুরআনের আয়াতের এই ব্যাখ্যা অনুমোদন করেন নাই"।[৭২]

(দুই) ওয়াটের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) ৬১ ঃ ৬ আয়াতের তাঁহার ব্যাখ্যায় "যদিও তিনি পুরাতন ধারণাসম্পন্ন ব্যাখ্যাই দিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রমাণস্বরূপ পূর্ববর্তী কোন ভাষ্যকারকে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই", যদিও "প্রতিটি সামান্য বিষয়েও অজস্র প্রামাণ্য ব্যক্তির গ্রন্থ উদ্ধৃত করা তাঁহার অভ্যাস," ওয়াট বলেন, ইহার অর্থ "তিনি এমন কোন খ্যাতনামা ভাষ্যকারের কথা জানিতেন না যিনি তাঁহার সময়ে যাহা মানসম্পন্ন ও স্পষ্ট মত ছিল তাহা পোষণ করিতেন"।[৭৩]

ওয়াট এখন গুথেরী বিশপকে অনুসরণ করিতে গিয়া এবং ইব্‌ন ইসহাক মহানবী ﷺ-এর নাম হিসাবে আহ্‌মাদ-এর উল্লেখ করা হইতে বিরত রহিয়াছেন মনে করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। যেরূপ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে[৭৪] ইব্‌ন ইসহাক আহ্‌মাদ নামটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাও কুরআনের আয়াতের (২ ঃ ৪০) ব্যাখ্যায় যাহা ইয়াহূদীদিগকে আগমনকারী নবী সম্পর্কে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ও তাহাদের অবগতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ইব্‌ন ইসহাক নামটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং মহানবী ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আত-তাবারী সম্পর্কে যুক্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ওয়াটের চিন্তাধারা স্পষ্টরূপে দুইটি পারস্পরিক স্বতন্ত্র মতের ভিত্তিতে গঠিত। তিনি বলেন যে, আত-তাবারী পুরাতন ধারণাসম্পন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কারণ উহাই "তাহার সময়ে মানসম্পন্ন এবং স্পষ্টরূপে বোধগম্য মত ছিল"। কিন্তু তিনি যেহেতু কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নাই, তাই "কোন খ্যাতনামা ভাষ্যকার এই মতের সমর্থক ছিলেন না"।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ ব্যাখ্যা মানসম্পন্ন এবং স্পষ্টরূপে বোধগম্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না যদি সেই যুগের অথবা পূর্ববর্তী যুগের "খ্যাতনামা" ভাষ্যকারগণ উহা পোষণ না করেন অথবা যদি তাহারা কোন ভিন্নতর বা বিপরীত মত পোষণ করেন। আরও উল্লেখ্য যে, আত-তাবারী প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নাই। কেবল যেখানে কোন বিষয়ে একাধিক মত বিদ্যমান অথবা যেখানে পাঠ এত দুরূহ যে, উহার কয়েকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে সেখানেই তিনি অনুরূপ উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তিনি যে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নাই তাহার অর্থ একমাত্র এই যে, আলোচনাধীন আয়াতের অর্থের ব্যাপারে তাঁহার নিজ যুগে কিংবা পূর্ববর্তী যুগে কোন মতপার্থক্য ছিল না এবং পাঠ এতো পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে, উহার অন্য কোন ব্যাখ্যা হইতেই পারে না।

আত-তাবারী কর্তৃক কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দান হইতে বিরত থাকা এই কথার প্রমাণ বহন করে না যে, বিষয়টিতে পূর্বে মতপার্থক্য ছিল। উক্ত মনীষীর প্রতি সুবিচার এবং নিজ

দাবির প্রতি ন্যায়বিচারের স্বার্থে ওয়াটের নিজ ব্যাখ্যার সমর্থনে পূর্ববর্তী কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দান করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, বরং নেতিবাচক দিক হইতে তাঁহার দাবি প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন। "কুরআন ব্যাখ্যার আদিপুরুষ"[৭৫] হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি.) আত-তাবারীর প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে প্রকৃতপক্ষে 'ইসমুহু আহ্মাদ' অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তাঁহার নাম আহ্মাদ"।[৭৬]

প্রকৃতপক্ষে 'ইসমুহু' (اسمه) 'তাঁহার নাম' অভিব্যক্তিটি এত পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে, উহার অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না। ওয়াটই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এক অদ্ভুত মতের অবতারণা করিয়াছেন যে, আহ্মাদ শব্দটি এখানে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অভিব্যক্তিটির অনুবাদ হইবে এইরূপ ঃ "যাহার/ তাঁহার নাম প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"। এই অনুবাদ ইংরেজী ও আরবী উভয় ভাষার প্রতি চরম অবমাননাকর । কেবল কোন ব্যক্তি (বা তাহার কার্য বা আচরণ)-কেই সাধারণত "প্রশংসার যোগ্য বা "প্রশংসার অধিকতর যোগ্য" বলা হয়, তাঁহার নামকে নহে। সুতরাং সাধারণত এইরূপ বলা হইবে, "তিনি প্রশংসার যোগ্য" অথবা "প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"। কেহই এইরূপ বলিবে না, "তাহার নাম প্রশংসার যোগ্য"। যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার নামই "প্রশংসার যোগ্য" অর্থাৎ "তিনি জনাব প্রশংসার যোগ্য অথবা জনাব অধিকতর প্রশংসার যোগ্য"। সুতরাং বাক্যটিকে ব্যক্তির নাম প্রদানকারী হিসাবে ধরিতে হইবে, যদিও সেই নাম শব্দ হিসাবে একটি বিশেষণও।

ইংরেজী ব্যবহার রীতির প্রশ্ন ছাড়াও ওয়াটের অনুবাদে আরবী ব্যাকরণের স্বীকৃত নীতিমালা চরমভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে। আরবী ভাষায় দুই বা ততোধিকের মধ্যে তুলনামূলক বিশেষণ নিম্নের তিনটির যে কোন একটি রূপ গ্রহণ করে। যথা ঃ (ক) ইদাফাহ্ রূপ, উদাহরণ-হুওয়া আফদালুহুম' (সে তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম), (খ) 'মিন' ব্যবহারযোগে সাধারণ তুলনার রূপ, উদাহরণ-'হুওয়া আফদালু মিনহু' (সে তাহার অপেক্ষা ভাল) এবং (গ) বিশেষণের পূর্বে 'আল' যোগ করিয়া নির্দিষ্টকরণের রূপ, উদাহরণ-হুওয়া আল-আফদালু' (তিনিই সর্বোত্তম)। এই সবকয়টি রূপের অন্তর্নিহিত নীতি এই যে, যাহার সহিত তুলনা করা হইবে তাহাকে হয় প্রকাশ্য অথবা প্রসঙ্গ হইতে বোধ্য হইতে হইবে। যেক্ষেত্রে 'আল' ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে সাধারণত দুইয়ের অধিকের মধ্যে তুলনা করা হয় এবং সেখানে যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহা প্রকাশ্য বা পরোক্ষ হইতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিমালার ব্যতিক্রম করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রে, যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহা হয় সার্বজনীনভাবে জ্ঞাত অথবা প্রসঙ্গ হইতে এত স্পষ্ট যে, উহার কোন উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

আলোচ্য বাক্যে বিষয়টি এইরূপ নহে। ওয়াটের অনুবাদে এইভাবে ভাষায় স্বীকৃত নীতিমালা উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং ব্যাকরণগতভাবে উহা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং তাহা এই ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রযোজ্য যেখানে তিনি উহাকে দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—"তাহার 'নাম প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"। 'অধিকতর' কাহার বা কাহার নাম

অপেক্ষা? আল্লাহ্র কোন পূর্ববর্তী নবী বা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব "প্রশংসাযোগ্য" নাম বহন করেন নাই। আসলে ওয়াট বাক্যটির অর্থের সহিত আহ্মাদ নামের অর্থের সম্পূর্ণ তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি বাক্যটিতে 'আহ্মাদ' বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত এবং নাম হিসাবে না হইত, তাহা হইলে উহার পূর্বে নির্দিষ্টসূচক প্রত্যয় 'আল' যুক্ত হইত অথবা পরে 'মিন' ও তৎসহ একটি কর্ম যুক্ত হইত অথবা বাক্যটি 'ইদাফাহ' আকারে গঠিত হইত এবং বিশেষণের সহিত কিছু অভিব্যক্তি 'মুদাফ ইলায়হি' রূপে যুক্ত হইত।

ওয়াট তাহার অগ্রহণযোগ্য ধারণা ও ভ্রান্ত অনুবাদের ভিত্তিতে তিনি যাহাকে "ঘটনার ক্রমধারা" বলেন তাহা এইভাবে পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "খৃস্টানগণ কর্তৃক ইসলামের সমালোচনার জবাবে কিছু মুসলমান খৃস্টান ধর্মগ্রন্থসমূহে মুহাম্মাদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজিতেছিলেন" এবং জন (সুসমাচারের) ১৪-১৬ অংশটি তাহাদের নজরে পড়ে। ওয়াট আরও বলেন যে, সম্ভবত কুরআনের আয়াত নং ৬১ ঃ ৬-এর উপর গভীর অভিনিবেশ "খৃস্টধর্ম হইতে একজন ধর্মান্তরিতকে, যিনি সামান্য গ্রীক ভাষা জানিতেন, অর্থের মিল সম্পর্কে প্রথম যুক্তি-প্রমাণের দিকে ধাবিত করে" যাহার ভিত্তি "Periklutos-এর সহিত Parakletos-এর বিভ্রান্তির উপর স্থাপিত। ফলে যদিও কুরআনের আয়াতে 'আহ্মাদ'-কে এই পর্যন্ত "সাধারণত বিশেষণরূপে ধরা হইত", এখন উহাকে নাম হিসাবে ধরা হইল। কারণ উহা একটি সুপরিচিত প্রাক-ইসলামী নাম ছিল এবং আরও কারণ, এইরূপে খৃস্টান ধর্মগ্রন্থের সহিত একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুক্তিটি বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিকারক হইল যাহারা "তাহাদের নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অধিকতর পরিচিত" ছিল এবং একবার গৃহীত হইলে নামটি শীঘ্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৭৭]

এখানে আমাদের parakletos এবং periklutos সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন নাই, ওয়াটের উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করাই যথেষ্ট। কুরআন বারবার দাবি করিয়াছে যে, একজন নবী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে করা হইয়াছিল এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সেই অতি প্রতীক্ষিত নবী ছিলেন। সুতরাং মুসলমানদেরকে খৃস্ট ধর্মগ্রন্থের সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী দেখার জন্য উৎসাহী হইতে ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দীতে দৃশ্যপটে খৃস্টানগণ কর্তৃক ইসলামের সমালোচনার সূত্রপাতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা এবং কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা হইতেই উক্ত ধর্মগ্রন্থে সমর্থন খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু হইয়া থাকিবে। খৃস্টানদের দ্বারা ইসলামের সমালোচনাও প্রকাশিত হইতে ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দেরী হয় নাই। এবং যেহেতু, যেমন ওয়াট নিজেই বলেন, "মুহাম্মাদ Periklutos-এর তেমনই বিশুদ্ধ অনুবাদ যেমন আহ্মাদ" এবং যেহেতু শেষোক্ত শব্দটি, যদি বিশেষণ হিসাবেও ধরা হয়, সমভাবে মহানবী ﷺ-এর বর্ণনার সুন্দর প্রতিফলন ঘটায়, তাই নাম হিসাবে শব্দটির প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহার হইতে ধারণা গ্রহণের এবং আহ্মাদও মহানবী ﷺ-এর নাম ছিল এই বলিয়া অভিনব ঘোষণা সহকারে আগাইয়া আসিবার মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল না। এইরূপ নূতন ধারণা মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক বিতর্কের সৃষ্টি করিত, বিশেষ করিয়া যদি, যেমন ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন, ৬১ ঃ ৬ আয়াতের অভিব্যক্তিকে এই পর্যন্ত

"সাধারণভাবে বিশেষণরূপে ধরা হইত"। ওয়াটের বহু পরিশ্রমের ফসল এই ধারণা ও ব্যাখ্যা উপরে উল্লিখিত মুইরের দীর্ঘ দিনের পরিত্যক্ত ধারণার অন্যভাবে সম্পূর্ণ পুনরুক্তি মাত্র। যথা মহানবী ﷺ -এর জন্য আহ্মাদ নামটি মুসলমানদের নিকট খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের সহিত মুকাবিলার সময় জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

তিন ঃ মৃগীরোগের অপবাদ ও অন্যান্য মন্তব্য

শাক্কুস-সাদর (বক্ষবিদারণ)-এর ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় প্রাচ্যবিদ এইরূপ উদ্ভট কটাক্ষ করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার বাল্যকাল হইতে আজীবন "মৃগী বা মূর্ছা রোগে" আক্রান্ত ছিলেন। এই কটাক্ষ গ্রীকদের দ্বারা শুরু হয় এবং তারপর পরবর্তী লেখকগণ কর্তৃক উহা গৃহীত হয়। তাহাদের কেহ কেহ এমনকি, যেরূপ সায়্যিদ আহ্মাদ খান উল্লেখ করিয়াছেন, ঘটনার বিবরণে উল্লিখিত 'ফালহিকীহি' (فالحقيه) অভিব্যক্তিকে 'বি-আলহাক্কিয়্যাহ' (بالحقية) রূপে ভুল পাঠ করিয়াছেন এবং তারপর উহার অদ্ভুত অনুবাদ করিয়াছেন "অমূলক আতঙ্কগ্রস্ততা বা উদ্বিগ্নতা রোগ" (Hy-Pochondriacal disease) বলিয়া।[৭৮] উইলিয়াম মুইর যখন তাহার গ্রন্থ রচনা করেন স্পষ্টতই তাহার পূর্বসূরীদের ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাই এই ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইহা "সম্ভবত মৃগীরোগের খিচুনি" ছিল এবং লিখেন ঃ[৭৯]

"আমরা যদি আক্রমণগুলিকে সঠিকভাবে বুঝিতে সম্মত হই যাহা হালীমাকে স্নায়বিক বা মৃগী প্রকৃতির খিচুনিরূপে শংকিত করিয়াছিল তাহা হইলে ঐগুলি মুহাম্মাদ ﷺ-এর গঠনে সেই সকল উত্তেজনাকর অবস্থা ও ভাবাবেশকর মূর্ছার স্বাভাবিক চিহ্ন প্রদর্শন করে, যাহা সম্ভবত তাঁহার মনে প্রেরণার ধারণা প্রদান করিয়াছিল, যেরূপ তাঁহার অনুসারিগণ উহাকে নিঃসন্দেহে তাহার প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে"।

মুইর এই মৃগীরোগের তত্ত্বের সমর্থনে তাহার পুস্তকের পাদটীকায় ইব্ন হিশাম (ইব্ন ইসহাক)-এর গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের উসটেনফিল্ড (Wustenfeld) সংস্করণে[৮০] এবং অন্য সকল সংস্করণেও, বর্ণনায় প্রকৃত অভিব্যক্তি উল্লিখিত হইয়াছে 'উসীবা' (اصيب), অথচ মুইর উহাকে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন 'উমীবা' (اميبه) বলিয়া, যাহা স্পষ্টতই একটি অদ্ভুত ও অর্থহীন অভিব্যক্তি। অতঃপর তিনি উহার অর্থ করিয়াছেন "খিচুনিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন"[৮১] বলিয়া। প্রকৃতপক্ষে তিনি যদি উক্ত গ্রন্থের কোন ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত কপি অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু মুইর তাহা করেন নাই। বিপরীতক্রমে সায়্যিদ আহ্মাদ খান যখন ১৮৭০ খৃ. মুইরের এই মারাত্মক ভুলের কথা উল্লেখ করেন[৮২], শেষোক্তজন তখন মাত্র তাহার পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণ হইতে আলোচ্য পাদটীকাটি বাদ দিয়া দেন। কিন্তু তাহার যে তত্ত্বের সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ উক্ত পাদটীকা প্রথমে দেওয়া হইয়াছিল তিনি উহার কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করেন নাই। এইভাবে উৎসের ভুল ও অপব্যবহার নির্দেশ করা সত্ত্বেও অভিযোগ অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়া হয়।[৮৩]

উল্লেখ্য যে, 'শাক্কুস সাদর' (شق الصدر) ঘটনা সংক্রান্ত কোন বর্ণনাতেই উল্লেখ নাই যে, বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে অচেতন বা মৃগীর খিচুনিগ্রস্ত দেখা গিয়াছিল। পুনরায় কোন বর্ণনাতেই ঘটনাটিকে শারীরিক পীড়ন ও নিষ্পেষণসহ উল্লেখ করা হয় নাই, যাহা মহানবী ﷺ -এর জীবনে অনেক পরবর্তী কালে তাঁহার নিকট ওহী আগমনের সময় কখনও কখনও থাকিত। এতদসত্ত্বেও মুইর তাহার পূর্বসূরীদের অনুসরণে উহাই করিয়াছেন এবং নিম্নরূপ অননুমোদিত মন্তব্য করিয়াছেন যে, "স্নায়বিক বা মৃগী প্রকৃতির খিচুনি" মুহাম্মাদ ﷺ-এর গঠনে "সেই সকল উত্তেজনাকর অবস্থা ও ভাবাবেশকর মূর্ছার স্বাভাবিক চিহ্ন" ছিল যাহা সম্ভবত তাঁহার মনে প্রেরণার ধারণা প্রদান করিয়াছিল, যেরূপ তাঁহার অনুসারিগণ উহাকে নিঃসন্দেহে তাহার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন"।

এইরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি বিষয়ের মিশ্রণ কোনক্রমেই উৎস গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত নহে, বরং দুইটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত বহনকারী। ইহাতে একদিকে মৃগীরোগের ধারণার ভিত্তি হিসাবে 'শাক্কুস সাদর' সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ পায়। তাই মহানবী ﷺ-এর নিকট ওহী আগমনকালীন কোন কোন সময়কার অবস্থার বিকৃতি সাধন দ্বারা এক প্রকার সহায়ক প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে। অন্যদিকে ইহাতে ওহীর প্রকৃতি এবং তদ্দ্বারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই শেষোক্ত আচরণ বিষয়টির প্রতি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতে অধিকতর মৌলিক বলিয়া মনে হয়। তাই পরবর্তী প্রাচ্যবিদদের অনেকে মৃগীরোগের মতবাদ গ্রহণ না করিলেও মুইরের উপরোল্লিখিত মন্তব্যের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং ওহীকালীন (وحى) অবস্থার ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহাকে বলা হয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর "সচেতনতা" বলিয়া অর্থাৎ যাহা তিনি "প্রেরণা" মনে করিতেন বা "আন্তরিকভাবে" বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু যাহা কোনভাবেই আল্লাহ্র নিকট হইতে ছিল না।[৮৪] এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও আলোচনা এই পুস্তকের পরবর্তী পর্যায়ে করা হইবে।[৮৫] তবে এখানে এতটুকু অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় যে, মুসলমানগণ তাথাকথিত "উত্তেজনাকর অবস্থা ও ভাবাবেশকর মূর্ছা"কে প্রেরণার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করে না, যেরূপ মুইর দাবি করিয়াছেন।

মৃগীরোগ কিংবা অনুরূপ অন্য কোন রোগের মতবাদ ঐতিহাসিক অথবা যৌক্তিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণেই টিকিতে পারে না। প্রাপ্ত সকল বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, মহানবী ﷺ আমৃত্যু এক অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও কর্মতৎপরতার অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও দেহ ও মনের দৌর্বল্য ও বৈকল্যের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করেন নাই যাহা অতীত ও বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিন্ন মতানুযায়ী মৃগীরোগ বা হিস্টিরিয়ার অপরিহার্য পরিণতি। এমনও নহে যে, ইহা কটাক্ষের প্রবক্তাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। মুইর নিজেই বলেন, "ইহা সম্ভব যে, অন্যান্য দিক দিয়া মুহাম্মাদ ﷺ-এর দৈহিক গঠন অধিকতর শক্ত-সমর্থ ছিল"।[৮৬] ইহা সত্ত্বেও মুইর ও তাহার অনুসারিগণ কটাক্ষ অব্যাহত রাখিতে বদ্ধপরিকর।

মার্গোলিয়থ মহানবী ﷺ-এর মধ্যে মস্তিষ্ক-শক্তির হ্রাসসহ মৃগীরোগের কিছু কিছু লক্ষণ অনুপস্থিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিলেও, উল্লিখিত অভিযোগ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রেই শুধু নহে, ওহী

আগমন প্রক্রিয়ার সহিত কথিত মৃগীরোগের খিচুনির সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও মুইরের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মার্গোলিয়থ এমনও বলেন যে, মহানবী ﷺ ওহী "সৃষ্টি"র উদ্দেশ্যে "কৃত্রিমভাবে" উহার লক্ষণ তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ "......খৃস্টান লেখদের[৮৭] মধ্যে প্রচলিত ধারণা যে, তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন, ওহী নাযিল প্রক্রিয়ায় তাঁহার অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ বর্ণনাসমূহে উহার অদ্ভূত সমর্থন পাওয়া যায় এবং উক্ত প্রক্রিয়ার লক্ষণসমূহ প্রায়শ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলেও উক্ত ধারণার গুরুত্ব হ্রাস পায় না"।[৮৮]

এইরূপে মুইর ও মার্গোলিয়থের উদ্ভাবিত কটাক্ষের পুনরাবৃত্তি পরবর্তী লেখকদের অনেকেই করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রিচার্ড বেল (Richard Bell), যিনি উক্ত অভিযোগের প্রতি তাহার সমর্থন ব্যক্ত করিয়া সকল প্রধান প্রধান প্রাচ্যবিদের তালিকা প্রদান করিয়াছেন যাহারা উক্ত অভিযোগ উত্থাপন ও প্রধানত ওহী নাযিল প্রক্রিয়ার সহিত উহার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন।[৮৯] যেহেতু আধুনিক কালে মুইর এই অপবাদের প্রধান প্রবক্তা এবং অন্যরা শুধু তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন ধারণার পক্ষে কোন বৈধ যুক্তির উল্লেখ ছাড়াই, তাই তাহাদের মতামতের পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নাই।

মহানবী ﷺ-এর শৈশবের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে তাঁহার চাচার সহিত সিরিয়া ভ্রমণের সময় বাহীরার (বুহায়রা) সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিষয়টি প্রাচ্যবিদগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কারণ ইহাতে মহানবী ﷺ-এর প্রথম জীবনে একজন খৃস্টান ধর্মযাজকের সহিত তাঁহার এক প্রকার যোগাযোগ প্রমাণিত হয় এবং তাহা তাহাদের এই মতবাদের প্রতি সমর্থন যোগায় বলিয়া ধারণা করা হয় যে, তিনি পূর্বেই নানাভাবে খৃস্টধর্মের জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষণা করেন তখন সেই জ্ঞানের ব্যবহার করেন। তাহারা বাহীরার সহিত এই কথিত সাক্ষাতের, এমনকি খৃস্টধর্মের বিধান ও ধর্মগ্রন্থের পাঠ ও শিক্ষা গ্রহণের কয়েকটি অধিবেশন অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, যদিও সংশ্লিষ্ট বিবরণে কোন আকারেই একটি অতি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকার এবং প্রধানত প্রত্যাশিত নবী সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থীয় ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আনুষঙ্গিক আলোচনার অতিরিক্ত কোন কিছুর ধারণা পাওয়া যায় না।

কথিত খৃস্টান ও ইয়াহূদী উৎস হইতে মহানবী ﷺ-এর তথ্য ধার করার প্রশ্ন এই পুস্তকের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হইবে।[৯০] এখানে এইটুকু মাত্র উল্লেখ করা যায় যে, বাহীরার সহিত সাক্ষাতের এই ঘটনাকে প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক ব্যবহার দুইটি প্রধান বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ।

(এক) তাহারা ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণের একটি অংশ মাত্র গ্রহণ করেন এবং অপর অংশটি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ সেই অংশটি তাহাদের মতের বিরুদ্ধে যায়। বিবরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, তথা কুরায়শ দলকে বাহীরা কর্তৃক আপ্যায়ন, বালক মুহাম্মাদ ﷺ -এর সহিত তাহার কথোপকথন এবং বালককে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য আবূ তালিবের প্রতি তাহার আহবান-এর পিছনে সমগ্র কারণ ছিল প্রত্যাশিত নবী সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থীয় ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে তাহার (বাহীরার) জ্ঞান এবং বালকের মধ্যে উক্ত নবীর "চিহ্নসমূহ" তাহার শনাক্ত করিতে পারা। সমগ্র বিবরণটিকে গ্রহণ করিলে উহার অর্থ খৃস্টান ধর্মগ্রন্থে অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর শুধু উপস্থিতিই স্বীকার

করা হয় না, বরং তদানীন্তন আরবজগতে খৃস্টান যাজকীয় মহলে অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর জ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহাও স্বীকার করা হয়। এতদসত্ত্বেও বাহীরা ও তাহার ন্যায় অনেকের যে অনুরূপ সচেতনতা ও জ্ঞান থাকিতে পারে প্রাচ্যবিদগণ তাহাও মানিতে নারাজ। মুইর এই ঘটনাকে, যেরূপে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কোন ফন্দিবাজ ধর্মযাজকের ভ্রান্তি বা জালিয়াতি বলিয়া একতরফা ধারণা দ্বারা ব্যাখ্যা করারও প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহারা এইভাবে ঘটনার মূল অংশ বা সারকথা অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করিয়া আনুষঙ্গিক একটি বিষয় অর্থাৎ বাহীরার সহিত বালক হিসাবে মহানবী ﷺ-এর কথোপকথনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং উহার ভিত্তিতে শেষোক্তজনের খৃস্টধর্মের জ্ঞানের সংস্পর্শে আগমন ও উহা অর্জনের মতবাদ নির্মাণের প্রয়াস পাইয়াছেন।

(দুই) যেরূপ শাক্কুস সাদর সংক্রান্ত বিবরণের ক্ষেত্রে সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও প্রাচ্যবিদগণ, বিশেষ করিয়া মুইর, বিবরণটি ব্যবহার করিয়াছেন, যদিও উহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাহারা সন্দেহ পোষণ করেন। সুতরাং মুইর তাহার পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক দীর্ঘ পাদটীকায় কাল্পনিক ও "অনেক বেশী অবাস্তবতায়" পরিপূর্ণ বলিয়া বাহীরা সংক্রান্ত বিবরণের নিন্দা করিয়াছেন।[৯১] কিন্তু তারপর সম্ভবত ইহা বুঝিতে পারিয়া যে, পাদটীকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা মূল পুস্তকে বর্ণিত তাহার ধারণার পরিপন্থী, তাহার পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে পাদটীকাটি বাদ দেন, কিন্তু মূল পুস্তকের বক্তব্য অসংশোধিতই থাকিয়া যায়।

এমনকি মুইর এই সফরকে মহানবী ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাসফর বা আবিষ্কারমূলক অভিযান বলিয়াও কল্পনার ফানুস উড়াইয়াছেন। একজন শিক্ষিত পূর্ণ বয়স্ক পর্যটক পাইতে পারেন এইরূপ ধারণা মনের সামনে তুলিয়া ধরিয়া মুইর কল্পনার চিত্র আঁকিয়াছেন এইভাবে যে, মহানবী ﷺ আরবজগতের ও রাষ্ট্রসমূহের সেই অংশের সকল ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন।[৯২]

"এই অভিযান.....তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ-কে পর্যবেক্ষণের যে সুযোগ দান করিয়াছিল তাঁহার উপর উহার প্রভাব ব্যর্থ হয় নাই। তিনি পেট্রা, জেরাশ, আম্মন ও প্রাচীন বাণিজ্যিক জাঁকজমকের অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানসমূহের নিকট দিয়া অতিক্রম করেন এবং উহাদের দৃশ্য নিঃসন্দেহে তাঁহার চিন্তাশীল মনের উপর পার্থিব শ্রেষ্ঠত্বের অস্থায়িত্ব গভীর রেখাপাত করে...। এই সফরকালে তিনি কয়েকটি ইয়াহূদী বসতী এলাকার মধ্য দিয়াও গমন করেন এবং সিরিয়ার জাতীয় ধর্ম খৃস্টধর্মের সংস্পর্শে আসেন....। সিরিয়ায় তৎকালের খৃস্টধর্ম যতই পতিত ও বস্তুবাদী হউক না কেন, ইহা চিন্তাশীল পর্যবেক্ষকের মনে অনুকূল এবং মক্কার স্থূল ও অধ্যাত্মিকতাহীন পৌত্তলিকতার বিস্ময়কর বিপরীত রেখাপাত করিয়া থাকিবে।

উল্লিখিত বর্ণনা নিঃসন্দেহে একটি উপভোগ্য সাহিত্যের অংশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পরিমিত ও বিশ্বাস্য বিবরণ উহাতে অনুপস্থিত। আমরা বরং এইরূপ মনে করার পক্ষে যে, যেহেতু ইহা একটি বেশ দীর্ঘ ও কষ্টকর স্থলপথে বাণিজ্যদলের সফর ছিল, তাই দলটি পরিত্যক্ত নিবাস, বিধ্বস্ত নগরী কিংবা নিরানন্দ গীর্জা সমাবেশ-এর ন্যায় বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক স্থানসমূহের ভ্রমণ সতর্কতার সহিত পরিহার করিয়া থাকিবে।

অনুবাদ ঃ মু. আবদুল মান্নান

তথ্যসূত্র

১. মার্গোলিয়থ, উপরে দ্র., পৃ. ৪৫-৫১।

২. ঐ, পৃ. ৪৭।

৩. ঐ (মুসনাদ-এর বরাতে ৪খ., পৃ. ১৬৬।

৪. ঐ বরাত।

৫। ঐ (মুসনাদ, ৩খ., পৃ. ২৪১-এর বরাতে)।

৬. ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮।

৭. ঐ, পৃ. ৪৮।

৮. ঐ, পৃ. ৫০-৫১।

৯. ৪৩ ঃ ৩১ = (وَقَالُوْآ لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ)

১০. ৩৮ ঃ ৮ = (اَءُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا.....)

১১. ৩৮ ঃ ৪ = (وَعَجِبُوْاْ اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ)

১২. মুসনাদ, ৪ খ., পৃ. ১৬৫-১৬৬, 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ ইবনুল হারিছ-এর হাদীছ।

১৩. A.J. Wensinck, মিফতাহ কুনূযিস সুন্নাহ (আরবী অনুবাদ ঃ এফ.এ.বাকী), পৃ. ৪৩৬, শিরোনামটি নিম্নরূপ ঃ فَاَنَا خَيْرُكُمْ نَسَبًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا।

১৪. মুসনাদ, ৩ খ., পৃ. ২৪১।

১৫. ইবনুন নাদীম, ফিহরিস্‌ত্‌, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ৭-৮।

১৬. মার্গোলিয়থ, উপরে দ্র. পৃ. ৪৭-৪৮।

১৭. ঐ, পৃ. ৪৮।

১৮. ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯।

১৯. নামের উৎপত্তি সম্পর্কে উপরে দ্র. পৃ. ১২০।

২০. মার্গোলিয়থ, পূর্বোক্ত পৃ. ৫০-৫১।

২১. ফাত্‌হুল বারী, ১খ. পৃ. ৫৩।

২২. বুখারী, নং ৬।

২৩. আরবী উক্তিটি নিম্নরূপ ঃ لقد امر امر ابن ابى كبشة।

২৪. Watt, M. at, পৃ. ৪৯।

২৫. Watt, M. at M, পৃ. ১৪।

২৬. পরে ২৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৭. উপরে দ্র., পৃ. ৪১।

২৮. Watt, M. at M, পৃ. ১৪।

২৯. কুরআন, ৪২ ঃ ২৩ = قُلْ لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا الاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى.... "বলুন, আমি এই (আমার কাজের) জন্য জ্ঞাতি আত্মীয়দের ভালবাসা ব্যতীত তোমাদের নিকট কোন পুরস্কার চাহি না"।

৩০. এ্যালয় স্প্রেংগার খৃস্টধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন অষ্ট্রীয় বংশোদ্ভূত একজন পণ্ডিত ছিলেন। ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন তাহাকে কলিকাতা মাদরাসার প্রিন্সিপাল (১৮৫২-১৮৫৪) নিয়োগ করিয়াছিল। উদ্দেশ্য, কুরআন ও হাদীছসহ সকল প্রকৃত ইসলামী বিষয়সমূহকে পাঠ্যসূচী হইতে বাদ দিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামী ভাবধারা মুক্ত করা। মহানবী ﷺ-এর উপর তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাজ তিনি সেই সময়ে শুরু করেন। পরবর্তীতে উহা নিম্নবর্ণিত নামে প্রকাশিত হয় ঃ Das Leben und Die Lehre Des Mohamed (Ester Band, বর্লিন ১৮৬১; Zweiter Band, বার্লিন ১৮৬২ এবং Dritter Band, বার্লিন ১৮৬৫)।

৩১. 'আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী (৯৭৫-১০৪৪), সীরাতুল হালাবিয়্যা ফী সীরাতিল আমীনাল মা'মূন।

৩২. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, পুনর্মুদ্রণ ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ১২৮-১৩০।

৩৩. ঐ, পৃ. ১৩১। মূল আরবী পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وفى الامتاع لما مات قثم بن عبد المطلب قبل مولد رسول الله (ص) بثلاث سنين وهو ابن تسع سنين وجد عليه وجدا شديدا فلما ولد رسول الله ﷺ سماه قثم حتى اخبرته امه امنة انها امرت فى منامها ان تسميه محمدا فسماه محمدا .

৩৪. আল-মাকরিযী, তাকিয়্যুদ্দিন আহ্মাদ আলী, ইমতাউল আসমা বিমালির-রাসূল মিনাল আনবা' ওয়াল-আমওয়াল ওয়াল-হাফাদাহ ওয়াল-মুতা'।

৩৫. W. Muir, The Life of Mahomet, ১ম খণ্ড, লণ্ডন ১৮৫৮ খৃ., পৃ. ১৬ (তৃতীয় সংস্করণ, লণ্ডন ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৫)।

৩৬. ঐ, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৭, টীকা।

৩৭. উদাহরণস্বরূপ দ্র., সুহায়লী, ১খ. (দারুল-ফিক্র সংস্করণ), পৃ. ১৮২; এবং আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৩১।

৩৮. ঐ, আরও দ্র. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কাল'আজী, আত-তাফসীর আস-সিয়াসী লিস-সীরাহ ইত্যাদি, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, পৃ. ১৭-১৮।

৩৯. Muir, পূর্বে উল্লেখিত, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৭, টীকা।

৪০. কুরআন, ৭ ঃ ১৫৭; আরও দ্র. ২ ঃ ১৪৬; ৬ ঃ ২০।

৪১. উদাহরণস্বরূপ দ্র., Bevan Jones 'Paraclete or Muhammad' M. W. এপ্রিল ১৯২০ খৃ., ১০খ, পৃ. ১১২-১২৫; James Robson, "Does The Bible Speak of Muhammad', ঐ, জানুয়ারী ১৯৩৫ খৃ., ২৫ খ, পৃ. ১৭-২৬।

৪২. A. Gutherie E.F.I. Bishop, 'The Paraclete and Ahmad', ঐ, অক্টোবর ১৯৫১ খৃ., ৪১ খ., পৃ. ২৫১-২৫৬, বিশেষত পৃ. ২৫৩।

৪৩. W.M. Watt "His name is Ahmad", ঐ, এপ্রিল ১৯৫৩ খৃ., ৪৩ খ, পৃ. ১১০-১১৭। ওয়াট এই প্রবন্ধটি সম্প্রতি Early Islam, Edinburgh University Press, ১৯৯১ খৃ., নামে তাঁহার একটি

প্রবন্ধ সংকলনে প্রকাশ করিয়াছেন। ভূমিকায় ওয়াট বলেন, এই প্রবন্ধসমূহে তিনি সেই সকল প্রমাণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন যাহা তাঁহার অন্য বইগুলিতে পাওয়া যাইবে না।

৪৪. Gutherie and Bishop, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫২-২৫৪। আরও দ্র. ইব্‌ন হিশাম, ১ খ., পৃ. ২৫৩।

৪৫. Watt, in M.W., পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৩।

৪৬. ঐ, পৃ. ১১০।

৪৭. ঐ, পৃ. ১১১।

৪৮. ঐ, পৃ. ১১৭।

৪৯। ঐ, পৃ. ১১১।

৫০. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (সম্পা. ড. হাসান 'আব্বাস), ১খ., বৈরূত (১৯৬৯ ?), পৃ. ২৪৮।

৫১. আল-ইসাবা, ৪০৮ ও ৫১ (কিতাবুন নিসা) ঃ ويقال ان اباه احمد اول من سمى باحمد بعد رسول الله ﷺ

৫২. ঐ, নং ১০, (বাবুল কুনা)।

৫৩. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৪৩৬।

৫৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১১ খ., পৃ. ৩১১।

৫৫. কবিতার জন্য দ্র. ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।

৫৬. দ্র. W. Arafat "Early Critics of the authenticity of The poetry of the Sira, B.S.O.A.S., ২১ (১৯৫৮)।

৫৭. Watt, M.at M., পৃ. ২১১।

৫৮. M.W., ৪৩ খ., পৃ. ১১৭।

৫৯. তিনি হইলেন উমামা আল-মুযায়রিয়্যা। কবিতাটি সালম ইব্‌ন উমায়র-এর সারিয়াহ প্রসঙ্গে রচিত। দ্র. ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৬৩৬।

৬০. Watt, M.W, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১১৭।

৬১. ইব্‌ন হিশাম, ১ খ., পৃ. ৩৫৩।

৬২. ঐ, পৃ. ৪৫৩।

৬৩. ঐ, ২খ., পৃ. ১৯৭।

৬৪. ঐ, পৃ. ১৪২, ৪১৯।

৬৫. ঐ, পৃ. ১৫৮, ২৫৬ এবং ৩৪৯।

৬৬. ঐ, পৃ. ৩৮৭।

৬৭. ঐ, ১ খ., পৃ. ১৫৯।

৬৮. ঐ, খৃ. ৫৩৪।

৬৯. M.W, ১৯৫৩, ৪৩খ., পৃ. ১১৩।

৭০. ঐ, আরবী পাঠ নিম্নরূপ ঃ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ...... ।

৭১. পূর্বোক্ত বরাত।

৭২. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ১১৩-১১৪।

৭৩. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ১১৩।

৭৪. উপরে দ্র., পৃ. ১৫২।

৭৫. Encylopaedia of Islam, নূতন সংস্করণ, লাইডেন ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ৪০।

৭৬. তানবীর আল-মিক্য়াস মিন তাফসীর ইব্ন 'আব্বাস, আল-মাকতাবাত আশ-শা'বিয়া, তা.বি., পৃ. ৪৬৯। অন্যান্য মুদ্রণের মধ্যে গ্রন্থটি বোম্বাই-এ ১২৮০হি. সনে মুদ্রিত হইয়াছে (পুনর্মুদ্রণ ১৩২০ হি.), ইহার পর হইয়াছে বূলাক মুদ্রণ কায়রোতে ১২৯০ হি. সনে (পুনর্মুদ্রণ ১৮৬৩ খৃ., ১৮৬৭ খৃ.) এবং ইস্তাম্বুলে ১২১৭ হি. সনে। ইহা আস-সুয়ূতীর আদ-দুর্রুল মানছূর গ্রন্থের পার্শ্বদেশেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, আল-মাতবা'আ আযহারিয়্যা, ১৩০২, ১৩১৬, ১৩২২ ও ১৩৪৪ হি.।

৭৭. M.W., ৪৩খ., পৃ. ১১৪-১১৫।

৭৮. সায়্যিদ আহ্মাদ খান, Essays on The Life of Muhammad (লণ্ডন ১৮৭০), পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৩৮৮।

৭৯. W. Muir, The Life of Mahomet, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২১-২৪ (উদ্ধৃতি পৃ. ২৩-২৪-এর)।

৮০. Gottingen, ১৮৫৮ খৃ.।

৮১. Muir, উপরে উল্লিখিত, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২১, টীকা।

৮২. সায়্যিদ আহ্মাদ খান, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৮৬।

৮৩. উদাহরণস্বরূপ দ্র. Muir, পূর্বে উল্লিখিত, তৃতীয় সংস্করণ, লণ্ডন ১৮৯৪, পৃ. ৫-৭।

৮৪. পরে দ্র., ২০শ অধ্যায়, ১ম অংশ।

৮৫. পরে দ্র., ২০শ অধ্যায়, ২য় ও ৩য় অংশ।

৮৬. Muir, পূর্বে উল্লিখিত, ১খ., প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৪, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭।

৮৭. মার্গোলিয়থ এখানে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ Noldeke, Gesch. d. Korans, পৃ. ১৮।

৮৮. Morgoliouth, Mohammed and the rise of Islam, তৃতীয় সংস্করণ, লণ্ডন ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৪৫-৪৬।

৮৯. R. Bell, Introduction to The Qur'an, Edinburgh University Press, ১৯৫৩ খৃ, পৃ. ৩০১১?

৯০. পরে নিচে, ১১শ অধ্যায় দ্র.।

৯১. Muir , পূর্বে উল্লেখিত, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৫-৩৬।

৯২. ঐ, পৃ. ৩৩-৩৪ (৩য় সংস্করণ, পৃ. ১০-১১)।

সপ্তম অধ্যায়

কৈশোর ও যৌবন

এক ঃ এক নজরে তাঁহার কার্যাবলী

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার চাচা আবূ তালিবের যত্নে ও স্নেহে লালিত-পালিত হন এবং পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহারই পরিবারের সদস্য হিসাবে বসবাস করিতে থাকেন। পরিবারের অন্যান্য সন্তান, বিশেষ করিয়া তাঁহার চাচাতো ভাইদের ন্যায় তিনি স্বভাবতই পরিবারের বিষয়াদি ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতেন। তখনকার মক্কার সমাজে সর্বপ্রধান পেশা ছিল ব্যবসায় এবং মেষ, ছাগল ও উট পালন। মুহাম্মাদ ﷺ যে তাঁহার প্রথম জীবনে মক্কার উপত্যকাগুলিতে মেষ চরাইতেন তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়। কারণ তিনি যখন তাঁহার লোকদের অবিসম্বাদিত নেতা তখনও তাঁহার প্রথম জীবনের পরিমিত অবস্থা সম্পর্কে কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। সুতরাং আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "একদা মহানবী ﷺ মন্তব্য করেন যে, এমন কোন নবী ছিলেন না যিনি মেষ চরান নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি নিজেও উহা করিয়াছেন কিনা? তিনি উত্তরে বলিলেন যে, তিনি নিজেও তাহা করিয়াছেন"।[১] মহানবী ﷺ-এর ভিন্ন ভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত আরও কয়েকটি হাদীছেও একই মর্ম উল্লেখ রহিয়াছে। উহাদের কোন কোনটিতে মহানবী ﷺ যে সকল স্থানে মেষ চরাইতেন উহাদের একটি হিসাবে আজয়াদ নামক স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ রহিয়াছে।[২] এইরূপও বর্ণিত আছে যে, মেষ চরাইবার সময় কখনও কখনও তিনি 'আরাক নামক এক প্রকার বন্য গাছের ফল আহরণ করিতেন।[৩]

অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি অন্যের মেষ চরাইতেন কিনা তাহা স্পষ্ট নহে। প্রশ্নটি প্রধানত একটি হাদীছের ব্যাখ্যার উপর আবর্তিত যেখানে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি "মক্কার লোকদের জন্য কারারীত-এ (বা ইহার বিনিময়ে) মেষ চরাইতেন।[৪] কেহ কেহ কারারীতকে একটি স্থানের নাম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু এই নামে মক্কায় কিংবা উহার নিকটে কোন স্থান ছিল বলিয়া জানা নাই তাই অন্যরা ইহাকে একটি মুদ্রার নাম কীরাত-এর বহুবচনরূপে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাতেও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই। কারণ কীরাত নামে কোন মুদ্রা তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল না।[৫]

কৈশোরে মেষ চরানো মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিঃসন্দেহে মরুভূমির জীবন এবং শহরের পরিবেশ, যেখানে তিনি বড় হইয়াছেন, উভয়ের সহিত সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা তাঁহাকে তাঁহার কর্ম ও সংগ্রামের সময় টিকিয়া থাকিতে সাহায্য করে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, প্রকৃতির বিশাল বিস্তার আপাত দৃষ্টিতে সীমাহীন মরুভূমি, গহীন উপত্যকা ও নির্জন দৃশ্য

দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঊষর ও খাড়া পর্বতমালা যেখানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং বিশাল গম্বুজের ন্যায় দৃশ্যমান ও সন্ধ্যাবেলা তারকা খচিত পরিষ্কার নীল আকাশ তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়া থাকিবে। কারণ প্রথম জীবন হইতেই তিনি ছিলেন চিন্তাশীল, গম্ভীর, অত্যধিক বুদ্ধিমান এবং লক্ষণীয়ভাবে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

যদিও অন্যদের মত তিনিও পরিবারের কাজ ও বিষয়াদিতে অংশগ্রহণ করিতেন, কিন্তু চরিত্র, মেজাজ ও আচরণে তিনি তাঁহার সমকক্ষদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। ইহার লিখিত প্রমাণ রহিয়াছে যে, সর্বগ্রাসী পৌত্তলিকতার মধ্যে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, স্বাভাবিকভাবে মদ ও নারীতে অবাধ ভোগ-বিলাসের সহিত সম্পৃক্ত পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজে বাস করিয়াও তিনি সকল কালিমা ও ঘৃণ্য কাজ হইতে মুক্ত জীবন পরিচালনা করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাকের বরাতে আত-তাবারী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ অন্যান্য বালকদের সহিত মেষ চরাইবার কালে দুইবার মক্কার নৈশকালীন জীবন উপভোগের কথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় সময়ই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হস্তক্ষেপের ফলে তিনি ফাঁদে জড়ানো হইতে বাঁচিয়া যান এইভাবে যে, সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়েন।[৬] ইব্ন কাছীর যথার্থই উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা খুবই অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক বর্ণনা এবং বলেন যে, বর্ণনাকারী সম্ভবত তাহার নিজের বিষয়কে মহানবী ﷺ-এর বিষয়ের সহিত তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন।[৭]

দুই ঃ শির্কমূলক কার্যাবলী পরিহার

বাল্যকাল হইতেই মহানবী ﷺ তাঁহার লোকদের শেরেকী (পৌত্তলিক) আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি দারুণ ঘৃণাভাব পোষণ করিতেন এবং নিজে কখনও কোন শেরেকী উপাসনা বা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন নাই। পরিবারের তরুণী উম্মু হানী (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ তালিব কোন এক দেবতার সম্মানে একটি বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য বারবার বলা সত্ত্বেও উহাতে বালক মুহাম্মাদের দৃঢ় অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত হইয়াছিলেন।[৮] উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীছে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি মহানবী ﷺ-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ "আমি কখনও কোন দেবতার বেদীতে উৎসর্গীকৃত কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করি নাই, এমনকি আল্লাহ আমাকে তাঁহার বার্তা দ্বারা সম্মানিত করার পূর্বেও নহে"।[৯]

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির অনেক পূর্বে একবার মহানবী ﷺ -এর সামনে কিছু গোশতের তরকারী আনা হয়। কিন্তু তিনি এই বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন যে, বেদীতে উৎসর্গীকৃত কোন কিছু তিনি ভক্ষণ করেন না।[১০] যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, মহানবী ﷺ, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও আস-সাফা ও আল-মারওয়ার মধ্যখানে স্থাপিত মূর্তিগুলিকে স্পর্শ করিতেন না, যেরূপ কুরায়শগণ উক্ত স্থান দুইটির মধ্যে দৌড়াইবার সময় অথবা কা'বাঘর প্রদক্ষিণ কালে করিত।[১১]

পুনরায় 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে উক্ত হইয়াছে, "একবার মহানবী ﷺ -কে প্রশ্ন করা হইল 'আপনি কি কখনও কোন মূর্তির পূজা করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ 'না'। লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কখনও মদ পান করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ 'না'। কারণ আমি জানিতাম, "তাহারা যাহা করে তাহা কুফরী, যদিও আমি তখন কিতাব বা ঈমান সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না"।[১২]

বস্তুতপক্ষে মহানবী ﷺ-এর নবুওয়াত পূর্ববর্তী ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, কিতাব (কুরআন) এবং ঈমানের বিস্তারিত সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের অভাব ছিল। ইহাই কুরআনের ৪২ ঃ ৫২ নং আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلاَ الْاِيْمَانُ .

"কিতাব কিংবা ঈমান সম্পর্কে তুমি অবহিত ছিলে না"।

আয়াত ৬ ঃ ১৬১-ও কিছু মাত্রায় একই অর্থ বহন করে, যাহা নিম্নরূপ ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا .

"বল, নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে সোজা পথ, সুপ্রতিষ্ঠ দীন এবং ইবরাহীমের সঠিক পথে পরিচালনা করিয়াছেন"।

উল্লিখিত দুইটি আয়াতের প্রেক্ষিতে আয়াত ৯৩ ঃ ৭-এর মর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى .

"এবং তিনি কি তোমাকে পথহারারূপে পান নাই, অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন"?

অবতরণের ক্রম অনুসারে তিনটি আয়াতের মধ্যে এই আয়াতটি প্রথম। আয়াতটিতে মহানবী ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়ে তাঁহার কঠিন মানসিক চাপ ও উত্তেজনা, আধ্যাত্মিক আকুল আকাঙ্খা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। একই সঙ্গে ইহাতে তাঁহার নূতন আলোকপ্রাপ্তিতে দারুণ উপশম ও কৃতজ্ঞতাবোধেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে। উল্লিখিত তিনটি আয়াতের একটিরও অর্থ এই মর্মে করা যায় না যে, মহানবী ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে পৌত্তলিকতায় আকীর্ণ অর্থে পথভ্রষ্ট (ضال) ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ضال শব্দটি কুরআনের অন্য অনেক শব্দের ন্যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।[১৩] পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকা ছাড়া মহানবী ﷺ কুরায়শ গোত্রের অন্যান্যদের ন্যায় ইবরাহীমী অনুষ্ঠান হজ্জ, 'উমরাহ ও কা'বাঘর প্রদক্ষিণ ইত্যাদি পালন করিতেন। তদুপরি তিনি তাহাদের ন্যায় মুহাররাম মাসের প্রথম দিনগুলিতে, বিশেষ করিয়া 'আশূরার দিন রোযা রাখিতেন।[১৪]

বাল্যকাল হইতেই মহানবী ﷺ-এর মধ্যে প্রগাঢ় বিনয় ও শালীনতাবোধ বিদ্যমান ছিল। ইব্‌ন ইসহাক মহানবী ﷺ-এর নিজ যবানীতে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন নিম্নরূপ ঃ তিনি বলেন, "আমি কুরায়শ বালকদের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পাইলাম যাহারা পাথর বহন করিতেছিল, যেমন বালকগণ উহা দ্বারা খেলা করিয়া থাকে। আমরা সকলে নিজেদের দেহ উন্মুক্ত করিয়াছিলাম, প্রত্যেকে নিজের জামা খুলিয়া গলার চারিদিকে পেঁচাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং পাথর বহন করিতেছিলাম। আমি একই পথে যাইতেছিলাম এবং ফিরিতেছিলাম। এমন সময় আমাকে অদৃশ্য কেহ জোরে চড় মারিল যাহাতে আমি খুব ব্যথা পাইলাম এবং সে বলিল, 'জামা পরিধান কর'। সুতরাং আমি উহা লইয়া পরিধান করিলাম এবং আমার সঙ্গীদের মধ্যে আমি একাই জামা পরিয়া আমার ঘাড়ের উপর পাথর বহন করিতে লাগিলাম"।[১৫]

কা'বাঘর পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গেও একইরূপ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে।[১৬] এই কারণে সুহায়লীর ধারণা, ঘটনাটি মহানবী ﷺ-এর জীবনে একাধিকবার ঘটিয়াছিল।[১৭] যাহা হউক, বর্ণনাটি এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, মহানবী ﷺ এমনকি তাঁহার বাল্যাবস্থায়ও স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদনকালে নিজের শরীর বিবস্ত্র রাখা হইতে বিরত থাকিতেন। যখন বড় হইলেন তখন তিনি স্বীয় দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র, আন্তরিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা , সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন। ইব্‌ন ইসহাক এই কথাই নিম্নবর্ণিত অর্থপূর্ণ বাক্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"সুতরাং আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত তাঁহার উপর বর্ষিত হউক, বড় হইলেন। আর আল্লাহ তাঁহার যত্ন নিলেন, তাঁহাকে ধর্মহীনতার পঙ্কিলতা হইতে রক্ষা করিলেন ও দূরে রাখিলেন। কারণ তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিতে ও তাঁহার রাসূলরূপে মনোনীত করিতে চাহিয়াছিলেন, যতক্ষণ না তিনি পূর্ণ বয়স লাভ করেন এবং মানুষ হিসাবে তাঁহার লোকদের মধ্যে সর্বোত্তমরূপে পরিণত হন। চরিত্রে তাহাদের মধ্যে মহত্তম, বংশে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত, প্রতিবেশী হিসাবে তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম, বুদ্ধিতে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী, সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং মহত্ত্ব ও আভিজাত্যের মাধ্যমে হীন কার্য ও আচরণ হইতে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থানকারী যাহাতে তিনি 'বিশ্বাসী' বলিয়া পরিচিত হন। কারণ তাঁহার মধ্যে আল্লাহ সমস্ত ভাল গুণের সমাহার ঘটাইয়াছিলেন"।[১৮]

তিন ঃ ফিজার যুদ্ধ

মহানবী ﷺ-এর প্রথম যৌবনের দুইটি বিখ্যাত ঘটনা ছিল ফিজার (পবিত্রতা হানিকর অন্যায়) যুদ্ধ এবং 'হিলফুল-ফুদূল' নামক সজ্জনদের সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠা।

মহানবী ﷺ-এর বয়স যখন আনুমানিক চৌদ্দ হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে তখন ফিজার যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি অন্যূন পাঁচ বৎসরকাল ব্যাপী ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত প্রায় চারিটির মত যুদ্ধ ছিল। ইহাদেরকে ফিজার (বা পবিত্রতা হানিকর অন্যায়) যুদ্ধ বলা

হয় এই কারণে যে, ইহাদের সূচনা কিংবা সংঘটন হইয়াছিল পবিত্র মাস যুল-কা'দাতে যখন শান্তিভঙ্গ ও আন্তগোত্রীয় বিবাদ ঐতিহ্যগতভাবে পবিত্রতাহানির কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই যুদ্ধগুলির সূত্রপাত হয় বিখ্যাত উকায মেলায়, যাহা বার্ষিক যুল-কা'দা মাসের প্রথম তিন সপ্তাহব্যাপী তায়েফ ও নাখলার মধ্যবর্তী এক স্থানে অনুষ্ঠিত হইত। গোত্রীয় অহমিকা এবং সঠিক বা ভুল যাহাই হউক না কেন—কোন গোত্রের একজন সদস্য বা মিত্রকে রক্ষা ও সমর্থন করার মধ্যে মিথ্যা সম্মান ও মর্যাদাবোধের সহিতও অনেকাংশে ইহাদের সম্পর্ক ছিল। উপদ্বীপের সকল অংশ হইতে উকাযে কেবল ব্যবসায়ী ও বণিকরাই তাহাদের পণ্যসামগ্রী লইয়া হাজির হইত না, বরং কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী ও অন্যান্য বিনোদনকারীও নিজ নিজ কলা-কৌশল প্রদর্শন ও উহা হইতে অর্থ উপার্জনের জন্য আগমন করিত। মেলার অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন গোত্রের কবিদের মধ্যে এক প্রকার জাতীয় প্রতিযোগিতা। তাহারা তাহাদের নিজ নিজ কবিতা আবৃত্তি করিত এবং প্রত্যেকেই নিজের ও নিজ গোত্রের মর্যাদা ও প্রাধান্য অন্যান্য গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী থাকিত। স্বভাবতই এইরূপ অবস্থায় গোত্রীয় চেতনা ও উত্তেজনা চরমে থাকিত এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহা ঝগড়া-বিবাদ, দ্বন্দ্ব ও রক্তপাত পর্যন্ত গড়াইত।

প্রথম ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ ছিল, কোন এক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উক্ত মেলায় দম্ভ করিয়া নিজেকে সকল আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলিয়া দাবি করিয়াছিল এবং অন্য এক গোত্রের একইরূপ একগুঁয়ে আরেক ব্যক্তি উক্ত দাবির প্রতিবাদ ও প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ বাঁধার কারণ ছিল যথাক্রমে এক গোত্রের এক মহিলাকে অপর এক গোত্রের এক পুরুষ কর্তৃক অপমানিত করা এবং এক গোত্রের এক ব্যক্তি অপর এক গোত্রের আরেক ব্যক্তির নিকট ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়।

চতুর্থ বা শেষ যুদ্ধ বাঁধে আরও গুরুতর বিষয় লইয়া। হীরার রাজা নু'মান ইব্নুল মুনযির উকায মেলায় তাহার বাণিজ্যদল প্রেরণের ইচ্ছা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত যামিন (কাফীল) খুঁজিতেছিলেন। মক্কার বানূ কিনানা গোত্রের বাররাদ ইব্ন কায়স এবং তায়েফের বানূ হাওয়াযিন গোত্রের উরওয়া ইব্ন 'উতবা এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং পদটিতে নিঃসন্দেহে কমিশন প্রাপ্তির ব্যবস্থা ছিল। নু'মান অবশেষে 'উরওয়াকে যামিনরূপে নির্বাচিত করেন। বাররাদ এই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া পথিমধ্যে 'উরওয়াকে আক্রমণ ও হত্যা করে।[১৯] পরিণতিতে যে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে উহাতে একদিকে কুরায়শ ও কিনানা গোত্র ও তাহাদের মিত্রবৃন্দ এবং অন্যদিকে হাওয়াযিন ও কায়স গোত্র ও তাহাদের মিত্রবৃন্দ একে অপরের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

দীর্ঘ সাময়িক বিরতিসহ যুদ্ধ চার বৎসর স্থায়ী হয়। প্রধানত মেলার সময় যুদ্ধ সংঘটিত হইত এবং পালাক্রমে একেকবার একেক প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের জয় হইত। পরিশেষে এক চুক্তি দ্বারা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। চুক্তিপত্রে এই শর্ত সন্নিবেশিত হয় যে, যুদ্ধে যে পক্ষের লোক অধিক সংখ্যক

নিহত হইয়াছে সেই পক্ষ উহার অতিরিক্ত সংখ্যক নিহত লোকের জন্য অপর পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে।

ইব্‌ন ইসহাকের মতানুসারে যখন সর্বশেষ ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন মহানবী ﷺ -এর বয়স ছিল বিশ বৎসর।[২০] কিন্তু ইব্‌ন হিশাম ১৪ অথবা ১৫ বৎসর বয়সের কথা উল্লেখ করেন এবং আরও বলেন যে, যুদ্ধের 'সময়' একদিন মহানবী ﷺ তাঁহার চাচাগণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে নীত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যেখানে মহানবী ﷺ-কে নিম্নরূপ উক্তি করিতে দেখা যায় ঃ "আমি তাহাদের (আমার চাচাদের) নিকট তাহাদের প্রতি তাহাদের শত্রুগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর কুড়াইয়া আনিয়া দিতাম"।[২১]

ইব্‌ন হিশাম মহানবী ﷺ-এর এই বিশেষ উক্তির পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য উৎসের উল্লেখ করেন নাই। ইব্‌ন হিশামের বক্তব্য সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বাহির হইয়া আসে ঃ

(ক) ইহা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী ﷺ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই, বরং তাঁহার চাচাগণ তাহাদের সহিত তাঁহাকে সেখানে "লইয়া যান"।

(খ) তাঁহার চাচাগণ কর্তৃক তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করার অথবা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার মত বয়সের লোক ছিলেন না।

(গ) সেখানে তাঁহার ভূমিকা ছিল একজন বেসামরিক সহায়কের; তাঁহার চাচাদের প্রতি তাহাদের শত্রুগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিকট ফেরত প্রদান ছিল তাঁহার একমাত্র দায়িত্ব (স্পষ্টতই তাঁহার চাচাগণ কর্তৃক উহাদের পুনর্ব্যবহারের জন্য)।

ইব্‌ন হিশামের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক আল-ওয়াকিদী এই ঘটনার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন হিশাম উভয়ের বর্ণনার সংমিশ্রণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং স্পষ্টত ইব্‌ন ইসহাকের অনুসরণে আল-ওয়াকিদী বলেন, মহানবী ﷺ সেই সময় ২০ বৎসর বয়সের ছিলেন এবং তারপর ইব্‌ন হিশামের ন্যায় মহানবী ﷺ-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেন, "আমি উহাতে (অর্থাৎ ফিজার যুদ্ধে) আমার চাচাদের সহিত উপস্থিত ছিলাম এবং উহাতে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমি যদি উহা না করিতাম তাহাই ভাল হইত"।[২২]

পুনরায় ইব্‌ন হিশামের ন্যায় আল-ওয়াকিদীও এই বিবরণের পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য উৎসের উল্লেখ করেন নাই। তাহার পক্ষে এই অনুল্লেখ আরও বিস্ময়কর এই কারণে যে, একই স্থানে এবং একই বিষয় সম্পর্কে তিনি হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা)-এর উক্তির পূর্ণ ইসনাদ প্রদান করিয়াছেন যেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি মহানবী ﷺ-কে ফিজার যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছেন।[২৩] ইহা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে, হাকীম ইব্‌ন হিযামের এই উক্তিতে মহানবী ﷺ কর্তৃক তীর সংগ্রহ বা নিক্ষেপের কোন উল্লেখ নাই। বর্ণনাসমূহের এই সকল অসামঞ্জস্যের

কারণে যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর ভূমিকার সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া খুবই কঠিন। স্পষ্টত ইব্‌ন হিশাম এবং আল-ওয়াকিদী কর্তৃক প্রদত্ত মহানবী ﷺ-এর কথিত উক্তির দুইটি ভিন্ন ভিন্ন রূপের উভয়টিই তিনি যাহা বলিয়াছেন, যদি আদৌ এই বিষয়ে কিছু বলিয়া থাকেন, তাহার একই সময়ে সঠিক বর্ণনা হইতে পারে না।

চার ঃ হিলফুল্ ফুদূল

ফিজার যুদ্ধের অবসানের পরপরই হিলফুল্ ফুদূল (حلف الفضول) নামে অভিহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি উক্ত যুদ্ধের কোন সরাসরি ফল ছিল না। তবে ইহা স্পষ্টত সেই শুভবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল যাহা উক্ত যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছিল এবং দেশে সাধারণভাবে প্রচলিত নিরাপত্তাহীনতা ও অরাজকতার ধ্বংসাত্মক পরিণতির স্বীকৃতি ছিল।

চুক্তি সম্পাদনের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল এইরূপ ঃ মক্কার বানূ সাহম গোত্রের আল-'আস ইব্‌ন ওয়াইল নামক এক ব্যক্তি জনৈক সফরকারী ইয়ামানী (যুবায়দী) ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিছু পণ্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাকে উহার মূল্য পরিশোধ করে নাই। শেষোক্ত ব্যক্তি আহ্‌লাফ নামক একটি গোষ্ঠীর নিকট আবেদন করে। গোষ্ঠীটি ইতিপূর্বে বানূ 'আবদুদ-দার, বানূ মাখযূম, বানূ জুমাহ, বানূ সাহম ও বানূ 'আদিয়্যি ইব্‌ন কা'ব সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল[২৪] এবং আল-'আস ইব্‌ন ওয়াইল এই গোষ্ঠীরই অন্যতম সদস্য ছিল।

আহ্‌লাফ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করে। তাই সংক্ষুব্ধ ইয়ামানী বিষয়টি কুরায়শদের সাধারণ সভায় পেশ করে। এই সভা কা'বা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইত। এখানে মহানবী ﷺ-এর এক চাচা যুবায়র ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব ('আবদুল্লাহ্‌র সহোদর ভাই) ইয়ামানীর বিষয়টি গ্রহণ করেন। তাহার উদ্যোগে বানূ হাশিম, বানূ আল-মুত্তালিব, বানূ যুহ্‌রা; বানূ আসাদ ও বানূ তায়মের নেতৃবৃন্দ শেষোক্ত গোত্রের এবং নগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি, যদি নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি না হন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আনের গৃহে মিলিত হন। শেষোক্তজন এই উপলক্ষে বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের উপস্থিত অনুগামীবৃন্দ একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ঃ

(ক) নির্যাতিতকে রক্ষা ও সমর্থন করা;

(খ) ন্যায়সম্মত মালিককে কোন সম্পত্তি হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত বা অধিকারচ্যুত করা হইলে উহা তাহাকে প্রত্যার্পণ করা: এবং

(গ) সংক্ষুব্ধ পক্ষের প্রতি অবিচার রোধ করা এবং ন্যায়বিচারের যাবতীয় ব্যবস্থা করা, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের গোত্র ও গোষ্ঠী আনুগত্য অথবা তাহাদের সামাজিক মর্যাদা অথবা তাহাদের আবাসন নির্বিশেষে করা হইবে।[২৫]

চুক্তির এই সৎ উদ্দেশ্যের কারণে ইহা হিলফুল ফুদূল বা "সজ্জনদের চুক্তি" নামে পরিচিতি লাভ করে। নামকরণের অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, চুক্তিটির নাম এইরূপ হইয়াছে এই কারণে যে, ইহার উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তির অধিকার হইতে এই পরিমাণ সম্পত্তি ছিনাইয়া লওয়া যাহা তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবির অতিরিক্ত (অর্থাৎ ফুদূল)। তৃতীয় একটি মত এই যে, ইহার এইরূপ নামকরণের কারণ চুক্তি সম্পাদনের পিছনে যাহারা সক্রিয় ছিলেন তাহাদের মধ্যে তিনজনের প্রত্যেকের নাম ছিল ফাদ্‌ল (অর্থাৎ আল-ফাদ্‌ল ইব্‌ন ফুদালা, আল-ফাদ্‌ল ইব্‌ন ওয়াদা'আ এবং আল-ফাদ্‌ল ইবনুল হারিছ) এবং ফুদূল ফাদ্‌ল-এর বহুবচন। আরও একটি ব্যাখ্যা আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, ইহা এই নামে অভিহিত হইবার কারণ যাহারা এই চুক্তি সম্পাদন পছন্দ করে নাই তাহারা অবজ্ঞার সহিত মন্তব্য করিয়াছিল যে, চুক্তিবদ্ধ সদস্যগণ একটি অপ্রয়োজনীয় (ফুদূল) বিষয়ে শুধু শুধু নিজদিগকে কষ্টে ফেলিল।[২৬]

ইহা অবশ্যই বলিতে হয় যে, সর্বশেষ উল্লিখিত তিনটি ব্যাখ্যা যে পরিস্থিতিতে চুক্তিটি সম্পাদিত হয় উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ইহা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি সংগঠন ছিল এবং ইহার নাম যে যথার্থ করা হইয়াছিল তাহা যে শুধু উহা যে পটভূমিতে গঠিত হইয়াছিল উহা হইতেই পরিষ্কার তাহা নহে, বরং উহার পরবর্তী কার্যাবলী হইতেও উহা স্পষ্ট। ইহা প্রতিষ্ঠার পিছনে তিন ফাদ্‌ল-এর সক্রিয় থাকিবার গল্প সুবিদিত তথ্য দ্বারা সমর্থিত নহে, বরং যুবায়র ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আনই ইহার গঠনের পিছনে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একইরূপে "অতিরিক্ত" বা অন্যায় অধিকার প্রসংগে নামের ব্যাখ্যা চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যই কেবল অনুমোদন করে। তদুপরি একটি প্রতিকূল গোষ্ঠীর অসর্তক ও দুঃখপূর্ণ মন্তব্য চুক্তিটির এইরূপ নাম প্রদান করিতে পারে না যদ্দারা ইহা মানবজাতির ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

গোত্রসমূহের একটি দল যে ইহার গঠন পছন্দ করিত না অথবা ইহার উদ্দেশ্যের সহিত স্পষ্টত একমত ছিল না তাহা কেবল হিল্‌ফ্ গঠনের সহিত সম্পৃক্ত ঘটনাবলী হইতেই পরিষ্কার নহে, বরং ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক ইহার বর্ণনা কুসাই (কুসায়্যি)-এর মৃত্যুর পর কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৃষ্ট মতবিরোধ এবং পরিণতিতে আহ্‌লাফ ও মুতায়্যাবূন নামে গোত্রগুলির দুইটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্তি[২৭] সংক্রান্ত বর্ণনার অব্যবহিত পরে করা হইতেও স্পষ্ট। তিনি ইহার বর্ণনা মহানবী ﷺ -এর প্রাথমিক জীবনের বিবরণের পর প্রদান করেন নাই, যদিও অন্যত্র তাহার বর্ণিত ঘটনাবলী এবং অন্যান্য উৎস হইতে ইহা স্পষ্ট যে, ফিজার যুদ্ধ অবসানের অত্যল্প কাল পরেই হিল্‌ফ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহানবী ﷺ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা প্রধানত মুতায়্যাবূন দলের গোত্রসমূহের চুক্তি ছিল।[২৮] ইহা সাধারণভাবেও স্বীকৃত ঘটনা।[২৯]

হিলফুল ফুদূল গঠন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল এই হিসাবে যে, চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলি, তাহাদের অন্য বিবেচনা যাহাই হউক না কেন, কেবল গোত্র চেতনা ও স্থানিক বিবেচনার উর্ধ্বে উঠিয়া অভিন্ন মঙ্গলের জন্য উচ্চতর নীতি অনুযায়ী জীবন ধারণ ও কর্ম সম্পাদন

করিতে আগাইয়া আসে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনা যে, মহানবী ﷺ, যিনি তখনমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ'আনের গৃহের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং দল গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৩০] ইহা তাঁহার জনগণের কাজে প্রথম রেকর্ডকৃত অংশগ্রহণ এবং তিনি ইহাকে তাঁহার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে স্মরণ করিতেন। তাঁহার জীবনের অনেক পরবর্তী পর্যায়ে এবং দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে যে, "এমনকি তখনও যদি কোন নির্যাতিত ব্যক্তি উক্ত হিল্ফ-এর নামে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে তাহা হইলে তিনি তাহা আনন্দের সহিত করিবেন"।[৩১]

প্রধানত ইহার প্রসংগে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "যদিও ইসলামে কোন চুক্তির (হিল্ফ) আর কোন প্রয়োজন নাই, তবুও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যাহা কিছু সম্পাদিত হইয়াছে তাহা ইসলাম কর্তৃক সমর্থিত ও জোরদার করা হইয়াছে"।[৩২]

হিল্ফ উহার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য পূরণে সফল হইয়াছিল। চুক্তি সম্পাদনের পর নেতৃবৃন্দ আল-'আস ইব্ন ওয়াইল-এর নিকট গমন করেন এবং ইয়ামানী ব্যবসায়ীকে পণ্য ফেরত দানে তাহাকে বাধ্য করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দলটি নগরীর সমাজ জীবনে একটি শক্তিশালী ফ্যাক্টররূপে কাজ করিত এবং আহ্লাফ গোত্রগুলির বিরুদ্ধে নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত।

ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে যে, অল্প কিছুদিন পর বানূ খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার সুন্দরী কন্যাসহ মক্কায় হজ্জ বা 'উমরাহ করিতে আসে। নুবায়হ ইবনুল হাজ্জাজ নামক মক্কার জনৈক অধিবাসী অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়েটিকে জোরপূর্বক অপহরণ করে। বেচারা পিতা হিল্ফুল ফুদূলের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কা'বা প্রাঙ্গণে চিৎকার দিতে থাকে। তৎক্ষণাৎ চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলির নেতৃবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আগাইয়া আসে এবং দুষ্কৃতকারীকে মেয়েটিকে তাহার পিতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করে।[৩৩]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরেও হিলফ একটি জীবন্ত শক্তি হিসাবে অব্যাহত থাকে। খলীফা মু'আবিয়া (রা)-র আমলেও তাঁহার মদীনার গভর্নর আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'উতবা আল-হুসায়ন ইব্ন 'আলী (রা)-এর পাওনা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যখন শেষোক্তজন তাঁহার অধিকার আদায়ের জন্য হিল্ফ-এর সাহায্য কামনার হুমকি প্রদান করেন এবং যখন 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) আল-হুসায়ন (রা)-এর পক্ষে তাঁহার সমর্থন ঘোষণা করেন।[৩৪]

পাঁচ ঃ দ্বিতীয়বার সিরিয়া সফর এবং খাদীজা (রা)-এর সহিত বিবাহ

প্রকৃতপক্ষে হিলফুল্ ফুদূল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহানবী ﷺ প্রথম জনজীবনে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি স্বীয় সততা, পূর্ণতা, সত্যবাদিতা, নির্ভরযোগ্যতা ও উচ্চ নৈতিক চরিত্রের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আর তাই তিনি সাধারণ্যে আল-আমীন বা "বিশ্বস্ত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। এইরূপ খ্যাতি ও তাঁহার চরিত্রের জনস্বীকৃতি নিজ লোকদের সহিত তাঁহার দৈনন্দিন

সম্পর্কের, বিশেষ করিয়া সময় সময় তাঁহার উপর অর্পিত আমানত ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি অর্জন করিয়া থাকিবেন। তবে তাঁহার এইরূপ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানা নাই। উৎসসমূহে যতদূর পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মক্কায় তাঁহার কিছু ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রতি কিছু পরোক্ষ ও অস্পষ্ট উল্লেখ মাত্র।[৩৫]

তবে ইতিহাসে ইহার বিশেষভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাঁহার বয়স যখন প্রায় পঁচিশ বৎসর তখন তিনি খাদীজা (রা)-এর বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটি কিছুটা বিশদভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে সর্তক ছিলেন স্পষ্টত এই কারণে যে, ইহা তাঁহার জীবনের এক সন্ধিক্ষণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। তবুও তাঁহাকে এইরূপ বাণিজ্যিক দায়িত্ব প্রদান হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি সেই পর্যন্ত এই জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু স্বীকৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। কারণ খাদীজা (রা)-এর ন্যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে সফল হিসাবে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মহিলা কিছুতেই একজন যুবকের উপর, সে যতই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হউক না কেন, তাহার পুঁজি ও বাণিজ্য-সম্ভার অর্পণের ঝুঁকি গ্রহণ করিতেন না—যদি তিনি এই ব্যাপারে তাঁহার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কে পুরাপুরি নিশ্চিত না হইতেন। তবুও ইহা নিশ্চিত যে, তিনি মক্কায় যেরূপ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডেই নিয়োজিত থাকুন না কেন, তিনি পূর্বে কখনও বিদেশে কোন বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া গমন করেন নাই। যদি তিনি অনুরূপ করিতেন তাহা হইল উক্ত তথ্য অবশ্যই ঐতিহাসিকগণ ও হাদীছবিদগণ, অন্তত খাদীজার পক্ষে এই বাণিজ্যিক মিশন প্রসংগে, উল্লেখ করিতেন।

খাদীজা (রা) খুওয়ায়লিদের কন্যা, তিনি আসাদের পুত্র, তিনি 'আবদুল 'উযযার পুত্র, তিনি কুসায়্যির পুত্র, তিনি কিলাবের পুত্র এবং তিনি মুররার পুত্র ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বংশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের সহিত কুসায়্যি-তে গিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সময় তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের ছিলেন। পূর্বে তিনি পরপর দুই ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের উভয়ে তাঁহার জন্য দুইটি সন্তান রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য, যৌবন ও সৌন্দর্য তখনও অটুট ছিল। তবে তাঁহার প্রকৃত সৌন্দর্য তাঁহার চরিত্র ও আচরণে নিহিত ছিল। তিনি সারা জীবন পূত-পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার নগরী ও সমাজের সকল প্রকার কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এইজন্য বন্ধু ও শত্রু, উচ্চ ও নীচু সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত 'আত-তাহিরাহ্' (পবিত্র মহিলা) বলিয়া উল্লেখ করিত। এই নিখুঁত গুণের সহিত তাঁহার আরও ছিল বিরল বিচক্ষণতা, মানুষ ও অবস্থা বুঝিবার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং প্রকৃত ব্যবসায়িক সূক্ষ্ম বুদ্ধি। তিনি বিপুল ধন-সম্পদেরও মালিক ছিলেন অংশত উত্তরাধিকার সূত্রে, কিন্তু প্রধানত তাঁহার ব্যবসায়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা বহু গুণ বৃদ্ধির কারণে। কথিত আছে যে, তাঁহার বাণিজ্যিক পণ্যসম্ভার ও বাণিজ্য কাফেলা তখনকার মক্কার অন্যান্য সকল কুরায়শ ব্যবসায়ীদের পণ্যসম্ভার ও বাণিজ্য কাফেলার সমষ্টির যদি অধিক না হয়, তার প্রায় সমান ছিল। স্বভাবতই তিনি নগরীর পরম শ্রদ্ধেয়া মহিলা ছিলেন এবং কাহারও অপেক্ষা কম কাম্য ছিলেন না।

ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, খাদীজা (রা) মুহাম্মাদ ﷺ-এর চরিত্র ও যোগ্যতার কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত তাঁহার চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং সিরিয়ায় তাঁহার বাণিজ্য কাফেলার নেতৃত্ব দানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন, আর এইজন্য তিনি অন্যদেরকে যাহা প্রদান করিতেন তাহার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক তাঁহাকে প্রদানের প্রস্তাব করেন।[৩৬] মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার চাচা এবং শুভাকাঙ্খী আবূ তালিবের সহিত পরামর্শক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং খাদীজা (রা)-এর বাণিজ্য কাফেলা লইয়া সিরিয়া গমন করেন, আর এই সময় তাঁহার সহকারী হিসাবে সঙ্গে ছিলেন খাদীজা (রা)-এর ভৃত্য মায়সারা।

স্বীয় চাচার সহিত প্রথমবার সিরিয়া ভ্রমণের ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটিয়াছিল সেইরূপ দ্বিতীয়বার ভ্রমণের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকগণ অপর এক ধর্মযাজক নেসতোরিয়াসের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি প্রায় একই স্থানে বসবাস করিতেন, যেখানে প্রায় বার অথবা চৌদ্দ বৎসর পূর্বে বাহীরা বসবাস করিতেন এবং যিনি একইরূপে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যে ভবিষ্যৎ নবীর লক্ষণসমূহ সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই মর্মে তাঁহার ও মায়সারার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন।[৩৭] আরও বর্ণিত আছে যে, মায়সারা স্বয়ং ফিরতি ভ্রমণের সময় মুহাম্মাদ ﷺ-কে দুইজন ফেরেশতা (অন্য এক বর্ণনামতে মেঘখণ্ড) কর্তৃক রৌদ্র হইতে ছায়াদান করিতে দেখিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার যথার্থতা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ। যাহা হউক, ব্যবসায় অভিযান আশাতীতরূপ সফল প্রমাণিত হয়। মহানবী ﷺ খাদীজা (রা)-এর পণ্যসম্ভার শুধু প্রচুর মুনাফাতেই বিক্রয় করেন নাই, বরং তিনি বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা আরও পণ্য ক্রয় করিয়া আনেন যাহা দ্বারা মক্কায় ফেরত আগমনের পর প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হইয়াছিল।

মুহাম্মাদ ﷺ ও খাদীজা (রা)-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই যোগাযোগ অবশেষে তাঁহাদের বিবাহ পর্যন্ত গড়ায়। মহানবী ﷺ খাদীজা (রা)-এর পক্ষে আরও কোন ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা স্পষ্ট নহে। তবে সকল বর্ণনাই একমত যে, খাদীজা (রা) ক্রমান্বয়ে মহানবী ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তিনিই বিবাহের প্রস্তাবদানে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেন, যদিও পূর্বে তিনি একাধিক অবস্থাপন্ন কুরায়শ বংশীয় লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সহচরী ও বান্ধবী নাফীসা বিন্‌ত মুনায়াকে এই বিষয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতামত জানার জন্য নিয়োগ করেন।[৩৮]

নাফীসা বলেন, যখন তিনি প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা বলার পর বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন তখন মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার জীবনের সেই পর্যায়ে বিবাহের জন্য আর্থিক অসচ্ছলতার কথা ব্যক্ত করেন এবং যখন তিনি তাহার আসল উদ্দেশ্য ও তাহার নিয়োগকর্ত্রী ও প্রস্তাবিত পাত্রীর পরিচিতি প্রকাশ করিলেন তখন মহানবী ﷺ বিস্ময়াভিভূত হইয়া মন্তব্য করিলেন ঃ "আমার জন্য তাহা কি করিয়া সম্ভব?" নাফীসা জবাব দিলেন "তাহা আমার উপর ছাড়িয়া দিন"। ইহার পর মহানবী ﷺ বিষয়টি লইয়া অগ্রসর হওয়ার জন্য তাহাকে সম্মতি দান করেন।

নাফীসা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরিয়া আসেন এবং তাহার দৌত্যকার্যের ফলাফল সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করেন।[৩৯] অতঃপর দুই পক্ষের মধ্যে আরও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্ধারিত দিনে তাঁহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ -এর চাচা আবূ তালিব অথবা হামযা (রা) এই উপলক্ষে তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন এবং খাদীজার চাচা 'আমর ইব্ন আসাদ খাদীজা (রা)-এর পক্ষে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় খাদীজা (রা)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর।[৪০]

এই বিবাহ সম্পূর্ণ সুখী ও সফল হইয়াছিল। ইহা খাদীজা (রা)-র ইনতিকাল পর্যন্ত পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ এক-চতুর্থাংশ শতাব্দীতে যখন মহানবী ﷺ -এর পূর্ণ যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইতেছিল, তিনি অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। একজন (ইবরাহীম) ব্যতীত তাঁহার সকল সন্তান খাদীজার গর্ভজাত। তাঁহারা ছিলেন দুই পুত্র ঃ আল-কাসিম ও আত-তাহির ('আবদুল্লাহ) এবং চার কন্যা যয়নব, রুকায়্যা, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা (রা)। ইবরাহীমসহ, যিনি পরবর্তী সময়ে মারিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সকল পুত্র শৈশবেই ইনতিকাল করেন। অন্যদিকে কন্যাগণ দীর্ঘদিন বাঁচিয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। কন্যাদের দুইজনকে প্রথমে আবূ লাহাবের দুই পুত্রের সহিত বাগদান করা হইয়াছিল। কিন্তু আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল (আবূ সুফ্য়ানের ভগ্নী)-এর বিদ্বেষ ও বিরোধিতার কারণে শেষ পর্যন্ত তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় নাই। অবশেষে যয়নবের বিবাহ হয় আবুল 'আস ইবনুর রাবী' (ইব্ন 'আবদুল 'উযযা ইব্ন 'আব্দ শামস ইব্ন 'আব্দ মানাফ)-এর সহিত।[৪১] রুকায়্যা এবং উম্মু কুলছূম (রা)-এর বিবাহ, পরপর একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনের, উছমান ইব্ন 'আফফান (রা)-এর সহিত হয় এবং ফাতিমা (রা)–এর বিবাহ হয় আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর সহিত।

খাদীজা (রা)-এর সহিত বিবাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁহার অসচ্ছল আর্থিক অবস্থা হইতে মুক্তি দেয়। এখন হইতে তিনি তাঁহার চাচা আবূ তালিবের গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে খাদীজা (রা)-এর সহিত বসবাস করিতে শুরু করেন। খাদীজা (রা) তাঁহার সকল ধন-সম্পদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর অধীনে ন্যস্ত করেন। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহাকে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্ত জীবন দান করিয়াছিল। তাঁহার অবস্থার এই অনুকূল পরিবর্তন কুরআনের ৯৩ ঃ ৮ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে ঃ "তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব পান নাই, অতঃপর সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন?"

ঐতিহাসিকগণ খাদীজা (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের পরবর্তী প্রায় দশ বৎসর যাবত তাঁহার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। এই সময়ের তাঁহার উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা কেবল পরোক্ষ আভাস পাই খাদীজা (রা)-এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য সম্পর্কিত বিখ্যাত বর্ণনা হইতে, যাহা তিনি মহানবী ﷺ-র প্রথম ওহী প্রাপ্তির পর, চরম উৎকণ্ঠিত ও ভয়ার্ত অবস্থায়

তাঁহার নিকট আগমনের পর করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারেন না। কারণ "আপনি সর্বদা সত্য কথা বলেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, আত্মীয়দের দেখাশুনা করেন, গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্য ও সহায়তা করেন" ইত্যাদি।[৪২] স্পষ্টত ইহাই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবন ও চরিত্রের বাস্তব চিত্র যাহা খাদীজা (রা)-র নিকট তাঁহাদের জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে তাঁহার ও তাঁহার মহান স্বামীর আশ্বস্ততা ও সান্ত্বনার কারণস্বরূপ তাৎক্ষণিকভাবে দেখা দিয়াছিল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নূতন অর্জিত সচ্ছন্দ অবস্থাকে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং খাদীজা (রা) কর্তৃক উল্লিখিত কল্যাণমূলক কার্যাবলীতে নিজেকে খ্যাতিমান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিবাহিত জীবনের প্রথম দশ বৎসর কালের কমপক্ষে দুইটি সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে আমরা অবহিত যাহাকে স্পষ্টভাবে খাদীজা (রা) কর্তৃক উল্লিখিত কল্যাণমূলক কার্যাবলী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একটি আবূ তালিবের পুত্র 'আলী (রা)-কে প্রতিপালনের জন্য তাঁহার গ্রহণ। বর্ণিত আছে যে, বৃহৎ পরিবার ও এক বৎসর খরার কারণে আবূ তালিব কঠিন সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এই অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন চাচা 'আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, আবূ তালিবের কষ্ট লাঘবের জন্য তাঁহাদের উভয়ের কিছু করা দরকার। তখন তাঁহারা উভয়ে আবূ তালিবের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার কয়েকজন পুত্রের লালন-পালন ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করার জন্য তাহাকে প্রস্তাব করিলেন। বৃদ্ধ আবূ তালিব রাজি হইলেন। তারপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলীকে গ্রহণ করেন এবং 'আব্বাস গ্রহণ করেন জা'ফারকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলীকে তাঁহার পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কায়েকজনের অন্যতম ছিলেন এবং যেরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার নিকট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ দেন।

অন্য কাজটি যায়দ ইব্ন হারিছাকে দত্তকরূপে গ্রহণ। যায়দ যখন বালক ছিলেন তখন তাঁহার পরিবারের শত্রুগণ অথবা একদল দস্যু কর্তৃক ধৃত হইয়া বিখ্যাত উকায মেলায় ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হন এবং সেখানে খাদীজার ভাতিজা বা ভাগিনেয় হাকীম ইব্ন হিযাম তাহাকে ৪০০ দিরহামের বিনিময়ে খাদীজা (রা)-র জন্য ক্রয় করেন। খাদীজা (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বিবাহের পর তাঁহাকে বালক ভৃত্যটি উপহার দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দাসত্বের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহার প্রতি এইরূপ পিতৃসুলভ স্নেহ ও ভালবাসা দেখাইতে থাকেন যে, লোকেরা অচিরেই তাঁহাকে যায়দ ইব্ন মুহাম্মাদ বলিতে শুরু করে। পরবর্তী কালে যায়দের পিতা হারিছা এবং চাচা কা'ব তাঁহার খোঁজ পাইয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিয়া দাসত্বের অর্থের বিনিময়ে তাহাদের ছেলেকে তাহাদের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য তাঁহার আনুকূল্য কামনা করিয়াছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, তবে যায়দকে তাঁহার সঙ্গে থাকার অথবা তাহার পিতা ও চাচার সহিত নিজ পরিবারে ফিরিয়া যাইবার

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। যায়দ সেই পর্যন্ত মহানবী -এর আচরণে এইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত থাকিতেই পছন্দ করিলেন। যায়দের পিতা ও চাচাকে অধিকতর আশ্বস্ততার প্রতীকস্বরূপ মহানবী তখন কা'বা প্রাঙ্গণে গমন করিলেন এবং প্রকাশ্যে যায়দকে পুত্র হিসাবে তাঁহার দত্তক গ্রহণের কথা ঘোষণা করিলেন।[৪৩] যায়দ তাঁহার অবশিষ্ট জীবন মহানবী -এর সহিত অতিবাহিত করেন এবং তাঁহার নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কয়েকজনের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ছয় ঃ কা'বাঘর পুনর্নির্মাণ ও মহানবী -এর মধ্যস্থতা

মহানবী -এর বয়স যখন প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব একটি ঘটনার মাধ্যমে জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাটি বোধগম্য কারণেই যত্ন সহকারে কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছিল কা'বার পুনর্নির্মাণ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যায় ইহার দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়াছিল। এই পর্যন্ত ইহাতে কোন ছাদও ছিল না এবং সম্প্রতি এক চোর ইহাতে রক্ষিত কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছিল। এই কারণে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, কাঠামোর ভিত্তি উচুঁ করা, আরও উচুঁ করিয়া ইহার দেয়াল পুনর্নির্মাণ এবং ইহার উপর একটি ছাদ নির্মাণের। মক্কায় সেই সময় মিসরীয় কপ্‌ট্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন উপযুক্ত কারিগর সহজলভ্য হওয়ায় পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন সহজতর হয় এবং সেই সঙ্গে জেদ্দা উপকূলের অদূরে একটি গ্রীক জাহাজ ধ্বংস হইয়া বায়ু ও ঢেউ তাড়িত হইয়া উহার কাঠ তীরে জমা হইলে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন আরও সহজ হইয়া উঠে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ছাদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে উক্ত কাঠসমূহ ক্রয় করে।[৪৪] মহানবী -এর পিতা 'আবদুল্লাহ্‌র এক মামা বানূ মাখযূম গোত্রের আবূ ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন 'আমর নির্মাণ পরিকল্পনায় একজন উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন।[৪৫] কুরায়শ গোত্রগুলির সকলে কা'বাঘর পুনর্নির্মাণ কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পুনর্নির্মাণ কাজের সহিত প্রথমে বিদ্যমান দেয়াল ভাঙ্গার কাজ জড়িত ছিল; আর এই কাজটিতে প্রথমে যথেষ্ট দ্বিধা ও সঙ্কোচের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ আল্লাহ্‌র ঘরে এইরূপ হস্তক্ষেপের কারণে, যদিও তাহা ভাল উদ্দেশ্যেই ছিল, ভাঙ্গন কাজে অংশগ্রহণকারীদের উপর আল্লাহ্‌র রোষ ও শাস্তি নামিয়া আসিবার আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরার দুঃসাহসিকতা এই দ্বিধার পরিসমাপ্তি ঘটায়। তিনি এক কোণার দেয়ালের একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রথম ভাঙিয়া ফেলেন এবং তারপর সকলে এক রাত অপেক্ষা করে তাহার কোন অমঙ্গল হয় কিনা দেখার জন্য।[৪৬] কিন্তু ঐ সময়ে তাহার কিছু না হওয়ায় সকলেই দেয়াল ভাঙার কাজ শুরু করিয়া দেয়। কুরায়শ গোত্রগুলি চারিটি স্বতন্ত্র দলে নিজেদের সংগঠিত করে। প্রত্যেক দল

গৃহের চারি পার্শ্বের একপার্শ্ব ভাঙা ও পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে এই বিখ্যাত গণপূর্ত কাজের জন্য গোত্রসমূহের এইরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা একটি কৌতুহল উদ্দীপক বিষয়। এই শ্রেণীবিভক্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ

	গোত্র	দায়িত্ব
(ক)	বানূ 'আব্দ মানাফ ও বানূ যুহরা	দরজা ও সেইদিকের (অর্থাৎ পূর্বদিকের) দেয়াল
(খ)	বানূ মাখযূম ও অন্য কয়েকটি গোত্র	কালো পাথর ও ইয়ামানী কোণের মধ্যবর্তী দেয়াল।
(গ)	বানূ জুমাহ ও বানূ সাহম	দরজার বিপরীত দিকের (অর্থাৎ পশ্চিম দিকের) দেয়াল।
(ঘ)	বানূ 'আবদিদ দার ও বানূ আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উযযা ও বানূ কা'ব ইবন লু'আই	হাতীম ও ঐদিকের দেয়াল।

চাচা 'আব্বাসের সহিত একসঙ্গে নিজ কাঁধে পাথর বহন করিয়া মহানবী ﷺ কা'বাঘর পুনর্নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪৭] পুনর্নির্মাণ কাজ স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু যখন দেয়ালগুলি এইরূপ উচ্চতায় পৌঁছিল যেখানে কালো পাথরকে (হাজরে আসওয়াদ) উহার স্থানে পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন, তখন গোত্রগুলির মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি গোত্রই পাথরটি পুনঃস্থাপনের সম্মান অর্জন করিতে আগ্রহী ছিল। সম্মত কার্যবণ্টন অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই কাজের দায়িত্ব উপরে উল্লিখিত (ক) ও (খ) শ্রেণীর যে কোন বা উভয় শ্রেণীর গোত্রসমূহের উপর বর্তায়। কিন্তু অন্যান্যরা, বিশেষ করিয়া (ঘ) শ্রেণীর গোত্রসমূহ ইহার বিরোধিতা করে। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, তাহারা আপোষহীনভাবে তাহাদের দাবি আদায়ের ঘোষণা করে এবং রক্তপূর্ণ পাত্রে নিজেদের হাত ডুবাইয়া, যাহাকে তাহারা বিরল সম্মান বলিয়া মনে করিয়াছে তাহা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করিয়া তাহাদের জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করে।[৪৮] ইহা লইয়া ঝগড়া বা অচলাবস্থা চার বা পাঁচ দিন অব্যাহত থাকে।

অতঃপর বর্ণিত আছে, বানূ মাখযূম গোত্রের উমায়্যা ইব্ন মুগীরা, যিনি সকল কুরায়শের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠতম ছিলেন, তাহাদিগকে এই মর্মে রাজী করাইতে সমর্থ হন যে, পরবর্তী ভোরে একটি নির্দিষ্ট দিক হইতে কা'বা প্রাঙ্গনে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করিবে তাঁহার নিকট বিষয়টি মীমাংসার জন্য ন্যস্ত হইবে।[৪৯] (প্রকৃতপক্ষে পরের দিনের নয়, বরং তাৎক্ষণিকভাবে

প্রথম আগমনকারীকে মধ্যস্থকারী মনোনীত করা হইয়াছিল, ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ৫৭৫, সম্পাদনা পরিষদ)। তাহাদের সকলের জন্য সৌভাগ্যবশত যে লোকটি সেদিন কা'বা প্রাঙ্গনে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল ও উচ্চস্বরে বলিল, "এই হইলেন বিশ্বস্ত ব্যক্তি; আমরা তাঁহাকে মানি, তিনি তো মুহাম্মাদ"।[৫০]

মনোনীত সালিশ সময়ের দাবি পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি একখণ্ড কাপড় আনিতে বলিলেন। কাপড় আনা হইলে তিনি উহাতে পাথরটি রাখিলেন এবং গোত্রগুলির নেতৃবৃন্দকে কাপড়ের চারিদিক ধরিতে বলিলেন এবং তারপর সকলে কাঙ্খিত স্থানে এবং কাঙ্খিত উচ্চতায় পাথরটি উত্তোলন করিল। যখন এইরূপ করা হইল তখন তিনি নিজে পুনরায় পাথরটি হাতে লইলেন এবং তাহা উহার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিলেন।

এইভাবে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল, আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহতা দূরীভূত হইল এবং নেতৃবৃন্দের গোত্রীয় অহমিকা পরিতৃপ্ত হইল। যদিও ঘটনাটি এইভাবেই সেই নাটকের সুখকর পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে, কিন্তু ইহার শেষ অঙ্ক ইহা সম্পর্কে অনেক কিছু বলার সুযোগ স্পষ্টতই সৃষ্টি করিয়াছে। কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট ব্যাখ্যা নহে যে, যে বিবদমান গোত্রগুলি ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত সম্মান অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখিয়াছিল তাহারা হঠাৎ এলাকায় কোন একটি নির্দিষ্ট দিক হইতে প্রথম প্রবেশকারী এক অপরিচিত ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর তাহাদের সম্ভাবনার ঝুঁকি ধরিতে সম্মত হইয়াছিল। বিষয়টি এবং ভাবী সালিশের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেক আলোচনা ও শলা-পরামর্শ হইয়াছিল। ইহাও অসম্ভব যে, মুহাম্মাদ ﷺ যিনি স্বয়ং কা'বার পুনর্নির্মাণ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা ছাড়া নিজ সমাজের একজন বুদ্ধিমান ও সম্মানিত সদস্য ছিলেন, এই বিবাদ ও তাহার সহিত জড়িত অন্যান্য বিষয়, বিশেষ করিয়া সালিশের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং তারপর কেবল ঘটনাক্রমে এবং কোন একটি দিক হইতে কা'বা প্রাঙ্গনে প্রথম প্রবেশকারী হওয়ার সুবাদে নিজেই উক্ত সালিশ হন। ঘটনা যাহাই হউক না কেন—এই কাহিনী হইতেও ইহা স্পষ্ট যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সালিশ হিসাবে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিল কেবল এইজন্যই নহে যে, তিনি ঐ এলাকায় প্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি ছিলেন, বরং স্পষ্টত ও চূড়ান্তরূপে এই কারণে যে, তিনি "আল-আমীন, বিশ্বস্ত ব্যক্তি" যাঁহার ছিল প্রমাণিত বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং যাঁহার সততা ও নিরপেক্ষতায় ছিল সবচাইতে অগাধ আস্থা। সমগ্র কাহিনীর ইহাই মূল বক্তব্য। সালিশী তৎকালীন কুরায়শ নেতৃবৃন্দের গোত্র-চেতনা ও বংশ-গৌরবের উপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অভ্রান্তরূপে বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। ইহা প্রকৃতই ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ কল্পনামুক্ত চরিত্র, তাঁহার সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা ও জনপ্রিয়তার প্রতি জাতীয় অনুমোদন।

সূত্রসমূহ সাধারণত এই মর্মে একমত যে, কা'বার পুনর্নির্মাণ কাজ মহানবী -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার অর্থ, সেই সময় অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সমাজের একজন সাধারণ ও সম্মানিত সদস্য হিসাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি সমাজের দৈনন্দিন কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতেন, তাঁহার মহৎ চরিত্র ও সত্যবাদিতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে পছন্দ ও বিশ্বাস করিত। নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্ন থাকার সময়, যাহা সকল বর্ণনামতে ওহী আগমনের পূর্বে ঘটিয়াছিল, স্পষ্টত তখনও শুরু হয় নাই। সঠিক কোন বৎসর বা তারিখ হইতে তাঁহার জীবন যাপন পদ্ধতিতে এই লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে এইরূপ ধারণা করিয়া যে, ইহা কা'বাঘর পুনর্নির্মাণের বেশীদিন পরে সংঘটিত হয় নাই। বলা যাইতে পারে যে, নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্ন থাকার সময়কাল সর্বোচ্চ চার বৎসরের অধিক ছিল না।

সাত ঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব

মহানবী -এর নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের অপর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অ-প্রাপ্তি এবং তাঁহার পঠন ও লিখনে অপারগতা। ঐতিহাসিকগণ যদিও মহানবী -এর জীবন ও কার্যাবলীর অনেক ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে সতর্ক, কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রথম জীবন ও যৌবনে কখনও তিনি কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোন আভাস প্রদান করেন নাই। বিপরীতক্রমে মহানবী -এর নিজের এই মর্মে একাধিক উক্তি রহিয়াছে যে, তিনি ছিলেন একজন নিরক্ষর (উম্মী) অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না। স্বয়ং কুরআনেও একাধিক উক্তি রহিয়াছে যাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করে যে, তিনি কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই অথবা পড়িতে ও লিখিতেও জানিতেন না। এই তথ্যের প্রকাশ ঘটায়াছে 'উম্মিয়্যি' শব্দ হইতে যাহা একবচন ও বহুবচন আকারে কুরআনে সর্বমোট ছয়টি স্থানে উক্ত হইয়াছে[৫৩] যাহার অর্থ একজন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোক উভয়ই (অর্থাৎ শিক্ষা সম্পর্কে যে ব্যক্তি তাহার মায়ের কোলে রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত)[৫৪] এবং যাহার আরও অর্থ "যে ব্যক্তি কোন অবতীর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হন নাই"।[৫৫] এইগুলি ব্যতীত কুরআনে আরও কতকগুলি আয়াত রহিয়াছে, যথা ১৬ ঃ ১০৩, ২৫ ঃ ৪-৫ ও ২৯ ঃ ৪৮ যাহাতে 'উম্মিয়্যি' শব্দটির উল্লেখ নাই কিন্তু যাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, মহানবী পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন না। কুরআনের এই উভয় প্রকার আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে মহানবী -এর "নিরক্ষরতা" সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের মতামত এবং তাঁহাদের এই অভিযোগ যে, তিনি মক্কার একজন "তথ্যদাতা" বা "তথ্যদাতাগণের" নিকট হইতে তাঁহার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন প্রসঙ্গেঁ আলোচনা করা হইবে।[৫৬]

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনকালীন সুবিখ্যাত ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ণিত আছে যে, মহানবী -এর পক্ষে হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক যখন সন্ধির শর্তাবলী লিখিত

হইতেছিল তখন কুরায়শ নেতা সুহায়ল মহানবীর নামের সহিত 'রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ্র দূত) শব্দাবলীর ব্যবহারে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। মহানবী ﷺ সন্ধি সম্পাদন নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে "আলীকে উক্ত শব্দাবলী রহিত করিয়া তৎপরিবর্তে শুধু "আবদুল্লাহ্র পুত্র" লিখিতে বলিলেন। কিন্তু 'আলী বোধগম্য ভাবাবেগ ও ভক্তির কারণে 'রাসূলুল্লাহ' অভিব্যক্তিটি মুছিয়া ফেলিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে মহানবী ﷺ তাহার নিকট হইতে কাগজটি টানিয়া নিলেন এবং কোন বর্ণনামতে, কোথায় উক্ত অভিব্যক্তিটি লিখিত হইয়াছে তাহা 'আলীকে দেখাইতে বলিলেন এবং তাহা দেখান হইলে তিনি উহা কাটিয়া দেন এবং তদস্থলে কুরায়শ নেতার দাবি মোতাবেক বিকল্প অভিব্যক্তি 'আবদুল্লাহ্র পুত্র" লিখার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য বর্ণনায় শুধু উক্ত হইয়াছে যে, 'রাসূলুল্লাহ' অভিব্যক্তিতে কুরায়শ নেতার আপত্তির কারণে মহানবী ﷺ উহার পরিবর্তে 'আবদুল্লাহ্র পুত্র' লিখিলেন।[৫৮] এই শেষোক্ত বর্ণনা সম্পর্কে খুব সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উক্তিটিকে সেই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে যে অর্থে সন্ধিপত্র রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক লিখিত হয় অর্থাৎ তাহারা নিজেরা সন্ধিপত্র লিখেন না বা উহার খসড়া তৈয়ার করেন না, বরং তাহাদের ক্ষমতার অধীনে লিখিত হয়।[৫৯] এমনকি এই শেষোক্ত বর্ণনাতেও দ্ব্যর্থহীনভাবে উক্ত হয় নাই যে, মহানবী ﷺ স্বয়ং শব্দগুলি লিখিয়াছিলেন।

কেহ কেহ এই শেষোক্ত বর্ণনাকে মহানবী ﷺ-এর নিরক্ষরতা সম্পর্কে কুরআনের সাক্ষ্যের সহিত সমন্বয় সাধন করার প্রয়াস পাইয়াছেন এই ভাবিয়া যে, মহানবী ﷺ তাঁহার জীবনের শেষদিকে এবং আলোচ্য কুরআনের আয়াত নাযিলের পরবর্তীতে কিছু কিছু পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন।[৬০] এই অভিমতের ভিত্তি সম্ভবত 'আওন ইব্ন 'আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদীছ যাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, "মহানবী ﷺ পড়িবার ও লিখিবার পূর্বে ইনতিকাল করেন নাই।"[৬১] এই বিশেষ হাদীছটি সর্বসম্মতভাবে অত্যন্ত 'দুর্বল' বলিয়া বিবেচিত এবং কুরআনের সাক্ষ্যের সহিত ইহার বিরোধিতার কারণে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।[৬২] ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ পরবর্তী কালে যদি পড়িতে এবং লিখিতে শিখিয়া থাকেন তাহা হইলে এই উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাঁহাকে উহা অর্জনে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার বা তাহাদের নাম তাঁহার অনেক সাহাবীই উল্লেখ ও বর্ণনা করিতেন।[৬৩] তাই এই ধারণা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

অনুবাদ ঃ মু. আবদুল মান্নান

তথ্যসূত্র

১. বুখারী, নং ২২৬২; ইব্ন মাজা, নং ২১৪৯; মুওয়াত্তা, অধ্যায় ৫৪, বাব ৬, হাদীছ ১৮; ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১২৫।

২. ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১২৬।

৩. বুখারী, নং ৩৪৫৩; মুসলিম, নং ২০৫০; মুসনাদ, ৩খ, পৃ. ৩২৬; ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১২৫-১২৬।

৪. বুখারী, ২২৬২; ইব্ন মাজা, নং ২১৪৯, উল্লেখ্য যে, এই দুইটি উৎসে মূল পাঠের প্রধান অংশটি একটি হইতে অন্যটি ভিন্নতর। প্রথমটিতে ইহা নিম্নরূপ ঃ

كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط এবং দ্বিতীয়টিতে ইহা এইরূপ ঃ كنت أرعاها لاهل مكة بالقراريط

৫. আলোচনার জন্য দ্র. আল-হালাবী, ১খ., পৃ. ২০৫-২০৬।

৬. আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ২৭৯ (১১২৬-১১২৭)।

৭. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ইত্যাদি, ১-২ খ, পৃ. ২২৭-২২৮। আরও দ্র. ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ইত্যাদি, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., ১খ., পৃ. ৫৬৭।

৮. ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৫৮।

৯. আল-হালাবী, ১খ., পৃ. ২০১।

১০. বুখারী, নং ৩৮২৬, আরও আলোচনার জন্য দ্র. নীচে, ৮ম অধ্যায়, ৪র্থ অংশ।

১১. আত-তাবারানী, মাজমা' ইত্যাদি, ৯খ., পৃ. ৪১৮।

১২. আল-হালাবী, ১খ., পৃ. ২০৪।

১৩. কুরআনে সর্বমোট ১৪টি স্থানে এই শব্দটি তিনটি ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানগুলি নিম্নরূপ ঃ ১ ঃ ৭; ২ ঃ ১৯৮; ৩ ঃ ৯০; ৬ ঃ ৬৭; ১৫ ঃ ৫৬; ২৩ ঃ ১০৬; ২৬ ঃ ২০; ২৬ ঃ ৮৬; ৩৭ ঃ ৬৯; ৫৬ ঃ ৫১; ৫৬ ঃ ৯২; ৬৮ ঃ ২৬; ৮৩ ঃ ৩২; ও ৯৩ ঃ ৭। এই সকল আয়াতের যে কোন মানসম্পন্ন ভাষ্যে ইহাদের অর্থ ও তাৎপর্যের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ২ ঃ ১৯৮ আয়াতে শব্দটি অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ হজ্জব্রত পালনকালে মুযদালিফায় নির্ধারিত অনুষ্ঠান যাহারা বাদ দিয়াছে তাহাদের বুঝাইতে স্পষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে ১৫ ঃ ৫৬ আয়াতে ইহা সেই ব্যক্তিকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার আল্লাহ্র অনুকম্পায় পূর্ণ বিশ্বাস নাই বরং সে নৈরাশ্যবাদী। পুনরায় ৬৮ ঃ ২৬ আয়াতে ইহা একজন ভ্রান্ত ব্যক্তির সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৪. উদাহরণস্বরূপ দ্র. বুখারী, নং ২০০২, আরও দ্র. নং ২০০১, ১৮৯২।

১৫. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৮৩; আল-হালাবী, ১খ., পৃ. ১৯৯।

১৬. বুখারী, নং ৩৮২৯।

১৭. সুহায়লী, ১খ., পৃ. ২০৮-২০৯।

১৮. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৮৩।

১৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব আল-বাগদাদী (মৃ. ২৪৫/৮৫৯), কিতাবুল মুনাম্মিক ফী আখবার কুরায়শ (সম্পা. খুরশিদ আহমাদ ফারিক), 'আলামুলকুতুব, বৈরূত ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১৬০-১৮৫। আরও দ্‌. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৮৪-১৮৫।

২০. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ১৮৬।

২১. পূর্বোক্ত বরাত।

২২. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১২৮। মূল আরবী উক্তিটি নিম্নরূপ ঃ

قد حضرته مع عمومتى ورميت فيه بأسهم وما احب انى لم اكن فعلت .

২৩. পূর্বোক্ত বরাত।

২৪. উপরে দ্র., পৃ. ৩৮-৩৯।

২৫.আল-বাগদাদী, কিতাবুল মুনাম্মিক ইত্যাদি, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৮৬-১৮৮। আরও দ্র. আল-মাস'উদী, মুরূজ ইত্যাদি, ২খ, ২৭৬-২৭৭; ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ১৩৩-১৩৫; সুহায়লী, ১খ., ১৫৫-১৫৬; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ইত্যাদি, ১খ, ৫৭০-৫৭১; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ইত্যাদি, ১-২খ, (২), ২৯০-২৯৩; আল-হালাবী, ১খ., ২১১-২১৫।

২৬. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ২১৪।

২৭. উপরে দ্র. পৃ. ৩৮-৩৯।

২৮. আল-মুসনাদ, ১খ., পৃ. ২১৪।

২৯. আল-হালাবী, ১খ., পৃ. ২১৪।

৩০. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৩৪; আল-মুসনাদ, ১খ., পৃ. ১৯০, ১৯৩।

৩১. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৩৪; সুহায়লী, ১খ., পৃ. ১৫৫, ১৫৮।

৩২. দ্র. আল-মুসনাদ, ১খ., পৃ. ১৯০, ১৯৩, ২খ., পৃ. ১৮০, ২০৭, ২১২-২১৩, ২১৫; ৩খ., পৃ. ২৮১; ৪খ., পৃ. ৮৩; ৫খ., পৃ. ৬১; আবূ দাউদ, নং ২৯০৯; দারিমী, ২খ., পৃ. ২৪৩; তায়ালিসী, নং ১০৮৪।

كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة اوحدة .

৩৩. আল-হালাবী, ১খ., পৃ. ২২১-২২২।

৩৪. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৩৪-১৩৫।

৩৫. আল-ইসাবা, ৪খ, পৃ. ১১১-১১২; ৫খ, পৃ. ৬০; আল-মুসতাদরাক, ৩খ, পৃ. ৬৩৭।

৩৬. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৮৮।

৩৭. পূর্বোক্ত বরাত, আরও দ্র. ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৩০; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ইত্যাদি, ১খ., পৃ. ৫৬৯; তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ২৮০ (১/১১২৮); ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ইত্যাদি, ২খ., পৃ. ২৯৪।

৩৮. ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৩১।

৩৯. পূর্বোক্ত বরাত, নাফীসা বিনতে মুনায়্যার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

فارسلتنى دَسِيْسًا الى محمد بعد ان رجع فى عيرها من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك ان تزوج فقال ما بِيَدِىْ ما اتزوج به قلت فان كفيت ذلك ودعيت الى الجمال والمال والشرف والكفاءة الا تجيب؟ قال فمن هى قلت خديجة فقال وكيف لى بذلك قالت قلت على قال فانا افعل فذهبتُ فاخبرتُها .

৪০. পূর্বোক্ত বরাত।

৪১. আল-ইসাবা, ৪খ, পৃ. ১২১। আবুল 'আসের মাতা ছিলেন হালাহ্, যিনি ছিলেন খাদীজার ভগ্নি। সুতরাং আবুল 'আস খাদীজার ভাগিনেয় এবং যয়নবের খালাতো ভাই ছিলেন।

৪২. পরে দ্র. ১৬শ অধ্যায়, ১ম অংশ।

৪৩. আল-'ইসাবা, ১খ., নং ২৮৮৯ (পৃ. ৫৬৩)। দত্তক সম্পর্ক ইসলামে রহিত করা হইয়াছে।

৪৪. ইব্ন হিশাম, ১ খ., পৃ. ১৯২-১৯৩।

৪৫. পূর্বোক্ত বরাত, ১৯৪।

৪৬. পূর্বোক্ত বরাত।

৪৭. বুখারী, নং ৩৬৪, ১৫৮২, ৩৮২৯; মুসলিম, নং ৩৪০; আল-মুসনাদ, ৩খ., ২৯৫, ৩১০, ৩৩৩; ৫খ., ৪৫৪, ৪৫৫।

৪৮. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৪৯. পূর্বোক্ত বরাত, নির্দিষ্ট দিকটি ছিল বাব বানী শায়বা বা বানী আব্দ শাম্‌স (আধুনিক বাবুস সালাম বা বাবুস সাফা)।

৫০. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ১৯৭। ইব্ন ইসহাকের ভাষা এইরূপ ঃ

فلما رأوه قالوا هٰذا الامين رضينا هٰذا محمد .

৫১. পূর্বোক্ত বরাত, আরও দ্র. মুসনাদ, ৩খ., পৃ. ৪২৫; তায়ালিসী, নং ১১৩।

৫২. উদাহরণস্বরূপ দ্র., আল-মুসনাদ, ২খ., পৃ. ২১২।

فقال انا محمد النبى الامى انا محمد النبى الامى ثلاثا .

৫৩. কুরআন ২ ঃ ৭৮; ৩ ঃ ৭৫, ৭ ঃ ১৫৭-১৫৮ ও ৬২ ঃ ২।

৫৪. দ্র. লিসানুল আরাব, 'উম্ম' শিরোনামাধীন।

৫৫. নীচে দ্র., অধ্যায় ১০, অংশ ১।

৫৬. নীচে দ্র. অধ্যায় ১০, অংশ ৩।

৫৭. বুখারী, নং ২৭৩১-২৭৩২, ২৬৯৮, ৩১৮৪; মুসলিম, নং ১৭৮৩-১৭৮৪; মুসনাদ, ৩খ, পৃ. ২৬৮; ৪খ., পৃ. ৮৬, ২৯১, ৩২৫, ৩৩০।

৫৮. বুখারী, নং ৪২৫১; আল-মুসনাদ, ৪খ, পৃ. ২৯৮; দারিমী, ২খ., পৃ. ২৩৭-২৩৮; তায়ালিসী, নং ৭১৩।

৫৯. ফাত্হুল বারী, ৫খ., পৃ. ২১৭।

৬০. উদাহরণস্বরূপ দ্র. ইয্যাত দারওয়াযাহ, সীরাতুর রাসূল ﷺ ইত্যাদি, বৈরূত ১৪০০হি., ১খ., পৃ. ৮২।

৬১. আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ইত্যাদি, বৈরূত, ১৯৮৬ খৃ., ৭খ., পৃ. ২৭৪।

৬২. পূর্বোক্ত বরাত।

৬৩. আবুল আ'লা মাওদূদী, সীরাতে সারওয়ার 'আলাম (সম্পা. নাঈম সিদ্দীকী এবং অন্যান্য), লাহোর ১৯৭৮ খৃ., ১খ., পৃ. ১২৪, টীকা।

অষ্টম অধ্যায়

কৈশোর ও যৌবন ঃ প্রাচ্যবিদদের অভিমত

মহানবী ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণ অনেক মন্তব্য ও ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল ধারণার অনেকগুলিই রাসূল হিসাবে তাঁহার জীবনের প্রতি এবং সামগ্রিকভাবে তাঁহার কর্মকাণ্ডের প্রতি চরম অবমাননাকর। যেহেতু ঐগুলি তাঁহার নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনের সহিত সম্পর্কিত, তাই তাঁহার নিকট ওহী আগমন ও তাঁহার নবুওয়াতী জীবন শুরুর বিবরণ দানের পূর্বে ঐগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যথার্থ হইবে। প্রধানত প্রাচ্যবিদগণের মন্তব্য ও ধারণা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সংক্রান্ত ঃ

(ক) রাখাল হিসাবে মহানবী ﷺ-এর জীবন।

(খ) ফিজার যুদ্ধের প্রকৃতি ও হিলফুল ফুযূল এবং উহাতে মহানবী ﷺ-এর ভূমিকা;

(গ) তাঁহার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড;

(ঘ) খাদীজা (রা)-র সহিত তাঁহার বিবাহ;

(ঙ) তাঁহার ধর্মীয় বিশ্বাসের অবস্থা এবং

(চ) তাঁহার কথিত উচ্চাভিলাষ এবং পরবর্তী কালে তাঁহার ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি।

সর্বশেষ বিষয়টিকে তাঁহার নিরক্ষরতার প্রশ্ন এবং তাঁহার উপর সমকালীন পরিস্থিতির প্রভাব, বিশেষ করিয়া ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের প্রতি তাঁহার কথিত আকর্ষণ এবং তৎকালের ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহ তৎকর্তৃক কথিত আত্মস্থকরণ ও পরবর্তীতে কুরআনে সেইগুলির পুনরায় উপস্থাপন করার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই শেষোক্ত অভিযোগটি সম্প্রতি ওয়াট কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি মহানবী ﷺ ও ইসলামের উত্থান সম্পর্কে তাহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে ফিজার যুদ্ধ ও হিলফুল ফুযূলের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত কিছুতে উত্থাপিত বিষয়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উহাদের সতর্ক বিবেচনা প্রয়োজন। বর্তমান অধ্যায়ে (ক), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ক্রমিকের বিষয়সমূহ আলোচিত হইবে। অবশিষ্ট বিষয়গুলি পরবর্তী ধারাবাহিক চারটি অধ্যায়ে আলোচিত হইবে, যাহা ক্রম অনুযায়ী নিম্নরূপ ঃ (১) হারবুল ফিজার ও হিলফুল ফুযূল সম্পর্কে ওয়াটের মতবাদ, (২) উচ্চাভিলাষ ও প্রস্তুতির অভিযোগ, (৩) ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের প্রতি কথিত আকর্ষণ এবং (৪) কুরআনে কথিত সমকালীন ভ্রম।

এক ঃ রাখাল হিসাবে মহানবী ﷺ-এর জীবন প্রসঙ্গে

মহানবী ﷺ-এর মেষ চরানো প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার অভাবগ্রস্ত চাচা আবূ তালিবকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ঐ পেশা দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেন। উইলিয়াম মুইর লিখিয়াছেন, "এই কাজের জন্য প্রাপ্ত মজুরী তাঁহার অভাবগ্রস্ত চাচা আবূ তালিবের সাহায্যার্থে ব্যয় হইত"।[১] মার্গোলিয়থ আরও কিছু দূর আগাইয়া বলিয়াছেন, "আবূ তালিব সম্ভবত আরাফাত পর্বতের নিকট 'উরানায় রক্ষিত তাহার মেষ ও উট দেখাশুনার জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন"।[২] এই সকল উক্তি দ্বারা যে বিষয়ে স্পষ্ট কটাক্ষ করা হইয়াছে তাহা এই যে, বালক মুহাম্মাদ ﷺ চাচা আবূ তালিবের নিকট হইতে সৎ-পিতা সুলভ আচরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আবূ তালিব সেই সময় এতখানি অভাবগ্রস্ত ছিলেন যে, তাহার সংসারের ভার কিছুটা লাঘব করার জন্য ভাতিজাকে দিয়া মজুরীর বিনিময়ে রাখাল হিসাবে কাজ করাইতে হইয়াছিল।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেষ চরানো পেশা বা উহা দ্বারা অর্থ উপার্জনের সহিত যদিও কোন প্রকার কলঙ্ক বা অবমাননা জড়িত নাই, তবুও উল্লিখিত বক্তব্য কোন সরাসরি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নহে। বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে যদি মেষ চরানোতে নিয়োজিত করা হইয়াই থাকে, তবে তাঁহার চাচাতো ভাইগণ অর্থাৎ আবূ তালিবের পুত্রগণও তো উহাতে নিয়োজিত ছিলেন। তদুপরি এইরূপ ধারণা করা যে, মহানবী ﷺ -এর বাল্যকালে আবূ তালিব অত্যন্ত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিলেন—বলা সঠিক নহে। আবূ তালিবের অর্থনৈতিক অবস্থা তাহার জীবনের শেষদিকে খারাপ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পূর্বে অন্ততপক্ষে সিরিয়ায় তাহার বাণিজ্য সফর পর্যন্ত যখন মহানবী ﷺ প্রায় বারো বৎসর বয়সের ছিলেন, তাহার আর্থিক অবস্থা তত খারাপ ছিল না। মহানবী ﷺ কর্তৃক অন্যের মেষ চরানো দ্বারা অর্থ উপার্জনের বিষয়টিও উৎসসমূহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। কারারীত-এর বিনিময়ে তাঁহার মেষ চরাইবার উল্লেখকারী একমাত্র হাদীছটির, যেরূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং এই বিষয়ে তাহা কোনভাবেই সুস্পষ্ট প্রমাণ নহে। রাখাল বালক হিসাবে মহানবী ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে কোন কিছু অনুমানন করার সময় এই কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

মুইর এবং মর্গোলিয়থ উভয়ই আত-তাবারী কর্তৃক উল্লিখিত হাদীছটির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, মেষ চরানোকালে দুইবার মহানবী ﷺ শহরের নৈশ জীবন উপভোগের কথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই প্রস্তাবিত বিনোদনস্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই নিদ্রায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।[৫] মুইর কথিত ব্যক্তব্য সঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং মন্তব্য করেন, "এইরূপ কাহিনী প্রচলনে সহায়ক অন্ধ শ্রদ্ধার সকল সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও মুহাম্মাদের চরিত্রের সহিত ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যে, তিনি তাঁহার যুবা বন্ধুদের অশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ হইতে সরিয়া থাকিবেন"।[৬] মার্গোলিয়থ মহানবী ﷺ-এর সত্যবাদিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং মন্তব্য করেন, "আমাদের যদি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হয়

তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয় যে, নিজেকে অসম্মানিত করার পূর্বেই নিদ্রা তাঁহাকে অলৌকিকভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল"।[৭]

ইদানীং মুইর এবং মার্গোলিয়থের পথ ধরিয়া এ. গুয়েম (A. Guillaume) তাহার ইব্ন ইসহাক প্রণীত গ্রন্থের অনুবাদের পাদটীকায় সম্পূর্ণ কাহিনীটি উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] তিনি সুহায়লীর একটি মন্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইহার অবতারণা করিয়াছেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সুহায়লী কা'বা গৃহের কোন এক কার্যোপলক্ষে পাথর বহনকালে মহানবী ﷺ কর্তৃক তাঁহার জামা না খুলিবার ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসংগে বলেন যে, ঘটনাটি সম্ভবত দুইবার ঘটিয়াছিল।[৯] গুয়েম-এর অভিমত এই যে, সুহায়লীর পক্ষে "দুইবার"-এর এই ধারণা উপরে উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত "দুইবার" শব্দটি হইতে সৃষ্ট। গুয়েম-এর এই হাদীছটি উল্লেখের প্রকৃত কারণ সম্ভবত তিনি এই প্রসংগে আরও যাহা বলিয়াছেন তাহাই। তিনি বলেন, যদিও ইব্ন ইসহাক বালক মুহাম্মাদ ﷺ-এর শালীনতাবোধের কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আত-তাবারী "কাহিনীটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন এবং উহার স্থলে" অভীপ্সিত নৈশকালীন উপভোগের কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন।

এই সকল কারণে আলোচ্য হাদীছের প্রতি একটু ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি দান করা প্রয়োজন। প্রথমত, যদিও আত-তাবারী বলেন যে, তিনি হাদীছটি হুমায়দ-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, হুমায়দ উহা পাইয়াছেন সালামার নিকট হইতে এবং উক্ত হইয়াছে যে, সালামার নিকট উহা অন্যদের বর্ণনার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বিস্ময়কর যে, ইব্ন হিশাম সম্পাদিত ইব্ন ইসহাকের আস-সীরাহ গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করা হয় নাই। এইরূপ মনে করা কঠিন যে, হাদীছটি আসলে ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে ইব্ন হিশাম কর্তৃক উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইব্ন হিশাম কোনটি বাদ দিয়াছেন এবং কোনটি তাহার নিজ মন্তব্য বা টীকাস্বরূপ সংযোজন করিয়াছেন তাহা উল্লেখের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট যত্নবান। গুয়েম নিজেও সম্ভবত ইহা মনে করেন না যে, হাদীছটি আসলে ইব্ন ইসহাক কর্তৃক তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছিল। সুতরাং ইব্ন ইসহাক কর্তৃক হাদীছটি উল্লেখ না করা এবং তারপরও পরবর্তী কোন গ্রন্থে উহাকে তৎকর্তৃক উল্লিখিত বলিয়া চালাইবার প্রয়াস হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দারুণ সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, আত-তাবারী এবং তৎপরবর্তী অন্য কতিপয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীছটির শব্দাবলীতে একটির সহিত অপরটির মিল নাই।[১০] শব্দসমূহের এই অসঙ্গতির কারণে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, বর্ণনাকারিগণ নিজেরাই কাহিনীটিতে তাহাদের নিজ নিজ শব্দ ও অভিব্যক্তি ব্যবহার করিয়াছেন এবং অতএব, মহানবী ﷺ যদি এই বিষয়ে কিছু বলিয়াও থাকেন তবে ইহা তাঁহার আক্ষরিক বর্ণনা নহে।

তৃতীয়ত, আত-তাবারী যেরূপ হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ মক্কার "উচ্চ ভূমিতে" (بِاَعْلٰى مَكَّةَ) মেষ চরাইয়াছিলেন এবং রাত্রিবেলা তাঁহার মেষ

দেখাশুনার জন্য তাঁহার রাখাল বন্ধুদের অনুরোধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। অথচ নিজ বাড়ি হইতে অনেক দূরে এবং দূরবর্তী মরূদ্যানে না হইলে, রাত্রিবেলা মাঠে মেষ রাখা এবং বাড়ি হইতে নিজেদের দূরে অবস্থান করা রাখালদের জন্য স্বাভাবিক ছিল না। সুতরাং কাহিনীর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে, ইহাতে কোথাও কিছু ভুল রহিয়াছে। তাই ইব্ন কাছীর হাদীছটি বর্ণনা করার পর যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা "অত্যন্ত বিরল ও অস্বাভাবিক" এবং হাদীছটি বর্ণনার প্রক্রিয়ায় কোন কিছু মিশ্রিত হইয়া থাকিবে।[১১]

মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে আরেক কটাক্ষ করিয়াছেন মার্গোলিয়থ। তাহার মতে, খেলাধুলা ও আনন্দ স্ফূর্তির প্রতি মহানবী ﷺ -এর বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি মন্তব্য করেন, "এবং বাস্তবিকপক্ষে তিনি যখন নবী ছিলেন তখনও গায়িকা মেয়েদের গান পরিবেশন তাঁহার পছন্দের ছিল"।[১২] এই মন্তব্যের সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ মার্গোলিয়থ মুসনাদের দুইটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।[১৩] উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উভয় হাদীছই বিবাহ অনুষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত এবং কোনক্রমেই তাহা কোন খেলাধুলা বা গান-বাজনায় মহানবী ﷺ-এর ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ বা উপভোগের সহিত সম্পর্কিত নহে। হাদীছটির কিভাবে অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা এখানে সম্পূর্ণ হাদীছটি উদ্ধৃত করিতেছি, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া গায়িকা মেয়েদের ব্যাপারে কটাক্ষ করা হইয়াছে। হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ

...عن جابر قال قال رسول الله ﷺ لعائشة اهديتم الجارية الى بيتها قالت نعم قال فهلا بعثتُمْ معهم من يغنيهم يقول اتيناكم اتيناكم فحيونا فحياكم فان الانصار قوم فيهم غزل .

"...জাবির (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'তোমরা কি নববধূকে তাহার (স্বামীর) গৃহ অভিমুখে রওয়ানা করাইয়াছ'? তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। তিনি (আল্লাহ্‌র রাসূল) বলিলেন ঃ 'তোমরা তাহাদের (বরযাত্রী দলের) সহিত এমন কাহাকেও কেন প্রেরণ করিলে না যাহারা তাহাদের নিকট এই বলিয়া গান করিবে, 'আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি। সুতরাং তোমরা আমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কর; আমরাও তোমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইব'। কারণ আনসার জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ আনন্দপূর্ণ গযলের প্রচলন রহিয়াছে"।[১৪]

ইহা স্পষ্ট যে, হাদীছটি আনসারদের মধ্যে প্রচলিত নববধূকে তাহার স্বামীগৃহে প্রেরণকালীন একটি বিশেষ প্রথার উল্লেখ করিয়াছে মাত্র। গানের সুনির্দিষ্ট শব্দসমূহও হাদীছটিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তদুপরি এই রেওয়াজও ছিল যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গান করিতে করিতে বরযাত্রী দলের অগ্রে অগ্রে গমন করিত। এইরূপ আনন্দ অনুষ্ঠানের সমগ্র উদ্দেশ্য ছিল কেবল একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করাই নহে, বরং প্রধানত বিবাহ সম্পাদন সম্পর্কে

সমাজকে অবহিত করা এবং গোপনে ও অস্পষ্টভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান নিরুৎসাহিত করা।[১৫] এই হাদীছটি এবং এই মর্মের অন্যান্য হাদীছকে কোন কল্পনাতেই গায়িকা মেয়েদের গান পরিবেশনের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দ প্রমাণার্থে ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা প্রকাশ করে।

দুই ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কষ্টকল্পনা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিছু ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা উৎসসমূহ হইতে স্পষ্ট। ইহাও সুবিদিত যে, তিনি দুইবার সিরিয়ায় বাণিজ্য সফর করিয়াছিলেন ঃ একবার তাঁহার চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে এবং পুনরায় খাদীজা (রা)-র বাণিজ্য বহরের নেতা হিসাবে, যখন তিনি ছিলেন প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়সের যুবক। তিনি যদি দূরদেশে আর কোন বাণিজ্য সফর করিতেন তাহা হইল অবশ্যই তাহা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিতেন অথবা তাঁহার অনেক সহকারী কর্তৃকই তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা হিসাবে উল্লিখিত হইত। উপরে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাচ্যবিদগণ অবশ্য অনেক কষ্টকল্পিত ও অত্যন্ত বিসদৃশ কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন।

সুতরাং (উইলিয়াম) মুইর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণ সম্পর্কে লিখিতে গিয়া দাবি করিয়াছেন যে, তিনি আরও অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, অথচ উৎসমূহে অনুরূপ পরিভ্রমণের সামান্যতম ইঙ্গিতও নাই। মুইর বলেন, যদিও মক্কা হইতে বুসরা যাতায়াতের সরাসরি পথ ভূমধ্য সাগরের অনেক পূর্বে অবস্থিত, তবুও ইহা সম্ভব যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ভ্রমণ বা পূর্ববর্তী ভ্রমণকালে ভূমধ্যসাগর দেখিয়াছিলেন এবং এমনকি "মক্কার ব্যবসায়ীদের প্রিয় রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্য কেন্দ্র" গাযাও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কারণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন "কুরআনে তৎকর্তৃক উল্লিখিত পানিতে চলমান পর্বত সদৃশ বিশাল বিশাল জাহাজ লোহিত সাগরে তাহার সম্ভাব্য দৃষ্ট জাহাজ অপেক্ষা বৃহত্তর শ্রেণীর জাহাজের প্রতি ইঙ্গিত করে"। আরও বলা হইয়াছে যে, কুরআনে অঙ্কিত সামুদ্রিক ঝড় ও ঢেউ-এর সুস্পষ্ট চিত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব উপকূল হইতে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু "পর্বত সদৃশ জাহাজ" তিনি "খুব সম্ভব সিরিয়া উপকূল হইতে" দেখিয়াছিলেন।[১৬]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল ও গাযা বন্দর পরিভ্রমণের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অলীক কল্পনামাত্র, যাহার ভিত্তি একইরূপে সমর্থনের অযোগ্য অপর এক ধারণার উপর স্থাপিত যে, তিনি নিজেই তাঁহার নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে কুরআন রচনা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত ধারণার অশুদ্ধতা এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হইবে।[১৭] এখানে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, কুরআনে দৃষ্ট সামুদ্রিক ঝড় ও "পর্বত সদৃশ জাহাজ"-এর "সুস্পষ্ট চিত্র" কেবল উপকূল হইতে উহাদের প্রতি সাময়িক দৃষ্টি দ্বারাও অঙ্কন করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার সিরিয়ার ভূমধ্য সাগরীয় উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া থাকিতেন, গাযার কথা না হয় বাদই দেওয়া হইল, তাহা হইলে সেই তথ্যের কোন না কোনভাবে ইতিহাস বা হাদীছে

উল্লেখ থাকিত। কারণ তিনি অন্তত এইরূপ দূরবর্তী দেশে একেবারে একা এবং একদল সঙ্গী ব্যতিরেকে, পরবর্তীতে যাহারা তাঁহার বন্ধু বা শত্রু হইয়াছিল, কোন বাণিজ্য সফর করেন নাই।

স্পষ্টত মুইরের পথ ধরিয়া মার্গোলিয়থ মহানবী ﷺ-এর কাল্পনিক পরিভ্রমণের পরিধি পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সকল দিকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং আরব উপদ্বীপের সীমান্তবর্তী সকল দেশ—সিরিয়া, পারস্য, হীরা, বাহরায়ন, ইয়ামান, মিসর ও আবিসিনিয়ায় তাঁহার ভ্রমণের দাবি করিয়াছেন। মার্গোলিয়থ লিখিয়াছেন, "কুরআন তাঁহাকে সমুদ্র ও স্থলপথে পরিভ্রমণের সহিত সুপরিচিত বলিয়া দেখাইয়াছে। তিনি উহাতে জাহাজের গতি ও ঝড়ের ফলাফল যে বাস্তবতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে অভিজ্ঞতার গন্ধ পাওয়া যায়"।[১৮]

সুতরাং মুইরের ধারণার অযৌক্তিতা, যাহা উপকূল হইতে সাময়িক দৃষ্টি দ্বারা কুরআনের বর্ণনায় যে বাস্তবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রদান করা সম্ভব নহে, পরিহার পূর্বক মার্গোলিয়থ মহানবী ﷺ-কে আরব সাগর ও ভূমধ্য সাগর তীরে শুধু দাঁড় করানই নাই, তাঁহাকে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে ভ্রমণও করাইয়াছেন।মার্গোলিয়থ আরও বলেন যে, মহানবী ﷺ একটি মিষ্টি পানির সমুদ্র ও একটি লবণাক্ত পানির সমুদ্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, "তাঁহার ধারণানুযায়ী এই দুইটির মিলন একটি বাঁধ ধারা ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল"। মার্গোলিয়থের মতে এইরূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে যে, তিনি (মহানবী) মরু সাগর, আল-হিজর-এর প্রস্তর সমাধি, বাহরায়নের পল্লী অঞ্চল এবং "ইয়ামানে লেজবিহীন মেষের একটি জাত" দর্শন করিয়াছিলেন, যাহাদের সবগুলিই তিনি কোন না কোনভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[১৯]

উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, কত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্তরূপে মার্গোলিয়থ এই সকল কল্পনায় মুইরকে অনুসরণ করিয়াছেন। একই ধারণা এইগুলিতেও প্রতিভাত হইয়াছে, যথা-মহানবী ﷺ স্বয়ং কুরআন রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মার্গোলিয়থ ইহাতে একটি নতূন মাত্রা যোগ করিয়াছেন। তিনি আরেকটি ধারণার অবতারণা করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ এই সকল সফর ও পরিভ্রমণের সুযোগে সর্বপ্রকার জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে তিনি যে ভূমিকা পালন করিয়াছেন তজ্জন্য দীর্ঘকাল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছেন। এই ধারণা সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করা হইবে। ইহার পূর্বে একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ঃ কুরআনে বর্ণিত সবকিছুই যদি মহানবী ﷺ-এর ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাতে বর্ণিত বেহেশত ও দোযখের সুস্পষ্ট বর্ণনায় বিশ্বাস করা হয় না কেন, বিশেষ করিয়া যখন স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার এক বিশেষ সফরকালে (মি'রাজ রজনীতে) উহা দর্শন করিয়াছিলেন?

সম্প্রতি ওয়াটও মুইর-মার্গোলিয়থের কল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর প্রাথমিক জীবনের বর্ণনা প্রদান করিতে গিয়া যাহাতে তিনি কুরআনের আলো

হইবার কল্পনা পোষণ করেন, ওয়াট এই বিষয়ে তাহার সর্বশেষ গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "সামুদ্রিক ঝড়ের বর্ণনা প্রদানকারী আয়াত (১০ ঃ ২২...) হইতে কেহ কেহ মনে করিতেন যে, বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য হইতে ঝড়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বুঝা যায় এবং সেই ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ অবশ্যই জাহাজে লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া ইথিওপিয়া গমন করিয়া থাকিবেন"।[২০]

ওয়াট কেন সকল স্থানের মধ্যে ইথিওপিয়া এবং কেনইবা কেবল লোহিত সাগরের কথা, যেখানে মুইরের মতে "পর্বত সদৃশ জাহাজ" দেখা যাইত না, উল্লেখ করিলেন তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অনুরূপ অভিজ্ঞতা মক্কার অন্যান্য অনেকেরই ছিল। পুনরায় একটু পরেই মদীনায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতের উল্লেখ করিতে গিয়া এবং উহুদ যুদ্ধের সময় মহানবী ﷺ-কে বিভ্রান্ত করার কিছু লোকের প্রয়াস (৪ ঃ ১১৩) সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া ওয়াট বলেন যে, "ধারণা করা যায় যে, ইহা হিজরতের পূর্বে তাঁহাকে (মহানবীকে) ব্যবসায়ে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে 'বিপথে পরিচালিত করার' মক্কাবাসীদের প্রয়াসের উল্লেখ করিয়া থাকিবে"।[২১]

আয়াতটির এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান কিভাবে "ধারণাযোগ্য" ওয়াট তাহার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই অথবা তিনি এই অনুমানের সমর্থনে কোন তথ্য বা প্রমাণেরও উল্লেখ করেন নাই যে, মক্কাবাসীগণ হিজরতের পূর্বে ব্যবসায়ে "ব্যস্ত রাখার" মাধ্যমে মহানবী ﷺ-কে বিপথে পরিচালিত করার প্রয়াস পাইয়াছিল।

আরও লক্ষণীয় যে, তাহার এই সর্বশেষ মন্তব্য তাহার পূর্ববর্তী গ্রন্থে মহানবী ﷺ-এর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছুটা বিরোধী। পূর্ববর্তী গ্রন্থে তিনি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদের অভ্যন্তরীণ মহল ও সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসায় হইতে তাঁহাকে (মহানবীকে) বাদ দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ওয়াট অনেকগুলি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যাহা কার্যত পরস্পর বিরোধী। তিনি যেভাবে ইহা করিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ "তিনি প্রথমে বলেন যে, যদিও মহানবী ﷺ কর্তৃক পুনরায় সিরিয়া ভ্রমণের কোন প্রমাণ নাই 'তাহার অর্থ এই নহে যে, তিনি উহা করেন নাই, যদিও ইহা সর্বদা সম্ভব যে, তিনি তাঁহার ব্যবসায় দেখাশোনার দায়িত্ব অন্যদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন"।[২২]

মহানবী ﷺ পুনরায় সিরিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকিতে পারেন অথবা তাঁহার কাজের দায়িত্ব তাঁহার প্রতিনিধিকে প্রদান করিয়া থাকিতে পারেন অর্থাৎ যে কোনভাবেই হউক তিনি অন্যদের ন্যায় মক্কার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করার পর সম্ভবত ওয়াটের মনে পড়িয়া যায় তাহার অতি কষ্টে উদ্ভাবিত তত্ত্বের কথা, যেই তত্ত্ব অনুযায়ী একদিকে বানূ হাশিম ও তাহাদের মিত্রগণ এবং অন্যদিকে বানূ 'আব্দ শামস, বানূ 'আবদুদ দার ও তাহাদের মিত্রদের মধ্যে ছিল চরম ব্যবসায়িক বৈরিতা এবং তাহার আরও তত্ত্ব যে, শেষোক্তগণ প্রথমোক্তগণকে মক্কার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তিনি অতি দ্রুত একটি শর্ত অথবা, বরং তাহার উপরে উল্লিখিত কক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি

বক্তব্য জুড়িয়া দেন, "তবে এই সম্ভাবনার কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাকে ব্যবসায়ীদের অভ্যন্তরীণ মহল ও সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসায় হইতে বাহিরে রাখা হইয়াছিল"।[২৩]

কিন্তু পুনরায় এই শেষোক্ত বক্তব্য প্রদানের পর তিনি সম্ভবত বুঝিতে পারেন যে, সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি সেই সময়ের অত্যন্ত কাছাকাছি রহিয়াছেন যখন মহানবী ﷺ-কে তাঁহার এক কন্যাকে প্রভাবশালী বানূ 'আব্‌দ শাম্‌স গোত্রের একজন সদস্যের নিকট এবং অপর দুই কন্যাকে তাঁহার নিজ গোত্রের আরেক প্রভাবশালী সদস্য আবূ লাহাবের পুত্রদের নিকট বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে দেখা যায়। সুতরাং ওয়াট অতি দ্রুত আরেকবার ডিগবাজি দিয়া বলিয়া উঠেন, "তবে ইহা অসম্ভব যে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ বাহিরে রাখা হইয়াছিল। কারণ তিনি 'আব্‌দ শাম্‌স গোত্রের একজন সদস্যের সহিত তাঁহার এক কন্যা যয়নবকে বিবাহ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ...তাঁহার অপর দুই কন্যাকে আবূ লাহাবের দুই পুত্রের নিকট বাগদান সম্পন্ন করা ইহাই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদও গোত্রের সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিশীল যুবকদের অন্যতমরূপে বিবেচিত ছিলেন"।[২৪]

সুতরাং একই স্থানে তিনটি ধারাবাহিক বাক্যে ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন যে, (ক) মহানবী ﷺ সম্ভবত পুনরায় ব্যক্তিগত সফর অথবা তাঁহার প্রতিনিধির মাধ্যমে সিরিয়ার সহিত ব্যবসায় করিয়াছেন;

(খ) তাঁহাকে সম্ভবত অনুরূপ লাভজনক ব্যবসায় এবং মক্কার ব্যবসায়ীদের অভ্যন্তরীণ মহল হইতে বাহিরে রাখা হইয়াছিল; এবং

(গ) ইহা অসম্ভব যে, তাঁহাকে অনুরূপ বাহিরে রাখা হইয়াছিল। কারণ তিনি উক্ত "অভ্যন্তরীণ মহলের" এবং নগরীর শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ওয়াট এইরূপ পরস্পর বিরোধী কল্পনা করার কষ্ট স্বীকার হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেন যদি তিনি বানূ হাশিম ও অন্যান্যের মধ্যে এক তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধের ভ্রান্ত তত্ত্বের জালে, যাহার উপর তিনি আরও অনেক কল্পনার জাল বুনিয়াছেন, আটকা না পড়িতেন। সত্য কথা এই যে, সাধারণভাবে বানূ হাশিম এবং বিশেষভাবে মহানবী ﷺ-কে কখনও তথাকথিত "সর্বাধিক লাভজনক" ব্যবসায় হইতে বাহিরে রাখা হয় নাই অথবা তথাকথিত মক্কার অভ্যন্তরীণ মহল কখনও হিজরতের পূর্বে মহানবী ﷺ-কে ব্যবসায়ে "ব্যস্ত রাখিয়া" তাঁহার কর্তব্য কর্ম হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে নাই।

তিন ঃ খাদীজা (রা)-র সহিত মহানবী ﷺ-এর বিবাহ প্রসঙ্গে

খাদীজা (রা)-র সহিত মহানবী ﷺ-এর বিবাহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মন্তব্য তিনটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ঃ (ক) খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার পিছনে মহানবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য; (খ) বিবাহের সময় খাদীজা (রা)-র বয়স এবং (গ) যে পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহানবী -এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রধান কটাক্ষ করিয়াছেন মার্গোলিয়থ। তাহার অভিযোগ, মহানবী তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরে উন্নীত হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিতে বিলম্ব করেন। কারণ তিনি একজন বিচক্ষণ ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন এবং বিবাহের মাধ্যমে নিজের বস্তুগত অবস্থান উন্নয়নের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মার্গোলিয়থ শুধু মহানবী -এর তীব্র নিন্দাই করেন নাই, বরং সাধারণভাবে সমগ্র আরবজাতির নিন্দা করিয়াছেন তাহাদের কথিত কামাসক্তির জন্য। তাহার ভাষায়, " মুহাম্মাদ, যদিও সেই কামাসক্তিতে অংশীদার ছিলেন যে সম্পর্কে তালমুদ যথার্থই বলিয়াছে যে, উহার নয় ভাগ আরবজাতিকে দেওয়া হইয়াছে এবং কেবল একভাগ অবশিষ্ট পৃথিবীকে প্রদান করা হইয়াছে, যতক্ষণ বিবাহের মাধ্যমে নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম না হন ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন"।[২৫]

উপরে উল্লিখিত বক্তব্য এক জ্বলন্ত বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য। ইহা স্বীকৃত সত্য যে, খাদীজা (রা) একজন অতি ধনশালী মহিলা ছিলেন এবং মহানবী -এর বস্তুগত অবস্থান এই বিবাহের ফলে নিঃসন্দেহে উন্নত হইয়াছিল। ইহার সত্যতা কুরআন কর্তৃক স্বীকৃত। ইহাও সত্য যে, খাদীজা (রা)-র প্রতিনিধি নাফীসা যখন মহানবী -কে তখনও পর্যন্ত বিবাহ না করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি সরল মনে জানাইলেন, বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব পালনে তাঁহার অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কথা। কিন্তু এই সত্যগুলিকে বিকৃত করিয়া এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা যায় না যে, তিনি একজন সম্পদশালী মহিলাকে, তিনি খাদীজা (রা)-ই হউন কিংবা অন্য কেহ, বিবাহ করার মাধ্যমে তাঁহার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি যে তাঁহাকে বিবাহ করিবার স্বপ্ন দেখেন নাই তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট যে, সকল উৎসই এই ব্যাপারে একমত যে, মহানবী নহেন, বরং খাদীজা (রা) নিজেই এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধি নাফীসার বক্তব্যে দেখা যায়, মহানবী নিঃসন্দেহে বিস্মিত হইয়াছিলেন যখন তিনি (নাফীসা) প্রস্তাবিত কণে হিসাবে খাদীজা (রা)-র নাম প্রকাশ করেন। নাফীসার কথা শুনিয়া মহানবী মন্তব্য করিয়াছিলেন, "তাহা আমার জন্য কি করিয়া হইতে পারে?" অবশেষে তিনি নাফীসাকে বিষয়টি লইয়া অগ্রসর হইতে তাঁহার সম্মতি দান করেন কেবল যখন নাফীসা ইহা স্পষ্ট করেন যে, তিনি স্বয়ং খাদীজা (রা)-র নির্দেশেই এই কাজ করিতেছেন।[২৬] এই সকল অকাট্য তথ্য খাদীজা (রা)-র ন্যায় কোন সম্পদশালী মহিলাকে বিবাহ করিয়া নিজের বস্তুগত অবস্থা উন্নয়নের মহানবী -এর পূর্ব পরিকল্পনার ধারণা নাকচ করিয়া দেয়।

একইভাবে মহানবী -এর সহিত বিবাহের সময় খাদীজা (রা)-র বয়স সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির কারণ অগ্রহণযোগ্য। মার্গোলিয়থ লিখিয়াছেন, "তিনি (খাদীজা) মুহাম্মাদ অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু নিশ্চয়ই চল্লিশ বৎসর বয়সের ছিলেন না, যেরূপ মুহাম্মাদ -এর জীবনীকারগণ দাবি করেন। যদিও লোককাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন বেদুঈন মহিলা তাহাদের সৌন্দর্য আশি কিংবা এমনকি এক শত বৎসর বয়স পর্যন্ত অটুট রাখে। আর

কুরায়শ বংশীয় মহিলাগণকে একটি নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করা হইত, যে নিয়ম অনুসারে ষাট বৎসর বয়সের পর মহিলাদের পক্ষে সন্তান ধারণ অসম্ভব"।[২৭] এবং তাহার প্রায় প্রতিধ্বনি করিয়া ওয়াট বলেন, "খাদীজার বয়স সম্ভবত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। তাঁহার গর্ভে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সাতজন সন্তানের নাম উৎসসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে... এমনকি যদি, যেরূপ ইব্ন সা'দের কোন এক উৎস বলিয়াছে, তাহারা নিয়মিত এক বৎসর অন্তর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইল সর্বশেষজনের জন্মের পূর্বে তাঁহার (খাদীজার) বয়স হয় আটচল্লিশ বৎসর। ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব নহে, তবে যে কেহ ইহাকে মন্তব্যের যোগ্য ভাবিতে যথেষ্ট অস্বাভাবিক মনে করিবে। ইহা এমনকি এইরূপ ব্যাপার যাহাকে অলৌকিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও ইব্ন হিশাম, ইব্ন সা'দ বা আত-তাবারীর পৃষ্ঠাসমূহে একটি শব্দ বা মন্তব্যও স্থান পায় নাই"।[২৮]

সীরাত বিষয়ক পরবর্তী কালের কোন কোন গ্রন্থে অবশ্য মহানবী ﷺ-এর সহিত খাদীজা (রা)-র বিবাহের সময় তাঁহার বয়স সম্পর্কে কিছু ভিন্নমত রহিয়াছে।[২৯] কিন্তু ইব্ন সা'দ ও আত-তাবারীর ন্যায় প্রাথমিক উৎসসমূহ সেই বর্ণনাকেই গ্রহণ করিয়াছে যেখানে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি সেই সময় চল্লিশ বৎসর বয়সের ছিলেন। এই বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির জন্য মার্গোলিয়থ ও ওয়াট কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তি যে, 'সন্তান ধারণের জন্য বয়সসীমা' এবং তাঁহার বয়স "সম্ভবত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে" এই অনুমান উভয়টিই ভিত্তিহীন। মার্গোলিয়থ বলেন, ষাট বৎসর সন্তান ধারণের জন্য অস্বাভাবিক বিবেচিত হওয়া উচিত; কিন্তু সেই বয়সসীমা বর্তমান ক্ষেত্রে স্পষ্টতই প্রযোজ্য নহে। অপরপক্ষে ওয়াট এই সম্পর্কে মার্গোলিয়থকে সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহা করিতে গিয়া তিনিও (ওয়াট) কিছুটা ভুল করিয়াছেন। কারণ (যেরূপ তিনি করিয়াছেন) বাৎসরিক জন্মের ভিত্তিতে হিসাব করিলে সপ্তম শিশুর জন্ম তাঁহার (খাদীজার) বয়সের সাতচল্লিশতম বর্ষে হইয়া থাকিবে এবং আটচল্লিশতম বর্ষে নহে। কিন্তু তারপরও, কোন কোন মত অনুসারে, তাঁহার সন্তান সংখ্যা ছিল ছয়জন, তায়্যিব এবং তাহির উভয়ই এক ও অভিন্ন সন্তানের নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।[৩০] সুতরাং বয়সসীমা আরও এক বৎসর কম অর্থাৎ ছেচল্লিশ বৎসর হইবে। এমনকি কিছু বিরতি মানিয়া লইলে এবং ওয়াটের হিসাব গ্রহণ করিলে যে, তাঁহার সর্বশেষ সন্তান তাঁহার বয়সের আটচল্লিশতম বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, প্রাচীন বা আধুনিক যুগের কোন সুস্বাস্থ্যবতী মহিলার পক্ষেই উক্ত বয়সে সন্তান ধারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।[৩১]

ওয়াট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা "কোনক্রমেই অসম্ভব নহে"। তারপরও তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, এইরূপ ঘটনা "মন্তব্যের জন্য যথেষ্ট অস্বাভাবিক" এবং ইহা "এইরূপ ব্যাপার ছিল যাহাকে অলৌকিক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে"। কিন্তু ইব্ন হিশাম, ইব্ন সা'দ এবং আত-তাবারী কোন মন্তব্য ব্যতীতই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কটাক্ষ এই যে, এই প্রাথমিক মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রতিটি অস্বাভাবিক ঘটনা আঁকড়াইয়া ধরিতে এবং উহাকে তাহাদের নবীর অলৌকিক কর্ম হিসাবে উল্লেখ করিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁহারা যদি প্রকৃতই প্রতিটি

অস্বাভাবিক ঘটনাকে অলৌকিক কর্ম হিসাবে বিকৃত করার প্রবণতা সম্পন্ন হইতেন তাহা হইলে বর্তমান ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবেই অনুরূপ করিবার প্রয়াস পাইতেন। আসলে এই ঐতিহাসিক অথবা তাহাদের উৎসসমূহ তাঁহার (খাদীজার) বয়স অতিরঞ্জিত করিতেন না যদি তদ্দ্বারা তাহাদের কোন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য না থাকিত। তাই তাহারা যে এই বিষয়ে কোন বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই উহার অর্থ, একদিকে মায়ের আটচল্লিশতম বৎসর বয়সে সন্তান জন্মদান তাহারা আদৌ অস্বাভাবিক কিছু মনে করেন নাই এবং অন্যদিকে, তাঁহার বয়স অতিরঞ্জিত করেন নাই। কারণ তাহাদের অনুরূপ করার পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। স্পষ্টত প্রথমে উক্ত পণ্ডিতগণ খাদীজা (রা)-র বয়স অতিরঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়া ধারণা করা এবং তারপর তাঁহার সন্তানের কথিত অস্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে তাহাদের নীরবতাকে অতিরঞ্জন অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত নহে।

সর্বশেষে, যেভাবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তৎসম্পর্কে। ডব্লিউ মুইর ওয়েইল (Weil) ও স্প্রেংগার (Sprenger)[৩২]-এর অনুসরণে আল-ওয়াকিদী কর্তৃক এই বিষয়ে অপর কয়েকটি বর্ণনার সহিত উল্লিখিত একটি বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন যেখানে উক্ত হইয়াছে যে, খাদীজা (রা) এই ভয়ে যে, তাঁহার পিতা খুওয়ায়লিদ প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মত হইবেন না, একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তাঁহার পিতার জন্য একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করেন এবং যখন তাঁহার পিতা বেশ "মদোন্মত্ত উৎফুল্ল" হন তখন তাহাকে দিয়া "মহানবী ﷺ-এর চাচা হামযার উপস্থিতিতে" মহানবী ﷺ-এর সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করান, আর যখন বৃদ্ধ লোকটি জ্ঞান ফিরিয়া পান তখন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন এবং বিবাহ বাতিল করিয়া দিতে উদ্যত হন। কিন্তু পরিশেষে যাহা হইয়াছে তাহা তাহাকে মানিয়া লইতে রাজী করান হয়।[৩৩]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল-ওয়াকিদী অন্যান্য বর্ণনার ভিত্তিতে বিবাহের বিবরণ দানকালে উপরিউক্ত বর্ণনা এই বলিয়া উল্লেখ করেন যে, ইহা ভ্রান্ত ও অনির্ভরযোগ্য বিবরণ।[৩৪] আত-তাবারীও একইরূপ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তারপর এই বলিয়া নিজের মন্তব্য সংযোজন করিয়াছেন যে, ইহা অসত্য এবং অনির্ভরযোগ্য।[৩৫] উল্লিখিত মনীষীদ্বয় আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, খাদীজা (রা)-এর পিতা খুওয়ায়লিদ ফিজার যুদ্ধের পূর্বেই মারা যান এবং তাঁহার চাচা আমর ইব্ন আসাদ তাঁহার বিবাহে অভিভাবকত্ব করেন। আর যদিও ইব্ন ইসহাক প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, খুওয়ায়লিদ তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি (ইব্ন ইসহাক) পরবর্তী সময়ে তাহার গ্রন্থে তাহার ভুল সংশোধন করেন এবং বলেন যে, 'আমর তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছেন।[৩৬]

আল-ওয়াকিদী, যাহাকে মুইর উক্ত বর্ণনার উৎস হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, দ্ব্যর্থহীনভাবে উহাকে অসত্য ও অনির্ভরযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ মুইর এই সত্যটি গোপন করিয়া তাহার পাঠকদেরকে স্পষ্টভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। মুইর বলিতে চাহেন যে, তাহার ভাষায়,

মুসলিম মনীষীদের তাহাদের নবীর প্রতি অসম্মানজনক প্রতিটি বর্ণনা গোপন করার প্রবণতা সত্ত্বেও যেহেতু বর্ণনাটি চালু হইয়া গিয়াছে, তাই উহাকে "সত্য বলিয়াই" গ্রহণ করিতে হইবে।[৩৭] এই বক্তব্যেও মুইর ভুল করিয়াছেন। মুসলিম মনীষিগণ মহানবী ﷺ-এর প্রতি অসম্মানজনক কোন বর্ণনাই গোপন করেন নাই, অন্ততপক্ষে বর্তমানটি ত নহেই। বিপরীতক্রমে তাহারা মহানবী ﷺ সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্য সংরক্ষণের জন্য তাহাদের আগ্রহের কারণে, যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহাই যত্নের সহিত লিখিয়া রাখিয়াছেন, কখনও কখনও কোন বিশেষ বর্ণনা সম্পর্কে তাহাদের নিজেদের মন্তব্য ও বক্তব্যও যোগ করিয়াছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে আল-ওয়াকিদী ও আত-তাবারী ঠিক তাহাই করিয়াছেন।

মুইর যদি মহানবী ﷺ-এর প্রতি যাহা কিছু অসম্মানজনক বলিয়া মনে হয় তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে ঈষৎ কম অনুরাগী হইতেন এবং যদি সমালোচনামূলক মন প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে তিনি খোদ বর্ণনাটিতেই উহার কৃত্রিমতার উপাদানসমূহ দেখিতে পাইতেন। কথিত হইয়াছে যে, খাদীজা (রা) তাঁহার পিতাকে মাতাল করিয়াছিলেন, তারপর একটি গরু যবেহ করিয়াছেন, বিবাহভোজের আয়োজন করিয়াছেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করিয়াছেন এবং বিবাহকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন ইত্যাদি। এইরূপ একটি বিরাট আয়োজনের জন্য একটি সমগ্র রাত বা সমগ্র দিনের প্রয়োজন এবং ইহা দৃশ্যতই অকল্পনীয় যে, তাঁহার পিতা খুওয়ায়লিদ এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী মদের প্রভাবাধীন ছিলেন। ইহাও অসম্ভব যে, তাঁহার ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন এবং তাঁহার কাজের প্রতি নীরব সমর্থন জানাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ঘটনাটি এইরূপ অবাস্তব যে, ইহার কল্পনাই করা যায় না যদি আমরা একই সঙ্গে খাদীজা (রা) ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রের অনুমান না করি, যাহা উৎসসমূহে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অধিকন্তু ইহাও সমভাবে অকল্পনীয় যে, মহানবী ﷺ-এর চাচাগণ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাহারা সকল বর্ণনা মতেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, খুওয়ায়লিদের বাড়িতে তাহার আমন্ত্রণ ব্যতীত এবং কেবল তাহার কন্যার গোপন আহবানের ভিত্তিতে উপস্থিত থাকিবেন। সুতরাং এমনকি, যদি আল-ওয়াকিদী ঘটনাটির অনির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু নাও বলিতেন তবুও উহার প্রতি সামান্য একটু সমালোচনামূলক দৃষ্টি উহার অসারতা প্রমাণে যথেষ্ট হইত।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণনাটির উৎপত্তি আবূ মিজলায (লাহিক ইব্ন হুমায়দ আদ-দাওসী) হইতে, যিনি একজন তাবিঈ ছিলেন এবং যিনি ১০৬ বা ১০৯ হি. সনে ইনতিকাল করেন।[৩৮] তিনি বলেন যে, খাদীজা (রা) তাহাকে বলিয়াছেন ইত্যাদি। আবূ মিজলায খাদীজার (রা)-র ইনতিকালের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তিনি কোনক্রমেই খাদীজা (রা)-র নিকট হইতে বর্ণনা শুনিতে পারেন না। কাজেই ঘটনাটি স্পষ্টরূপে পরবর্তী কালের বানানো এবং উহার উপর নির্ভর করা যায় না, যেরূপ ওয়াকিদী যথার্থই বলিয়াছেন।

চার ঃ মহানবী ﷺ -এর ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসঙ্গে

মহানবী ﷺ-এর ওহী প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়ের তাঁহার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মন্তব্য আরও গুরুতর। বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার সমাজের অন্যদের মতই কম বা বেশী বহু ঈশ্বরবাদী ছিলেন এবং কিছু দেবতার উপাসনা বা তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। এই অভিযোগ তাঁহার নবুওয়াত-পূর্ব যুগের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী।[৩৯] এই অভিযোগ প্রধানত মার্গোলিয়থ করিয়াছেন, যদিও কিছু বিষয় তিনি তাহার পূর্বসূরীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, যেরূপ তাহার পরবর্তীগণ তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মার্গোলিয়থের যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) "কিছু সংখ্যক শিশুর নাম হইতে দেখা যায় যে, তাহাদের পিতা-মাতা যখন তাহাদের নামকরণ করেন তখন তাহারা পৌত্তলিক ছিলেন।[৪০]

(খ) "খাদীজাসহ তিনি (মহানবী ﷺ) প্রত্যেক রাত্রে নিদ্রা গ্রহণের পূর্বে কোন এক দেবীর সম্মানে কিছু ঘরোয়া অনুষ্ঠান পালন করিতেন"।[৪১]

(গ) "তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি এক সময় একটি ধূসর বর্ণের মেষ আল-'উযযার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[৪২]

(ঘ) যিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মাংস অপছন্দ করিতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী যায়দ ইব্ন 'আমর।[৪৩]

(ঙ) যদিও মহানবী ﷺ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু "তৎপ্রতি তাঁহার সেইরূপ দৈহিক বিরোধিতা ছিল না যেরূপ প্রায়শ লোকদের থাকে। অন্যথায় কালো পাথর চুম্বন একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হইত না যে জন্য তিনি শিরক হইতে বঞ্চিত হইয়া আকুল আকাঙ্খা পোষণ করিতেন এবং যাহা তিনি স্থায়ীভাবে বহাল রাখিয়াছিলেন"।[৪৪]

প্রথম যুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, মার্গোলিয়থ উহার কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই অথবা তাহার উল্লিখিত গ্রন্থে উহার কোন বিশদ ব্যাখ্যাও প্রদান করেন নাই। যাহা হউক, বিষয়টি পরবর্তী একজন লেখক কর্তৃক পুনরুল্লিখিত হইয়াছে যিনি বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যখন বিষয়টি সম্পর্কে উক্ত লেখকের মতামত বিবেচনা করিব তখন এই প্রশ্নটি আলোচিত হইবে।[৪৫]

(খ)-এ বর্ণিত যুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, মার্গোলিয়থ প্রমাণস্বরূপ মুসনাদের একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৬] কিভাবে এই বিশেষ হাদীছটির ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা দেখার জন্য মূল হাদীছটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, যাহা নিম্নরূপ ঃ

حدثنا هشام يعنى ابن عروة عن ابيه قال حدثنى جار لخديجة بنت خويلد انه سمع النبى ﷺ وهو يقول لخديجة اى خديجة والله لا اعبد اللات ابدا والله لا اعبد

العزى ابدا قال فتقول خديجة خل اللات خل العزى قال كانت صنمهم التى كانوا يعبدون ثم يضطجعون .

"হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়াহ (র) হইতে তাহার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (র)-এর জনৈক প্রতিবেশী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি মহানবী ﷺ -কে খাদীজাকে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ হে খাদীজা! আল্লাহ্‌র শপথ, আমি কখনও লাত-এর উপাসনা করি না, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি কখনও উয্‌যার উপাসনা করি না।' তিনি (উক্ত প্রতিবেশী) বলেন, ইহাতে খাদীজা বলিলেন, 'সেই লাতের কথা ছাড়ুন, সেই 'উযযার কথা ছাড়ুন'। তিনি (উক্ত প্রতিবেশী) বলিলেন, 'উহারা ছিল সেই সকল দেবতা, তাহারা (লোকেরা) রাত্রে নিদ্রা গ্রহণের পূর্বে যাহাদের উপাসনা করিত" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ২২২, নং ১৮১১১; ৫খ., পৃ. ৩৬২, নং ২৩৪৫৫)।

ইহা স্পষ্ট যে, মার্গোলিয়থ হাদীছটির সর্বশেষ বাক্যের উপর তাহার ধারণার ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। তবে ইহা করিতে গিয়া তিনি উক্ত বাক্যটি সঠিকভাবে বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ইহার বিকৃতি সাধন করিয়াছেন। ইহা স্পষ্ট যে, "উহারা ছিল সেই সকল দেবতা, তাহারা রাত্রে নিদ্রা গ্রহণের পূর্বে যাহাদের উপাসনা করিত" অভিব্যক্তিটিতে, যাহা খাদীজার প্রতিবেশীর উক্তি ছিল, সাধারণভাবে কুরায়শ জনগোষ্ঠীর অভ্যাসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মহানবী ﷺ ও খাদীজা (রা)-র অভ্যাসের কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা প্রসঙ্গ হইতেও এবং বাক্যটির প্রতি প্রযোজ্য ব্যাকরণগত নিয়ম হইতেও সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, বর্ণনাকারীর পক্ষে ইহা বলা যেরূপ তিনি বলিয়াছেন, বেমানান ও স্ব-বিরোধী হইবে যে, তিনি মহানবী ﷺ কর্তৃক তাঁহার স্ত্রীকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি কখনও মূর্তিপূজা করেন নাই এবং তারপর একই সময়ে ইহা বলা যে, মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্ত্রী ঐ সকল মূর্তির পূজা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনাকারীর এইরূপ উক্তি করার কোন কারণ নাই। তবে যদি তিনি মহানবী ﷺ -এর বিরোধিতা ও তাঁহাকে অসম্মান করার কোন ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন তাহা হইলেই কেবল এইরূপ হইতে পারে যাহা বর্তমান ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর অভিপ্রায় ছিল বলিয়া ধারণা করা কল্পনারও অতীত।

ব্যাকরণগত নিয়ম প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাক্যটির শেষ অংশে তিনটি ক্রিয়াপদ রহিয়াছে কানূ (كانوا), ইয়া'বুদূনা (يعبدون) ও ইয়াদতাজি'উনা (يضطجعون), সব কয়টিই দ্বি-বচনের পরিবর্তে বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ক্রিয়াপদগুলি যদি আদৌ মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্ত্রীকে নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে ঐগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে দ্বি-বচন আকারে ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ কানা (كانا), ইয়া'বুদানে (يعبدان) ও ইয়াদ্‌তাজি'আনে (يضطجعان),

যেরূপ আরবী ব্যাকরণগত নিয়ম দাবি করে।[৪৭] অভিব্যক্তিটির স্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্ণনাকারী মহানবী ﷺ কর্তৃক তাঁহার স্ত্রীকে যাহা বলিতে শুনিয়াছেন তাহা বর্ণনা করার পর নিজের পক্ষ হইতে মূর্তিসমূহের বিবরণ এই বলিয়া সংযোজন করিয়াছেন যে, ঐগুলি সেই মূর্তি ছিল যাহাদেরকে "তাহারা" অর্থাৎ কুরায়শের লোকেরা রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্বে উপাসনা করিত। আরও উল্লেখযোগ্য যে, তাহাদের মূর্তি বলিয়া মূর্তিগুলির বর্ণনাই অন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বারণ করে। কারণ এখানে উল্লিখিত দুইটি দেবতা মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্ত্রী কর্তৃক প্রবর্তিত ও অভিষিক্ত করা হয় নাই অথবা তাহারা (দুই দেবতা) একান্তভাবে মহানবী ﷺ বা খাদীজা (রা)-র পরিবারেরও ছিল না। সেইজন্যই বর্ণনাকারী কোনভাবেই আলোচ্য দেবতাদেরকে তাহাদের অর্থাৎ মহানবী ﷺ ও খাদীজা (রা)-র দেবতা বলিতে পারেন না। ব্যাকরণগত ও ভাষাগত উভয়ভাবেই অভ্রান্তরূপে সাধারণভাবে কুরায়শ লোকদের কথা বুঝান হইয়াছে। সুতরাং মার্গোলিয়থ তাহার অভিযোগের সমর্থনে যে দলীল পেশ করিয়াছেন উহা বিপরীত তথ্য প্রমাণ করে মাত্র। উহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মহানবী ﷺ জোরের সহিত বলিতেছেন এবং তাহাও তাঁহার স্ত্রীর নিকট, যাঁহার নিকট তাঁহার অভ্যাস সম্পর্কে কোন কিছু লুকাইবার কোন কারণ ছিল না যে, তিনি কখনও দেবতার উপাসনা করেন নাই।

(গ)-এ প্রদত্ত তাহার বক্তব্য, যথা 'মহানবী ﷺ একবার আল-উযযার উদ্দেশ্যে একটি ধূসর বর্ণের মেষ উৎসর্গ করার কথা স্বীকার করিয়াছেন'-এর সমর্থনে মার্গোলিয়থ জে. ওয়েলহৌসেন (J.Wellhausen)-এর Reste[৪৮] প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন। এই শেষোক্ত পণ্ডিত প্রকৃতপক্ষে তাহার দাবি একটি বর্ণনার ভিত্তিতে করিয়াছেন যাহা ইয়াকূতের গ্রন্থে এবং আবুল মুনযির (ইব্নুল কালবী)–এর গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। ইয়াকূত তাহার মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে আল-উযযার বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "আবুল মুনযির বলিয়াছেন, আমরা শুনিয়াছি (وقد بلغنا) যে, মহানবী (আল্লাহ্র শান্তি ও করুণা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক) তাহার (আল-উযযা) কথা একবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ আমি যখন আমার লোকদের ধর্ম পালন করিতেছিলাম তখন আমি আল-'উযযার উদ্দেশ্যে একটি ধূসর বর্ণের মেষ উৎসর্গ করিয়াছিলাম"। ইহা স্পষ্ট যে, ইয়াকূত বর্ণনাটি আবুল মুনযিরের নিকট হইতে পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শুধু এই বর্ণনাটিই নহে, বরং ইয়াকূত প্রদত্ত আল-'উযযার[৫০] সমগ্র বর্ণনাটিই আবুল মুনযির উক্ত প্রতিমা সম্পর্কে তাহার প্রতিমা গ্রন্থে (কিতাবুল আসনাম) যাহা লিখিয়াছেন তাহারই হুবহু নকল বা খোলাখুলি চৌর্যবৃত্তি।

এখন এই আবুল মুনযিরকে হাদীছ শাস্ত্রের সকল স্বীকৃত বিশেষজ্ঞই একজন কুখ্যাত মিথ্যুক ও জাল হাদীছ রচনাকারী হিসাবে গণ্য করেন এবং মহানবী ﷺ-এর চরিত্র এবং আইনগত ও ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয়ে তাহাকে বিশ্বাস ও নির্ভর না করার জন্য সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং হাদীছের অন্যতম প্রাথমিক যুগের বিশেষজ্ঞ ইব্ন হিব্বান আবুল

মুনযিরকে চরম শীঈরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, যে অদ্ভুত কাহিনী ও ঘটনার সুদীর্ঘ বর্ণনাদানে পারঙ্গম, যেইগুলির বাস্তবে কোন ভিত্তি নাই। ইব্ন হিব্বান আরও বলেন যে, আবুল মুনযিরের ভ্রান্তি ও মিথ্যা উদ্ভাবন এত কুখ্যাতিপূর্ণ যে, উহাদের কোন বিবরণ প্রদানের প্রয়োজন করে না।[৫১] অনুরূপভাবে ইব্ন হাজার আবুল মুনযিরের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বলের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, সে (আবুল মুনযির) একজন সস্তা গল্পকার ও খোশগল্পপ্রিয় লোক ছিল। ইব্ন হাজার আদ-দারা কুতনীর এই উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আবুল মুনযিরকে সর্বদা পরিহার করিতে হইবে।[৫২] একইভাবে আয-যাহাবীর অভিমতও তাহার অনুকূলে নহে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইব্ন 'আসাকির তাহাকে রাফিদী হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন।[৫৩] এইগুলি শুধু উদাহরণ মাত্র।[৫৪] আবুল মুনযির স্বয়ং অনেক সময় ভুয়া বর্ণনা প্রণয়নের ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের কথা স্বীকার করিয়াছে।[৫৫] এমনকি বিবেচ্য বর্ণনাটি তাহার নিজের কথায় জনশ্রুতি (فقد بلغنا) মাত্র। সুতরাং যে বর্ণনাটি প্রাচ্যবিদগণ বারবার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাহাদের লেখার আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই বানোয়াট ও অনির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বয়ং ইব্নুল কালবীর স্বীকারোক্তি মতেই ইহা জনশ্রুতি হিসাবে নিন্দিত।

(ঘ)-তে প্রদত্ত তাহার যুক্তি, যথা 'তাওহীদবাদী যায়দ ইব্ন 'আমর মহানবী ﷺ-কে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মাংস অপছন্দ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে' সম্পর্কে মার্গোলিয়থ অবশ্য মুসনাদে সংকলিত একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।[৫৬] ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল[৫৭] একদা মহানবী ﷺ ও যায়দ ইব্ন হারিছার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। এই সময় যায়দ ইব্ন 'আমরকে অপর দুইজনের জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানান হয়। কিন্তু যায়দ ইব্ন 'আমর এই বলিয়া উহাতে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন যে, তিনি বেদীতে (নুসুব) হত্যাকৃত কোন কিছু ভক্ষণ করেন না। বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর মহানবী ﷺ-কে বেদীতে হত্যাকৃত কোন কিছু খাইতে দেখা যায় নাই।

মহানবী ﷺ ও যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল-এর মধ্যে সাক্ষাৎকার এবং খাদ্যের ঘটনা সংক্রান্ত এই হাদীছ বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এবং অনেক সংযোজন ও পরিবর্তনসহ বিভিন্ন আকারে আমাদের নিকট আসিয়াছে।[৫৮] স্বয়ং ঘটনাটিই ইহার পরিষ্কার প্রমাণ যে, হাদীছটি বর্ণনাকালে ইহাতে অনেক কিছু মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। যতদূর মুসনাদের বর্ণনা সম্পর্কে বলা যায়, কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ইহার বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আল-মাসঊদী নামক একজন বর্ণনাকারী রহিয়াছেন যাহার সম্পর্কে সাধারণ অভিমত এই যে, তিনি বিভিন্ন বিষয় মিশ্রিত করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহার মাধ্যমে আগত কোন বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইবে না।[৫৯] এতদ্ব্যতীত অপর দুইজন বর্ণনাকারী নুফায়ল ইব্ন হিশাম এবং তাহার

পিতা হিশাম (ইব্‌ন সা'ঈদ) সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহেন।[৬০] হাদীছটির অপর এক বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আলকামা অন্যতম বর্ণনাকারী। তাহাকেও অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয়।[৬১] এইজন্য মুসনাদের এই বিশেষ বর্ণনাটিকে 'দুর্বল' বলিয়া মনে করা হয়।[৬২] প্রকৃতপক্ষে "যায়দ তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন" (فمر بهما زيد) হইতে তাহার বর্ণনাকৃত মন্তব্যের শেষ পর্যন্ত বর্ণনাটির সমগ্র অংশই প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিয়াছিল উহার মিশ্রিত রূপ।[৬৩] ইহা এই ঘটনা হইতেও স্পষ্ট যে, আল-বায়হাকী উক্ত একই মাসউদীর মাধ্যমে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে এই অংশটির উল্লেখ নাই।[৬৪]

দ্বিতীয়ত, এমনকি মুসনাদের বর্ণনা সঠিক ধরা হইলেও ইহা কোনক্রমেই দেখানো সম্ভব নহে যে, মহানবী ﷺ নিজে প্রাণীটি হত্যা করিয়াছিলেন এবং খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনাটির ভিন্ন ভিন্ন রূপের কোনটিই এইরূপ ধারণা প্রদান করে না। বিপরীতক্রমে বর্ণনার বিভিন্ন রূপের শব্দ প্রয়োগ ও মর্ম হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য অন্যরা প্রস্তুত করিয়াছিল এবং তাহারাই মহানবী ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে প্রদান করিয়াছিল। এবং খাদ্য ভক্ষণ প্রশ্নে উল্লেখ্য যে, বুখারী কর্তৃক প্রদত্ত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে যে, একবার যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল-এর মহানবী ﷺ-এর সহিত, তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে, বালদাহ (মক্কার নিকটবর্তী) নামক স্থানে সাক্ষাত হয় যখন অনুরূপ খাদ্য মহানবী ﷺ-কে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। যায়দ ইব্‌ন 'আমরও তাহাই করেন এবং বলেন, "তোমরা যাহা বেদীতে হত্যা কর আমি তাহা খাই না," ইত্যাদি।[৬৫] স্পষ্টত যায়দের এই উক্তি, যাহা প্রথমে মহানবী ﷺ কর্তৃক খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পরবর্তী ঘটনা এবং যাহা যায়দকে তাহার পালা অনুযায়ী খাদ্য প্রদান করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী মিশাইয়া ফেলিয়াছেন এবং এইরূপ ধারণার জন্ম দিয়াছেন যে, তিনিই প্রথম উক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন।[৬৬] বর্ণনার বিষয়গুলি যে তালগোল পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে তাহা ইহা হইতেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই বর্ণনার একটি রূপে একই দল বর্ণনাকারী তাহাদের বর্ণনায় সংযোজন করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার সময় ঐ দুইটি স্থানে স্থাপিত 'ঈসাফ ও নাইলা নামক দুইটি মূর্তির নিকট গমন ও উহাদের স্পর্শ করিতে তাঁহার সঙ্গী তাঁহার দত্তক পুত্র যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। অন্যান্য মক্কাবাসী সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার সময় ঐ মূর্তি দুইটি স্পর্শ করিতে অভ্যস্ত ছিল। স্পষ্টত বর্ণনাকারিগণের উদ্দেশ্য এই বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা যে, মহানবী ﷺ এমনকি তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত ছিলেন। পুনরায় একই দল বর্ণনাকারী এই শেষোক্ত ঘটনাটিকে খাদ্যের ঘটনার উল্লেখ ব্যতীত একটি পৃথক বর্ণনারূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[৬৭]

সুতরাং বর্ণনাটির বিভিন্ন রূপের মধ্যে তুলনা ও উহাদের একত্র করা হইলে দেখা যাইবে যে, মহানবী ﷺ প্রাণীটি হত্যা ও খাদ্য প্রস্তুতও করেন নাই অথবা তিনি উহা গ্রহণও করেন নাই;

যদিও বিবাহ-নিষিদ্ধজনদের মধ্যে বিবাহের ন্যায় কেবল অনুরূপ খাদ্য গ্রহণ, এই দুইটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হইবার পূর্বে, বেঠিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। অন্যদিকে বুখারীতে প্রদত্ত বর্ণনার একটি রূপে, যাহা প্রশ্নাতীতভাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য, স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি উক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। অধিকন্তু একই দল বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত বর্ণনাটির অপর দুইটি রূপে এতদভিন্ন গুরুত্বের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াইবার সময় ঐ দুইটি স্থানে স্থাপিত মূর্তিগুলিকে কঠোরভাবে এড়াইয়া গিয়াছেন। বর্ণনাটির বিভিন্ন রূপ হইতে ইহাও স্পষ্ট যে, যায়দ ইব্ন 'আমর ও মহানবী ﷺ-এর মধ্যকার বর্ণিত সাক্ষাৎকার শেষোক্তজনের নবুওয়াত প্রাপ্তির বেশী দিন পূর্বে সংঘটিত হয় নাই, যখন তাঁহার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ করিয়া পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া থাকিবে, বিশেষ করিয়া যেরূপ আমরা জানি যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে স্পষ্টত তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও আল-লাত ও আল-'উযযার উপাসনা করেন নাই।[৬৮] স্পষ্টরূপেই বলা যায় যে, আলোচ্য বর্ণনাটি যে সময় সংক্রান্ত সেই সময়ে মূর্তিকে ঘৃণা ও উহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত গোশ্ত পরিহার করার জন্য মহানবী ﷺ-কে যায়দ ইব্ন 'আমর ও তাহার ন্যায় অন্যদের দ্বারা প্রথম বারের মত "অনুপ্রাণিত" হইবার প্রয়োজন ছিল না।

সর্বশেষ, উপরে (ঙ)-তে উল্লিখিত মার্গোলিয়থের মন্তব্য সম্পর্কে, যথা 'পৌত্তলিকতার প্রতি মহানবী ﷺ-এর খুব বেশী দৈহিক বিরোধিতা ছিল না, কারণ তিনি কালো পাথর চুম্বনের রীতি ইসলামে বহাল রাখিয়াছেন—মার্গোলিয়থ এইরূপ মন্তব্য করিয়া তিনটি ভুল করিয়াছেন। যথা (ক) কালো পাথরের মূল প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল; (খ) তাহার ভাষায় উহা চুম্বনের জন্য মহানবী ﷺ-এর আকুল আকাঙ্খা সম্পর্কে ভুল এবং (গ) উহা চুম্বন/স্পর্শ করার রীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ভুল।

কালো পাথরের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকগুলি হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।[৬৯] ইবনুল আছীর-এর বর্ণনানুসারে নবী ইবরাহীম (আ) কা'বাঘর নির্মাণের সময় এই পাথরটি নিকটবর্তী আবূ কুবায়স পর্বত হইতে সংগ্রহ করেন এবং কা'বা ঘরের এক কোণে উহাকে স্থাপন করেন যাহাতে উহা কা'বাঘর প্রদক্ষিণের (তাওয়াফ) শুরু ও শেষ বিন্দু নির্দেশক হইতে পারে।[৭০] ইবনুল আছীরের এই বক্তব্যে পাথরটির উৎপত্তি সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাখ্যা নাই। তবুও ইহা আমাদিগকে তথ্য প্রদান করে যে, কিভাবে এবং কেন নবী ইবরাহীম (আ) উহা লাভ করিয়াছেন এবং ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তী সকল যুগে কালো পাথরের এই প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য দৃষ্টি হইতে লোপ পায় নাই। ইবরাহীম (আ)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া প্রাক-ইসলামী যুগের মক্কার অধিবাসী ও অন্যান্য আরবগণ কালো পাথরের প্রান্ত হইতে কা'বা ঘরের প্রদক্ষিণ শুরু করিত এবং উহা চুম্বন

করিত। কিন্তু উৎসসমূহে এইরূপ মনে করার মত কিছু নাই যে, তাহারা তাহাদের দেবতাদের সহিত উহার উপাসনা করিত অথবা উহার কোন স্বর্গীয় গুণ কিংবা কল্যাণ বা অকল্যাণ করার কোন ক্ষমতা ছিল বলিয়া মনে করিত। অথবা এইরূপ কোন ইঙ্গিতও নাই যে, চুম্বনকর্ম কোন প্রকার উপাসনা ছিল কিংবা দেব-দেবীর উপাসনার সহিত সম্পর্কিত কোন ধর্মীয় আচার ছিল। বস্তুত কালো পাথর চুম্বন আরবদের জন্য ইবরাহীমী ঐতিহ্যের সহিত তাহাদের পরিচিতির নির্দেশক এক প্রকার জাতীয় প্রথা ছিল। ইহা তখনও পৌত্তলিক উপাসনার কোন অংশ ছিল না। সুতরাং এই অভিমত ব্যক্ত করা যে, কালো পাথর চুম্বনরীতি বহাল রাখার অর্থ পৌত্তলিকতার অবশেষ টিকাইয়া রাখা—উক্ত পাথরের উৎপত্তি ও প্রকৃতির অপব্যাখ্যা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, কালো পাথর চুম্বনের জন্য মহানবী -এর কথিত "আকুল আকাঙ্খা" সম্পর্কে মার্গোলিয়থের উল্লেখ বাস্তব তথ্যের বিকৃতি। হিজরতের পর মহানবী 'উমরা ও হজ্জ পালনের জন্য প্রকৃতই আকুল আকাঙ্খা পোষণ করিতেন। কিন্তু উহাতে ইহা বুঝায় না যে, তিনি কেবল কালো পাথর চুম্বনের জন্য আকুল আকাঙ্খা করিতেন অথবা উক্ত পাথরকে ভক্তি বা অনুরক্তির বস্তু হিসাবে দেখিতেন।

তৃতীয়ত, কালো পাথর প্রান্ত হইতে কা'বা ঘরের তাওয়াফ শুরু ও শেষ করার ইবরাহীম (আ) প্রতিষ্ঠিত রীতি ইসলামে বহাল রাখা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হজ্জ ও 'উমরা দীন ইসলামে ইবরাহীমী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। এই ঐতিহ্যের পৌত্তলিক উপাসনার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। হজ্জ ও 'উমরা সঠিকভাবে পালনের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হইতেছে কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। আর ইহাও একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত যে, প্রদক্ষিণ কাজ কালো পাথর বরাবর শুরু ও শেষ হইতে হইবে। উহার স্পর্শ ও চুম্বন হজ্জ বা 'উমরার জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নহে। মহানবী স্বয়ং কখনও উহা চুম্বন করিয়াছেন, আবার কখনও করেন নাই। চুম্বন কাজটি করা হয় কা'বার জন্য কাহারও ভালোবাসা ও আবেগ প্রদর্শনস্বরূপ, আর এই কা'বাই হইতেছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য দিকনির্দেশনার অনুভূতি দানকারী কেন্দ্র। কালো পাথর চুম্বন সেই মহান পরিবার ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি ঐক্য ও আনুগত্যের অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র যাহার উৎপত্তির অনুসন্ধান করা হয় ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে। এমন একজন মুসলমানও পাওয়া যাইবে না যে মনে করে যে, সে কালো পাথরের উপাসনা করে অথবা উহা কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে বলিয়া মনে করে। একজন মুসলমান কালো পাথর বা কা'বা ঘরের উপাসনা করে না, বরং উহার ও বিশ্বজগতের একমাত্র প্রভুর উপাসনা করে। কালো পাথর সংক্রান্ত রীতি কোন অন্ধ ভক্তির বিষয় বা পৌত্তলিকতার অবশিষ্টাংশ কোনটিই নহে।

মার্গোলিয়থকে তাহার যুক্তি ও উপসংহারের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের অনেক লেখক অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আর্থার জেফারী (Arthar Jeffery)-র নাম উল্লেখযোগ্য, যিনি

মার্গোলিয়থের গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় সিকি শতাব্দী পর "মুহাম্মাদ কি তাঁহার শৈশব হইতেই নবী ছিলেন" শীর্ষক নিবন্ধে এই বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের যুক্তিসমূহ তুলিয়া ধরিয়াছেন।[৭১] জেফারী শুরু করিয়াছেন এই মন্তব্য দ্বারা যে, "প্রথম জীবনে মুহাম্মাদ -এর পৌত্তলিকতামুক্ত থাকার গোটা প্রশ্নটাই" অত্যন্ত বোকামীপূর্ণ। কারণ ইহা "যে কোন শিক্ষিত বোধশক্তির নিকট স্পষ্ট যে, প্রত্যেক নবী তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় জনগণের ধর্ম অনুসরণ করিতেন এবং একজন শিশু নবীর ধারণা মানসিকভাবে বিকৃত জীবের ধারণামাত্র"।[৭২]

সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র নিন্দা করিয়া জেফারী পূর্বেই সেই সকল আপত্তির জবাব দান করিয়াছেন যাহা তাহার উল্লিখিত হাদীছ সম্পর্কে উত্থাপন করা যায়। তিনি বলেন যে, হাদীছ সম্পর্কে মুসলমান সমালোচনা "সম্পূর্ণরূপে সনদ পরীক্ষার সহিত" সংশ্লিষ্ট এবং "হাদীছের মতন বা বিষয়বস্তুর উপর খুব সামান্য মনোযোগই" প্রদান করা হয়। অথচ শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান "বিস্ময়কর সুফল" বহিয়া আনে। তাই আধুনিক পণ্ডিতগণ কেবল ইসনাদের উপর মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখাকে অর্থহীন বলিয়া গণ্য করেন। তিনি আরও বলেন যে, যেরূপ যিশু, বুদ্ধ বা এমনকি আলোকজাণ্ডারের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে, সেইরূপ মুহাম্মাদ -এর ক্ষেত্রেও পরবর্তী কালে এইরূপ অনেক হাদীছ সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শস্বরূপ প্রতিষ্ঠার প্রবণতার উদ্ভব ঘটিয়াছে। "সুতরাং ইহা সেই সকল হাদীছ যাহা এই আদর্শ স্বরূপ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা হইতে দূরতম অবস্থানে এবং যাহা খুব সম্ভব নির্ভুল"। কারণ "আদর্শ স্বরূপ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হইবার পর" এইগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই এবং ইহারা যদি প্রাচীন ও প্রশ্নাতীতরূপে "নির্ভুল হইত" তাহা হইলে সকল সম্ভাবনা অনুযায়ী ইহাদিগকে তখন গোপন রাখা হইত।[৭৩] তিনি আরও বলেন যে, কুরআনের আয়াত ৯৩ ঃ ৬-৭ হইতে দেখা যায় যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ -কে "একটি মিথ্যা ধর্মে" পাইয়াছেন এবং তারপর তাঁহাকে সত্যধর্মে পরিচালিত করিয়াছেন এবং কুরআনে তাঁহার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিই একজন মানুষের যিনি তাঁহার স্বীয় জনগণের পুরাতন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে একটি নূতন ও শ্রেয়তর ধর্ম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করিতেছেন। জেফারী অতঃপর তাহার মতের সমর্থনে নিম্নবর্ণিত ছয়টি কারণ উল্লেখ করেন ঃ

(১) আল-মাকদিসী তাঁহার 'কিতাবুল বাদ' ওয়াত-তারীখ' গ্রন্থে কাতাদার[৭৪] বরাতে একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাহিলিয়্যা যুগে খাদীজা (রা)-র গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মহানবী -এর প্রথম পুত্রের তিনি নাম রাখিয়াছিলেন 'আব্‌দ মানাফ অর্থাৎ মানাফের ভৃত্য। প্রাচীন কালের এবং এক সময়ের মক্কার প্রধান দেবতার নাম ছিল মানাফ এবং যেহেতু মুহাম্মাদ "নবুওয়াত প্রাপ্তির পর" "তাঁহার অনুসারীদের প্রাচীন পৌত্তলিকতার স্মৃতিবাহী নামসমূহ" পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়াছিলেন, তাই ইহা স্পষ্ট যে, "তিনি যদি সেই সময়

ইবরাহীম (আ) -এর ধর্ম অনুসরণ করিতেন, যাহা তিনি পরবর্তীতে করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম সন্তানের নাম 'আব্‌দ মানাফ রাখিতেন না"।[৭৫]

(২) মহানবী ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহার তিন কন্যাকে তিনজন পৌত্তলিক পুরুষের সহিত বিবাহ দেন (দুইজনকে আবূ লাহাবের দুই পুত্রের নিকট এবং জ্যেষ্ঠতমাকে আবুল আস ইব্‌নুর রাবী'-র নিকট) এবং সেই সময় "মুহাম্মাদের ধর্ম ও তাঁহার মক্কাবাসী সমসাময়িকগণের ধর্মের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সম্পর্কে কাহারও কিছু জানা ছিল না"।[৭৬]

(৩) কা'বাঘর পুনর্নির্মাণের সময় কালো পাথরকে উহার স্থানে স্থাপনের জন্য মহানবী ﷺ -এর সালিসীর কথা উল্লেখ করিয়া জেফারী বলেন, যেই আল-লাত, আল-'উযযা ও মানাতের বিরুদ্ধে তিনি পরবর্তী কালে "কুরআনে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন" তাহাদের গৃহ কা'বার পুনর্নির্মাণে মুহাম্মাদ ﷺ -এর অংশগ্রহণেই প্রমাণ করে যে, তিনি তখন "তাঁহার জনগণের ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে অনুসরণ করিতেন"।[৭৭]

(৪) জেফারী মার্গোলিয়থ কর্তৃক পূর্বেই উল্লিখিত মুসনাদের (৪খ., পৃ. ২২২) হাদীছটির উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে উক্ত হইয়াছে যে, আল-লাত ও আল-উযযার উপাসনা করিতে মহানবী ﷺ -এর অস্বীকৃতি তাঁহার স্ত্রীকে জানান এবং একজন প্রতিবেশীর উহা শোনা ও প্রতিবেশীর মন্তব্য যে, "উহারা সেই দেবতা যাহাদের তাহারা উপাসনা করিত এবং তারপর শয্যা গ্রহণ করিত"। জেফারী উক্ত হাদীছের মার্গোলিয়থের ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্য তাহার নিজ কারণসমূহ সংযোজন করেন।[৭৮] এই কারণগুলি এখন বিবেচনা করা হইবে।

(৫) জেফারী মুসনাদের (১খ., পৃ. ১৮৯) সেই হাদীছটিও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মার্গোলিয়থও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহা দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে মহানবী ﷺ-কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।[৭৯] জেফারী তাহার নিজস্ব কারণ সংযোজন করিয়াছেন যাহা এখন আলোচনা করা হইবে।

(৬) সর্বশেষ, জেফারী সেই হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা ইতোপূর্বে মার্গোলিয়থও উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহা দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ একবার একটি মেষ আল-'উযযার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।[৮০]

উল্লেখ্য যে, এই যুক্তিসমূহের প্রথমটিতে জেফারী মহানবী ﷺ-এর কোন কোন সন্তানের নামের পৌত্তলিক চরিত্র সম্পর্কে মার্গোলিয়থের বক্তব্যের ভুক্তিকরণ করিয়াছেন মাত্র। কালো পাথর পুনস্থাপনে মহানবী ﷺ-এর ভূমিকা সম্পর্কে (৩)-এ প্রদত্ত যুক্তিও কালো পাথর সম্পর্কে মার্গোলিয়থের মন্তব্যের এক প্রকার সম্প্রসারণ মাত্র এবং (৪), (৫) ও (৬)-এ প্রদত্ত যুক্তিসমূহ মার্গোলিয়থের উল্লিখিত যুক্তিসমূহেরই পুনরাবৃত্তি। সুতরাং একমাত্র অতিরিক্ত যুক্তি যাহা আবশ্যিকভাবে জেফারীর নিজস্ব বলা যাইতে পারে তাহা হইল (২)-এ প্রদত্ত যুক্তি। কিন্তু যেহেতু

তিনি এই সকল যুক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য নিজস্ব যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাই উহাদের সবগুলিকেই এক এক করিয়া বিবেচনায় আনা হইবে। উহা করিবার পূর্বে অবশ্য জেফারীর প্রাথমিক মন্তব্যকে সামান্য ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা সময়োপযোগী হইবে।

শুরুতেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জেফারী তাহার যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে কিছুটা স্ফীত করিয়াছেন। মুসলমানগণ কখনও দাবি করে না যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার শৈশব হইতেই নবী ছিলেন, যেমন জেফারী বলিয়া থাকেন অথবা তাঁহারা ইহাও বলে না যে, মহানবী ﷺ তাঁহার বাল্যকাল হইতে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম অনুসরণ করিয়াছেন। তাহারা শুধু এইটুকু বলে যে, মহানবী ﷺ এমনকি তাঁহার নবুওয়াত-পূর্ব জীবনেও আল্লাহ্র সহিত অংশীদারিত্বের (শির্ক) কলঙ্ক হইতে মুক্ত ছিলেন। ইহা এবং তিনি তাঁহার শৈশবকাল "হইতে" নবী ছিলেন বলা এক কথা নহে। পুনরায়, জেফারীর উক্তি যে, "যে কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমত্তার নিকট ইহা যথেষ্ট স্পষ্ট যে, প্রত্যেক নবী তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহার জনগণের ধর্ম অনুসরণ করিতেন" তর্কসাপেক্ষ। অথবা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এইরূপ মনে করা আদৌ "বোকামী " নহে যে, কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিবেশে জন্ম ও লালিত-পালিত হইলেও সে উক্ত ধর্ম ব্যবস্থার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না। মক্কার গোত্রীয় সমাজের ন্যায়, যেখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ব্যক্তিগত চর্চা অপেক্ষা অনেকাংশে সম্প্রদায়গত চর্চার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, সেখানে ইহা আরও সহজ ব্যাপার। বস্তুতপক্ষে এইরূপ সমাজে কোন ব্যক্তির সম্প্রদায়গত ধর্মীয় অনুষ্ঠানদিতে অনুপস্থিতি দ্বারা উক্ত সামাজিক-ধর্মীয় ব্যবস্থায় কোন লক্ষণীয় ভাঙ্গন অপেক্ষা বরং উক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৌতুহলশূন্য ও লোকচক্ষুর নজর এড়াইবার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাইবে। উদাহরণস্বরূপ কোন খৃস্টান সমাজে "ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না এইরূপ খৃস্টানের" নজীর বিরল নহে এবং যদি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয় যে, এইরূপ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন হইতে বিরত ব্যক্তিগণ সঠিক অর্থে কী বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাহাদের অনেককেই বুদ্ধিগত শূন্যতায় বিরাজ করিতে অথবা নাস্তিক বা মার্কসবাদীরূপে দেখা যাইবে, যদিও তাহারা সাধারণত তাহাদের নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক সদস্য হিসাবেই দিনাতিপাত করে।

বিষয়টি ইহাকেও ছাড়াইয়া যায়। যে কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমত্তার নিকট ইহা অতি স্পষ্ট যে, অনেক মহান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তাহার পরবর্তী মহত্ত্বের লক্ষণ তাহার প্রথম জীবনেই ফুটিয়া উঠে এবং একজন মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যতদূর বলা যায়, ইহা মোটেও অসম্ভব নহে যে, আল্লাহ তাঁহার মনকে তাঁহার বাল্যকাল হইতেই সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। কোন তাওহীদবাদী ধর্ম নূতন গ্রহণকারী কিন্তু পূর্বে অন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এইরূপ লোকদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের জীবনের প্রাথমিক পর্যায় হইতে তাহাদের সম্প্রদায়ের শেরেকী কর্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করিত এবং ঐ সকল

কর্মকাণ্ড পরিহার করিয়া চলিত। বর্তমান লেখক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ইসলামে নব দীক্ষিত একজন তরুণ বাঙালী হিন্দুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার বয়স যখন ৮ কিংবা ৯ বৎসর তখন হইতে তিনি মূর্তিপূজা অপছন্দ ও পরিহার করিতে শুরু করেন, যখন তাহার বয়স প্রায় ১২ বৎসর তখন ইসলাম গ্রহণ করেন, গৃহ ত্যাগ করেন, একজন পরোপকারীর সাহায্যে পাকিস্তান গমন করেন এবং সেখানে তাহার মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং এই বৎসর (১৯৯১) গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।[৮১] ইসলামে দীক্ষিত অপর এক তরুণ, যিনি পূর্বে ইংল্যান্ডের লেইসেস্টারের এক খৃস্টান পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং যিনি কিছু দিনের জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, খৃস্টীয় পদ্ধতির উপাসনা হইতে তাঁহার প্রথম জীবন হইতেই অনুপস্থিত থাকার অভিন্ন কাহিনী লেখকের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মুশরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত কোন বালকের শেরেকী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার ধারণা আদৌ "বোকামী" নহে, যেরূপ জেফারী অত্যন্ত আস্থার সহিত দাবি করেন।

মুসলিম পণ্ডিতগণ কর্তৃক হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে তাহার বক্তব্যও সমর্থনযোগ্য নহে। মুসলমান সমালোচনা "একমাত্র" সনদসূত্র পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ; এবং এমনকি যদি তাহাই হইত, তবুও যে উৎসকে নির্দিষ্ট কোন হাদীছের ভিত্তিস্বরূপ ধরা হয় উহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ ত্যাগ করার কোন যৌক্তিকতা নাই, যেরূপ প্রাচ্যবিদগণ মনে করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রথমে মুইর কর্তৃক আনীত এবং তারপর জেফারীসহ অনেকেরই পুনঃউচ্চারিত অভিযোগ যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমান পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নবীর প্রতি অবমাননাকর কোন বর্ণনা গোপন রাখিতে উৎসাহী ছিলেন—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কোন কিছু গোপন করার কোন প্রয়াস কখনও ছিল না, পক্ষান্তরে প্রাপ্ত এবং প্রচলিত সবকিছু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার প্রয়াস ছিল। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু গোপন করার কোন প্রয়াস এমনিতেও হইতে পারিত না। কারণ হাদীছের লিখন বা প্রচার কোন কেন্দ্রীভূত বিষয় ছিল না এবং কোন ব্যক্তিকে তাহার সংগৃহীত কোন বর্ণনা ও তথ্য লিখন ও বর্ণনা হইতে বিরত রাখার কোন ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কোন কিছু গোপন করা প্রশ্নের অতীত ছিল। হাদীছ বর্ণনার তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা বা সম্ভাব্যতার অনুপস্থিতির কারণে এবং স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক অনেক জাল হাদীছ প্রচারিত হইতে প্রত্যক্ষ করার কারণে মুসলমান হাদীছবেত্তাগণ জাল হাদীছ হইতে আসল হাদীছ চিহ্নিত করার নীতিমালা প্রণয়নে আগাইয়া আসেন। খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, যখন জাল হাদীছের ছড়াছড়ি ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে উহার উদ্ভব হইতেছিল তখন হাদীছ প্রচারের কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। ইসনাদের উপর গুরুত্বারোপ এই ঐতিহাসিক তথ্যেরই ফলমাত্র; এবং এই তথ্যই কঠোর পরীক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আবশ্যকীয় করিয়া তোলে, বিশেষ করিয়া সেই সকল হাদীছ যাহা মহানবী ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে সাধারণভাবে স্বীকৃত তথ্যের বিরোধী অথবা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিপন্থী ও অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানদের মধ্যে তাহাদের নবীর প্রতি অবমাননাকর যে কোন বর্ণনা গোপন করার প্রবণতা ছিল—এই মৌলিক ত্রুটিপূর্ণ ধারণার কারণে প্রাচ্যবিদগণ সাধারণত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মহানবী -এর প্রতি অবমাননাকর তথ্য প্রকাশকারী যে কোন কিছুকেই চরম সত্যরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। জেফারীর উক্তি যে, আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠার প্রবণতা হইতে দূরতম অবস্থানের হাদীছগুলি বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা সর্বাধিক—উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই লক্ষণ। এমনকি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠার প্রবণতার উপস্থিতি এবং উহার বিপরীতধর্মী হাদীছ বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনাও ইসনাদ ও অন্যান্য ব্যাপারে শেষোক্তদের সমালোচনামূলক পরীক্ষা বর্জন করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নহে। মোটের উপর মুসলমানগণ তথাকথিত আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠাকারী হাদীছগুলিকে কোন প্রকার পরীক্ষা ব্যতীত এমনিতেই তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে না। জেফারী কর্তৃক তাহার মতের সমর্থনে উল্লিখিত হাদীছগুলির ইসনাদ ও মতন উভয় বিষয়ে একটু সতর্ক পরীক্ষা করিলে উহাদের দুর্বলতা ধরা পড়িবে এবং বিবেচ্য বিষয়ে সেইগুলিকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করার বিপদ সম্পর্কে বর্তমানে আলোচিত হইবে।

জেফারীর প্রথম প্রমাণ হইল আল-মাকদিসী[৮২] কর্তৃক উল্লিখিত এবং খাদীজা (রা)-র গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মহানবী -এর প্রথম পুত্রের নাম সম্পর্কে কাতাদার বর্ণনা। ইহা অনেকভাবেই ত্রুটিপূর্ণ। এই কাতাদা ইব্ন দি'আমাহ্, (মৃ. ১১৭/১১৮ হি.) সাধারণত একজন প্রতারণাপূর্ণ (মুদাল্লিস) বর্ণনাকারী হিসাবে বিবেচিত, যিনি সুস্পষ্ট প্রমাণ অনুযায়ী প্রায় ত্রিশজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে তাহার তথ্যদাতা হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে তিনি কখনও কোন কিছু শোনেন নাই।[৮৩] বর্তমান ক্ষেত্রে ইহারও উল্লেখ নাই যে, তিনি কাহার নিকট হইতে এই বিশেষ তথ্যটি পাইয়াছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আল-মাকদিসী (মৃ. ৩৫৫ হি.) এবং সাঈদ ইব্ন আবী 'আরূবা (মৃ. ১৫৬/১৫৭ হি.), যিনি কাতাদার নিকট হইতে এই তথ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে, উভয়ের মধ্যে প্রায় দুই শত বৎসরের ব্যবধান বিদ্যমান। তারপরও আল-মাকদিসী কিভাবে বা কোন্ উৎসের মাধ্যমে শেষোক্তজনের বর্ণনা লাভ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। ইহা আরও লক্ষণীয়, কারণ তিনি ইব্ন ইসহাকের পুস্তককে উৎস হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন অথচ তিনি বলেন যে, বিষয়টিতে শেষোক্ত জনের উক্তি এবং সাঈদ ইব্ন আবী 'আরূবার উক্তির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।[৮৪] ইসনাদের এই বিবেচনা ছাড়াও মূল বর্ণনাতেও দুর্বলতা রহিয়াছে। আল-মাকদিসী লিখিয়াছেন, "কাতাদার নিকট হইতে প্রাপ্ত সাঈদ ইব্ন আবী 'আরূবার এক বর্ণনা অনুসারে, তিনি অর্থাৎ (খাদীজা রা) জাহিলিয়্যা যুগে আল্লাহ্র রাসূল -এর জন্য 'আব্দ মানাফকে জন্ম দেন এবং ইসলাম-পরবর্তী যুগে তাঁহার দুই পুত্র ও চার কন্যাকে জন্ম দান করেন। পুত্রদ্বয়ের নাম আল-কাসিম ও 'আবদুল্লাহ এবং তাঁহারা শৈশবেই ইনতিকাল করেন। এবং ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার দুই পুত্র জাহিলিয়্যা যুগে ইনতিকাল করেন।[৮৫]

এখন এই বর্ণনা সম্পর্কে উল্লেখ করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যেখানে ইহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, দুই পুত্র আল-কাসিম ও 'আবদুল্লাহ, যাঁহারা ইসলাম-পরবর্তী যুগে

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, শৈশবেই ইনতিকাল করিয়াছেন, সেখানে ইহা তথাকথিত 'আব্‌দ মানাফ সম্পর্কে, যে তাহাদের পূর্বে জাহিলিয়্যা যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে সে সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। অপর দুই পুত্রের শৈশবে মৃত্যুর উপর গুরুত্বারোপ হইতে বুঝা যায় যে, তথাকথিত 'আব্‌দ মানাফের অনুরূপ মৃত্যু হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস মহানবী -এর এইরূপ কোন পুত্রের কথা জানে না যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিংবা তাঁহার পরেও জীবিত ছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রতিবেদনটির বিবরণ প্রস্তুত বা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তাহার সুস্পষ্ট ভুল বা বিভ্রান্তি।

কিছু বিভ্রান্তি বা ভুল যে রহিয়াছে তাহা ইহা হইতে আরও স্পষ্ট যে, সীরাত মুগালতাঈ গ্রন্থে[৮৬] দ্ব্যর্থহীনভাবে উক্ত হইয়াছে যে, খাদীজা (রা) 'আবদ মানাফ (বা 'আবদুল্লাহ) নামের এক পুত্রের জন্ম দিয়াছেন তাঁহার প্রথম স্বামী 'আতীক ইব্‌ন 'আইদের ঔরসে।[৮৭] বিবেচ্য বর্ণনাটি সম্ভবত এই 'আব্‌দ মানাফকে মহানবী -এর প্রথম পুত্র হিসাবে উপস্থাপনের বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছে। কারণ তিনি পরবর্তীতে খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইব্‌ন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১) একই কাতাদা হইতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যেখানে উক্ত হইয়াছে যে, মহানবী -এর মাত্র চারজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠজনের নাম ছিল আল-কাসিম।[৮৮] এই বর্ণনায় 'আব্‌দ মানাফের আদৌ কোন উল্লেখ নাই।

অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কাতাদার কল্পিত বরাতে আল-মাকদিসী প্রদত্ত বর্ণনা এবং ইব্‌ন 'আসাকির কর্তৃক উল্লিখিত একই বিষয়ে একই কাতাদার অপর একটি বর্ণনার মধ্যে মিল নাই।

দ্বিতীয়ত, কাতাদাকে কে তথ্য সরবরাহ করিয়াছে তাহার উল্লেখ নাই কিংবা আল-মাকদিসী কিভাবে সা'ঈদ ইব্‌ন আবী 'আরূবাহ্ কর্তৃক বর্ণিত বলিয়া কথিত বর্ণনা পাইলেন, যিনি তাহার প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে ইনতিকাল করিয়াছেন, আল-মাকদিসী তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই।

তৃতীয়ত, বর্ণনাটি হইতে মনে হয় যে, তথাকথিত 'আব্‌দ মানাফ শৈশবে ইনতিকাল করেন নাই, কিন্তু মহানবী -এর অপর দুই পুত্র শৈশবেই ইনতিকাল করেন। অথচ ইতিহাসে মহানবী -এর এইরূপ কোন পুত্রের উল্লেখ নাই যিনি পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অথবা তাঁহার ইনতিকালের পরও জীবিত ছিলেন।

চতুর্থত, আল-মাকদিসীর তথ্য ইব্‌ন ইসহাকসহ পূর্ববর্তী সকল বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পরিপন্থী। এইরূপ ধারণা করা স্বেচ্ছাচারী ও অন্যায় উভয়ই হইবে যে, উল্লিখিত পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণের সকলেই মহানবী -এর অপর এক পুত্রের অস্তিত্ব ও নামের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য গোপন করার পক্ষে ছিলেন।

সর্বশেষ কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, যদি আল-কাসিম ভিন্ন অপর কোন জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিত তাহা হইলে মহানবী -এর উপনাম (কুন্‌য়া) হইত "আবুল কাসিম"-এর পরিবর্তে "আবূ

অমুক-তমুক"। কারণ কোন ব্যক্তির উপনাম অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহার প্রথম জন্মগ্রহণকারী সন্তানের নাম অনুসারে হইত। এমনকি আল-মাকদিসীও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবুল কাসিম ছিল মহানবী ﷺ-এর উপনাম।[৮৯] এই সকল কারণে আলোচনাধীন বর্ণনাটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।[৯০]

জেফারীর দ্বিতীয় যুক্তি যে, মহানবী ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহার তিন কন্যাকে তিনজন পৌত্তলিক স্বামীর নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন কেহই তাঁহার বিশ্বাসে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করে নাই—সমভাবে অকার্যকর। কারণ প্রাক-ইসলামী আরব সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের লোক বা পরিবারের মধ্যে আন্ত-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। ইসলামে এই নিষেধাজ্ঞা অনেক পরে আরোপিত হয়। ইহার পূর্বে কোন মহলের লক্ষণীয় কোন আপত্তি উত্থাপন বা বিবেকের কোন তাড়না প্রদর্শন ব্যতীতই আরব সমাজে এইরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। উদাহরণস্বরূপ ইয়াছরিবের নেতা কা'ব ইবনুল আশরাফের মাতা বানূ নাযীর গোত্রের একজন ইয়াহূদী ছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা আশরাফ ছিলেন বানূ নাবহান গোত্রের একজন মুশরিক।[৯১] অনুরূপভাবে যদিও যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল একজন শিরক বর্জনকারী তাওহীদবাদী (হানীফ) ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, তাহার পুত্র সাঈদকে মুশরিক আল-খাত্তাবের কন্যা (উমার ইব্নুল খাত্তাবের বোন) ফাতিমার সহিত বিবাহ প্রদানে কেহই আপত্তি করে নাই। পুনরায় ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল যদিও একজন তাওহীদবাদী ও খৃস্টান ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহার মুশরিক পরিবার ও গোত্রের একজন স্বাভাবিক সদস্য হিসাবে তাহাদের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে কোন অসুবিধা বোধ করেন নাই। আবূ লাহাব ও তাহার স্ত্রী যে তাহার পুত্রগণকে মহানবী ﷺ-এর কন্যাদের সহিত তাহাদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা আসলে তাহার ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের জন্য ছিল না, বরং এইজন্য ছিল যে, তিনি প্রকাশ্যে পুরাতন ধর্মকে দোষারোপ করিতেন এবং নূতন ধর্ম প্রচার ও উহা গ্রহণের জন্য তাঁহার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে আহবান জানাইতেন। আবূ লাহাব ও অন্যদের বৈরিতা মহানবী ﷺ-এর কর্মকাণ্ডের এই শেষোক্ত দিকের জন্যই বৃদ্ধি পায়। তিনি যদি তাঁহার নিজ ধর্মের ব্যাপারে নীরব থাকিতেন এবং তাঁহার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা না করিতেন তাহা হইলে সম্ভবত তাঁহার বিরুদ্ধে আদৌ কোন আপত্তি উত্থাপিত হইত না, আবূ লাহাব কর্তৃকও নহে কিংবা অন্যদের দ্বারাও নহে। জেফারীর যুক্তিতে এই বিষয়টি এবং প্রাক-ইসলামী আরবের অভিনব বৈবাহিক রীতিনীতি অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহা একদিকে কোন ব্যক্তির নীরবে ও অস্পষ্টরূপে মুশরিকী আচার-অনুষ্ঠান পালন না করা, অন্যদিকে কোন ব্যক্তির প্রকাশ্যে ও বিরোধিতাক্রমে জনগণের ধর্ম বর্জন করা এবং সেই সঙ্গে নূতন ধর্ম প্রবর্তন ও উহাতে দীক্ষিত করার চেষ্টার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হইয়াছে।

তৃতীয় যুক্তি সম্পর্কে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কালো পাথর পুনঃস্থাপনে তাঁহার সালিশী ও কার্য দ্বারা কা'বাঘর পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এই কা'বাঘর ছিল "আল-লাত, আল-'উযযা ও

মানাতের গৃহ" যাহাদের বিরুদ্ধে তিনি পরবর্তী কালে "অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন", জেফারী দুইটি ভুল করিয়াছেন। বস্তুত কা'বাঘর আল-লাত, আল-'উযযা ও মানাতের গৃহ ছিল না। ইহারা ও ইহাদের মন্দির যথাক্রমে তাইফ, নাখলা ও কুদায়দ (লোহিত সাগর উপকূলের নিকট মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান)-এ অবস্থিত ছিল, যদিও কুরায়শরা ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত।[৯২] আর মক্কাবাসী ও সাধারণভাবে আরবগণও মক্কার কা'বাকে তাহাদের দেবতাদের গৃহরূপে পবিত্র জ্ঞান ও শ্রদ্ধা করিত না, যদিও উহাদের অনেকগুলি সেখানে ও উহার আশপাশে স্থাপিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তাহাদের দেবতাদের অনেক মন্দিরও কা'বা নামে অভিহিত ছিল। যথা নাজরানের কা'বা, সিনদাদ (কূফা ও বসরার মধ্যবর্তী)-এর কা'বা[৯৩] এবং যুল-খালাসার কা'বা আল-ইয়ামানিয়্যা।[৯৪] মক্কার কা'বা সম্পর্কে যতদূর বলা যায়, আরবগণ ইহাকে বিশেষ সম্মান ও বিশিষ্টতম মর্যাদা দান করিত এইজন্য নহে যে, ইহা কোন বিশেষ দেবতার মন্দির ছিল অথবা সাধারণভাবে তাহাদের দেবতাদের গৃহ ছিল, বরং এইজন্য যে, ইহা আল্লাহ্র গৃহ ছিল এবং নবী ইবরাহীম (আ) ও নবী ইসমাঈল (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত ছিল। একমাত্র এই কা'বাতেই আরবগণ পৌত্তলিকতায় নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও, ইবরাহীমী ঐতিহ্য অনুসরণে 'উমরা ও হজ্জ পালন করিত। সুতরাং কা'বাগৃহে কালো পাথর পুনস্থাপনে মহানবী ﷺ-এর সালিশী ও কর্ম কোন দেবতা গৃহ নির্মাণে অংশগ্রহণ ছিল না অথবা ইহা কোনক্রমেই সেই সময় "নিজ জনগণের ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে" তাঁহার অনুসরণের প্রমাণও নহে।

জেফারীর চতুর্থ যুক্তি মুসনাদের বর্ণনা (৪খ., পৃ. ২২২) যাহা মার্গোলিয়থ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহাতে খাদীজা (রা)-র সহিত মহানবী ﷺ-এর কথোপকথন জনৈক প্রতিবেশী কর্তৃক শ্রুত হইবার উল্লেখ রহিয়াছে, যেখানে তিনি (মহানবী ﷺ) আল-লাত ও আল-'উযযার উপাসনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই বর্ণনা সম্পর্কে মার্গোলিয়থের উপসংহারের ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীর মন্তব্য, "ঐগুলি ছিল সেই প্রতিমা যেগুলির তাহারা উপাসনা করিত, তারপর শয্যা গ্রহণ করিত", মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্ত্রীর প্রতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত আপত্তির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[৯৫] জেফারী তিনভাবে মর্গোলিয়থের উপসংহার সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন ঃ

(ক) তাহার উপসংহারের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য বর্ণনায় উল্লিখিত মহানবী ﷺ-এর উক্তির তিনি ভুল অনুবাদ করিয়াছেন;

(খ) প্রতিবেশীর উক্তি মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্ত্রীর প্রতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত আপত্তি এড়াইবার জন্য তিনি একটি অজুহাতের অবতারণা করিয়াছেন; এবং

(গ) তাহার উপসংহার সমর্থনের জন্য সামগ্রিকভাবে বর্ণনাটির তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি কিছু মন্তব্য করিয়াছেন।

জেফারী মহানবী ﷺ-এর উক্তি— ای خديجة والله لا اعبد اللات والعزى والله لا اعبد ابدا -এর নিম্নরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ঃ

"Oh Khadijah! by Allah, I will not worship al-Lat nor al-Uzza; by Allah I will not perform worship again".

"হে খাদীজা! আল্লাহ্র শপথ, আমি আল-লাত বা আল 'উযযার উপাসনা করিব না। আল্লাহ্র শপথ! আমি পুনরায় উপাসনা করিব না"।[৯২] এই অনুবাদ তিন প্রকারে ক্রটিপূর্ণ।

ঐ উক্তির দুই স্থানে উল্লেখিত 'লা' আ'বুদু' (لا اعبد) ক্রিয়াপদটিকে তিনি ভবিষ্যত কাল নির্দেশকরূপে ধরিয়াছেন, যাহা ব্যাকরণগত নিয়মের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, এই উক্তিটিতে আ'বুদু (اعبد) ক্রিয়াটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উভয়বারই ঘটমান (মুদারি مضارع) আকারে। আরবী ভাষায় এই আকারটি বর্তমান (হাল حال) বা ভবিষ্যৎ (মুসতাকবিল مستقبل) কাল বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণ নিয়ম এই যে, যেখানে ক্রিয়াটি একই বাক্যে একই মুদারি' আকারে দুইবার ব্যবহৃত হয়, সেখানে প্রথম ব্যবহারে বর্তমান কাল (حال) এবং দ্বিতীয় ব্যবহার ভবিষ্যৎ কাল (مستقبل) বুঝিতে হইবে। এই সাধারণ নিয়ম ছাড়াও যেখানে ক্রিয়াটির দ্বিতীয়বারের ব্যবহারে ভবিষ্যৎ কাল বুঝিতে হইবে বলিয়া সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান সেখানে বিশেষভাবে ও অবশ্যম্ভাবীরূপে এই নিয়ম অনুসৃত হইবে। আলোচনাধীন উক্তিটিতে দ্বিতীয়বারের আ'বুদু ক্রিয়াটির পরেই 'আবাদান (أبدا) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা অভ্রান্তরূপে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এখানে ক্রিয়াটি দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল বুঝান হইয়াছে। অতএব উক্তিটিতে প্রথমবার ব্যবহৃত ক্রিয়াটিকে বর্তমান কালের (حال) বুঝিতে হইবে। এই সকল সাধারণ নিয়ম অনুসারে মহানবী ﷺ-এর উক্তির (والله لا اعبد اللات والعزى والله لا اعبد أبدا...) নির্ভুল অনুবাদ হইবে ঃ

"By Allah! I do not worship al-Lat and al-Uzza; by Allah! I will never worship (them)".

"আল্লাহ্র শপথ, আমি আল-লাত ও আল-'উযযার উপাসনা করি না; আল্লাহ্র শপথ, আমি কখনও (তাহাদের) উপাসনা করিব না।"

প্রথমবার ব্যবহৃত ক্রিয়াটিকে সাধারণ বর্তমান কাল অর্থে বুঝিতে হইবে। কারণ দ্বিতীয়বারের ব্যবহারে ক্রিয়াটির সহিত 'আবদান' (أبدا) শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে এবং যেহেতু এইরূপ ধারণা করা সম্ভব নহে যে, মহানবী ﷺ শুধু এইটুকু বলিতেছিলেন যে, তিনি সেই মুহূর্তে ঐ সকল প্রতিমার উপাসনায় নিয়োজিত ছিলেন না, তাই উক্তিটির প্রথমার্ধ তাঁহার অভ্যাস ও কর্মের ঘোষণাস্বরূপ এবং দ্বিতীয়ার্ধ ভবিষ্যতে অনুরূপ করার জোরালো অস্বীকৃতিস্বরূপ মনে করিতে হইবে। অন্য কথায়, মহানবী ﷺ বলিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রতিমার উপাসনা করা তাঁহার কাজ নহে কিংবা তিনি কখনও উহাদের উপাসনা করিবেন না।

জেফারীর অনুবাদের দ্বিতীয় ত্রুটি 'লা...'আবদান' (لا ... أبدا) অভিব্যক্তির অর্থ উপেক্ষা করা বা এড়াইয়া যাওয়া যাহার অর্থ "কখনও নহে"। এই অভিব্যক্তিটির নির্ভুল অর্থ করার পরিবর্তে জেফারী এখানে "পুনরায়" শব্দটি আমদানী করিয়াছেন এবং ইহা অনুবাদের তৃতীয় ত্রুটি। সুতরাং তিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন ঃ "আমি পুনরায় উপাসনা করিব না"। আরবী ভাষায় 'আবাদান' শব্দের সহিত 'লা' শব্দ ব্যবহৃত হইলে উহার অবশ্যম্ভাবী অর্থ দাঁড়ায় "কখনও নহে", ইহার অর্থ কখনও "পুনরায়" হয় না। জেফারী এই তিন ধরনের অশুদ্ধ অনুবাদ করিয়াছেন—উভয় স্থানে ক্রিয়াপদকে ভবিষ্যত কাল অর্থে গণ্য করিয়াছেন, 'লা...আবাদান' অভিব্যক্তির অর্থ এড়াইয়া গিয়াছেন এবং উহার স্থলে "পুনরায়" শব্দটি আমদানী করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ পূর্বে ঐ সকল প্রতিমার উপাসনা করিতেন। এখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এখন হইতে তিনি "পুনরায়" উহা করিবেন না। মূল বাক্যের এইরূপ অর্থ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক।

মূলের অনুবাদে এই বিকৃতি সাধন ছাড়াও জেফারী বর্ণনার সর্বশেষ বাক্য, প্রতিবেশীর মন্তব্যঃ "ঐগুলি ছিল সেই প্রতিমা যাহাদের তাহারা উপাসনা করিত এবং তারপর শয্যা গ্রহণ করিত" মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্ত্রীর প্রতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত আপত্তি এড়াইবার জন্য এক কৈফিয়তের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, একজন আধুনিক লেখক দ্বি-বচন ও বহুবচন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন, "কিন্তু প্রাচীন কালে ইহা এইরূপ ছিল না"। তিনি আরও বলেন যে, সম্পূর্ণ হাদীছটিই অর্থহীন হইবে "যদি ইহা মুহাম্মাদ ও খাদীজার পরিবারের প্রতি নির্দেশ না করে এবং যদি চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে আমরা সর্বদাই বলিতে পারি যে, বহুবচন পরিবার বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে"।[৯৭]

ব্যাকরণগত আপত্তি উপেক্ষা করার জন্য জেফারী প্রদত্ত কৈফিয়ত একেবারে দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য। হাদীছ বর্ণনাকারিগণ আরবী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোটেও এত দুর্বল নহেন যে, তাহারা ক্রিয়াপদের দ্বি-বচন ও বহুবচন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ব্যাপারে অমনোযোগী হইবেন। জেফারী নিজেই তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার অবস্থানের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করিয়াছেন যখন তিনি বলেন, "যদি চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে আমরা সর্বদাই বলিতে পারি যে, বহুবচন পরিবার বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে"। হাঁ, বহুবচন পরিবার বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে তাহাতে খাদীজার পিতৃ-পরিবার অথবা সাধারণভাবে কুরায়শ পরিবার বুঝান হইয়াছে, বিবাহের পর খাদীজা ও তাঁহার স্বামী লইয়া গঠিত পরিবার নহে।

এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে সঠিকভাবে হাদীছটির তাৎপর্য সম্পর্কে জেফারীর মন্তব্যের নিকট আনয়ন করে। তিনি বলেন যে, হাদীছটি এক মুহূর্তের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারিক জীবনের পর্দা উন্মোচন করে এবং তখন হইতে তাঁহার "আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধিত হইতে থাকে যখন তাঁহার চারপাশের বিশুদ্ধতর ধর্ম অথবা হানীফ নামের সেই সকল ছায়াবৎ ব্যক্তিবর্গের প্রভাবে তিনি প্রতিমা উপাসনার অকার্যকারিতা অনুভব করিতে লাগিলেন"।[৯৮]

হাদীছটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পারিবারিক জীবনের পর্দা মুহূর্তের জন্য উন্মোচন করিতে পারে, কিন্তু ইহা বর্ণিত প্রভাবের অধীন তাঁহার কথিত বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সময় হইতে আসে নাই। কারণ যদি মহানবী ﷺ যে কোন সময়ের জন্য খাদীজার সহিত প্রতিমা উপাসনা করার পর পরবর্তীতে উহার প্রতি কোন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হইত তাহা হইলে তিনি (খাদীজা) তৎসম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত থাকিতেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে কথোপকথন ভিন্নরূপ ধারণ করিত। অন্ততপক্ষে খাদীজা (রা) এই বলিয়া বিষয়টি শেষ করিতেন না যে, "সেই আল-লাতের কথা ছাড়ুন, সেই আল-'উযযার কথা ছাড়ুন", বরং তাঁহার স্বামীর নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু ব্যাখ্যা জানিতে চাহিতেন। আর মহানবী ﷺ-ও যেভাবে উত্তর দিয়াছেন সেভাবে দিতেন না, বরং তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ উল্লেখ করিয়া অন্য কিছু শব্দের ব্যবহার করিতেন, বিশেষ করিয়া তিনি যখন তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথা বলিতেছিলেন। সুতরাং কথোপকথনের ধারা ও মর্ম হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, ইহা তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটিয়াছিল, যদি আদৌ ঘটিয়া থাকে, যখন মহানবী ﷺ প্রথমবারের মত এইরূপ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন যখন দেবদেবীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। খুব সম্ভব ইহা এমন এক সময় ঘটিয়াছিল যখন তিনি খাদীজার পৈত্রিক পরিবারের সহিত প্রথমবারের মত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন অথবা ইহা তাঁহাদের বিবাহের পর প্রথম এমন কোন বার্ষিকী ছিল যখন কুরায়শরা ঐসকল দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিত। ঘটনার এই ব্যাখ্যা যে, উহা তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটিয়াছিল, বর্ণনটির অন্য সবকিছুর সহিত সুন্দররূপে মিলিয়া যায়। ইহা, যেরূপ উপরে উক্ত হইয়াছে, মহানবী ﷺ-এর উক্তির সঠিক অর্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইবে এবং পূর্বাহ্নে কৃত নির্দিষ্ট কোন ধারণার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য নিজের সুবিধামত ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না। প্রাথমিক যুগের হাদীছ বর্ণনাকারিগণকে ব্যাকরণগত জ্ঞানের অজ্ঞতা সম্পর্কে দোষারোপ করার প্রয়োজন হইবে না অথবা বর্ণনাটি অন্যভাবে অর্থহীনও হইবে না যেরূপ জেফারী কল্পনা করিয়াছেন। বিবেচনার সকল নিয়ম অনুসারে বর্ণনাটি খাদীজার সহিত মহানবী ﷺ-এর বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের কোন এক পরিস্থিতির সহিত সম্পর্কিত হইবে।

হাদীছটি এমন এক সময়কার যখন মুহাম্মাদ ﷺ দেবদেবীর উপাসনাকে অর্থহীন বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছিলেন—জেফারী এইরূপ মন্তব্য দ্বারা কার্যত স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিশেষ বর্ণনাটি সম্পর্কে যতদূর বলা যায়, ইহা প্রমাণ করে যে, মহানবী ﷺ তখন হইতে দেব-দেবীকে ভক্তি করিতেন না এবং উহাদের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই স্বীকারোক্তি এবং সেই সঙ্গে এই বাস্তবতা যে, ঘটনাটি খাদীজার সহিত মহানবী ﷺ-এর বিবাহের খুব বেশী দিন পরের ছিল না—জেফারীর পূর্ববর্তী তিনটি যুক্তিকেও নাকচ করিয়া দেয়। কারণ যখন ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ অন্ততপক্ষে তাঁহার বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক পর্যায় হইতে দেবদেবীর উপাসনা অর্থহীন বলিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উক্ত উপাসনা ত্যাগ

করিয়াছিলেন তখন সঙ্গতিপূর্ণভাবে এই দাবি করা যায় না যে, তিনি তৎসত্ত্বেও তাঁহার সন্তানদের জন্মের পর দেবদেবীর নাম অনুসারে নামকরণ করিয়াছেন অথবা তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে কা'বাঘরে কালো পাথর পুনস্থাপনে মধ্যস্থতা করিয়া দেবদেবীর জন্য গৃহ নির্মাণে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা তিনি তখনও একজন মুশরিক ছিলেন যখন নিজ কন্যাদিগকে মুশরিকদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

অবশিষ্ট দুইটি বিষয় সম্পর্কে (ঙ ও চ) অর্থাৎ দেবদেবীকে প্রদত্ত মাংস গ্রহণে যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়লের অস্বীকৃতি সংক্রান্ত হাদীছ এবং যে হাদীছটিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী ﷺ একবার আল-'উযযার উদ্দেশ্যে একটি ধূসর বর্ণের মেষ উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই হাদীছটির বিষয়ে জেফারী নূতন কোন প্রমাণ বা মন্তব্য প্রদান করেন নাই। এই হাদীছ দুইটি ইতোপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।[৯৯] সুতরাং উহাদের সম্পর্কে আর কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্বে এই বিষয়ে ওয়াট-এর মতামত উল্লেখ করা দরকার। তিনি সম্ভবত তাহার পূর্বসূরীদের মতামতের ভিত্তিতে নিজের মত গঠন করিয়াছেন এবং উহাদের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। তৎকর্তৃক বিষয়টির আলোচনায় মোটামুটি তিনটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা, যাহার সব কয়টিই তাহার পূর্বসূরীদের, শনাক্ত করা যায়। তিনি সম্ভবত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কম বা বেশী পৌত্তলিক ছিলেন—এই ভ্রান্ত মতকে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই মতও গ্রহণ করেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে প্রচলিত "অস্পষ্ট একত্ববাদ", বিশেষ করিয়া হানীফদের উত্থান ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের প্রভাবের ফল ছিল এবং মুহাম্মাদ ﷺ সেই একত্ববাদ দ্বারা একেবারে অপ্রভাবিত ছিলেন না। তৃতীয়ত এবং আরও স্পষ্টত, ওয়াট তাহার গুরু আর. বেল (R. Bell)-এর মত গ্রহণ করেন, যিনি যে আয়াতগুলিকে কুরআনের প্রাথমিক আয়াতসমূহের বাণী বলিয়া মনে করেন সেইগুলির ভিত্তিতে, এই মত পোষণ করেন যে, এমনকি নবুওয়াতের প্রথম কয়েক বৎসর মুহাম্মাদ ﷺ প্রকাশ্যে অন্যান্য দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, বরং আল্লাহ্র "দয়া" ও দানের উপর জোর দিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহিতেন মাত্র।[১০০]

ওয়াট এই সকল চিন্তাধারাকে একত্র করিয়া মন্তব্য করেন যে, মহানবী ﷺ "শয়তানের কবিতা"র ঘটনা ও উহার বাতিলকরণ পর্যন্ত পৌত্তলিকতার সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করেন নাই। তিনি যাহাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে "ক্রমবিকাশের আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা" বলিয়া অভিহিত করেন সেই সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতগণের বোধশক্তির অভাবের ব্যাপারে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া ওয়াট লিখিয়াছেন, "সত্য কথা এই যে, তাঁহার অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত সমসাময়িকগণের ন্যায় তাঁহার একত্ববাদ মূলত কিছুটা অস্পষ্ট ছিল এবং বিশেষ করিয়া এতখানি কঠোর ছিল না যে, নিকৃষ্টতর সত্তার স্বীকৃতি উহার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি সম্ভবত আল-লাত, আল-'উযযা ও মানাতকে আল্লাহ অপেক্ষা নিম্নমানের স্বর্গীয় সত্তারূপে

মনে করিতেন—অনেকাংশে ঠিক যেরূপ ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম ফেরেশতাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দান করে"। ইহার পূর্বে, "মুহাম্মাদের নবুওয়াত ও প্রথম ওহী প্রাপ্তির পূর্বে কী ঘটিয়াছিল" সে সম্পর্কে বলিতে গিয়া ওয়াট লিখিয়াছেন, "ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভবত অস্পষ্ট একত্ববাদ ছিল যাহা সর্বাধিক আলোকিত মক্কাবাসীর মধ্যে দৃষ্ট হইত, তবে ইহার অতিরিক্ত তিনি সম্ভবত মক্কায় কোন প্রকার সংস্কারের প্রত্যাশী ছিলেন"।[১০২] ওয়াট তাহার নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী[১০৩] এই কথাগুলি লিখিবার সময় এতখানি সতর্ক ছিলেন না যেরূপ পরবর্তীতে তিনি সতর্ক হইয়াছিলেন যে, সর্বোচ্চ সত্তা হিসাবে আল্লাহ্‌র ধারণা প্রাক-ইসলামী যুগের আরবে প্রচলিত ছিল। তাই তাহার সর্বশেষ গ্রন্থে তাহার বক্তব্য নিম্নরূপে কিছুটা সংশোধন করেন ঃ[১০৪]

"প্রাক-ইসলামী যুগের ধর্ম সম্পর্কে কুরআনের সাক্ষ্য এবং শয়তানের কবিতার কাহিনী হইতে বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তে মুহাম্মাদের মূল বিশ্বাস সম্ভবত 'প্রধান গড' বা সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে ছিল, সেই সঙ্গে নিম্নমানের স্থানীয় দেবতাদের প্রতিও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যাহাদিগকে তিনি ফেরেশতা বলিয়া মনে করিতে পারেন, যাহারা সর্বোচ্চ সত্তার সহিত দেনদরবার করিতে পারিত। এমনকি এইরূপ একটি বর্ণনাও রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি একবার আল-'উযযার উদ্দেশ্যে একটি মেষ উৎসর্গ করিয়াছিলেন"।

ওয়াট-এর এই মন্তব্যসমূহ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক পর্যায়ের সহিত আরও স্পষ্টরূপে সম্পর্কিত। সুতরাং একটু পরেই সেই প্রসঙ্গে ঐগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইবে।[১০৫] এখানে শুধু এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, উক্ত মন্তব্যসমূহ ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নহে যে সম্পর্কে ওয়াট এতো সুপরিচিত।

প্রথমত, তিনি বলেন যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ধর্মের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল "অস্পষ্ট একত্ববাদ যাহা সর্বাধিক আলোকিত মক্কাবাসীর মধ্যে দৃষ্ট হইত"। একই সঙ্গে ওয়াট আরও বলেন যে, তথাকথিত "শয়তানের কবিতা"-র ঘটনা অর্থাৎ নবী হিসাবে তাঁহার ভূমিকার ৩-৪ বৎসর পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ কেবল নিম্নতর দেবতাদের স্বীকৃতিসহ অস্পষ্ট একত্ববাদ সম্পর্কে বলিতেন। ইহা ক্রমবিকাশ ধারণার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। কারণ নবী হিসাবে মুহাম্মাদের আবির্ভাব ইতোপূর্বে যাহা কিছু জ্ঞাত ছিল তদপেক্ষা তাঁহার পক্ষে নূতন ও উন্নততর কিছু চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। কেহই তাঁহার প্রতি কোন বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিত না এবং তাঁহার অনুসারী হইত না যদি তাঁহার ভাবধারা আলোকিত মক্কাবাসীদের তুলনায় সুস্পষ্টরূপে অগ্রগামী না হইত।

দ্বিতীয়ত, "সর্বাধিক আলোকিত মক্কাবাসী" বলিতে ওয়াট স্পষ্টত হানীফদের বুঝাইয়াছেন। কিন্তু তিনি শুধু বিভ্রান্তই হন যখন তিনি বলেন যে, তাহাদের একত্ববাদ "এতো কঠোর ছিল না যে, নিম্নতর সত্তাদের স্বীকৃতি উহার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া ভাবা হইত"। হানীফ নামের উক্ত আলোকিত ব্যক্তিগণের একত্ববাদ অস্পষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উহা সুস্পষ্ট ও অভ্রান্তরূপে প্রচলিত পৌত্তলিকতার একটি প্রতিক্রিয়া ও বিযুক্তি ছিল। উহা পৌত্তলিকতার কোন প্রশাখা ছিল না অথবা

কোনভাবেই "নিম্নতর সত্তাদের" ক্ষমতাও স্বীকার করিত না। ওয়াট হানীফদের অবস্থানের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন মহানবী ﷺ -এর প্রতি উক্ত অবস্থান স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে, আর এই উভয় প্রচেষ্টাই ক্রমবিকাশ ধারণার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে—হানীফদের সম্পর্কেও নহে অথবা মহানবী ﷺ সম্পর্কেও নহে।

তৃতীয়ত, ওয়াটের উপরে উদ্ধৃত উক্তিটির শেষ বাক্যে মহানবী ﷺ কর্তৃক আল-'উযযার উদ্দেশ্যে কথিত মেষ উৎসর্গ সম্পর্কিত হাদীছটির উল্লেখ রহিয়াছে যাহা ওয়াটের পূর্বসূরিগণও কিছু অন্যান্য বর্ণনার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। যেরূপ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই বর্ণনাটি বানোয়াট এবং বিশ্বাসের অযোগ্য।[১০৬] কিন্তু সেই কথা বাদ দিয়া, এমনকি বর্ণনার ভাষাও স্পষ্টত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির অনেক পূর্বের অবস্থার বর্ণনা করে। এই বর্ণনার উল্লেখ করিয়া ওয়াটের পূর্বসূরিগণ, বিশেষ করিয়া জেফারী অন্ততপক্ষে স্বীকার করিয়াছেন যে, নবুওয়াতের পূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এতখানি পরিবর্তন সাধিত হয় যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথা বলার সময় দ্ব্যর্থহীনভাবে আল-লাত ও আল-'উযযার উপাসনা প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং নবুওয়াত প্রাপ্তির পরেও মহানবী ﷺ আল-লাত ও আল-'উযযাকে স্বীকৃতি দান অব্যাহত রাখিয়াছিলেন—এই দাবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ওয়াট কর্তৃক এই বর্ণনাটির উল্লেখকরণ কাল নিরূপণের নিরিখে ভ্রান্তিমূলক এবং অন্যদের ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সহিত সঙ্গতিবিহীন উভয়ই। ইহাও উদ্দেশ্যমূলক যে, ওয়াট মহানবী ﷺ কর্তৃক আল-লাত ও আল-'উযযার উপাসনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন সংক্রান্ত অপর বর্ণনাটি আদৌ উল্লেখ করেন নাই যাহা ওয়াটের পূর্বসূরিগণ সুনির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুবাদ ঃ মু. আবদুল মান্নান

তথ্যসূত্র

১. W. Muis, The Life of Mahomet, ৩য় সংস্করণ, ১৮৯৩, পৃ. ১৭ (১ম সংস্করণ, খ.২, পৃ. ১২)।

২. D.S. Margholiouth, Mohammed and The Rise of Islam, ৩য় সংস্করণ, ১৯০৫, পৃ. ৫১।

৩. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৪. আত-তাবারী, ২ ঃ ২৭৯ (১/১১২৬-১১২৭)।

৫. Muir, পূর্বে উল্লিখিত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৮; ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৪-১৫; Margpliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫২।

৬. Muir, পূর্বে উল্লিখিত।

৭. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত।

৮. A. Guillaume, The Life of Muhaammed : A Trouslation of The Ishaq's Sisat Rasul Allah, ৫ম মুদ্রণ, করাচি, ১৯৫৮, পৃ. ৮১ টীকা।

৯. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৬৬।

১০. উদাহরণস্বরূপ, আত-তাবারীর বর্ণনা এবং ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়াহ ইত্যাদি, ২খ, ২৮৭-২৮৮-এর বর্ণনায় শব্দসমূহ তুলনীয়।

১১. ঐ, পৃ. ২৮৮। আরও দ্রষ্টব্য, মুহাম্মাদ আল-গাযালী, ফিকহুস-সীরাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ৭২-৭৩ টীকা।

১২. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭০।

১৩. মুসনাদ ৩খ, পৃ. ৩৯১; ৪খ, পৃ. ৬৭।

২৪. মুসনাদ ৩খ, পৃ. ৩৯১।

১৫. এই হাদীছ ও একই মর্মের অন্য কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, আহমাদ আবদুর রহমান আল-বান্না আস-সা'আতী, আল- ফাত্হুর রাব্বানী, অংশ ১৬, পৃ. ২১২-২১৩।

১৬. Muir, পূর্বে উল্লিখিত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২১ টীকা ১ (১ম সংস্করণ, ২খ., পৃ. ২০ টীকা)।

১৭. পরে, ১১শ ও ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৮. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৭।

১৯. ঐ, পৃ. ৫৮।

২০. W.M. Watt, Muhammad's Mecca : History in The Quran, Edinbusgh University pres, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮।

২১. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৫০।

২২. Watt, M., at M., পৃ. ৩৮।

২৩. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৮-৩৯।

২৪. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯।

২৫. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৬। দ্রষ্টব্য. তাহার পৃ. ৬৯-এ তাহার মন্তব্য যেখানে তিনি মহানবী ﷺ-এর যৌনক্ষমতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

২৬. উপরে দ্র. পৃ. ১৭৪।

২৭. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৭।

২৮. Watt, M. at M, পৃ. ৩৮।

২৯. উদাহরণস্বরূপ দ্র., ইব্ন কাছীর (৭০১-৭৪৭ হি.), আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (সম্পা. মুসতাফা 'আবদুল ওয়াহিদী), ১খ., বৈরূত, তা, বি. পৃ. ২৬৪; আল-হালাবী, ১খ., পৃ. ২২৯।

৩০. দ্র. ইব্ন হিশাম, ১খ., ১৯০, টীকা ৩ এবং সুহায়লী, ১খ., ২১৪।

৩১. বর্তমান লেখক স্বয়ং রিয়াদে ১৯৮৪ খৃ. তাঁহার এক বন্ধুর (একজন ভারতীয় নাগরিক) সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন যখন তাহার স্ত্রীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ছিল। একজন বৃটিশ মহিলাও

(গ্রীক বংশোদ্ভূত) কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডনে এক পুত্র সন্তানের জন্মদান করেন যখন তাহার বয়স চল্লিশ বৎসরের অনেক বেশী ছিল।

৩২. Muir কর্তৃক উল্লিখিত, পূর্বে উল্লিখিত, ২খ., পৃ. ২৪, টীকা।

৩৩. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ২৩-২৪ (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৩)।

৩৪. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., ১৩৩; আল-ওয়াকিদী লিখিয়াছেন ঃ

فهٰذا كله عندنا غلط ووهل واثب عندنا المحفوظ عن اهل العلم ان اباها خويلد بن اسد مات قبل الفجار وان عمها عمرو بن اسد زوجها رسول الله ﷺ.

৩৫. আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., ২৮২ (১/১১২৯)।

৩৬. দ্র. আস-সুহায়লী, ১খ., ২১৪।

৩৭. Muir, পূর্বে উল্লিখিত, ১ম সংস্করণ, ২খ., ২৪-২৫।

৩৮. তাকরীবুত-তাহ্‌যীব, ২খ., ৩৪০।

৩৯. উপরে পৃ. ১৬৪-১৬৬ দ্র.।

৪০. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৯-৭০।

৪১. ঐ লেখক, পৃ. ৭০, মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ২২২-এর বরাতে।

৪২. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭০, Wellhausen, Reste, পৃ. ৩৪-এর বরাতে।

৪৩. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭০, মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ১৮৯-এর বরাতে।

৪৪. Margoliouth, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৯।

৪৫. নিম্নে, পৃ. ২০৪-২১০।

৪৬. মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ২২২।

৪৭. অনেক পণ্ডিতই এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ দ্র. আকরাম খান, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩০৫।

৪৮. অর্থাৎ J. Wellhausen, Reste Arabischen Hidentums, ২য় সংস্করণ, বার্লিন ১৮৯৭ খৃ.।

৪৯. ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১১৬।

৫০. আবুল মুনযির হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনিস সাইব আল-কালবী (মৃ. ২০৪/২০৬ হি.), কিতাবুল আসনাম, সম্পা. আহমাদ যাকী পাশা, কায়রো ১৯১৪ খৃ.। বিশেষভাবে তুলনীয় আবুল মুনযিরের পৃ. ১৮-১৯-এর সহিত ইয়াকূতের মূলপাঠ। আবুল মুনযির কর্তৃক আল-'উযযার বর্ণনা তাহার গ্রন্থের পৃ. ১৭-২৭ ব্যাপী বিস্তৃত।

৫১. ইব্‌ন হিব্বান (মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহমাদ আবূ হাশিম আত-তামীমী আল-বুসতী, মৃ. ৩৫৪ হি.), কিতাবুল মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিছীন ওয়া দু'আফা' ওয়াল-মাতরূকীন, ১-৩ খণ্ড (সম্পা. মুহাম্মাদ ইবরাহীম যায়দ), আলেপ্পো ১৩৯৬ হি., ৩খ. পৃ. ৯১।

৫২. ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, লিসানুল মীযান, ৬খ., ৩য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৯৬ (নং ৭০০)।

৫৩. আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (সম্পা. 'আলী মুহাম্মাদ আল-বুখারী) ৬খ., দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত, পৃ. ৩০৪-৩০৫। আরও দ্র., আল-মুগনী ফীদ দু'আফা' আল-কাবীর (সম্পা. নূরুদ্দীন 'আসীর), তা.বি, ২খ., পৃ. ৭১১, নং ৬৭৫৬।

৫৪. আরও দ্র. আল-'আকীল (আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন হাম্মাদ), কিতাবুদ দু'আফা' আল-কাবীর (সম্পা. 'আব্দুল মু'তী আমীন কাল'আজী), প্রথম মুদ্রণ, বৈরূত, তা.বি., পৃ. ৩৩৯, নং ১৯৪৫; আহমাদ যাকী পাশার কিতাবুল আসনাম-এর ভূমিকা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭; তাহযীবুত তাহযীব, ১২খ, পৃ. ২৬৯।

৫৫. কিতাবুল আসনাম, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২১।

৫৬. আল-মুসনাদ, ১খ, পৃ. ১৮৯-১৯০, নং ১৬৪৮ (Margoliouth, উপরে উল্লিখিত, পৃ. ৭০)।

৫৭. তিনি একজন হানীফ এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন, আল-খাত্তাব এবং 'আমর উভয় সহোদর ভাই ছিলেন। তাহাদের পিতা নুফায়ল ইব্ন 'আবদিল 'উযযা, কা'ব ইব্ন লুআয়্যি-এর ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ ছিলেন।

৫৮. উদাহরণস্বরূপ দ্র. আল-মুসনাদ ছাড়াও, বুখারী, নং ৩৮২৬ ও ৫৪৯৯; আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ১খ., দ্বিতীয় মুদ্রণ, তা,বি, পৃ. ১৫১ এবং ৫খ., পৃ. ৮৬-৮৭; আল-বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ ইত্যাদি, ২খ., বৈরূত ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১২০-১২৮, ১৪৪; আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা' খণ্ড ১, বৈরূত ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ২২০-২২২; আল-হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়াইদ ইত্যাদি, বৈরূত, ১৯৮৬ খৃ., ৯খ., পৃ. ৪২০-৪২১। নাসাঈ কর্তৃকও তাঁহার মানাকিব অংশে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও দ্র. আয-যাহাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (সম্পা. 'উমার 'আবদুস সালাম তাদমুরী), প্রথম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ৮৫-৯২, এখানে বর্ণনাটির প্রায় সবকয়টি বিভিন্নরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫৯. আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ১খ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৫১, পাদটীকা।

৬০. পূর্বোক্ত বরাত, আরও দ্র. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১খ, পৃ. ২২২।

৬১. আত-তাবারানী, পূর্বে উল্লিখিত, ৫খ, পৃ. ৮৬, টীকা।

৬২. পূর্বোক্ত বরাত।

৬৩. মুহিব্বুল্লা শাহ, আত-তাবারানীতে উদ্ধৃত, পূর্বে উল্লিখিত, ১খ., পৃ. ১৫১, টীকা। আরও দ্র. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী কর্তৃক মুহাম্মাদ আল-গাযালীর ফিক্হুস সীরা-এ মন্তব্য, ৭ম মুদ্রণ, ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ৮৬-৮৭, টীকা।

৬৪. আল-বায়হাকী, দালাইল ইত্যাদি, ২খ, প্রথম মুদ্রণ, বৈরূত, ১৯৮৫/১৪০৫, পৃ. ১২৩-১২৪।

৬৫. বুখারী, নং ৩৮২৬, মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

حدثنا... ان النبى ﷺ لقى زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح قبل ان ينزل على النبى ﷺ الوحى فقدمت الى النبى ﷺ سفرة فابى ان يأكل منه ثم قال زيد انى لست اكل مما تذبحون على انصابكم...

৬৬. এই বর্ণনার উপর মন্তব্যের জন্য দ্র. ফাতহুল বারী, তৃতীয় মুদ্রণ, ৮খ., পৃ. ১৭৬-১৭৮ এবং ৯খ, পৃ. ৬৩০-৬৩১।

৬৭. তু. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', ১খ, পৃ. ২২০-২২১ এবং তাঁহার আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮১, ৮৭-৮৮; এবং আত-তাবারানী, পূর্বে উল্লিখিত, ৫খ, পৃ. ৮৬-৮৭ (নং ৪৬৬৩ ও ৪৬৬৫)।

৬৮. উপরে পৃ. ১৯৬ দ্র.।

৬৯. উদাহরণস্বরূপ দ্র. আল-মুসনাদ, ১খ, পৃ. ৩০৭, ৩২৯, ৩৭৩; ২খ, পৃ. ২১৩, ২১৪; ৩খ, ২৭৭; তিরমিযী, নং ৮৭৭, ৮৭৮; নাসাঈ, নং ২৯৩৫। আরও দ্র. মুহাম্মাদ তায়্যিব আন-নাজ্জার, আল-কাওলুল মুবীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, রিয়াদ ১৯৮১ খৃ., পৃ. ২১-২৬, ইহাতে বিভিন্ন হাদীছ উদ্ধৃত ও আলোচনা করা হইয়াছে।

৭০. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ইত্যাদি, ১খ, পৃ. ৮২।

৭১. MW, পৃ. ২০, ১৯৩০, ২২৬-২৩৪।

৭২. ঐ, পৃ. ২২৬।

৭৩. ঐ, পৃ. ২২৭-২২৮।

৭৪। জেফারী লিখিয়াছেন, "আল-কাতাদা" যাহা ভুল। নামটি হইবে শুধু কাতাদা।

৭৫. Jeffery, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২২৮-২২৯।

৭৬. ঐ, পৃ. ২২৯-২৩০।

৭৭. ঐ, পৃ. ২৩০-২৩১।

৭৮. ঐ, পৃ. ২৩১-২৩২।

৭৯. ঐ, পৃ. ২৩২-২৩৩।

৮০. ঐ, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

৮১. নবদীক্ষিত ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ সফিউল্লাহ (তাঁহার পূর্বনাম ছিল পরেশ চন্দ্র শীল), পিতা শ্রী সুকুমার চন্দ্র শীল, গ্রাম ঃ গাবুয়া, ডাকঘর ঃ মানকরন, বদরপুর, জেলা ঃ পটুয়াখালী।

৮২. মুতাহ্হার ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী (মৃ. ৩৫৫ হি.), 'কিতাবুল বাদ' ওয়াত-তারীখ, সম্পা, Huart, প্যারিস ১৮৯৯ খৃ., পুনর্মুদ্রণ, বৈরুত ১৯১৯ খৃ., পৃ. ১৩৯।

৮৩. তাহযীবুত তাহযীব, ৮খ, ৩৫১-৩৫৬, বিশেষ করিয়া পৃ. ৩৫৬।

৮৪. পরবর্তী টীকা দ্র.।

৮৫. আল-মাকদিসী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৩৯। আরবী মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وفى رواية سعيد بن ابى عروبة عن قتادة انها ولدت لرسول الله ﷺ عبد مناف فى الجاهلية وولدت له فى الاسلام غلامين واربع بنات القاسم وعبد الله فمات صغيرين وفى كتاب ابن اسحاق ان ابنيه هلكا فى الجاهلية وان بناته ادركن الاسلام وهاجرن والله اعلم .

৮৬. আল-হাফিয 'আলাউদ্দীন মুগালতাঈ ইব্‌ন কুলায়য (মৃ. ৭২৬ হি.), সীরাত মুগালতাঈ, কায়রো মুদ্রণ ১৩২৬ হি. পৃ. ১২।

৮৭. আরও দ্র., হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান আদ-দিয়ার বাকরী (মৃ. ৯৬৬ হি.), তারীখুল খামীস, বৈরূত, তা. বি. খণ্ড ১, পৃ. ২৬৩।

৮৮. ইব্‌ন 'আসাকির, মুগালতাঈ কর্তৃক উদ্ধৃত, আয-যাহরুল বাসিম, পাণ্ডুলিপি, লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় or. ৩৭০ (ফটোকপি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত), ফলিও ৯৬।

৮৯. আল-মাকদিসী, পূর্বে উল্লিখিত।

৯০. এখানে উল্লেখ্য যে, হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া (মৃ. ১৪৬ হি.) হইতে অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা রহিয়াছে যেখানে উক্ত হইয়াছে যে, খাদীজা (রা) ইসলামের পূর্বে মহানবী ﷺ-এর ঔরসে দুইটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়াছেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে 'আবদুল 'উযযা ও আল-কাসিম, কিন্তু উভয়েই ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইনতিকাল করেন (বুখারী, আত-তারীখুস সাগীর, সম্পা. মাহমূদ ইবরাহীম যায়দ, কায়রো ১৩৯৭/১৯৭৭, খ১, পৃ. ৪)। এই বর্ণনাটিও এই কারণে অবিশ্বাস্য যে, ইহা প্রয়োগগতভাবে মু'দাল অর্থাৎ হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার পূর্ববর্তী ইহার একাধিক বর্ণনাকারীর উল্লেখ নাই। অন্যদিকে তাহার পরবর্তী কয়েকজন, যেমন ইসমাঈল (ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উওয়ায়স) নির্ভরযোগ্য নহেন (দ্র., তাহযীবুত তাহযীব, ১খ, পৃ. ৩১০, নং ৫৬৮)।

৯১. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, পৃ. ৫১।

৯২. দ্র. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, পৃ. ৮৩-৮৫; ইবনুল কালবী, কিতাবুল আসনাম, পৃ. ১৩, ১৬, ৪৪; ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, ৪খ., ১৬; ৫খ, পৃ. ৪, ২০৪।

৯৩. ইবনুল কালবী, কিতাবুল আসনাম, পৃ. ৪৪-৪৫; ইব্‌ন হিশাম, ১খ, পৃ. ৮৩।

৯৪. বুখারী, নং ৪৩৫৫, ৪৩৫৬, ৪৩৫৭।

৯৫. উপরে দ্র., পৃ. ১৯৬-২০০।

৯৬. Jeffery, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩১।

৯৭. ঐ, পৃ. ২৩২।

৯৮. ঐ, পৃ. ২৩১।

৯৯. উপরে দ্র., পৃ. ১৯৭-২০১।

১০০. R. Bell, "The Beginnig of Muhammad's Religious Activities", T.G.U.O.S., VII, ১৬-২৪, বিশেষ করিয়া পৃ. ২০।

১০১. Watt, Muhammad' at Mecca, পৃ. ১০৪।

১০২. ঐ, পৃ. ৪৪।

১০৩. Watt, Muhammad's Mecca, Edinburgh 1988, Preface, vii.

১০৪. ঐ, পৃ. ৪৯।

১০৫. নীচে, অধ্যায় ২৩ দ্র.।

১০৬. উপরে দ্র. পৃ. ১৯৭-১৯৯।

নবম অধ্যায়

হারবুল ফিজার এবং হিলফুল ফুযূল সম্পর্কে ওয়াটের তত্ত্ব

হারবুল ফিজার এবং হিলফুল ফুযূল সম্পর্কে ওয়াট একটি নূতন তত্ত্ব উপস্থাপন করিয়াছেন। মহানবী ﷺ -এর শৈশব ও প্রথম যৌবনকালে মক্কা নগরীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা ছিল এই হারবুল ফিজার এবং হিল্‌ফুল ফুযূল সম্পর্কিত ঘটনা। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওয়াট ধরিয়া লইয়াছিল যে, কুরায়শ গোত্রের দুইটি দলের দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছিল। হারবুল ফিজার এবং হিল্‌ফুল ফুযূল সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কুরায়শ গোত্রের এই দুই দলের মধ্যে কেবল বাণিজ্য ক্ষেত্রেই নিজেদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল তাহাই নহে, বরং অপরদিকে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী দুইটি পক্ষ ছিল উত্তরে হীরা-পারস্য এবং দক্ষিণে ইয়ামান, যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃহত্তর পরিসরে ধর্মীয় স্বার্থ, বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থ লইয়া বায়যান্টাইন ও পারসিক সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং এই দুই দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ওয়াটের মতে, এই ফিজারের যুদ্ধ শক্তিশালী কুরায়শ গোত্র এবং হীরা-পারস্যের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফল। সেই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন ঃ

(ক) হিল্‌ফুল ফুযূল ছিল "মুতায়্যাবূন-এর পরবর্তী কালের উদ্ভাবন" অর্থাৎ তথাকথিত দুর্বলতর গোত্রের এবং "অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের প্রতিরোধ নয়"।[১]

(খ) ইহা ছিল আব্‌দ শাম্‌স এবং নাওফালের মত শক্তিশালী গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত[২] এবং

(গ) গোত্রের মধ্যকার শক্তিশালী দল যাহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একচ্ছত্রভাবে দখল করিয়া লইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে দুর্বলতর দলের প্রচেষ্টা ও সেই দলেরই প্রতিনিধিত্বকারী।[৩]

ওয়াট যে ধারণা পোষণ করিতেন নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল ঃ সাধারণ আন্তর্জাতিক অবস্থা, বিশেষ করিয়া পারস্য সাম্রাজ্য ও বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা সর্বজনবিদিত এবং ইহাকে ইসলামের জাগরণের কারণ হিসাবে ইতোপূর্বে অনেক পণ্ডিতই তুলিয়া ধরিয়াছেন;[৪] কিন্তু এই অবস্থা হইতে ওয়াট যে পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহা অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

তিনি বলেন যে, জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর (৫৬৫ খৃ.) পর পারস্য সাম্রাজ্য ও বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যকার বিরোধ "চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়" এবং ৫৭০ অথবা ৫৮৫ সালের মধ্যে পারসিকরা আরবভূমি হইতে আবিসিনীয়দেরকে বিতাড়িত করে অর্থাৎ ইয়ামান হইতে বিতাড়িত করে। আবিসিনীয়রা ছিল বায়যান্টীয়দের মিত্র। পারসিকরা অতঃপর ইয়ামানে তাহাদের তাবেদার রাজত্ব কায়েম করে, "যদিও রাজধানী হইতে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না",[৫] এই কথা বলিয়া তিনি বলেন যে, ইয়ামানের উপর পারসিকদের যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তেমন কার্যকর হয় নাই। এই বক্তব্য রাখার পরই ওয়াট বলেন, "আল-হীরার লাখমী যুবরাজদের সহায়তায় পারসিকরা ইয়ামান হইতে পারস্যে বাণিজ্য বহর স্থলপথে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল"। অতঃপর তাহার সর্বশেষ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তিনি আরেও বলেন যে, "আল-হীরা হইতে ইয়ামানে প্রেরিত পারস্যের বাণিজ্য কাফেলার কারণেই ফিজারের যুদ্ধ ও যূকারের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল"।[৬]

এখন লক্ষণীয় যে, হীরার ক্ষুদ্র রাজত্ব পারস্য সীমান্তে অবস্থিত ছিল এবং ইহার অধীনস্থ ছিল; কিন্তু ইয়ামান ও এই রাজ্যের মধ্যবর্তী যে এলাকা উহা বিশাল আরব ভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং আরব উপদ্বীপের উপর পারস্যের কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না। তাহা ব্যতীত পারস্যের বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের কারণে কোন যূকারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, অথচ ওয়াট স্পষ্টভাবে সেই কথাই বলিয়াছেন। হীরার যুবরাজ নু'মান ইবনুল মুনযির এবং পারস্যের শাসকের মধ্যে যে ব্যক্তিগত মতবিরোধ ছিল তাহার কারণেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অথবা বলা চলে, আল-হীরা নিয়ন্ত্রণ করার পারসিক অভিলাষের কারণেই এই যুদ্ধ হইয়াছিল।[৭] অন্যদিকে ফিজার যুদ্ধের কথা বলিতে গিয়া ওয়াট সাহেব তাহার বক্তব্যে অনেক সত্যকে বিকৃত করিয়াছেন।

প্রথমত, চতুর্থ ফিজার যুদ্ধের কারণ হিসাবে যে বাণিজ্য বহরের কথা বলা হইয়াছে সেই বাণিজ্য বহর পারস্যের পক্ষ হইতে অথবা তাহাদের স্বার্থ নু'মান ইবনুল মুনযির কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।[৮]

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য বহর প্রেরিত হইয়াছিল তায়েফের নিকটবর্তী 'উকায মেলায় যোগদানের উদ্দেশ্যে, ইয়ামানের উদ্দেশ্যে নয়। কোন ঐতিহাসিক সামান্যতম ইঙ্গিতও দেন নাই যে, বাণিজ্য বহর সেই দেশের উদ্দেশ্যে গিয়াছিল।

তৃতীয়ত, চতুর্থ ফিজার যুদ্ধের কারণ হিসাবে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাকেই সকল যুদ্ধের সাধারণ কারণ হিসাবে ফিজার যুদ্ধগুলি ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইতোপূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল তিনটি যুদ্ধ এবং প্রতিটি যুদ্ধের কারণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্যক্রমের সঙ্গে ইহার কোনটির কোন সম্পর্ক ছিল না।

চতুর্থত, বিরোধপূর্ণ কার্যাবলীর ফলে শেষাবধি যে চতুর্থ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল উহা নু'মানের বাণিজ্য বহরের উপর আক্রমণ হিসাবে পরিচালিত হয় নাই, হীরার কোন একজন

সওদাগরের উপরও হয় নাই, হইয়াছিল তায়েফের একজন বাসিন্দা উরওয়াহর উপর। সে ছিল মক্কার বাররাদ-এর ব্যক্তিগত পক্ষ। উরওয়াহ তাহার বাণিজ্য বহরের জামিনদার হইয়া তাহাকে ঠকাইয়াছিল। তায়েফে যে বাণিজ্য বহর আসিতেছিল ইহারা দুইজনই তাহার পক্ষের লোক ছিল।

ইয়ামান হইতে পারস্যে স্থলপথে বাণিজ্য বহর প্রেরণের পারসিকদের প্রচেষ্টা, এই তত্ত্ব কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ওয়াটের আপন বক্তব্য হইতেও ইহার দুর্বলতা ধরা পড়ে। ধরা পড়ে যখন তিনি নিজেই কিছু পূর্বে বলেন যে, ইয়ামান সরকারের উপর তাহাদের তেমন কোন কর্তৃত্ব ছিল না অর্থাৎ পারস্য সরকারের কোন কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল না। একই কথা তিনি কয়েক পৃষ্ঠা পরে নিজেই লিখিয়াছেন। সেই স্থানে বলিয়াছেন, "মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিজয় (পারস্য কর্তৃক ইয়ামান বিজয়) সমুদ্রপথে সাধিত হইয়াছিল এবং সেই কারণে এই অঞ্চল তাহাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় নাই। অপরপক্ষে সমগ্র আরবভূমি বা আরব উপদ্বীপ পারসিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না"।[৯] ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে একজন কী করিয়া বলেন যে, পারস্য চেষ্টা করিয়াছিল স্থলপথে বাণিজ্য বহর ইয়ামান হইতে পারস্যে প্রেরণ করিতে যেখানে সমগ্র ভূভাগ, যাহার উপর দিয়া বাণিজ্য বহর যাইবে সেইটি তাহাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে অবস্থিত ছিল? সে যদি সত্যই ইয়ামানের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক আমদানী বা রপ্তানী পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক থাকিত তবে তাহা অবশ্যই সমুদ্রপথ তাহার জন্য অধিকতর নিরাপদ মনে হইত অথবা বিকল্প পথ হিসাবে আরবের পূর্ব উপকূল পথ তাহার জন্য অনেক বেশী আকর্ষণীয় হইতে পারিত, আরবের পশ্চিম দিক ঘুরিয়া এবং হীরার প্রতিনিধির মাধ্যমে নহে।

ওয়াটের তত্ত্ব বর্ণনায় ফিরিয়া আসা যাক। তিনি তাহার এই তত্ত্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করিয়াই পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলিতেছেন, "দুই দৈত্যের সংগ্রামের মাঝে মক্কার অবস্থান কী হইতে পারে"? উত্তর নিজেই দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, ইব্‌ন কুতায়বার একটি মন্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কুসায়্যি যিনি মক্কা শরীফে বানূ খুযা'আর বিরুদ্ধে কুরায়শদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি গাস্‌সানীদের অথবা অন্যান্য বায়যান্টীয়দের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং কুসায়্যির এই "মক্কা বিজয়"-এর সঙ্গে এই নগরের সিরিয়ার বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কিত। ওয়াট আরও বলেন, "কুসায়্যির পরে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ইয়ামান হইতে মক্কা পর্যন্ত স্থলপথ প্রধানত ইয়ামানীদের দখলেই ছিল, বিশেষ করিয়া একজন ইয়ামানী সওদাগর ফুদূল কনফেডারেসি গঠিত হইবার সময় মক্কায় সওদা লইয়া আসিয়াছিলেন (৫৮০ খৃ.)। যদি মক্কার বাণিজ্য প্রধানত উত্তরের সঙ্গে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ইহাকে বায়যান্টাইন ও তাহার মিত্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখিতেই হইবে"।[১০]

এখন আমরা বায়যান্টাইন এবং মক্কার মধ্যে যে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল সেই ধারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি দেখিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না অথবা উত্তরমুখী

বাণিজ্যের স্বার্থে "বায়যান্টাইন ও তাহার মিত্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখিতেই হইবে" এই বিষয়ে কোন আপত্তি তুলিতেছি না। আমরা ইহাও অনুধাবন করি যে, ইয়ামান হইতে মক্কা পর্যন্ত স্থলপথ "প্রধানত ইয়ামানীদের দখলে"ই থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু ওয়াট সাহেব যেভাবে বলেন, "কিছু দিনের জন্য" তাহা সত্য নয়, বরং শত শত বৎসর যাবৎ সেই কুসায়্যির সময় হইতে এই পথ তাহাদের দখলেই ছিল। কারণ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর যৌবনকালে যখন হিল্‌ফুল ফুযূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন পর্যন্ত এই পথ ইয়ামানীদের দখলেই ছিল। ওয়াট সাহেব সেই কথাই বলিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কুসায়্যির অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। তাহা ব্যতীত ওয়াট সাহেব হিলফের তারিখ হিসাবে যে ৫৮০ খৃ. -এর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও ঠিক নহে। হিল্‌ফ সংগঠিত হইবার সময় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর যৌবন কাল। তখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসরের অধিক। যে সভায় এই হিল্‌ফুল ফুযূল সংগঠিত হইয়াছিল তিনিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই তথ্য প্রমাণ করে যে, তখন সময়কাল ছিল কমপক্ষে ৫৯০ খৃ.।

কিন্তু ওয়াট সাহেব ইহার পর যে কথা বলিয়াছেন তাহা রীতিমত বিভ্রান্তিকর। বায়যানটীয়দের সঙ্গে কুরায়শদের সুসম্পর্ক বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি পুনরায় আবিসিনিয়া কর্তৃক ইয়ামান বিজয়ের কথা বলিয়াছেন, অতঃপর আরও জোর দিয়া বলিয়াছেন, যেহেতু আবিসিনিয়া ও বায়যান্টাইনের মধ্যকার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তাই এই সময় "তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ হওয়ায় মক্কাবাসীরা তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিতে পারিয়াছিল এবং চারিদিকে তাহাদের বাণিজ্য বহর পাঠাইয়াছিল"।[১১] এই অবধি অগ্রসর হইয়া একদিকে মক্কা এবং অন্যদিকে আবিসিনিয়া ও বায়যানটাইনের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের তত্ত্ব উত্থাপন করিয়া ওয়াট সাহেব নিজেই এক চরম সত্যের মুখোমুখি হইতেছেন এবং দেখিতে পাইতেছেন যে, আবিসিনিয়ার ভাইসরয় আবরাহা মক্কা আক্রমণ করিতেছে। তখন তিনি দ্রুত পরিবর্তিত সুরে বলিতেছেন, যাহা হউক "আবিসিনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের নিশ্চয় অবনতি ঘটিয়াছিল, ইয়ামান অধিকারের শেষের দিকে আবরাহা মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন"। ওয়াট সাহেবের অনুমিত আবিসিনিয়া সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতির কারণ হিসাবে কোন ইঙ্গিতই তিনি দিলেন না।

অনেকের মত ওয়াট সাহেবও বরাত দিয়া থাকেন যে, ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যেই আবরাহার আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল, ইহার পর আবদুল মুত্তালিবের আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একটি দূর সম্পর্কীয় ও অযৌক্তিক ধারণার উল্লেখ করিয়া বলেন, যাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আবদুল মুত্তালিব নাকি কুরায়শদিগের মধ্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১২] প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যে ছিল আবদুস শাম্‌স, নাওফাল ও মাখযূম গোত্র। বাহ্যত প্রথম দুই গোত্র ইতোমধ্যে সিরিয়া ও ইয়ামানের বাণিজ্যের অধিকাংশই হস্তগত করিয়াছিল. যাহা ইতোপূর্বে হাশিম ও আল-মুত্তালিবের দখলে ছিল।[১৩]

এই সর্বশেষ মন্তব্য করার পূর্বে ওয়াট কেবল মক্কার সঙ্গে বায়যানটীয়দের ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বের কথা বলিয়াছেন। সেই স্থলে তিনি বিশেষ করিয়া আব্দ মানাফের চার পুত্রের কথা বলিয়াছেন ঃ আব্দ শাম্স, হাশিম, আল-মুত্তালিব ও নাওফাল। তাহারা যথাক্রমে আবিসিনিয়া, সিরিয়া, ইয়ামান ও ইরাকের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কোথাও এক পক্ষে হাশিম ও আল-মুত্তালিবের পুত্রগণ এবং অপর পক্ষে আব্দ শাসম ও নাওফালের পুত্রগণের মধ্যে বাণিজ্য লইয়া প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ কোন একটি ঘটনারও উল্লেখ করেন নাই। এখন আকস্মিকভাবে যখন তিনি দেখিলেন, আবরাহার আক্রমণ একটি সত্য ঘটনা তখন তিনি অনুমান করিলেন যে, অনুরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। তিনি সেই স্থলে "আবরাহার সঙ্গে আবদুল মুত্তালিবের আলাপ-আলোচনার মধ্যে" স্বার্থপরতার গন্ধ আবিষ্কার করিলেন। অতঃপর এই সর্বশেষ ধারণার বশবর্তী হইয়া অনুমান করিতে ব্রতী হইলেন যে, আব্দ শাম্স ও নাওফালের বংশধরগণ " ইতোমধ্যে বাহ্যত সিরিয়া ও ইয়ামানের সকল বাণিজ্য বাজার দখল করিয়া লইয়াছিল, যাহা কিনা এক সময় হাশিম ও আল-মুত্তালিবের অধিকারে ছিল"। সত্যই যদি আবিসিনিয়ার সহিত সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াই থাকে যাহার কারণে আবরাহার আক্রমণ, প্রকৃতই সম্পর্কের অবনতি হইয়াছিল এবং ওয়াট তাহাও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আব্দ শাম্স ও নাওফাল গোত্র সেই একই সময় হাশিম ও আল-মুত্তালিব গোত্রকে আবিসিনিয়া ও ইয়ামানের বাণিজ্য হইতে বহিষ্কার করিতে উদ্যত হইবে, ইহা রীতিমত বিভ্রান্তিকর। আগেই দেখানো হইয়াছে যে,[১৪] আবদুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে ওয়াটের অভিযোগ যুক্তিতে টিকে না।

ওয়াটের মতে তথাকথিত ধনী কুরায়শ গোত্রগুলির মনোভাব সম্পর্কে তাহার মন্তব্য অধিকতর বিভ্রান্তিকর। ওয়াট বলেন, "আবিসিনিয়ার পক্ষে আবদুল মুত্তালিবের নীতির বিপক্ষে ধনী গোত্রগুলি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিত, কারণ উহাই ছিল তাহাদের সর্বাধিক স্বার্থের অনুকূল"।[১৫] এই ক্ষেত্রে যে কেহ প্রশ্ন তুলিতে প্রলুব্ধ হইতে পারেন যে, নিরপেক্ষতা কিসের প্রতি অথবা কাহার প্রতি? ওয়াটের অনুমান মত আবদুল মুত্তালিব যদি চাহিতেন তবে আবিসিনীয়দের সহায়তায় তাহার প্রতিপক্ষ ধনী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে সকল কিছু উল্টাইয়া ফেলিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের নিরপেক্ষ থাকার ফলে তাহাদের স্বার্থ কি প্রকারে রক্ষিত হইত? এবং নিরপেক্ষ থাকিবার কারণে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইত অধিক। অন্যদিকে আবরাহা আসিয়াছিল কা'বা শরীফ ও বাণিজ্যে মক্কার প্রাধান্য ধ্বংস করিতে। সেই ক্ষেত্রে মক্কার ধনিক গোত্রগুলির সহিত বায়যানটীয়দের যতই সদ্ভাব থাকুক না কেন তাহারা কি প্রকারে এই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে? পারসিকগণ তখনও দৃশ্যপটে আসে নাই। ফলে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে নিরপেক্ষ থাকিবার প্রশ্নও আসিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি আব্দ শাম্স্ ও অন্যান্য গোত্রের 'নিরপেক্ষ নীতি' বলিতে কি বুঝাইয়াছেন উহার মাথামুণ্ড বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে।

ওয়াট সাহেব আরও বলিয়াছেন, "যখন পারসিকগণ দক্ষিণ আরব জয় করিয়া লইল তখন মক্কার জন্য নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা অধিকতর জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল"।[১৬] ওয়াটের এই

ব্যাখ্যাটি দ্বারা বোধগম্য হয় যে, তিনি যখন ইতোপূর্বে নিরপেক্ষতার কথা বলিয়াছিলেন তখন তাহার নিকট পারস্য বিবেচনাধীন ছিল না। অতএব সেই স্থলে নিরপেক্ষতা বলিতে তিনি বায়যানটীয়দের সঙ্গে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাই বুঝাইয়াছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর তিনি বলিয়াছেন যে, আরব ভূভাগে পারস্যের অবস্থান যাহা ছিল তাহাতে মনে হয় না যে, মক্কার নিরপেক্ষ থাকিবার সেইরূপ কোন প্রয়োজন ছিল। কারণ উপরিউক্ত বক্তব্য রাখিবার পরই ওয়াট সাহেব পাঠকের দৃষ্টি দক্ষিণ আরবে পারস্যের প্রভাব যে মোটেই কার্যকর নহে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া বলেন, "যেহেতু অধিকাংশ আরবভূমি তাহাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না" সেইহেতু "মক্কাবাসিগণ এই অবস্থার সুযোগে নিজেদের শক্তিকে সুসংহত করিয়া লইয়াছিল"। এই প্রকারে তিনি পরবর্তী বিবৃতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পুনরায় ফিজার যুদ্ধের উৎপত্তি সম্পর্কিত তাহার অনুমান উপস্থাপন করিয়া বলেন, 'ফিজারের যুদ্ধ, যাহা সম্ভবত আরম্ভ হইয়াছিল আবিসিনীয়দের উৎখাত করিবার পরবর্তী কোন এক সময়ে, হীরা হইতে তায়েফ হইয়া ইয়ামান যাইবার পথে মক্কার কোন বন্ধু প্রতীম গোত্র কর্তৃক আর একটি কাফেলা বিনা উস্কানিতে আক্রান্ত হইবার কারণে ফিজারের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অর্থনীতির পরিভাষায় ইহার অর্থ মক্কাবাসিগণ এই পথ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল অথবা এই পথ যেন তাহাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে সেই ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট ছিল।[১৭]

এইরূপে ওয়াট সাহেব আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মক্কার সম্ভ্রান্ত সওদাগরগণ বায়যানটীয়দের সঙ্গে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বের কারণে আবরাহা যখন তাহাদের নগরী আক্রমণ করিয়াছিল তখন নিরপেক্ষ ছিল এবং যখন পারসিকরা দক্ষিণ আরব হইতে আবিসিনীয়দের বিতাড়িত করিল তখন মক্কাবাসিগণ চেষ্টা করিবে হীরা-পারস্যের বাণিজ্য পথ, যাহা তায়েফ হইয়া দক্ষিণ আরব গিয়াছিল, নিয়ন্ত্রণ করিতে অথবা বন্ধ করিয়া দিতে। এই অনুমানের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট মিথ্যা যুক্তি এই যে, হীরা হইতে যে কাফেলার ইয়ামানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার কথা বলা হইয়াছে এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাহার তত্ত্ব দাঁড় করাইয়াছেন সেই কাফেলা মোটেই ইয়ামানের উদ্দেশ্যে ছিল না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নিজ রচনার ১২ পৃষ্ঠায় ওয়াট সাহেব বলিতেছেন, 'পারসিক কাফেলা আল-হীরা হইতে ইয়ামান', এখন তিনি বলিতেছেন, 'আল-হীরা হইতে একটি কাফেলা', সঙ্গে যোগ করিতেছেন 'তায়েফ হইয়া' তথাকথিত গন্তব্যস্থল ইয়ামানে 'একটি কাফেলা' এই পরিবর্তন সঠিক; কিন্তু বিবৃতিটি সামগ্রিকভাবে বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতই সেখানে একটি কাফেলা ছিল, অনেকগুলি কাফেলা নহে এবং ইহাকে ইয়ামান হইতে তায়েফে প্রেরণ করা হইয়াছিল অর্থাৎ উহার নিকটে উকাযের মেলায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তায়েফ হইয়া ইয়ামানের উদ্দেশ্যে নহে।

ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে, কাফেলার উপর যে আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল উহা প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত হইয়াছিল সেই কাফেলার জামিনদারের উপর যিনি একজন তায়েফবাসী ছিলেন। সেই আক্রমণকারীও ছিলেন জামিনদারের ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষ। মক্কার সওদাগরদের পক্ষ হইতে সেই

আক্রমণ পরিচালিত হয় নাই। এই আক্রমণ কোনক্রমেই হীরার বিপক্ষে বাণিজ্যপথ বন্ধ করিবার জন্য ছিল না, ছিল না সেই পথের উপর মক্কাবাসীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে হীরা হইতে উকায মেলায় গমনকারী এই একটিমাত্র কাফেলার ঘটনা ব্যতীত হীরা বা পারস্য হইতে তায়েফ হইয়া ইয়ামানে বাণিজ্য করার জন্য অন্য কোন কাফেলা গিয়াছিল অথবা যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল ওয়াট এইরূপ আর কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। যেহেতু তাহার মূল অনুমানটি ভ্রান্ত অর্থাৎ কাফেলাটিকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণের ধারণাটিই ভ্রান্ত, সেইহেতু এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিতেছেন যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এই কাফেলার উপর আক্রমণ পরিচালনা করিয়া হীরা বা পারস্যের বিপক্ষে পথটি বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা পথের উপর তাহাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ ইহার ফলে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল উহা একান্তই মক্কা ও তায়েফের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকারেই হীরা বা পারস্য এই বিবাদে জড়িত হইয়া পড়ে নাই। সত্যই যদি মূল ঘটনা তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই তায়েফের পক্ষ অবলম্বন করিত, অন্ততপক্ষে ইরাক ও ইয়ামানের সহিত মক্কার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। কারণ বিশেষত ইয়ামান তখন পারস্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এইরূপ প্রচেষ্টার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে তায়েফ বা অন্য কোন স্থানে আগমনকারী কোন কাফেলাকে মক্কাবাসিগণ বাধা দান করিবে এমন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইতোপূর্বে দেখানো হইয়াছে যে, বিবাদের উৎস ছিল দুই ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা। তারা দুইজনই চাহিতেছিলেন যে, কাফেলা তায়েফে (উকায মেলায়) আসুক। মক্কার বাররাদ কর্তৃক তাহার তায়েফী প্রতিপক্ষ উরওয়ার উপর যে আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল তাহা ছিল ব্যক্তিগত এবং এই ব্যাপারে মক্কাবাসীদের কোন ভূমিকাই ছিল না, এই কথা মি.ওয়াট তাহার রচনায় তিন পৃষ্ঠা পূর্বেই স্বীকার করিয়াছেন।[১৮] সেই স্থানে তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, 'তিনি (বাররাদ) যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা মূলত ছিল আপন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এবং মক্কাবাসীর প্ররোচনায় নহে'। এমতাবস্থায় ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, উত্তমরূপে জানিয়া এবং ঘটনার প্রকৃত সত্য বর্ণনা করিয়া ওয়াট সাহেব কী প্রকারে পরবর্তী পর্যায়ে ইহাকে বিকৃত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া তাহার মক্কা এবং হীরা-পারসিক বাণিজ্য যুদ্ধের তত্ত্ব নির্মাণ করিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, উহার উপরই ভিত্তি করিয়া তিনি একের পর এক ধারণা, অনুমান ও সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন, ইহা ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে।

অনুরূপ বাণিজ্য যুদ্ধের যুক্তিসঙ্গত কারণও পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ মক্কাবাসিগণ তখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য চালাইয়া যাইতেছিল, যেমন উত্তরে সিরিয়া ও ইরাক এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়ামান ও আবিসিনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালাইতেছিল। তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই

প্রয়োজন ছিল কেবল বায়যানটাইনই নহে, সকলের সহিত সুসম্পর্ক রক্ষা করা। কুরায়শ সওদাগরগণ নিশ্চয়ই এত নির্বোধ ছিল না যে, মক্কার নিকটে পাইয়া হীরা বা ইয়ামানের কোন বাণিজ্য বহরকে আক্রমণ করিয়া বসিবে এবং নিজেদেরকে অহেতুক বিপদের মধ্যে ফেলিবে। তদুপরি তাহারা অবশ্যই জানিত যে, এইরূপ আচরণ করিলে ভবিষ্যতে তাহারাও অনুরূপ আচরণ লাভ করিবে। তাহারা যখন উহাদিগের দেশের নিকট দিয়া বাণিজ্য বহর লইয়া যাইবে তাহাদিগকে অনুরূপ আক্রমণের মোকাবিলা করিতে হইবে। ঐরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ তাহারা করিবে এমন সম্ভাবনাও নাই। কারণ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ জানিতেন যে, তাহাদের বাণিজ্য পথের নিকটে অবস্থিত বিভিন্ন গোত্রের সহায়তা তাহাদের প্রয়োজন। এই বিষয়ে ওয়াট নিজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'কোন এলাকার মধ্য দিয়া যাইবার সময় সেই এলাকার গোত্র-প্রধানকে পানি ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মূল্য দিতে হয়'।[১৯] ওয়াট মক্কার নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহাদের আপন ঘরের নিকট যে প্রকার একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের অভিলাষ দেখাইতে চাহিতেছেন সেই ক্ষেত্রে মক্কার উত্তর ও দক্ষিণে যে বাণিজ্য পথ তাহার দুই পাশে অবস্থিত নানা মতের নানা দলের যে বিভিন্ন গোত্র বসবাসরত ছিল তাহাদের সকলের সহিত সহযোগিতা ও সম্পর্ক রক্ষা করা মক্কার নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন ছিল (উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে প্রোশিয়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য কর অবলুপ্ত করার মাধ্যমে সমগ্র জার্মান জাতিকে একীভূত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছিল যাহাকে বলা হয় যোল্লেভেরেইন)। ষষ্ঠ শতকের শেষে এবং সপ্তম শতকের প্রথমদিকে আরব উপদ্বীপে অনুরূপ যোল্লেভেরেইনের উদ্যোগের বিষয় কল্পনা করা যায় না। পক্ষান্তরে তায়েফ অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া ফিজারের যুদ্ধে মক্কার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যুক্তি যেমন একটি অর্থনৈতিক ঐক্য বিরোধী, তেমনি মক্কার আধিপত্যে সামরিক প্রয়োজনে পশ্চিম আরবের বিভিন্ন গোত্রকে সম্মিলিত করিয়া একটি রাষ্ট্র-সংঘ গঠন সম্পর্কিত ওয়াট-এর তত্ত্ব অযৌক্তিক।

মি.ওয়াট এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ হীরা হইতে তায়েফে আগমনকারী কাফেলাকে বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্যোগ নিয়াছিল। তিনি চাহিয়াছেন যে, আমরা আরও বিশ্বাস করি তাহারা ইয়ামানী কাফেলাকে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেও বাধা দান করিয়াছিল, এমনকি তাহারা যেন মক্কা পর্যন্তও না যাইতে পারে। এই সকল বক্তব্য তিনি কতগুলি অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, যেমন একই সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণের সহিত মক্কার বাণিজ্য যুদ্ধ। কেবল তাহাই নহে, তাহার আর একটি অনুমান যে, মক্কার অভ্যন্তরেই কুরায়শদের দুই গোত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ছিল এবং এই প্রকারেই মি. ওয়াট তাহার হিল্‌ফুল ফুযূলের প্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন।[২০] উহা নিম্নরূপ ঃ

"এই পটভূমিতে ফুযূলের রাষ্ট্র-সংঘ...... একটি নূতন গুরুত্ব লাভ করিল"। ইয়ামানী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পণ্য লইয়া কোন এক সাহমীর মূল্য পরিশোধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং

বানূ হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াট লিখিয়াছেন, ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাহাদের নীতিতে নূতন গুরুত্বপূর্ণ ধারার প্রবর্তন হইয়াছিল ঃ "ধনী গোত্রসমূহ কর্তৃক দক্ষিণের বাণিজ্য হইতে ইয়ামানীদিগকে বহিষ্কার করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা এবং উহাকে নিজেদের করতলগত করা"। ওয়াটের ধারণায় বানূ হাশিম এবং অন্যান্য গোত্র ইয়ামানে তাহাদের নিজেদের কাফেলা প্রেরণের মত অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। তাই তাহারা "মক্কার ইয়ামানী সওদাগরদিগের নিকট হইতে ব্যবসা করিয়া কিছু উপার্জন করিত"। তাহা হইলে সেই সকল গোত্র, যেমন বানূ আব্‌দ শাম্‌স ও বানূ মাখযূম কর্তৃক যদি ইয়ামনগামী কাফেলা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে দুর্বলতর গোত্রগুলির "সিরিয়াতে লইয়া যাইবার মত কোন পণ্যই ছিল না; তাহা না হইলে ধনী গোত্র কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে তাহাদের কাফেলার অংশগ্রহণ ব্যতীত তাহাদিগের আর কোন উপায় ছিল না"।

এভাবেই ওয়াট তাহার পরিসমাপ্তি টানিয়াছেন যে, একজন সাহমীর (আল-আস ইব্‌ন ওয়াইল) কারণে যিনি একজন ইয়ামানী সওদাগরের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়াছেন অথচ তাহার মূল্য পরিশোধ করেন নাই এবং তাহার ফলেই বনূ হাশিম ও অন্যান্য গোত্র মিলিয়া হিল্‌ফুল ফুদূল গঠন করিয়াছিল। তথাকথিত "ধনী গোত্র", যেমন আব্‌দ শাম্‌স ও মাখযূম, নিশ্চয়ই চেষ্টা করিয়াছিল ইয়ামানে কাফেলা পাঠানোর একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাহাদের থাকিবে এবং তাহারা "দুর্বল গোত্রগুলি"কে ভীত করিয়া তুলিবে যে, তাহাদের "কোন মালামালই নাই সে ক্ষেত্রে সিরিয়ায় কি প্রকারে কাফেলা প্রেরণ করিবে"।

সর্বাপেক্ষা মজার বিষয় পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় ওয়াট দেখাইয়াছেন যে, "আবরাহার আক্রমণের পূর্ব হইতেই বানূ আব্‌দ শাম্‌স ও নাওফাল সিরিয়া ও ইয়ামানের অধিকাংশ বাণিজ্য দখল করিয়া লইয়াছিল যাহা পূর্বে হাশিম ও আল-মুত্তালিবের অধিকারে ছিল"।[২১] হিলফুল ফুযূল গঠনের মাত্র বিশ বৎসর পূর্বে ইহাই যদি অবস্থান হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা বোধগম্য নয় যে, কেন বানূ আব্‌দ শাম্‌স ও তাহার মিত্রগণ ইয়ামানের কাফেলার ক্ষেত্রে তখনও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে? বর্তমান ক্ষেত্রে ঘটনা এইরূপ যে, একজন ইয়ামানী সওদাগর আসিয়াছেন ও তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করা হয় নাই। মক্কার কোন কাফেলা ইয়ামানের উদ্দেশে রওয়ানা হইতেছে তাহাও নহে। তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, কী প্রকারে "তুলনামূলকভাবে ধনী" গোত্রসমূহ ইয়ামানগামী কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে যখন তাহারা নিজেরাই মক্কায় অবস্থানরত ইয়ামানীদিগের সহিত দুর্ব্যবহার করে অথবা সেখানে আসিতে বাধা প্রদান করে? পুনরায়, তাহারা কী প্রকারে আশা করিতে পারে যে, তাহারা একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সফল হইবে, যেমনটি ওয়াটের ধারণা, যেখানে খোদ মক্কা নগরীতেই একটি দল রহিয়াছে, সেই দল যতই দুর্বল হউক না কেন, যাহারা তেমন নীতির বিরোধিতা করিতেছে? কিন্তু ওয়াট কী বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন যে, বানূ হাশিম ও অন্যান্য গোত্র যাহারা হিল্‌ফ গঠন করিয়াছিল তাহারা আর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না যে, তাহারা "নিজেদের কাফেলা

ইয়ামানে পাঠাইবে"। ইহা তাহার অনুমান মাত্র এবং সেই অনুমান তিনি নিজেই খণ্ডন করিয়াছেন যখন তিনি প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন। ওয়াট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, হিল্‌ফ সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন বানূ তায়ম গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন এবং তিনি "ফিজার যুদ্ধের প্রারম্ভকালে মক্কা নগরীর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন"।[২২] সূত্রমতে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই সময় মক্কা নগরীর সর্বাপেক্ষা ধনী না হইলেও অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তদুপরি সত্যই যদি হিলফ গঠনের পরবর্তী কালে আবূ তালিবের আর্থিক অবস্থার কিছু অবনতি হইয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার গোত্রে এইরূপ বহু ধনী ব্যক্তি ছিলেন, যেমন আবূ লাহাব ও আব্বাস, যাহারা সম্পদের দিক হইতে আব্‌দ শাম্‌স ও বানূ মাখযূম গোত্রের অনেক ধনী ব্যক্তির সমতুল্য ছিলেন। তদুপরি হিলফের অপর এক সদস্য বানূ আসাদ গোত্রও যথেষ্ট ধনী ছিল এবং তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের বাণিজ্যিক কাফেলা পরিচালনা করিত। খাদীজা (রা) ছিলেন সেই গোত্রের। নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা যায় যে, হিল্‌ফ গঠনের পাঁচ বৎসর পর যখন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বিবি খাদীজা (রা)-র কাফেলা লইয়া সিরিয়া গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বাণিজ্য-সম্পদ ও কাফেলা মক্কার অন্যান্য সকল সওদাগরের মিলিত সম্পদের প্রায় সমান ছিল। এই তথ্য এবং সেই সঙ্গে বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে লইয়া আবূ তালিবের সিরিয়ায় বাণিজ্য ভ্রমণ সংক্রান্ত সর্বজনবিদিত ঘটনা ওয়াটের সেই অনুমান বা ধারণাকে খণ্ডন করে যে, আবরাহার মক্কা আক্রমণের সময় হইতে বানূ হাশিম গোত্র সিরিয়ার বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহার বক্তব্য, "দুর্বলতর" গোত্রগুলি অর্থনৈতিকভাবে ইয়ামানে বাণিজ্য কাফেলা পরিচালনার শক্তি রাখিত না এবং সেই কারণে তাহারা একদিকে "মক্কায় অবস্থানকারী ইয়ামানী সওদাগরদিগের সহিত সওদা করিয়া কিছু ফায়দা কুড়াইয়া লইত" এবং অপরপক্ষে যদি ইয়ামানগামী কাফেলা সম্পূর্ণরূপে আব্‌দ শাম্‌স ও মাখযূম গোত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা হইলে দুর্বলতর গোত্রের উত্তরে সিরিয়ায় লইয়া যাইবার মত মালামাল ছিল না, কথাটি একে অপরকে খণ্ডন করে। কারণ তাহারা যদি পারিত এবং এখানে যেভাবে বলা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় তাহারা উত্তরে সিরিয়ায় কাফেলা প্রেরণ করিত, সেই ক্ষেত্রে তাহারা কেন ইয়ামানে কাফেলা পাঠাইতে পারিবে না ইহা বোধগম্য নয়। তদুপরি তাহারা যদি এতই গরীব হইত যে, ইয়ামানে কাফেলা পাঠাইতে পারিত না ওয়াট যেমন ধারণা পোষণ করেন, তাহার অর্থ তথাকথিত ধনী গোত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহা হইলে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জনের জন্য সেই ক্ষেত্রে মক্কায় আগত ইয়ামানী সওদাগরদিগকে আপন স্বার্থে শোষণ করার প্রয়োজন হইত না। প্রকৃতপক্ষে এমনকি ইয়ামানী সওদাগরদিগের নিকট হইতে সওদা গ্রহণ করা হইতে কেবল দুর্বলতর গোত্রগুলিকে নিবৃত্ত করাই যদি উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে সহজ সাধারণ বাণিজ্যিক জ্ঞান বলে, অধিকতর ধনিক শ্রেণীর গোত্রগুলি অতি সহজেই মূল্য পরিশোধ করিয়া ইয়ামানী সওদাগরদের মালপত্র খরিদ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাইয়া দিতে পারিত এবং তাহাকে আপন স্বার্থে শোষণ না করিয়া ইয়ামানে মক্কার কাফেলা প্রেরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিত না।

এমতাবস্থায় যে অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া ওয়াট তাহার হিল্‌ফুল ফুযূল তত্ত্ব দাঁড় করাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং অযৌক্তিক। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, আবরাহার আক্রমণের সময় মক্কা নগরীতে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। আবরাহার আক্রমণ হইয়াছিল হিল্‌ফুল ফুযূল গঠনের কমপক্ষে বিশ বৎসর পূর্বে। তিনি আবরাহার আক্রমণের পূর্বে অথবা পরে বিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ করিতে পারেন নাই যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় সেই সময় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কোন দীর্ঘকালীন বাণিজ্যিক কলহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যেহেতু বানূ হাশিম ও সমমনা গোত্র কর্তৃক হিল্‌ফ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যেহেতু ইহার অব্যবহিত পূর্বে এবং বানূ সাহমের এক ব্যক্তি কর্তৃক একজন ইয়ামানী সওদাগরকে প্রবঞ্চনা করার ঘটনা ঘটিয়াছিল, ওয়াট ইহাকেই কুরায়শদিগের নিজেদের দুই দলের মধ্যে চরম বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলিয়া পশ্চাৎকালীন সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহার সেই ধরিয়া লওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে এক প্রকার অতীত হইতে বর্তমান ধারণায় (Retrospective Effect) বলিতে চাহিতেছেন যে, উহা আবরাহার আক্রমণের সময়ে বিদ্যমান ছিল এবং উহাকে টানিয়া ফিজার যুদ্ধে পরিণতি দান করিয়াছেন। ওয়াট এই কাজটি করিয়াছেন। কারণ স্পষ্টতই তিনি উপরে উল্লিখিত সত্য ঘটনার প্রতি চোখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমনকি চতুর্থ ফিজার যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে বানূ হাশিম গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তথাকথিত ধনী গোত্রের লোকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল সেই অতি বাস্তব ঘটনাটি না দেখিবার ভান করিয়াছেন। ওয়াটের ধারণামত সেই যুদ্ধ যদি তথাকথিত দুর্বলতর গোত্রের ক্ষতি সাধনের বিনিময়ে ধনী গোত্রের একচ্ছত্র বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঘটানো হইয়া থাকিত তাহা হইলে দুর্বল গোত্রগুলি সেই যুদ্ধকে ধনী গোত্রের সঙ্গে সাধারণ উদ্দেশ্য হিসাবে কখনও বিবেচনা করিত না।

হিল্‌ফ সম্পর্কিত ওয়াটের ধারণায় যে আরও কিছু ভুল তথ্য রহিয়াছে তাহা লক্ষণীয়। অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে হালাবীও দেখাইয়াছেন যে,[২৩] প্রধানত মুতায়্যাবূনের উৎসাহে ইহা সংগঠিত হইয়াছিল কিন্তু ইহা কেবল সেই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। খলীফা আবদুল মালিক এবং বানূ নাওফাল গোত্রের একজন সদস্যের মধ্যে একটি কথোপকথনের কাহিনী ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন যাহা ওয়াট নিজেও লক্ষ্য করিয়াছেন। সেখানে দেখা যায়, বানূ আব্‌দ শাম্‌স ও বানূ নাওফাল উভয় গোত্রই হিলফে যোগদান করিয়াছিল, যদিও পরবর্তী কালে তাহারা উহা পরিত্যাগ করিয়াছিল।[২৪] ওয়াট স্বীকার করিয়াছেন যে, বানূ আসাদ গোত্রও উহাতে যোগদান করিয়াছিল।[২৫] ধনী ও শক্তিশালী গোত্রের বিরুদ্ধে দুর্বলতর ও দরিদ্র গোত্রগুলি সম্মিলিত হইয়াছিল ইহাও সত্য নহে। তাহারা যে দুর্বল ও অকার্যকর ছিল না তাহা প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায়, তাহারা ইয়ামানী সওদাগরকে বানূ সাহম গোত্রের যে আল-আস ইব্‌ন ওয়াইল নামক ব্যক্তি প্রতারিত করিয়াছিল তাহাকে অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং ইয়ামানীর প্রাপ্য পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।[২৬] সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এইরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় না যাহা হইতে বুঝা যায় যে,

তথাকথিত ধনী ও শক্তিশালী দল, তাহার ধারণায়, যাহাদিগের স্বার্থে সে এই দুষ্কর্মটি করিয়াছিল, হিল্‌ফ যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল তখন তাহার সাহায্যার্থে কিছুই করে নাই, এমনকি হিলফের নীতি ও প্রভাবকে খর্ব করিবার নিমিত্ত কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। অথচ ওয়াট গুরুত্ব দিতেছেন যে, আল-আস ইব্‌ন ওয়াইলের কাজটি ছিল "ধনী গোত্রগুলি কর্তৃক দক্ষিণের বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা"। এই ঘটনার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা ইহাই যে, আল-আস যাহা করিয়াছিল তাহা সে নিজের ভুলে করিয়াছিল। ইহার সহিত তাহার গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অনুমিত প্রচেষ্টার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সকল গোত্র ইয়ামানীর পক্ষে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। অথচ গোত্রের ধর্মই হইতেছে গোত্রের কোন সদস্য বা সদস্যের কোন মিত্রকে যে কোন প্রকার ঘটনায় সমর্থন করা। কিন্তু তাহারা যখন দেখিতে পাইল যে, হিল্‌ফ বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছে যেখানে উচ্চতর বিচার নীতির ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং সুবিচার করা হইবে তখন তাহারা জানিত যে, হিল্‌ফ যাহা করিতেছে তাহা সকলের স্বার্থেই করিতেছে। সেই কারণে তাহারা নীরবে সমগ্র বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার অর্থ ছিল প্রকারান্তরে হিল্‌ফের নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

হিল্‌ফ প্রকৃতই তাহাদের নীতিতে "উল্লেখযোগ্য" ধারা প্রবর্তন করিয়াছিল; কিন্তু সেই ধারা কোনক্রমেই "ধনী গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া" হিসাবে নহে, যাহা ওয়াট ধরিয়া লইয়াছেন। ফিজার যুদ্ধের উৎস ছিল এক মাথাগরম ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনাহীন কর্ম এবং তেমনি সমান অযৌক্তিক তথাকথিত মিথ্যা সম্মান, যে কারণে ঘটনার গুণাগুণ যাহাই হউক না কেন, তাহা যদি গোত্রের কোন সদস্য অথবা তাহার মক্কেল যেই হউক না কেন, তাহার দ্বারা সংঘটিত হয় তাহাকে গোত্র কর্তৃক সমর্থন প্রদান। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষতি এবং অর্থ ও জনবলের ক্ষয়ক্ষতি কুরায়শদের মধ্যে এই বোধোদয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, অনুরূপ নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য নিছক নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বোধোদয় অধিকতর জোরালো হইয়াছিল, যখন ফিজার যুদ্ধের পরপর বানূ সাহম গোত্রের আল-আস ইব্‌ন ওয়াইল ইয়ামানী সওদাগরকে প্রতারণা করিয়াছিল। তখন মক্কার ব্যবসায়ীরা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিল যে, এখন দক্ষিণের ইয়ামানী ও তাহাদের মিত্র গোত্রসমূহ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। অতঃপর মক্কার ধীরস্থির বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন যে, মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যর স্বার্থে এবং সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য ন্যূনতম ন্যায়বিচার ও যুক্তিসঙ্গত আচার-বিধি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই হিল্‌ফুল ফুযূল-এর জন্ম হইয়াছিল। ওয়াট নিজেই তাহার রচনার পরবর্তী পর্যায়ে এই বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিয়াছেন, অবশ্য ভিন্ন প্রেক্ষিতে। তিনি সেখানে গুরুত্ব দিয়া বলিয়াছেন যে, "বিশ্বাস রক্ষা করার ক্ষেত্রে চরম সততাই বেদুঈনদের ধর্ম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; ব্যবসার চাকায় তৈল দিতে হইলে নির্ভর করার ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ ন্যূনতম মাত্রার সততার প্রয়োজন। বিবেক বর্জিত অসৎ আচরণের প্রতিবাদেই ফুযূল কনফেডারেশনের উৎপত্তি হইয়াছিল।"[২৭]

প্রকৃতই ব্যবসার ক্ষেত্রে অসদাচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এবং ন্যূনতম মাত্রায় বাণিজ্যিক সততা রক্ষা করার উদ্দেশ্য হইতেই হিল্‌ফ-এর জন্ম হইয়াছিল। কুরায়শদের দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলস্বরূপ ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। অথবা ক্ষমতাবান সওদাগরদিগের হীরা-পারস্যের বাণিজ্যপথের উপর অথবা অন্যদিকে ইয়ামানের বাণিজ্যপথের উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার কারণে ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। ওয়াট অসদাচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে যে হিলফের জন্ম—এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহা স্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে ইতোপূর্বে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন সেই মন্তব্যকেই খণ্ডন করিয়াছেন।[২৮] অর্থাৎ তিনি ইতোপূর্বে বলিয়াছিলেন যে, হিল্‌ফ প্রকৃতপক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নহে। ঘটনাক্রমে ফিজার যুদ্ধ সম্পর্কে জে. ডাবলিউ ফুক (J. W. Fuck) বাহ্যত ওয়াটের মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে তিনিও মন্তব্য করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন, "ইহার উদ্দেশ্য ছিল নজদের বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাহার ফলে এই বাণিজ্য হইতে প্রভূত লাভবান হওয়া"।[২৯]

অনুবাদ ঃ ফজলে রাব্বি

•

তথ্যসূত্র

১. ওয়াট, M. at M., পৃ. ৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬, ১৫, ৩২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫।

৪. উদাহরণস্বরূপ দ্র. পি.কে. হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স (প্রথম সং. ১৯৩৭ খৃ.), অধ্যায় ৪ ও ৫।

৫. ওয়াট, M. at M., পৃ. ১২।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. বিস্তারিত দ্র. ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, সম্পা. আবুল ফিদা, আবদুল্লাহ আল-কাদী, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ., পৃ ৩৭৪-৩৮০; মাসউদী, মুরূজ ইত্যাদি, ১খ, পৃ. ২৭৮।

৮. উপরে দ্রষ্টব্য. পৃ. ১৬৭-১৬৮।

৯. ওয়াট, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

১৩. ওয়াট, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৪।

১৪. পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৩৮-১৪০।

১৫. ওয়াট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. ঐ, পৃ. ১১।

১৯. ঐ।

২০. ঐ ,পৃ. ১৫।

২১. ঐ ,পৃ. ১৪।

২২. ঐ, পৃ. ৩২।

২৩. উপরে উল্লিখিত, পৃ. ১৭১।

২৪. ওয়াট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

২৫. ঐ, পৃ.৭, ৯২।

২৬. উপরে উল্লিখিত, পৃ. ১৭১।

২৭. ওয়াট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

২৮. ঐ, পৃ. ৬।

২৯. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, নূতন সং., লাইডেন ১৯৮৩ খৃ., ২খ., পৃ. ৮৮৪, শিরো. ফিজার যুদ্ধ।

দশম অধ্যায়

উচ্চাভিলাষ ও প্রস্তুতির অভিযোগ

অভিযোগ করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি এবং তিনি পরবর্তী জীবনে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহার প্রস্তুতি শৈশবকাল হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উচ্চাভিলাষের অভিযোগ সম্পর্কিত উদাহরণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতেই ভাষা ও কাব্যচর্চা করিয়াছিলেন। সেই দক্ষতাকে তিনি কুরআন (শরীফ) রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাইয়াছিলেন (নাউ'যু বিল্লাহ)। আরও বলা হইয়াছে যে, সাধারণ ধারণা যে, তিনি অশিক্ষিত ছিলেন, ইহা নাকি যথার্থ নহে এবং তিনি নাকি কিছুটা পাঠ করিতে ও লিখিতে সক্ষম ছিলেন। বর্তমান অধ্যায়ে প্রাচ্যবিদগণের এই সকল মতামত ও মন্তব্য পরীক্ষা করা হইবে।

এক ঃ সাধারণভাবে উচ্চাভিলাষ সম্পর্কিত বিষয়ে

মুইর ও মার্গোলিয়থ উভয়ে মহানবী ﷺ-এর উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অভিযোগ করিয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন। মুইর লিখিয়াছেন, "মেহোমেটের বাহ্যিক প্রশান্ত ও দুশ্চিন্তাহীন চেহারার পশ্চাতে লুকাইয়াছিল এক উচ্চ সিদ্ধান্ত, একনিষ্ঠতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতা, ছিল এক মহিমাময় দৃঢ় সঙ্কল্প, ছিল সমগ্র আরবের হৃদয়কে একীভূত করিয়া একটি মানুষের হৃদয়ে পরিণত করিয়া উহাকে আপনার প্রতি নতজানু করিবার কার্যকর বিস্ময়কর অদম্য স্পৃহা"।[১] মুইর আরও বলিয়াছেন, যখন কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদ (কালো প্রস্তর) স্থাপনের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ﷺ যে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার এই উচ্চাভিলাষ অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, যাহার কারণে "তিনি যে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁহার জনগণের জন্য পয়গাম্বর হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল"।[২]

একই সূরে বলিতে গিয়া মার্গোলিয়থও দাবি করিয়াছেন, "আমরা কুরআন হইতে জানিতে পারি যে, মুহাম্মাদ ছিলেন এরূপ একজন যুবক যাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল" এবং "তাঁহার উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে আমাদের নিকট প্রমাণ রহিয়াছে যে, তাঁহার অপযশ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল এমন এক সময় যখন তাহাদের পরিকল্পনা অল্পই অগ্রসর হইতেছিল ঃ 'আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই এবং তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করি নাই'? পয়গাম্বর যখন সমস্যার মধ্যে পতিত তখন এইরূপ ঐশ্বরিক সান্ত্বনা আসিতেছে। বক্ষ প্রশস্তকরণ, একটি নূতন কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া জীবন সংগঠন... সুউচ্চ সম্মানজনক স্থান লাভের জন্যেই তাঁহার ছিল আগ্রহ"।[৩] মারগোলিয়থ সাহেব আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাহিয়াছেন, পয়গাম্বরের

আকাঙ্খা ও উচ্চাভিলাষ ছিল ব্যক্তিগত সম্মান অর্জন। সেই কারণে তিনি নাকি ফিজার যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।[৪]

ওয়াট সাহেবও অনুরূপ অভিমত পোষণ করিতেন, যদিও তিনি বিশেষভাবে "উচ্চাভিলাষ" শব্দটি তাহার বক্তব্যে ব্যবহার করেন নাই। তাহার পরিবর্তে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন পয়গাম্বরের "বিরাট সাংগঠিক দক্ষতা" সম্পর্কে তাঁহার "সচেতনতা" এবং সেই সঙ্গে তিনি সংযোগ করিয়াছেন সেই সচেতনতার প্রতি মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা। ওয়াট বলিতে চাহিয়াছেন যে, পয়গাম্বর প্রণোদিত হইয়াছিলেন এক প্রকার "বঞ্চনাবোধ" হইতে যে, প্রথমত শৈশবে তিনি তাঁহার পিতাকে লাভ করেন নাই এবং দ্বিতীয়ত "তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বাণিজ্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে"।[৫] মহানবী ﷺ-এর এই তথাকথিত বঞ্চনাবোধ সম্পর্কিত ধারণার ইঙ্গিত মার্গোলিয়থ দিয়াছেন। কারণ তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণে তিনি মহানবীর শৈশবকাল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "পিতৃহীন বালকের অবস্থা মোটেই কাঙ্খিত ছিল না"।[৬]

যাহাই হউক না কেন, ওয়াট সাহেবও নিশ্চিতভাবে মার্গোলিয়থকে অনুসরণ করিয়া কুরআন ভিত্তিক ঐশ্বরিক সান্ত্বনাকেই "ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ হিসাবে কাজ করিবার প্রস্তুতি" গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ পেশ করিয়াছেন। পার্থক্য এইটুকু যে, মারগোলিয়থ সূরা ৯৪ (ইনশিরাহ)-কে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অন্যদিকে ওয়াট সেই ক্ষেত্রে সূরা ৯৩ (দুহা)-কে উপস্থাপন করিয়াছেন। এইভাবে "সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে তাহার জন্য বৎসরাধিক কালের প্রস্তুতি" হিসাবে মহানবী ﷺ-এর সহিত হযরত খাদীজার বিবাহের পরবর্তী কয়েক বৎসরকে প্রস্তুতির বৎসর হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ওয়াট সাহেব সূরা ৯৩-এর আয়াত ৬-৮ এর একটি অনুবাদ দিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, এই আলোচ্য অংশে "অনুমিত হয়[৭] যে, ইহা দ্বারা মুহাম্মাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার" কথাই বলা হইয়াছে এবং ইহা হইতে "আমরা সম্ভবত ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহার এক পর্যায়ে তিনি অনুধাবন কারিতে পারিয়াছিলেন যে, সকল প্রকার দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও ঈশ্বরের সমর্থন তাঁহার প্রতি রহিয়াছে"।[৮] একই উদ্ধৃতির বরাত দিয়া, অবশ্য সামান্য ভিন্নরূপ অনুবাদ করিয়া, ওয়াট তাহার পরবর্তী কালের রচনায়, যেখানে অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম জীবন সম্পর্কে বলিতে গিয়া এবং "ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ হিসাবে কাজ করিবার প্রস্তুতি" হিসাবে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "পিতার অবর্তমান অবস্থা মুহাম্মদের মনে অবশ্যই এক প্রকার বঞ্চনাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং একজন যুবক হিসাবে দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা হয়ত এই বঞ্চনাবোধকে লালন করিয়াছিল"।[৯] অতঃপর ওয়াট এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন, "সম্ভবত ইহা সর্বাধিক আকর্ষণীয় বাণিজ্য কার্যক্রম হইতে তিনি যে বাদ পড়িয়াছিলেন"। "এই সঙ্গে তাঁহার বিশাল সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁহার সচেতনতা মুহাম্মাদকে মক্কার সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল"।[১০]

এভাবেই প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ মহানবী ﷺ -এর উচ্চাভিলাষ এবং প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পর্কে অনুমান করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহানবী ﷺ -এর

ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ সম্পর্কিত তাহাদের অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাসূলে করীম -এর পয়গাম্বর বা সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তুতি বিষয়ে তাহাদের অনুমানও সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এবং কোনরূপ তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, কুরআন শরীফের কোন আয়াত বা হাদীছ দ্বারা তো ইহা দাঁড় করানো যায়ই না। মার্গোলিয়থের কটাক্ষ যে, মহানবী ফিজার যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত সম্মান লাভের জন্য, ইহাও যুক্তিতে টিকে না এবং এই বিষয়ে যুক্তি-তর্কেরও অবকাশ নাই। এখানে তিনি তাঁহার উচ্চাভিলাষের অভিযোগ বিষয়ে কুরআন শরীফের যে সাক্ষ্য দাঁড় করাইয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। মার্গোলিয়থ তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করিয়াছেন, "মুহাম্মাদ একজন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যুবক" এবং ইহার সমর্থনে সূরা হূদের যে (১১ ঃ ৬৫) আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন[১১] তাহা সম্পূর্ণ ভুল এবং অপ্রাসঙ্গিক। আয়াতটি এইরূপ ঃ

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ .

"কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল। অতঃপর সে বলিল, তোমরা তোমাদিগের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে" (১১ ঃ ৬৫)।

এই আয়াত তথা সম্পূর্ণ অংশই পয়গাম্বর সালিহ (আ) এবং তাঁহার জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া। সালিহ (আ)-এর জনগণ ক্রমাগত তাঁহার আদেশ-নির্দেশ অমান্য করিতেছিল। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি সাবধান বাণী। সত্যই অবশেষে তাহাদের উপর দুর্যোগ আপতিত হইয়াছিল। এই আয়াতের "প্রতিশ্রুতি" ছিল পরোক্ষভাবে তাহাদের প্রতি সেই দুর্যোগের সংবাদ যাহা মিথ্যা হয় নাই। ইহাকে কল্পনা করিয়া কোনক্রমেই এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নহে যে, ইহা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ -এর প্রতি প্রতিশ্রুতি ছিল। মার্গোলিয়থ এই প্রসঙ্গে সূরা ৯৪ হইতে ১নং ও ৪ নং আয়াত দুইটিকে একটি বাক্য হিসাবে ধরিয়া এবং মূল উল্লেখ না করিয়া মাঝের দুইটি আয়াত বাদ দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ "আমি কি তোমার বক্ষ সম্প্রসারিত করি নাই এবং তোমার নামকে উন্নত করি নাই"?[১২]

আলোচ্য অংশকে মহানবী -এর মানসিক দুশ্চিন্তার সময়ে তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র সান্ত্বনা হিসাবে স্বীকার করিবার পর ইহাকে কীরূপে তাঁহার উচ্চাভিলাষের সহিত সম্পৃক্ত করা যায় তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ইহার দ্বারা মহানবী -এর যে সম্মান অর্জনের প্রতি আকাঙ্খা ছিল এবং প্রথম জীবনের সিদ্ধান্তের প্রতি নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাও কাহারও বোধগম্য নয়। মার্গোলিয়থ উক্ত বক্তব্য দ্বারা তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। স্পষ্টত নবীর পক্ষ হইতে "প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি"র অভিযোগের সমর্থনে তিনি সূরা ১১ ঃ ৬৫ আয়াত যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা রীতিমত বিভ্রান্তিকর। সূরা ৯৪-এর আলোচ্য অংশ তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও অযৌক্তিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে ওয়াট সাহেব সূরা আদ-দুহা (৯৩ ঃ ৬-৮)-কেও সেইভাবে দাঁড় করাইয়াছেন যাহা বহু দূর অধিগম্য ও অযৌক্তিক। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, কুরআন শরীফের আলোচ্য

অংশটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হযরত খাদীজা (রা)-র বিবাহের পূর্ব কালের অবস্থা নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহা আরও স্পষ্ট যে, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, "তাঁহার অনুধাবন যে, দুর্যোগ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্য তাঁহার প্রতি রহিয়াছে"। কিন্তু সেই অনুধাবন নিঃসন্দেহে নবুওয়াত লাভের পরবর্তী সময়ের এবং উহাকে কোনক্রমেই পূর্ববর্তী সময়ের মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

পরবর্তী কালের সান্ত্বনা বাক্য নবুওয়াত লাভের পূর্বেকার মানসিক অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইহা দ্বারা নবুওয়াত লাভের পূর্বের তাঁহার মানসিক প্রস্তুতি বুঝানো যায় না। এই আলোচ্য আয়াতে এমন কোন বক্তব্য নাই যাহা দ্বারা মনে হইতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনরূপ বঞ্চনাবোধ ছিল। অন্যদিকে যে বিষয়টি পরিসফুটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও তৃপ্তিবোধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক হইতে কোন প্রকার বঞ্চনাবোধ সম্পর্কিত অনুমান বা ধারণা উক্ত আলোচ্য অংশে থাকিতে পারে না। আল্লাহ তাঁহার অবস্থা তাঁহার মঙ্গলের দিকে লইয়া গিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার এক প্রকার কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। যদি ধরিয়া লওয়াও হয় যে, তিনি কোন এক প্রকার বঞ্চনাবোধের কারণে কষ্ট পাইতেছিলেন সেই ক্ষেত্রে খাদীজা (রা)-র সহিত বিবাহ হইবার পর স্পষ্টতই স্থান পাইয়াছিল দ্ব্যর্থহীন তৃপ্তিবোধ ও কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সেই পরিবর্তিত অবস্থা ও সুখের দিন দীর্ঘ প্রায় ১৫ বৎসর কাল অব্যাহত ছিল—যতদিন না ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ করিল অর্থাৎ ওয়াট যে সময়কালকে "প্রস্তুতির" সময় বলিয়া চিহ্নিত করিতে চাহিয়াছেন সেই সময়কাল।

পুনরায়, "অত্যন্ত আকর্ষণীয় বাণিজ্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল" বলিয়া যে ধারণা দেওয়া হয় ইহাও সঠিক নহে। ওয়াট অবশ্য এই সম্পর্কে কুরআন শরীফের সর্বজনবিদিত ৪৩ ঃ ৩১ আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ "এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হইল না দুই জনপদের (কারয়াতায়ন) কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর"?[১৩] সকলেই স্বীকার করেন আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, যখন ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন তিনি মক্কা ও তায়েফের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না। তাহার অর্থ এই নহে যে, "অত্যন্ত আকর্ষণীয় বাণিজ্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল"। প্রকৃতপক্ষে বনূ হাশিম এবং অপর কয়েকটি কুরায়শ গোত্রের মধ্যে বাণিজ্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব এবং সম্ভাব্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বাণিজ্য হইতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সরাইয়া দেওয়া, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ওয়াট তাহার উপসংহার টানিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।[১৪] এই বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্যদিকে ৯৩ ঃ ৮ আয়াতের আলোচ্য অংশের মূল শব্দ 'আগনা'; ওয়াট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ কেবল যথেষ্ট পরিমাণের সম্পদ যাহার রহিয়াছে তিনিই নহেন, বরং ওয়াটের নিজের ভাষায় 'এমন একটি অবস্থান যাহা তুলনামূলকভাবে স্বাধীন এবং সমাজে যাহার বেশ প্রভাব রহিয়াছে'। ইহা সর্বজনবিদিত সত্য, ওয়াট নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, নবী করীম

ﷺ যখন নবুওয়াত লাভ করিলেন তখন তিনি একদিকে ধনী ও প্রভাবশালী আবূ লাহাবের সহিত, অন্যদিকে মাখযূম গোত্রের অত্যন্ত ধনী সদস্যের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। এমতাবস্থায় খাদীজা (রা)-র সহিত বিবাহ হইবার পর হইতে পরবর্তী পনের বৎসর ওহী নাযিল হওয়া পর্যন্ত তিনি দারিদ্র্যের কারণে বঞ্চনাবোধ এবং লোভনীয় বাণিজ্য হইতে সরিয়া যাওয়ায়, "মুহাম্মাদকে মক্কার সাধারণ অবস্থা লইয়া চিন্তায় ফেলিয়াছিল" এবং অবশেষে তিনি পয়গাম্বর বা সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন—উভয়ই সূরা ৯৩-এর সাধারণ অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সেই সময়ের বাস্তব ও সর্বজন স্বীকৃত তথ্যের বিপরীতধর্মী বক্তব্য।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত বৎসরগুলিতে মনের অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, তিনি কোন প্রকার বঞ্চনাবোধে কষ্ট পান নাই। তদুপরি তিনি পয়গাম্বর হইবার জন্য কোন প্রকার পরিকল্পনা বা প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন নাই। ইহা স্পষ্টভাবে কুরআনের আয়াতে পরিলক্ষিত হয় যেখানে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقَى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ...

"তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ..." (২৮ ঃ ৮৬)।

কুরআন শরীফের এই সন্দেহাতীত বাক্য চূড়ান্তরূপে রদ করে যে, তাঁহার নবী হইবার কোন আকাঙ্খা ছিল অথবা তিনি কোন অভিলাষ পোষণ করিতেন, যদিও নবুওয়াত লাভের পূর্বে তিনি মাঝে মাঝে নির্জন জায়গায় ধ্যান করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও কোন কাজ বা আচরণের মাধ্যমে এমন ভাব প্রদর্শন করেন নাই যাহাতে মনে হইতে পারে যে, তাঁহার পয়গাম্বর হওয়া তো দূরে থাক, স্বজাতির নেতা হইবার কোন বাসনা ছিল।

ইহাই স্বাভাবিক এবং সাধারণত ইহাই হইয়া থাকে যে, কোন নেতা হঠাৎ করিয়া আবির্ভূত হন না, বরং একটি ক্রম-অগ্রসরমান পদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে আপন জনগণের নিকট পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠেন যাহা আশেপাশের নিকটজনের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা যায় না। যিনি ভবিষ্যতে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তিনি তাহার আচরণ ও কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজের নিকট আপন অভিলাষ ফুটাইয়া তোলেন। তথাপি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এইরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই যদ্দ্বারা অনুমিত হইতে পারে যে, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার স্বজনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। তাঁহার যদি এইরূপ কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা থাকিত অথবা তিনি স্বীয় জাতির নেতা হইবার কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে উহা অবশ্যই তাঁহার আপনজনের নিকট প্রকাশ পাইত। নেতা হইবার যদি কোন পরিকল্পনা তিনি করিতেন অথবা প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে উহা অবশ্যই কোন না কোন প্রকারে জানাজানি হইয়া যাইত এবং পরবর্তী কালে ইহা তাহার বিরুদ্ধাচারীদের জন্য সমালোচনা করিবার সুযোগ করিয়া দিত। কিন্তু এইরূপ কোন তথ্যই

পাওয়া যায় নাই। ওহী নাযিল হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোন প্রকার চিহ্ন প্রদর্শন করেন নাই, কার্যকলাপে বা আচরণে কেহই অনুমান করিতে পারে নাই যে, ভবিষ্যতে স্বীয় জাতির নেতা হইবার তাঁহার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষরা সত্যই দেখাইয়াছে, যেমন কুরআনের ৪৩ ঃ ৩১ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, দু'টি শহরের মধ্যে তিনি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না যে, তাঁহাকে পয়গাম্বর করা যাইবে। তাঁহার যে কোন উচ্চাভিলাষ অথবা প্রস্তুতি ছিল না ইহার সর্বাধিক শক্তিশালী প্রমাণ পবিত্র কুরআনের এই আয়াত। ইহা অপেক্ষা আর কোন প্রমাণ অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে না।

ওহী নাযিল হইবার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁহার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই ঘটনার বিবরণ যে বিখ্যাত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে উহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট ওহী নাযিল হওয়া ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অজানা ঘটনা। তিনি হেরা পর্বত হইতে হতভম্ব ও ভীত অবস্থায় দ্রুত কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন তাঁহাকে একটি কম্বলে আচ্ছাদিত করিতে। অতঃপর তিনি পর্বত গুহায় কি ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন যে, তাঁহার জীবনে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিতে যাইতেছে বলিয়া তাঁহার ভয় হইতেছে, সম্ভবত তিনি মারা যাইতেছেন। স্ত্রী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন, অভয় দিলেন এবং আশ্বস্ত করিলেন যে, আল্লাহ নিশ্চয় তাঁহার কোন ক্ষতি হইতে দিবেন না। কারণ তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ, সৎ মানুষ; তিনি কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই; সদাসর্বদা সত্য কথা বলিয়াছেন, অতিথি আপ্যায়ন করিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজনকে ও দরিদ্রকে সাহায্য করিয়াছেন।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলাইয়া ওঠার পর কিছুটা স্থির হইলে খাদীজা (রা) তাঁহাকে ওয়ারাকা নামক এক আত্মীয়ের বাড়িতে লইয়া গিয়াছিলেন। ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন যিনি অনেক কিছু জানিতেন। হেরা গুহায় তাঁহার স্বামীর যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল সে সম্পর্কে তিনি ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফালের নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছিলেন। ওয়ারাকা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার অধীত বিদ্যার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে এই অভিমত দিয়াছিলেন যে, ইতোপূর্বে মূসা ('আ) যেরূপ আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করিয়াছিলেন তিনিও সেইরূপ আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করিবেন। ইহার ফলে স্বজাতির সহিত তাঁহার কলহ হইবে এবং তাঁহার অনেক কষ্ট হইবে। শেষের কথায় তিনি আরও আশ্চর্য হইয়াছিলেন।[১৫]

সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী এই বিষয়টির কয়েকটি দিক তুলিয়া ধরিয়াছেন।[১৬] উহা গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রথমত, আমরা এই স্থলে নবী করীম ﷺ-এর অবস্থার যে দৃশ্য দেখিতে পাই তাহা রীতিমত এইরূপ যে, নবী করীম ﷺ তখন বিভ্রান্ত ও হতভম্ব অবস্থায় রহিয়াছেন। একটি অকল্পনীয় অভাবিত অবস্থায় তিনি হতভম্ব। তাঁহার যদি কোন সময় কোন দিন এই অভিলাষ থাকিত অথবা পয়গাম্বর বা ধর্মীয় নেতার ভূমিকায় ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন এইরূপ কোন প্রস্তুতি থাকিত অথবা এমন কোন আকাঙ্খা বা ইচ্ছা থাকিত যে, তাঁহার নিকট

কোন ঐশী বাণী আসিবে তাহা হইলে তাঁহার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইত। তাহা হইলে তিনি হতভম্ব হইতেন না, হতবুদ্ধি হইতেন না, ভয়ে কাঁপিতে থাকিতেন না, বরং হেরা পর্বত হইতে প্রত্যাশা পূরণের আনন্দে সফল ও হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। কাহারও সান্ত্বনা বাক্যের প্রয়োজন হইত না। তিনি সরাসরি তাঁহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিতেন।

দ্বিতীয়ত খাদীজা (রা)-এর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহাও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার স্বামীর যদি অনুরূপ কোন অভিলাষ থাকিত যে, তিনি একদিন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন তাহা হইলে দুনিয়ায় অপর কেহ না জানিলেও তিনি তাহা অবশ্যই জানিতেন। অতএব তিনি যখন হেরা পর্বত হইতে তাঁহার এই নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেন, তাঁহার এত দিনের প্রত্যাশা ও প্রস্তুতির সফলতায় খুশি হইতেন এবং তাঁহার আত্মীয় ওয়ারাকার নিকট পরামর্শের জন্য যাইতেন না, বরং তাঁহার স্বামীর নূতন কর্মসূচী কি প্রকারে বাস্তবায়িত করা যায় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন।

তৃতীয়ত ওয়ারাকার দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপভাবে লক্ষণীয়। তিনি নবী করীম ﷺ-এর একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। শৈশবকাল হইতেই তিনি নবী করীম ﷺ -কে জানিতেন। ওয়ারাকা খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত ছিলেন। ওহী সম্পর্কেও তাহার জ্ঞান ছিল। ওহী ও নবুওয়াত সম্পর্কে ওয়ারাকার জ্ঞান থাকার কারণে তিনি অতি সত্বর বুঝিতে পারিলেন যে, হেরা গুহায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট যিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি নবী মূসা ('আ)-এর নিকট যিনি ওহী লইয়া আসিতেন আল্লাহ্‌র সেই ফেরেশতা ব্যতীত আর কেহই নহেন। নবী করীম ﷺ যদি উচ্চাভিলাষী হইতেন এবং তাঁহার ধর্মীয় নেতা হইবার আকাঙ্খা থাকিত, তদুপরি যদি তিনি তাহাদের অভিযোগ অনুযায়ী ওয়ারাকার নিকট হইতে নিয়মিত খৃস্ট ধর্মের অনুশাসন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেন তাহা হইলে ওয়ারাকার প্রতিক্রিয়া ও মনোভঙ্গি হইত সম্পূর্ণ ভিন্ন। হয় তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -কে জানাইতেন যে, এতদিন তিনি যাহা চাহিতেছিলেন এবং যাহার অপেক্ষায় দিন গণনা করিতেছিলেন তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন অথবা ইহাও করিতে পারিতেন যে, তিনি তাঁহার মিথ্যা ভান ও প্রস্তুতির সংবাদ প্রচার করিয়া দিতেন। কিন্তু ওয়ারাকা সেইরূপ কিছুই করিলেন না। তিনি যে সেইরূপ কিছু করিলেন না ইহাই বড় প্রমাণ যে, তাহার নিকট হইতে মহানবী ﷺ খৃস্ট ধর্মের অনুশাসন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই অথবা তাঁহার যে কোন ধর্মীয়-সামাজিক নেতা হইবার ইচ্ছা ছিল তাহা তিনি জানিতেন না।

অন্যদিকে ওয়ারাকার প্রতিক্রিয়া হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পূর্বকালের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ওই সকল গ্রন্থে একজন পয়গাম্বরের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং মুহাম্মাদের মধ্যেই সেই পয়গাম্বরের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। এই সকল প্রাচ্যবিদ, বিশেষ করিয়া ওয়াট আরও দেখাইয়াছেন যে, ওয়ারাকার এই উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য

নবী করীম ﷺ-এর মনে তাঁহার লক্ষ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছিল।[১৭] তাঁহার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং উচ্চাভিলাষ ছিল এইরূপ ধারণা যে মিথ্যা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যখন দেখা যায়, আদর্শ বাস্তবায়নের সূচনালগ্নেই তাঁহার মধ্যে আস্থার অভাব রহিয়াছে। এই সঙ্গে আরও যোগ করা যায় সর্বজনবিদিত সত্য ঘটনা যে, তিনি সকল প্রকার পার্থিব মূল্যবান বস্তু প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কিন্তু আপন আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। আমরা জানি কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে বারংবার তাঁহার আদর্শ ত্যাগ করিয়া তাহার বিনিময়ে ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও সম্পদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রদান করিয়াছিল।

প্রসঙ্গত বর্তমান অধ্যায়ের সমাপ্তি টানিবার পূর্বে উল্লেখ করা যায় যে, নবী করীম ﷺ শেষ পর্যন্ত তাঁহার জনগণ ও সকল সাধারণ ঈমানদারদের নেতা হইয়াছিলেন। এই ঘটনার কারণে প্রাচ্যবিদগণ তাঁহার নবুওয়াত লাভের পূর্ব জীবনে উচ্চাভিলাষ ও প্রস্তুতি গ্রহণকে অন্তর্গত করিয়া তাহার জীবনী নির্মাণ করিতে চান। প্রকৃত ঘটনা ও সূত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া এবং ঐতিহাসিক রীতি অনুসরণ করিয়া এইটুকু বলা যায় যে, কোন নেতা আকস্মিকভাবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হইতে পারেন না। সেই বিবেচনায় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর ক্ষেত্রে বলা চলে যে, তিনি যখন ওহী লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন হইতে প্রকৃতপক্ষে সেই প্রক্রিয়ার সূচনা হইয়াছিল এবং অবশেষে তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহা নহে যে, তিনি প্রথম জীবন হইতেই যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতেন তাহার কারণেই তিনি নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যখন তিনি নবুওয়াত লাভের আহবান পাইলেন তখন তিনি নেতৃত্ব লাভের আশা করার মত কোন সম্ভাব্য ব্যক্তি ছিলেন না।

দুই ঃ কাব্যচর্চার অভিযোগ

তাঁহার সম্পর্কে যেমন অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে, তিনি জীবনের প্রথম হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নেতা হইবার উচ্চাভিলাষ ছিল, তেমনি এইরূপ অভিযোগও উত্থাপিত হইয়াছে যে, তিনি ভাষাগত দক্ষতা ও কাব্যচর্চায় দক্ষতা লাভের জন্য প্রথম হইতে দুইটি বিষয়ে অনুশীলন ও চর্চা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পরবর্তী কালে তিনি কুরআন 'রচনা' করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ডবলিউ মুইর বলেন, উকায মেলায় কবিতা ও সাহিত্য প্রতিযোগিতার দৃশ্য মুহাম্মাদ ﷺ -এর অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, "ব্যক্তিগত সাফল্যের আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত" করিয়াছিল এবং সেই মেলায় তিনি "প্রধান কবিদের নিকট হইতে প্রতিভা উৎকর্ষ সাধনের ও শিক্ষা লাভের দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং পাইয়াছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতার শিল্পশৈলী ও ছন্দপ্রকরণের আদর্শ রূপ"।[১৮]

মুইরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মার্গোলিয়থ মন্তব্য করেন যে, মুহাম্মাদ সম্ভবত সুললিত বাকপটুতার অনুশীলনও করিয়াছিলেন, "যে ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী কালে চরম উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছিলেন"।[১৯] তিনি আরও বলেন, যদিও পয়গাম্বরের কবিতার প্রতি কিছুটা বিরাগ ছিল,

"বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কুরআনের ভাষার সঙ্গে" আরবের প্রাচীন কবিতার "বিস্ময়কর সাযুজ্য" দেখা যায়। স্পষ্টত ইঙ্গিত করা হইয়াছে উকাযের মেলার কবিতা প্রতিযোগিতার প্রতি, যেখানে মুইর এই বিষয়ে সরাসরি বরাত দিয়াছেন, সেখানে মারগোলিয়থ মন্তব্য করেন যে, "সেখানে সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যে যে সকল কবিতা আবৃত্তি হইত তাহা হইতে কোন কোন কবিতা তাঁহার স্মৃতিতে ভাস্বর হইয়া রহিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে উহাই ভবিষ্যতের ওহীর আকৃতি লাভ করিয়াছিল"।[২০]

এই ক্ষেত্রে স্পষ্টই বলা আবশ্যক যে, যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করিবেন যে, কুরআন কোন কাব্যগ্রন্থ নহে। নবী করীম ﷺ-ও কখনও ছন্দ মিলাইয়া কাব্য রচনা করেন নাই। অবিশ্বাসী কুরায়শগণ তাহাদের বিরোধিতার প্রথমদিকে যখন ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন উহার বিরোধিতা করিয়া বলিত যে, মুহাম্মাদ ﷺ কবি হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু শীঘ্রই যখন তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের আক্রমণ সঠিক হইতেছে না তখন তাহাদের আক্রমণের ভাষা পরিবর্তিত করিল। কারণ যেহেতু মহানবী ﷺ ছিলেন সম্পূর্ণ উম্মী, যাঁহার কাব্যচর্চার কোন অভ্যাস ছিল না, তখন তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল যে, অপর কেহ তাঁহাকে কবিতা লিখিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। আবার বলা হইল, 'প্রাচীন যুগের কাহিনী' অপর কেহ তাহার হইয়া লিখিয়া দিয়াছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করিয়া শুনাইয়াছে।[২১] এই অভিযোগ পবিত্র কুরআনে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করা হইয়াছে। কবিতা রচনা অথবা কুরআন কোন এক প্রকার কবিতা—এই অভিযোগের ক্ষেত্রে কুরআন স্পষ্টভাবে অস্বীকার করিয়াছে ঃ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ .

"আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয়ও নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন" (৩৬ ঃ ৬৯)।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ .

"এবং ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর" (৬৯ ঃ ৪১)।

প্রকৃতপক্ষে পরিমাণগতভাবে বিচার করিলে কুরআনের এক-চতুর্থাংশও সাজ' বা ছন্দবদ্ধ গদ্যও নহে। মার্গোলিয়থ নিজেই আপন কটাক্ষের প্রতি দুই প্রকারে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহার রচনার পরের দিকে বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর সুললিত বাচনভঙ্গীর অভাব ছিল এবং তিনি উপস্থিত বিতর্কে পটু ছিলেন না, তাই কুরায়শদের "পরিষদ সভায়" কখনও তর্কের "সুযোগ" গ্রহণ করিতেন না।[২২]

দ্বিতীয়ত, অতি যত্ন সহকারে মার্গোলিয়থ যেখানে এই বিষয়ে মতামতের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের স্কন্ধে অর্পণ করেন সেই মার্গোলিয়থ নিজেই যখন পরবর্তী কালে আরবী কবিতার

উৎপত্তি বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করিলেন তখন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া তত্ত্ব উপস্থাপন করিলেন যে, ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতা হিসাবে যে কবিতাসমূহ পরিচিত তাহা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সাজ' (ছন্দ)-এর ধাঁচে রচিত ইসলাম-পরবর্তী যুগের কবিতার আদর্শে রচিত।[২৩] এই তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট আলোচনার উদ্ভব ঘটাইয়াছে।[২৪] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তত্ত্ব উপস্থাপন করার ফলে তিনি ইতোপূর্বে যে বলিয়াছিলেন, ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতা "হইতেই ভবিষ্যতের ওহী কিরূপ হইবে তাহা স্থির হইয়াছিল"—এই বক্তব্যকে সরাসরি খণ্ডন করিয়াছে।

তিন ঃ ওয়াটের তত্ত্ব ঃ সাক্ষরতার প্রশ্ন

মুইর ও মারগোলিয়থ যদিও অভিযোগ করিয়াছেন যে, নবী করীম ﷺ ভাষাগত ও কাব্য দক্ষতা চর্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা উৎসসমূহের সঙ্গে একমত পোষণ করেন যে, তিনি একজন সাক্ষরতা বর্জিত ব্যক্তি ছিলেন। মার্গোলিয়থ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ "শৈশবকালে পঠন ও লিখনবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন নাই, যদিও ইহা সেকালের অধিকাংশ মক্কাবাসীর আয়ত্তে ছিল" এবং "ব্যবসা-বাণিজ্যে উহার প্রয়োগ ছিল প্রচুর"।[২৫] মজার বিষয়, এই স্থলে মারগোলিয়থ দুইটি সত্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। (এক) মক্কাবাসীর মধ্যে লেখা-পড়ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। (দুই) ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহার বহুল ব্যবহার ও উপযোগিতা ছিল। ওয়াট এই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বলিতে চাহিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না, কিছুটা লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। "কারণ তাঁহাকে ব্যবসায়িক হিসাবপত্র রাখিতে হইত"।[২৬] এই প্রসঙ্গে ওয়াট কুরআন শরীফের ২৯ ঃ ৪৮ ও ২৫ ঃ ৫ আয়াতের কিয়দংশ উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে যথাক্রমে বলা হইয়াছে, "তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই" এবং "এইগুলি তো সেকালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে"।[২৭] ওয়াট ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, প্রথম অংশের অর্থ "মুহাম্মাদ নিজে কোন ধর্মগ্রন্থ পূর্বে পাঠ করেন নাই" কিন্তু ওয়ারাকার ন্যায় কোন ব্যক্তি অথবা তাহার কোন সংবাদদাতা সম্ভবত সিরিয়াক ভাষার বাইবেল পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিল। কারণ তখন পর্যন্ত আরবী ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয় নাই। দ্বিতীয় আয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াট বলেন, "ইহার অর্থ" মুহাম্মাদের জন্য তাঁহার কোন "সচিব" প্রাচীন কাহিনী লিখিয়া দিত। এইভাবে ওয়াট তাহার যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন, "ব্যবসায়ের কারণে মুহাম্মাদ প্রয়োজনীয় লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন সেইরূপ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, নিজে কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন নাই"।[২৮]

ওয়াট এই প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে ব্যবহৃত শব্দ 'উম্মী'-এর অর্থ লইয়া আরও আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ওয়াট উপরে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার আলোচনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সর্বজনবিদিত যে, সেই সময় মক্কার কিছু সংখ্যক অধিবাসী অবশ্যই লিখিতে ও পড়িতে জানিত। ইহা একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি যে, যখন কোন একটি বিশেষ অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে কোন একটি সমাজে বা দেশে বিদ্যমান থাকে তখন

সেই দেশের বা সমাজের কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু আমাদের নিকট যে সকল তথ্যসূত্র রহিয়াছে অথবা ওয়াট যে উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে এই ধারণার সৃষ্টি হয় না যে, তৎকালে অর্থাৎ মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব কালে মক্কা নগরীতে লেখা-পড়ার বিষয়টি ছিল সেই সময়কার সাধারণ বিষয় অথবা নগরীর অধিকাংশ জনগণ দূরে থাকুক, একটি বিপুল সংখ্যক অধিবাসী ছিল শিক্ষিত। এমতাবস্থায় মহানবী ﷺ যে শিক্ষিত ছিলেন, লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন এইরূপ ধারণা সৃষ্টির কোনরূপ কারণ থাকিতে পারে না। অপরপক্ষে তাঁহার প্রথম জীবনের যে সর্বজনবিদিত স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই যে ধারণার সৃষ্টি হয় তাহা এই যে, তিনি বাল্যকালে কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পান নাই।

দ্বিতীয়ত, এই প্রসঙ্গে ওয়াট কুরআন শরীফের যে দুইটি আয়াত ২৯ ঃ ৪৮ এবং ২৫ ঃ ৫ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আংশিক মাত্র। দুইটি আয়াতেরই মূল বক্তব্যের বাহিরে এবং আয়াতদ্বয়ের উপর ভুল ও পক্ষপাতযুক্ত ব্যাখ্যা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার পিছনে কোন পরিপ্রেক্ষিত নাই, এমনকি সমগ্র বক্তব্যর সহিত সামঞ্জস্য পর্যন্ত অনুপস্থিত। তিনি কী প্রকারে ইহা করিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য মূল আয়াত পূর্ণভাবে পাঠ করা প্রয়োজন। ২৯ ঃ ৪৮ আয়াত নিম্নরূপ ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِه مِنْ كِتٰبٍ وَّلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ .

"তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে" (২৯ ঃ ৪৮)।

এই বক্তব্যে ইহা স্পষ্ট যে, নবী করীম ﷺ যখন আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত ওহী প্রচার করিতেছিলেন তখন অবিশ্বাসিগণ অভিযোগ করিয়াছিল যে, তিনি উক্ত ওহী নিজেই রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রেক্ষিতে এই ওহী নাযিল হইয়াছিল। আলোচ্য অংশে মক্কাবাসীর অভিযোগকে সোজা কথায় অবাস্তব বলা হইয়াছে। কারণ তখনকার মক্কার সকল ব্যক্তি জানিত যে, নবী করীম ﷺ ইতোপূর্বে কখনও লিখিতে বা পড়িতে পারেন নাই। যিনি কোন দিন লিখেন নাই বা পাঠ করেন নাই তিনি আকস্মিকভাবে অসাধারণ সাহিত্য গুণসম্পন্ন সৃষ্টি লইয়া জনসমক্ষে উপস্থিত হইবেন তাহা ছিল কল্পনাতীত। ইহার অর্থ আরও স্পষ্ট হয় যখন বাক্যের শেষ অংশে বলা হয়, "মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে"। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয়, যে শব্দ দ্বারা উহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা 'মা কুনতা' যাহার অর্থ অভ্যস্ত না হওয়ার অবস্থা অথবা (পড়িতে ও লিখিতে) অক্ষম হওয়া। তদুপরি কিতাব শব্দটি যেরূপ অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে স্পষ্টতই তাহার অর্থ 'যে কোন কিতাব', নির্দিষ্ট কোন কিতাব নহে। কুরআন শরীফ অবশ্যই নির্দিষ্ট কিতাব বলিতে বাইবেলকে বুঝাইয়াছে।

আলোচ্য অংশ অনুবাদ করিতে গিয়া ওয়াট অবশ্য 'যে কোন গ্রন্থ' বুঝাইয়াছেন। তিনি অবশ্য এই বিষয়টি আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "চিন্তা করিবার আরও অনেক কারণ

রহিয়াছে" যে, পয়গাম্বর "কখনও বাইবেল অথবা অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করেন নাই"। কিন্তু এই কথা বলিবার পরক্ষণেই তিনি আলোচ্য অংশের অর্থ সীমাবদ্ধ করিয়া বলেন যে, নবী করীম ﷺ "কোন ধর্মগ্রন্থ" পাঠ করেন নাই। তারপর যোগ করিতেছেন, যদিও "তিনি নিজে" বাইবেল পাঠ করেন নাই অথবা লিখিয়া লন নাই কিন্তু ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল ও নবী করীম ﷺ-এর অপর কয়েকজন "নাম না জানা তথ্য সরবরাহকারী" সিরিয়াক বাইবেল পাঠ করিয়াছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আলোচ্য অংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য নহে। ওয়ারাকা অথবা অপর কেহ সিরিয়াক বাইবেল অথবা অন্য কোন ভাষার বাইবেল পাঠ করিয়াছিল কিনা তাহা আলোচ্য অংশের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। আলোচ্য অংশের অন্তর্নিহিত অর্থ কেবল মহানবীর পূর্ববর্তী অবস্থা বুঝাইবার জন্য, অন্য কিছু নহে। ওয়াট চালাকি করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছেন যে, মনে হয় মহানবী ﷺ অপরের মাধ্যমে বাইবেলের ঘটনা ও ধারণা লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে তাহা কুরআন শরীফের অন্তর্গত করিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

ওয়াট কুরআন শরীফের ২৫ ঃ ৫ আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সর্বাধিক উদ্ভট ব্যাখ্যা। তিনি যে কতখানি যুক্তিহীন ব্যাখ্যা দিতে পারেন তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে যখন আমরা এই আয়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত পাঠ করিব। সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اِفْكُ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا. وَقَالُوْاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً. قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ..... .

"কাফিরগণ বলে, 'ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে'। এইরূপে উহারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে। উহারা বলে, 'এইগুলি তো সে কালের উপকথা যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়'। বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন'; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (২৫ ঃ ৪-৬)।

৪ নং আয়াতে অবিশ্বাসিগণ যে অভিযোগ আনিয়াছে এবং উহা খণ্ডন করিয়া যে বক্তব্য দেওয়া হইয়াছে উহার ধারাবাহিকতায় পঞ্চম আয়াতের বক্তব্য, ইহাই স্বাভাবিক। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসিগণ বলিত যে, ওহী মিথ্যা এবং উহার পাঠ অপর কয়েকজনের সহায়তায় নবী করীম ﷺ তৈরি করিয়াছিলেন। আয়াতে এই বক্তব্যকে সরাসরি মিথ্যা ও অন্যায় (ظُلْمًا وَّزُوْرًا) হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অভিযোগ খণ্ডন করিতে গিয়া পঞ্চম আয়াত অবিশ্বাসীদের অন্যান্য অভিযোগ উল্লেখ করিয়াছে যেমন অন্যদের দিয়া লিখাইয়া লওয়া, প্রাচীন

কালের কাহিনী যাহা সকালে ও সন্ধ্যায় পয়গাম্বর পাঠ করাইয়া লইতেন, তাহা ব্যতীত ওহী আর কিছুই নহে ইত্যাদি। অভিযোগের সারাংশ হইতেছে, নবী করীম অপরের সাহায্য লইয়াছিলেন। ইহাও অস্বীকার করা হইয়াছে এই কথা বলিয়া যে, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন তিনি ওহী নাযিল করিয়াছেন। তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন "যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন" এই বরাত দেওয়া হইয়াছে যথাযথ। কারণ ওহী হইতেছে আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে একান্ত আপন বিষয় যাহা অপর কেহ জানিবে না বা দেখিবে না। প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফের বহু স্থানে যথার্থই বলা হইয়াছে যে, রাসূল ও তাঁহার নিন্দুকদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ্ই সর্বোত্তম সাক্ষী।

পবিত্র কুরআনের ২৫ ঃ ৫ আয়াত লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া ওয়াট অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা মহানবী -এর বিরুদ্ধে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী অবিশ্বাসীদের অভিযোগ ছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে, তাঁহার নিকট যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা ছিল "প্রাচীন কাহিনী" এবং ওই সকল কাহিনী তিনি অপর কাহাকেও দিয়া লিখাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ওয়াট সামগ্রিকভাবে উহার অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তিনি অভিযোগ অস্বীকারের বিষয় পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন, অথচ উহাই ছিল আলোচ্য আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্যদিকে তিনি অভিযোগকে একটি বিচ্ছিন্ন বক্তব্য হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছেন, "তাহার অর্থ হইল মহানবী "নিজে" লিখেন নাই, তিনি তাঁহার "সচিবদের" দ্বারা লিখাইয়া লইয়াছিলেন। এমনিভাবে ওয়াট মহানবী -এর বিরুদ্ধে অবিশ্বাসিগণের অভিযোগগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ধরিয়া লইয়াছেন, ওহী হিসাবে তিনি যে বাণী দিয়াছেন উহা ছিল অপরের রচনা, একই সঙ্গে তাঁহার বিরুদ্ধাচারীর প্রতি জবাবে যে তিনি উহা নিজে রচনা করেন নাই এই মূল বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা উদ্ভট ব্যাখ্যা আর কী হইতে পারে?

ওয়াট যদি তাহার ব্যাখ্যা লইয়া অগ্রসর হইবার পূর্বে আরও একটু সতর্ক হইতেন এবং নিজেকে প্রশ্ন করিতেন যে, প্রকৃত অবস্থার চাবিকাঠি কোথায় অবস্থিত, যেমন কেন তাঁহার বিরুদ্ধাচারিগণ এমন অভিযোগ করিবে যে, তিনি অপরকে দিয়া প্রাচীন কাহিনী লিখাইয়া ও অসাধারণ কাব্যগুণ সম্পন্ন শিল্প রচনা করাইয়া তাহাকে ওহী বলিতেছেন? একটুখানি চিন্তা করিলেই ওয়াট ইহার সদুত্তর পাইতেন। কারণ তাহারা এবং সেকালের সকলেই উত্তমরূপে জানিত যে, মুহাম্মাদ ছিলেন উম্মী—লিখিতে ও পড়িতে অক্ষম, তাঁহার পক্ষে কাব্যগুণ সম্পন্ন কোন কিছুই রচনা করা সম্ভব ছিল না, বিশেষ করিয়া ওহীর মত অসাধারণ সাহিত্যগুণ সম্পন্ন ভাষায় কিছু রচনা করা তাঁহার পক্ষে মোটেও সম্ভব নহে। তাঁহার জন্য অপর কেহ প্রাচীন কালের কাহিনী রচনা করিয়া দিয়াছিল—এই কথা বলিয়া তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা আরও বলিয়াছে যে, সেই সকল কাহিনী সকাল-সন্ধ্যা তাঁহাকে শুনানো হইত। ইহার স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাহারা জানিত যে, কেবল সেই কাহিনীগুলি লিখিয়া দিলেই চলিবে না, সেইগুলি তাঁহাকে উত্তমরূপে শুনাইতে হইবে যাহাতে তিনি সেইগুলি যথাযথভাবে মুখস্থ করিয়া জনগণকে শুনাইতে পারেন।

অবিশ্বাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছিল, আয়াতের সেই মূল অংশটুকু বাদ দিয়া ওয়াট এই সম্পূর্ণ আয়াত ব্যাখ্যা করার যে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা তাহার দ্বিতীয় ত্রুটি। তিনি ইহা সচেতনভাবেই করিয়াছেন। কারণ তাহা না হইলে তিনি যে তত্ত্ব দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন সেই তত্ত্ব যুক্তিতে টিকে না। এমনিভাবে তিনি আয়াতের পরিপ্রেক্ষিত ও সামগ্রিক অর্থকে অবহেলা করিয়া এবং একটি অংশমাত্র ব্যবহার করিয়া ও ইহার দ্বিতীয় অংশ, তাহার ব্যাখ্যার জন্য মারাত্মকরূপে ক্ষতিকারক, তাহা বাদ দিয়া কুরআন শরীফের বাক্য দ্বারাই তিনি তাহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তত্ত্ব দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন যে, নবী করীম ﷺ নিরক্ষর ছিলেন না। ওয়াট খেয়াল করেন নাই যে, তিনি যে ধারণার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন যে, নবী করীম ﷺ কয়েকজন সাহায্যকারী বা সচিবের সহায়তায় ওহীর বাণী রচনা করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহার অর্থ কী দাঁড়াইতে পারে। নবী করীম ﷺ যদি সত্যই অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়া উহা লিখাইয়া লইতেন তাহা হইলে তাহারাই তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দিত। কারণ তাঁহার নবুওয়াতের দাবির ভিত্তি ছিল সেই বাণী এবং তাহার ফলে সমগ্র জাতির নেতৃত্ব। মারগোলিয়থ সম্ভবত এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই তিনি এই কথা বলেন নাই। এমনভাবে ওয়াট কুরআন শরীফের আয়াতের অপব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিতেছেন ঃ

"মুহাম্মাদ ﷺ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যতটুকু লেখাপড়া জানা আবশ্যক ততটুকু লেখাপড়া সম্ভবত জানিতেন। তবে নিশ্চিত সম্ভাবনা যে, তিনি কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন নাই"। ওয়াট আরও বলেন যে, এই সিদ্ধান্ত "মুসলমান পণ্ডিতগণকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ করিয়া দিয়াছে"।[২৯]

অতঃপর তিনি 'উম্মী' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুরআন শরীফে এই শব্দটি কয়েকবার আসিয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, মুসলমান পণ্ডিতগণ 'উম্মী' শব্দের অর্থ করেন, 'সম্পূর্ণ নিরক্ষর-লিখিতে ও পড়িতে না পারা'। কিন্তু তাহার মতে উম্মী অর্থ "যাহাদের লিখিত কিতাব নাই"। এই প্রসঙ্গে তিনি কুরআন শরীফের ২ ঃ ৭৮, ৩ ঃ ২০, ৩ ঃ ৭৫ ও ৬২ ঃ ২ সংখ্যক আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহার অর্থ একই অর্থাৎ উম্মী নবী বলিতে ইয়াহূদী নহেন, কিতাবহীন নবী। অর্থাৎ তিনি বাইবেল সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানিতেন না।[৩০] এই কথা বলিয়া তিনি সমাপ্তি টানিয়াছেন।

ওয়াটের ঘোষণার বক্রোক্তি যে, মুসলমান পণ্ডিতগণকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ করিয়া দিয়াছে—এই বক্তব্যকে হয়তো তেমন গুরুত্ব না দিলেও চলে। তবে আসল কথা এই যে, মুসলমান বিশেষজ্ঞগণ 'উম্মী' শব্দের অর্থ কেবল অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা ব্যক্তি বুঝান না। প্রাচীন ও আধুনিক মুসলিম বিশেষজ্ঞ উভয় দলই স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে, আলোচ্য শব্দ দ্বারা "ইয়াহূদী নন এমন এবং কিতাবী নহেন" ইহাও বুঝাইত।[৩১] ওয়াট অভিযোগ করিয়াছেন, মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ "উম্মী" বলিতে কেবল একটি অর্থ বুঝাইয়াছেন। অথচ তিনি নিজে দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের সর্বত্র 'উম্মী' শব্দের একই অর্থ এবং তাহা 'ইয়াহূদী নহে ও কিতাবী নহে'।

কুরআন শরীফের ২ ঃ ৭৮ আয়াত সম্পর্কে তিনি যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ সমগ্র বিবরণই ইয়াহূদী সম্প্রদায় সম্পর্কিত। অথচ তিনি সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, "ভালভাবে পাঠ করিলে বুঝা যায় উহা দ্বারা যাহাদের কিতাব নাই তাহাদিগকে বুঝাইয়াছে"।[৩২] একটুখানি সতর্কতার সহিত আমরা যদি সেই আয়াত যথাযথ প্রেক্ষিতে পাঠ করি তাহা হইলে স্পষ্ট হইবে যে, তাহার বক্তব্য সত্য নহে। উক্ত আয়াত ঃ

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلاَّ اَمَانِىَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ .

"তাহাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই; তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে" (২ ঃ ৭৮)।

ওয়াট আয়াতটির 'ইল্লা আমানিয়্যা' পর্যন্ত অনুবাদ দিয়াছেন, "তাহারা উম্মিয়্যূন যাহারা লোক-পরম্পরায় শোনা ব্যতীত কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না" এবং 'ইল্লা আমানিয়্যা' অনুবাদ করিয়াছেন 'লোক-পরম্পরায় শোনা ব্যতীত'। ইহা পিকথলের অনুবাদ যাহা "যথেষ্ট বিতর্কিত, কিন্তু যুক্তির প্রতিকূল নহে"। পিকথলের উদ্ধৃতি দিয়া ওয়াট বলেন যে, কিতাবের অনুবাদ হওয়া উচিৎ আসমানী কিতাব।[৩৩]

ওয়াটের বক্তব্য সঠিক যে, পিকথলের 'ইল্লা আমানিয়্যা'-র ভাষান্তর 'যথেষ্ট বিতর্কিত'। প্রকৃতপক্ষে উহা সঠিক নহে; কারণ কোন মানসম্পন্ন অভিধানে উহার অনুরূপ অর্থ করা হয় নাই। সাধারণভাবে ইহার অর্থ 'বাসনা' বা 'খেয়াল' অথবা অনুরূপ ভাব প্রকাশক শব্দ। কিন্তু ওয়াট যদি আল্লামা ইউসুফ আলীর ১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত কুরআন শরীফের ইংরাজি অনুবাদ বিবেচনা করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, সেই অনুবাদে ইহার অর্থ 'বাসনা' করা হইয়াছে। পিকথলের অনুবাদের মাত্র চার বৎসর পর উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এমনকি এ.জে. আরবারি উহার অর্থ দিয়াছেন 'কল্পনা'।[৩৪] মনে হয় ওয়াট ইচ্ছা করিয়াই পিকথলের অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তাহা হইলে তিনি যে ব্যাখ্যা দিতে চান তাহা দেওয়া যায়। 'উম্মিয়্যূন' অর্থ 'যাহাদের কিতাব নাই'-এই ভাষ্যটি তাহার মনের মত ভাষ্য। আমানিয়্যা-র বিতর্কিত অর্থ ব্যতীত আয়াতটি ওয়াট যে উম্মিয়্যূন-এর ব্যাখ্যা দিতে চান তাহা সমর্থন করে না। সমগ্র আয়াত সে কালে ইয়াহূদীরা যে আচরণ করিয়াছিল তাহার বিবরণের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত। আয়াত ৭৬-এ তাহারা যে ওহী লাভ করিয়াছিল সেই ওহীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহারা নিজেরাই গোপন করিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেখানে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া আয়াত ৭৭-এ বলা হইয়াছে ঃ "তাহারা কি জানে না যে, যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তাহা জানেন"? অতঃপর আয়াত ৭৮ আরম্ভ হইতেছে এইরূপে, "তাহাদের মধ্যে এমন কতক....", তারপর বিবরণ বর্ণিত হইতেছে, অতঃপর পরবর্তী ৭৯ আয়াতে তাহারা নিজেরাই যে রচনা করিয়া

ওহী বলিয়া চালাইতেছে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। এমনিভাবে তাহারা যে আল্লাহ্র ওহী লইয়া 'আমানিয়্যা' বা যাহা ইচ্ছা তাহা করে, বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণনা এবং সতর্ক করা ৮২ আয়াত পর্যন্ত চলে। স্পষ্টতই ৭৮ আয়াতে ইয়াহূদীদের উম্মিয়্যুন সম্পর্কেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যাহারা অজ্ঞ ও বে-খবর তাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। যদি আরব বা কিতাবী নহে এমন কাহাকেও বলা হইত তাহা হইলে 'ওয়া মিনহুম (ومنهم) তাহাদের মধ্যে এমন কতক'....কথা অপ্রাসঙ্গিক হইত। কারণ 'আরব ও অন্যান্য' যাহারা ইয়াহূদী নহে তাহারা সকলেই ছিল কিতাবহীন। পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা না করিয়া যদি কেবল নিছক আয়াতটিকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয় তাহা হইলেও ওয়াটের ব্যাখ্যার সঙ্গে আয়াতের কোন সঙ্গতি পাওয়া যায় না।

ওয়াটের মনমত ইংরাজি সমার্থক প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াও আয়াতের যে অনুবাদ হয় তাহা এইরূপ ঃ "তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক যাহারা অ-কিতাবী এবং কিতাব কী 'আমানিয়্যা' ছাড়া, তাহা তাহারা জানে না।" ইহা অর্থহীন অভিযোগ যে, অ-কিতাবী লোকেরা জানে না যে, কিতাব কি! অ-কিতাবী লোকেরা কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ হইবে ইহাই স্বাভাবিক। এমন বক্তব্য কেবল নির্বোধরাই পেশ করিতে পারে। তাহার এই ব্যাখ্যা যে কত অদ্ভুত ও উদ্ভট হইতে পারে তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যখন আয়াতের শেষ অংশ আমরা বিবেচনা করি। এই অংশ তিনি যেন সচেতনভাবে অনুল্লেখ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। শেষ অংশে রহিয়াছে পাঁচটি শব্দ (وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ) "এবং তাহারা অনুমান ব্যতীত আর কিছুই করে না"। এই বাক্যাংশটি সতর্ক বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত ও তাহারই ধারাবাহিকতায় বলা হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে যে 'আমানিয়্যা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই শব্দেরই ব্যাখ্যামূলক অবস্থা। অতএব আয়াতের এই শেষাংশের উম্মিয়্যূন শব্দের অর্থ যদি ধরা হয় 'যে জনগোষ্ঠী কিতাব লাভ করে নাই' তাহা হইলে আলোচ্য বক্তব্যের মধ্যে সতর্ক করার যে শক্তি থাকা আবশ্যক তাহা পাওয়া যায় না এবং কোন কার্যকর বক্তব্য বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে তাহারা যদি কিতাবে কি আছে তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিয়াও থাকে তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। যদি আয়াতের আলোচ্য অংশকে আমরা পৃথকভাবে বিবেচনা করি অথবা সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করি তাহা হইলেও উহার অর্থ একই যে, 'তাহাদের মধ্যে' অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ অর্থাৎ যে ইয়াহূদীগণ নিজেদের কিতাব সম্পর্কে অবহিত নয় তাহাদের লইয়াই সমগ্র আলোচনা চলিতেছিল। তাহারা নিজেদের কিতাবও যত্ন সহকারে পাঠ করে না, খেয়াল-খুশিমত অনুসরণ করে এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলে। কেবল তাহাই নহে, তাহারা নিজেদের তৈরী বক্তব্যকে আল্লাহ্র কিতাবের বাণী বলিয়া চালায় যেমন পরবর্তী ৭৯ আয়াতে সেই কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। উম্মিয়্যূন বলিতে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা যদি কিতাবহীন জনগোষ্ঠী হইয়া থাকে তাহা হইলে এই পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যও অর্থহীন বিবেচিত হইবে। কারণ ওই সকল লোকের ক্ষেত্রে প্রশ্নই ওঠে না যে, তাহারা কোন কিছুকে কিতাবের বাণী বলিয়া প্রচার করিত।

ওয়াট মনে করেন যে, উম্মী কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে হিবরু 'উম্মত হা ওলাম' কথা হইতে যাহার অর্থ বিশ্বের অ-ইয়াহূদী জনগোষ্ঠী। হয়ত তাহা সঠিক হইতে পারিত; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ইহা আরবী শব্দ 'উম্ম' হইতে আসিয়াছে যাহার অর্থ মাতা। অতএব উম্মী অর্থ হইতেছে যাহার কোন অর্জিত জ্ঞান নাই, সে কেবল মাতৃক্রোড়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাই তাহার একমাত্র জ্ঞান। যাহা হউক, ইহা অনেকাংশে নিশ্চিত যে, ইয়াহূদীগণ যাহারা ইয়াহূদী নহে তাহাদিগকে উম্মীয়্যু অথবা কিতাবহীন জাতি বলিত। তাহারা অবজ্ঞাপূর্ণভাবে ইহা বলিত, কারণ অন্যান্য লোকদের বা জাতির কোন আসমানী কিতাব ছিল না। অতএব তাহারা সকলেই জ্ঞান বিবর্জিত, অশিক্ষিত, মূর্খ, এক কথায় অজ্ঞ। এমনিভাবে ইয়াহূদীদের আচরণেও শব্দটির অর্থ অশিক্ষিত অথবা অজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন গ্রীকরা যাহারা গ্রীক নয় তাহাদিগকে অসভ্য বর্বর জাতি বলিয়া অভিহিত করিত। এই শব্দের অর্থ শুধু গ্রীক নহে এমন নয়, বরং মূলত এমন এক ব্যক্তিকে বুঝাইত যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গনের বাইরের লোক এবং এই পরবর্তী কালের অর্থই টিকিয়া থাকিল এবং মূল অর্থ বাদ পড়িল।

অনুরূপভাবে অন-আরবগণকে আরবরা আজামী বলিয়া থাকে। তাহার অর্থ, যে ব্যক্তি সহজভাবে আগন বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃত আরব শব্দের অর্থ এক সময় ছিল যে ব্যক্তি সাবলীলভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। পরবর্তী কালে আ'জাম শব্দের এই অর্থ আর রহিল না, তাহার পরিবর্তে 'আজম শব্দের অর্থ দাঁড়াইল অনারব বা বিদেশী। অনুরূপভাবে প্রাচীন কালে হিন্দুগণ যাহারা আর্য নহে তাহাদিগকে যবন বলিত। কিন্তু পরবর্তী কালে যবন শব্দের অর্থ হইল কেবল 'আর্য নহে' এমন জাতি নহে, বরং অহিন্দু, বিশেষত মুসলমান। এইভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, বহু শব্দ আছে যাহার মূল অর্থ লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে নূতন অর্থ অর্জন করে এবং ক্রান্তিকালে দুইটি অর্থই বিদ্যমান থাকে । ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন কুরআন শরীফ নাযিল হইয়াছিল সেই সময় উম্মী শব্দটির দুইটি অর্থই চালু ছিল। সেই কারণে কুরআন শরীফে উম্মী শব্দটি দুইটি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে হইলে শব্দটি কোন প্রেক্ষিতে কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া অনুধাবন করিতে হইবে। সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় আমরা সকলেই জানি যে, প্রত্যেক ভাষায় এইরূপ বহু শব্দ রহিয়াছে যাহার অর্থ একাধিক এবং সেই অর্থ বুঝিতে হইলে শব্দটি কোন প্রেক্ষিতে কোন অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও বিবেচনায় আনিতে হইবে।

উপরে দেখানো হইয়াছে যে, উম্মী শব্দটি ২ ঃ ৭৮ আয়াতে নিশ্চিতভাবে 'অশিক্ষিত' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরআন শরীফের আরও পাঁচ জায়গায় শব্দটি আসিয়াছে, যেমন ৩ ঃ ২০, ৩ ঃ ৭৫ এবং ৬২ ঃ ২ আয়াতে শব্দটি বহুবচনরূপে আসিয়াছে এবং অভিযোগের আকারে আসিয়াছে। প্রতিটি স্থলে শব্দটির অর্থ অশিক্ষিত' ধরা যাইতে পারে, আবার অজ্ঞ জাতি হিসাবেও ধরা যাইতে পারে অথবা যাহাদের কিতাব নাই সেই অর্থেও ধরা যাইতে পারে। অপর দুইটি ক্ষেত্রে, যথা ৭ ঃ ১৫৭ এবং ৭ ঃ ১৫৮ আয়াতে শব্দটির একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পয়গাম্বরের বিশেষণ

হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইহা দ্বারা একজন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে। কোন প্রকারেই ইহা দ্বারা কিতাবহীন ব্যক্তি অথবা ইয়াহূদী নহে এমন ব্যক্তি বুঝানো হয় নাই। আমরা যদি আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠ করি তাহা হইলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ... فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

"যাহারা অনুসরণ করে উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে, তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়... সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম" (৭ ঃ ১৫৭)।

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا... فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ .

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল... সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর যাহাতে তোমারা সঠিক পথ পাও" (৭ ঃ ১৫৮)।

এই দুইটি আয়াতের দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম দেখা যাইতেছে, প্রথম আয়াতে গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে যে, নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে ইয়াহূদীদের নিকট এবং একই সঙ্গে খৃস্টানদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে যাহার বিষয়ে তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহা আয়াত দুইটির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় তিনি জাতিগতভাবে আরব ছিলেন কিনা অথবা তিনি ইয়াহূদী বংশ উদ্ভূত ছিলেন না তাহা বিবেচনায় আনার কোনই প্রয়োজন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইবে আত্মহননকারী বক্তব্য যে, অ-ইয়াহূদী ও অ-কিতাবধারী এক রসূলকে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল যাহাদের নিকট কিতাব ছিল, বরং অবিশ্বাসিগণের বারংবারের অভিযোগ যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ওহী হিসাবে যাহা প্রচার করিতেছিলেন উহা তাঁহার নিজের তৈরী রচনা এই কথা স্মরণে রাখিয়া এবং এই সত্যও স্মরণ রাখিয়া যে, উহা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে আবেদন হিসাবে করা হইয়াছিল যাহাতে সেই অভিযোগ খণ্ডন করা যায়। বিষয়টি এইভাবে সাজানোই ছিল একান্ত স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, দুইটি আয়াতই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে এই কথাই বলে যে, পয়গাম্বরের নিকট কিতাব নাযিল হইয়াছে এবং এই কথা তিনি নিজে যেমন বিশ্বাস করেন

(اَلَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَتِهِ) তেমনি তাঁহার শ্রোতাগণকে তিনি বিশ্বাস করিতে বলেন। (وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ أُنْزِلَ مَعَهُ) এইভাবে উভয় ক্ষেত্রের বক্তব্যে নবী করীম ﷺ ছিলেন নিরক্ষর এবং তাঁহাকে কেহ পড়াইয়া দেয় নাই, তিনি 'অ-ইয়াহূদী ও অ-কিতাবী' ছিলেন কখনও এই অর্থ নহে। তিনি নিজেই যখন বিশ্বের সকল মানুষকে মক্কাবাসী, আরববাসী, ইয়াহূদী ও খৃস্টান সকলকেই বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন যে, তিনি কিতাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ওহী নাযিল হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে পয়গাম্বরকে 'অ-কিতাবী বলা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। যেখানে তিনি আল্লাহ্র নিকট হইতে আসমানী কিতাব লাভ করিয়াছেন তাঁহার এই দাবিই বিশ্বাস করা হইবে কি না তাহাই হইতেছে মূল আলোচ্য বিষয়, সেই স্থলে তিনি বলিতে পারেন না যে, তিনি একজন কিতাবহীন পয়গাম্বর।

আলোচ্য শব্দের যে অর্থই দেওয়া হউক না কেন, এই প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করিতে হইবে যে, নবী করীম ﷺ নিরক্ষর ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই আলোচ্য শব্দই কেবল কুরআনের একমাত্র প্রমাণ নহে। ইতোমধ্যে আমরা দেখিয়াছি যে, কুরআন শরীফে এইরূপ অনেকগুলি আয়াত রহিয়াছে যেগুলি অবিশ্বাসিগণের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ মোটেই লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না, যে কারণে অবিশ্বাসিগণ তাহাদের আক্রমণের ধারা এই কথা বলিয়া পরিবর্তিত করিয়াছিল যে, তিনি যে ওহী প্রচার করিতেন উহা অপর কেহ লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইত।[৩৫]

বিষয়ান্তরে যাইবার পূর্বে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য স্মরণ করা যায় যে, ওয়াট তাহার আলোচনার সূত্রপাতকালে বলিয়াছিলেন যে, "পরবর্তী কালের অধিকাংশ মুসলমান এই বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, কুরআন অনেক বেশী অলৌকিক। কারণ মুহাম্মাদ ﷺ লিখিতে বা পড়িতে সক্ষম ছিলেন না"...।[৩৬] এই কথার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে, কুরআনের অলৌকিকতা প্রমাণের জন্য 'পরবর্তী কালের অধিকাংশ মুসলমান এই বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন' করেন বলিয়াই মুসলমানগণ মনে করে না মহানবী নিরক্ষর ছিলেন বরং কুরআন নিজেই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং বারংবার বলিয়াছে যে, যদি কেহ সক্ষম হয় আগাইয়া আসুক এবং কুরআনের ন্যায় ছোট বা বড় সূরা রচনা করিয়া দেখাক যে, উহা কোন মানুষ রচনা করিতে সক্ষম।

ওয়াট যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চান এবং কুরআনের বক্তব্যকে বিকৃত করিয়া বিপরীত অর্থকে যে প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান তাহাতে মনে হয় তিনি উহা করিবেনই। তিনি বলিতে চান যে, মহানবী ﷺ কিছুটা হইলেও লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। ওয়াট উহার দ্বারা পরোক্ষভাবে এই কথাই বলিতে চান যে, কুরআন তেমন কোন অলৌকিক কিছু নহে। অতঃপর এইসব কঠিন আয়াসসাধ্য ব্যাখ্যা দিবার পর তিনি পরিশেষে বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ ব্যবসার প্রয়োজনে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন'। স্বাভাবিকভাবে ওয়াটের এই অনুমানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে ঃ কাহারও পক্ষে কি ইহা সম্ভব বা স্বাভাবিক যে, মোটামুটি পড়া-লেখা ও অংক (তিনটি

আর)-এর দক্ষতা লইয়া কেহ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত কোন কিছুই না করিয়া হঠাৎ আকস্মিকভাবে এইরূপ কিছু রচনা করিলেন যাহা সকলেই স্বীকার করেন 'আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ'?[৩৭] দুর্ভাগ্যবশত ওয়াট নিজেকে প্রশ্ন করেন নাই, কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টা করাতো দূরের কথা।

সবশেষে সাধারণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ তত্ত্ব বিষয়ে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। কারণ উহা মহানবী ﷺ যে নিরক্ষর ছিলেন তাহার সহিত স্পষ্টতই সম্পর্কিত। একজন ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে কোন একজন নেতার আবির্ভাব অথবা প্রকৃতপক্ষে যে কোন ঘটনার ব্যাখ্যা করা সত্যই কঠিন যদি না তিনি সেই সময়ের অবস্থা, পটভূমি ও প্রস্তুতি বিবেচনায় না আনেন, বিশেষ করিয়া ঘটনাটি যদি কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়া থাকে, সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে প্রকারেই হউক না কেন। এক অর্থে ইতিহাসের অপর একটি সমস্যার সহিত প্রশ্নটি জড়িত । প্রশ্নটি হইতেছে, ইতিহাস ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে না কি ব্যক্তি ইতিহাস নির্মাণ করে সেই বিতর্কে জড়িত না হইয়াও এই কথা বলা চলে, বিশেষ করিয়া হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর সম্পর্কে যখন কিছু বলিতে হয় তখন অতি গুরুত্বের সঙ্গেই বলিতে হয়, তিনি কেবল একজন সাদামাটা ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। সর্বপ্রথম এবং প্রধানত তিনি ছিলেন একজন পয়গাম্বর, আল্লাহ্র একজন প্রেরিত পুরুষ। ইহা বিশ্বাসের বিষয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই বিশ্বাসকে অবজ্ঞা না করাই প্রয়োজন।

ঘটনা যখন এই প্রকার তখন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে মূল্যায়ন করিতে হইলে কেবল বাঁধাধরা প্রচলিত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মানদণ্ড দ্বারা মূল্যায়ন করিলে পয়গাম্বরের অনন্যসাধারণ মাত্রাকে ভুল বুঝার যথেষ্ট আশংকা থাকিয়া যায়। তিনি একজন ঐতিহাসিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার এই 'অসাধারণত্ব' সম্পর্কে সচেতন হওয়া তাঁহার যথার্থ মূল্যায়নের জন্য একান্ত আবশ্যক। তিনি প্রকৃতই কোন প্রেরিত পুরুষ ছিলেন না অথবা 'পশ্চিমা জগতের' জন্য ইসলাম বিপদজনক এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে গবেষণা বা অধ্যয়ন তখন সেই অধ্যয়ন প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্রতিপত্তিকতায় পরিভ্রষ্ট হয়।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, একজন অমুসলিম বিশ্বাস করিতে জ্ঞানত বাধ্য নহে যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ একজন আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। কিন্তু যখন কোন অধ্যয়ন আপন স্বীকারোক্তি অনুযায়ী প্রধানত পরিচালিত হয় যে, তিনি প্রেরিত ছিলেন না অথবা ইহা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যে পশ্চিমা সভ্যতার জন্য ইসলাম একটি বিপদজনক বিষয়, সেই ক্ষেত্রে গবেষকের বিপরীত ইচ্ছা থাকিলেও তাহা নিরপেক্ষ হয় না। ওয়াট সেইরূপ ইচ্ছাই প্রদর্শন করিয়াছেন। Mohammad at Mecca (মক্কা নগরীতে মুহাম্মাদ) নামক গ্রন্থ লিখিতে গিয়া তিনি একজন স্বঘোষিত খৃস্টান হিসাবে বলেন, "ইসলামের সঙ্গে খৃষ্ট ধর্মের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে একজন খৃস্টান মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিবে আর সেই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হইবে ধার্মিক আদর্শ"। কিন্তু তিনি 'ধর্মীয় প্রশ্নে' চেষ্টা করিয়াছেন নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে। তিনি দাবি করিয়াছেন যে, তিনি সর্বপ্রথম ঐতিহাসিকের প্রতি তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করিয়াছেন যে, তাহার গবেষণায় তিনি খৃস্টানদের নিকট

ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করিয়াছেন যাহা ইসলামের প্রতি ধর্মীয় বিচারে বিবেচিত হইবে।[৩৮] তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবেন, কিন্তু সেই নিরপেক্ষতা সর্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। মহানবী ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিতে গিয়া সর্বত্রই তাহার দুইটি উদ্দেশ্য স্পষ্টতই পরস্পর বিরোধী ছিল। তিনি ঐতিহাসিক আদর্শকে ইভানজেলিস্টের বেদীতে বিসর্জন দিয়াছেন।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর 'আসাধরণত্ব' স্বীকার করার অর্থ এই নহে যে, তাঁহার জীবনকে সমালোচনা ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা যাইবে না। ইহার অর্থ প্রকৃত তথ্যের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত থাকার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা এবং কোন প্রকারেই মূল পাঠকে বিকৃত না করার চেষ্টা করা অথবা মূল পাঠকে প্রকৃত বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভুল ব্যাখ্যা না করা। ইহার অধিকতর স্পষ্ট অর্থ হইতেছে—সম্পূর্ণ পরিষ্কার সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। অন্যরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত 'অপরাধী নহে' ধরিয়া লইতে হইবে; এইরূপ নহে যে, অন্যরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত 'অপরাধী' ধরিয়া লইতে হইবে।

অনুবাদ ঃ ফজলে রাব্বি

তথ্যসূত্র

১. W. Muir, The Life of Mahomet, 3rd edn, p. 25-26.

২. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ২৯।

৩. মারগোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

৪. ঐ, পৃ. ৬৫।

৫. Watt, Muhammad's Mecca, পৃ. ৫০-৫১।

৬. মারগোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৭. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

اَلَمْ يَجِدكَ يَتِيْمًا فَاوٰى... وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى .

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?.... তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন" (৯৩ ঃ ৬-৮)।

৮. Watt, M. at M., 39.

৯. Watt, M's. M, 50-51।

১০. ঐ, পৃ. ৫০।

১১. মারগোলিয়থ, ঐ, পৃ. ৬৪।

১২. ঐ, পৃ. ৬৫।

১৩. Watt, M's M., 50.

১৪. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৮৯-১৯০।

১৫. বুখারী, নং ৩, আরও পরে দ্র. পৃ. ৩৬৯-৩৭৩।

১৬. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলম, ১খ, লাহোর ১৯৭৮ খৃ., ২য় অধ্যায়।

১৭. Watt, M. at M., 50; M's, M 59.

১৮. Muir, Life of Mahomet, 3rd edition, 15 (Ist edn., II, 7).

১৯. Morgoliouth, op. cit., 52-53.

২০. Ibid, 60.

২১. পরে দ্র., পৃ. ২৬৮-২৭৪।

২২. মারগোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

২৩. J.R.A. S., Jaly 1925, p. 417-449.

২৪. ত্বহা হুসায়ন তাঁহার ফিশ-শি'র আল-জাহিলিয়া গ্রন্থে মারগোলিয়থ তত্ত্বের ভিত্তিতে লিখেন, ইহা অনেক আলোচনার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য মুহাম্মাদ মুস্তফা হুদারার 'মানাহিজুল মুসতাশরিকীন' প্রবন্ধের প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য। Arab Bureu of Education for The Gulf States, pp. 396-438.

২৫. মারগোলিয়থ, Mohammed etc., 59.

২৬. Watt, Muhammad's Mecca, 52

২৭. আরও আলোচনার জন্য নিচে মূল পাঠ দেখুন।

২৮. Watt, M's M, 52.

২৯. Watt, M's M., 52.

৩০. ঐ, পৃ. ৫৩।

৩১. See Ibn Hisham, II (ed. Tadmuri), p.220; also Raghib al-Isfahani (d. 502 H), AL-Mufradat Fi Gharib al-Quran, 23; Al-Farra (Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad, (d. 207 H), Ma'ani al-Quran, vol.I, Beirut, n.d., 224; Maududi, Tafhim al-Quran, English tr., Towards Understanding The Quran, (tr. z. I. Ansari), vol I, Leicester 1988, pp. 87, 242, 265.

৩২. Watt, M's M., 53.

৩৩. পূর্বোক্ত বরাত।

৩৪. A.J. Arberry, The Koran Interpreted, O.U.P (Paperback), 10.

৩৫. উপরে দ্র., পৃ. ২৪১-২৪৬।

৩৬. Watt, M's M., 51.

৩৭. The phrase is that used by The Oxford University Press in its notice to A. J. Abberry's translation of The Quran in "The World Classics" series, paperback edition, 1982, reprint, backcover.

৩৮. Watt, M. at M., Introduction, X.

একাদশ অধ্যায়

ইয়াহূদী-নাসারা প্রভাবের কাহিনী

মহানবী ﷺ -এর শিক্ষা ও মতাদর্শ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি নাকি প্রচুর পরিমাণে ইয়াহূদী-নাসারা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এই অভিযোগের কাহিনী লইয়া বহু লেখালেখি হইয়াছে। এই সকল রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানত দেখাইতে হইবে যে, মহানবী ﷺ পরবর্তী কালে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুরআন আসমানী কিতাব নহে—তাহা প্রতিষ্ঠিত করা। আবরাহাম গিয়েগার[১] যিনি একমাত্র তথাকথিত ইয়াহূদী প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তাহার আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখিয়াছিলেন। উইলিয়াম মুইর সম্ভবত প্রথম আধুনিক ঐতিহাসিক যিনি সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়াছেন এবং উহাকে জনপ্রিয় করিতে যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিয়াছেন। তাহার রচনা প্রকাশিত হইবার পর আরও অনেকেই এই বিষয়ে লিখিয়াছেন।[২] বর্তমান আলোচনায় কেবল মুইর, মারগোলিয়থ ও ওয়াট-এর অনুমানসমূহের আলোচনা এবং সারসংক্ষেপ থাকিবে।

এক ঃ অনুমানসমূহের সারসংক্ষেপ

মুইর বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা, মদীনা ও উকায মেলায় ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহাদের নিকট হইতে ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে বাণিজ্য সফরে সিরিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান হইতেও ওই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি শৈশব কালেই তিনি নাকি মদীনায় ইয়াহূদীদের দেখিয়াছেন, 'তাহাদের সিনাগগের কথা, তাহাদের প্রার্থনার কথা শুনিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহভীরু মানুষ হিসাবে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন'।[৩] খাদীজা (রা)-এর বাণিজ্য কাফেলা লইয়া যখন দ্বিতীয়বার সিরিয়া গমন করেন তখন মহানবী ﷺ -এর সহিত যে নেসতোরিয়াসের সাক্ষাতের 'বাল সুলভ' কাহিনীর কথা বলা হয় মুইর অবশ্য তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তথাপি মুইর বলেন, 'আমরা অবশ্য নিশ্চিত যে, মোহামেট যখনই কোন পাদ্রী অথবা যাজকের দেখা পাইতেন তখন তাহাদের নিকট হইতে সিরিয়ান খৃস্টানদের উপাসনা পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানিবার সুযোগ হারাইতেন না'।[৪]

উদাহরণ হিসাবে মুইর মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঃ (ক) বালক অবস্থায় তিনি উকায মেলায় কুস ইব্‌ন সাইদা-এর কথা শুনিয়াছিলেন।[৫] (খ) যায়দ ইব্‌ন হারিছার সঙ্গে পরিচয়। যায়দের পূর্বপুরুষ খৃস্টান ছিল এবং বাল্যকালে তাহাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা

হইয়াছিল। তিনি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট তাহার খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে যাহা জানা ছিল তাহা বলিয়াছিলেন[৬]। (গ) ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফালের সঙ্গে পরিচয়। মুইর এই পরিচয়কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'মুহাম্মাদ ﷺ এক ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছেন এই কথা বলিয়া তাঁহাকে মানসিক তৃপ্তি দিয়াছিলেন'। [৭] মুইর আরও বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের মতপার্থক্য ও বিরোধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তবে তিনি তাহাদের নিকট হইতেই এক ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা, ঐশ্বরিক বাণী ও কিতাব সম্পর্কে ধারণা এবং আবরাহাম-এর নাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ই আবরাহামকে অত্যন্ত সম্মান করে, যিনি কা'বাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং প্রতিটি আরব গোত্র কা'বাগৃহে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা আবরাহামই সৃষ্টি করিয়াছেন—এই সকল কথা তিনি তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন। মুইর আরও বলেন যে, মহানবী ﷺ যখন সিরিয়ায় ছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, 'সেখানে খৃস্ট ধর্ম অবলম্বন করাই জাতীয় ধর্ম বা পেশা'। এই প্রকারে মুইর সমাপ্তি টানিয়াছেন যে, 'মুহাম্মাদ সম্ভবত মনে করিয়াছিলেন, তিনি বিশপের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তাহা হইবে আরও ব্যাপক ও সর্বজনীন পর্যায়ের'।[৮]

মুইর দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সঙ্গে মহানবী ﷺ-এর যোগাযোগ ঘটিয়াছিল, বিশেষ করিয়া খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই কথা বলিয়া মুইর যোগ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার যোগাযোগ ছিল খৃস্টান 'গোঁড়া বা মৌলবাদী দলের' সঙ্গে যাহারা ছিল সিরিয়ার সন্ন্যাসী ও যাজক, ফলে তিনি খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে 'বিকৃত' তথ্য, বিশেষ করিয়া মেরী ও যীশু সম্পর্কে ভুল তথ্য লাভ করিয়াছিলেন।[৯] মুইর বলিতে চাহিয়াছেন যে, 'তিনি যদি সঠিক তথ্য লাভ করিতেন তাহা হইলে তিনি নূতন ধর্ম প্রচার না করিয়া নিজেই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেন'। অতঃপর মুইর দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'সাম্রাজ্যের ক্যাথোলিক নামের অপনাম সেই যুগের অনন্য প্রতিভাধর মেধাকে আকৃষ্ট করিতে ব্যর্থ হইল। কেবল তাহাই নহে, ফলে সমগ্র পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ তাহাদের হাতছাড়া হইল'।[১০]

মুইর যে ধারণা পোষণ করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাই মারগোলিয়থ গ্রহণ করিয়া নিজের মত করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মারগোলিয়থ ধরিয়া লইয়াছেন যে, মহানবী ﷺ-এর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁহার এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডে তিনি বহু মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং কথা প্রসঙ্গে টুকরা টুকরা তথ্য গ্রহণ করিতেন। মারগোলিয়থ বিষয়টি এইভাবে লিখিয়াছেন, মদের দোকানে আলাপ-আলোচনা হইতে অথবা গল্প-বলিয়ের গল্প শুনিয়া, যাহাদের মধ্যে অনেকেই থাকিত ইয়াহূদী কাপড় ব্যবসায়ী,[১১] তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিতেন। আরব ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও যোগাযোগের ফলে, বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ "এক প্রকার বাইবেলীয় বাগধারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন"।[১২] আরও বলা হইয়াছে যে, তিনি নাকি ব্যবসায়িক কাজে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, "তাঁহার পবিত্র গ্রন্থের সর্বত্র তাঁহার এই পেশার চিহ্ন চোখে পড়ে"।[১৩] মুইরের মতই পুনরায়

মারগোলিয়থ বলেন যে, এই দুই পদ্ধতি সম্পর্কে মহানবী -এর জ্ঞান নাকি ছিল ক্রটিপূর্ণ এবং "ভাসা ভাসা"।[১৪] মারগোলিয়থ অবশ্য আরও যোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দিনে দিনে নাকি বাইবেলীয় কাহিনী সম্পর্কে মহানবী -এর জ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মারগোলিয়থ লিখিয়াছেন, "কুরআনের কলেবর যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল ততই" নাকি "তাঁহার বাইবেলীয় জ্ঞান ক্রটিমুক্ত হইতেছিল ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, যদিও এই ক্রমান্বয়ে অধিকতর সঠিক তথ্য পরিবেশনের কারণ মহানবীর স্মৃতিশক্তি। সম্ভবত তিনি সময়ের সঙ্গে অধিক তথ্য সংগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন"।[১৫]

কিন্তু মুইর যে স্থানে ক্ষেদোক্তি করিয়াছেন যে, খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে 'বিকৃত' তথ্য প্রাপ্তির কারণে তিনি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, সেই স্থানে মারগোলিয়থ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উহা ছিল মহানবী -এর পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ। মারগোলিয়থ বলেন, মহানবী যে ভূমিকা পালন করিয়াছেন উহার ধারণা "দীর্ঘ কাল হইতেই ইয়াহূদী, খৃস্টান ও পারসিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা হইতেই" তাঁহার মনে উপস্থিত ছিল। তিনি যাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন তাহাদের "সকলেরই একটি জিনিস ছিল যাহা আরবদের ছিল না ঃ উহা হইল আইন প্রণয়নকারী যিনি ঐশ্বরিকভাবে আদিষ্ট.... প্রত্যেক জাতির অনুরূপ একজন নেতা থাকা আবশ্যক। এই স্থানেই ছিল একজন পয়গাম্বরের জন্য সুযোগ"।[১৬]

মুইরের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া মার্গোলিয়থ বলেন যে, মহানবী সিরিয়ায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, "খৃস্টবাদের জাতীয় পেশা" এবং মহানবী যে সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সেখানেই দেখিয়াছিলেন "সকলেই ঈশ্বরের আইনের অধীন"। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার দেশের পশ্চাদগামিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছিলেন এবং সেজন্য যে সংস্কার প্রয়োজন সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হইয়াছিলেন। সেই সংস্কার তিনি পয়গাম্বর হইয়া ওহীর মাধ্যমে সাধন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ উহাই তাঁহার মতে ছিল উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত।[১৭]

তিনি খৃস্ট ধর্ম অথবা ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। কারণ মারগোলিয়থের মতে, খৃস্ট ধর্মকে "বায়যান্টাইন নাগপাশ হইতে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাহা ছাড়া মুহাম্মাদ অনেক বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন, তিনি কখনও আপন জাতির উপর পরাধীনতার জোয়াল চাপাইয়া দিতে পারেন না"। অনন্তর তিনি যদি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণও করিতেন তাহা হইলেও তিনি "যাহারা পুরাতন খৃস্টান তাহাদিগের তুলনায় সেই ধর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে পারিতেন না"।[১৮] তিনি "ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের মানব প্রকৃতির ছাত্র" হিসাবে স্থির করিলেন যে, তিনি মূসা (আ) অথবা যীশুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। মারগোলিয়থ আরও বলেন, মুহাম্মাদ দেখিলেন, তাহারাও মানুষ ছিল, অতএব তাহারা যাহা পারিয়াছে তিনিও তাহা করিতে পারিবেন।[১৯] তাহার মতে, তদানীন্তন খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ ও মতপার্থক্য নাকি তাঁহার পরিকল্পনার জন্য সুবিধাজনক হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া খৃস্টানদের পরবর্তী কালের বিভিন্ন উপদলের

মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল এবং তিনি মদীনায় দাবি "করিয়াছিলেন যে, তাহারা যে সকল ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে না সেইগুলিকে ঠিক করার জন্যই তাঁহার আগমন ঘটিয়াছে"।[২০]

মুইর ও মারগোলিয়থের এই ধারণাই ওয়াট গ্রহণ করিয়া সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তাহার রচিত গ্রন্থ Muhammad at Mekka ("মক্কায় মুহাম্মাদ")-তে। সেই গ্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ঃ "ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সূত্রের সহিত ইসলামের শিক্ষার সম্পর্ক"। বিষয়টিকে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অন্যতম তত্ত্ব হিসাবে তিনি বলিয়াছেন, ইসলামের মহানুভবতার অন্যতম কারণ কতকগুলি আরব বৈশিষ্ট্যের সহিত বিশেষ কয়েকটি ইয়াহূদী-খৃস্টান ধারণার সংমিশ্রণ।[২১] তিনি একটি বিস্তৃত পরিসরে তাহার বক্তব্যকে উপস্থাপন করিয়াছেন, অতঃপর সাধারণভাবে আরবদের উপর অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর, সেইসঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এই সকল সূত্রের প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।[২২] ওয়াটও তাহার পূর্বসূরীদের ন্যায় বলিতে চাহিয়াছেন যে, খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের নিকট হইতে মুহাম্মাদ ﷺ একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সেই সময়ের হানীফ নামক একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের প্রভাবের সম্ভাবনার কথাও বলিয়াছেন।[২৩] তদুপরি তিনি আরও গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছেন যে, "একেশ্বরবাদ সম্পর্কে আরবদের মধ্যে এক প্রকার আশঙ্কাবোধ জন্মলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ অবশ্যই ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রভাব"।[২৪] মুইর ও মারগোলিয়থের ন্যায় ওয়াটও এই সকল প্রভাবের উৎস সন্ধান করিয়াছেন আরবদের সহিত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সংস্পর্শের মধ্যে, বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগের মাধ্যমে। বায়যান্টাইনদের শক্তি ও সভ্যতার প্রতি আরবদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আবিসিনিয়া, এমনকি হীরার সহিত যে যোগাযোগ ছিল তাহার মাধ্যমে এই সকল প্রভাব আসিয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করেন। হীরা ছিল পূর্ব সিরিয়া অথবা নেস্টোরিয়ান খৃস্টানদের দূরবর্তী বসতি বা উপনিবেশ।[২৫] কেবল তাহাই নহে, মুইর ও মারগোলিয়থ যে অনুমান করিয়াছিলেন ওয়াটও সেই একই অনুমান পোষণ করিয়াছেন। তিনিও মনে করেন যে, নবুওয়াতের ধারণাও নাকি তিনি খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। ওয়াট লিখিয়াছেন, "আদ ও ছামূদ জাতির পয়গাম্বর ছিলেন হূদ (আ) ও সালিহ (আ), এই ধারণাও সম্ভবত ইয়াহূদী-খৃস্টান ধারণার প্রয়োগের একটি কুরআন-পূর্ব যুগের উদাহরণ"।[২৬]

"পরোক্ষ পারিপার্শ্বিক প্রভাব" সম্পর্কে লিখিবার পর ওয়াট "প্রত্যক্ষ" প্রভাবের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেখানে "যথেষ্ট পরিমাণে অনেক ভাল প্রমাণ" রহিয়াছে যাহাতে দৃষ্ট হয় যে, মহানবী ﷺ-এর "একজন একেশ্বরবাদী তথ্য সরবরাহকারী" ছিল।[২৭] এই "অনেক ভাল প্রমাণ" তিনি কুরআনের বাণী হইতেই দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ১৬ ঃ ১০৩ আয়াত দ্বারা। বলা প্রয়োজন যে, মারগোলিয়থও এই একই উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ -এর একজন তথ্য সরবরাহকারী ছিল।[২৮] উক্ত উদ্ধৃতি অবিশ্বাসিগণের অভিযোগকে যেরূপ

মিথ্যা বলিয়াছে সেইরূপ ইহাও দেখাইয়াছে যে, যে ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে সে ভিন্ন ভাষায় কথা বলিত এবং পবিত্র কুরআন স্পষ্টই আরবী ভাষায়।[২৯] ওয়াট অবশ্য মারগোলিয়থের উল্লেখ না করিয়া তাহার পরিবর্তে সি.সি. টোরির উক্ত আয়াতের অদ্ভুত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।[৩০] অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, মহানবী ﷺ -এর যে একজন মানব শিক্ষক ছিল তাহা নাকি তিনি অস্বীকার করেন নাই। তিনি নাকি কেবল জোর দিয়াছেন যে, তিনি নাকি আসমানী উৎস হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।[৩১]

"সময়ের সাথে সাথে বাইবেলের কাহিনী সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং সঠিক হইতেছিল"—এইরূপ ধারণা করিয়াছেন মারগোলিয়থ। মারগোলিয়থের সেই ধারণাকেই ওয়াট তাহার পূর্ববর্তী অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্মাণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ওয়াট কুরআন শরীফের মোট সাতটি বাক্যাংশ উল্লেখ করিয়াছেন যেইগুলি আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব। সেখানে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, "ক্রমান্বয়ে পুরাতন নিয়মের কাহিনীর সহিত তাঁহার পরিচিতি বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিশেষ করিয়া আবরাহাম ও লোত সম্পর্কে"।[৩২] ওয়াট আরও যোগ করিয়াছেন, "এইরূপ আরও অনেক" উদাহরণ দেওয়া যায় যাহা ক্রমান্বয়ে সঠিক হইতেছিল। কিন্তু তিনি উদাহরণগুলি দেন নাই। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, এই সকল কারণে "পাশ্চাত্যের সমালোচকদের" পক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া কঠিন ছিল যে, নবীর "এই সকল কাহিনী সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তিনি কোন একজন অথবা একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য লাভ করিতেছিলেন যিনি বা যাহারা এই বিষয়ে পরিচিত ছিলেন"।[৩৩] এই সম্পর্কে ওয়াট কুরআনের ১১ ঃ ৫১ আয়াতের বরাত দিয়াছেন যেখানে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম ﷺ ও তাঁহার জাতি ইতোপূর্বে নবীদের এই সকল কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না যাহা তাঁহার নিকট অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। ওয়াট তখন বলেন, "যাহারা নবীর আন্তরিকতায় বিশ্বাসী তাহাদের জন্য এই আয়াত বিব্রতকর"। ইহার সমাধান এই যে, ইহার অন্তর্গত শব্দ নূহী (আমরা প্রত্যাদেশ করি)-এর ব্যাখ্যা হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, কাহিনী ও শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং তাহার প্রকৃত অর্থ "ইহার মধ্যে যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেই" ইত্যাদি।[৩৪]

ওয়াট তাহার পরবর্তী সর্বশেষ রচনায় সেই একই মনোভাব পোষণ করিয়া কুরআনের ২৫ ঃ ৪ আয়াত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সম্ভবত মুহাম্মাদ ﷺ -এর একাধিক তথ্য সরবরাহকারী ছিল এবং কুরআনও "অস্বীকার করে না যে, তিনি এই প্রকারেই সংবাদ পাইতেন"। কিন্তু সেখানে কেবল বলা হইয়াছে যে, এইভাবে যে তথ্য তিনি লাভ করিতেন তাহা কুরআন নহে। "কারণ একজন বিদেশী স্পষ্ট ভাষায় আপন বক্তব্য ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে"। এইভাবে ওয়াট পুনরায় বলেন যে, "পয়গাম্বর ﷺ যে তথ্য কোন্ তথ্য সরবরাহকারীর নিকট হইতে লাভ করিতেন তাহা নিছক সত্য তথ্যভিত্তিক জ্ঞান", কিন্তু ইহার অর্থ ও ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট আসিত "স্বাভাবিক প্রত্যাদেশ হিসাবে"।[৩৫]

এমনিভাবে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম হইতে ধার করার বিষয় লইয়া ওয়াট যখন পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং মারগোলিয়থের অনুমান পুনরাবৃত্তি করেন যে, মহানবী ﷺ তাহাদের এই দুই ধর্ম সম্পর্কে কিছু বিকৃত ও ভুল তথ্য লাভ করিয়াছিলেন যাহা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। মুইরের "গোঁড়া সম্প্রদায়ের " ও সিরিয়ান চার্চ-এর বিরুদ্ধে বক্রোক্তিকে পরিহার করিয়া ওয়াট বলেন যে, "খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের যে বিশেষ সম্প্রদায় আরবদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাদের নানা প্রকার অদ্ভুত ধারণা ছিল"। ওয়াট গুরুত্ব সহকারে ওই সকল অদ্ভুত ধারণার উদাহরণ হিসাবে বলেন যে, সেগুলি কুরআনের কথা যেখানে বলা হইয়াছে, "ত্রিত্ববাদ হইতেছে পিতা, পুত্র ও মেরি"। ওয়াটের মতে এই সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে নামমাত্র খৃস্টান আরবদের সমালোচনা। তাহারাই এইরূপ ধারণা পোষণ করিত। ওয়াট আরও বলেন যে, ইয়াহূদীদের দিকেরও "অনেক বিস্তারিত বিবরণ" কুরআনে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যাহা "পবিত্র গ্রন্থ" হইতে আসে নাই, বরং "বিভিন্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্র হইতে আসিয়াছে"।[৩৬]

একই কথা তিনি তাহার সর্বশেষ গ্রন্থে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "মক্কার কিছু লোক অজ্ঞতাবশত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা পোষণ করিত"। যেমন "খৃস্টানরা যীশু ও মেরিকে দুই ঈশ্বর মনে করে তাহা ছাড়াও একজন ঈশ্বর আছেন এবং ইয়াহূদীরা মনে করে 'উযায়র (এযরা) ঈশ্বরের পুত্র"।[৩৭]

ওয়াট বলেন যে, কুরআনের এই বক্তব্য "সম্ভবত ভুল", "এইগুলি মক্কাবাসীর বিশ্বাস" এবং তাহার মতে, "ঈশ্বরের জন্য ইহা আবশ্যক নহে যে, তিনি এই সকল ভুল ধারণা সংশোধন করিয়া দিবেন"। কারণ ঈশ্বর প্রধানত আরবদিগকেই "তাহাদের বর্তমান বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে সম্বোধন করিতেছেন" এবং কুরআনের বাণী এই সকল বিশ্বাস সংশোধন না করিয়াই প্রচার করা যায়।[৩৮] একই অনুমানকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে গিয়া ওয়াট বলেন, "কুরআন সর্বপ্রথম আরবদিগকেই সম্বোধন করে তাহাদের যে জগত সেই জগতের প্রেক্ষিতে", এমনকি সেই ক্ষেত্রে "যদি ভুলও হয়"। এই বক্তব্যের পক্ষে তিনি পৃথিবী যে সমতল এইরূপ তৎকালীন ধারণার উল্লেখ করিয়াছেন এবং কুরআন শরীফ হইতে প্রায় সাতটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, কুরআনে সেই ভুল তথ্যই দেওয়া হইয়াছে।[৩৯]

পুনরায় মুইর ও মারগোলিয়থ , বিশেষ করিয়া মারগোলিয়থের মতই ওয়াট বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার দেশ ও জাতির অসন্তোষজনক সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সংস্কার প্রয়োজন এবং চিন্তা করিলেন যে, ইহা ধর্ম ও প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই সম্ভবপর। ওয়াট সেই কথা এরূপভাবে দিয়াছেন, মুহাম্মাদ ﷺ "হয়তো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, এই অসন্তোষজনক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে কোন এক প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব"।[৪০] আবার মারগোলিয়থের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চমৎকারভাবে ওয়াট আরও অনুমান করেন, অবশ্য অতি সাবধানতার সহিত মুহাম্মাদ ﷺ একটি নূতন একেশ্বরবাদী ধর্মের সূচনা করিলেন

যাহাতে কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা না থাকে, সে কারণে ইয়াহূদী ধর্ম বা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলেন না। কারণ "বায়যান্টাইন ও আবিসিনিয়া সাম্রাজ্যের সহিত খৃষ্ট ধর্ম জড়িত ছিল এবং পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি ইয়াহূদী ধর্মের সমর্থন ছিল।[৪১] প্রকৃতপক্ষে ওয়াট তাহার আলোচনার উপসংহার বেলের মন্তব্যকে গ্রহণ করিয়াই টানিয়াছেন, সেখানে বলিয়াছেন, "মুহাম্মাদের জীবনী অধ্যয়ন করিতে হইলে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রায়িত করার খুব কমই প্রয়োজন। কারণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "খুটিনাটি অনেক বিষয় বিতর্কিত"। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন, "ইহা অনুধাবন করাই প্রকৃত প্রয়োজন যে, মুহাম্মাদের নিকট কুরআন আগমনের পূর্বেই তেমন বিষয় সেখানকার বাতাসে বিদ্যমান ছিল এবং উদ্দেশ্য হাসিলের উহাই ছিল তাঁহার নিজের ও পরিবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের অংশ"।

পাশ্চাত্যের এই পণ্ডিতবর্গ প্রায় সকলেই একই প্রকার যুক্তি ও একই প্রকার মতামত উপস্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের এই সকল যুক্তি ও মতামত প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচটি অনুমান বা ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্তিত হইয়াছে ঃ

১. ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের অবস্থাগত বা পরিবেশগত প্রভাব।

২. কোন কোন খৃষ্টান ব্যক্তির সহিত হযরত মুহাম্মাদ -এর যোগাযোগ ছিল বলিয়া অভিযোগ।

৩. সেই খৃষ্টান ব্যক্তির / ব্যক্তিবর্গের তথ্যকে তথাকথিত কুরআনের সাক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া।

৪. ধরিয়া লওয়া যে, বাইবেলের কাহিনী নাকি সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে কুরআনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

৫. অভিযোগ করা যে, সেকালের ভুলগুলি কুরআনে ভুল হিসাবেই উদ্ধৃত।

নিম্নে প্রথম চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হইবে এবং পঞ্চম বিষয়টি লইয়া পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

দুই ঃ সাধারণভাবে পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা

ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, আরবদেশে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী ও খৃষ্টান বসবাস করিত। ইয়াহূদীগণ প্রধানত মদীনায় এবং খৃষ্টানগণ নাজরানে থাকিত। যতদূর জানা যায়, মহানবী -এর জন্মভূমি মক্কা এবং তাঁহার কর্মজীবনের অবস্থা যেখানে সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন খৃষ্টান বসবাস করিত এবং তাহাদের অবস্থা সামাজিক ও বিদ্যাবুদ্ধির দিক হইতে অতিশয় নিম্নমানের ছিল। কারণ তাহারা ছিল ক্রীতদাস অথবা সামান্য ফেরিওয়ালা এবং অধিকাংশই ছিল প্রবাসী। দুই-একজন ছিলেন মক্কার আদিবাসী, যেমন উছমান ইব্‌নুল হুওয়ায়রিছ ও ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল। প্রথমজন ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক কারণে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং

নাওফাল উন্নততর ধর্মবিশ্বাস অন্বেষণ করিতে গিয়া খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদুপরি মক্কাবাসীরা খৃস্টান অধ্যুষিত সিরিয়া ও আবিসিনিয়ার সহিত বাণিজ্য করিত। অতএব ইহা সহজেই বোধগম্য যে, মুহাম্মাদ ﷺ -সহ মক্কার ওয়াকিফহাল মহল ধর্ম হিসাবে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে কিছু অবশ্যই জানিত। তাহারা ইহাও জানিত যে, উভয় ধর্মেই বিশ্বাসের দিক হইতে কিছু মিল রহিয়াছে, তাহাদের পূজারীরা যে সকল পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান করিত তাহাও কিছুটা জানিত। ইহাও সত্য যে, আমাদের এই তিন পণ্ডিত মুইর, মারগোলিয়থ ও ওয়াট একটি বিষয়ে একমত যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান খুব বেশি হইলেও তাহা ছিল গৌণ, 'ভাসাভাসা' ও ভ্রান্তিপূর্ণ। মারগোলিয়থ আরও বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যে কারণে এই দুই ধর্মের কোন একটিও গ্রহণ করেন নাই তাহা এই যে, তিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সকল ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার যে জ্ঞান আছে বলিয়া তিনি ভান করিবেন তাহা অপেক্ষা ওই সকল ধর্মের পুরাতন অনুসারীরা অনেক বেশি জ্ঞাত। অবস্থা যখন এমনই হয় যাহা প্রাচ্যবিশারদগণ মনে করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্ত ছিল, তাহা হইলে সাধারণ পাঠক প্রশ্ন তুলিতে পারেন, ইহা কি ধরিয়া লওয়া বা অনুমান করা যুক্তিসংগত যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মত বুদ্ধিমান ও সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সর্বজনস্বীকৃত একটি নূতন ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হইবেন এবং ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের মত দুইটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্পর্কে কেবল সেই শোনা কথা ও ভাসাভাসা জ্ঞান লইয়া সেই ধর্মের ভুল-ত্রুটি দেখাইতে অগ্রসর হইবেন?

প্রাচ্যবিশারদগণ যদিও মুহাম্মাদ ﷺ যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও প্রস্তুতি ছিল এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, অথচ নিজেদেরকে সেই প্রশ্ন করেন নাই। প্রাচ্যবিশারদগণের সহজাত দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা এই স্থানে চোখে পড়ে যে, তাহারা একদিকে বলিতেছেন, মহানবী ﷺ ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং সেই কারণে তিনি ইয়াহূদী ধর্ম বা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনীতিকে জড়ানোর ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন; অন্যদিকে তিনি এমনই উদাসীন ছিলেন যে, বাজারের গল্প ও মদের দোকানের ইয়াহূদী গল্প কথকের নিকট হইতে শ্রুত কাহিনী হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রকৃত তথ্য এই যে, যেমন অর্বাচীনের বক্তব্যের মত এই কথা বলা যে, ইসলাম হইতেছে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কিত গৌণ তথ্যের সহিত কিছু আরব উপাদান সংমিশ্রণজাত ধর্ম। অনুরূপ অবাস্তব বক্তব্য হইতেছে তাহাদের অনুমান যে, মহানবী ﷺ ওই দুইটি ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে নবুওয়াত, ওহী এবং আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই সকল ধারণার অস্তিত্ব থাকার অর্থ এই নহে যে, সেই ধারণা খৃস্টধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম হইতেই আসিয়াছিল, যদিও নিঃসন্দেহে তাহাদের মধ্যে উহা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি বা রিসালাত সম্পর্কীয় ধারণা অবিসংবাদিতভাবে ইয়াহূদী-পূর্বকালীন ও খৃস্ট-পূর্বকালীন। ইবরাহীম ('আ) নবী ছিলেন, তিনি কা'বাঘর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম ('আ)-এর সময় হইতে কা'বাঘরকে কেন্দ্র করিয়া হজ্জ পালন আরবদের

চিরকালের আপন বিষয় বলিয়া তাহারা সেইগুলি ধরিয়া রাখিয়াছিল। তদুপরি খৃস্টান ও ইয়াহূদী প্রভাব ব্যতিরেকেই আরবদের নিকট আল্লাহ যে একমাত্র মহাপ্রভু এই ধারণা পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাগুলি ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষারই অবশিষ্টাংশ এবং ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম আগমনের পূর্বেই সমগ্র আরবভূমিতে ছড়াইয়া ছিল, তেমনি এক আল্লাহ্র পূজারী হানীফ-এর ধারণাও যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও আছে।[৪৩] অবশ্য প্রাচ্যবিশারদগণ স্বীকার করেন যে, ইসলাম-পূর্ব কালে আরববাসিগণের মধ্যে আল্লাহ্র ধারণা বিদ্যমান ছিল। সবশেষে ওয়াট এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।[৪৪] কিন্তু তিনি কুরআন শরীফের কয়েকটি অতি পরিচিত আয়াত, যেখানে ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল বলিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে গিয়া টেক্সিডোরের উৎকীর্ণ লিপি অধ্যয়নের উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে গ্রীক-রোমান সময়ে নিকট-প্রাচ্যে মহামহিম এক সর্বোচ্চ আল্লাহ্র ধারণা বিদ্যমান ছিল তাহা দেখাইয়াছেন।[৪৫] এবং এইভাবে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তৎকালে বিদ্যমান ধারণা হইতে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অতি সাবধানতার সহিত ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মে "মহামহিম এক সর্বোচ্চ আল্লাহ্র" প্রভাবের বিষয় পরিহার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাও ব্যাখ্যা করেন নাই যে, কি প্রকারে এই বিশেষ প্রকৃতির ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহা বহু-ঈশ্বরবাদী আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি অবশ্য ধারণা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই পুরাতন ধর্ম বা পৌত্তলিকতা (প্যাগানিজম) তখন ধ্বংসোন্মুখ ছিল; কারণ তাহার মতে, দেব-দেবীর যে কোন শক্তি নাই সেই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত ধারণা জন্মলাভ করিতেছিল।[৪৬] সেইসঙ্গে অন্যান্যদের অনুসরণ করিয়া তিনি "আল্লাহ" শব্দের উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৪৭] তথাপি না তাহার এই ব্যাখ্যা, না সেই অনুমিত প্যাগানিজমের অবক্ষয়, কোন প্রকারেই "সুমহান প্রভু" আল্লাহ্র ধারণার উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই।

একত্ববাদের ধারণা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন তথা মহানবী ﷺ সমকালীন আরব, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই মৌলিক একত্ববাদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সকলেই তাহাদের নবীর মূল শিক্ষা হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং বিকৃত হইয়া বহু-ঈশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে একত্ববাদের ধারণা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তাহারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ একত্ববাদের যে শিক্ষা দিয়াছে সেই শিক্ষাকে বিতর্কিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রকৃত একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফের প্রতি যদি হালকাভাবেও দৃষ্টি সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে দুইটি সত্য ধরা পড়ে। প্রথমত, কুরআন কোথাও কোন মৌলিকত্বের দাবি করে না ও বলে না যে, উহা এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছে। ইহার একমাত্র দাবি যে, আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন জাতির নবীগণকে যে বাণী দিয়াছেন ইহা সেই একই বাণীকে কেবল পুনর্জীবিত করিয়াছে

এবং উহাকেই সংরক্ষণ করিয়াছে। এখানেই কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব। আরও সঠিকভাবে বলিলে বলিতে হয়, কুরআন সেই একই শিক্ষা দিতেছে যাহা ইবরাহীম (আবরাহাম), মূসা ও ঈসা ('আ)-এর মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলের সম্পর্কে কুরআন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বক্তব্য উচ্চারণ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কুরআন সমকালীন আরব, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত সকল প্রকার বহু-ঈশ্বরবাদী আচার-আচরণ ও বিশ্বাসকে দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কুরআনের এই দ্বিমাত্রিক বক্তব্য প্রাচ্যবিশারদগণ যাহা বলিতে চাহিতেছেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, তাহাদের পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে সরাসরি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধারণা ছিল না। কারণ তিনি উহা নিজেও পাঠ করেন নাই এবং তখন আরবী ভাষায় উহা অনূদিতও হয় নাই।

অপরপক্ষে পবিত্র কুরআন এবং একই প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ নিজে বারংবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, মূলত তাঁহাদের শিক্ষা এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মূল গ্রন্থের শিক্ষা এক ও অভিন্ন। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যবিশারদগণ বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ সমকালীন যে সকল ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাহাদের নিকট হইতেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কুরআন এবং মুহাম্মাদ ﷺ বলেন যে, সমকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ বিভ্রান্ত ও ভুল ছিল এবং তাহারা তাহাদের নিজেদের পবিত্র কিতাব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল, বিশেষ করিয়া একত্ববাদ বিষয়ে তাহারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না।

এমতাবস্থায় যে কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া অবশ্যই বলিবেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যেখান-সেখান হইতে শোনা কথার ভিত্তিতে আপন বক্তব্য নির্মাণ করেন নাই। তাহা হইলে তিনি মৌলিকতার ভান করিতেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থে আপন উপদেশসমূহ অন্বেষণ করিতেন না অথবা এমন শ্রোতা বাছিয়া লইতেন যাহারা তাঁহার তথ্যের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইত না। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁহার কোন সমকালীন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ করেন নাই। কারণ তিনি স্পষ্টতই তাহাদের মধ্যে ত্রুটি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সঠিক পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রদর্শিত পথে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, যখন তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তব্য ও শিক্ষা এবং তাঁহার পূর্ববর্তী কিতাবের বক্তব্য ও শিক্ষা একই, সেই সাথে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি সেই কিতাবগুলি পাঠ করেন নাই এবং এই ব্যাপারে প্রাচ্যবিদগণও একমত, সেই ক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞানের উৎস উহা নিজেই পাঠ করা অথবা অন্যের মাধ্যমে সমকালীন কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে পারে না, বরং ইহার উৎস নিশ্চয়ই ভিন্নতর কোথাও রহিয়াছে।

কয়েকজন প্রাচ্যবিশারদ, বিশেষ করিয়া ওয়াট অবশ্য ধারণা করেন যে, কোন তৃতীয় পক্ষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে এবং উহা কোন একত্ববাদী তথ্য সরবরাহকারী অথবা মহানবীর কোন তথ্য সরবরাহকারী। এই অনুমান সমস্যা সমাধান অপেক্ষা অনেক বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করে। বর্তমানে তিনি যে কুরআন ভিত্তিক প্রমাণ খাড়া করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

সেই ক্ষেত্রে বক্তব্য একটিই, মহানবী ﷺ-এর একজন তথ্য সরবরাহকারী ছিল—কুরআন এই কথা সমর্থন দূরে থাক, সেখানে ঠিক বিপরীত কথাই বলা হইয়াছে এবং অবিশ্বাসিগণ যে অভিযোগ আনিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিয়াছে।

বলা হয়, বিশেষ করিয়া মারগোলিয়থ বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ নাকি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে আবরাহামের নাম জানিয়াছেন এবং আপন শিক্ষাকে তাঁহার শিক্ষার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া একটি ধারাবাহিকতা নির্মাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের উপর তাঁহার অগ্রবর্তী অবস্থান রহিয়াছে। তিনি নাকি ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন। এই দুইটি ধারণার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয় এবং যুক্তিতেও টিকে না।

আবরাহামের ঐতিহ্য কা'বা শরীফ এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলি মহানবী ﷺ-এর জন্মের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। তিনি যদি এইগুলি উদ্ভাবন করিতেন এবং ইবরাহীমের শিক্ষার সহিত সম্পৃক্ত করিতেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধাচারিগণ তো তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতই, এমনকি তাঁহার অনুসারিগণও বিদ্রূপ করিত। দ্বিতীয়ত, মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার ইয়াহূদীদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বেই মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি একদিকে ঈশ্বরের পুত্রত্ব ও পিতৃত্ব জাতীয় বাইবেলীয় কাহিনী অস্বীকার করেন এবং অন্যদিকে গুরুত্ব সহকারে বলেন যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তাহাদের মূল পবিত্র গ্রন্থের প্রকৃত শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত সত্য এই যে, সমকালীন খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্মের সহিত যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকুক না কেন, উহাকে যতই নিবিড়ভাবে অবলোকন করা হউক না কেন তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার একত্ববাদের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। এমনকি তাহাদের সুদূর অতীতের অতি পুরাতন পবিত্র গ্রন্থ যদি উত্তমরূপে পাঠও করা হয় তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে একত্ববাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ওল্ড টেস্টামেন্টে যে ঈশ্বরের চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে সেই ঈশ্বর যেন কোন গোত্র বা জাতির ঈশ্বর, খোলাখুলিভাবে তিনি ইসরাঈল বংশোদ্ভুত জাতির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। এমন ঈশ্বর কদাচিৎ অ-ইয়াহূদী জাতির কল্পনাকে আকৃষ্ট করে, শ্রদ্ধা তো দূরের কথা।

অন্যদিকে নিউ টেস্টামেন্টের কথা ও বক্তব্য এক ঈশ্বর সম্পর্কে এমনই ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট। কারণ সেই এক ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যাখ্যার অযোগ্য ও ত্রিত্বের স্বীকৃতভাবে রহস্যময় তত্ত্ব সংযোগ এমন এক ঈশ্বরের ধারণা দিতে চেষ্টা করে যাহা একেবারেই দুর্বোধ্য। 'ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র' এবং 'ঈশ্বর পবিত্র আত্মা' সেখানে দুর্বোধ্য একত্ব একের তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্য বা গুণ নয়, বরং তিনটি পৃথক সত্তা। তদুপরি অবতারবাদের তত্ত্বগত মতবাদ যাহার উপর 'ঈশ্বর-ই পুত্র' এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত তাহা হিন্দু ধর্মের মতবাদ হইতে ভিন্ন কিছুই নহে। একজন খৃস্টানের ন্যায় একজন আধুনিক হিন্দু একই সঙ্গে বহু দেব-দেবী স্বীকার করেন, আবার ত্রিত্বের তত্ত্বের ন্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

শিবেও বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে দাবি করিতে পারেন যে, তাহার মূল গ্রন্থে এক ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর[৪৮], তথাপি যাহারা হিন্দু নহেন তাহাদের জন্য বিশ্বাস করা কঠিন যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে একেশ্বরবাদ রহিয়াছে। সেই সময়ের ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা চরম দুর্নীতিতে অধঃপতিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং একত্ববাদ হইতে বহু দূরে ছিল। মুইর পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার করেন যখন তিনি রোম সাম্রাজ্যে মিথ্যা চিহ্নিত ক্যাথোলিসিজম' ও সিরিয়ায় "গোঁড়া সম্প্রদায়ের" কড়া সমালোচনা করেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর পরিস্থিতি পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমান্বয়ে অধঃপতিতই হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে খৃস্ট ধর্মের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করিয়া ক্লুনিয়াক আন্দোলন, আইকোনোক্লাস্টিক আন্দোলন এবং মার্টিন লুথার কর্তৃক সংস্কার আন্দোলন প্রমাণ করে যে, খৃস্ট ধর্ম ও খৃস্টানগণ অধঃপতনের কত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। এই সকল সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তী কালে একত্ববাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদের প্রতি এবং যীশুর ঐশ্বরিকতার প্রতি বিশ্বস্ততা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া যাহা ইসলাম যে নিরঙ্কুশ একত্ববাদের (তাওহীদ) স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছে তাহার ফলে হইয়াছে। যাহা হউক সপ্তম ও অষ্টম শতকে সিরিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে খৃস্ট ধর্মের যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহাতে সেই ধর্মের প্রতি কেহ আকর্ষণ বোধ করা দূরে থাকুক, বরং বিকর্ষণবোধ স্বাভাবিক ছিল। ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে যে, সেই বিভ্রান্তকারী আত্মাভিমান যদি কাহাকেও এই ধারণা দিতে চায় যে, সিরিয়ায় খৃস্টবাদ অবলম্বনই ছিল 'জাতীয়' পেশা এবং তাহা নবীন সংস্কারক মুহাম্মাদ ﷺ -কে প্রভাবিত করিয়াছিল তবে ঐতিহাসিকভাবে উহার কোনই ভিত্তি নাই।[৪৯]

তিন ঃ ইয়াহূদী-খৃস্টান বিশেষজ্ঞদের সংস্পর্শে আসার তথাকথিত অভিযোগের উদাহরণ

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ দুইবার সিরিয়া গিয়াছিলেন। একবার তাঁহার বার বৎসর বয়সে তাঁহার চাচার সঙ্গে এবং পুনরায় পঁচিশ বৎসর বয়সে খাদীজা (রা)-র বাণিজ্য বহরের নেতা হিসাবে। প্রাচ্যবিশারদগণ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর সর্বজনবিদিত এই দুই ভ্রমণ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা হইয়া থাকে যে, এই দুইবার ভ্রমণকালে প্রথমবার বাহীরা নামক একজন খৃস্টান পাদ্রী এবং দ্বিতীয়বার একজন নেস্তোরিয়ান খৃস্টান সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যথেষ্ট সন্দেহ এবং সম্ভাবনাহীনতা রহিয়াছে।

বিশেষ করিয়া মুইর-সহ অনেক প্রাচ্যবিশারদ এই ঘটনাকে তুচ্ছ হিসাবে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ 'যখনই চলার পথে কোন খৃস্টান পাদ্রী বা সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপের বা যোগাযোগের সুযোগ পাইতেন তিনি সেই সুযোগ ত্যাগ করিতেন না'। মারগোলিয়থ সেই একই অনুমানকে আরও বাড়াইয়া বলিয়াছেন এবং মুইর

তাহার সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়া বলিয়াছেন, 'মুহাম্মাদ সম্ভবত সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরকালে খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন'।[৫০] ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, তিনি যে বাণিজ্য সফরে গিয়াছিলেন উহা খৃস্টানদের দেশেই বাণিজ্য সফর ছিল। সেই দেশের অধিকাংশ অথবা সকল অধিবাসী ছিল খৃস্টান। সেখানে খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ হইবেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মহানবী বাণিজ্য করিতে গিয়া কোন খৃস্টান ব্যক্তি অথবা কোন খৃস্টান পাদ্রীর নিকট হইতে খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করিতেন এমন কোন তথ্য-প্রমাণ উৎসগ্রন্থসমূহে নাই এবং দলীল হিসাবে উপস্থাপনও করা হয় নাই—ইহা লক্ষণীয়। এমনকি বাহীরা ও নেস্তোরিয়াসের সহিত সাক্ষাতের যে সন্দেহজনক বিবরণের উল্লেখ করা হয় সেখানেও দেখা যায় যে, তাহারাই অর্থাৎ বাহীরা ও নেস্তোরিয়াস তাঁহার সম্পর্কে জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্পর্কে মতামত দিয়াছিলেন। মহানবী নিজে কিছুই করেন নাই। তদুপরি বাহীরার সহিত মহানবী -এর যে সাক্ষাতের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে মহানবী -এর সহিত তাহার কোন প্রকার গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ তখন বালক মহানবীর বয়স মাত্র বার বৎসর। তাহাছাড়া তিনি যে প্রকার বাণিজ্যকর্ম উপলক্ষে সেখানে গমন করিয়াছিলেন তখন তাহার এইরূপ কোন অবসর পাওয়ার কথা নয় যখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ঐরূপ শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া নিয়োজিত হইবেন। তিনি যদি সত্যই ঐরূপ শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হইতেন তাহা হইলে উহা অবশ্য তাঁহার সহিত আগত বহু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দুইবারই তাহারা তাঁহার সঙ্গে বাণিজ্যে আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের অনেকেই পরবর্তী কালে তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন। তথাপি আমরা পবিত্র কুরআনে দেখিতে পাই যে, অবিশ্বাসী কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তিনি নাকি কেবল একজন বিদেশীর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন যে মক্কায় অবস্থান করিত এবং আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সম্ভবত মক্কায় বসবাসরত একদল লোক তাঁহার ওহী রচনা করিয়া দিত এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইত। মুহাম্মাদ যদি তাঁহার সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরকালে কোন খৃস্টান পাদ্রীর সহিত অথবা সাধারণ কোন খৃস্টানের সহিত তথ্য সংগ্রহের জন্য অথবা নিছক আলোচনার জন্য যোগাযোগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত যাহারা সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল সেই সকল বিরোধী কুরায়শগণ ইহাকে তাঁহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতে কাজে না লাগাইয়া ছাড়িত না। তাহারা যে অনুরূপ কোন অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনে নাই ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ যে, সিরিয়া গমনকালে কাহারও নিকট হইতে তিনি খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম বিষয়ে কোন প্রকার তথ্য গ্রহণ করেন নাই।

দ্বিতীয়ত, তথাকথিত উদাহরণ, কুস ইব্ন সাইদা সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা, মুইর যাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মারগোলিয়থ পরোক্ষভাবে ইংগিত করিয়াছেন : উক্ত বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, মহানবী শুনিয়াছিলেন, কুস নাকি উকায মেলায় প্রচার কাজ করিয়াছিলেন।[৫১] এই বর্ণনাটি সর্বজনসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, উহা বাতিল ও মিথ্যা বর্ণনা।[৫২] বিশেষ করিয়া এই

বর্ণনার অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল হাল্লাজ আল-লাখমী একজন ডাহা মিথ্যাবাদী (কাযযাব)।[৫৩] এই বানোয়াট বর্ণনা সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, মহানবী ﷺ এই কথার প্রথম শ্রোতা এবং ইহার বক্তাকে সে সম্পর্কে তিনি কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রাচ্যবিশারদগণ এই প্রতিবেদনটি, ইহার দুর্বলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে যে সন্দেহ রহিয়াছে তাহা উল্লেখ না করিয়াই ব্যবহার করিয়াছেন। কোন অনুমানের সপক্ষে ইহাকে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা কতটুকু ব্যবহারযোগ্য তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা না করিয়াই যে ইহা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার প্রতিই ইংগিত করে।

যায়দ ইব্‌ন হারিছার উদাহরণও অনুরূপ দুর্বল। এই উদাহরণটি মুইর বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুইর অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে যায়দ অথবা তাহার পিতা-মাতা যে খৃস্টান ছিলেন ইহা সরাসরি উল্লেখ করা পরিহার করিয়াছেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, খৃস্ট ধর্ম যায়দের পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অতঃপর তিনি বুঝাইতে গিয়া বলেন যে, যদিও যায়দকে যখন বিক্রয় করা হয় তখন তিনি বালক তবুও নাকি তিনি খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে অনেক কিছুই মনে রাখিয়াছিলেন এবং তিনি নিশ্চয় তাহার পালক-পিতা মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঐ সকল তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা কষ্ট-কল্পনা আর কি হইতে পারে? বালক বয়সে হয়ত যায়দ খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে সামান্য কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু বালক বয়সে লব্ধ সেই জ্ঞান পরবর্তী পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্মরণ রাখা যথেষ্ট কঠিন। তাহার পরও যদি কিছু স্মরণ থাকেও তথাপি সেই তথ্য ও জ্ঞান একজন গভীর অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, যিনি ভবিষ্যতে একজন সংস্কারক হইবেন, তাঁহার অতি সামান্যই কোন কাজে লাগিতে পারে। তদুপরি যায়দ যদি সত্যই খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে মহানবী ﷺ-এর শিক্ষক হইতেন এবং যায়দের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই শিক্ষার ভিত্তিতে মহানবী ﷺ তাঁহার মতাদর্শ নির্মাণ করিতেন তাহা হইলে মহানবী ﷺ-এর প্রতি যায়দের কোন প্রকার প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ থাকিত না, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ-কে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিতেন না এবং কোনক্রমেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস রাখিতে পারিতেন না।

উদাহরণ হিসাবে প্রাচ্যবিশারদগণ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল-এর উল্লেখ করেন। সন্দেহ নাই যে, সর্বপ্রথম ওহীপ্রাপ্তির পর খাদীজা (রা) মহানবী ﷺ-কে ওয়ারাকার নিকট পরামর্শ গ্রহণের জন্য লইয়া যান। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একদিকে এই ঘটনা হইতে জানা যায়, নবী বা রাসূলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আদৌ কোন অভিলাষ বা উচ্চাভিলাষ মহানবী ﷺ-এর ছিল না। অন্যদিকে ওয়ারাকা মুহাম্মাদ ﷺ -কে একজন আন্তরিক ও অকপট চিত্তের অধিকারী বলিয়াই জানিতেন। প্রকৃতপক্ষে ওয়ারাকার সহিত হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইতোপূর্বে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে যদি আলোচনা হইত তাহা হইলে অবশ্যই উহার সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করিতেন। কোন প্রকার তথ্যসূত্র হইতে এইরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই যাহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, ইতোপূর্বে তিনি কখনও কোন বিষয়ে ওয়ারাকার সহিত আলোচনা

করিয়াছেন, যদিও বর্তমান প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় উভয়ে উভয়কে অতি নিকটজনের মাধ্যমেই জানিতেন। মহানবী ﷺ-এর সিরিয়া গমন এবং সেখানে খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ বিষয়ে অভিযোগের ক্ষেত্রে যে যুক্তি পেশ করা হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে সেই একই যুক্তি অধিকতর জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়। মহানবী ﷺ যদি ওয়ারাকার নিকট হইতে নিয়মিতভাবে খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন তাহা হইলে মক্কার কুরায়শগণ মহানবী ﷺ -কে অধিকতর কঠোরভাবে সমালোচনা ও আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইত।

চার ঃ একত্ববাদী এক বা একাধিক তথ্য সরবরাহকারী সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের তথাকথিত সাক্ষ্য

মক্কার পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দের অভিযোগ যে, মহানবী ﷺ অন্যের নিকট হইতে পরামর্শ বা উপদেশ লাভ করিতেন। এই বিষয়ে কুরআনের যে বক্তব্য ইহা আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। ইহা প্রধানত কাফিরদের সেই অভিযোগ যে বিষয়ে ওয়াট ও তাহার পূর্ববর্তীগণ তাহাদের অনুমানের ভিত্তি রচনা করিয়াছেন যে, রাসূল মুহাম্মাদের এক বা একাধিক সংবাদদাতা ছিল যাহারা তাঁহাকে একত্ববাদ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিত। এই কাজ করিতে গিয়া ওয়াট অথবা সি.সি.টোরি কুরআনের বক্তব্যের মারাত্মকভাবে ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা কি প্রকারে করা হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য আমাদের প্রয়োজন—ওয়াট তাহার অনুমানের সমর্থনে কুরআন শরীফের যে দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই দুইটি আয়াতের মূল আরবীসহ ওয়াটকৃত অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ . (نحل : ١٦: ١٠٣)

"We know they say, It is only a person teaches him. The tongue of the one they hint at is foreign, but this (the Quran) is (in) a clear Arabic tongue" (Muhammad's Mecca, 45).

"আমি তো জানি, তাহারা বলে, ইহা ত এক ব্যক্তি তাহাকে শিক্ষা দেয়। তাহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষা বিদেশী, কিন্তু ইহা (কুরআন) তো স্পষ্ট আরবী ভাষা" (১৬ ঃ ১০৩)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اِفْكُ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ . فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا . وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً .

"The unbelievers say : This is only a folsehood he invented; other people helped him with it... They said, Old-World fables, he has had written down; they are dictated to him morning and evening".

"অবিশ্বাসীরা বলে, ইহা তো একটি মিথ্যা মাত্র, সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে, অন্য লোকজন ইহাতে সাহায্য করিয়াছে; এইরূপে উহারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে। তাহারা বলিল, প্রাচীন বিশ্বপৌরাণিক কাহিনী, যে উহা লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলি সকাল-বিকাল তাহার নিকট পাঠ করা হয়") ২৫ ঃ ৪-৫)।

টোরি-কে[৫৪] অনুসরণ করিয়া ওয়াট এই দুইটি বক্তব্য, বিশেষ করিয়া প্রথম বক্তব্য এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'মুহাম্মাদ অস্বীকার করেন না যে, তাহার এক মানব শিক্ষক ছিল কিন্তু কেবল দাবি করেন যে, উহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল'।[৫৫] ওয়াট তাহার সর্বশেষ গ্রন্থে সেই বক্তব্যকে বিশদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, "কুরআন অস্বীকার করে না যে, মুহাম্মাদ এইভাবে তথ্য লাভ করিতেন" কিন্তু কেবল "দাবি করেন যে, তিনি যে সকল তথ্য লাভ করিতেন সেইগুলিই কুরআন নহে, কারণ একজন বিদেশী স্পষ্ট আরবী ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না"। অতএব সংবাদ সরবরাহকারী যে সকল তথ্য সরবরাহ করিত তাহা "সত্য ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞান", অথচ "সত্য ঘটনার অর্থ ও ব্যাখ্যা তাহার নিকট আগমন করে স্বাভাবিক প্রত্যাদেশ যে প্রকারে আসে সেই প্রকারে"।[৫৬] ওয়াটের এবং টোরীর এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল।

ওয়াটের পক্ষ হইতে ইহা ছিল এমন একটি প্রচেষ্টা যাহাতে এই পাঠে, বিশেষ করিয়া প্রথম অনুচ্ছেদে ওহী সম্পর্কিত তাহার ধারণাকে কাজে লাগানো যায়, যাহাকে তিনি প্রফেটিক ইনটিউশন বা এক প্রকার পয়গাম্বর সুলভ নিজস্ব চেতনা বলিয়াছেন : অর্থাৎ এমন কিছু যাহা 'অর্থ' ও 'ব্যাখ্যা'সূচক যাহা বাস্তবতা ও শব্দ হইতে ভিন্ন। ওয়াটের সেই ধারণা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে যখন আমরা 'ওহী' সম্পর্কে আলোচনা করিব।[৫৭] লক্ষণীয় যে, উক্ত আয়াত হইতে সর্বাধিক যে অর্থ বাহির করা যাইতে পারে তাহা হইতেছে, মক্কা নগরীতে একজন বিদেশী ছিল, সম্ভবত তাহার ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে কিছু জ্ঞান ছিল এবং তাহার সহিত মহানবী ﷺ -এর পরিচয় ছিল। স্বাভাবিক কারণেই মহানবীর বিরুদ্ধাচারিগণ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল যে, তিনি যে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছেন উহা রচনা করিতে সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে "শিক্ষা" দিয়াছিল। পবিত্র কুরআন এই অভিযোগকে অস্বীকার ও মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কল্পনাকে যতই দীর্ঘ করা হউক না কেন তাহা দ্বারা ইহা অনুমান করা সম্ভব নহে যে, পবিত্র কুরআন অস্বীকার করে না যে, তিনি সেই ব্যক্তির নিকট হইতে ইঙ্গিতবহ তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইহা নিছক "দাবি" করে যে, তিনি যে সকল বস্তু এই প্রকারে লাভ করিতেন তাহা "কুরআন হইতে পারে না। কারণ একজন বিদেশী নিজেকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে" ইহা ওয়াটের নিজের ব্যাখ্যা অথবা "উদ্দেশ্যমূলক" আকার প্রদান। কুরআন স্পষ্টভাবেই বলিতেছে যে, সেই কটাক্ষপাতকারী ব্যক্তির ভাষা 'আজমী' অর্থাৎ "বিদেশী"। কিন্তু অর্থের যতই প্যাঁচ খাটানো হউক না কেন ইহা কি যুক্তিসঙ্গত যখন বলা হয়, একজন বিদেশী, যে স্পষ্ট আরবী ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, সে মহানবী ﷺ-কে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বিষয়ের শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইবে, যখন তিনি নিজে কোন প্রকারেই কোন বিদেশী ভাষা জানেন না?

প্রকৃতপক্ষে ইহা মারাত্মক বিভ্রান্তিমূলক এবং বেশ কিছুটা স্ববিরোধীও বটে। টোরি ও ওয়াট বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ অস্বীকার করেন না যে, "তাঁহার এক মানব শিক্ষক ছিল, কিন্তু কেবল দাবি করেন যে, উহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল"। তাঁহার দাবি যদি কেবল তাহাই হইত যে, শিক্ষা "আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল" তাহা হইলে উহা কি অস্বীকার করা নয় যে, তাহার একজন মানব শিক্ষক ছিল? কিন্তু শিক্ষা "আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল" ইহাই কেবল বলা হয় নাই, তাহা অপেক্ষা অনেক জোরালোভাবে এবং বারংবার বলা হইয়াছে যে, প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের "মূল পাঠ"-ও আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল যে, কেহ আসিয়া সূরার অনুরূপ একটি পাঠ রচনা করুক। সেই চ্যালেঞ্জ আজও রহিয়াছে।

অবিশ্বাসিগণের অভিযোগের মধ্যে আরও রহিয়াছে যে, গ্রন্থের "মূল পাঠ"ও সুকৌশলে প্রবিষ্ট সেই ব্যক্তি নাকি রচনা করিয়া দিয়াছিল। শব্দটি ছিল 'ইয়ু'আল্লিমু', সমকালীন আরবী বাচনভঙ্গির দিক হইতে ইহার অর্থ কেবল তথ্য সরবরাহ করা নহে, বরং একটি পাঠ পৌঁছাইয়া দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হইত যাহা সাধারণত মুখস্ত করিয়া করা হইত। সেকালে জ্ঞান বা তথ্য সম্পূর্ণরূপে মুখে মুখে স্থানান্তরিত হইত এবং যেহেতু অভিযোগে ওহীর মূল পাঠের কথা বলা হইয়াছে, ইহার অস্বীকৃতি অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে যখন কেবল দেখানো হইয়াছে সুকৌশলে প্রবিষ্ট সেই ব্যক্তি স্পষ্ট আরবী পাঠ উচ্চারণ করিতে অক্ষম তখন ইহা একেবারেই অযৌক্তিক। অস্বীকৃতির মধ্যে কিছু পরিমাণে সুকৌশলে প্রবিষ্ট সেই ব্যক্তির প্রতি বক্রোক্তিও রহিয়াছে। প্রকৃতই ওয়াট যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন সেই দ্বিতীয় আয়াতে অবিশ্বাসিগণের অভিযোগের প্রকৃতি অধিকতর স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমানে আমরা ইহার প্রতি মনোযোগ দিব।

ওয়াট প্রথম আয়াতের (১৬ : ১০৩) যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন উহা তিন দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। (এক) উহা সম্পূর্ণরূপে যে প্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে তাহা মোটেই গ্রাহ্য করা হয় নাই। উহা অবিশ্বাসিগণের অভিযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যই বলা হইয়াছে।[৫৮] ইহার পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত স্পষ্ট, আয়াতটি এমনিতেই পরিষ্কার, আবার ইহার পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতও (১০১ ও ১০২) স্পষ্ট। যেমন ১০১ আয়াত অবিশ্বাসিগণের অভিযোগ যে, মহানবী "জালিয়াতি" করিয়াছেন সেই সম্পর্কিত এবং অতঃপর এই কথা বলিয়া অভিযোগ খণ্ডন করা হয় যে, যাহারা এই সকল অভিযোগ উত্থাপন করে তাহারা প্রকৃতই কিছু জানে না।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

"তাহারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না" (১৬ : ১০১)।

একই অস্বীকৃতি অব্যাহত রহিয়াছে এবং ১০২ আয়াতে ইতিবাচকরূপে বলা হইয়াছে, যেখানে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলা হইয়াছে প্রত্যাদেশ "তোমার প্রতিপালকের" নিকট হইতে ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক অবতীর্ণ হইয়াছে।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ .

"বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে"।

ওয়াট ১০৩ আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন উহাও অবিশ্বাসিগণের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ের অনুবর্তন মাত্র এবং একই জোরালো অস্বীকৃতি। প্রকৃতপক্ষে وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ "আমি তো জানিই, তাহারা বলে," এই বক্তব্য বিশেষ করিয়া অপ্রধান পদ ও সর্বনাম 'আন্নাহুম' স্পষ্ট পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত সংযুক্তি বুঝায়। অথচ ওয়াট তাহার ব্যাখ্যায় পরিপ্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন এবং মহানবী ﷺ-এর প্রতিপক্ষের অভিযোগগুলি নিশ্চিন্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

(দুই) ওয়াট আর একটি ভুল করিয়াছেন যখন তিনি বলেন যে, কুরআন অস্বীকার করে না, যাহাকে তিনি বলেন, বিদেশীর নিকট হইতে তথ্যপ্রাপ্তি। যে প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হইয়াছিল সেই প্রেক্ষিতকে যদি বিবেচনা করা নাও হয় তাহা হইলেও এই ১০৩ আয়াতের 'ইউলহিদূনা' (يُلْحِدُوْنَ) শব্দের মধ্যে রহিয়াছে নির্ভেজাল ও নির্ভুল অস্বীকৃতি। ইহাতে রহিয়াছে অবমাননাকর ভর্ৎসনা, যথা সত্য হইতে এবং সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া অথবা বিকৃতি ঘটানো।

সকল পারদর্শী বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেন যে, ইলহাদ (الحاد) শব্দের অর্থ "মিথ্যা বর্ণনা" অথবা "অসত্যভাবে তুলিয়া ধরা, তাকযীব" (اَلتَّكْذِيْبُ)।[৫৯] প্রকৃতপক্ষে 'ইউলহিদূনা' শব্দটি কুরআন শরীফে আর মাত্র দুইটি জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ৭ ঃ ১৮০ ও ৪১ ঃ ৪০ আয়াতে; এবং উভয় ক্ষেত্রে ইহার স্পষ্ট অর্থ অন্যায় ও অবাঞ্ছিত আচরণ।[৬০] লক্ষণীয় যে, এ.জে. আরবেরি তাহার কুরআন অনুবাদে এই দুই ক্ষেত্রেই blaspheming কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন leave those who blaspheme His names (যাহারা তাহার নাম বিকৃত করে) and those who blaspheme Our signs (যাহারা আমাদের নিদর্শন বিকৃত করে)।[৬১] আরও উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, কুরআন শরীফে যুলম-অবিচার (ظُلْمٌ) ২২ ঃ ২৫ শব্দের ব্যাখ্যাকারী শব্দ হিসাবে এই শব্দের মূল শব্দ ইলহাদ (الحاد) ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আরবেরি ইহা যথাযথভাবেই অনুবাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ .

"আর যে ইচ্ছা করে সীমালঙ্ঘন করিয়া ইহাতে পাপকার্যের" (২২ ঃ ২৫)।

And whosoever purposes to violate it wrongfully ইত্যাদি।[৬২] যদিও প্রাচ্যবিদগণ ১৬ ঃ ১০৩ আয়াতের বক্তব্যকে সাদামাটাভাবে অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন They hint at

(তাহারা ইংগিত করে) অথচ ইহার সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিত, 'তাহারা অন্যায়ভাবে ইঙ্গিত করে' (They wrongfully suggest) অথবা 'তাহারা অবিবেচকের মত ইশারা করে' (They unjustly hint at) অথবা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। প্রসঙ্গত আরও বলা যায় যে, They hint at -এর আরবী হয় 'ইউশিরূনা ইলা', 'ইউলহিদূনা' নহে। আয়াত ১৬ ঃ ১০৩-এর প্রকৃত অর্থ হইবেঃ "আমরা তো জানিই, তাহারা বলে, 'তাহাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ'। উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষা তো আরবী নহে, কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা"। অভিযোগ অস্বীকার না করা তো দূরের কথা, বরং আয়াতের পাঠে ইহাকে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, উহা ইলহাদ বা অন্যায় বক্রোক্তি।

(তিন) ওয়াট নিষ্পত্তিকারক অথবা বলা চলে অভিযোগ খণ্ডনকারী শব্দাবলী যাহা আয়াতের শেষাংশে রহিয়াছে তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। অথচ উহাতে জোরের সঙ্গে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তির প্রতি অন্যায়ভাবে ইংগিত করা হইয়াছে তাহার ভাষা বিদেশী।

প্রকৃতপক্ষে এই স্থলে একই বক্তব্যের মধ্যে অভিযোগের প্রতি দুই প্রকার অস্বীকৃতি বুঝানো হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে, যেহেতু সেই ব্যক্তির ভাষা বিদেশী সেই ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ -এর পক্ষে, যিনি বিদেশী ভাষা জানিতেন না, পরামর্শ অনুধাবন করা ছিল অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, কুরআনের ভাষা যেহেতু আরবী সেহেতু বিদেশী ব্যক্তি উহা মহানবী ﷺ -কে শুনাইতে সক্ষম হইতে পারে না।

এমতাবস্থায় 'তথ্য' বা 'উপাত্ত' যাহাই বলা হউক না কেন অথবা ওহীর পাঠ রচনা ও শব্দ চয়ন, কোন কিছুতেই একজন বিদেশীর পক্ষে মহানবী ﷺ-এর প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না।

অবিশ্বাসীগণের কটাক্ষপাতকে খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান কুরআন শরীফের পরবর্তী দুই আয়াতেও আছে (১৬ ঃ ১০৪-১০৫)। আয়াত ১০৪, সেখানেও আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করার কুফল সম্পর্কে অবিশ্বাসীগণকে সতর্ক ও সাবধান করা হইয়াছে। ১০৫ আয়াতে সমুচিত জবাব দিয়া বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ .

"যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী" (১৬ ঃ ১০৫)।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি, আয়াত ১৬ ঃ ১০-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মিলিতভাবে একটি পরিপূর্ণ পৃথক স্পষ্ট বক্তব্য নির্মিত হইয়াছে যাহার উদ্দেশ্য অবিশ্বাসীগণের বানোয়াট অভিযোগ ইতিবাচক, জোরালো ও নিঃসংশয়ভাবে খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান

করা। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে এইরূপ কিছুই নাই যাহা হইতে অবিশ্বাসীগণ এমন ধারণা দিতে সচেষ্ট হইয়াছে যেমনটি ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছেন অর্থ ও ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য ও সংবাদ গ্রহণ বিষয়ে। অন্যদিকে প্রত্যাখ্যানের প্রকৃতি ও শব্দ ব্যবহার, বিশেষ করিয়া যে মানুষটিকে আনা হইয়াছে তাহার ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ইহাই স্পষ্ট করিয়া তোলে যে, ওহীর পাঠ নির্মাণে মহানবী ﷺ-এর নিজের অক্ষমতার প্রতি নির্দেশ করাই ছিল অভিযোগের লক্ষ্য।

২৫ ঃ ৪-৫ আয়াতে অবিশ্বাসীগণের অভিযোগের এই প্রকৃতি অনেক বেশী সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াট এই আয়াতই উল্লেখ করিয়াছেন। এই আয়াত ১৬ ঃ ১০৩ আয়াতের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ২৫ ঃ ৪-৫ আয়াত বলে, অবিশ্বাসীগণের অভিযোগ ছিল যে, মহানবী ﷺ এইরূপ ওহী লাভ করিয়াছিলেন যাহা তাহাদের নিকট "প্রাচীন কালের রূপকথা", যাহা মহানবী ﷺ-এর জন্য লিখিত হইয়াছিল এবং সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করিয়া শোনানো হইত। লক্ষণীয় যে, ওয়াট অনুবাদ করিতে গিয়া আয়াত ৪-এর শেষ অংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন, যেখানে বলা হইয়াছে ঃ

فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا .

"এইরূপে উহারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে" (২৫ ঃ ৪)।

বাদ দেওয়ার কারণ এই যে, অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক আনীত অভিযোগ খণ্ডন করা হয় নাই বলিয়া তাহাদিগের এই ধারণাকে যাহাতে সহজেই উপস্থাপন করা যায়।

আয়াত ২৫ ঃ ৪-৫ বা এই সূরা সর্বজন স্বীকৃত যে, ১৬ সূরার আগে অবতীর্ণ সূরা।[৬৩] এই আর একটি কারণ যে কারণে ১৬ ঃ ১০৩ আয়াতটির অভিযোগের সহিত ২৫ ঃ ৪-৫ আয়াতের অভিযোগ একত্রে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসীগণের পক্ষে এই কথা বলা অসম্ভব হইয়া পড়িবে যে, মহানবী ﷺ-এর জন্য অন্য কেহ ওহী লিখিয়া দিত এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইত এবং তাহার পর একথা বলা যে, তিনি একজনের নিকট হইতে কেবল তথ্য ও সংবাদ লাভ করিতেন। ইহাই স্বাভাবিক যে, তাহাদের অভিযোগ যে, মহানবী ﷺ-এর নিজের পক্ষে ওহী রচনা করা সম্ভব নহে তাহাও তথ্য ও সংবাদের উল্লেখ যেমন রহিয়াছে তেমনি ওহীর পাঠ ও ভাষারও উল্লেখ আছে । কিন্তু কেহ যদি ধরিয়া লয় যে, কেবল তথ্য ও সংবাদের উল্লেখ আছে অথবা কেহ যদি স্বীকারও করে যে, স্বাভাবিক সত্য হইতেছে অভিযোগে উভয়ের উল্লেখ রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে ২৫ ঃ ৪ আয়াত, যে আয়াত ওয়াট পাঠকের নিকট হইতে অগোচরে রাখিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাসীগণের অভিযোগকে বলা হইয়াছে অন্যায় বা জুলম (ظلم) এবং সরাসরি মিথ্যার (زُوْرٌ) বহিপ্রকাশ। ইহা অপেক্ষা অধিকতর ও জোরালো অস্বীকৃতি আর কিছুই হইতে পারে না।

ওয়াট যথার্থই বলিয়াছেন যে, মুসলমান তফসীরকারগণ, অবিশ্বাসিগণ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাদের পরিচয় সম্পর্কে একমত পোষণ করেন না, বরং একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, মক্কায় বসবাসকারী তাহারা অধিকাংশই খৃস্টান দাস।[৬৪] কিন্তু তিনি কাহিনী সমাপ্তও করেন নাই, আবার তাহার ধারণা হইতে উদ্ভূত বিষয় লইয়া আলোচনার অগ্রগতিও সাধন করেন নাই। স্বাভাবিকভাবেই তাহার ধারণা লইয়া কিছু প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু তিনি এই বিষয় লইয়া অগ্রসর হন নাই। প্রশ্নগুলি এইরূপ হইতে পারে ঃ

(ক) মুহাম্মাদ ﷺ যখন রিসালাতের দাবি করিলেন এবং প্রকাশ্যে তিনি মক্কাবাসীকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বলিলেন ও বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইল, তখন কি কারণে কোন ইয়াহূদী ও খৃস্টান বিজ্ঞ ব্যক্তি ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে তাঁহাকে তথ্য সরবরাহ করিয়া তাঁহার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আগাইয়া আসিয়াছিলেন?

(খ) কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তাহাদের জ্ঞান ও মক্কার ন্যায় খুব বড় নয় এমন একটি নগরীর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাসহ, বিশেষ করিয়া যখন তাহারা মহানবী ﷺ-এর চলাফেরার সর্বক্ষণ নজরদারি করিতে সক্ষম তখন কেন তাহারা মহানবীর তথাকথিত 'সংবাদদাতা' সম্পর্কে তথ্যকে কাজে লাগাইয়া মহানবীর 'বানোয়াট' রিসালাতকে প্রকাশ করিয়া দেয় নাই?

(গ) তাহা ব্যতীত যদি সত্যই 'সংবাদদাতা' বা 'সংবাদদাতাগণ' খৃস্টধর্ম অথবা ইয়াহূদী ধর্ম হইতে আসিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পর যখন জানিতে পারিয়াছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ ওহী হিসাবে যে বাণী ও মতবাদকে আল্লাহ্‌র ওহী হিসাবে প্রচার করিতেছিলেন উহা রচনা করিবার জন্য তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন, তখন তাঁহারা কেন তাঁহার উপর বিশ্বাস অব্যাহত রাখিয়াছিল?

অধিকতর উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এইসব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ওয়াট উত্থাপন তো করেনই নাই, অধিকন্তু এই সকল প্রশ্নের জবাবও অন্বেষণ করেন নাই। তিনি যদি কোন একটি কাজও করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, মুসলমান তাফসীরকারগণ স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যখন দেখিতে পাইল যে, কয়েকজন খৃস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন আলোচ্য এইসব প্রশ্নসহ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল। মক্কার নেতৃবৃন্দ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা তাহাদিগের উপর এই মর্মে চরম নির্যাতন চালাইয়াছিল যে, তাহারা যেন বলে যে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ আছে, অনুরূপভাবে নির্যাতিত জাবর নামক এক মুসলিম যখন চরমভাবে নির্যাতিত হইয়াছিলেন তখন তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি মুহাম্মাদ ﷺ-কে শিক্ষা দেই নাই, বরং তিনিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং পথপ্রদর্শন করিয়াছেন'।[৬৫]

পাঁচ ঃ বাইবেলীয় তথ্যের ক্রমান্বয়ে যথাযথ হইবার তথাকথিত অগ্রগতি

সত্যই কোন প্রকার যুক্তিতে ইহা অনুধাবন করা যায় না যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর ন্যায় একজন অনন্যসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণ লোকের জনশ্রুতির গৌণ সূত্র হইতে ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মগ্রন্থের অসম্পূর্ণ ও ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করিবেন এবং প্রাচ্যবিদগণের মতে সেই ভাসা ভাসা জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি মতবাদ প্রচার করিবেন এবং এমন সব কাহিনী বলিতে গিয়া দাবি করিবেন যে, উহা প্রত্যাদেশ। ওয়াট তথাপি তাহার পূর্ববর্তীদের অনুসরণে কেবল অনুরূপ অবাস্তব প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং আরও বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ একজন সরল বোকা কিসিমের মানুষ ছিলেন এবং চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই তাড়াহুড়া করিয়া প্রথমেই ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি কাহিনী যতখানি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাই প্রত্যাদেশ হিসাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে যখন তিনি সেই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করেন তখন উহা সংশোধন বা পরিবর্তন করেন। এইভাবে তিনি ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ) সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা নাকি তাহার মতে, 'ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী' যাহা পরিচিতির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে যথাযথ হইয়া উঠিয়াছে। ওয়াট এইভাবে সমাপ্তি টানিয়াছেন যে, "ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী সম্পর্কিত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তিনি সেই কাহিনী সম্পর্কে অবহিত একজন বা একাধিক জনের নিকট হইতে জানিতে পারিতেছিলেন"।[৬৬]

ওয়াট যে সকল আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইগুলি হইতেছে ৩৭ ঃ ১৩৫ C; ২৬ ঃ ১৭১ E (D); ২৭ ঃ ৫৮ E (D); ৭ ঃ ৮১ DE; ১৫ ঃ ৬০ D, ১১ ঃ ৮৩ ই + এবং ২৯ ঃ ৩২ E +। লক্ষণীয় যে, ওয়াট আয়াতের যে সংখ্যা দিয়াছেন ফ্লুগেল যে সংখ্যা দিয়াছেন তাহাই, তবে বর্তমানে প্রচলিত ও প্রমিত যে নির্দেশ সংখ্যা রহিয়াছে তাহা হইতে সামান্য ভিন্ন। কিন্তু আয়াতের অর্থ দেখিয়া তাহা শনাক্ত করিতে অসুবিধা হয় না। তিনি আয়াতগুলির মূল আরবী দেন নাই, এমনকি অনুবাদও দেন নাই। তদুপরি একটি সূরার একটি আয়াত উল্লেখ করিতে গিয়া নিশ্চয়ই তাহার সম্মুখে সেই বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতও ছিল। তিনি প্রতিটি আয়াতের পার্শ্বে যে হরফ বসাইয়াছেন উহা দ্বারা আর. বেল আয়াতগুলির তারিখ নির্দেশ করিয়াছেন, C বসাইয়াছেন মক্কা বুঝাইতে, মদীনার প্রথম দিকে বুঝাইতে E বসাইয়াছেন এবং E + বসাইয়াছেন মদীনা বুঝাইতে।[৬৭]

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় যে, 'যথাযথ হইয়া উঠা' বা ক্রমান্বয়ে সঠিক হইয়া উঠা সম্পর্কিত তাহার যে ধারণা উহার মূল ভিত্তি হইতেছে কয়েকটি আয়াতের উপরিউক্ত তারিখ। কিন্তু এই যে তারিখ তিনি দিয়াছেন উহা চূড়ান্ত নহে, 'অস্থায়ী'।[৬৮] ওয়াট নিজেও সেই তারিখ সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন।[৬৯] তদুপরি তিনি তাহার নিজের সর্বশেষ রচনায় বেল কর্তৃক প্রদত্ত তারিখকে বাতিল করিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে আর. ব্লাশেয়ার প্রদত্ত তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আবার মোটামুটি নোলডেকে-কে অনুসরণ করিয়াছেন।[৭০] তাহা ব্যতীত তিনি দুইটি তারিখ

বুঝাইতে যে দুইটি অক্ষর যেভাবে আয়াতের পার্শ্বে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা রীতিমত বিভ্রান্তিকর। আরও লক্ষণীয়, যে সকল আয়াত তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইগুলি সবই মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়া অবিসম্বাদিত মর্যাদাসম্পন্ন সকল মুসলমান বিশেষজ্ঞ মনে করেন। যাহা হউক, লেখক স্বয়ং যেখানে তারিখ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন সেই সন্দেজনক তারিখের উপর এবং লেখক নিজে যখন তাহার নিজের সর্বশেষ রচনায় উহা বাতিল করিয়াছেন—তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ক্রমান্বয়ে সঠিক হইয়া উঠা সম্পর্কিত ধারণা রীতিমত বিভ্রান্তিকর ও বিপদজনক।

তারিখ নির্ধারণের প্রশ্ন উত্থাপন না করিলেও আয়াতগুলি নিজেই 'ক্রমান্বয়ে সঠিক হইয়া উঠা' সম্পর্কিত তত্ত্বকে সমর্থন করে না। প্রথমেই যেভাবে ওয়াট দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, উল্লিখিত দুইটি আয়াতে (৩৭ ঃ ১৩৫ এবং ২৬ ঃ ১৭১) লূতের 'দলের' যে সদস্য রক্ষা পায় নাই সে 'এক বৃদ্ধা', অন্যান্য সকল আয়াতে সে তাঁহার স্ত্রী। ওয়াটের মন্তব্য মোটেই সঠিক নহে এবং আলোচ্য দুই আয়াত সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা। দুইটি স্থানেই বাক্য আরম্ভ হইয়াছে ইল্লা (إلا=ব্যতীত) দ্বারা যাহার মাধ্যমে বুঝানো হইয়াছে যে, ইহা আয়াতের পূর্বে যাহা তাহার ক্রমানুবর্তন মাত্র।

লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আয়াতের পূর্বে যে পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে উহা হইতেছে 'আহ্ল'। তাহার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ দাঁড়াইতেছে "এক বৃদ্ধা ব্যতীত" লূতের সকল 'আহ্ল' রক্ষা পাইয়াছিল। 'আহ্ল'-এর প্রধান অর্থ "পরিবার", এমনকি "স্ত্রী"; ইহার গৌণ অথবা পরোক্ষভাবে বর্ণিত অর্থ হইতে পারে "সম্প্রদায় " অথবা "অধিবাসী"। এই গৌণ অর্থ এই স্থলে স্পষ্টতই প্রযোজ্য নহে। কারণ এই স্থলে যাহা স্বাভাবিক তাহা হইতেছে "লূতের সম্প্রদায়ের সকলে রক্ষা পাইবে কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত" তাহা নহে। অপরপক্ষে ইহাও বলা যায় না যে, লূতের সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ও শাস্তি লাভ করিবে, সেখানে মাত্র এক বৃদ্ধাই ছিল। প্রতিটি স্থানে পরপর দুইটি আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ হইতেছে, লূতের পরিবারের সকল সদস্য রক্ষা পাইয়াছিল একমাত্র "বৃদ্ধা নারী" ব্যতীত। এইভাবে উভয় ক্ষেত্রে লূতের সহিত মহিলার সম্পর্ক পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে "বৃদ্ধা মহিলা" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ সে অবিশ্বাসী থাকার কারণে তাহাকে গ্রহণ করা হয় নাই, লূতের সহিত তাহার কি সম্পর্ক ছিল তাহা না জানার কারণে নহে। অবশ্য অন্য সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সম্পর্ক সরাসরি ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম দুইটি আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কোন ভুল তথ্য নহে এবং অন্যান্য পাঁচটি আয়াতে 'ক্রমান্বয়ে সঠিক হইয়া উঠা' নহে।

অনুরূপভাবে ওয়াটের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অবিবেচনাপ্রসূত কল্পনা। উপরিউক্ত প্রথম চারটি আয়াতে "আবরাহাম ও লূতের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল" বলিয়া কোন অবহিতি নাই। অথচ অপর তিন আয়াতে আবরাহামের সহিত সম্পর্ক স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।[৭১]

এখন, ১৫ ঃ ৬০, ১১ ঃ ৮৩ এবং ২৯ ঃ ৩২ আয়াতগুলিতে দেখা যায় যে, "আবরাহাম ও লূতের সম্পর্কের" মধ্যে ওয়াট কেবল সমসাময়িকতার ইশারা দেখেন। ইহা আসলে ঘটনাক্রমে বর্ণিত যেখানে লূতের সম্প্রদায়ের উপর পতিত আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও শাস্তির বিবরণ দেওয়া

হইয়াছে। আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ কয়েকজন ফেরেশতাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা লূতের সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহাকে শুভ সংবাদ দেন যে, তাঁহার আর একটি পুত্র সন্তান হইবে। তাঁহারা আরও জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা লূতের সম্প্রদায়কে শাস্তি দিবার জন্যই যাইতেছেন। তখন তিনি লূতের জন্য সুপারিশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাপ্রসূত বিবরণ অন্যান্য আয়াতে আসে নাই। কারণ সেই স্থলের বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষিত ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম চারটি আয়াতে (৩৭ ঃ ১৩৫; ২৬ ঃ ১৭১; ২৭ ঃ ৫৮ এবং ৭ ঃ ৮১) উল্লিখিত নবীগণের উপর আল্লাহ্র রহমতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কি প্রকারে তাঁহারা আপন সম্প্রদায়ের শত্রুতা ও পরীক্ষায় আল্লাহ্র সহায়তা লাভ করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন তাহা বলা হইয়াছে। অপরপক্ষে অন্য তিন আয়াতে (১৫ ঃ ৬০; ১১ ঃ ৮৩ এবং ২৯ ঃ ৩২) নবীগণের বিরোধিগণের আচরণ এবং তাহাদের প্রতি যে বাণী প্রেরণ করা হয় উহা প্রত্যাখ্যান ও তাহাদের বিরোধিতার ফলাফল কি তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

চার আয়াতের প্রথম গুচ্ছ প্রধানত মহানবী -কে উদ্দেশ্য করিয়া এবং তাঁহার অনুসারিগণকে সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়ার জন্য, অপর তিন আয়াত প্রধানত অবিশ্বাসিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। এখানে অবিশ্বাসিগণকে তাহাদের অবিশ্বাস ও বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে। প্রথম চারটি আয়াতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণের উপর যে শাস্তি আপতিত হইবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নাই, এমনকি দেওয়া হয় নাই লূত সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আরোপকারী ফেরেশতাগণের বিবরণও। অপরপক্ষে অপর তিন আয়াতে সেই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে ফেরেশতার আগমন এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাহাদের কথোপকথন যাহাতে তাহার সহিত লূত (আ)-এর তথাকথিত সম্পর্কের উল্লেখ দেখা যায়। এইরূপে প্রথম চার আয়াতে কোন কিছুর ঘাটতি নাই এবং অপর তিন আয়াতে তথ্য সঠিক হইয়া ওঠা ঠিক নহে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, পবিত্র কুরআনে ইতিহাস বর্ণনার জন্য অথবা কোন গল্প বলার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা ও পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনী উল্লেখ করা হয় নাই; বরং শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত অথবা উপদেশ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কারণে কোন একজন নবীর জীবন কাহিনীর একই বিষয় অথবা বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণত যেমন কোন ইতিহাস গ্রন্থে বা কোন গল্প গ্রন্থে বর্ণনা করা হয় তেমনভাবে কোথাও কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কোন নবীর পরিপূর্ণ জীবন কাহিনী একাধারে বর্ণনা করা হয় নাই।

কাহিনীর বাহ্যিক পুনরাবৃত্তি বা অসম্পূর্ণতাকে প্রাচ্যবিশারদগণ তাহাদের 'সঠিকতার দিকে অগ্রগতি' তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যদি একটু গভীরভাবে এই সকল অনুচ্ছেদ বা সূরা অবলোকন করা যায় তাহা হইলে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হইবে যে, তাহাদের তত্ত্ব আপাত

দৃষ্টিতে সত্য মনে হইলেও তাহা আদৌ সত্য নহে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, কোন এক স্থানে বিষয় ও প্রেক্ষিত বিচারে নিছক বিস্তারিত বর্ণনা না করা এবং অপর ক্ষেত্রে বিষয় ও প্রেক্ষিতের কারণে বিস্তারিত বর্ণনা করাকে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো চলে না যে, প্রথমটি সঠিক নহে এবং দ্বিতীয়টি 'সঠিকতার দিকে অগ্রগতি'।

পুনরায়, ধীরে ধীরে সত্য উদ্ঘাটন ও বিস্তারিত বর্ণনা একথা প্রমাণ করে না যে, কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি নবীর তথ্য সরবরাহকারীরূপে কাজ কারিয়াছিল। পবিত্র কুরআনে ইসলামের যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়, ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান ও আদেশ-নিষেধ ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষয়কে যদি কেহ কোন এক বা একাধিক শিক্ষকের নিকট হইতে নবীর ক্রমান্বয়ে জ্ঞান লাভের প্রমাণ বলিয়া দাবি করে তাহা হইলে তাহাকে কল্পনা বা অনুমানের চূড়ান্ত ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

অবশ্য এই সকল কারণের পরও আরও কিছু কথা আছে। সত্যই যদি গভীরভাবে সূরাগুলি পাঠ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উল্লিখিত চারটি সূরায় তথ্যের দিক হইতে কোন ঘাটতি বা অসম্পূর্ণতা নাই। 'আদ ও ছামূদ জাতির নিকট নবীগণের (হূদ ও সালিহ) কথা বাদ দিলেও বলিতে হয় যে, তাঁহাদের কথা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু বাইবেলে উল্লেখ নাই। এমনকি এই সকল সূরায় ইবরাহীম (আ)-এর ক্ষেত্রে যেরূপ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে সেইরূপ কিছুই বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে নাই। এইরূপে এই সকল সূরায় হযরত ইবরাহীম (আ)-কে একত্ববাদের প্রবক্তা হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং এই আদর্শের জন্য তিনি যে কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও স্বজাতি যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিত সেই বিষয়ে তাহাদের সহিত যে বিতর্ক করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত তথ্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার মূর্তি ভাঙ্গা, ভ্রান্ত বিশ্বাসে অস্বীকৃতি, অগ্নি পরীক্ষা, হিজায গমন ইত্যাদির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার জীবনের এই সকল দিকের কোন বিষয় ওল্ড টেস্টামেন্টে (বাইবেলে) উল্লেখ নাই। অপরপক্ষে আলোচ্য তিনটি আয়াতে যে স্থলে 'সঠিকতার দিকে অগ্রগতির' অনুমান করা হইয়াছে তাহাতে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ফেরেশতাদের আগমন ও তাঁহার কথোপকথনকে ইহার কারণ হিসাবে ধরা হইয়াছে। অথচ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পবিত্র কুরআনে এই ঘটনার যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা বাইবেলে উল্লিখিত বিররণ হইতে ভিন্ন। যেমন আলোচ্য তিন আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ইবরাহীম (আ) 'মেহমানদের' (মানবরূপী ফেরেশতাগণ) সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন যখন তাহাদের জন্য প্রস্তুত খাদ্য তাহারা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, যাহার ফলে তাহারা তাহাদের পরিচয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার সহিত আরও কথাবার্তা বলেন এবং যাহার মধ্যে তাঁহার আরও একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে এই সুসংবাদও ছিল এবং তাহারা যে লূত (আ)-এর জাতিকে শাস্তি দিতে আসিয়াছেন সেই কথাও ছিল।

অপরপক্ষে ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে, যখনই ইবরাহীম (আ) 'তিনজন মানুষকে' দেখিলেন তিনি দৌড়াইয়া গেলেন 'তাঁবুর দরজা হইতে তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য', তাহাদিগকে দাওয়াত করিলেন আহার করিবার জন্য এবং তাহারা দাওয়াত গ্রহণ করিবার পর আহার প্রস্তুত করিলেন, 'এবং তাহারা খাদ্য গ্রহণ করিলেন'।[৭২] অনুরূপভাবে লূত (আ)[৭৩] তাহাদের জন্য যে খাদ্য তৈয়ারি করিয়াছিলেন তাহারা সেই 'খাদ্য গ্রহণ করিলেন'। এই প্রকারে দেখা যায় কোন ক্ষেত্রেই তথ্য কম ছিল না। প্রথম চার আয়াত লইয়া তাহারা যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন পরবর্তী তিন আয়াতে তথ্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাও সঠিক নহে। কারণ উভয় ক্ষেত্রে কুরআনের তথ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের বক্তব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত তথ্য রহিয়াছে এবং বস্তুগতভাবে তাহা ভিন্ন। তাহা হইতে বোঝা যায়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সূত্র পুরাতন বাইবেলও নহে এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন মানব সন্তানও নহে। অতএব যুক্তিযুক্তভাবে 'সঠিকতার দিকে অগ্রগতি'র তত্ত্ব কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে কোন একজন 'তথ্য সরবরাহকারী' অথবা একাধিক 'তথ্য সরবরাহকারী' যেই হউক না কেন তাহার নিকট হইতে মহানবী ﷺ তথ্য পাইয়াছেন এইরূপ কথা পবিত্র কুরআন সরাসরি অস্বীকার তো করিয়াছেই, অধিকন্তু পবিত্র কুরআন চ্যালেঞ্জ দিয়া দাবি করিয়াছে যে, মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্বজাতির কেহই বর্তমানে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যাহা জানান হইয়াছে তাহা পূর্বে জানিত না।[৭৪] এমনিভাবে ১১ ঃ ৪৯ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا...

"এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না" (১১ ঃ ৪৯)।[৭৪]

উপরিউক্ত আয়াত এবং সেই সঙ্গে আরও অন্যান্য আয়াত পবিত্র কুরআনের শক্তিশালী সাক্ষ্য যেখানে বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ -কে ওহী প্রসূত যে জ্ঞান দান করা হইয়াছে উহা পূর্বে কখনও তাঁহার জানা ছিল না। তাঁহার 'অক্ষরজ্ঞানহীনতার'[৭৫] সমর্থনে তাই কুরআনের এই সাক্ষ্য। অথচ এই উদাহরণের ক্ষেত্রেও ওয়াট তাহার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছেন যে, পবিত্র কুরআনেও আছে যে, মহানবী ﷺ কাহারও নিকট হইতে তথ্য গ্রহণ করিতেন। ওয়াট বলেন যে, এই ১১ ঃ ৪৯ আয়াত নাকি তাহাদের জন্য 'বিব্রতকর, যাহারা মুহাম্মাদের আন্তরিকতাকে প্রতিষ্ঠিত' করিতে চাহেন এবং তাহার পরে তিনি এই তথাকথিত বিব্রতকর অবস্থাকে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যোগ নেন। সেজন্য তিনি ওহী সম্পর্কিত তাহার অদ্ভুত ধারণার সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, নবীগণের কাহিনীর ঘটনা ও তথ্য মুহাম্মাদ ﷺ পাইয়াছিলেন মানবিক সূত্র হইতে, কিন্তু 'শিক্ষা' ও সেই কাহিনীর আন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মুহাম্মাদের নিকট আসিয়াছিল প্রত্যাদেশের

দ্বারা'।[৭৬] কিন্তু এই বক্তব্যের পরই ওয়াট মনে হয় তাহার সাধারণ তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়া বলেন যে, এমনকি চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ ইয়াহূদী-খৃস্টান সূত্র হইতে উহা ধার করিয়াছেন। তখন দ্রুত যোগ করেন, যেহেতু 'ইয়াহূদী-খৃস্টান ধারণা হিজাযে অনেকাংশে পরিচিত ছিল', যে ধারণা পবিত্র কুরআনে 'ধরিয়া লওয়া সত্ত্বেও বিশেষভাবে অপরকে জানানোর প্রয়োজন ছিল না', কিন্তু 'সঠিকভাবে' যাহা কিনা এমনভাবে সন্নিবেশিত 'করার প্রয়োজন ছিল যাহাতে তদানীন্তন পরিবেশে খাপ খায় যা কেবল রাসূলের মানসিক অন্তর্জ্ঞান দ্বারাই সম্ভব।[৭৭]

এখন এই কথা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, মহানবী ﷺ কোন মানুষের নিকট হইতে তথ্য লাভ করিয়াছিলেন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তদুপরি মহানবী ﷺ ও তাঁহার স্বজাতি ওই সকল বিষয়ে কিছুই জানিতেন না যাহা প্রত্যাদেশ বা ওহীর মাধ্যমে জানানো হইয়াছিল। ফলে উপরে উল্লিখিত আয়াত কোন প্রকারেই বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে নাই। এমনকি প্রত্যাদেশের অর্থ ও সুযোগকে সীমিত করিয়া 'সঠিকভাবে' উপস্থাপনের মাধ্যমে তথাকথিত বিব্রতকর অবস্থাকে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যোগ নেয়ারও প্রয়োজন হয় নাই, যাহার মধ্যে কাহিনী ও কিছু তথ্য দিয়া তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হয় না।

পবিত্র কুরআনের আয়াত হইতেই ইহা স্পষ্ট যে, মহানবী ﷺ সকল তথ্য ও ভাষা প্রত্যাদেশ্যের মাধ্যমেই লাভ করিতেন। উপরিউক্ত আয়াতের (১১ : ৪৯) মূল শব্দটি হইতেছে আনবা (انباء), ওয়াট নিজে এই শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন 'কাহিনী' বলিয়া। যাহা হউক, তিনি পরামর্শ দেন যে, এখানে এইগুলির কোন শিক্ষা এবং 'গুরুত্ব' বুঝিতে হইবে। তাহার এই প্রস্তাবনার কারণ তাহার অনুমান বা ধারণার সহিত যাহাতে এই আয়াত খাপ খায়। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দের সহজ আরবী অর্থ 'আখবার' (اخبار) এবং উভয় শব্দের অর্থ 'ঘটনা' বা 'বিবরণ'। এ. জে. আরবেরি ইহার অর্থ করিয়াছেন 'শুভ সংবাদ'। ইহাই শব্দটির নিকটতম সমার্থবোধক শব্দ যাহা দ্বারা অনেকাংশে মূল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতই যখন আনবা' আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে[৭৮] তখন ইহার অর্থ হয় 'প্রকৃত ঘটনা বা সঠিক বিবরণ', যাহার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা অসত্য নাই। কিন্তু আমরা যদি শব্দটির অনুবাদ ওয়াটের মনের মত করিয়া গ্রহণ করি যে, উহার অর্থ 'কাহিনী' তথাপি পবিত্র কুরআনে অথবা অন্য কোথায়ও ইহার দ্বারা এই কথা কোন প্রকারে প্রতিষ্ঠা করা যায় না যে, উহার অর্থ প্রকৃত ঘটনা বাদ দিয়া 'শিক্ষা ' এবং 'গুরুত্ব'। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, নাবা (نبا) শব্দের মূল ধাতুর যাবতীয় ব্যুৎপত্তি যাহাই থাকুক না কেন পবিত্র কুরআনে এই শব্দের একবচন কম করিয়া হইলেও সতের স্থানে[৭৯] ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে ১২ স্থানে।[৮০] এই ২৯ স্থানের সর্বত্রই শব্দটি ঘটনা ও পরিস্থিতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে (শব্দটির অর্থ তদারক করিয়া) দেখার কোন প্রয়োজন নাই। ১১ : ৪৯ আয়াত ব্যতীত আর মাত্র দুইটি স্থান দেখিলেই চলিবে। সেই স্থানে এই শব্দটি অনুরূপ জোরের

সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান আসিয়াছিল তাহা ইতোপূর্বে কখনও মহানবী ﷺ-এর জানা ছিল না। ইহার একটি ৩ ঃ ৪৪ আয়াত যে স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۔

"ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যাহা তোমাকে ওহীর দ্বারা আমি অবহিত করিতেছি। মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে, ইহার জন্য যখন তাহারা কলম নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না" (৩ ঃ ৪৪)।[৮১]

অপর আয়াত ১২ ঃ ১০২ যে স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْآ اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۔

"ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌছিয়াছিল তখন তুমি তাহাদের সংগে ছিলে না" (১২ ঃ ১০২)।[৮২]

ইহা লক্ষণীয় যে, উভয় আয়াতের প্রারম্ভে রহিয়াছে 'তখন তুমি তাহাদের সঙ্গে ছিলে না'। উহা মহানবী ﷺ -কে প্রদত্ত আনবাআ-র ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হইয়াছে এবং উহা নির্দিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন ঘটনার 'অর্থ' ও 'গুরুত্ব' বুঝাইতে বলা হয় নাই।

মহানবী ﷺ যে ছিলেন মাসুম ও সরল এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁহাকে যে সকল ঘটনা জ্ঞাত করানো হইয়াছিল তাহা পূর্বে তিনি জানিতেন না—এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পুনর্বার পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। উক্ত ২৮ ঃ ৪৪-৪৬ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۔ وَلٰكِنَّا اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۔

"মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম; অতঃপর উহাদের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদইয়ানবাসীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। মূসাকে যখন আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তখন তুমি তূর পর্বতপার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক

করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে" (২৮ ঃ ৪৪–৪৬)।[৮৩]

এই সকল (১১ ঃ ৪৯, ৩ ঃ ৪৪, ১২ ঃ ১০২, ২৪ ঃ ৪৪-৪৬) আয়াতে সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট ভাষায় বারংবার বলা হইয়াছে যে, মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন শিশুর মত সরল। তিনি ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও ঘটনাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং ওই সকল বিষয়ে পূর্বে তিনি কিছুই জানিতেন না। উহাতেই রহিয়াছে অখণ্ডনীয় অনুমানের অসঙ্গতি যে, তিনি মনুষ্য সূত্র হইতে তথ্য ও ধারণা লাভ করিয়াছিলেন এবং অতঃপর ওহী বা প্রত্যাদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, যাহাতে তৎকালীন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে যথাযথ বা নির্ভুল হয়। ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে, উপরিউক্ত আয়াতগুলি মহানবী ﷺ-এর সমকালীন প্রতিপক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ। তাহারাও অনুরূপভাবে কটাক্ষ করিয়া বলিত যে, তিনি নাকি কোন মানুষের নিকট হইতে তথ্য লাভ করিতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি অংশ যখনই যে মুহূর্তে প্রত্যাদিষ্ট নাযিল হইত তৎক্ষণাৎ উহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইত। প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসিগণের বিভিন্ন অভিযোগ এবং তাহাদের অভিযোগ খণ্ডনকারী সাক্ষ্য-প্রমাণ যে প্রকারে পবিত্র কুরঅনে বিধৃত হইয়ছে তাহাই তাৎক্ষণিক ওহীর বক্তব্য (প্রত্যাদেশ) হওয়ার অকাট্য ও অভ্রান্ত প্রমাণ। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ মক্কার প্রাথমিক কাল হইতে মদীনার মাঝামাঝি সময়কালে নাযিল হইবার বিভিন্ন তারিখগুলি যদি লক্ষ্য করা যায় (ওয়াট নিজেই প্রথমে উল্লিখিত আয়াত শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন, ১১ ঃ ৪৯ = C + অর্থাৎ মক্কার প্রথম কাল হইতে মদীনার মাঝামাঝি কাল) তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, চ্যালেঞ্জ বারংবার ঘোষিত হইয়াছে, কেবল মক্কায় নহে, বরং মদীনায়ও, সেখানে অনেক অভিজ্ঞ ইয়াহূদী বসবাস করিত। তাহারা মহানবী ﷺ-এর বিপক্ষেই ছিল। তথাপি কোন সূত্র হইতে এইরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই যাহা হইতে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা কোন প্রকারে উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিল অথবা তাহারা এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখাইয়া অথবা কোন সূত্রকে নির্দেশ করিয়া বলে নাই যে, মুহাম্মাদ ﷺ সেই ব্যক্তি অথবা সূত্রের নিকট হইতে তথ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মক্কার (ইসলামে) ধর্মান্তরিত খৃস্টানদের উপর দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালাইবার পরও তাহাদের নিকট হইতে এইরূপ কোন স্বীকারোক্তি লাভ করিতে পারে নাই যে, মহানবী ﷺ -কে তাহারা কিছু শিখাইয়াছিল।

ছয় ঃ পবিত্র কুরআনের বিবরণের সহিত বাইবেলের বিবরণের পার্থক্য

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত একই নবী সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ এবং বাইবেলে বর্ণিত সেই একই নবী সম্পর্কিত ঘটনাসমূহের মধ্যে লক্ষণীয় তথ্যগত পার্থক্য হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ বাইবেল বিষয়ে বিজ্ঞ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন তথ্য লাভ করেন নাই। প্রথমে উল্লিখিত আয়াত ১১ ঃ ৪৯ নূহ (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কিত। ওল্ড টেস্টামেন্টে যেরূপ ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে পবিত্র কুরআনে সেইরূপ বর্ণনা

নাই। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, তিনি একত্ববাদ প্রচার করিতে এবং তাহার জাতিকে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে বলিতেন।

পুনরায় বাইবেলে যেভাবে বলা হয় নাই পবিত্র কুরআনে তাহা বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ না নূহ (আ) তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা ও সমস্যার সম্মুখীন হইলেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহার উপদেশ গ্রহণে তাঁহাকে হতাশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল এবং যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তাহারা ঈমান আনিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উপর বিপদ নামিয়া আসে নাই।

তৃতীয়ত, পবিত্র কুরআনে আছে, যাহারা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। পুনরায় পবিত্র কুরআনে আছে যে, কিভাবে নূহ (আ)-এর পুত্র সত্যকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সে কিভাবে ডুবিয়া গিয়াছিল।

চতুর্থত, বাইবেলে আছে যে, আল্লাহ এই মহাপ্লাবন ঘটাইয়া কিছুটা অনুতপ্ত (?) হইয়াছিলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন অনুরূপ ঘটনা আর তিনি ঘটাইবেন না এবং নিজেকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এবং নূহ (আ)-এর সহিত 'চুক্তি সাধনের' পর আসমানে একটি ধনু (রংধনু) সৃষ্টি করিলেন, যাহার অর্থ তাঁহারও ভুল হইবার মত দুর্বলতা থাকিতে পারে (নাঊযুবিল্লাহ)।[৮৪] অপরপক্ষে পবিত্র কুরআন চমৎকারভাবে আল্লাহ্র মর্যাদা বিরোধী দোষারোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে বলা হয় নাই যে, আল্লাহ্র ক্রোধকে[৮৫] প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে নূহ (আ) একটি কুরবানী দিয়াছিলেন, অথচ তাহাই বাইবেলে আছে। বাইবেলে অনুলিখিত ঘটনাবলী পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করিয়া স্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ করিয়া মহানবী ﷺ -কে ও তাঁহার জনগণকে বলা হইয়াছে যে, তিনি ও তাঁহার সম্প্রদায় কেহই এই ঘটনার কথা পূর্বে জানিতেন না।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আয়াত (৩ ঃ ৪৪) আসিয়াছে মেরী ও যীশুর কাহিনীর প্রেক্ষিতে। তাহাদের লইয়া যে কাহিনী বাইবেলে ও পবিত্র কুরআনে আছে তাহার পার্থক্য আরও চমৎকার। সেই আয়াতেই তাঁহার যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআন স্পষ্টতই সকল মূল্যহীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইতে (মারয়ামকে) দোষমুক্ত ঘোষণা করিয়াছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে, তিনি পবিত্র ও সতীসাধ্বী এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বিশ্বের সকল মহিলার মধ্যে মহত্তম মহিলারূপে নির্বাচন করিয়াছেন। কুরআন এই প্রকারে তাঁহাকে যীশুর মাতা হওয়ার অসাধারণ সম্মান প্রদান করিয়াছে ঃ

يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ .

"হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।[৮৬]

একই সংগে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি একজন মানুষ বই আর কিছু নন এবং কোন কিছু চাহিতে হইলে তাঁহাকে অন্যান্যের মত আল্লাহ্র নিকটই চাহিতে হইবে ঃ[৮৭]

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ .

"হে মারয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সহিত রুকূ কর" (৩ ঃ ৪৩)।

যীশু সম্পর্কে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছে এবং এইরূপ কথাও বলা হইয়াছে যাহা নিউ টেস্টামেন্টেও নাই। যেমন, তিনি যখন দোলনায় শিশু তখন তিনি কথা বলেন,[৮৮] আল্লাহ্র হুকুমে মাটির পুতুল পাখির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন।[৮৯] অতঃপর তাঁহার নিকট আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নামিয়া আসিয়াছিল। এই সকল কথা কুরআন শরীফেই আছে। এই সকল কথা ব্যতীত পবিত্র কুরআনে সামগ্রিক ধারণার কথাও বলা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, যীশু নবী বা রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তিনি ঈশ্বর নহেন,[৯০] তিনি ঈশ্বরের পুত্রও নহেন,[৯১] তিনি ত্রিত্বের অন্যতমও নহেন,[৯২] তিনি ক্রুশবিদ্ধও হন নাই।[৯৩]

তৃতীয় আয়াত (১২ ঃ ১০২) ইউসুফ ('আ)-এর কাহিনীর শেষ অংশে আছে। পবিত্র কুরআন এই কাহিনীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কাহিনী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে (احسن القصص = আহসানুল কাসাস)। পবিত্র কুরআনে এই কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধৃত হইয়াছে। উহাতে আধ্যাত্মিকতার ইংগিত রহিয়াছে, যাহা ওল্ড টেস্টামেন্টে নাই। বাইবেল ও পবিত্র কুরআনের হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রধান কিছু অংশ পাশাপাশি স্থাপন করিলে উহাদের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যেমন ঃ

১. পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে যে, ইয়াকূব (আ) তাঁহার পুত্র ইউসুফকে অধিকতর ভালবাসিতেন, কারণ তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল (দ্র. ১২ ঃ ৪-৬)।

কুরআন	বাইবেল
১. পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে যে, ইয়াকূব (আ) তাঁহার পুত্র ইউসুফকে অধিকতর ভালবাসিতেন, কারণ তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল (১২ ঃ ৪-৬)।	১. ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে, ইউসুফের প্রতি ইয়াকূবের ভালবাসার কারণ তিনি বৃদ্ধ বয়সের পুত্র ছিলেন (জেনেসিস, ৩৭ ঃ ৩)।
২. পবিত্র কুরআন বলে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে লইবার পূর্বেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল (১২ ঃ ৯-১০)।	২. ওল্ড টেস্টামেন্টে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই।
৩. কুরআন বলে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে দেওয়ার	৩. অপরপক্ষে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে যে, ইয়াকূব তাঁহার পুত্রদের সঙ্গে যাইবার

জন্য তাহাদের পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিল (১২ : ১১-১৪)।

৪. পবিত্র কুরআনে দেখা যায় যে, ইউসুফ (আ) স্বপ্নের কথা তাঁহার ভাইদের নিকট বলেন নাই (১২ : ৫)।

৫. পবিত্র কুরআন বলে যে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁহাকে একটি কূপে ফেলিয়া দেয়, সেই স্থান দিয়া গমনকালে এক কাফেলা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া মিসরে দাসরূপে বিক্রয় করে (১২ : ১৫, ১৯)।

৬. পবিত্র কুরআন বলে যে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাহাদের পিতাকে বলে, ইউসুফকে কোন জন্তু খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তিনি উহা বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার ব্যাপারে নিরাশ হইয়াও যান নাই (১২ : ১৬-১৮)।

৭. পবিত্র কুরআন বলে যে, আযীযের স্ত্রীই ইউসুফকে বিপথগামী করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তখন ইউসুফ (আ) দৌঁড়াইয়া পলায়ন করিলে সে পশ্চাত হইতে তাঁহার জামা টানিয়া ধরিলে জামার পিছন দিক ছিঁড়িয়া যায় (১২ : ২৩-২৫)।

৮. পবিত্র কুরআন বলে যে, ইউসুফ (আ) যখন দৌড়াইয়া পালাইতেছিলেন তখন দরজার নিকট আযীযের স্ত্রীও ছিল, একই সময়ে আযীযও আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আযীযের স্ত্রী তাহার নিকট অভিযোগ করে যে, ইউসুফ তাহার শালীনতা ভঙ্গ করিতে গিয়াছিল এবং আযীযের জবাব না শুনিয়াই দাবি করে যে, ইউসুফকে এখনই কারাগারে নিক্ষেপ করিতে হইবে, শাস্তি দিতে হইবে (১২ : ২৫)।

৯. পবিত্র কুরআন বলে যে, ইউসুফ তৎক্ষণাৎ সেখানেই দরজার নিকট নিজেকে

জন্য ইউসুফকে বলিয়াছিল (জেনেসিস, ৩৭ : ১৩-১৪)।

৪. ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে যে, ইউসুফ স্বপ্নের কথা তাঁহার ভাইদের নিকট বলিয়াছিলেন (আদিপুস্তক, ৩৭ : ৫, ৯)।

৫. ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দেয়, অতঃপর তাহাকে কূপ হইতে তুলিয়া সেই স্থান দিয়া গমনকারী একদল কাফেলার নিকট তাহাকে বিক্রয় করে (আদিপুস্তক, ৩৭ : ২৩-২৮)।

৬. ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে, ইয়াকূব সহজেই তাঁহার পুত্রদের মিথ্যা বিবরণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হইয়া দীর্ঘকাল ক্রন্দনরত ছিলেন।

৭. ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে, আযীযের স্ত্রী চিৎকার করিয়া সাহায্যের জন্য ডাক দিলে ইউসুফ তাহার হাতে জামা ফেলিয়া পলাইয়া যান (জেনেসিস, ৩৯ : ১২)।

৮. ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে যে, আযীয গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাহার স্ত্রী ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ও বলে যে, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করিলে সে জামা ফেলিয়া পালাইয়া যায় (জেনেসিস, ৩৯ : ১৪-১৮)।

৯. ওল্ড টেস্টামেন্টে ইহার উল্লেখ নাই।

নির্দোষ বলিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করেন এবং সত্য কথা বলিতে গিয়া জবানবন্দী দেন যে, আযীযের স্ত্রীই তাঁহাকে বলাৎকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে (১২ ঃ ২৬)।

১০. পবিত্র কুরআন বলে যে, গৃহের একজন সাক্ষী বলে, যদি ইউসুফের জামার সম্মুখভাগ ছিন্ন হইত তাহা হইলে সে দোষী হইত, কিন্তু জামার পশ্চাত ভাগ ছিন্ন থাকায় প্রমাণিত হয় যে, আযীযের স্ত্রীই দোষী (১২ ঃ ২৬-২৭)।

১০. ওল্ড টেস্টামেন্টে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই।

১১. পবিত্র কুরআন বলে যে, জামার পিছন দিক যেহেতু ছিন্ন ছিল তাই আযীয প্রকৃত সত্য অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইউসুফকে নীরবে চলিয়া যাইতে বলেন। অতঃপর স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা চাহিতে বলেন (১২ ঃ ২৮-২৯)।

১১. ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে, স্ত্রীর অভিযোগ শুনিয়াই আযীয ক্রোধান্বিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণ করেন (জেনেসিস, ৩৯ ঃ ১৯-২০)।

১২. ঘটনার কথা চাপা থাকেনি কোনভাবে। নগরের মহিলা মহলে কানাঘুষা চলিতে থাকে যে, আযীযের স্ত্রী তাহার ক্রীতদাসের সহিত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। কানাঘুষার কথা আযীযের স্ত্রীও শুনিতে পায়। তখন সে একদিন সকল মহিলাকে নৈশভোজের দাওয়াত দেয়। ভোজন সমাপ্ত হইবার পর সকল মহিলার হাতে একটি আপেল ও আপেল কাটার একটি করিয়া ধারালো ছুরি দেওয়ার পর ইউসুফকে সেই সমাবেশে উপস্থিত করা হয়। মহিলাগণের প্রত্যেকেই ইউসুফের সৌন্দর্য ও দেহসৌষ্ঠব অবলোকন করিয়া এইরূপ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, তাহারা ফল না কটিয়া নিজেদের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলে। তখন আযীযের স্ত্রী বিজয় উল্লাসে সকলের সম্মুখে আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে, ইউসুফ যদি তাহার ইচ্ছা পূরণ না করে তবে তাহাকে অবশ্যই কারাবরণ করিতে হইবে এবং কষ্টভোগ করিতে হইবে (১২ ঃ ২৯-৩২)।

১২. ওল্ড টেস্টামেন্টে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

১৩. ইউসুফ (আ) তখন আযীযের স্ত্রীর বাসনা পূরণ অপেক্ষা কারাবরণ অধিকতর শ্রেয় মনে করেন এবং আযীযও দুর্নাম হইতে পরিত্রাণের জন্য ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণ করেন (১২ ঃ ৩৩-৩৫)।

১৩. ওল্ড টেস্টামেন্টে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

১৪. কেবল পবিত্র কুরআনেই বলা হইয়াছে যে, মিসরের রাজা ইউসুফকে কারামুক্ত করার এবং উচ্চপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত জানাইতে ইউসুফের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তখন ইউসুফ সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া বরং দাবি করেন যে, ঘটনাটির পূর্ণ তদন্ত করিতে হইবে। কেন তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে এবং তিনি যে নির্দোষ তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে (১২ ঃ ৫০)।

১৪. ওল্ড টেস্টামেন্ট ইউসুফের এই দাবির কথা বলে না, বরং বলে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

১৫. সর্বসমক্ষে ঘটনার বিচার হয়, সেখানে আযীযের স্ত্রী নিজেই সব কথা স্বীকার করে এবং সে বিষয়ে হাত কর্তনীয় মহিলারাও সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আযীযের স্ত্রী নিজেই তাহাদের কাছে স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়াছিল। ফলে ইউসুফ (আ) যে নির্দোষ ছিলেন তাহা সকলে জানিতে পারে (১২ ঃ ৫১-৫২, ১২ ঃ ৩২)।

১৫. ওল্ড টেস্টামেন্টে এই বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই।

১৬. পবিত্র কুরআনে কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতা-মাতা ও ভাইদের সঙ্গে মিলিত হন এবং স্বপ্ন যে বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছিল তাহাই দেখানো হইয়াছে (১২ ঃ ১০০)।

১৬. ওল্ড টেস্টামেন্টে ইউসুফের স্বপ্নের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোন বিবরণ নাই।

১৭. অবশেষে পবিত্র কুরআন যথাযথভাবে মিসরের শাসনকর্তাকে রাজা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে, ফিরআওন নহে। কারণ ফিরআওন পদবী প্রচলিত হইয়াছিল ১৮শ রাজবংশের পূর্বে নহে, সঠিকভাবে বলিতে গেলে ৩য় থেটমস-এর রাজত্বের পূর্বে (১৪৯০-১৪৩৬ খৃ. পূ.) নহে।

১৭. অপরপক্ষে ওল্ড টেস্টামেন্ট সর্বত্রই মিসরের শাসককে ফিরআওন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

ইউসুফ ('আ)-এর কাহিনী লইয়া পবিত্র কুরআন ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বিবরণের মধ্যে যে তথ্যগত পার্থক্য রহিয়াছে তাহার কিছু উল্লেখ করা হইল। এইরূপে যদি আরও বিস্তারিত তুলনা করা হয় তাহা হইলে আরও অনেক পার্থক্য ধরা পড়িবে।

অনুরূপভাবে আলোচ্য চতুর্থ আয়াত (২৮ ঃ ৪৪-৪৬) হযরত মূসা (আ) সম্পর্কিত কিছু ঘটনা (২৮ ঃ ২-৪৩) বর্ণনা প্রসঙ্গে সর্বশেষে বলা হইয়াছে। ঘটনাক্রমে এই কাহিনী একটি বক্তব্য দিয়া আরম্ভ হইয়াছে ঃ "আমরা তোমার নিকট সোনাই মূসার বিষয়ে কয়েকটি কাহিনী"। পবিত্র কুরআনে সত্যই মূসা ও তাঁহার ভাই হারূন ('আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, ইসরাঈলদের সম্পর্কে ওল্ডটেস্টামেন্টে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশি বর্ণনা রহিয়াছে। অবশ্য দুইটি বিবরণের মধ্যে অনেক মিলও রহিয়াছে। কিন্তু পার্থক্যসমূহ কুরআনে যে নূতন তথ্য রহিয়াছে তাহা মৌলিক।[৯৪] সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে মূসা ('আ)-কে ও তাঁহার ভাই হারূনের উপর অনুচিত কার্যের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, যদিও মূসাকে বলা হইয়াছে যে, তিনি ছিলেন তাঁহাদের 'আইনদাতা'। অপরপক্ষে মূসা ও তাঁহার ভাই হারূনকে ব্যক্তি হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইয়াছেন ও আল্লাহ্‌র রোষ তাহাদের উপর পতিত হইবার কারণ ছিল।[৯৫] এমনকি এইরূপ অভিযোগও আনয়ন করা হইয়াছে যে, হারূনের কারণেই তাহারা স্বর্ণ গোবৎস পূজা প্রবর্তন করিয়াছিল। অপরপক্ষে পবিত্র কুরআন তাহাদিগকে সকল অভিযোগ হইতে মুক্ত দেখাইয়াছে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছে যে, তাঁহারা ছিলেন আল্লাহ্‌র নির্বাচিত পয়গাম্বর ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ও কিতাবপ্রাপ্ত। তাঁহাদের প্রতি অনোচিত্যমূলক কর্মের যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাঁহারা ছিলেন উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁহারা ছিলেন আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর হিসাবে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী উৎসর্গকৃত প্রাণ, নিবেদিত প্রাণ, আন্তরিক মানুষ। তাঁহারা মানুষকে আহ্বান করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌রই উপাসনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও উপাসনা না করে।[৯৬] পবিত্র কুরআনে আরও বলা হইয়াছে যে, স্বর্ণ-গোবৎসের উপাসনা প্রবর্তন করিয়াছিল ইসরাইলী সামিরই, মূসার ভ্রাতা হারূন নহেন।[৯৭] পুনরায়, একমাত্র পবিত্র কুরআনের দুই সাগরের মিলনক্ষেত্র[৯৮] অবধি মূসার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার পবিত্র কুরআনেই সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে যে, মূসাকে হত্যা করিবার জন্য ফিরআওন যে চক্রান্ত করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইয়া যায় এবং ফিরআওনের দরবারের একজন 'বিশ্বাসী' ব্যক্তি তাহাকে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হইতে বিরত করিয়াছিল।[৯৯]

এমনকি বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থের লেখক যথাযথই দেখাইয়াছেন যে, পবিত্র কুরআনে আছে—শিশু মূসাকে নদী হইতে ফিরআওনের স্ত্রী উদ্ধার করিয়াছিল, ফিরআওনের কন্যা নহে। বাইবেলে আছে সাতজন মেষ পালক বালিকাকে মূসা সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু পবিত্র কুরআনে আছে মাত্র দুইজনকে। দশটি প্লেগের ঘটনার পরিবর্তে পবিত্র কুরআনে নয়টি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। কুরআনে আরও

আছে যে, মূসা প্রস্তরে আঘাত করিলে সেই প্রস্তর হইতে বার গোত্রের জন্য বারটি প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছিল। "অতঃপর নূতন বিষয়ে রহিয়াছে ঃ একজন মিসরীয়কে হত্যা করিবার জন্য মূসা অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। রাত্রিকালে মূসা দূরে জ্বলন্ত অগ্নি দেখিতে পাইলে সেই অগ্নি হইতে আগুন সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলেন..."। পবিত্র কুরআনে আরও বলা হইয়াছে যে, ফিরআওনের যাদুকরগণকে আল্লাহতে ঈমান আনার কারণে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল।[১০০]

অনুরূপভাবে যখন অন্যান্য পয়গাম্বরদিগের বিবরণ বর্ণনা করা হইয়াছে তখন পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ও বাইবেলের বর্ণনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইবরাহীম ('আ)-এর কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক পার্থক্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন দাউদ ও সুলায়মান ('আ) সম্পর্কে বিবরণ, তাঁহারা দুইজন ছিলেন পরাক্রমশালী মহান পয়গাম্বর। কিন্তু তাঁহাদিগের সম্পর্কে বাইবেলে যে চিত্র অংকন করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিভাত হয় যে, তাহারা ছিলেন অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী, ভোগবিলাসী, লম্পট, এমনকি অন্যায় সম্ভোগের জন্য অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করিতে দ্বিধা করিতেন না।[১০১] পয়গাম্বর লূতও নাকি আপন কন্যাদের সহিত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)।[১০২] অপরপক্ষে পবিত্র কুরআন এককভাবে পয়গাম্বরদের চরিত্রে কোন প্রকার কালিমা লেপন হইতে বিরত রহিয়াছে এবং হযরত দাঊদ (আ) সম্পর্কে যাহা বলিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র আদর্শ প্রতিনিধি। সেই কারণে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল সাম্রাজ্য, প্রজ্ঞা, কিতাব ও ক্ষমতা।[১০৩] অনুরূপভাবে সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন হিসাবে প্রদান করা হইয়াছিল ক্ষমতা, সাম্রাজ্য ও সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা।[১০৪] তাঁহারা উভয়ই ছিলেন আদর্শ চরিত্রের মানুষ ও আল্লাহ্র নবী।

এইরূপে পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে পয়গাম্বরগণ সম্পর্কিত যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা তুলনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, কুরআনের বিবরণ বাইবেলের বিবরণের নকল নহে। অবশ্য দুইটি বিবরণের মধ্যে অনেক মিলও রহিয়াছে, কিন্তু কুরআনের বিবরণ অনেক বেশি ভিন্ন প্রকৃতির ও মৌলিক। কোন কোন প্রাচ্যবিশারদ স্বীকার করেন যে, কুরআনে অনেক নূতন তথ্য আছে, কিন্তু সাধারণভাবে তাহাদের বিবেচনাগুলিতে তিনটি সাধারণ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, তাহারা যেখানে মিল আছে সেইগুলি সকল অমিল বাদ দিয়া দেখাইয়াছেন অথবা কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়া গৌণ বিষয় হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাহারা অনুরূপ ঘটনা বা ধারণা অন্যান্য পৌরাণিক গ্রীক, হিব্রু ও লাতিন রচনায় চিহ্নিত করিতে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই এবং তৎক্ষণাৎ ঝাঁপাইয়া পড়েন ও বলেন যে, কুরআনে বর্ণিত ঘটনা সেই সূত্র হইতে লওয়া হইয়াছে অথবা উহার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে। তাহারা তখন ভুলিয়া যান যে, কোন ঘটনার বা ধারণার উল্লেখ পূর্ববর্তী কোন রচনায় থাকিলেই প্রমাণিত হয় না যে উহা সেই পূর্ববর্তী রচনা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কোন সময় উক্ত বিষয় হয়তো কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বের রচনা।

পরবর্তী কালের কোন কিছুতে সেই ধারণা বা ঘটনা থাকার অর্থ ইহা নহে যে, উহাকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী কালে রচনা রচিত হইয়াছে। আরও কিছু সাক্ষ্য প্রয়োজন হয়। যেমন যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ অথবা সেই সূত্রের সহিত যোগাযোগের সম্ভাবনার কোন প্রমাণ থাকিতে হয়। এই বিষয়টি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ এই কথা বলা চলে না যে, তিনি অসংখ্য পৌরাণিক রচনা ও সূত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এমনকি সেই সকল রচনা লুপ্ত ভাষায় থাকিলেও তিনি সেই ভাষা জানিতেন। সেই সকল পৌরাণিক কাহিনী ও জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে নিছক পথচারীর মুখ হইতে শুনিয়া অথবা ধর্মান্তরিত ক্রীতদাসের নিকট হইতে শুনিয়া সম্ভব নহে। অথচ তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগই আনয়ন করা হইয়াছে। এইরূপ কোন তথ্য নাই যাহাতে দেখা যায়, সেকালে মক্কা নগরীতে অথবা আশেপাশে কোন গ্রন্থাগার বা যাদুঘর ছিল যেখানে প্রাচীন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি ছিল, যে সকল গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির প্রতি প্রাচ্যবিশারদগণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, অথবা সেখানে এইরূপ কোন জ্ঞানী পণ্ডিত অথবা ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন না যিনি সেই সকল গ্রন্থের রহস্য ভবিষ্যতে যিনি পয়গাম্বর হইবেন তাঁহার নিকট ওই সকল তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারিতেন। তৃতীয়ত, যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাচ্ছিল্যের সহিত প্রাচ্যবিশারদগণ স্বীকার করেন যে, পবিত্র কুরআনে অনেক নূতন তথ্য রহিয়াছে তখন তাহারা মনে হয় কখনও মনোযোগ দিয়া চেষ্টা করেন নাই যে, উক্ত তথ্য কোন্ সূত্র হইতে আসিয়াছে তাহা উদ্ধার করিতে। তাহারা যদি সত্যই আন্তরিকভাবে সেই চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনুধাবন করিতে পারিতেন, যে ধারণা-অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহারা একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা করিতেছেন সেই অনুমান ও ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন।

অনুবাদ ঃ ফজলে রাব্বি

তথ্যসূত্র

১. Abraham Geiger, Was hat Muhammed aus dem Judenthem aufgenommen? Bonn 1833.

২. Of such works mention may be made of (a) Wilhelm Rudolph, Dei Abhangigheit des Qurans von Judentum und Die Christentunm, Stuttgart 1922; (b) Tor Andrae, Der Ursprung des Islams und des Christentum, Stockholm 1926 (Fr. tr. Les Origins de l'Islam le christianisme, Paris 1955); (c) R. Bell, The Origin of Islam in its Christian Envi, ronment, London 1926; (d) K. Ahrens, "Christliches in Qoran," ZDMG, 1930, 15-68, 148-190 (also his Muhammed als Religionsstiffer, Leipzig 1935; (e) C.C. Torrey, The Jewish foundation of Islam, New York 1933 (republished, New York 1967) and (f) A. I. Katsh, Judaism in Islam, New York 1954.

৩. মুইর, প্রাগুক্ত, তৃতীয় সংস্করণ ১৫ (vol 2, 1st edition, 8).

৪. ঐ, ২০ (২খ, ১ম সংস্করণ, ১৮)।

৫. ঐ, ১৫-১৬, (২খ., ১ম সংস্করণ, ৭-৮)।

৬. ঐ, ৩৪ (২খ, ১ম সংস্করণ, ৪৯-৫০)।

৭. ঐ (২খ, ১ম সংস্করণ, ৫২)।

৮. ঐ, ১৬ (২খ, ১ম সং, ৮-৯)।

৯. ঐ, ২০-২১ (২খ, ১ম সং, ১৯-২০)।

১০. ঐ বরাত।

১১. মারগোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

১২. ঐ বরাত, পৃ. ৫৮-৫৯।

১৩. ঐ, পৃ. ৬৯, এখানে মারগোলিয়থ লেখক ও গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করিয়া C.C. Torrey's Commercial-Thelogicasl Terms in The Koran, Leiden 1892-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

১৪. মারগোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৫. ঐ, পৃ. ১০৬।

১৬. ঐ, পৃ. ৭৩।

১৭. ঐ, পৃ. ৭৪।

১৮. ঐ, পৃ. ৭৭।

১৯. ঐ, পৃ. ৭৮।

২০. ঐ, পৃ. ৭৬-৭৭।

২১. Watt, M at M, 23.

২২. ঐ, পৃ. ২৫-২৯ এবং Excursus B, pp 158-161 এবং Muhammad's Mecca, 36-38.

২৩. M at M. 28; Ms' M, 37-38.

২৪. M at M, 27.

২৫. ঐ বরাত।

২৬. ঐ, পৃ. ২৮।

২৭. ঐ, ২৭ এবং Excursus B, 159.

২৮. মারগোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

২৯. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ . (১৬ ঃ ১০৩)

৩০. C.C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩ প.।

৩১. Watt, M at M, Excursus B., p 159.

৩২. ঐ বরাত।

৩৩. ঐ বরাত।

৩৪. ঐ বরাত।

৩৫. M's M, 45.

৩৬. M at M, পৃ. ২৭-২৮।

৩৭. M's M, পৃ. ২, ৪৫।

৩৮. ঐ, পৃ. ২, ৪৪।

৩৯. ঐ, পৃ. ২, ৫-৭; কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—২ ঃ ২২; ১৩ ঃ ৩; ২০ ঃ ৫৩; ৫১ ঃ ৪৭-৪৮; ৭১ ঃ ১৯-২০; ৭৮ ঃ ৬-৭ এবং ৭৯ ঃ ২৭-৩৩ এইসব আয়াতের আলোচনার জন্য নিম্নে দ্রষ্টব্য পৃ. ৩০১-৩১৯।

৪০. ঐ, পৃ. ৫১।

৪১. ঐ, পৃ. ৩৮।

৪২. M. at M, 29.

৪৩. পরে দেখুন হানীফ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের আলোচনার জন্য অধ্যায় ১৪।

৪৪. Watt, M's M, ৩১-৩৬।

৪৫. ঐ, পৃ. ৩৫; Javier Teixidor, The Pagan God : popular Religion in The Greco-Roman Period, Princeton 1977, pp, 17, 161-এর বরাতে।

৪৬. Watt, M. at M, ২৩-২৪; M's M, ৩৫; আরও দ্র. মারগোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৭. Watt, M at M, ২৬-২৭; আরও দ্র. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

৪৮. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আধুনিক বেদান্ত দার্শনিকদের, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাহার উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীদের বর্ণিত মতামত, M.M.Ali, The Begali Reaction to Christian Missionary Activities, 1833-1857. চট্টগ্রাম ১৯৬৫ খৃ., অধ্যায় ২ এবং ৩।

৪৯. Huart, "Une nouvelle Source du Koran", Jurnal Asiatique, 1904, p. 129; আরও দ্র. Goerges Sale, Observations Historiques et Critiques sur le Mahometisme, pp. 64-71.

৫০. Watt, M's M, 36.

৫১. হাদীছটি বেশ কয়েকটি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (সম্পা. আবদুল মজীদ আস-সালাফী), ১২খ, পৃ. ৮৮-৮৯; নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া নামানবাউল ফাওয়াইদ, বৈরূত ১৯৮৬/১৪০৬, ৯খ, পৃ. ৪২১-৪২২; আল-বায়হাকী, দালাইলুন নুবূওয়া, ১খ, পৃ. ৪৫৩, ৪৫৪-৪৫৬ এবং ৪৫৭-৪৬৫।

৫২. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী, আল-মাওদূ'আতুল কাবীর, ১খ, ২১৩-২১৪; আস-সুয়ূতী, আল-লাআলীল মাসনূআ, ১খ, ১৮৩-১৯২; আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইরাক আল-কানানী (৯০৭-৯৬৩ হি.), তানযীহুশ শারী'আহ আল-মারফূআ আনিল আহাদীছিশ শানিয়া আল-মাওদূ'আ, ৩য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮১, ১খ., পৃ. ২৪১-২৪৩।

৫৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল (সম্পা. আলী মুহাম্মাদ আল-বিজ্জাবী), ৩খ, পৃ. ৫০৯, নং ৭৩৫১; আল-ইসাবা, ৩খ, পৃ. ২৭৯-২৮০, নং ৭৩৪৯।

৫৪. C.C. Torrey, The Jewish Foundation etc., op cit, 43 ff.

৫৫. Watt, M at M, 159.

৫৬. Watt, Ms M, 45.

৫৭. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ২০।

৫৮. এখানে লক্ষণীয় যে, ওয়াট এবং তাহার গুরু আর. বেল কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যাকালে উহার প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব এই বলিয়া হ্রাস করিতে চেষ্টা করেন যে, প্রত্যাদেশের প্রতিটি একক প্রায় সব সময় ছিল সংক্ষিপ্ত আয়াত। কিন্তু বিষয়বস্তুর আকস্মিক পরিবর্তন বা ভাষার আঙ্গিকের পরিবর্তন বা সম্বোধনে প্রথম পুরুষ হইতে তৃতীয় পুরুষের পরিবর্তন যাহা তাহাদের মতে একটি বিশেষ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত সম্পর্ক নির্দেশ করে, এই দৃষ্টান্তে কোনক্রমেই প্রযোজ্য নহে।

৫৯. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল-আছার, ৪র্থ অংশ; বাব ঃ আল-লাম মা'আল খা; আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, বৈরূত মুদ্রণ; তাবি., ২খ., ৪২৯; আল-কুরতুবী; তাফসীর, ৭খ, ৩২৮ এবং ১০খ, ১৭৮ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ইত্যাদি, ১খ, ২য় মুদ্রণ ১৯৬৪/১৩৮৩, পৃ. ২৭০ এবং ৩য় অংশ, পৃ. ১৯৫।

৬০. বক্তব্য দুইটি নিম্নরূপ ঃ

اَلَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِى اٰيٰتِنَا (ح - م سجدة : ٤٠-٤١).

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهِ (اعراف : ١٨٠).

৬১. A. J. Arberry, The Koran, O.U.P. (Oxford paperbacks), 1986, পৃ. 165 ও 495.

৬২. ঐ, পৃ. ৩৩৬।

৬৩. এই সূরা (আল-ফুরকান, নম্বর ২৫) মুসলিম মনীষীদের মতে নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ৩৮ এবং ৪২ নম্বর সূরার মধ্যবর্তী কালের। পক্ষান্তরে রডওয়েল ও নোলডেকে-এর মত প্রাচ্যবিদরা ইহাকে অবতীর্ণ হওয়ার দিক হইতে ৬৬তম স্থানে রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুইর ইহাকে ৭৪তম স্থানের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যদিকে মুসলিম মনীষিরা সূরা (আন-নাহল) নম্বর ১৬-কে ৬৭ ও ৭২ সূরার মধ্যবর্তী স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। রডওয়েল এবং নোলডেকে ৭৩তম স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। মুইর ইহাকে ৮৪তম এবং এ জেফারী ইহার স্থান ৪৬তম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র. মুহাম্মাদ খলীফা, The Sublime Quran and Orientalism, London and New York 1983. Appendix II : and Muhammad "Izzat Darwazah, Sirat al-Rasul, I Beirut, n. d. (1400 H) PP. 145-149.

৬৪. Watt, M's M, পৃ. ৪৫। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লিখিত নাম ছিল জাবব। ফাকীহ্ ইবনুল মুগীরা-এর একজন খৃস্টান ক্রীতদাস, যিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, জাবর ছিলেন বানূল হাদরামীর একজন দাস। আরকটি প্রস্তাবিত নাম হইল ইয়াইশ, বানূ হাদরামী বা বানুল মুগীরা বা বানূ আমের ইব্‌ন লুওয়াই-এর একজন দাস। আরও বলা হইয়া থাকে যে, বানুল হাদরামীর দুইজন দাস ছিল। একজনের নাম জাবর এবং অপরজনের নাম ইয়াসার অথবা নাবত। তারা ছিলেন তরবারি নির্মাতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মধ্যে তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিতেন ও কথাবার্তা বলিতেন বলিয়া কথিত আছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তি ছিলেন বাল'আম, একজন খৃস্টান, যাহার বাইবেল সম্পর্কে কিছু জ্ঞান ছিল। আল-কুরতুবীর মতে ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তির নাম ছিল মায়সারা যিনি ছিলেন মক্কায় বসবাসরত একজন গ্রীক খৃস্টান। অপর এক বর্ণনায় আছে, তাহার নাম ছিল আদ্দাস, উৎবা ইব্‌ন রাবী'আর ক্রীতদাস। আরেকটি ভিন্ন মতে তিনি ছিলেন আব্‌স, হুওয়ায়রিছ ইব্‌ন আবদুল উযযার একজন ক্রীতদাস। দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১০খ, পৃ. ১৭৭-১৭৮ এবং আয-যামাখশারী, কাশশাফ, ২খ, ৪২৯)।

৬৫. আল-কুরতুবী (তাফসীর), ১০খ, পৃ. ১৭৭।

৬৬. Watt, M at M, 159 (Excursus B).

৬৭. ঐ, পৃ. ৯।

৬৮. ঐ বরাত।

৬৯. Watt, The Dating of The Quran : A review of Richard Bell's theories, J.R.A.S., 1957, pp. 46-56 (Specially pp. 54-56).

৭০. Watt, M's M, 4.

৭১. Watt, M at M, 159.

৭২. Gen., 18 : 1-8.

৭৩. Gen., 19 : 3.

৭৪. অনুবাদটি ঈষৎ পরিবর্তনসহ, A. J. Arberry -এর প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

৭৫. উপরে দ্র.. পৃ. ২৪১, ২৫০।

৭৬. Watt, M at M, 160.

৭৭. ঐ, পৃ. ১৬০-১৬১।

৭৮. Watt অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে।

৭৯. ৫ ঃ ২৭; ৬ ঃ ৩৪; ৬ ঃ ৬৭; ৭ ঃ ১৭৫; ৯ ঃ ৭০; ১০ ঃ ৭১; ১৪ ঃ ৯; ১৮ ঃ ৩; ২৬ ঃ ৬৯; ২৭ ঃ ২২; ২৮ ঃ ৩; ২৮ ঃ ২১; ৩৮ ঃ ৬৭; ৩৮ ঃ ৮৮; ৪৯ ঃ ৬; ৬৪ ঃ ৫ এবং ৭৮ ঃ ২।

৮০. ৩ ঃ ৪৪; ৬ ঃ ৫; ৭ ঃ ১০১; ১১ ঃ ৪৯; ১১ ঃ ১০০; ১১ ঃ ১২০; ১২ ঃ ১০২; ২০ ঃ ৯৯; ২৬ ঃ ৬; ২৮ ঃ ৬৬; ৩৩ ঃ ২০ এবং ৪৪ ঃ ৪।

৮১. A.J. Arberry, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৮২. ঐ, পৃ. ২৩৭।

৮৩. ঐ, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

৮৪. Gen., 8:21 এবং 9:11-16.

৮৫. Gen., 8: 20.

৮৬. Quran, 3 : 42.

৮৭. Quran, 3 : 43.

৮৮. Quran, 3 : 46.

৮৯. Quran, 3 : 49.

৯০. Quran, 5 : 19; 4 : 171.

৯১. Quran, 4 : 171; 6:101; 10:68, 17:111; 18 : 4-5; 19 : 35; 19 : 88-89; 19 : 91-92; 21:26; 23:91; 25:2; 37:152; 39:4; 43:81; 72:3 and 112:3.

৯২. Quran, 4:171; 5:76.

৯৩. Quran, 4 : 157.

৯৪. সাদৃশ্যের সারাংশের জন্য The shorter Encyclopaedia of Islam, 1974, reprint, pp. 414-415.

৯৫. Deuteronomy 32 : 48-52.

৯৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. Quran, ২ ঃ ৫২-৭২; ৭ ঃ ১৪৪-১৪৫; ১৯ ঃ ৫১-৫৩; ৫৭-৭৩; ২০ ঃ ৩৯-৫০; ২১ ঃ ৪৮; ৩৩ ঃ ৬৯; ৩৭ ঃ ১১৪-১২২; ৫৩ ঃ ৩৮ এবং ৮৭ ঃ ১৯।

৯৭. Quran, ২০ ঃ ৮৫-৮৬; ২০ ঃ ৯৫-৯৭।

৯৮. Quran, 18 : 60-62; The Shorter Encyclopaedia of Islam-এর লেখক (পৃ. ৪১৫) সঠিকভাবেই লিখিয়াছেন। একটি সফরে মূসা ('আ) যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাহচর্যে ছিলেন এই কাহিনী অতুলনীয়।

৯৯. Quran, 40 : 26-45. Shorter Encyclopeadia of Islam-এর লেখক এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে মূসা ('আ) এর কাহিনীর উৎস ছিল Haggada লিখেন, "ফিরাউনের দরবারে একজন মুসলমান কর্তৃক মূসা ('আ)-কে রক্ষা করার প্রচেষ্টা সম্পর্কিত কুরআনের কাহিনী স্পষ্ট নহে"। হাঁ, তুলনাটি লেখক যেমনটি প্রস্তাব রাখিয়াছেন অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ। Haggada-এ Jethro-এর কাহিনী বাস্তবিকই স্পষ্ট নহে। কুরআনের বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্ট। Haggada-এর সহিত ইহার কোন তুলনা হয় না।

১০০. The Shorter Encyclopaedia of Islam, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪-৪১৫।

১০১. দাউদের জন্য দ্র. স্যামূয়েল II, 3:12-16; 4 : 4-5; 16:23; 18 : 33 এবং সলোমনের জন্য দ্র. Kings I, 2 : 13-25; 28-35; 11 : 1-13.

১০২. Gen., 19 : 31-36.

১০৩. Quran, 6 : 88; 21 : 78-80; 34 : 10-11; 38 : 17-26.

১০৪. Quran, 2 : 102; 4 : 163; 6 : 88; 21 : 78-82; 27 : 15-44; 34 : 12-14; 38 : 30-40.

দ্বাদশ অধ্যায়

পবিত্র কুরআনে সমকালীন ত্রুটি

একদিকে পবিত্র কুরআনে যে সকল বক্তব্য রহিয়াছে তাহার সহিত অন্যদিকে তৎকালীন বাইবেলে উল্লিখিত পয়গাম্বরদিগের কাহিনী ও অন্যান্য বিবরণের মধ্যে যে সকল পার্থক্য ও বিরোধ রহিয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যে তত্ত্ব দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, তাহা বাইবেল হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই তত্ত্ব সঠিক নহে। প্রাচ্যবিদগণ নিজেদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন মহানবী নিজে বাইবেল পাঠ করেন নাই, কিন্তু ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য অপরের মুখ হইতে শুনিয়া লাভ করিয়াছেন এবং যেহেতু তাঁহার এই জ্ঞান গৌণভাবে লাভ করা সেহেতু এই দুইটি ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ভ্রান্ত ধারণা পবিত্র কুরআনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই একই ধারণার সূত্র ধরিয়া তাহারা পরবর্তীকালে, বিশেষ করিয়া ওয়াট, বলিতে চাহিয়াছেন যে, কেবল দুই ধর্মের ভ্রান্ত ধারণাই নহে, বরং তৎকালে প্রচলিত বিশ্ব ও মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা পবিত্র কুরআনে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রাচ্যবিদগণের ধারণা ছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ এবং সেই ক্ষেত্রে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিছক লোকমুখের কথা শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান লইয়া এবং তথাকথিত ব্যক্তিগত 'সংবাদ সরবরাহকারী' অথবা 'শিক্ষক' তাহাকে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে দুইটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পদ্ধতি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন অথবা একটি নূতন ধর্ম নির্মাণ করিতে ও প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাহাদিগের এই অমূলক ধারণা বা অনুমান যে নিতান্তই অযৌক্তিক তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে প্রচ্যবিদগণের অবশিষ্ট বাহানা ও ছুতা লইয়া আলোচনা করা হইবে। অবশিষ্ট বাহানা ও ছুতাগুলি হইতেছে, পবিত্র কুরআনে নাকি অনেক কথা রহিয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভ্রান্ত এবং ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কেও অনেক ভুল তথ্য রহিয়াছে।

এক ঃ ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে তথাকথিত অনেক ভুল তথ্য

বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে দুইটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, কুরআন ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মকে কোন পৃথক ও নূতন ধর্ম মনে করে না, বরং মনে করে যে, তৎকালে প্রচলিত এই দুইটি ধর্ম ছিল মূলত আল্লাহ্‌র নবীগণ যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বিকৃত রূপ ও বিচ্যুতি মাত্র। আধুনিক ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তাহাদিগের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া যাহা মনে করিয়া থাকেন সেই বিষয়ে কুরআন কোন মন্তব্য করিয়াছে এইরূপ কোন প্রশ্নই

এমতাবস্থায় ওঠে না। পবিত্র কুরআন নির্দিষ্টরূপে দেখাইয়াছে যে, সেই সময়ে তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ যাহা বিশ্বাস করিত এবং অনুশীলন করিত তাহা ভুল ছিল এবং সেই সকল ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহারা তাহাদের কিতাবের বিকৃতি সাধন করিয়াছিল। কুরআন সেই সকল ভ্রান্তি সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করিবার জন্য তীব্র চেষ্টা করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান কালে আধুনিক ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তাহাদিগের বিশ্বাসের বিশুদ্ধ তত্ত্বগত শিক্ষা বলিয়া যাহা মনে করেন তাহার সহিত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকের ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এক নহে। এমতাবস্থায় ইহা মূলত একটি ভ্রান্তিমূলক পদ্ধতি যখন বলা হয়, যে কুরআনে বিধৃত তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কতিপয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা 'স্পষ্টত বোধগম্য' মিথ্যা বিবরণ। কারণ সর্বজনবিদিত যে, ইসলামের আগমনের পর এই সকল ধর্মের অনুশাসনে, বিশেষ করিয়া খৃস্ট ধর্মের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি 'সংস্কার' ও সংশোধন সাধিত হইয়াছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে যখন লক্ষ্য করা যাইবে যে, সত্যিকারের চিন্তাশীল খৃস্টানগণ সম্প্রতি যীশুর ঈশ্বরত্ব ও যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের শরীরপরিগ্রহ,[১] ট্রিনিটির অংশ হিসাবে পবিত্র আত্মা[২] প্রভৃতি তত্ত্বকে পরিহারের কথা বলিতেছেন। যদি কোন সময় খৃস্টানদের ধর্মবিশ্বাসের এই সকল প্রস্তাবিত সংস্কার ও সংশোধন সাধিত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে কোন খৃস্টান পণ্ডিত নির্দ্বিধায় বলিতে পারিতেন যে, 'যীশু ঈশ্বরের শরীর পরিগ্রহণকারী' এই বাক্য খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্টত 'বোধগম্য' মিথ্যা বক্তব্য।

মুইর এবং অন্যান্য প্রাচ্যবিদগণ প্রকৃতপক্ষে তাহাই করিয়াছেন। এইরূপে তাহারা অযৌক্তিকভাবে পবিত্র কুরআনকে দোষারোপ করিয়াছেন যে, তাহারা ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য বলিয়া জানেন সেই সকল ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে। তাহারা অবশ্য এই সত্য অস্বীকার করেন নাই যে, সকল ভ্রান্ত তথ্য সমকালীন খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণ বিশ্বাস করিতেন। যেমন মুইর সমস্ত দোষ 'ক্যাথলিক' ও সে যুগের সিরিয়ান খৃস্টানদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। অপরপক্ষে ওয়াট সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইয়া দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 'নামকা ওয়াস্তে খৃস্টানদের' উপর।[৩] তিনি তাহার সর্বশেষ রচনায় আরও পরিবর্তন করিয়া বলিয়াছেন, 'মক্কার কিছু লোক কতগুলি ভ্রান্ত ধারণাকে ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মীয় বিশ্বাস বলিয়া মনে করিত এবং এইগুলি ছিল মক্কাবাসীর বিশ্বাস'।[৪] সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, সেই বিশ্বাসগুলি ও আচারগুলি মক্কার কিছু লোকের ধারণা ছিল না, বরং মক্কাবাসী আরব ও সিরিয়ার খৃস্টানদের ছিল। তাহাদের এই সকল বিশ্বাসের প্রতি নির্দেশ করিয়াই পবিত্র কুরআন বলিতেছে যে, তাহারা তাহাদের আসল নবীর কথা অনুসরণ করিতেছে না, ভুল পথে চলিতেছে। পবিত্র কুরআন ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মের মূল তত্ত্ব বা শিক্ষণীয় সম্পর্কে বলিতেছে না।

তথাকথিত ভ্রান্তির উল্লেখ করিয়া তাহারা বলেন যে, কুরআন নাকি বলে—'ট্রিনিটি হইতেছে পিতা, পুত্র ও কুমারী মেরী'—এই তিনের সমাহার।[৫] ইহা আরও বলে, ইয়াহূদীরা এজরাকে (উযায়র) ঈশ্বরের পুত্র মনে করে এবং ইহা অস্বীকার করে যে, যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন।

(ক) ট্রিনিটি সম্পর্কিত

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পবিত্র কুরআনের কোথাও বলা হয় নাই যে, ট্রিনিটি হইতেছে 'পিতা', 'পুত্র' ও 'কুমারী মেরী'—এই তিনের সমাহার। ইহা কুরআনের বিষয়ও নহে; ট্রিনিটি সংগঠনে কোন ব্যক্তি বা সত্তা রহিয়াছে তাহা চিহ্নিত করা পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্যও নহে।

পবিত্র কুরআন কেবল এই ধারণাকে একত্ববাদের ক্ষতিকারক, বিরোধী ও বিপরীতমুখী বলে। এই প্রাচ্য বিশারদগণ, বিশেষ করিয়া ওয়াটের নিজস্ব ধারণা যে, কুরআনের সেই সকল আয়াতে যেখানে খৃস্টানদের আল্লাহসহ যীশু ও মেরীর উপাসনার কথা প্রসঙ্গে 'ট্রিনিটি হইতেছে ইত্যাদি' বলা হইয়াছে।[৬] যে আয়াতের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন উহা (৫ ঃ ১১৬)।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِى وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ .

"আল্লাহ যখন বলিবেন, 'হে মারয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর'! সে বলিবে, তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই, উহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে" (৫ ঃ ১১৬)।

এখানে পবিত্র কুরআন আল্লাহ ব্যতীত যীশু ও মেরীর উপাসনা অনুমোদন করে না এবং সেই সঙ্গে যীশুকে তাহার শিষ্যগণকে কথিত অনুরূপ নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পরোক্ষভাবেও ট্রিনিটি তত্ত্বের কোন উল্লেখ নাই। আশ্চর্যজনকভাবে উল্লেখ যোগ্য যে, যে স্থলে পবিত্র কুরআন পরোক্ষভাবেও ট্রিনিটি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে—যেমন আয়াত ৪ ঃ ১৭১ ও ৫ ঃ ৭৩, সেই স্থলেও কোন সত্তাকে চিহ্নিত করা হয় নাই যে সত্তাকে বলা যাইতে পারে ট্রিনিটির অংশ। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনে দুইটি বিষয়কে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিবেচনা করিয়াছে। একটি বিষয় হইতেছে ট্রিনিটি এবং অপর বিষয় হইতেছে মানুষকে ঈশ্বর বা দেবতারূপে উপাসনা করা। ৯ ঃ ৩১ আয়াতে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণ আল্লাহ ছাড়াও তাহাদের সন্যাসী ও তপস্বীগণকে যে ঈশ্বর বা দেবতারূপে উপাসনা করে তাহা অনুমোদন করে না। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

"তাহারা আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে তাহাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারয়াম তনয় মসীহকেও। কিন্তু তাহারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি পূত-পবিত্র" (৯ ঃ ৩১)।

এই আয়াতটির অর্থ ৫ ঃ ১১৯ আয়াতেব অর্থের অনুরূপ। এখানে পুনরায় আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও উপাসনাকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে একটি হাদীছও রহিয়াছে যাহাতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, কিরূপে খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণ তাহাদিগের সন্যাসী ও পুরোহিতগণকে ঈশ্বররূপে বিবেচনা করিত।[৭] কিন্তু সেই প্রশ্নের বাহিরে, কেহ কোথাও ৯ ঃ ৩১ আয়াতের ভিত্তিতে বলিবে না পবিত্র কুরআনের ট্রিনিটি সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে একদিকে রহিয়াছে সন্যাসী ও তপস্বী, অপরটি হইতেছে যীশু এবং তৃতীয় অংশ হইতেছে আল্লাহ!

খৃস্টানগণ যে যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য ঘটনা। মেরীকে উপাসনার বিষয়টিও সত্য। কারণ কেবল আরব দেশীয় খৃস্টান নহে, বরং পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক খৃস্টান, বিশেষ করিয়া ক্যাথলিকগণ তাঁহাকে পূর্বেও পূজা করিত, এখনও করে। তাঁহাকে তাহারা ঈশ্বরের মর্যাদা দিয়ে থাকে। ওয়াট সম্ভবত এই সত্যটি আমলে আনিতে চাহেন না, যেহেতু তিনি নিজে একজন প্রটেস্টান্ট এবং প্রটেস্টান্ট শিক্ষায় ইহা নাই। বিষয়টি মুহাম্মদ আলী তাহার এই আয়াতের তফসীরে যেভাবে লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল ঃ

"মেরীকে খৃস্টানগণ যেভাবে দেবীরূপে বিবেচনা করে তাহার বিবরণ দিতে গিয়া কিছু সংখ্যক খৃস্টান পবিত্র কুরআনের সমালোচনাকারী উপসংহার টানেন এই বলিয়া যে, কুরআনের মতে ট্রিনিটি তত্ত্বে তিন ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে—ঈশ্বর, যীশু ও মেরী। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অযাচিত উপসংহার। মেরীকে খৃস্টানদের উপাস্য দেবী বলা হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেখানে ট্রিনিটি তত্ত্ব উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ অপরদিকে যেখানে ট্রিনিটি তত্ত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে মেরীর ঈশ্বরত্ব উল্লেখ করা হয় নাই। মেরীওলেট্রি তত্ত্ব ও অনুশীলন, প্রটেস্টান্ট বিতর্ক সৃষ্টিকারিগণ তাহাই বলিয়া থাকেন, একটি অতি পরিচিত বিষয়। রোমান গির্জায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে উহা "তিনি সত্যই ঈশ্বরের মাতা, তিনিই দ্বিতীয় হাওয়া (ইভ), তাহার মাধ্যমেই আমরা জীবন ও করুণা লাভ করিয়াছি, তিনি দয়ার মাতা, বিশেষভাবে তিনিই আমাদের জন্য সুপারিশকারী, তাহার প্রতিচ্ছবি আমাদের জন্য পরম প্রয়োজনীয়" (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১১শ সংস্করণ, ১৭শ ভলিউম, পৃষ্ঠা ৮১৩)। সেখানে আরও বলা হইয়াছে, তাহার সুপারিশকারী হওয়ার বিষয় গীর্জার প্রার্থনা সংগীতের মধ্যে সরাসরি স্থান পাইয়াছে। তদুপরি সাইথিয়া, থ্রেস ও আরবদেশে অনেক মহিলা দেবী হিসাবে কুমারীকে পূজা করায় অভ্যস্ত ছিল। তাহাদের পূজার অর্ঘ্য থাকিত কেক। লেখক আরও বলেন, 'ইফেসাসের কাউন্সিলের সময় (৪৩১ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত) হইতে কুমারী মেরীও শিশুর মূর্তি প্রদর্শন গোঁড়ামী প্রদর্শনের অনুমোদিত বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে...। মেরীর প্রথা (কাল্ট) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমের সর্বত্র ইফেসাসের কাউন্সিলের পর ইতিহাস অন্বেষণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে.... জাস্টিনিয়ান তাহার একটি আইনে তাহার সুপারিশ কিরূপ হইবে তাহা তৈরি করা হইয়াছিল এবং সেন্ট সোফিয়ার সুউচ্চ বেদীতে খোদাই করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহার নামসহ। যুদ্ধক্ষেত্রে সেবিকারা তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাহার ছবি পতাকায়

বহন করেন। দামাসকের (দামাসকাসের) জন তাহার সম্পর্কে বলেন যে, তিনিই সার্বভৌম, সকল সৃষ্টিকে তাহার পুত্র কর্তৃক তাহার দাস বা প্রজা করা হইয়াছে। পিটার দেয়ামিন তাহাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ সৃষ্টি বিবেচনা করিতেন এবং এমনভাবে সম্বোধন করিতেন যেন তিনি দেবী এবং স্বর্গ ও মর্তের সকল ক্ষমতার অধিকারী। অবশ্য আমাদের বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে খৃস্টান জগতের প্রয়োজন ছিল মধ্যস্থকারীর সহিত মধ্যস্থতা করিবার জন্য একজন মধ্যস্থতাকারীর এবং এইভাবে যীশুর সহিত মেরীকেও ঈশ্বরের আসনে উন্নীত করার। সাম্প্রতিক কালে সশরীরে মেরীর বেহেশতে প্রবেশ সংক্রান্ত পোপের ঘোষণা এই উপসংহার সমর্থন করে এবং খৃস্টান জগতে নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিবে যে, সত্যই ট্রিনিটি ঈশ্বর, যীশু ও মেরীর সমাহার কি না"।[৮]

(খ) 'উযায়র (আ) সম্পর্কিত বক্তব্য

কুরআনে বলা হইয়াছে যে, ইয়াহূদীরা 'উযায়র (আ)-কে ঈশ্বরের পুত্র বলে। এই বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াট ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, 'ইয়াহূদী ধর্ম সম্পর্কে ইহা কুরআনের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি' এবং গুরুত্ব সহকারে বলেন, যখন একথা সত্য যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে "ঈশ্বরের পুত্র" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে মসিহের ক্ষেত্রে; যাহার আগমনের কথা ছিল, কিন্তু এইরূপ কোন প্রমাণ নাই যে, উহা এযরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে।[৯]

অবশ্য ইহা সত্য যে, ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থে ইহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু পবিত্র কুরআন 'উযায়র সম্পর্কে ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থে কি রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করে নাই, উল্লেখ করিয়াছে সেকালে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী বিশ্বাস করিত যে, উযায়র ঈশ্বরের পুত্র; কুরআন তাহাদের কথাই বলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াত শুরুই হইয়াছে (وقالت اليهود) "আর ইয়াহূদীরা বলে" বলিয়া। তাফসীরকার আল-বায়দাবী, যাঁহার কথা ওয়াট তাহার পুস্তকে অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন[১০] এই আয়াত প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'যেহেতু উযায়রই ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্তমান রূপ দান করিয়াছিলেন, তাই অনেক ইয়াহূদী তাঁহাকে 'আল্লাহ্র পুত্র' মনে করিত, বিশেষত মদীনায় এইরূপ বিশ্বাসী একদল ইয়াহূদী বসবাস করিত। আল-বায়দাবী আরও উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য আয়াত যথারীতি মদীনায় পঠিত ও আবৃত্তি করা হইত, কিন্তু মদীনার কোন ইয়াহূদী ইহার প্রতিবাদ করে নাই।[১১] ইহাও লক্ষণীয় যে, এই আয়াত সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাই এই ব্যাপারে সেখানকার ইয়াহূদীদের নীরবতা যথেষ্ট তাৎপর্যবহ, বিশেষত যেহেতু তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোর সমালোচক ছিল।

শুধু আল-বায়দাবী নহেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণও উল্লেখ করেন যে, এই আয়াত ইয়াহূদীদের একটি গোষ্ঠীর মতের প্রকাশ ঘটায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আত-তাবারী বর্ণনাকারীদের নামোল্লেখসহ বেশ কয়েকটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিছেন, মদীনার নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা উযায়রকে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলিয়া বিশ্বাস করিত। এইসব

ইয়াহূদীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিল ফিনহাস, সাল্লাম ইব্ন মিশকাম, নুমান ইব্ন আওফা, শা'ছা ইবন কায়স এবং মালিক ইবনুস সায়ফ।[১২] আল-কুরতুবীও উল্লিখিত নামসমূহসহ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও যোগ করেন যে, আয়াতের ক্ষেত্রে ইয়াহূদী বলিতে বিশেষ একদল ইয়াহূদী বুঝানো হইয়াছে। ঠিক যেভাবে قَالَ لَهُمُ النَّاسُ "লোকেরা তাহাদিগকে বলিল" বলিতে পৃথিবীর সকল মানুষকে বুঝায় না, বরং বিশেষ একদল লোককে বুঝায়। তিনি আরও বলেন যে, উযায়র ('আ)-কে "আল্লাহ্র পুত্র" বলিয়া ইয়াহূদীদের যে গোষ্ঠী বিশ্বাস করিত তাঁহার (কুরতুবীর) সময় তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া গিয়াছিল।[১৩]

এইভাবে মারয়াম ('আ) বা উযায়র ('আ) কাহারও সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্যে কোন ভুল বা ত্রুটি নাই। ইহাও বলা যাইবে না যে, কুরআন শুধু জনপ্রিয় প্রচলিত ভুল ধারণাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে এবং এইভাবে অন্যায়ভাবে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়াছে। কেননা কুরআন এইসব বিশ্বাসকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া উল্লেখ করে এবং এইসব ভ্রান্তিতে বিশ্বাস করাকে ভুল বলিয়া নির্দেশ করে। সেইগুলি যদি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের আদি-অকৃত্রিম ধর্মের অংশ না হয় তাহা হইলে পবিত্র কুরআন কেবল সেই সত্যের প্রতি নির্দেশ করিয়াছে মাত্র।

পবিত্র কুরআনে কেবল সেই সকল ত্রুটি নির্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ইহা অন্যান্য ত্রুটিও নির্দেশ করিয়াছে। যেমনঃ (ক) মরয়াম সম্পর্কে ইয়াহূদীদের কুৎসা ও অবমাননাকর উক্তির বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআন দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার সতীত্ব ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ঘোষণা করিয়াছে; (খ) অন্যদিকে ট্রিনিটি তত্ত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সমঝোতা না করিয়া দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশিদার নাই। অনুরূপভাবে ঈশ্বরের পুত্র থাকা সম্পর্কে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ধারণা বিষয়ে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছে তাহার কোন পুত্র নাই এবং তিনি কাহারও পিতা নহেন; (গ) ঠিক তেমনিভাবে যীশুর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছে যে, তিনি ছিলেন মানুষ, কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। তদুপরি আরও বলা হইয়াছে যে, যাহারা তাহাকে ঈশ্বররূপে আরাধনা করে তাহারা কাফির-অবিশ্বাসী। সর্বাধিক মজার বিষয় এই যে, কোন প্রাচ্য বিশারদই এ পর্যন্ত বলেন নাই যে, তৎকালীন ইয়াহূদীদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র কুরআনের এই সকল উদ্ধৃতি 'অনুধাবনযোগ্য' ত্রুটি। কারণ এইগুলি 'নামমাত্র আরব খৃস্টানদের' বা 'মক্কার কিছু লোকের' বা 'মক্কাবাসীর' বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত সত্য এই যে, সেই সময়ে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এই প্রকার ধারণা ছিল এবং অনুরূপ আরও ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান ছিল যেগুলি পবিত্র কুরআন কখনও সমর্থন করে নাই।

এই দুই ধর্মের আধুনিক অনেক অনুসারী পুরাতন বিশ্বাসের অনেক কিছু পরিহার করিয়াছে, অনেক পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং এই নব পর্যায়ে পরিবর্তনের কারণে তাহাদের অনেকেই এই প্রস্তাব লইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন পবিত্র কুরআনে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কিছু কিছু বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে বরাত দেওয়া হইয়াছে তাহা ত্রুটি বলিয়া 'গণ্য করা' হয়, এমতাবস্থায় মহানবী ﷺ স্বয়ং বাইবেল পাঠ করেন নাই তবে সম্ভবত লোকমুখে ওই

সকল তথ্য শুনিয়াছেন বা সেইভাবেই জানিয়াছেন। মূল বিষয় হইতেছে, পবিত্র কুরআন ও মহানবী ﷺ তদানিন্তন ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কিছু বিশ্বাস ও আচারকে অবৈধ ও ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, এমনকি কোন বিষয়ে পবিত্র গ্রন্থে যাহাকে তাহাদের মতে অনুমোদন করিয়াছিল তাহাকেও। কেবল তাহাই নহে, পবিত্র কুরআন ইহাও বলে যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রাচীন গ্রন্থ যাহা বর্তমানে বিদ্যমান তাহাও মূল গ্রন্থের পরিবর্তিত সংস্কারণ যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করিয়াছে।[১৪] এমতাবস্থায় মহানবী ﷺ যে সূত্র হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই বাইবেল ব্যতীত অন্য কোন সূত্র, উহা অবশ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই বাইবেল নহে।

(গ) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে যীশুর জীবনাবসান বিষয়ে সাধারণ জনশ্রুতি বা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা বর্ণিত হয় নাই; বরং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলা হইয়াছে যে, সেই বিষয়ে সাধারণ জনশ্রুতি বা প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত। এই বিষয়ে যে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا .

“আর ‘আমরা আল্লাহ্র রাসূল মারয়াম তনয় ‘ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি’ তাহাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়ছিল। যাহারা তাহার সম্পর্কে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই” (৪ ঃ ১৫৭)।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে তাহাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হইয়াছে : উহাতে ইয়াহূদীগণ যাহা বলে সেই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, কারণ সমগ্র আয়াতটি ইয়াহূদীগণ সম্পর্কে। সেখানে স্পষ্টভাবে তাহাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, তাহারা যীশুকে হত্যা করিতে পারে নাই, বাস্তবে তাহারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধও করিতে পারে নাই। আরও বলা হইয়াছে যে, তাহারা যখন দাবি করিতেছিল যে, তাহারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছে তখন তাহারা নিজেরাও এই বিষয়ে সন্দিহান ছিল। যাহাকে তাহারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল তাহার পরিচয় সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত ছিল না এবং তাহাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল।[১৫] আয়াতে বলা হইয়াছে যে, সেই বিষয়টি দেখিতে যেন তাহা মনে হয় (شُبِّهَ لَهُمْ) তাহা করা হইয়াছিল, অর্থাৎ ইয়াহূদীগণের মনে হইয়াছিল যে,

তাহারা যীশুকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য তাহারা জানে না, তাহারা একটি ধাঁধার মধ্যে ছিল। অবশেষে বলা হইয়াছে, 'তাহারা যীশুকে অবশ্যই হত্যা করিতে পারে নাই'।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, প্রাথমিক যুগে খৃস্টানদের মধ্যে এইরূপ সম্প্রদায় ছিল যাহারা বিশ্বাস করিত না যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিলেন। যেমন বাসিলিবাসিগণ মনে করিত, যীশুর পরিবর্তে তাহার মত দেখিতে অপর এক ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল। ক্রুশে তাঁহার পরিবর্তে অন্য কাহারও হত্যার তত্ত্ব গসপেল অব সেন্ট বারনাবাস সমর্থন করে। ডায়ওকেটি অপর এক তত্ত্বের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে যীশুর কোন বাস্তব বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক শরীর ছিল না, তাঁহার ছিল বাহ্যিক বায়বীয় দেহ যাহা দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় না। ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইয়াছে তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল কিন্তু উহা সত্য নহে। অপর আর এক মতদৃষ্টে, মারসিওনাইট গসপেল মতে যীশুর জন্মই হয় নাই, তিনি কেবল মানুষের অবয়বে দেখা দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে না যে, পবিত্র কুরআন উল্লিখিত খৃস্টান সম্প্রদায়ের মতামত সমর্থন করে অর্থাৎ তাহারা যেভাবে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া মৃত্যু অস্বীকার করে পবিত্র কুরআন তাহা সমর্থন করে; কিন্তু তাহা নহে। কারণ পবিত্র কুরআন সেই সকল মতাদর্শের মূল কথা-যিশুর ঈশ্বরত্ব অথবা অলীক ছায়াশরীর স্বীকার করে না। বরং এই বিষয়ে সন্দেহ ও ভিন্নমত থাকার কারণে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইতিবাচকভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে ইয়াহূদীগণের দাবি (قَوْلِهِمْ) অস্বীকার করে যে, তাহারা যীশুকে হত্যা করিয়াছিল। তৎকালে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা পুনরুল্লেখ করা দূরের কথা, কুরআনের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয়ের বিরুদ্ধে। ইয়াহূদীদের দাবি ছিল যে, তাহারা যীশুকে হত্যা করিয়াছিল। অতএব তিনি পয়গাম্বর ছিলেন না, কারণ তাহার 'অভিশপ্ত মৃত্যু' হইয়াছিল; এই দাবি পবিত্র কুরআন অস্বীকার করে। অনুরূপভাবে খৃস্টানদের তত্ত্ব যীশুর ঈশ্বরত্ব ও সেই তত্ত্বের ভিত্তি 'রক্তের ঋণ' ধারণা এবং যীশুর প্রতিনিধিত্বমূলক প্রায়শ্চিত্ত, তাহাও পবিত্র কুরআন স্বীকার করে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে, 'তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই', এই বক্তব্য বাইবেলেও সমর্থিত হইয়াছে, যেমন (১) যে দিন যীশু ধৃত হন তাহার পূর্ব রাত্রিতে তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া অভিশপ্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন (মার্ক ১৪ ঃ ৩৬; মথি ২৬ ঃ ৩৯; লুক ২২-৪৪) এবং তাঁহার প্রার্থনা কবুল হইয়াছিল। ইহার অর্থ তিনি মরিতে চাহেন নাই এবং আল্লাহও তাঁহার অভিশপ্ত মৃত্যুর সুযোগ দেন নাই।

(২) গসপেলে কোথাও নাই, যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিল তাহার মৃত্যু কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছিল অথবা ক্রুশ হইতে যখন তাহাকে নামানো হইয়াছিল তখন তাহা কেহ দেখিয়াছিল।

(৩) পিলাত ছিলেন বিচারকের দায়িত্বে। মনে হয় তিন সমগ্র বিচারকার্য সম্পর্কে নিজেই সন্দিহান ছিলেন এবং সম্ভবত তিনি এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যেন যীশু পালাইয়া যাইতে

সক্ষম হন। শুক্রবারে বিচার কার্য হইয়াছিল। পিলাত ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত করিয়াছিলেন এবং এইভাবে সূর্যাস্তের মাত্র তিন ঘণ্টা পূর্বে রায় প্রদান করিয়াছিলেন যাহাতে যীশুকে দীর্ঘ সময় ক্রুশে থাকিতে না হয়। খুব বেশি হইলে মাত্র দুই ঘণ্টা থাকিতে হয়, কারণ সূর্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সাবাথ দিবস আরম্ভ হইবে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্রুশ হইতে নামাইয়া আনিতে হইবে। পিলাত আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে যীশুকে ক্রুশে আরোহণের পূর্বে কিছুটা সিরকা বা মদ্য পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি কম যন্ত্রণা অনুভব করে। ইহার ফলে যীশুকে তিন ঘণ্টার অধিক সময় ক্রুশে থাকিতে হয় নাই (মার্ক,১৫ ঃ ২৫; জন,১৯ ঃ ১৪)। সাধারণভাবে স্বাভাবিক সুস্থ শরীরের মানুষ এত অল্প সময় ক্রুশে থাকিলে মারা যায় না। লক্ষণীয় যে, যীশুর সহিত অপর দুই ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল; তাহাদিগকে ক্রুশ হইতে নামাইয়া আনার পর তাহারা জীবিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। পিলাত নিজেও বিশ্বাস করেন নাই যে, এত অল্প সময়ে যীশু মারা যাইবেন (মার্ক,১৫ ঃ ৪৪)।

(৪) ক্রুশ হইতে নামানোর পর অপর দুই ব্যক্তির পদযুগল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু যীশুর ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই বলিয়া বাইবেলে কথিত আছে (জন,১৯ ঃ ৩২, ৩৩)।

(৫) যীশুকে ক্রুশ হইতে অবতরণ করানোর পর তাহার শরীরের পার্শ্বদেশ ছিদ্র করিলে রক্ত নির্গত হইয়াছিল (জন ১৯ ঃ ৩৪)। ইহার অর্থ যীশু তখনও জীবিত ছিলেন।

(৬) আরিমাসিয়ার জোসেফ আবেদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পিলাত যীশুর 'দেহ' তাহার নিকট হস্তান্তর করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সে যীশুর দেহের প্রতি অপরিমিত যত্ন প্রদান করিয়া উহাকে পাহাড়ের পার্শ্বে নির্মিত বিশেষ সমাধি ভবনে রাখিয়াছিল (মার্ক,১৫ ঃ ৪৬)। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যীশুর শত্রুগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

(৭) তৃতীয় দিবসে দেখা গেল, সমাধির প্রবেশ প্রস্তর সরানো (মার্ক,১৫ ঃ ৪৬), যাহার অর্থ উহা পূর্বেই সরানো হইয়াছিল, সম্ভবত এই স্থলে রাখার প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে।

(৮) মেরী মাগদলিনি যখন ক্রুশের দিকে তাকাইলেন তখন তিনি দেখিলেন যীশু সেখানে নাই। তিনি দেখিলেন তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, প্রথমে ভাবিলেন, "বাগানের মালি দাঁড়াইয়া আছে", অতঃপর

(১৭) যীশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না, কারণ এখনও আমি আমার পিতার নিকট, তোমাদের পিতার নিকট; আমার আল্লাহ্‌র নিকট, তোমাদের আল্লাহ্‌র নিকট গমন করি নাই। (১৮) মেরী মাগদলিনি আসিয়া যীশুর শিষ্যদিগের নিকট বলিলেন যে, তিনি যীশুকে দেখিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে এই কথা বলিয়াছেন। (১৯) অতঃপর সেই দিন সন্ধ্যায়, সপ্তাহের প্রথম দিনের আরম্ভ, যখন দরজা বন্ধ ছিল, যেখানে শিষ্যগণ ইয়াহূদীগণের ভয়ে ভীত হইয়া সমবেত হইয়াছিল, যীশু আসিলেন এবং মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। (২০) এবং যখন তিনি এইরূপ বলিলেন, তিনি তাহাদিগকে

তাহার হস্তদ্বয় ও দেহের পার্শ্বদেশ প্রদর্শন করিলেন। তখন শিষ্যগণ তাহাদিগের প্রভুকে দেখিয়া আনন্দিত হইল" (জন,২০ ঃ ১৪-১৫, ১৭-২০)।

(৯) ইহা ছিল একই রক্ত-মাংসের শরীর যাহা ছিল যীশুর, তাঁহার ক্ষত এতই গভীর যাহাতে কোন মানুষের হাত প্রবিষ্ট হইতে পারে (জন,২০ ঃ ২৫-২৮)।

(১০) তাহাকে দেখা গিয়াছিল একই রক্তমাংসে। তখনও তিনি ক্ষুধা অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্যগণ যেরূপে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল তিনিও তদ্রূপ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

৩৬. "তাহারা পরস্পর এই সকল কথোপকথন করিতেছেন, ইতোমধ্যে তিনি আপনি অ৩৩৯হাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন ও তাহাদের বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ৩৭. ইহাতে তাহারা মহাভীত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া মনে করিলেন, আত্মা দেখিতেছি। ৩৮. তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হইতেছে? ৩৯. আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই। ৪০. ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। তখনও তাহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিতেছিল। ৪১. তাই তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? ৪২. তখন তাহারা তাহাকে একখানি ভাজা মাছ ও মৌচাকের টুকরা দিলেন। ৪৩. তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন" (লুক,৩৬-৪২)।

(১১) যীশু গ্যালিলির পথে যাত্রা করিলেন ও তথায় তাহার শিষ্যগণ তাহাকে দেখিল (মথি,২৮ ঃ ১০-১৭)।

বিভিন্ন গসপেলের এই সকল বক্তব্য পবিত্র কুরআনের এই ঘোষণাকেই নিশ্চিতভাবে সমর্থন করে যে, তাহারা যীশুকে অবশ্যই হত্যা করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে উপরোল্লিখিত গসপেলের বিভিন্ন বক্তব্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যীশু ক্রুশে মৃত্যুর হাত এড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার শত্রুদের নিকট হইতে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া কষ্টকর মৃত্যুবরণ করেন নাই। অস্ট্রেলিয়ান গবেষক বারবারা থিয়োরিং মরু সাগর লিপি (ডেড সি স্ক্রল) বিশ্লেষণ করিয়া যুক্তিযুক্তভাবে দেখাইয়াছেন যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মারা যান নাই।[১৬]

প্রায় সমসাময়িক দুইজন ইউরোপিয়ান পণ্ডিত হলগার কার্স্টেন এবং এলমার ই গ্রুবার অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তুরিন কাফনের কাহিনী রেডিও কার্বন পরীক্ষা পরিচালনা করেন[১৭] এবং ইহা প্রমাণ করেন যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করেন নাই।[১৮]

যীশুর পরিণাম সত্যই একটি কঠিন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন এবং সহজ-সরলভাবে ইহার পরিসমাপ্তি টানা যথাযথ হইবে না। অথচ মি. ওয়াট কুরআনের বক্তব্যকে বাজারের লোকশ্রুতি হইতে গৃহীত জনপ্রিয় ভ্রান্তি আখ্যায়িত করিয়া তাহাই করিতে চাহিয়াছেন।[১৯]

দুই ঃ বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তির অভিযোগ

ওয়াট একদিকে ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কিত ভ্রান্তির অজুহাত দিয়াছেন তেমনি তাহারই সংযোজন হিসাবে পরবর্তী কালে বলিতে চাহিয়াছেন যে, পবিত্র কুরআনে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে তৎকালীন ভ্রান্ত ধারণাসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, কুরআনে প্রথমে আরবদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাদিগের বিশ্বচিত্রের প্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে এবং তাহার ফলে বিশ্বচিত্র সম্পর্কে এমন কথা বলা হইয়াছে যাহা ভ্রান্ত ছিল। তাহার এই বক্তব্যের পক্ষে তিনি আটটি আয়াতের অনুবাদ তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহাতে দেখা যায় তৎকালে পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, উহা সমতল ভূমি এবং আসমান শক্ত বস্তু, 'ধরা যাইতে পারে উহা প্রস্তর', পবিত্র কুরআনে সেইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।[২০] ওয়াট স্বীকার করেন যে ,পৃথিবী বুঝাইতে এই সকল আয়াতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 'সমতল কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই'। কিন্তু তিনি বলেন, সকল শব্দই 'যাহারা শ্রবণ করিবে তাহারা তাহাদিগের নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী অর্থ করিবে যে, পৃথিবী সমতল'। কারণ 'কেহই জানিত না পৃথিবী তাহা নহে'।[২১] তিনি আরও প্রস্তাব করেন, সমকালীন ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করা একান্তই স্বাভাবিক। কারণ তাহার মতে, 'ইহা আল্লাহ্‌র কাজ নহে যে, তিনি এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করিয়া দিবেন', 'যেহেতু পবিত্র কুরআনের বাণী তাহাদের (আরবদের) বিশ্বাসকে সংশোধন না করিয়া তাহাদের নিকট পৌছানো যাইত'।[২২]

ওয়াট তাহার ধারণার স্বপক্ষে বা সমর্থনের জন্য যে সকল আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি বিচার-বিবেচনা করিবার পূর্বে তিনি বলিলেন, যেহেতু পবিত্র কুরআনের বাণী তাহাদের বিশ্বাসকে সংশোধন না করিয়া তাহাদের নিকট পৌছানো যাইত—এই শেষ বক্তব্যের মূল কথা কি তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই স্থলে ওয়াট আধুনিক খৃস্টানদের তাহাদের নিজেদের কিতাব সম্পর্কিত যে ধারণা তাহার প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন। এই মানকিসতার কারণ ঊনবিংশ শতক হইতে আধুনিক মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বাইবেলে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্রান্ত এইরূপ তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল ভ্রান্ত তথ্যের উপস্থিতির কারণে প্রথমে এমন ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী। ক্রমান্বয়ে অবশ্য নবী বা পয়গাম্বরের প্রেরিত আল্লাহ্‌র ওহী বা প্রত্যাদেশের ভাষা সম্পর্কিত যে ধারণা ছিল সেই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া তাহার স্থলে আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিত বাণীর ধারণা স্থান পাইতে লাগিল। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বা অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যাদেশ লিখিয়া লইয়াছিল। ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, বাইবেলের লেখকগণ হয়তো তৎকালীন ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সে কালের ভাষার কারণে বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্রান্ত তথ্য প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা তাহারা অস্বীকার করেন নাই।[২৩] একজন প্রখ্যাত খৃস্টান পণ্ডিত বলেন, "বাইবেলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিগুলি মানুষের ভুল। কারণ দীর্ঘকাল পূর্বে মানুষ শিশুর মত সরল ছিল এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না"।[২৪]

অবশ্য আধুনিক মুসলমানের সেই প্রকার ধারণা করিয়া শান্তিলাভের প্রয়োজন নাই। কারণ পবিত্র কুরআনের কোন বক্তব্যের সহিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধ নাই, তাহাই এই স্থলে দেখানো হইবে। ওয়াট তাহার বক্তব্যের পক্ষে কুরআনের যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা সঠিক নহে। অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি তাহার ধারণাকে উপস্থাপন করিতে গিয়া এই বিষয়ে যে[২৫] কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রহিয়াছে তাহা তো বিবেচনায় আনেনই নাই, এমনকি ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহুল পরিচিত গ্রন্থ মরিস বুকাইলির "বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান" গ্রন্থটিও বিবেচনায় আনয়ন করেন নাই। এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হইয়া দশ বৎসরের মধ্যে ১২টি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে[২৬] ঃ ইংরেজিসহ তিনটি ইউরোপীয় ভাষায় এবং সাতটি এশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ ওয়াট তাহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই সকল প্রকাশনার পরে।

(ক) পৃথিবীর আকৃতি

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওয়াট তাহার অনুমান বা ধারণার সমর্থনে যে সকল আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে স্বীকার করিয়াছেন যে, পৃথিবী বুঝাইতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 'সমতল' কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তিনি বলেন, যাহারা শ্রবণ করিবে তাহারা তাহাদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী অর্থ করিবে যে, 'পৃথিবী সমতল'।

ইহা পক্ষান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া যে, আলোচ্য আয়াতসমূহে বস্তুগত প্রকাশ দ্বারা সেই অর্থই ধরা যাইতে পারে যিনি যে ধারণা লইয়া পাঠ করিবেন অর্থাৎ পূর্ব ধারণা লইয়া পাঠ করিলে উহার অর্থ তাহাই মনে হইবে। ইহার অর্থ তাহারা জানিত পৃথিবী সমতল, ফলে তাহাদিগের নিকট সেই সকল শব্দের অর্থ সমতল মনে হইবে। অপরপক্ষে যদি পূর্বধারণা ব্যতীত অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে ওয়াটের কথামত মনে হইবে সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষিতে 'সমতল কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই'। কারণ 'কেহই জানিত না পৃথিবী তাহা নহে'। অন্যদিকে ওয়াট সাহেবের মূল বক্তব্যের যুক্তিযুক্ত অনুসিদ্ধান্ত যে, আধুনিক মানুষ যদি তাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া আয়াতগুলি পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি উহাকে বিজ্ঞানসম্মত না বলিয়া পারিবেন না। যদি তাহাই হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হওয়া উচিত, তাহা হইলে দেখা যাইবে পৃথিবী নহে, বরং অন্যান্য বিষয়েও ওয়াট কর্তৃক উদ্ধৃত আয়াতগুলি অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য সমর্থিত।

পবিত্র কুরআনে 'আরদ' শব্দটি ৪৬১ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অধিকাংশ ব্যবহার সমগ্র মহাবিশ্বের উপর আল্লাহ তাআলার চরম ক্ষমতার বিবরণ সংক্রান্ত এবং তাঁহার সৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত। কোন কোন স্থলে এই শব্দটি স্পষ্টই ব্যবহৃত হইয়াছে দেশ অথবা এলাকা[২৭] বুঝাইতে, আবার অন্যত্র উপমা হিসাবে পার্থিব জীবন বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।[২৮] যে সকল আয়াতে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণনা করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে মিশ্রিত হইয়া অথবা পর্বত ও নদীর সহিত তুলনা করিতে গিয়া। এই স্থলে পৃথিবী

মানুষের জন্য ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য কিরূপ উপযুক্ত ও বাসযোগ্য তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এখানে 'শ্রোতা অথবা পাঠক'-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে তাহার প্রতি এবং প্রকৃতির সেই সকল বস্তুর প্রতি এবং ভূতলের প্রতি যাহা তাহার সম্মুখে দৃশ্যমান। অন্যভাবে যদি বলা যায় যে, এই আয়াতে 'আরদ' বা পৃথিবী বলিতে বুঝানো হইয়াছে ভূমি বা ভূপৃষ্ঠ যাহা দর্শকের সম্মুখে রহিয়াছে পর্বত ও নদীর বিপরীত, সমগ্র পৃথিবী নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াতে আরদ বা পৃথিবী শব্দটি সাধারণভাবে সূর্য, চন্দ্র, আকাশ এবং সমগ্র মহাবিশ্বের প্রেক্ষিতে রহিয়াছে। এখানে পৃথিবীকে একটি একক হিসাবে বলা হইয়াছে এবং বর্ণনায় ইহার আকৃতি সম্পর্কে, অবস্থান সম্পর্কে, এমনকি মহাশূন্যে ইহার চলাচল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনে 'আরদ' শব্দটি যে প্রকারে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই প্রেক্ষিতে ওয়াট সাহেব বিষয়টি যে প্রকারে বিবেচনা করিয়াছেন তাহা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। তিনটি প্রধান বিষয়ে এই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমত, তিনি প্রথম শ্রেণীর আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন এবং 'আরদ' শব্দকে একক পৃথিবী হিসেবে বিবেচনা করিয়াছেন। অথচ এই স্থলে আরদের প্রকৃত অর্থ হইবে সম্মুখস্থ ভূমি, প্রান্তর বা মাটি।

দ্বিতীয়ত, এই আয়াতগুলির বর্ণনামূলক অভিব্যক্তির মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ও ব্যাপক অর্থ রহিয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া তিনি একই প্রকার অর্থ চাপাইয়া দিয়াছেন। কারণ তিনি মনে করেন, পবিত্র কুরআনের 'প্রথম পর্যায়ের শ্রোতা' ভাবিতেই পারিত না যে, পৃথিবী সমতল ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে। যদি তিনি সত্যই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে আয়াতগুলির প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। ওয়াট তাহা তো করেনই নাই, এমনকি একটি আয়াতের সামগ্রিক অর্থ বিবেচনা না করিয়া, আসল অংশের অনুবাদ না করিয়া চরম অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অর্থকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, সবশেষে যাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াতগুলি মোটেই বিবেচনা করেন নাই। অথচ সেখানেই পৃথিবীকে একটি একক ধরিয়া উহার আকার ও অবস্থান বলা হইয়াছে। অবশ্য মহাশূন্যে অন্যান্য গ্রহ- নক্ষত্রের কথাও বলা হইয়াছে। তাহাতে এমন কিছু বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক তথ্য রহিয়াছে যাহা সে যুগের মানুষের জানা ছিল না।

অধিকাংশ আয়াতে যে 'আরদ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ দর্শকের দৃষ্টির ভিতরে যে ভূপৃষ্ঠ তাহা, পৃথিবী নামক গ্রহ নহে। ওয়াট যে আয়াত দুইটি ৮৮ ঃ ১৯-২০ ও ৭৮ ঃ ৬-৭ উল্লেখ করিয়াছেন উহাতে ইহা সুস্পষ্ট। আয়াত দুইটি এইরূপ ঃ

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

"এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে" (৮৮ ঃ ১৯-২০)?

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا.وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا .

"আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক" (৭৮ ঃ ৬-৭)?

এখানে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, 'আরদ' বলিতে সম্মুখস্থ সমতল ভূভাগ বোঝান হইয়াছে যাহার বিপরীতে রহিয়াছে 'পর্বত'। যদি আরদ বলিতে পৃথিবী নামক গ্রহ বুঝাইত তাহা হইলে 'পর্বত' শব্দ সামঞ্জস্যহীন ও অতিরিক্ত হইয়া যাইত।

উদ্ধৃত আয়াতে আরদ শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত যে বাস্তবিক শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। সেইগুলি ওয়াটের ইংরেজি অনুবাদসহ দেওয়া গেল ঃ

৭৯ ঃ ৩০ দাহাহা... spread out	وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا
৮৮ ঃ ২০ সুতিহাত... spread out	وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
৭৮ ঃ ৬ মিহাদা...make an expanse	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا
৫১ ঃ ৪৮ ফারাশনাহা... laid flat	وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا
৭১ ঃ ১৯ বিসাতা... Made an expanse	وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا
২০ ঃ ৫৩ মাহাদা... made bed	جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا
১৩ ঃ ৩ মাদ্দা ... spread out	وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ
২ ঃ ২২ ফিরাশা...made a carpet	اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا

এই কথা না বলিলেও চলে যে, প্রতিটি অভিব্যক্তি যেমন দাহাহা, সুতিহাত ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থ বহন করে। ওয়াট সাহেব এই কথা নিজেই সকল আয়াত প্রসঙ্গে সাধারণভাবে স্বীকার করিয়াছেন; এমনকি তাহার রচনার প্রারম্ভেই অন্যান্য আয়াত উদ্ধৃতির প্রসঙ্গেও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আলোচ্য বিষয়ের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত'।[২৯]

এখন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সিরিজের প্রথম শব্দ বা অভিব্যক্তি দাহাহা; এই অভিব্যক্তিটি অন্যান্যগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। ইহার রুট (ধাতুমূল) ধরিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। ওয়াট সাহেব অন্যান্য অনেক অনুবাদ অনুসরণ করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন SPREAD OUT কিন্তু ধাতুমূল বিবেচনা করিয়া অর্থ করিলে ইহার অর্থ হইবে 'ডিম্বাকৃতি' যাহা দ্বারা পৃথিবী যে গোলাকার তাহার প্রমাণ পবিত্র কুরআন হইতেই পাওয়া যায়। দাহাহা শব্দের বিশেষ্য হইতেছে 'দাহিয়াহা' যাহা অদ্যাবধি আরবগণ ডিম অর্থে ব্যবহার করে।[৩০]

দ্বিতীয় শব্দ বা অভিব্যক্তি হইতেছে সুতিহাত; ইহাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দটির উৎপত্তি হইতেছে সাত্‌হ (سطح) ধাতু হইতে, যাহার অর্থ হইতেছে উপরিভাগ, আবরণ, খোসা,

ঢাকনা ইত্যাদি। যেমন সাতহুল বাহ্‌র অর্থ সমুদ্র-পৃষ্ঠ, সাতহ্‌ মাইল অর্থ ঢাল, সাতহী অর্থ বহির্ভাগ। ধাতুমূলের অর্থ বিবেচনা করিলে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর বায়বীয় বাষ্প ও গলিত লাভায় পরিপূর্ণ এই আধুনিক জ্ঞান লইয়া যদি পবিত্র কুরআনের ৮৮ ঃ ২০ আয়াত পাঠ করা যায় তাহা হইলে উহার অর্থ মনে হইবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ডিমের খোশার মত এবং উহা সমতল। প্রকৃতই সুতিহাত শব্দ দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে যথাযথরূপে বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পূর্ববর্তী আয়াতে (৮৮ ঃ ১৯) যখন পর্বত কিভাবে রাখা হইয়াছে তাহা বলা হইয়াছে তাহার পর সুতিহাত ব্যবহার সঠিক হইয়াছে। পবিত্র কুরআনের ৮০ ঃ ২০ আয়াত যদি "(Do they not look) to the earh how it has been surfaced and planed." এইভাবে অনুবাদ করা হয় (তাহারা কি দেখে না) ভূতলের দিকে কিভাবে উহাকে সমতল করা হইয়াছে? তাহা হইলে উহা হইত যথোপযুক্ত।

এই সিরিজের তৃতীয় শব্দ মিহাদ, ইহার সহিত সিরিজের ষষ্ঠ শব্দ মাহ্‌দ (২০ ঃ ৫৩) বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ উভয় শব্দই এক মূল হইতে উৎপন্ন। প্রথমটির অর্থ বিশ্রাম-স্থল, আশ্রয়, দোলনা, বক্ষস্থল এবং আকৃতিগতভাবে কোল (যাহার মধ্যে কিছু স্থাপন করা যায়)। এ. জে. আরবেরি ৭৮ ঃ ৬ আয়াত যথাযথভাবেই অনুবাদ করিয়াছেন "Have we not made the earth as a cradle."[৩১] প্রকৃতপক্ষে এই মিহাদ শব্দটি পবিত্র কুরআনের আরও ছয়টি স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে[৩২] এবং প্রতিটি স্থলে এইভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহার অর্থ বাসস্থান, আবাসস্থল, বিশ্রামাগার ইত্যাদি। যাহা হউক, আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি আছে তাহা জানি অথবা না জানি, আলোচ্য অভিব্যক্তির অনুবাদ যদি করা হয় made an expanse, তাহা হইলে উহা হইবে মূল হইতে বহু দূরের এবং এই প্রসঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন।

অনুরূপভাবে মাহ্‌দ অর্থ বিছানা বা দোলনা। ইহাও পবিত্র কুরআনে চার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; একবার হইয়াছে আরদ প্রসঙ্গে (৪৩ ঃ ১০) এবং তিনবার ঈসা ('আ) যখন দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে।[৩৩] এইবারও এ.জে. আরবেরি ৪৩ ঃ ১০ ও ২০ ঃ ৫৩ আয়াতের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শব্দটির অনুবাদ করিয়াছেন দোলনা বলিয়া। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুইটি স্থলেই একই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন—He who appointed the earth to be a cradle for you.'[৩৪] কিন্তু ওয়াট সাহেব সেই কথাই ভিন্নভাবে অনুবাদ করিয়াছেন ৭৮ ঃ ৬ আয়াতের ক্ষেত্রে make an expanse এবং ২০ ঃ ৫৩ আয়াতের ক্ষেত্রে made a bed.

অনুরূপভাবে সিরিজের চতুর্থ ও অষ্টম শব্দ ফারাশনাহা (فَرَشْنٰهَا) ও ফিরাশা (فِرَاشًا) তিনি সামঞ্জস্যহীনভাবে অনুবাদ করিয়াছেন। ফারাশা শব্দের প্রাথমিক অর্থ বিছাইয়া দেওয়া, বিছানা বিছাইয়া দেওয়া, আস্তরণ দেওয়া, আবৃত করা ইত্যাদি। অপরপক্ষে ফিরাশ অর্থ বিছানা, শয্যা, চাদর, কার্পেট ইত্যাদি। যাহা হউক ওয়াট সাহেব এই সর্বশেষ অভিব্যক্তির অর্থ করিয়াছেন

২ ঃ ২২ আয়াতে made a bed বিছানা তৈরি করিয়াছেন, ৫১ ঃ ৪৮ আয়াতে অনুবাদ করিয়াছেন laid flat সমতল করিয়াছেন, অনেক টানা-হেঁচড়া করিয়াও যদি করা হইত spread out as a bed অথবা laid out as a bed, তাহা হইলে কিছুটা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া করিয়াছেন laid flat।

অতঃপর এই সিরিজে অবশিষ্ট রহিয়াছে আর দুইটি শব্দ বিসাত (بساط) ও মাদ্দা (مَدَّ) যথাক্রমে সিরিজের পঞ্চম ও সপ্তম শব্দ। বিসাতের উপযুক্ত অর্থ বিছাইয়া দেওয়া; এ.জে. আরবেরি তাহাই করিয়াছেন। তিনি ৭১ ঃ ১৯ সমগ্র আয়াতটির অনুবাদ করিয়াছেন And God has laid the earth for you as a carpet.[৩৫] ওয়াট অবশ্য এই স্থলে অনুবাদ করিয়াছেন made an expanse। অপরদিকে মাদ্দা কথার প্রাথমিক অর্থ he expanded প্রসারিত অথবা বিস্তার করা। ইহার অর্থ আরও হইতে পারে। তিনি বিস্তারিত করিয়াছেন, ওয়াট এমনই করিয়াছিলেন। পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি আরও কয়েক স্থলে বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৮৪ ঃ ৩-৪ আয়াতে অভিব্যক্তিটির কর্মবাচ্যমূলক রূপ হইতেছে 'মুদ্দাত'; ইহার স্পষ্ট অর্থ দাঁড়াইতেছে 'চেপ্টা হইয়া যাওয়া'।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ . وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ .

"এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে" (বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)।

ইহা সেই সময়ের বিবরণ যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে এবং পৃথিবী শেষ পর্যায়ে আসিবে। অতএব 'মুদ্দাত' শব্দটি এই স্থলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অন্যত্র হইতে পারে না। পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থায় এই শব্দটি অথবা ইহা হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে সেই সময় তাহা করে না। এমতাবস্থায় অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ বহন করিবে ইহাই স্বাভাবিক। বিপরীত উপাত্ত হিসাবে বলা যায়, এই আয়াতটি পৃথিবীর সমাপ্তিকালের পূর্ব-মুহূর্তে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করিতেছে যে, পৃথিবী সামগ্রিকভাবে সমতল নহে।

উল্লিখিত শব্দগুলির বিভিন্ন অভিব্যক্তি থাকিলেও সেইগুলি বিবেচনায় না আনিলেও এবং তিনি spread out অর্থ ধরিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিলেও উদ্ধৃত আটটি পরিভাষার কোন একটিও বলে না যে, পৃথিবী নামক গ্রহ সমতল। কারণ আয়াতগুলি সম্মুখে যে ভূভাগ দৃষ্টিগোচর হয় তাহার কথাই বলিতেছে। তদুপরি শব্দটির ভাবার্থ সমান করা বা সমতল তাহা হইলেও ইহা দ্বারা পৃথিবী যে গোলাকার তাহা অস্বীকার করে না। জ্যামিতিক ও গাণিতিক সংজ্ঞায় সমান বা সমতল বলিতে বুঝায় সরল রেখা ইহার সকল বিন্দু স্পর্শ করে।[৩৬] অতএব পৃথিবী গোলাকার হইলেও ইহার যে কোন স্থান কমবেশি সমান বা সমতল। আট শত বছর পূর্বে ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিজরী/১১৫০-১২১০ খৃ.) দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। সেই কারণে তিনি মাদ্দা শব্দের অভিব্যক্তি যে তুলনামূলকভাবে আপেক্ষিক সে

বিষয়ে বক্তব্য রাখিয়াছেন। ১৩ ঃ ৩ ও ১৫ ঃ ১৯ আয়াতে মাদ্দা শব্দের অভিব্যক্তি সম্পর্কে তিনি দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিষয় উত্থাপন করা। সেই কারণে এইরূপ বস্তুকে বরাত দেওয়া যাহা দেখা যায়, অনুভব করা যায়।[৩৭] দ্বিতীয়ত, তিনি পৃথিবী সম্পর্কে বলেন, 'ইহা একটি বিশাল গোলক বা বল ঃ বিশাল গোলকের অংশও বিশাল, যখন ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় উহাকে সমতলই মনে হয়। এইরূপ ঘটনার প্রেক্ষিতে তাহারা যে সমস্যার কথা উত্থাপন করিতেছেন তাহার অস্তিত্বই থাকে না। এই ব্যাখ্যার প্রমাণ আল্লাহ্‌রই কথা ঃ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا "আমরা পর্বতকে কীলকরূপে স্থাপন করিয়াছি"। তিনি ইহাকে গোঁজ বা কীলক আখ্যা দিয়াছেন যদিও প্রকৃত সত্য হইতেছে তাহার উপরিভাগে অনেক সমতল ভূমি রহিয়াছে। এখানেও ঘটনা ইহাই।[৩৮]

সপ্তম শতাব্দীর আরবে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে পুনরুল্লেখ করা দূরে থাক, পবিত্র কুরআনে তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য তুলিয়া ধরিয়াছে যাহার সত্যতা কেবল সাম্প্রতিক কালে মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ওয়াট সাহেব যদি আরও একটু যত্নবান হইতেন এবং যত্ন সহকারে বিচার-বিবেচনা করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, তিনি যে সকল আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের কমপক্ষে তিনটি আয়াতে পৃথিবীর আকৃতিগত বিষয়ে এইরূপ অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে যাহা কাহারও পক্ষে তখন কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অনুবাদের মাধ্যমে যখন এই আয়াতগুলি উল্লেখ করেন তখন তিনটির যে দুইটির মধ্যে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বৈজ্ঞানিক তথ্য রহিয়াছে সেই অংশটি তিনি বাদ দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একটি আয়াত হইতেছে ১৩ ঃ ৩।

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهَارًا وَّمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يَغْشَى الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য" (১৩ ঃ ৩)।

এই আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কথা রহিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে, 'প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়'। এই কথার বা বাক্যের অর্থ সাম্প্রতিক কালেই বোধগম্য হইয়াছে যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, উদ্ভিদ ও ফলের মধ্যে পুং ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে। প্রকৃতই সকলের মধ্যেই আছে জোড়া।[৩৯] প্রকৃতই এই বক্তব্য দীর্ঘকাল যাবত এইভাবেই অনূদিত হইয়া আসিয়াছে।[৪০] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খৃস্টীয় সপ্তম শতকে এই বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে, উদ্ভিদ, ফল-ফলাদি ও অন্যান্যের জোড়া বা লিঙ্গভেদ থাকিতে পারে। এই

বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র কুরআন আলোচ্য বাক্যের দ্বারা কি বলিতে চাহিতেছিল তাহা কেহই অনুধাবন করিতে পারে নাই।

১৩ ঃ ৩ আয়াতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, 'তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন'। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই বক্তব্যের অর্থ রাত্রি ধীরে ধীরে দিবসের স্থান গ্রহণ করে—ইহা এমন একটি ঘটনা যাহা পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি ও ঘূর্ণায়মান অবস্থা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।[৪১] কারণ পৃথিবীকে যদি সমতল বলা হইত তাহা হইলে রাত্রি ও দিন পর্যায়ক্রমে আসে সেই অর্থে বলা হইত; বলা হইত না, 'দিবসকে রাত্রি আচ্ছাদিত করে'। এ.জে. আরবেরি যথার্থই অনুবাদ করিয়াছেন।[৪২]

দ্বিতীয় আয়াত হইতেছে ২০ ঃ ৫৩

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى .

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদের চলিবার পথ। তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি" (২০ ঃ ৫৩)।

এই স্থলে উদ্ভিদের লিঙ্গ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সত্য অধিকতর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা ১৩ ঃ ৩ আয়াতের সম্পূরক তথ্য হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার তৃতীয় অংশ ৫১ ঃ ৪৭-৪৮; ইহাতে বলা হইয়াছে ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ . وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ .

"আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী। আর ভূমি, আমি উহাকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী" (৫১ ঃ ৪৭-৪৮)।

এই স্থলে অভিব্যক্তিটি হইতেছে وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ 'নিশ্চয় আমরা সম্প্রসারণকারী'। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াট সাহেব এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন "ইহা আমরাই, যাহারা ইহাকে বিশাল ব্যপ্ত করে"।[৪৩] কিন্তু লক্ষণীয় যে, বাক্যের গঠনটি কর্তৃবাচক অথচ পূর্ববর্তী বাক্যাংশ ক্রিয়াবাচক এবং তাহাও অতীত কাল। সকলেই জানেন যে, আরবী বাক্য গঠনের রীতি অনুসারে কর্তৃবাচকের (اسمیه) সহিত যদি লাম (ل) অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহা গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা চলমান বা ঘটমান অর্থবোধক হয়। এমতাবস্থায় ইহার অর্থ হইবে 'নিশ্চয়ই আমরা সম্প্রসারণকারী অথবা সম্প্রসারিত করি অথবা আমরা সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত'। এ.জে. আরবেরি যথার্থই অনুবাদ করিয়াছেন, 'আমরা ইহাকে সম্প্রসারিত করি'।[৪৪]

আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী আমরা জানিতে পারিতেছি যে, মহাবিশ্ব এক হতবুদ্ধিকর গতিতে সম্প্রসারিত হইতেছে। এই তথ্যের প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাতে বলা হইতেছে যে, মহাশূন্যে যাহা কিছু আছে—গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্যসহ ছায়াপথ ও অন্যান্য যাহা কিছু সবকিছু অকল্পনীয় গতিতে ছুটিয়া চলিতেছে। সূর্য উহার গ্রহ-উপগ্রহসহ প্রায় দৈনিক দশ লক্ষ মাইল বেগে নক্ষত্রপুঞ্জ লিরার দিকে ছুটিয়া চলিতেছে, স্বয়ং লিরা অনুরূপ বেগে অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। এই প্রকারে আসমান (اَلسَّمَاءُ) অর্থাৎ মহাশূন্য ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হইতেছে। আধুনিক জ্ঞানের প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য, 'আমরা সৃষ্টি করিয়াছি আসমান এবং নিশ্চয়ই উহাকে সম্প্রসারিত করি' সত্যই অভাবিতভাবে চমকপ্রদ ও আশ্চর্যজনকভাবে নির্ভুল।

ওয়াট সাহেব যে আটটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনটি দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পবিত্র কুরআনে বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্রান্ত তথ্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেইগুলি তিনি যাহা অনুমান করিয়াছেন সেই অনুমানের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করে। প্রকৃত সত্য এই যে, (ক) আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতির (دَحٰهَا) করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন (৭৯ ঃ ৩০) এবং তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন (১৩ ঃ ৩)। এই বক্তব্য দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। (খ) অন্যান্য বস্তু ছাড়াও উদ্ভিদ ও ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায় (১৩ ঃ ৩) এবং (গ) আকাশ ক্রমাগত সম্প্রসারিত হইতেছে (৫১ ঃ ৪৭)। এইগুলি তো আছেই, তদুপরি পবিত্র কুরআনের আরও অনেক আয়াতে বৈজ্ঞানিক সত্য তথ্য রহিয়াছে, যেমন মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য।[৪৫] সংক্ষেপেও সেই সকল বিষয় এই স্থলে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। পৃথিবীর আকৃতি কী প্রকারের সেই প্রশ্নে পবিত্র কুরআনে কি বলা হইয়াছে তাহার কিছু উল্লেখ করা হইল।

এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হইতেছে ৯১ ঃ ৬। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, পৃথিবীকে নিক্ষেপ করা হইল (উহার কক্ষপথে) একটি বলের ন্যায়। বাক্যটি এইরূপ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا "শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহার"। লক্ষ্য করার বিষয় যে, 'দাহাহা' শব্দটির ন্যায় পূর্ববর্তী অনেক পণ্ডিত 'তাহাহা' শব্দটির অর্থ করিয়াছেন 'বিস্তৃত করা', প্রসারিত করা' ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয়, আল-কুরতুবী ও আশ-শাওকানী পূর্ববর্তী তাফসীরকারগণের তাফসীর দেখিয়া বলিয়াছেন যে, আরবগণ এই শব্দটি দ্বারা বুঝিতে পারে কোন কিছুর চলিয়া যাওয়া বা দূরে সরিয়া যাওয়া।[৪৬] ইহার অর্থ আরও ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করিয়াছেন তাজুল আরূসের রচয়িতা। তিনি পূর্ববর্তী তাফসীরকারগণ এই শব্দটির যে অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে. শব্দটির প্রকৃত অর্থ কোন কিছু 'নিক্ষেপ করা' (وَطَحًا بِالْكُرَةِ رَمٰى بِهَا), যেমন বল নিক্ষেপ করা।[৪৭] এই অভিব্যক্তি উপরে বর্ণিত 'দাহাহা' শব্দের অর্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয়ই পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির প্রতি এবং

শূন্যে ঘূর্ণায়মান অবস্থা নির্দেশ করে। আরও একটু অগ্রসর হইলে আমরা লক্ষ করি যে, ৯১ ঃ ৬ আয়াতের ঠিক পূর্বেই ৯১ ঃ ৩-৪ আয়াত রহিয়াছে, সেখানে যেভাবে সংক্ষেপে শব্দগুলি অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যের সহিত দিন ও রাত্রির গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে। বলা হইতেছে وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا . وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا "দিনের শপথ! যখন উহা সূর্যকে প্রকাশিত করে এবং রাত্রির শপথ! যখন সে উহা আচ্ছাদিত করে"।

এই দুই বাক্য স্পষ্ট করিয়া দেয় যে, দিন ও রাত্রির কার্য দ্বারাই সূর্য প্রকাশিত ও লুক্কায়িত হয়, সূর্যের কোনরূপ চলাচলের দ্বারা দিন ও রাত্রি সংঘটিত হয় না।

বাক্যটির অভিব্যক্তি সূক্ষ্মভাবে নির্ভুল হয় যদি ৯১ ঃ ১ আয়াতের প্রতি নজর দেওয়া যায়, সেখানে সূর্যের কথা আছে। সেখানে কেবল বলা হইয়াছে ঃ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا "শপথ সূর্যের এবং ইহার কিরণের"। কোন কর্ম বা ক্রিয়াপদ এখানে নাই। এই সূক্ষ্মভাবে নির্ভুল প্রয়োগ করা শব্দের প্রতি যদি একটু দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা স্পষ্টভাবে পৃথিবীর গোলাকৃতি ও ঘূর্ণন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সত্য তুলিয়া ধরে।

পৃথিবীকে 'ছুড়িয়া' ফেলা (তাহাহা) কথাটির গুরুত্ব আরও স্পষ্টভাবে অর্থবহ হয় যখন ইহাকে কুরআনের অপর একটি বাক্যের সহিত সম্পর্কিত করিয়া বিবেচনা করা যায়, যেখানে পৃথিবীর জন্ম এবং প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে বর্ণনা আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'প্রথমে আসমান ও যমীন একত্র ছিল, পরবর্তী কালে তাহাদিগেকে পৃথক করা হয় এবং পৃথিবীর সকল প্রাণী পানি হইতে উৎপন্ন হয়'। বাক্যটি নিম্নরূপ ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۗءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ .

"যাহারা কুফরী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে। তবুও কি উহারা ঈমান আনিবে না" (২১ ঃ ৩০)?

আধুনিক কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যখন আমরা জানিতে পারিতেছি যে, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি কি প্রকারে হইয়াছে তখনই কেবল পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইতেছে। পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াত সরাসরি পৃথিবীর সহিত সম্পর্কিত। উহা ১৩ ঃ ৪১ আয়াত। সেখানে বলা হইতেছে যে, পৃথিবী ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হইতেছে, ইহা আধুনিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا .

"উহারা কি দেখে না যে, আমি উহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি" (১৩ ঃ ৪১)?

পবিত্র কুরআনে আরও কয়েকটি আয়াতে দিন ও রাত্রি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, দিন প্রবেশ করে রাত্রির মধ্যে এবং রাত্রি প্রবেশ করে দিনের মধ্যে। এইরূপ আয়াতগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

(ক) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ

"তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর" (৩ ঃ ২৭)।

(খ) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ

"উহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে" (২২ ঃ ৬১)।

(গ) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ

"তুমি কি দেখ না আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন" (৩১ ঃ ২৯)?

(ঘ) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ

"তিনি রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে পরিণত করেন রাত্রিতে" (৩৫ ঃ ১৩ ও ৫৭ ঃ ৬)।

(ঙ) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ

"উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি" (৩৬ ঃ ৩৭)।

পবিত্র কুরঅনে বারংবার এইরূপ বলা হইতেছে যে, ক্রমান্বয়ে দিন ও রাত্রি একে অপরের মধ্যে মিশিয়া যায়, কেহই হঠাৎ করিয়া আবির্ভূত হয় না। পৃথিবী যদি সমতল হইত তাহা হইলে উহা ক্রমান্বয়ে হইত না; হঠাৎ আলোকিত হইত অথবা হঠাৎ অন্ধকার হইত। ইহা দ্বারা নির্দেশ করা বা ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, পৃথিবী গোলাকার।

৩৯ ঃ ৫ আয়াতটি আরও স্পষ্ট

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ .

"তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা"।

এই স্থলে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে কাওয়ারা শব্দটির উপর। কারণ এই শব্দের অর্থ বল গড়াইয়া যাওয়া বা বৃত্ত করা। অন্যভাবে বলা যায়, এই আয়াতের অর্থ রাত্রি ও দিন পৃথিবীকে ঘিরিয়া এক চলমান প্রক্রিয়া।

(খ) আকাশ

পবিত্র কুরআন কেবল পৃথিবী ও উহাতে আল্লাহ্র ইচ্ছায় যাহা উৎপন্ন হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই; বরং দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে আকাশের প্রতি, মহাবিশ্বের প্রতি—যাহাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি এবং তাহা করিতে গিয়া এইরূপ বক্তব্য রাখা হইয়াছে যাহার অর্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত হইতেছে। পৃথিবী সম্পর্কে বলিতে গিয়া ওয়াট সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন তেমনি আকাশ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্যকে তিনি সেকালের ভ্রান্ত ধারণার পুনরুল্লেখ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন যে, আকাশ এইরূপ কঠিন কোন বস্তু দ্বারা নির্মিত; 'সম্ভবত প্রস্তর'।[৪৮] তিনি তাহার অনুমানের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের যে আটটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার তিনটি আয়াতকে নিজের মনের মত অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, পবিত্র কুরআনে বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি রহিয়াছে। নিম্নে সেই আয়াত তিনটি ও তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা দেওয়া গেল ঃ

(ক) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا . رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا .

"Are you harder to create or the heaven he built? He raised up its roof and ordered it".

"তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ইহার ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন" (৭৯ ঃ ২৭-২৮)।

(খ) اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ .

"Will they not regard the camels, how they are formed? And the heaven how it is raised"?

"তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে" (৮৮ ঃ ১৭-১৮)।

(গ) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ .

"The heaven we have built with hands, and it is we who make it of vast extent".

"আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী" (৫১ ঃ ৪৭)।

(ঘ) اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً .

"(your Lord) made for you the earth a carpet and the heaven an edifice..."

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করিয়াছেন" (২ : ২২)।

উপরিউক্ত (ক), (গ) ও (ঘ) আয়াত তিনটিতে যথাক্রমে তিনটি শব্দ রহিয়াছে : بَنٰهَا/بَنَيْنٰهَا وَبِنَاءً - বানাহা, বানায়নাহা ও বিনা। ওয়াট তাহার নিজের মনের মতই অনুবাদ করিয়াছেন। কারণ তাহা দ্বারা তিনি যাহা বলিতে চাহিতেছেন তাহাই বোঝা যায়। তাহার অনুবাদ যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও দেখিতে হইবে যে, বিল্ড ও এডিফিস কেবল কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় না। এইগুলি কঠিন নহে অথবা বিমূর্ত এইরূপ বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত। যাহা হউক তিনি ওয়াইন্না লা-মূসি'উন (وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ) -এর অনুবাদ করিয়াছেন 'এবং আমরা ইহাকে বিশাল আয়তন করি', ইহা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। এই স্থলে যাহাকে 'বিশাল আয়তন করা' বলা হইয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ হইবে 'ক্রমসম্প্রসারমান' অথবা 'ক্রমবিস্তারমান'। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।

বর্তমান কালে আমরা অবগত আছি যে, একটি পরমাণু ও একটি 'গঠিত কাঠামো' কতকগুলি মৌলিক উপাদান লইয়া গঠিত। অনুরূপভাবে সমগ্র মহাবিশ্ব এবং ইহার বিভিন্ন অংশ যাহার মধ্যে রহিয়াছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, বিভিন্ন সিস্টেম, যেমন সোলার সিস্টেম—এই সকল কিছুই সুসংগঠিত কাঠামো অথবা প্রাণীসত্তা অথবা আলঙ্কারিক অর্থে একটি স্বপ্নসৌধও হইতে পারে। এমতাবস্থায় নির্মিত, সৃষ্ট বা গঠিত—এই শব্দগুলি তাহাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে। এমনকি সৌরমণ্ডলের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইতে পারে, যদিও তাহার মধ্যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে কোন দৃষ্টিতে আমরা বিষয়টিকে দেখি, যেমন ওয়াট সাহেব তার নিজের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আকাশ কোন কঠিন বস্তু।

অনুরূপভাবে 'সাম্‌ক' (سَمْكٌ) শব্দটিকে ওয়াট সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন 'ছাদ', অথচ ইহার অন্যান্য অর্থ হইতে পারে উচ্চতা, প্রসারিত, ব্যাপকতা এবং বুরুজ অথবা নক্ষত্রপুঞ্জের এলাকা।[৪৯] অবশ্য পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ 'উন্নীত ছাদ' (৫২ : ৫) এবং سَقْفًا مَّحْفُوْظًا "রক্ষাকারী ছাদ" (২১ : ৩২)। মূল আরবী সাক্‌ফ অর্থ আচ্ছাদন অথবা কোন কিছুর উপর ছাদ। এই শব্দটি যথাযথই ব্যবহৃত হইয়াছে—কারণ আমাদের নিকটস্থ পৃথিবীর চারপাশে যে মণ্ডল সেগুলি আমাদেরকে রক্ষা করার জন্যই। এই চারটি আয়াত ছাড়াও কুরআনে আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে যেগুলি আকাশ সংক্রান্ত, কিন্তু ওয়াট সেগুলি বিবেচনায় আনেননি।

এই আয়াতগুলিকে বৃহৎ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, (ক) যেগুলিতে সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় আকাশের অবস্থা বলা হইয়াছে; (খ) যেগুলিতে আকাশের প্রকৃতি ও তাহাতে কি আছে অথবা আকাশ এখন কি প্রকার তাহা বলা হইয়াছে; (গ) পরিশেষে যেগুলিতে আকাশের অবস্থা কি তাহা বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় আকাশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনার ক্ষেত্রে দুইটি আয়াত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি ৪১ ঃ ১১ আয়াত। উহা বলে যে, প্রথমে আকাশ ছিল 'ধোঁয়া' (অথবা বাষ্পীভূত বা গ্যাসের মত);[৫০] অপরটি ২১ ঃ ৩০। উহা বলে, আকাশ ও পৃথিবী প্রথমাবস্থায় একীভূত বা একত্র পুঞ্জীভূত ভর ছিল, পরে উহা বিভক্ত হইয়া পৃথক হইয়া গিয়াছে।[৫১] আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তাহাদের এক একজনের এক এক তত্ত্ব। বর্তমান লেখক এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন এবং এই বিষয়ে মন্তব্য করার মত পারদর্শীও নন। তদুপরি এই স্থলে উক্ত বিষয়ে আলোচনার তেমন সুযোগও নাই। তবে একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে এই বিষয়ে নিরাপদে দুইটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। (এক) আধুনিক কালে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত যে সকল থিওরি বা তত্ত্ব দাঁড় করানো হইয়াছে উহা পবিত্র কুরআনের বক্তব্যের অনেক কাছাকাছি। (দুই) পবিত্র কুরআনের এই সকল বক্তব্য ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে প্রচলিত ধারণা হইতে বহু দূরবর্তী।

আকাশের প্রকৃতি ও উহাতে কি আছে এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রহিয়াছে। এই সকল আয়াতের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় যে, ইহাতে আকাশ কথাটি বহুবচনে (اَلسَّمٰوٰت) বলা হইয়াছে এবং পবিত্র কুরআনে ১৯০ বার বলা হইয়াছে এবং একবচনে (اَلسَّمَاء) ১২০ বার বলা হইয়াছে। আরও মজার বিষয়, কমপক্ষে ৯ বার বলা হইয়াছে যে, 'সাত আসমান'।[৫২] একটির পর আর একটি (طِبَاقًا), যাহাকে বলা যায় পরত পরত।[৫৩] বিজ্ঞানীদের সঙ্গে অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, মহাশূন্য কতকগুলি সম্প্রসারমান স্তর দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি স্তরে তাহার নিজস্ব ছায়াপথ, নক্ষত্রপুঞ্জ ও সূর্য রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে ২০০ বার 'আকাশগুলি' ও 'সাত আকাশ' বলা হইয়াছে। ইহা আধুনিক জ্ঞানের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করিতে পারে। তবে একটি বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সপ্তম শতকের কোন মানুষ খালি চোখে আকাশের দিকে তাকাইয়া এবং আকাশকে কঠিন প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ কল্পনা করিয়া বলিতে সাহস করিবে এবং বারবার বলিবে সেখানে তেমন সাতটি প্রাসাদ আছে। এইরূপ উদ্ভট কথা বলা তো কখনই সম্ভব নহে, মহানবী ﷺ-এর পক্ষে তো সম্ভব নয়ই। এই ক্ষেত্রেই পবিত্র কুরআনে সপ্তম শতকের প্রচলিত ধারণা হইতে বহু দূরে।[৫৪]

আসমানসমূহ ও আসমানের অন্যান্য বস্তু তাহাদের নিজ নিজ অবস্থানে অবস্থিত রহিয়াছে কি প্রকারে সেই বিষয়ে পবিত্র কুরআন যে সকল বক্তব্য রাখিয়াছে তাহা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, আসমানকে 'উন্নীত' করিতে গিয়া আল্লাহ ইহার 'ভারসাম্য' নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।[৫৫] ইহাও বলা হইয়াছে যে, আসমান এইরূপ কোন কাঠামো নহে যাহা দৃশ্যমান স্তম্ভের উপর রক্ষিত।[৫৬] সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হইয়াছে যে, আসমানসমূহ এবং পৃথিবী আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ধারণকৃত হইয়া আছে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ .

"আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়। উহারা স্থানচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে উহাদিগকে সংরক্ষণ করিবে" (৩৫ ঃ ৪১)?

'আসামানের' ক্ষেত্রে, সেই সঙ্গে পৃথিবীর ক্ষেত্রে 'ধারণ করা' অভিব্যক্তিটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ পৃথিবী অথবা আসমান কোনটিই কোন নিরেট বস্তুর উপর রক্ষিত নয়। অন্যভাবে বলিলে হয়, আয়াতে বলা হইতেছে যে, আসমান বা আসমানসমূহ এবং পৃথিবী মহাশূন্যে তাহাদের নিজস্ব অবস্থানে আল্লাহ্র ইচ্ছামাফিক ও পরিকল্পনামত রহিয়াছে, কোন কিছুই কোন কঠিন বস্তুর উপর স্থাপিত নাই।

আসমান সম্পর্কিত তৃতীয় ও সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে যে, ইহা ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান পদ্ধতিতে সম্প্রসারণশীল। পূর্বেও এই বিষয়ে বলা হইয়াছে।[৫৭] মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনেকাংশে পবিত্র কুরআনের বক্তব্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে যে, পবিত্র কুরআন সপ্ত আকাশকে 'সাতটি পথ' হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছে। যেমন আয়াত ২৩ ঃ ১৭

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ .

"আমি তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্ত স্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নহি"।

পবিত্র কুরআনের এই বক্তব্যের সঠিক অর্থ সেইদিন আমরা জানিতে পারিব যেদিন আধুনিক বিজ্ঞান পরিপূর্ণভাবে মহাশূন্যে ভাসমান বস্তুর চলাচল সম্পর্কে জানিতে পারিবে।

আকাশ সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে যে, আমাদের গ্রহে যেমন প্রাণসম্পন্ন বস্তু রহিয়াছে তেমনি অন্যত্রও আছে। কারণ ৪২ ঃ ২৯ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ .

"তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি" (৪২ ঃ ২৯)।

এইরূপ আরও অনেক আয়াত আছে যেখানে অনুরূপ ধারণা দেওয়া হয়।[৫৮] অবশেষে বলিতে হয়, সাত আসমানের মধ্যে আমাদের সবচাইতে নিকটবর্তী আসমান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে আস-সামাউদ-দুন্য়া বা 'নিম্নস্থ আসমান'। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ .

"আমি নিম্নস্থ আসমানকে নক্ষত্র (কাওয়াকিব) এবং ভাস্বর আলোক (মাসাবীহ) দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি" (৬৭ ঃ ৫)।

এইরূপে ৪১ ঃ ১২ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান সৃষ্টি করার পর প্রতিটি আসমানের ক্রম নির্ধারণের বর্ণনা করেন ঃ

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاۤءٍ اَمْرَهَا .

"এবং তিনি প্রতিটি আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন"।

অতঃপর একই কথা ৬৭ ঃ ৫ আয়াতে বলিবার পর ৩৭ ঃ ৬ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ .

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি" (৩৭ ঃ ৬)।

নিকটবর্তী আকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাই। স্বাভাবিকভাবেই এই আকাশের বৈশিষ্ট্য বলা হইয়াছে। কারণ ইহাতেই রহিয়াছে আমাদের সৌরজগৎ ও নিকটবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেবল নিকটবর্তী আকাশ ও উহার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে নিয়োজিত। এই আকাশের উপরে 'ছাদ' হিসাবে রহিয়াছে 'ছায়াপথ', যে ছায়াপথে রহিয়াছে এক হাজার লক্ষ কোটির অধিক নক্ষত্র।

আকাশের কথা বলিতে গিয়া মহাশূন্যের ধারণাকে ব্যক্ত করিতে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, উহাদিগকে আকাশেও স্থাপন করা হইয়াছে এবং উহাদিগকে নির্দিষ্ট পথে চলাচলের জন্যও নির্ধারিত করা হইয়াছে।[৫৯] যেমন ১৩ ঃ ২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى .

"তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে....."। অনুরূপভাবে ৩৬ ঃ ৩৮-৪০ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ . وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ . لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ .

"এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে; ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে"।

উপরিউক্ত আয়াতের 'মুসতাকারর' ও 'ফালাক' শব্দের যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন এক দিকে এক প্রকার গতি ও চলাচলের ধারণা এবং অন্যদিকে মহাশূন্যের ধারণা 'ইয়াজরী, তাজরী ও ইয়াসবাহূন' শব্দের অভিব্যক্তিতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

সামাওয়াত শব্দটির অর্থের মধ্যে আমাদের চারিপাশে ও উপরে শূন্যস্থানের যে ধারণা রহিয়াছে তাহাও ১৬ ঃ ৭৯ ও ৩০ ঃ ৪৮ আয়াতে স্পষ্ট। প্রথম আয়াতটিতে বলা হইতেছে ঃ

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ .

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রানাধীন বিহংগের প্রতি" (১৬ ঃ৭৯)?

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইতেছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَآءِ .

"আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন" (৩০ ঃ ৪৮)।[৬০]

যে আয়াতগুলিতে শেষ দিনের কথা বলা হইতেছে সেইগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বলা হইতেছে, আকাশসহ সকল গ্রহ-নক্ষত্র ও সকল সৃষ্ট জগত শেষ হইয়া যাইবে। সেদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিবে যেমন গুটান হয় লিখিত দফতর (স্ক্রল)। যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব...[৬১] সেই দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে[৬২]; স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ;[৬৩] যেদিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে[৬৪]; আকাশ বিদীর্ণ হইবে... উহা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইবে[৬৫]; আকাশ গলিত ধাতুর মত হইবে[৬৬]; আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে[৬৭]; যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে[৬৮]; অবশেষে পুনরায় একটি নূতন পৃথিবী এবং নূতন আকাশ সৃষ্ট হইবে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ .

"যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তীত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশমণ্ডলীও" (১৪ ঃ ৪৮)।

এমনিভাবে বর্তমান পৃথিবী, মহাবিশ্ব নিঃশেষ হইবে, অতঃপর সূচনা হইবে নূতন বিশ্ব ও নূতন প্রাণের পরজগৎ।

এইভাবে বর্ণিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিহিত রহিয়াছে দূর ভবিষ্যতের গর্ভে এবং একমাত্র মহামহিম আল্লাহ তাআলাই জানেন উহা কখন, কবে সংঘটিত হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান কেবল অনুমান করিতে পারে যে, একদিন এই বিশ্ব লোপ পাইবে কোন মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণে এবং সৌরজগতের ও গ্রহমণ্ডলীর স্থানচ্যুতির কারণে। এমতাবস্থায় আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে পারি ইহার সহিত উপরে উল্লিখিত পবিত্র কুরআনের বক্তব্যর কোনই অসামঞ্জস্যতা নাই।

'গুটাইয়া ফেলা' অথবা 'বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়া' প্রভৃতি শব্দ ও অভিব্যক্তি আকাশের আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হওয়ার সহিত জড়িত। এই সকল অভিব্যক্তি দ্বারা ধারণা হয় যে, কোন কিছু

ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তেমনিভাবে, প্রাসাদ' বা 'ছাদ' শব্দের ন্যায় আকাশকেও কঠিন বস্তু বিবেচনা না করিয়াও এই সকল অভিব্যক্তিগুলিকেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, বিশেষ করিয়া যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে উহার মধ্যে রহিয়াছে নক্ষত্ররাজি, গ্রহ, সৌরজগৎ ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে আকাশ জীবনের অস্তিত্বের অর্থ ইহা নহে যে, সেই পৃথিবীর ন্যায় কঠিন বস্তু হইবে। কারণ যেমন পৃথিবী আকাশের (মহাশূন্যে) মধ্যে স্থিত তেমনি আরও অনেক পৃথিবী এই আকাশে অবস্থান করিতেছে। পবিত্র কুরআন ৬৫ ঃ ১২ আয়াতে স্পষ্টই বলিতেছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ .

"আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবীও" (৬৫ ঃ ১২)।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য জীবনের গঠন প্রকৃতি ও গঠনের উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে, হইতে পারে ভিন্ন মাত্রার আবাসস্থল, সেই আবাসস্থল আমাদের আবাসস্থলের ন্যায় নাও হইতে পারে। আবার পৃথিবী হইতে কিছু দূরে আকাশে মানুষের অবস্থা ওজনহীন হইয়া পড়ে এবং তখন তাহার চলাচল বা দাঁড়াইবার জন্য কোন প্রকার স্থূল বস্তুর সাহায্য লাগে না, তেমনি মহাশূন্যে যে সকল প্রাণসম্পন্ন বস্তু রহিয়াছে তাহারাও কঠিন বস্তু নাও হইতে পারে; তাহারা আমাদের স্পর্শের বা ধরা-ছোয়ার বাহিরে থাকিতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআনে এমন সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি রহিয়াছে তাহা যদি আকাশ সম্পর্কিত সেই পুরাতন আদিম যুগের ধারণা লইয়া পাঠ করা যায় তাহা হইলে উহার অর্থ তেমনই হইবে। কিন্তু যদি আধুনিক কালের আকাশ ও মহাশূন্য সম্পর্কিত জ্ঞান লইয়া পাঠ করা যায় তাহা হইলে অবশ্যই যথাযথ মনে হইবে। তদুপরি মনে রাখিতে হইবে, আমাদের আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও আজও সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাবধি কেবল নিকটস্থ আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নিকটস্থ আকাশের পরে যে সীমাহীন মহাশূন্য রহিয়াছে তাহার তেমন কোন সঠিক তথ্য আজও আমরা লাভ করিতে পারি নাই। উহা আজও আমাদের ধারণার অতীত। বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন যে, এই নিকট-আকাশের যে তথ্য তাহারা লাভ করিয়াছেন তাহাও প্রকৃত অবস্থার তুলনায় বিন্দু পরিমাণ মাত্র। দৃশ্যমান এই নিকটস্থ আকাশ, যেখানে রহিয়াছে গ্রহ-নক্ষত্র, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে মহাজগৎ তাহা আজও আমাদের জ্ঞান জগতের বাহিরে রহিয়াছে। এমনকি বিজ্ঞানীগণও স্বীকার করেন যে, তাহারা আকাশের বিস্তার ও প্রকৃতি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যাহা জানিয়াছেন উহা অজানা জগতের তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর সমানও নহে। আমাদের জ্ঞাত জগতের বাহিরে যাহা আছে উহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অন্ধকার। এই সকল আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি অনুমান করা হয় যে, পবিত্র কুরআনের বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে তাহা হইলে উহাকে চরম হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না।

যাহা হউক, ওয়াট সাহেবের অনুমান যে, আকাশ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের বক্তব্য মধ্যযুগীয়, উহাতে সপ্তম শতকের জ্ঞান ধারণ করা হইয়াছে, তাহার সেই অনুমান তিনটি কারণে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

(এক) তিনি মাত্র কয়েকটি আয়াত নির্বাচন করিয়াছেন এবং মধ্যযুগীয় ধারণা লইয়া বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ মন লইয়া বিচার করিয়াছেন।

(দুই) আকাশ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে সংগতিপূর্ণ সেই সকল আয়াত তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন এবং আকাশ সম্পর্কিত সেই সকল বক্তব্য কেবল বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির পর বোধগম্য হইবে।

(তিন) তিনি মনে করেন বা ধরিয়া লইয়াছেন যে, আকাশ বা মহাকাশ সম্পর্কে আজ অবধি বিজ্ঞান যাহা জানিয়াছে উহাই চূড়ান্ত এবং মহাকাশ সম্পর্কে আর কিছুই জানার নাই। কিন্তু সত্য তাহা নহে। কারণ বিজ্ঞানীগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া মহাকাশ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাহারা যাহা জানিয়াছেন এবং যাহা অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন উহা মহাকাশের তুলনায় কণামাত্র।

অনুবাদ ঃ ফজলে রাব্বি

তথ্যসূত্র

১. J. Hicks, (ed.) The Myth of God Incarnate, London.1977.

২. Salvation Army-এর প্রবক্তারা এই মত পোষণ ও প্রচার করেন।

৩. Watt, M at M, 28.

৪. Watt, M's M. ২, ৪৪, ৫৫।

৫. M. at M ২৮।

৬. Watt. M's M., ২, ৪৫।

৭. এই হাদীছটি আদী ইবন হাতিম (রা) প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ এবং তিরমীযী ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর, ১০খ, ১১২; এবং ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ; আরও দ্র. তিরমিযী (সম্পা. আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির), ৫খ, পৃ. ২৭৮ (হাদীছ নম্বর ৩০৯৫)।

৮. মুহাম্মাদ আলী, The Holy Quran, Arabic Text. English Translation & Commentary, revised edition, Lahore 1985, pp. 275-276 (n. 751).

৯. Watt. M's M, 45.

১০. ঐ, পৃ. ১০৮, টীকা ২, অধ্যায় ১ এবং টীকা ২ ও ১০, অধ্যায় ৩।

১১. আল-বায়দাবী (তাফসীর), ১খ, ২য় মিসরীয় মুদ্রণ, ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৪১২।

১২. আত-তাবারী (তাফসীর), ১৪খ, পৃ. ২০১-২০৪।

১৩. আল-কুরতুবী (তাফসীর), পাঠ ৮, পৃ. ১১৬-১১৭।

১৪. আধুনিক পাশ্চাত্যের এক পণ্ডিতের এই সত্যের স্বীকৃতির জন্য দ্র. Bart. D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture : The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament, Oxford University Press, New York & Oxford 1993.

১৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর, ৬খ, পৃ. ১৬-১৭।

১৬. Barbara Thiering, Jessus The Man (First Published 1993). Corgi ed. 1993. See especially the book cover page.

১৭. তুরিনে যে কাফন আবিষ্কৃত হয় তাহা ঐ জামা বলিয়া বিশ্বাস করা হয় যে, ইহা দ্বারা যীশুর শরীর আবৃত করা হইয়াছিল যখন তাঁহার ভাস্কর্যে স্থাপন করা হইয়াছিল।

১৮. Holger Kersten & Elmor R. Gruber. The Jessus conspiracy The Turin Shroud and the Truth about the Resurrection, Element books Ltd, Shaftesbury 1994.

১৯. M's M. ৪৫-৪৬।

২০. ঐ, ৫, ৬।

২১. ঐ, ৫।

২২. ঐ, ২, ৪৪।

২৩. ২য় ভ্যাটিকান কাউন্সিল (১৯৬২-১৯৬৫) একটি দলীল গ্রহণ করে যাহাতে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, Old Testament-এর পুস্তকাদিতে এমন কিছু উপাদান রহিয়াছে যাহা ত্রুটিযুক্ত ও অপ্রচলিত। দ্র. M. Bucaille, What is the Origin of Man? The Answers of Science and the Holy Scriptures, 4th ed. Seghers, Paris 1988, p. 15.

২৪. Jean Guitton (1978), প্রাগুক্তের বরাতে, পৃ. ১০।

২৫. For isntance Muhammad Wafa al-Amiri, al-Isharat al-Ilmiyyah Fi al-Quran, Second impression, Cairo 1401 (1981), and Hanafi Ahmad, al-Tafsir al-Ilmi li al-Ayat al-kawniyyah Fi al-Qura, Cairo, n.d.

২৬. এয়োদশ সংস্করণ ১৯৮৭ সালে প্যারিসে প্রকাশিত হয়।

২৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. কুরআনের ৭ ঃ ১১০; ১৪ ১৩; ২০ ঃ ৫৭; ২০ ঃ ৬৩; ২৬ ঃ ৩৫; ২৮ ঃ ৫৭।

২৮. যেমন কুরআনের ৯ ঃ ৩৮।

২৯. Watt, M's M 2.

৩০. M. Fathi Uthman, "Al-ard fi al-Quran al-Karim," Proceedings of the First Islamic Geographical Conference, Riyadh, 1404 (1984), Vol IV, 127 (117-271); A. M. Soliman, Scientific Trends in the Quran, London (Taha Publication), 1985, p. 16.

৩১. A. J. Arberry, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৬।

৩২. Quran, ২ ঃ ২০৬; ৩ ঃ ১২; ৩ ঃ ১৯৭; ৭ ঃ ৪১; ১৩ ঃ ১৮; ৩৮ ঃ ৫৬।

৩৩. Quran 3 : 40; 3 : 110 এবং 19 : 29.

৩৪. A. J. Arberry, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫ এবং ৩১৪।

৩৫. ঐ, ৬০৯।

৩৬. Oxford Advanced Learners Dictionary of current English, ed. A.S. Hornby, 19th impression, 1984, p. 636.

৩৭. আত-তাফসীরুল কাবীর, ১৯ খ, পৃ. ৩।

৩৮. ঐ, ১৯খ., পৃ. ১৭০, মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

فَهِىَ كُرَةٌ غَايَةُ الْعَظِيْمَةِ وَالْكُرَةُ الْعَظِيْمَةُ يَكُوْنُ كُلُّ قِطْعَةٍ صَغِيْرَةٌ مِّنْهَا اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا فَاِنَّهَا تَرٰى كَالسَّطْحِ الْمُسْتَوِىْ وَاِذَا كَانَ كَذَالِكَ زَالَ مَا ذَكَرُوْهُ مِنَ الْاَشْكَالِ وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى (وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا) سَمَاهَا اَوْتَادًا مَعَ اَنَّهُ قَدْ يَحْصِلُ عَلَيْهَا سَطُوْحٌ عَظِيْمَةٌ مُسْتَوِيَةٌ فَكَذَا هٰهُنَا .

৩৯. এ বিষয়ে আরও দ্র. কুরআন ৩৯ ঃ ৩৬ এবং ৫১ ঃ ৪৯।

৪০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. পিকথল এবং A. Yusuf Ali-র এই আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

৪১. এই বিষয়ে কুরআনে অন্য উল্লেখের জন্য নিম্নে দ্র.।

৪২. আরবেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

৪৩. Watt, M's M, 6.

৪৪. A. g. Araberry. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫।

৪৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. M. Bucaille, প্রাগুক্ত।

৪৬. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ২০খ; আশ-শাওকানী, তাফসীর, ৫খ, পৃ. ৪৪৯।

৪৭. তাজুল আরূস, ১০খ, ২২১; আরও দ্র. E.W. Lane, Arabic-English Laxicon طحو ও طحى শিরোনামে যেখানে অন্যান্য অর্থ ছাড়াও উল্লেখ করা হইয়াছে طحا বলা হয় তখন যখন কাহাকেও উপুড় করিয়া ফেলা হয় (Cambridge Islamic Text Society print, 1984. vol. II, p 1839.

৪৮. Watt, M's, M. 5.

৪৯. দ্র. লিসানুল আরাব, সাম্‌ক শিরোনামে এবং তাজুল আরূস, ৭খ, পৃ. ১৪৫।

৫০. মূল পাঠ নিম্নরূপ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ وَهِىَ دُخَانٌ

৫১. মূল পাঠ নিম্নরূপ . اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

৫২. কুরআন ২ : ২৯; ১৭ : ৪৪; ২৩ : ১৭; ২৩ : ৮৬; ৪১ : ১২; ৬৫ : ১২; ৬৭ : ৩; ৭১ : ১৫; ৭৮ : ১২

৫৩. কুরআন ৬৭ : ৩ এবং ৭১ : ১৫ طِبَاقًا শব্দটির যদিও প্রায় অনুবাদ করা হয় একের উপর অন্যটি, তবে বিশুদ্ধতর অর্থ হইল স্তরে স্তরে অথবা একটির সহিত অন্যটি সম্পর্কিত। দ্র. Lane-এর Laxicon.

৫৪. ওয়াট এই মূল পাঠ এই বলিয়া দ্রুত অতিক্রম করিয়া যান যে, এখানে সাতটি আসমানের কথাও বলা হইয়াছে (Muhammads Mecca, 5).

৫৫. কুরআন ৫৫ : ৭ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ

৫৬. কুরআন ১৩ : ২ এবং ৩১ : ১০।

৫৭. নিম্নে দ্র.পৃ. ৩১৩; আরও দ্র. কুরআন ৫১ : ৪৭।

৫৮. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. কুরআন ১৬ : ৪৯; ১৭ : ৪৪; ১৭ : ৫৫; ১৯ : ৯৩; ২১ : ১৯; ২৩ : ৭১; ২৪ : ৪১; ২৭ : ৬৫; ২৮ : ১৮; ৩০ : ২৬।

৫৯. আরও দ্র. কুরআন ১৪ : ৩৩; ১৬ : ১২; ২৯ : ৬১; ৩১ : ২০; ৩৫ : ১৩; ৩৯ : ৫; ৪৫ : ১৩; ৭ : ৪; ১৬ : ১২।

৬০. কুরআনে অবশ্য রূপক অর্থে কোন কোন ক্ষেত্রে 'সামা' শব্দটি বৃষ্টির অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে তাহা আলোচ্য বিষয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক নহে।

৬১. কুরআন ২১ : ১০৪

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ .

৬২. কুরআন ২৫ : ২৫ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ

৬৩. কুরআন ৪৪ : ১০ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ

৬৪. কুরআন ৫২ : ৯ يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا

৬৫. কুরআন ৫৫ : ৩৭ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

৬৬. কুরআন ৭০ : ৮ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ

৬৭. কুরআন ৮২ : ১-২ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

৬৮. কুরআন ৭৫ : ৯ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ; আরও দ্র. কুরআন ৩৯ : ৬৭; ৬৯ : ১৬; ৭৩ : ১৮; ৭৭:৯; ৭৮:১৯; ৮১:১১ এবং ৮৪ : ১।

তৃতীয় ভাগ

ON THE EVE OF THE CALL TO PROPHETHOOD

রিসালাতের দাওয়াত দেয়ার প্রাক্কালে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(দীন ইসলামে অন্তর্ভুক্তির) দাওয়াত দেয়ার প্রাক্কালে হানীফ সম্প্রদায় এবং 'উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ-এর ঘটনা

পূর্বে দেখানো হইয়াছে[1] যে, মুহাম্মাদ ﷺ ঐশী আদেশ (ওহী) প্রাপ্ত হইয়া নবী হইবার জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন এমন কোন উচ্চাশা তিনি পোষণ করিতেন না। অথবা কুরআন ইয়াহূদী-খৃষ্টীয় এবং অন্যান্য সূত্র[2] হইতে আহরিত তথ্যাবলীর একটি উৎকলনও ছিল না। এই কথা বলিয়া এইরূপ ধারণা প্রকাশ করা অভিপ্রায় নয় যে, মহানবী ﷺ তাঁহার সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকদের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না, বরং এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া যে, সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার উদ্বেগই শুধু নয়, তাঁহার গভীর চিন্তা ও ধীরতা সত্ত্বেও নবুওয়াতের প্রতি তাঁহার আহ্বান এবং তিনি যে প্রত্যাদেশসমূহ লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেবল আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা তাঁহার নিজস্ব বা ধ্যান-ধারণাপ্রসূত ছিল না। এই বিষয়টি ক্রমশই স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে যদি আমরা তাঁহার নবুওয়াত দাবির পূববর্তী ঘটনাবলীকে পর্যালোচনা করি। স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে তিনটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইগুলি হইতেছে ঃ (এক) নবী ইবরাহীম (আ) যে সত্য ধর্ম রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য 'হানীফ' নামে অভিহিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক অন্বেষণ, (দুই) খৃষ্টীয় বায়যান্টীয় শক্তির সাহায্যে মক্কার শাসন ও সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে উক্ত জনৈক হানীফ কর্তৃক প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং (তিন) কর্মব্যস্ত মক্কা নগরীর কেন্দ্রস্থল হইতে তিন মাইল দূরে হেরা পর্বতের উপরে অবস্থিত এক গুহায় মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক নির্জনে অবস্থান ও গভীর ধ্যানে (আত-তাহান্নু) নিমগ্ন থাকা।

তিনটি ঘটনার প্রথম দুইটির উপর বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয়টি মহানবী ﷺ কর্তৃক ওহী প্রাপ্তির সহিত সম্পর্কিত বিষয়, তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিধৃত হইয়াছে।

এক ঃ হানীফ সম্প্রদায়

মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুওয়াত দাবির সামান্য পূর্বে ইতিহাস রচয়িতাগণ কিছু সংখ্যক লোকের উল্লেখ করেন যাহারা পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া ইবরাহীম (আ)-এর সত্য ধর্মের অন্বেষণ করেন। তাঁহাদিগকে আল-হানীফিয়্যাহ নামে অভিহিত করা হয়। বারবার যাঁহাদের নাম উচ্চারিত হয়, তহারা হইলেন ঃ

(১) ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল (ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন 'আবদুল 'উয্‌যা)।

(২) 'উছমান ইব্‌নুল হুওয়ায়রিছ (ইব্‌ন আ'মাশ ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা)।

(৩) 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ্।

(৪) যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল।

(৫) 'উমায়্যা ইব্ন 'আবীস্ সাল্ত্।

(৬) 'আমর ইব্ন 'আবাসাহ।

(৭) সিরমাহ ইব্ন আবী 'আমাম (অথবা ইব্ন আবী কায়স)।

(৮) আন-নাবিগাই আল-জা'দী।

(৯) রি'আব ইব্নুল বারাআ।

(১০) 'আবূ 'আমের আল্-আওসী।

(১১) খালিদ ইব্ন সিনান ইব্ন গায়ছ।

(১২) 'আবূ কায়স ইব্নুল আসলাত।

এই তালিকার প্রথম চার জন দুইটি কারণে স্ব-উদ্যোগে একটি শ্রেণী গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রথমত, তাঁহারা সকলেই মক্কার অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহারা কেবল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমসাময়িকই ছিলেন না, বরং তাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পরিচিতজনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহারা আনুষ্ঠানিকভাবে পৌত্তলিকতাকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন এবং প্রায় একই সাথে ইবরাহীম (আ)-এর সত্য ধর্মের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, এই চার ব্যক্তি একদিন কুরায়শদের একটি বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমবেত হন। ঐ অনুষ্ঠানে একটি পাথরের মূর্তির পূজা ও দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গের ব্যবস্থা ছিল। তখন এই অনুষ্ঠান হইতে উক্ত চার ব্যক্তি নীরবে সরিয়া পড়েন এবং নিচুস্বরে নিজেদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিতে থাকেন যে, তাঁহাদের কুরায়শ গোত্রের লোকেরা তাহাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এবং সত্য ধর্ম হইতে পথভ্রষ্ট হইয়াছে। সত্য ধর্মের পরিবর্তে একটি পাথরের মূর্তির পূজা করা অর্থহীন। কারণ এই মূর্তি যেমন কোন কিছু দেখিতে ও শুনিতে পায় না তেমনি কাহারও কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে না। তারপর তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন এবং পৃথকভাবে তাঁহারা বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম আল-হানীফিয়্যা'র অন্বেষণ করিতে থাকেন।[৩]

ইহা স্পষ্ট যে, যদিও এই চার ব্যক্তি একত্রে একই সময়ে স্বগোত্রের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন হন তবুও বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তি পূজার প্রতি তাহাদের বিরাগ অনেক আগে হইতে তাহাদের মনে সৃষ্টি হইতেছিল। ইহাও অবশ্য লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইতে তাহাদের একযোগে সরিয়া পড়ার বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং অন্যের বিরক্তি উদ্রেককর ছিল না কিংবা ইহা তাহাদের পক্ষে কোন পরিকল্পিত গণআন্দোলনও ছিল না। ইব্ন ইসহাক বর্ণিত তথ্যের আলোকে ইহা আরও স্পষ্ট যে, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাহাদের অনুভূতি অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না বলিয়া তাহারা

একমত হন।[৪] কিন্তু তাহাদের কার্যক্রমের ধরন যাহাই হউক, ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাহারা বিশ্বাস করিতেন তাহাদের গোত্রীয় লোকেরা ইবরাহীম (আ)-এর মূল ধর্ম আল-হানীফিয়্যা হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং এই ধর্ম তাহাদের অনুসরণ করা উচিত বলিয়াও তাহারা মনে করিতেন।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি হইলেন ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল।[৫] তিনি কুরায়শ বংশের বনূ আসাদ গোত্রের লোক এবং উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর চাচা (সম্ভবত ইহা মুদ্রণ ত্রুটি, প্রকৃতপক্ষে ওয়ারাকা খাদিজা (রা)-এর চাচাতো ভাই) ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা)-এর পিতা খুওয়ায়লিদ ও নাওফাল হইলেন আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উয্যার দুই পুত্র। এই চারজনের মধ্যে ওয়ারাকা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁহার সত্য ধর্মের অন্বেষণের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে লিপিবদ্ধ বিবরণ অনুযায়ী তিনি পরবর্তী কালে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন এবং ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। হিব্রু ভাষাতেও তাঁহার দখল ছিল এবং তিনি বাইবেলের অংশবিশেষ হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। মহানবী ﷺ যখন প্রথম ওহী লাভ করেন তখন ওয়ারাকা নিতান্তই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে, মহানবী ﷺ-এর প্রথম ওহী লাভের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরপরই খাদীজা (রা) কিভাবে মহানবী ﷺ -কে তাঁহার চাচাত ভাইয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন এবং ওয়ারাকা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহী লাভ করিয়াছেন, যেমন মূসা (আ) আল্লাহ্র নিকট হইতে নির্দেশ পাইতেন। তিনি আরও বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার স্বীয় গোত্রের লোকদের নিকট হইতে অনেক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিবেন। তিনি (ওয়ারাকা) যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করিতেন। এই বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, যদিও ওয়ারাকা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তবুও তিনি দুইটি সুনির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করিতেন, যেমন 'আল্লাহ্র ওহী' জিবরীল (আ) (নামূস)-এর মাধ্যমে কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং 'আল্লাহ্র কোন নবী' শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। বস্তুত ওয়ারাকা নিশ্চিত ছিলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ হইতেছেন সেই প্রত্যাশিত নবী। ওয়ারাকার প্রাক-বংশপরিচয়, বৃদ্ধ বয়স ও ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থের সহিত পরিচিতির প্রেক্ষিতে ইহা ধরিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, তাঁহার উপরিউক্ত ধারণাসমূহ সেই সময়ে বিদ্যমান ধর্মগ্রন্থসমূহ পঠন-পাঠনের ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল।

তালিকার দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন 'উছমান ইব্নুল হুওয়ায়রিছ। তিনি বনূ আসাদ গোত্রভুক্ত এবং ওয়ারাকা ও খাদীজা (রা) উভয়েরই চাচাত ভাই। কারণ 'উছমানের পিতা আল-হুওয়ায়রিছ ছিলেন আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উয্যা'র আর এক পুত্র। 'উছমানের সত্যধর্মের অনুসন্ধান প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে বিদেশী সহায়তায় মক্কায় ধর্মশাসন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, যাহা পরবর্তী অংশে বর্ণনা করা হইবে।

বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা গোত্রের 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ এই তালিকার তৃতীয় ব্যক্তি। 'উবায়দুল্লাহ ছিলেন মহানবী ﷺ-এর ফুফাত ভাই। যেহেতু তাহার মা উমায়মা ছিলেন 'আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা। অন্যান্যদের ন্যায় 'উবায়দুল্লাহ আল-হানীফিয়্যাদের অন্বেষণে পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ পরিভ্রমণ করেন। মহানবী ﷺ -এর আহ্বানে সাড়া দিলে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী প্রথম মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁহার স্ত্রী 'উম্মু হাবীবা (রা)-ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 'উম্মু হাবীবা ছিলেন বনূ 'আবদ শাম্‌স গোত্রের আবূ সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারব-এর কন্যা। 'উবায়দুল্লাহ ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ই ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান এবং তাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে উবায়দুল্লাহ শেষ পর্যন্ত খৃস্ট ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার স্ত্রী 'উম্মু হাবীবা অবশ্য ইসলাম ধর্মে অবিচল চিত্তে অবস্থান করেন এবং পরবর্তী কালে মহানবী ﷺ -কে বিবাহ করেন।[৬]

যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল-এর কাহিনী সবচাইতে বেশী চিত্তাকর্ষক।[৭] তিনি বনূ 'আদী (ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লু'আয়্যি) গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব-এর চাচাত ভাই এবং আল-খাত্তাব ও আমর উভয়ই ছিলেন নুফায়ল-এর পুত্র। যায়দ-এর পুত্র সা'ঈদ উমার-এর ভগ্নী ফাতিমাকে বিবাহ করেন এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ই প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। যায়দ মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কোন পশুর গোশত গ্রহণ করিতেন না। একইভাবে যে সমস্ত প্রাণী আপনাআপনি মারা যায় উহার গোশত ভক্ষণ ও মদপান হইতেও তিনি বিরত থাকিতেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তাহার এই ধরনের মতামতকে গোপন রাখিতেন না এবং কন্যা শিশুকে হত্যার নির্মম জাহিলী প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন; বরং নিজে কন্যা শিশুর ভরণপোষণ করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেন। কখনও কখনও তিনি কা'বাগৃহের পার্শ্বে বসিয়া এইরূপ ঘোষণা দান করিতেন যে, তাহার গোত্রের লোকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করিতেন। তাহার শপথ পূর্বক মূর্তিপূজা পরিত্যাগ এবং জাহিলী প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ঘোষণা তাহার স্বীয় পরিজনদের এমনকি চাচাত ভাই আল-খাত্তাবের শত্রুতার সৃষ্টি করে। আল-খাত্তাব এজন্য যায়দের স্ত্রী ও অন্যদেরকে তাহার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এই সকল লোকের শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার কারণে যায়দের পক্ষে মক্কায় অবস্থান করা কঠিন হইয়া পড়ে। যে কোনভাবেই হউক, তিনি ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম হানীফিয়্যার সন্ধানে পার্শ্ববর্তী দেশ, বিশেষ করিয়া সিরিয়াতে গমন করেন। সেখানে তিনি খৃস্টান রাহেব ও ইয়াহূদী রাব্বীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিন্তু খৃস্ট কিংবা ইয়াহূদী ধর্ম তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বর্ণিত আছে যে, তিনি এই দুইটি ধর্মকেও বহু ঈশ্বরবাদী প্রথা দ্বারা কলুষিত বলিয়া মনে করেন। আরও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর সত্য ধর্মের বিষয়ে অনুসন্ধানে একজন খৃস্টীয় রাহেব তাহাকে জানান যে, যায়দের নিজ দেশে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম হানীফিয়্যাসহ একজন নবীর আগমন ঘটিবে এবং সেই নবীর আবির্ভাব খুব শীঘ্রই হইবে। এই তথ্য অবগত হইয়া যায়দ খুব দ্রুত মক্কায় প্রত্যাবর্তন

করিতে থাকেন, কিন্তু সিরিয়ার সীমানার মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি কিছু সংখ্যক আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। একটি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, মহানবী ﷺ-এর দীনি দাওয়াতের পূর্বে তিনি মক্কায় মহানবী ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করেন।[৮] এই ঘটনা অবশ্যই যায়দের দুর্ভাগ্য কবলিত সিরিয়া ভ্রমণের পূর্বেই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। আরও বর্ণিত আছে যে, একদা তাহার পুত্র সাঈদ যায়দের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিবেন কিনা এই মর্মে মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করিলে মহানবী ﷺ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেন।

এই চার ব্যক্তি ছাড়াও তালিকাভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলে মহানবী ﷺ-এর সমসাময়িক ছিলেন। তালিকার পঞ্চম ব্যক্তি 'উমায়্যা ইব্ন আবিস সাল্ত্ বনূ ছাকীফ গোত্রভুক্ত ছিলেন।[৯] তাহার পিতা আবুস সাল্ত ইব্ন 'আবির রাবীআহ'র ন্যায় উমায়্যাও একজন কবি ছিলেন। তিনিও একজন হানীফ এবং সত্যধর্মের অনুসন্ধানকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, পৌত্তলিতার প্রতি তাহার কোন বিশ্বাস ছিল না। তিনি মদ্যপানকে বেআইনী বিবেচনা করিয়া ইহা গ্রহণে বিরত থাকিতেন। তিনি খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিলেও ইহাদের কোন ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ধর্মীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি প্রধানত কবিতা রচনা করিতেন, তবে তাহার কবিতায় উল্লেখযোগ্যভাবে স্রষ্টার একক সত্তার প্রতি ইঙ্গিত থাকিত। 'আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি ও যায়দ ইব্ন 'আমর কা'বার নিকটে বসিয়াছিলেন। এমন সময় উমায়্যা ইব্ন আবিস সাল্ত সেখান দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তখন যায়দ উমায়্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যে সত্য ধর্মের অন্বেষণ করিতেছেন তাহার সন্ধান পাইয়াছেন কিনা। উত্তরে উমায়্যা জানান যে, তিনি এখনও উহার সন্ধান জানিতে পারেন নাই। তখন তিনি একটি স্বরচিত কবিতা আবৃতি করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌র নিকট আল-হানীফিয়া ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণীয় নয়।[১০] অন্যান্যদের মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে, সত্য ধর্ম লইয়া শীঘ্রই একজন নবী অবতীর্ণ হইবেন এবং তিনি নিজেই সেই নবী হইবেন বলিয়া আশা পোষণ করিতেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হইলেন তখন হিংসার বশবর্তী হইয়া উমায়্যা তাহার নবুওয়াতকে অস্বীকার ও তীব্রভাবে বিরোধিতা করিলেন।[১১]

তালিকার ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ব্যক্তি যথাক্রমে 'আমর ইব্ন 'আবাসা, সিরমাহ ইব্ন আনাস ও আন-নাবিগা আল-জা'দীকে একত্রে একটি দলে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ তাঁহাদের সকলেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বনূ সুলায়ম গোত্রের 'আমর ইব্ন 'আবাসা'র স্বীয় ভাষ্য অনুযায়ী জাহিলিয়্যা যুগের মূর্তিপূজাকে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়া পরিত্যাগ করেন। তিনি মূর্তিপূজারী লোকদিগকে ইহার অসারতা সম্পর্কে অবহিত করিতেন। তিনি আরও জানান যে, একদিন তিনি দেব-দেবী ও উহার পূজার বিরুদ্ধে যখন কথা বলিতেছিলেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের একজন উল্লেখ করেন যে, মক্কার এক ব্যক্তি (অর্থাৎ মহানবী ﷺ) দেব-দেবী ও উহার পূজার বিরুদ্ধে ঠিক অনুরূপভাবে মত প্রকাশ করেন। এই কথা শোনার পর 'আমর মক্কায়

আসেন এবং মহানবী ﷺ-এর নিকট ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া তিনি তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২]

অনুরূপভাবে বনূ 'আদী ইব্নুন' নাজ্জার গোত্রের সিরমাহ ইবন আনাস জাহিলিয়্যা যুগের মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া সন্যাস জীবন গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করিয়া সেখানে অপবিত্র অবস্থায় অন্য সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। স্ত্রী সহবাসের পর তিনি গোসল করিয়া পরিচ্ছন্ন হইতেন, ঋতুকালীন স্ত্রী সহবাস করিতেন না এবং সকল প্রকার উত্তেজক পানীয় পরিহার করিতেন। তিনি ঘোষণা দিয়া বলিতেন যে, তিনি কেবল ইবরাহীম (আ)-এর এক আল্লাহ্র উপাসনা এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের অনুসরণ করেন। মহানবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন সিরমাহ ছিলেন খুবই বৃদ্ধ। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩]

বনূ আমের ইবন সা'সা'আ গোত্রের আন-নাবিগাহ আল-জা'দী জাহিলিয়্যা যুগে এক আল্লাহ্র ইবাদত ও ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম প্রসংগে আলোচনা করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, 'আযাব, বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কে বিশ্বাস করিতেন।পরবর্তী কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৪] অনুরূপভাবে রিআব ইবনুল বারাআ, 'আবূ 'আমের-আল-'আওসী ও খালিদ ইবন সিনান ইবন গায়ছও পৌত্তলিকতা পরিত্যগ করিয়া এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মসহ শীঘ্রই একজন নবীর আগমন ঘটিবে।[১৫]

এই তালিকার শেষ ব্যক্তি হইলেন আবূ কায়স ইবনুল আসলাত এবং উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি হইতে তাহাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করিতে হইবে, যদিও তাহাদের কেহই মদীনাতে হানীফ হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। মহানবী ﷺ-এর মদীনাতে হিজরতের পর তিনি মহানবী ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিলেও ইসলাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং 'আওস গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি তাহার কবিতায় আল-হানীফিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করিতেন এবং ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের পবিত্র গ্রন্থদ্বয়ে একজন নবীর আগমনবার্তার বিষয়টি তাঁহার কবিতা রচনার উপজীব্য বিষয় ছিল। মদীনার ইয়াহূদীগণ তাহাকে ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার দলভুক্ত অন্য অনেকের ন্যায় তিনিও সত্য ধর্মের অন্বেষণে সিরিয়া পরিভ্রমণ করেন। সিরিয়াতে খৃস্টান রাহেব ও ইয়াহূদী রাব্বীগণ তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলেও তিনি তাহা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে একজন রাহেব তাহাকে জানান যে, আল-হানীফিয়া নামে তিনি যে ধর্মের অন্বেষণ করিতেছেন তাহা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম এবং ইহা তাহার নিজ দেশে দেখিতে পাইবেন। অতঃপর তিনি মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। মক্কায় তিনি যায়দ ইবন 'আমর ইবন নুফায়লের সাথে সাক্ষাত করিয়া আলাপ-আলোচনা করেন। যায়দ তাহাকে বলেন যে, তিনিও খৃস্টান রাহেব ও ইয়াহূদীদের ধর্মকে সঠিক নয় বলিয়া মনে করেন এবং প্রকৃত আল্লাহ্র ইবাদতের ধর্ম হইতেছে ইবরাহীম (আ)-এর আল-হানীফিয়া। মহানবী ﷺ মদীনায় হিজরত করিলে 'আবূ

কায়স তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন এবং ইহার সত্যতা অনুধাবন ও তাঁহাকে (মুহাম্মাদ ﷺ) নবী হিসাবে গ্রহণ করেন। মক্কায় ফিরিবার পথে আবূ কায়স-এর সহিত আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর দেখা হয়। উবায়্যি তাঁহাকে খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে থাকে। ইহাতে তিনি ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই মহানবী ﷺ -এর মদীনায় হিজরতের প্রায় ১০ মাস পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৬]

এই সকল ব্যক্তি ছাড়াও কুস ইব্ন সাইদা, আদ্দাস (উৎবাহ ইব্ন রাবীআ-এর মাওলা) এবং এমনকি বুসরার রাহেব বাহীরাকেও কেহ কেহ হানীফদের মধ্যে গণ্য করেন।[১৭] কেহ তাহাদিগকে 'আবূ যার আল-গিফারী ও সালমান আল-ফারিসী'র সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। আবূ যার আল-গিফারী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া তিন বৎসর যাবৎ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করিতে থাকেন।[১৮] পক্ষান্তরে সালমান আল-ফারিসী ইবরাহীম (আ)-এর সত্য ধর্ম আল-হানীফিয়ার দীর্ঘ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে তিনি ইসলাম ধর্মের মধ্যেই চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান লাভ করিতে সক্ষম হন।[১৯]

উপরের বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে, সেই সময়ে প্রচলিত বহু ঈশ্বরবাদী ও সর্বব্যাপী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের দ্বারা উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্মপ্রেরণা লাভ করেন, আবার অন্যভাবে বলিতে গেলে এক আল্লাহ্র প্রতি ইবাদতের জন্য প্রবল আসক্তি অনুভব করেন। ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম আল-হানীফিয়ার সহিত এক আল্লাহ্র ইবাদতকে তাহারা সমকক্ষ গণ্য করেন। প্রাপ্ত সূত্রসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে এই সত্যের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করে এবং যাহারা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম হিসাবে আল-হানীফিয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ ও চিহ্নিত করেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই এতদসম্পর্কে তথ্যের পুনরুল্লেখ করেন। এমনকি উমায়্যা ইব্ন আবিস সাল্ত-এর কবিতায়ও স্পষ্টভাবে আল-হানীফিয়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য তাহাদের অনেকেই স্বীয় লোকদের মধ্যে হানীফ হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মে প্রত্যাবর্তনের এই ঐকান্তিক আগ্রহ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিপতিত হওয়া সত্ত্বেও আরববাসিগণ তাহাদের উৎস কা'বা শরীফের পবিত্রতা ও ইবরাহীম (আ)-এর অনেক ধর্মীয় আচার ও প্রথা খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হয়। অবশ্য তাহারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই। ইহাই স্বাভাবিক ছিল যে, এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ঐ সকল পুণ্যাত্মা তাহাদের পূর্বপুরুষের মূল ধর্মের পুনরুজ্জীবন চাহিতেছিলেন। আল-হানীফিয়ার অনুসন্ধান আর একটি প্রমাণ এবং একই সাথে আরবে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুশাসনের ধারাবাহিকতার একটি পরিণতি। ইহা অবশ্য এই মতের বর্ণনা করে যে, ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্টধর্ম সেই সময় আরবদেশে ও সিরিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করিলেও সত্য ধর্মের অনুসন্ধানকারিগণ এই

দুইটি ধর্মের প্রশ্নহীন একেশ্বরবাদিতার আবেদন খুঁজিয়া পায় নাই। কারণ তাহাদের অনেকেই এই দুইটি ধর্মের কোনটিই গ্রহণ করে নাই, যদিও এই দুই ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত তাহাদের সাক্ষাত হইয়াছিল। বস্তুত বহু হানীফ সেই সময়কার ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মকে বিকৃত বলিয়া মনে করিত। ওয়ারাকা ইবন নাওফাল ও 'উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ-এর মত কিছু সংখ্যক সত্যানুসন্ধানকারী যদিও খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন তবুও ওয়ারাকা ইহাকে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই। কারণ সকল প্রকার বিবেচনা শেষে তিনি এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, আর একজন নবী আসিবেন এবং তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ অবশ্য স্বার্থ ও উচ্চাকাংখা সাধনে তৎপর ছিলেন।

তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুওয়াত লাভের প্রাক্কালে প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধানের একটি উদ্দীপনা এবং সত্য খুঁজিয়া বাহির করিবার একটি প্রবল আগ্রহ চূড়ান্ত গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছিল। মহানবী ﷺ-এর স্বীয় শহর-সহ ঐ এলাকার বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে মহানবী ﷺ-এর আপন আত্মীয়-পরিজনও ছিলেন। উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ নিজে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হইয়া সত্যানুন্ধানের সেই সময়কার উৎসাহ-উদ্দীপনা হইতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি কিভাবে এই প্রচেষ্টার প্রতি সাড়া দিলেন তাহা আলোচনার পূর্বে তাঁহার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা সময়োপযোগী হইবে।

দুই ঃ উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ-এর প্রসংগ

খাদীজা (রা) ও ওয়ারাকা ইবন নাওফাল-এর চাচাত ভাই 'উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ কুরায়শ গোত্রের মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিমান ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন।[20] অন্যান্যদের মত তিনিও সত্যানুসন্ধানের জন্য সফর করেন এবং সিরিয়ায় গমন করিয়া সেখানে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তবে তাহার খৃস্টধর্মের দীক্ষা গ্রহণ কোন স্বার্থশূন্য ছিল না। তিনি মক্কার শাসক হইবার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহাতে বায়যান্টীয় শক্তির সাহায্যে মক্কার শাসন ক্ষমতা হাতে লইয়া ইহার অধিবাসীদিগকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিতে পারেন।[21] ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে তিনি বায়যান্টীয় শাসনকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার জন্য তৎকর্তৃক মক্কা অবরোধের এবং মক্কাবাসী কর্তৃক তাহাকে কর প্রেরণের ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, মক্কাবাসিগণ যদি এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে সম্মত না হয় তাহা হইলে বায়যান্টীয় শাসক কর্তৃক সিরিয়ার সহিত মক্কার বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হইবে।[22] বায়যান্টীয় শাসক স্বাভাবিকভাবে এই পরিকল্পনায় একটি সুযোগের সন্ধান দেখিতে পান, যাহাতে আরবের হৃদয় হিসাবে পরিচিত এবং বাণিজ্যিকভাবে সমৃদ্ধ ও ধর্মীয় দিক দিয়া কেন্দ্রীয় নগরী মক্কাকে করতলগত করিয়া ইহাকে গাস্সানীয় রাজ্যের মত একটি করদ রাজ্যে পরিণত করিতে পারিবেন। তাহার উদ্দেশ্য সাধনে একটি সহজ পথ হিসাবে এই পরিকল্পনা তাহার অন্তরকে নাড়া

দিতে পারিয়াছিল। কারণ ত্রিশ বৎসর পূর্বে মক্কা বিজয়ের জন্য আবরাহার সামরিক বাহিনী ব্যর্থ হইয়াছিল। তদনুযায়ী বায়যান্টীয় শাসক উছমানকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন[২৩] এবং ইহার অধিবাসীদিগকে তাহার বশ্যতা স্বীকারের জন্য পত্র প্রেরণ করেন।[২৪]

উছমান সিরিয়া হইতে এই ক্ষমতা লাভ করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং কুরায়শদিগকে তাহাদের শাসক হিসাবে তাহাকে মানিয়া লওয়ার নির্দেশ জারী করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাহারা যদি ইহা মানিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে বায়যান্টীয় শাসক কর্তৃক সিরিয়ার সহিত বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইবে।[২৫] মক্কাবাসিগণ সর্বজনীনভাবে এই দাবির বিরোধিতা করে এবং তাহার গোত্রভুক্ত জনৈক আসওয়াদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা[২৬] এই বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমগ্র কুরায়শ শাখাগোত্রগুলিকে বিরোধিতা করিবার জন্য সংগঠিত করেন। এইভাবে স্বীয় সমর্থন লাভে ব্যর্থ হইয়া উছমান সিরিয়ায় পালাইয়া যাইতে বাধ্য হন। তিনি তবুও তাহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হতোদ্যম না হইয়া সিরিয়ার বায়যান্টীয় কর্তৃপক্ষকে সিরিয়ার সহিত মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য উসকানি দিতে থাকেন। অতঃপর মক্কার দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সাঈদ ইবনুল আসী ইব্ন উমায়্যা ও আবূ যে'ব (অর্থাৎ হিশাম ইব্ন শু'বাহ ইব্ন আবদুল্লাহ) সিরিয়া গমন করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। আবূ যে'ব জেলখানায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরায়শ নেতা আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা সিরিয়া গমন করেন এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সাঈদকে মুক্ত করিতে সক্ষম হন। আল-ওয়ালীদ-এর কূটনৈতিক তৎপরতা এবং আরবদের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখিবার বায়যান্টীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে উছমানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া যায় এবং অল্পকাল পরেই তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। একটি তথ্য অনুযায়ী আমর ইব্ন জাফনা আল-গাস্সানী তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এই আমর ছিল বায়যান্টীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত একজন অফিসার যাহাকে মক্কাবাসীদের বাণিজ্য অবরোধ ও মক্কার ব্যবসায়ীদের কারাগারে আটক করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[২৭]

এইভাবে উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ-এর ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা অবশ্যই ফিজার যুদ্ধের পরের ঘটনা এবং খুব সম্ভব কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণের নিকটবর্তী সময়ে ইহা ঘটিয়া থাকিবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সের সময় কা'বাঘর পুনঃনির্মিত হয়। মক্কায় একটি কেন্দ্রীয় ও সিদ্ধান্তদানক্ষম কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে উছমানকে এইরূপ উচ্চাভিলাসী পদক্ষেপ গ্রহণে সম্ভবত প্ররোচিত করিয়াছিল। তাহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হয় যে, সেই সময়ে মক্কার শাসনব্যবস্থা যাহাই থাকুক না কেন এবং আন্ত-গোত্রীয় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি যেমনই হউক না কেন, কুরায়শ বংশ কোন বৈদেশিক হস্তক্ষেপ হইতে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার মূল বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করিত।

এই ঘটনা প্রসংগে প্রাচ্যবিদগণ বেশ কিছু সংখ্যক ধারণা পোষণ করিয়া লয়। ওয়াট ইসলামের উত্থানকে মক্কার রাজনীতি ও উচ্চ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করিতে পছন্দ করেন। তিনি দুইটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র বায়যান্টীয় ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে মক্কার নিরপেক্ষতার নীতিকে এই বিষয়টির সহিত সম্পৃক্ত করেন। তিনি বলেন, অন্যান্য কারণ থাকা সত্ত্বেও মক্কাবাসিগণ উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তাহারা মনে করে যে, তাহাদের নিরপেক্ষতার নীতি হইতে সরিয়া আসা বিজ্ঞজনোচিত হইবে না।[২৮] ওয়াটের নিরপেক্ষতার তত্ত্বের সামগ্রিকভাবে অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে শুধু এইটুকুই যোগ করা যাইতে পারে যে, অপর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র পারস্য সাম্রাজ্য মক্কাকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। তাই এই দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের প্রশ্ন বর্তমান ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না। উছমান-এর অভিসন্দির বিপক্ষে মক্কার বিরুদ্ধতার সাধারণ কারণ উছমানের জ্ঞাতি আসওয়াদ-এর মতে, মক্কার স্বাধীন সত্তা। মক্কা কখনও এইরূপ কোন বাদশাহর অধীনে শাসিত হয় নাই এবং এইরূপ কোন অধীনতা মানিয়া লয় নাই।[২৯] দুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের বিষয়টির সহিত মক্কা কর্তৃক উছমানের প্রতারণাপূর্ণ দাবি প্রত্যাখ্যানকে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না, যখন সে একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে পরিত্যাগ ও একটি বৈদেশিক শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিল। এই অসৎ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এমন ছিল যে, সে কেবল মক্কার শাসকই হইবে না, সেখানকার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পরিবর্তে খৃস্টধর্মের প্রচলন করিবে। যদি তাহার ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ নাও করিত এবং এমনকি বিদেশী অনুচর হিসাবে কাজ করিত, তবুও মক্কাবাসীদের প্রতিক্রিয়া একই রকম হইত।

ওয়াট হিলফুল ফুযূল সম্পর্কে তাহার তত্ত্বের সহিত এই ঘটনার একটি যোগসূত্র সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই তিনি বলেন যে, হিল্‌ফ-এর বাহিরে যদি বনূ উমায়্যা ও বনূ মাখযূম গোত্র উছমান-এর বিরোধিতা করিবার জন্য আগাইয়া আসিত তাহা হইলে "ইহা ফুযূলের মৈত্রীবদ্ধতাকে মহাজীবন দান করিতে পারিত"। কিন্তু "নেতৃত্বদানের জন্য আসাদ গোত্রের একজন সদস্যকে পাওয়ার ফলে এইরূপ একটি পরিণতি এড়ান গিয়াছিল"।[৩০] কোন উৎস গ্রন্থের সমর্থন ছাড়াই ইহা সম্পূর্ণ একটি অনুমান মাত্র। হিলফুল ফুযূল শুরু হইতেই দুর্বল ও অকার্যকর এইরূপ ধারণা ছিল সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিপূর্ণ। এই ধারণার ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হইয়াছে।[৩১] উছমানের নিজের গোত্র বনূ আসাদ অবশ্যই হিল্‌ফ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু উৎস গ্রন্থাদিতে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, এই দলের স্বার্থে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। হিল্‌ফভুক্ত অন্যান্য গোত্রসমূহ তাহাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটাইবার জন্য তাহার এই প্রচেষ্টাকে কোনভাবেই বিবেচনাপ্রসূত বলিয়া দেখে নাই অথবা উৎস গ্রন্থাদিতে এমন কোন ইঙ্গিত নাই যে, উমায়্যা ও মাখযূমের মত গোত্রসমূহ হিল্‌ফের সহিত তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আলোকে বিষয়টিকে বিবেচনা করিয়াছে এবং তাহা ছাড়া উছমানের বিরোধিতা করিবার জন্য বনূ আসাদ গোত্রের কাহাকেও অগ্রণী

ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে পাওয়ার কোন চেষ্টা করে নাই। যদি ঘটনাটি হিল্‌ফ ও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির কোন বিষয় হইত তাহা হইলে ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না যে, বনূ আসাদ গোত্রের আল-আসওয়াদ ইব্‌ন আসাদ-এর মত একজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি তাহার গোত্রীয় স্বার্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হইবেন এবং তাহার পরিবর্তে বিপক্ষ দলের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হইবেন। অধিকন্তু ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, তাহার স্বীয় গোত্রের অন্যান্য নেতৃবর্গও তাহাকে ঐ ভূমিকা পালনের জন্য সমর্থন দান করিবেন। ওয়াট ঘটনাটির এইসব দিক উপেক্ষা করিয়া একটি অনুমানের উপর আরেকটি অনুমান দাঁড় করাইয়াছেন। এই সকল অনুমান এইরূপ ধরিয়া লওয়া ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, হিল্‌ফ-এর নেতৃবর্গ তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ছল-চাতুরী যেন না বুঝিবার মত যথেষ্ট পরিমাণে বোকা ছিলেন। তবে যাহাই ঘটুক না কেন—বনূ মাখযূম ও বনূ উমায়্যার লোকেরা এই ঘটনার বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পর্দার অন্তরালে ছিল—ওয়াট-এর এই প্রাথমিক ধারণা ছিল ভ্রান্ত। কারণ বনূ মাখযূম গোত্রের অধিপতি আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার চূড়ান্ত দৃশ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং তিনিই উছমানের পতন ঘটান।

এই প্রসংগে তৃতীয় অনুমানটি মূলত মারগোলিয়থের সৃষ্ট এবং পরবর্তীতে ওয়াট ইহা গ্রহণ করেন। ইহা এইরূপ যে, উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ-এর ঘটনার প্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ ﷺ তাহার খৃস্টধর্ম অথবা ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণের ফলে যে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল সে সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) এইরূপ রাজনৈতিক জটিলতামুক্ত এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের ধর্ম প্রচলনে আগাইয়া আসেন। স্পষ্টতই এইরূপ ধারণার আর একটি ভিত্তি পাওয়া যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ নবী হওয়ার জন্য সচেতনভাবে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের ত্রুটি সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩২] ইহা ছাড়া ওয়াটের এই ব্যাখ্যা আর একটি প্রতারণাদোষে দুষ্ট। ইহা এইরূপ অর্থ প্রকাশ যে, সেই সময়কার খৃস্টধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে একশ্বরবাদের প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি ধর্মের ভূমিকা তাহা ছিল না এবং সত্য অনুসন্ধানকারীদের আচরণের মাধ্যমে ইহা বিস্তারিত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দুইটি ধর্মের সত্যতা অনুসন্ধানকারীদের অধিকাংশই কোন সন্তোষজনক ফলাফল লাভ করিতে না পারিয়া ইহাদের কোনটিকেই গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকে। এই তথ্য প্রমাণ করে যে, খৃস্টধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্মের বিকল্প—এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের কোন ধর্ম প্রচারের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ -কে রাজনৈতিক বিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ওয়াটের বর্ণনা মোতাবেক ইসলাম শুধু আরবদের নিকট কোন বিকল্প এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের ধর্মমাত্র ছিল না, যাহা খৃস্টধর্ম ও ইয়াহূদীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা হারাইয়া আসিয়াছে।[৩৩]

অনুবাদ ঃ আবু মুহম্মদ

তথ্যসূত্র

১. প্রাগুক্ত বরাত, পরিচ্ছেদ ৮।

২. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ৯ ও ১০।

৩. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২২২-২২৩।

৪. ঐ, পৃ. ২২২।

৫. ওয়ারাকার জন্য দেখুন, ঐ, পৃ. ২২৩; ইব্‌ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ৫৯; আল-মাসউদী, মুরূজ, ১খ, পৃ. ৭৩।

৬. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২২৩-২২৪।

৭. তাহার জন্য দেখুন, একই পুস্তকের একই পরিচ্ছেদ, পৃ. ২২৪-২৩২; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ৫৬৯-৫৭০, নং ২৯২৩; আল-ইসতী'আব, ২খ., পৃ. ৬১৪ , নং ৯৮২; কিতাবুল আগানী, ২খ., পৃ. ১৩৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০১।

৯. তাহার জন্য দ্র. ইব্‌ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ., পৃ. ৪৫৯ এবং কিতাবুল আগানী, ৩খ., পৃ. ১৭ প.।

১০. উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২০৭, নং ৩০৬৪; আরও দ্র. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৬০, কা'বা শরীফের উপর আবরাহার আক্রমণ প্রসংগে উদ্ধৃত কবিতার কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। আল-মাস'উদীর মুরূজ, ১খ., পৃ. ৭০-৭১ (দারুল আন্দালুস বৈরূত ১৯৮৩ খৃ. সং. পৃ. ৮৪)-এ তাহার কিছু সংখ্যক কবিতার চরণের উদ্ধৃতি আছে। ইহার একটি চরণের এইরূপ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ . مَنْ لَمْ يَقُلْهَا فَنَفْسُهُ ظَلَمَا .

১১. কিতাবুল আগানী, ৩খ., পৃ. ১৮৭।

১২. মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ., পৃ. ১১১, ১১৪; মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাব ৫৩, হাদীছ নং ৩৭৪, পৃ. ৮৩২; নববী, ৪খ., পৃ. ১১৪-১১৫; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২১০; আল-ইসতীয়াব, ১খ., পৃ. ১১৯২-১১৯৪, হাদীছ নং ১৯৩৬।

১৩. আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ১৮২-১৮৩, নং ৪০৬১।

১৪. আল-ইসতী'আব, ৪খ., পৃ. ১৫১৪, নং ২৬৪৮।

১৫. ইব্‌ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ (সম্পা. ছারওয়াত উকাশা), কায়রো, তা. বি., ৫৮-৬৮; আল-মাস'উদী, মুরূজ, ১খ. (সম্পা. এম.এম. আবদুল হামীদ), বৈরূত, তা. বি., পৃ. ৬৭-৬৯।

১৬. ইব্‌ন সাদ, ৪খ., পৃ. ৩৮৩-৩৮৫।

১৭. ইব্‌ন কুতায়বা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬১; আল-মাস'উদী, মুরূজ, ১খ., পৃ. ৬৯, ৭৪, ৭৫।

১৮. মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫খ., পৃ. ১৭৪; আল-ইসতী'আব, ১খ., পৃ. ২৫২-২৫৬।

১৯. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২১৪-২২২; আয-যাহাবী, সিয়ার, ১খ., পৃ. ৫০৫-৫৫৭।

২০. আল-ফাসী, আল-ইকদুছ-ছামীন ইত্যাদি, ১খ., পৃ. ১৫৩।

২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব আল-বাগদাদী, কিতাবুল মুনাম্মিক ফী আখবার কুরায়শ, সম্পা. খুরশিদ আহমাদ ফারিক, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১৫৪।

২২. সুহায়লী, আল-রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ২৫৫।

২৩. পূর্বোক্ত বরাত।

২৪. প্রাগুক্ত, আরও দ্র. আল-ফাসী, পূর্বোক্ত।

২৫. পূর্বোক্ত বরাত।

২৬. তিনি উছমানের চাচা হন। তবে আল-ফাসী ঐ বিরোধিতাকারী ব্যক্তিকে আবূ জাম'আহ নামে অভিহিত করিয়া উছমান-এর চাচাত ভাই হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

২৭. সুহায়লী, পূর্বোক্ত।

২৮. ওয়াট, এম. এট এম. পৃ. ১৬।

২৯. সুহায়লী, পূর্বোক্ত।

৩০. ওয়াট, এম, এট এম, ১৬।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮।

৩২. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১০।

৩৩. ওয়াট, Muhamad's Mecca, পৃ. ৩৮।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রাচ্যবিদগণ ও হানীফ সম্প্রদায়

১. জেফারি-বেল তত্ত্ব

এক ঃ তত্ত্বের সারসংক্ষেপ

প্রাচ্যবিদগণের একটি অবিরাম প্রচেষ্টা হইতেছে ইসলামের উত্থানকে সমসাময়িক অবস্থার সহিত সম্পর্কিত করিয়া দেখান যে, মুহাম্মাদ ﷺ বিভিন্ন উৎস হইতে তথ্য ও ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাই হানীফ সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে প্রাচ্যবিদগণের মনোযোগ খুব বেশী আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে লিখিতে বসিয়া এ্যালয় স্প্রেংগার (Aloy Sprenger) মত প্রকাশ করেন যে, ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বেকার আরবদেশে হানীফ সম্প্রদায়ের একটি অংশ এক ব্যাপক ভিত্তিক ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করে এবং মুহাম্মাদ ﷺ নিজকে শুধু এই আন্দোলনের পুরোভাগে স্থাপিত করেন। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করেন।[১] এইরূপ চরম মতামত খুব শীঘ্রই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ইগনায গোল্ডযিহার (Ignaz Goldziher) ছিলেন প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের অন্যতম। তিনি স্প্রেংগারের ভুলগুলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হানীফগণ কোন সংগঠিত দল ছিল না, বরং তাহারা ছিল কিছু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র।[২]

উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে এবং বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রাথমিক পর্বে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন। তাহারা 'হানীফ'-এর শব্দ প্রকরণের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন।[৩] কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ মত প্রচলিত ছিল যে, হানীফ শব্দটির হিব্রু ভাষার 'হানেফ' শব্দের সহিত সম্পৃক্ততা থাকিতে পারে। হানেফ শব্দের অর্থ অপবিত্র। তবে শব্দটির মূল যাহাই হউক না কেন সাধারণ প্রামাণ্য বিষয় হইতে কোন লক্ষণীয় ব্যতিক্রম দেখা যায় না যে, মুহাম্মাদ ﷺ হানীফ সম্প্রদায় কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন। ১৯০৭ সালে R. A. Nicholson -এর নিবন্ধে এই প্রচলিত ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি বলেন, "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, হানীফিয়্যা সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মুহাম্মাদ-এর সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া তিনি তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং ইহাদের নিকট হইতে তিনি প্রথম উদ্দীপনা লাভ করিয়া থাকিবেন"।[৪]

বিষয়টির বুৎপত্তি সংক্রান্ত অর্থ আর্থার জেফারী'র (Arthur Jeffery) নিবন্ধ The Foreign Vocabulary of the Qur'an-এর অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে।[৫] তিনি বলেন, হানীফ শব্দটি প্রাচীন সিরীয় ভাষার 'হানপা' শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ "ধর্মহীন অখৃষ্টান"। তিনি আরও বলেন, কুরআনে হানীফ শব্দটি প্রধানত ইবরাহীমের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইবরাহীম

(আ) মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনধারার এক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেমন মুহাম্মাদ ﷺ দাবি করেন যে, তাঁহার শিক্ষা ইয়াহূদী ধর্ম অথবা খৃস্টধর্মের বহু পূর্বে অবতীর্ণ ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত হইতে আসিয়াছে এবং তিনি মিল্লাত ইবরাহীমের ধর্মকেই পুনর্বাসিত করিতেছেন।[৬]

এই গবেষণা সন্দর্ভটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইহা অনুসরণ করিয়া রিচার্ড বেল The Moslem World[৭] পত্রিকায় আরেকটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্ব প্রধানত জেফারি'র নিবন্ধে উল্লিখিত পরোক্ষ ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত এবং তিনি ইহাকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনধারায় কোন এক পর্যায়ে ইবরাহীম-এর ক্রিয়াকলাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বেল-এর মন্তব্য ঃ "আমার মনে হয়, সংক্ষিপ্ত হইলেও আমরা সম্পূর্ণ গুপ্ত তথ্য জানিতে পারিয়াছি"।[৮] এই গুপ্ত তথ্যটি নিম্নরূপ ঃ তিনি প্রথমে শব্দটির উৎস সম্পর্কে জেফারি'র ধারণাকে এই বলিয়া সংশোধন করিয়াছেন যে, "হানীফ" (hanif) শব্দটির দ্বিতীয় শব্দাংশের (syllable) দীর্ঘ স্বরবর্ণটিকে যদি প্রাচীন সিরিয়ার ভাষায় এক বচনে ব্যবহৃত হানপা (hanpa) শব্দটি হইতে প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে মারাত্মক ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু আরবী ভাষায় বহুবচনে ব্যবহৃত হুনাফা শব্দটি প্রাচীন সিরীয় ভাষার বহুবচন হানেফে (hanephe) শব্দের একটি পুনর্গঠন মাত্র। অতঃপর বেল মত প্রকাশ করেন যে, শব্দটি বহুবচনে অন্য ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আরবী ভাষার ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী বহুবচন হইতে একবচন হানীফ-এ উল্টাইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সিরীয় ভাষাভাষী খৃস্টানগণ অধর্মান্তরিত আরবদের বুঝাইবার জন্য হানেফ শব্দটি ব্যবহার করিত। অতএব "আরববাসিগণ হইতেছে হুনাফা যাহারা ইয়াহূদীও নয়, খৃস্টানও নয়, কিন্তু প্রাচীন দেশীয় ধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিত"।[৯]

এইভাবে শব্দটির উৎপত্তি ও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বেল উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ বহু ঈশ্বরবাদের বিরোধিতার বিষয়টি প্রচারে ইহা ব্যবহার করিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইয়াহূদীদের সহিত ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে যে মক্কা নগরী একদা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা নগরীকে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। বেল যুক্তি পেশ করেন যে, যদিও মহানবী ﷺ ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্টধর্ম হইতে প্রথমদিকে বেশ কিছু উপদেশ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার মদীনায় আসার পর কিছু নির্দিষ্ট কারণে ইয়াহূদীদের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়।[১০] অতঃপর তিনি এই উভয় ধর্মের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে জেরুসালেম হইতে মক্কায় কিবলা পরিবর্তন করেন এবং তারপর ঘোষণা দান করেন যে, আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ মূলত একই ছিল, "কিন্তু কালক্রমে ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় উভয়ই পবিত্র বিশ্বাস হইতে সরিয়া আসিয়া নিজস্ব পথে পরিচালিত হয়"।[১১] বেল তাহার বর্ণনার সহিত আরও সংযোজন করিয়া বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ -কে আর একটি ধর্ম কাজে লাগাইতে হয়। তাহা হইতেছে, "আরবদের ধর্ম অথবা সেই

সকল লোকের ভাষা যাহাদের নিকট হইতে তিনি তখন পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়ে তথ্য আহরণ করেন। এই সকল লোক হইতেছে 'হুনাফা'। তাহা অবশ্যই প্রথম যুগীয় খাঁটি ধর্মের বিচ্যুতি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং যেহেতু আবরাহাম (ইবরাহীম আ) তাঁহার পুত্র ইশমায়েল (ইসমাঈল আ)-এর মাধ্যমে আরবদের পূর্বপুরুষ হিসাবে পরিগণিত তাই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহাকে হুনাফাদের ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে গ্রহণ করেন"। কিন্তু তিনি সতর্কতার সহিত আরও যোগ করেন যে, তিনি বহু ঈশ্বরবাদীদের একজন নহেন এবং তিনি যে হানীফ ধর্মের প্রবর্তন করেন, তাহা অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মের ন্যায় একটি বিশুদ্ধ এক আল্লাহ্র ইবাদতের ধর্ম। এইরূপ যুক্তি উপস্থাপন করিয়া বেল বলেন, "আবরাহাম যেহেতু ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্টধর্ম উভয় হইতে পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করেন, তাই এই দুই ধর্ম হইতে তাঁহার ধর্ম অধিকতর বিশুদ্ধ...। এই সেই ধর্ম যাহাকে মুহাম্মাদ নিজে গ্রহণ করিয়া পুনঃঅধিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রচার শুরু করেন। তিনি তাঁহার মুখমণ্ডল এখন হইতে ইয়াহূদী ধর্ম বা খৃস্টধর্মের দিকে নহে, বরং আরবদের পবিত্র মূল ধর্মের দিকে স্থির করেন"। অতঃপর বেল এইভাবে উপসংহার টানেন যে, "হানীফ সম্প্রদায়ই আরব ধর্মের মূল আদর্শের অনুসারী। তাহারা ইতিহাসখ্যাত লোকদের কোন ক্ষুদ্র গোত্র বা উপদল ছিল না, বরং তাহারা ছিল মুহাম্মাদ ﷺ -এর অশান্ত মনের ফসল"।[১২]

হানিফিয়্যা সম্প্রদায় একটি সংগঠিত উপদল যাহারা আল্লাহ্র একত্ববাদের পক্ষে একটি আন্দোলন শুরু করেন—অনুমানের এই সর্বোচ্চ সীমা হইতে শুরু করিয়া অনুমান ও ধারণার প্রায় শতাব্দী কালব্যাপী ইহা সর্বনিম্ন সীমায় পৌঁছে। তারপর উল্লেখ করা হয় হানিফিয়্যা সম্প্রদায় কোন ইতিহাস খ্যাত উপদল বা গোত্র ছিল না, বরং শুধু আরব ধর্মের আদর্শ উৎসের কাল্পনিক অনুসারী ছিল এবং তাহা ছিল মুহাম্মাদ-এর অশান্ত চিত্তের সৃষ্ট ফসল। এই অনুমান ব্যতিরেকে বেল-এর প্রধান মতামতসমূহ হইতেছে—(ক) যেহেতু হানীফ পরিভাষা প্রাচীন সিরীয় ভাষার বহুবচনে ব্যবহৃত হানেফে শব্দ হইতে হইয়াছে; (খ) যেহেতু প্রাচীন সিরীয় ভাষাভাষী খৃস্টানগণ যে অর্থে আরববাসীরা "প্রাচীন স্থানীয় ধর্ম" অনুসরণ করিত সেই অর্থে আরবগণ শব্দের ব্যবহার করে; (গ) যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায় হইতে বাহির হইয়া গিয়া যখন এই পরিভাষাটি গ্রহণ করেন সেহেতু তিনি ইহার উপর বহু ঈশ্বরবাদের বৈপরীত্যের ধারণা আরোপ করেন। তিনি তাঁহার ধর্মীয় উপদেশসমূহকে আরববাসীদের মূল ধর্মের ধরিয়া লওয়া উৎসের সহিত চিহ্নিত করেন। আরবদের পূর্বপুরুষ আবরাহাম ও ইসমাঈলের মাধ্যমে যে ধর্মের প্রবর্তন করেন, তিনি তাহার সহিত স্বীয় প্রবর্তিত ধর্মীয় ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করিয়া অধিকতর গুরুত্বারোপ করেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ মূলত একই ছিল। হানীফিয়্যা সম্প্রদায় সম্পর্কে ওয়াট যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রধানত জেফারি-বেল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত। এইরূপ পর্যালোচনার পূর্বে জেফারি-বেল তত্ত্বের অবস্থানকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

দুই ঃ জেফারী-বেল তত্ত্বের অসমর্থনযোগ্যতা

শুরুতেই ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হানীফ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিবরণীসমূহ ধ্বনিত রঙ্গের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত। তাই স্পষ্টভাবে ইহা অনুমান নির্ভর এবং কেবল পরীক্ষামূলক। বস্তুত বেল কর্তৃক জেফারীর মতামতকে সমর্থনের খুব বেশী পরে নয় দুইজন পণ্ডিত যুগ্মভাবে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া উহাতে আলোচনা করেন যে, শব্দটির প্রয়োগ ইসলাম-পূর্ব যুগের এবং তাহার মতে প্রাচীন সিরিয়ার ও আরামীয়-নাবাতীয় ভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে।[১৩] তখন হইতে শব্দটির উৎপত্তি লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহারা ইহাকে কখনও প্রাচীন সিরিয়ার আবার কখনও প্রাচীন নাবাতীয় ভাষার বলিয়া অনুমান করেন।[১৪]

শব্দটির উৎপত্তির বিষয়টি বর্তমান আলোচনার সহিত সরাসরি সম্পৃক্ততা খুবই কম বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ইহা সুবিদিত যে, কোন শব্দের অর্থ, স্থান ও কাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আমাদের বর্তমান সময়ের একটি অতি শিক্ষামূলক উদাহরণ হইতেছে 'গণতন্ত্র' শব্দের প্রয়োগ। কম্যুনিস্ট ব্লকে ইহার অর্থ হইতেছে একটি সমাজতান্ত্রিক সর্ববিষয় নিয়ন্ত্রণকারী প্রথা। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্লকে ইহা সর্ববিষয় নিয়ন্ত্রণকারী প্রথার বিপরীত। অতঃপর ইহা যদি প্রদর্শন করাও হয় যে, প্রাচীন সিরীয় ভাষাভাষী খৃস্টানগণ ধর্মহীন অসভ্য ব্যক্তি হিসাবে হানপা শব্দটিকে ব্যবহার করিত অথবা প্রাচীন স্থানীয় ধর্মের অনুসারী আরবগণ কর্তৃক শব্দটি ব্যবহৃত হইত, তবুও ইহা অপরিহার্যভাবে এই অর্থ করে না যে, আরবগণ একই ভাবার্থে আরবী শব্দ হানীফকে ব্যবহার করিত, যদিও হানপা শব্দ হইতে হানীফ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী ভাষা হইতে উদ্ভূত হওয়ার তত্ত্ব প্রশ্নের জন্ম দেয়, কখন এই আহরণের ঘটনা ঘটে? সাধারণভাবে মতামতটি এমন হইবে যে, এই দৃশ্যপটে মুহাম্মাদ ﷺ -এর অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই ইহা ঘটিয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে শব্দটি বহু পূর্ব হইতে আরবদেশে প্রচলিত ছিল এবং ইহা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদের বেলায় প্রযোজ্য হইত। বিষয়টি ইহা হইলে এইরূপ ধারণা করা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে শুধু বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং একজন একেশ্বরবাদীর একেবারে বিপরীত অর্থে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকিবেন? অধিকন্তু শব্দটির এইরূপ অভিনব ব্যবহার কি তাঁহার স্বীয় লোকদের বিরোধিতা ও সমালোচনা করিতে আহ্বান করিবে না? এই বিষয়ে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, যদিও তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যটির পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু বেল মনে করেন যে, শব্দটি কুরআনে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় এবং প্রাচীন সিরীয়ভাষী খৃস্টানগণ কর্তৃক যে অর্থে ইহার ব্যবহার হইত উহার বিপরীত অর্থে কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ বেল-এর বর্ণনামতে মুহাম্মাদ ﷺ "যাহাদের নিকট হইতে তথ্য আহরণ করিতেন তাহাদের ভাষা" হইতে এই শব্দটি গ্রহণ করেন। ইহাই কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, যখন তিনি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের

সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছেন তখনও তিনি তাহাদের ব্যবহৃত শব্দই ব্যবহার করিবেন, যদিও আরবদের নিকট ইহা ব্যবহৃত বা বোধগম্য হইত না?

প্রকৃত তথ্য এই যে, একজন একেশ্বরবাদীর ভাবধারায় সেই সময়ে আরবে হানীফ শব্দটির স্পষ্ট প্রচলন ছিল। এমনকি বেল-এর নিজস্ব যুক্তিতর্কের বেলায়ও ইহাকে একটি অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ প্রাচীন সিরীয়ভাষী খৃস্টানগণ যদি আরবদের বুঝাইতে এই পদ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বেল-এর স্বীকৃতিমতে যদি আবরাহাম আরবদের পূর্বপুরুষ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাদের প্রাচীন ও স্থানীয় ধর্ম একেশ্বরবাদ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। কারণ বংশের আদিপুরুষ ইবরাহীম ঐশী আদেশ অনুসরণ করিয়া একটি ধর্ম প্রচার করেন এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মতানুসারে সেই ধর্ম হইতেছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। স্বাভাবিকভাবে তাহা ছিল আরবদের প্রাচীন ও স্থানীয় ধর্ম। হানীফ শব্দটির এই অর্থ বিলম্বে হইলেও বেল-এর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ওয়াট কর্তৃক স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। ওয়াট স্বীকার করেন যে, কিছু সংখ্যক প্রাচীন আরামীয় এলাকায় পদটির প্রাথমিক অর্থ ধর্মহীন অথবা নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী হইলেও অপ্রধান অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই অপ্রধান অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্থে দার্শনিক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বুঝান হইয়াছে যাহারা অপরিহার্যভাবে একেশ্বরবাদী ছিল। তিনি আরও বলেন যে, কুরআনে ব্যবহৃত শব্দটিতে এই প্রধান অর্থকে অবহেলা করা হইয়াছে এবং অন্যত্র অপরিচিত নয় এইরূপ শব্দার্থ বিদ্যাগত পদ্ধতি শব্দটির দ্বিতীয় অর্থে ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে....।[১৫] এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাহাকে প্রধান অর্থ বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে কুরআনে তাহাকে অবহেলা করা হয় নাই এবং শব্দটির অপ্রধান অর্থ তৈয়ারীতেও কোন ভূমিকা পালন করে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে আরববাসিগণ যে অর্থে শব্দটি বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে থাকে এখানে সেই অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়।

শব্দটির উৎপত্তি ও অর্থের প্রশ্নটি ব্যতিরেকে জেফারী-বেল তত্ত্বের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ তাহাদের তত্ত্ব অনুযায়ী মহানবী ﷺ মদীনায় হিজরত করিবার পর ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মমতের ও হানীফিয়্যার সহিত তাহার ধর্মীয় শিক্ষাকে সম্পর্কিত করেন, বিশেষ করিয়া মদীনায় ইয়াহূদীদের সহিত তাহার মতপার্থক্য সৃষ্টি হইবার পর তিনি এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সূত্র হইতেছে 'কুরআন মহানবীর নিজস্ব সৃষ্টি'। এই মতামত আদৌ সত্য নয়। ইহাও সত্য নয় যেমন পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ মক্কায় ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে তথ্য আহরণ করিয়া তাঁহার মতবাদ তৈয়ারী করেন। তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যেমন মক্কায় তাহাদের নিকট হইতে কোন তথ্য আহরণ করেন নাই, তেমনি মদীনাতে ইবরাহীমের ধর্মমত ও হানীফিয়্যার উপরও নির্ভর করেন নাই।

কুরআনের তিনটি স্পষ্ট ঘটনা পরবর্তী ধারণার বিরোধিতা করে। প্রথমে ইবরাহীম (আ)-এর বাণী এবং প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী সকল নবীর বাণীর সহিত পরিচিতির প্রসংগ ও ঘোষণা সর্বপ্রথম

মদীনাতে নয়, মক্কাতেই অনেক পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছিল। কুরআনের বেশ কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ এই তথ্যের সত্যতা প্রতিপাদন করে। এই মক্কাতেই মহানবী পূর্ববর্তী সকল নবী কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মীয় বাণীর সাধারণ উৎস ও আবশ্যকীয় পরিচিতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে ইবরাহীমের পূর্বে আগত নবী, যেমন নূহ ও আদমও রহিয়াছেন। ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মুহাম্মাদ নিশ্চিতভাবে দাবি করেন যে, সকল নবীর উপর আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ একই ছিল। তারপর আরও দাবি করেন যে, তাঁহার বাণীর উৎস হইতেছে ইবরাহীম (আ) এবং ইহাতে এই দাবির পূর্ববর্তীতা ও এক আল্লাহ্র ইবাদতের অধিকতর বিশুদ্ধতা স্বীকার করিতে গিয়া একটি সুস্পষ্ট অসঙ্গতির উপাদান পরিলক্ষিত হইবে। বেলও অনুরূপ মত পোষণ করেন। দ্বিতীয়ত, মদীনায় হিজরতের বহু পূর্বে এই মক্কাতেই ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্টধর্মের মৌলিক তত্ত্বসমূহের ব্যতিক্রম সাধিত হয়। তৃতীয়, কুরআনের মক্কার ঘটনাবলীতে প্রথম হানীফের প্রসংগ দেখিতে পাওয়া যায়। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ ইবরাহীম (আ)-কে হানীফ হিসাবে উল্লেখ করায় ইহা স্পষ্ট যে, মূসা ও ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহকে অবজ্ঞা করিবার কোন অভিপ্রায়ের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তেমনি সকল নবীর প্রদত্ত বাণীসমূহের একত্ব ও অভিন্নতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা হইতে সামান্যতম ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয় না।

কুরআনের প্রাসঙ্গিক আনুপূর্বিক বর্ণনাসমূহ দ্বারা উপরি উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে জেরুসালেম হইতে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে বেল মহানবী -এর ইয়াহূদীদের প্রতি পরিবর্তিত মনোভাবের একটি ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেন। কিবলা পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি অবশ্যই তাঁহার মদীনায় আগমনের পর ঘটে, তবে তাঁহার মদীনায় পৌঁছিবার ষোল কি সতর মাস পর অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ইহা ঘটে।[১৬] ইহার অর্থ বদর যুদ্ধের দুই মাসেরও বেশী পূর্বে কিবলা পরিবর্তিত হয়, আর বদর যুদ্ধ ঐ বৎসরের রমযান মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা সকলের নিকট সুবিদিত যে, বদর যুদ্ধের পর কোন এক সময় হইতে ইয়াহূদীদের সহিত মতানৈক্য শুরু হয়। অতএব কিবলা পরিবর্তনের কারণ যাহাই হউক না কেন ঐতিহাসিকভাবে ইহা প্রমাণিত করা যাইবে না যে, গৃহীত ব্যবস্থাটি ছিল ইয়াহূদীদের সহিত মতপার্থক্যের পরিণতি। যাহা হউক, ইহা যদি মহানবী -এর নিজস্ব সিদ্ধান্তের ফল হইত তাহা হইলে তিনি একটি সুবিধামত সময়ে ইহার ব্যবস্থা করিতেন। কারণ সেই সময়ে মদীনাতে তাঁহার অবস্থান তেমন সুসংহত হয় নাই এবং সেই সময় এমন কিছু করিলে তাহা ইয়াহূদীদিগকে তাঁহার বিরোধী করিয়া তুলিত। তাই তিনি বরং নূতন স্থাপিত এই রাষ্ট্রের প্রতি ইয়াহূদীদের সমর্থন ও আনুগত্য লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহা কিছু পরিমাণে হইলেও বিপক্ষে বলা হইবে যে, মহানবী মক্কাকে তাঁহার ধর্ম প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন যখন তিনি একই সময়ে মক্কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন বলিয়া বলা হইয়া থাকে। বেল অবশ্য এইরূপ ধারণা পোষণ করেন।

ক. মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে ইবরাহীম (আ)-এর পরিচয়

ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মীয় বাণী, প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী সকল নবীর বাণীতে বারংবার মক্কার প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। এই মক্কাতেই মৌলিক ঐক্য ও নবীগণের প্রদত্ত বাণীসমূহের ধারাবাহিকতার উপর সন্দেহাতীতভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে। মক্কার সমগ্র আমলে অবিশ্বাসী কুরায়শদের প্রতি সর্বদা প্ররোচনা দানের বিষয় এমন ছিল যে, পূর্বে তাহাদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের ধর্মোপদেশ প্রত্যাখ্যানের কারণে তাহাদের উপর বংশ-পরম্পরায় আল্লাহ্র অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছে। ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্র একত্ববাদের বাণী প্রচারের জন্য নবীগণের আগমন ঘটে। কুরআনের একেবারে প্রথমদিকের আয়াতসমূহের একটিতে এই তথ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং ইবরাহীম ও মূসা (আ) উভয়কেই একই বাণীর বাহক হিসাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়াতটি এইরূপ ঃ

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى . صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى .

"ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে" (৮৭ ঃ ১৮-১৯)।

আরেকটি মক্কী আয়াতে আছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ .

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর" (২১ ঃ ২৫)।

প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, তাঁহাদের প্রত্যেকের আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রচার এবং বংশ-পরম্পরায় একই ধর্মীয় বাণীর ঐক্য ও ধারাবাহিকতার বিষয় মক্কায় অবতীর্ণ একাধিক আয়াতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১৭] কখনও কখনও ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (যীশু) (আ)-এর প্রতি স্বতন্ত্র গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং ইহা এই কারণে যে, কুরআনে যাহাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে সেই সকল প্রত্যক্ষ শ্রোতা নবীগণের স্মৃতি সযত্নে হৃদয়ে লালন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও ঐতিহ্য অনুসরণকারী বলিয়া দাবি করেন। কিন্তু তাহাদের নিকট কখনও এইরূপ মত প্রকাশ করা হয় নাই যে, নবীগণের মধ্যে কাহারও ধর্মোপদেশ ও শিক্ষা অন্য যে কোন নবীর চাইতে অধিকতর বিশুদ্ধ ছিল।

যে আয়াতগুলি অত্যন্ত জোরালোভাবে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করে তাহা হইল ৬ ঃ ৮৩-৯০ আয়াত। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্র একত্ববাদের বিষয়টি ইবরাহীমের অনুসারীদের বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে যে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে উহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে সুপরিচিত নবীগণের উল্লেখ করত ধর্ম উপদেশ প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গকে নবীগণ প্রবর্তিত পথনির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আয়াতগুলি নিম্নরূপ ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ

وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ . وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ . وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ . اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ .

(৮৩) "এবং ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা আমি ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৪) আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান ও আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও, আর এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি। (৮৫) এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইল্য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম, ইহারা সকলের সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত; (৮৬) আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেকে, (৮৭) এবং ইহাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কয়েকজনকে। আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। (৮৮) ইহা আল্লাহ্র হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তাহারা যদি শির্ক করিত, তবে তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত। (৮৯) এবং উহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি, অতঃপর ইহারা যদি এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না। (৯০) উহাদিগকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের পথের অনুসরণ কর" (৬ ঃ ৮৩-৯০)।

একই মর্মের দীর্ঘ আরও কয়েকটি আয়াত হইল ঃ ২১ ঃ ৭১-৯২। ইহাতে ইবরাহীমের স্বীয় লোকদের আল্লাহ্র একত্ববাদে দীক্ষাদানের প্রচেষ্টার বিবরণের (আয়াতসমূহ ৫৩-৭০) পর বিভিন্ন নবী, যেমন ইসহাক, ইয়াকূব (জ্যাকব), লূত, নূহ, দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইসমাঈল, ইদরীস, যুল-কিফ্ল, যুননূন (ইউনুস), যাকারিয়্যা (আ)-এর একই মিশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে। এই আয়াতসমূহের শেষ অর্থাৎ ৯২ নং আয়াতে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন

বিবরণী আছে, যাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই নবীগণ একই ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী একটি একক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। আয়াতটি এইরূপ ঃ

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ .

"এই যে তোমাদিগের জাতি—ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর" (২১ ঃ ৯২)।

এইরূপে অন্যান্য নবীদের সহিত ইবরাহীমের প্রসঙ্গ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে পুনপুন আসিয়াছে। তাঁহাদের কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় নাই। এই মক্কাতেই একদিকে ইসলাম ও অন্যদিকে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্টধর্মের মৌলিক পার্থক্যসমূহ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। তাই ইয়াহূদীদের ধারণামতে যীশু নবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন ভণ্ড, প্রতারক (না'উযু বিল্লাহ)। পক্ষান্তরে খৃস্টানদের বিশ্বাস! যীশু কোন মানুষ নন, স্বয়ং স্রষ্টা তাহার মধ্যে মূর্ত। ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের এই দুই প্রকার ধারণা ইসলামে একইসাথে ও সমভাবে দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। আবার আল্লাহ্‌র পুত্র বা পুত্রগণের এই যে ধারণা, যাহা ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস তাহাও সন্দেহাতীতভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। অধিকন্তু মারইয়ামের (মেরীর) বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের দারুণ অবমাননাকর অপবাদ স্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ইয়াহূদী ও খৃস্টান এই উভয় সম্প্রদায়ের মতবাদের বিপক্ষে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, বিচার দিবসে প্রত্যেক মানুষ তাহার স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকিবে এবং তাহাকে একক ও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। এই বিচারের সময় কোন জাতি, বংশ এবং এমনকি কোন ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা প্রভৃতি কোন কিছুই কাজে আসিবে না।[১৮] এই সকল ক্ষেত্রে মদীনায় যাহা পরবর্তীতে ঘটিয়াছিল তাহা এই সকল বিষয়ের বিশদীকরণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

খ. মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহে হানীফের বর্ণনা

অনুরূপভাবে মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহে প্রথমে হানীফ প্রসঙ্গটি পাওয়া যায়। যেমন বেল উল্লেখ করেন যে, হানীফ শব্দটি কুরআনে ১২ স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০ স্থানে বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি এইরূপ ধারণা প্রদান করিতে চাহেন যে, হানীফ শব্দটির ১২ স্থানে প্রয়োগ মদীনার আয়াতসমূহের বেলায় ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এই ১২ স্থানের মধ্যে ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ৬ বার আমরা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে দেখিতে পাই। এই সূরাগুলি হইতেছে ঃ

১০ ঃ ১০৫ (সূরা ইউনূস)
১৬ ঃ ১২০ (সূরা আন্-নাহ্‌ল)
১৬ ঃ ১২৩ (সূরা আন-নাহ্‌ল)
৩০ ঃ ৩০ (সূরা আর-রূম)
৬ ঃ ৭৯ (সূরা আল-আন'আম)
৬ ঃ ১৬১ (সূরা আল-আন'আম)

কালানুক্রম অনুসারে শব্দটি সবচাইতে প্রথম ব্যবহৃত হয় সম্ভবত সূরা আর-রূম-এর ৩০ নম্বর আয়াতে (৩০ ঃ ৩০)। এই আয়াতে শির্ক বা বহু ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। কারণ ইহার পূর্ববর্তী ২০-২৯ নম্বর আয়াতসমূহে স্ত্রী-পুরুষভেদে বিভিন্ন প্রকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি তুলিয়া ধরা হইয়াছে যাহাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁহার পরম একত্ব ও কেবল তাঁহার ইবাদতের বিষয়টি আসিয়াছে। তারপর ৩০ ঃ ৩০ আয়াতে সরাসরি উপদেশ দান করা হইয়াছে, উহা এইরূপ ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া (হানীফ হিসাবে) নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।

এখানে আল্লাহ্র প্রকৃতি (ফিতরাত) বলিতে যাহা প্রায়ই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা বুঝান হয় নাই, বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে মন ও অন্তরের পবিত্রতা, বাহিরের পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত অথবা অর্জিত অভ্যাস ও মানসিকতা, নির্ভেজাল আনুগত্য ও আল্লাহ্র প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকেই বুঝান হইয়াছে। এই আয়াতের ঠিক পরবর্তী আয়াতে ইহার অর্থ আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে যেখানে কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদত, তাঁহার নিকট নিরাপত্তা ও সাহায্য চাওয়ার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে এবং একই সাথে তাঁহার কোন শরীক না করিবার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অনুরূপভাবে ১০ ঃ ১০৫ নং আয়াতের বিবরণীও প্রথমদিকের। এখানে পুনঃ বহু ঈশ্বরবাদের বিপরীতার্থক শব্দ হিসাবে হানীফের ব্যবহার হইয়াছে। আয়াতটির যথাসময়ের পূর্বকালীন তারিখ ইহার বিষয়বস্তু ও তৎসহ ইহার ঠিক পূর্বের ও পরের আয়াতসমূহে নির্দেশিত করা হইয়াছে। এইরূপে ১০ ঃ ১০৪ নম্বর আয়াতে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের ধরন সম্পর্কে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে বলা হইয়াছে। মক্কার বহু ঈশ্বরবাদীদের সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার জবাবে ইহা করা হয় এবং ১০৬ নম্বর আয়াতে হানীফের ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে। ১০ ঃ ১০৪-১০৬ নম্বর আয়াত এইভাবে আসিয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلاَ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ .

(১০৪) "বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ইবাদত কর আমি উহাদের ইবাদত করি না। পরন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ্র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। (১০৫) আর উহাও এই যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (১০৬) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করিতে পারে না, অপকারও করিতে পারে না। কারণ ইহা করিলে তখন তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে"।

উপাসনার বস্তুসমূহের, যথা দেব-দেবীর মূর্তি যাহার ভাল বা মন্দ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, প্রসংগের অবতারণা মক্কায় বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আর একটি অভ্যন্তরীণ প্রমাণ যেই কারণে এই আয়াত নাযিল হয়।

একই ভাবধারায় ও ভাষায় ৬ ঃ ৭৯ নং আয়াতে শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই সূরার এই অংশ ৭১ নং আয়াতের সহিত শুরু হইয়াছে যাহা অস্বীকৃতি বা প্রত্যাখ্যানের অর্থবোধক একটি জিজ্ঞাসা ঃ "বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদিগের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না?" পরবর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ)-এর মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ না করিবার বর্ণনা রহিয়াছে। অতঃপর ইবরাহীমের ঘোষণা ৭৯ নম্বর আয়াতে এইভাবে আসিয়াছে ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নই" (৬ ঃ ৭৯)।

এই সূরার ১৬১ নম্বর আয়াতের শেষ পর্যায়ে এই শব্দের ব্যবহার পুনঃ দৃষ্টিগোচর হয়। এইখানেও আয়াতের বিষয়বস্তু এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, ইহা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার পূর্ববর্তী ১৫৬-১৫৮ নম্বর আয়াতসমূহ বিশেষভাবে আরবদের অথবা বরং মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়। তাহাদিগকে বলা হয় যে, তাহাদের এই হিদায়াত গ্রহণ করা উচিত। কারণ তাহা হইলে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে যেমন আসমানী কিতাব দেওয়া হইয়াছে তেমনি আরববাসিগণকে কোন কিতাব দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে ওজর পেশ করা হয় তাহা আর করিতে হইবে না। তাহাদিগকে সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরও তাহারা অপেক্ষা করিতে থাকিবে যে, কোন বিশেষ নির্দশন অথবা ফেরেশতা অথবা আল্লাহ স্বয়ং তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হইবেন? ইহার অনুসরণে ১৫৯-১৬০ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, "যাহারা নিজেদের ধর্মের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করত উপদেশে পরিণত হয়" তাহাদের জন্য নবীর করণীয় কিছু নাই। আর প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মফল ভোগ করিবে। তখন ১৬১ নম্বর আয়াতে নবীকে নিম্নরূপ ঘোষণা প্রদান করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (৬ ঃ ১৬১)।

যাহারা তাহাদের স্বধর্মে বিভক্তি আনয়ন করে তাহাদের সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখের অর্থ যেমন ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং এই দুইটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে আসমানী কিতাব লাভ করিয়াছে। অথবা ইহার অর্থ সাধারণভাবে এমনও হইতে পারে যে, তাহারা নিজেদের ধর্মে নূতন কিছুর অন্তর্ভুক্তি কিংবা অন্য কোনভাবে পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। কিন্তু যদি এই পরোক্ষ ইঙ্গিত ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রতি আরোপ করা হয় তবুও ইহা মূল বিষয়বস্তুর ব্যতিক্রম কিছু হইবে না। কারণ নূতন ধর্মমতের বিপক্ষে মক্কার বিরোধিতা এমনই দাবি করে যে, মহানবী ﷺ -এর কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী ও খৃষ্টান বন্ধু তাঁহাকে যাহা শিখাইয়াছেন তিনি তাহাই ঘোষণা করেন। অতঃপর ইহা উল্লেখ করা খুবই যুক্তিসংগত হইবে যে, তাহাদের (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান) বিষয়ে মহানবী ﷺ -এর করণীয় কিছু ছিল না।

মক্কায় অবতীর্ণ অন্য দুইটি আয়াত যথা ১৬ ঃ ১২০ ও ১৬ ঃ ১২৩-এ হানীফ শব্দের উল্লেখ আছে। বস্তুত এই সূরার চারটি আয়াত একটি স্বতন্ত্র মাত্রা গঠন করিয়াছে যাহাতে পুনরায় আল্লাহ্র একত্ববাদের উপর জোর দেওয়া এবং অংশীবাদের সকল ধারাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। আয়াত চারটির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

انَّ ابْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ اجْتَبٰهُ
وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

(১২০) ইবরাহীম ছিল এক উম্মত, আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত; (১২১) সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে। (১২২) আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও, সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (১৬ ঃ ১২০-১২৩)।

মদীনার ঘটনাবলীতে যাওয়ার পূর্বে মক্কার ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রথম ও সর্বাগ্রে ইহা স্পষ্ট যে, হানীফের প্রসঙ্গ ও ইবরাহীমের ধর্মীয় বাণী মদীনায় হিজরতের বহু পূর্বে মক্কাতেই করা হয়। দ্বিতীয়, মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে সর্বমোট ছয়টি ক্ষেত্রে 'হানীফ' শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। হানীফ নামটি সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহ্র ইবাদতকারীদের বেলায় ব্যবহৃত হইয়াছে যাহারা অংশীবাদীদের সকল প্রকার ছায়াকে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তৃতীয়, ছয়টি স্থানের কমপক্ষে দুইটিতে অর্থাৎ ৩০ ঃ ৩০ ও ১০ ঃ ১০৫ নম্বর আয়াতে হানীফ শব্দটি ইবরাহীমের কোন প্রসংগ ছাড়াই ব্যবহৃত

হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, শব্দটি এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীর এক বর্গীয় ভাবধারায় ব্যবহার এবং তাহা জনগণের সাধারণ বোধগম্যতার মধ্যেই করা হয়। তাই কুরআন, অতঃপর মুহাম্মাদ একটি নূতন ও অসাধারণ ভাবধারায় হানীফ শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন—এইরূপ প্রশ্নের অবতরণা করার আবশ্যক হয় না। চতুর্থ, এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে ইবরাহীম (আ)-কে চার স্থানে যদিও উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তবুও অন্য কোন নবীকে একটি অপ্রধান অবস্থানে নামাইয়া আনার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই কিংবা ইবরাহীমের শিক্ষা হইতে তাহাদের শিক্ষাকে ভিন্নমতে দেখিবার জন্য কোন মত প্রকাশ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে ইবরাহীমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এই বোধগম্য কারণে যে, তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুসারীবৃন্দ যথা—আরব, ইয়াহূদী ও খৃস্টান তাঁহার স্মৃতিকে বিশেষভাবে লালন করে এবং একইসাথে সকল নবীর প্রদত্ত বাণীর পরিচিতি ও ধারাবহিকতা অভ্রান্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যাহা ৬ ঃ ৮৩-৯০ নম্বর আয়াতসমূহে পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে একজন হানীফ হিসাবে ইবরাহীম (আ)-এর প্রসংগ আসিয়াছে এবং উপরের বর্ণনাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ. মদীনার ঘটনাবলীতে হানীফের প্রসঙ্গ

মদীনায় যাহা ঘটে তাহা এই সকল বিষয় ও নীতিসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা মাত্র। মদীনার ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে মদীনার বিবৃতিসমূহ প্রণীত হয়। কিন্তু মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে যেভাবে আসিয়াছে ঠিক সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের উপর একইরূপ গুরুত্ব আরোপ, সকল নবী প্রদত্ত বাণীসমূহের পরিচিতি ও ধারাবাহিকতার একইরূপ পুনরুক্তি এবং হানীফ নামটির একই রূপ বর্গীয় ব্যবহার মদনীর সূরাসমূহে প্রত্যক্ষ করা যায়। মক্কার সূরাসমূহে যেমন তেমনি মদীনার সূরাগুলিতেও ছয়টির মধ্যে দুইটি স্থানে বর্গীয় ভাবধারায় হানীফ নামটি ইবরাহীম (আ)-এর প্রসঙ্গ ছাড়াই বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নের ২২ ঃ ৩০-৩১ নম্বর আয়াতে এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় ঃ

...فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ. حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ.

(৩০) "......... সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হইতে, (৩১) আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাঁহার কোন শরীক না করিয়া" (২২ ঃ ৩০-৩১)।

হানীফ নামের বর্গীয় ব্যবহার ও তৎসহ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর গুরুত্ব আরোপ এইখানে সন্দেহাতীতভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সমাপনী উক্তি "তাঁহার কোন শরীক না করিয়া" 'হুনাফা লিল্লাহি' শব্দদ্বয়ের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ মাত্র। ইবরাহীমের প্রসংগ উল্লেখ ব্যতিরেকে এই নামের অন্য বর্গীয় ব্যবহার ৯৮ ঃ ৫ সংখ্যক আয়াতে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ... .

"তাহারা তো (হুনাফা হিসাবে) আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে...."।

এখানেও পুনঃ হুনাফা শব্দ "আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে" এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অবশিষ্ট চারটি মাদানী আয়াতে হানীফ শব্দ অবশ্যই ইবরাহীমের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। তবে ইহা তো সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াহদানিয়াত-এর ভাবধারা এবং অংশীবাদের একই আপোষহীন প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট। এই চার স্থানে আসমানী কিতাবের অনুসারীদের, আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে গেলে ইয়াহূদীদের সহিত মত বিনিময়ের প্রেক্ষাপটে এই আনুপূর্বিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল আয়াতের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে আরবদের সহিত ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান—এই দাবি করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর ধর্মোপদেশের চাইতে ইবরাহীমের ধর্মীয় বাণী অধিকতর ভাল ও গুরুত্বের দিক দিয়া অধিকতর মর্যাদাবান ইহা প্রমাণের জন্য ইবরাহীমকে উদ্ধৃত করা হয় নাই; বরং আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে প্রথমত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিজেদের দাবির অসঙ্গতি, যেমন তাহাদের দাবি যে, ইবরাহীমের ধর্মের ধারক ও বাহক, এবং দ্বিতীয়ত ইবরাহীম নিজেই একজন ইয়াহূদী বা খৃস্টান ছিলেন এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টান না হওয়া ব্যতিরেকে আর কেহই পরকালে মুক্তি পাইবে না, কিংবা বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে না,[২০] এই সকল দাবির সবই স্ববিরোধী। এইরূপ দাবির বিরুদ্ধে ইহা উল্লেখ করা হয় যে, যখন তাহারা অন্যান্যদেরকে ইয়াহূদী বা খৃস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়, তখন তাহারা নিজেরাই আপোষহীনভাবে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইয়াহূদীরা দাবি করে খৃস্টানদের দাঁড়াইবার কোন ভিত্তি নাই, পক্ষান্তরে খৃস্টানদের দাবি হইতেছে ইয়াহূদীদের স্বীয় পক্ষ সমর্থনে তেমন কিছুই নাই, যদিও তাহাদের উভয় সম্প্রদায়ই আসমানী কিতাবধারী। ইহা আরও স্পষ্ট করা হয় যে, অন্তর্নিহিত বিষয় হইতেছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং আল্লাহ প্রেরিত সকল নবীর বাণীর অবিরাম চলমানতা ও পরিচিতি। নিচের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইবে। সূরা বাকারার ১৩৫ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"তাহারা বলে, ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান হও, সঠিক পথ পাইবে। বল, বরং একনিষ্ঠ (হানীফ) হইয়া আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব এবং যে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (২ ঃ ১৩৫)।

মূসা (আ)-এর বিস্তারিত বর্ণনার পরিণতি হিসাবে এই বিবরণ আসিয়াছে এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌র একত্ববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে প্রতিফলিত করিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা (২ ঃ ৪৭-১৩৪)। এই দীর্ঘ বিবরণীর ঘটনায় চারটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে

গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। (এক) ইহা সুস্পষ্ট করা হইয়াছে যে, এই যুক্তি সাধারণভাবে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে নয় কিংবা তাহারা যেহেতু মূসা ও ঈসা (আ)-এর অনুসারী তাই তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়াও নয়, বরং ঐ সকল নবী (আ)-এর নামে প্রচলিত নির্দিষ্ট মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। অতঃপর ইহা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা যায় ঃ "যাহারা বিশ্বাস করে, যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং খৃস্টান ও সাবিঈ—যাহারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না" (২ ঃ ৬২)।[২১]

(দুই) ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহা কেবল ইয়াহূদীদের একটি শাখা সচেতনভাবে এবং জানিয়া-শুনিয়া বাইবেলের পরিবর্তন সাধন করে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীদের অপর শাখা ধর্মগ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে কি পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা জানিত না এবং তাহারা শুধু প্রথমোক্তদের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশীমত ইহা অনুসরণ করিয়া চলে (আয়াত ২ ঃ ৭৫, ৭৮)।

(তিন) একইরূপ ভাবধারায় এমন বর্ণনা রহিয়াছে যে, মূসা (আ)-এর গ্রন্থে যে বাণী ধারণ করা হইয়াছে তাহা তাঁহার সময় পর্যন্ত থামিয়া থাকে নাই। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-সহ অন্যান্য নবীগণকে প্রেরণ করিয়া সেই ধারা অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইয়াহূদীগণ যখন দেখিল যে, তাহাদের পছন্দ বা অপছন্দের সহিত মূসা (আ)-এর গ্রন্থের ঐশী বাণীর কোন মিল নাই, তখন তাহারা কোন কোন নবীকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিল এবং তাঁহাদের কাহাকেও হত্যা পর্যন্ত করিল (আয়াত ২ ঃ ৮৭)।[২২] ইয়াহূদী ও খৃস্টান ব্যতীত আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এই দাবির ত্রুটি এই প্রসংগে চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং ইহা পুনঃ ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, যাহারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ ও ভাল কাজ করিবে তাহারা আল্লাহ তাআলা ঘোষিত পুরস্কার লাভ করিবে (আয়াত ২ ঃ ১১১-১১২)।

আল্লাহ্র পুত্র সম্পর্কিত ধারণা যা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত তাহা এই আয়াতে (আয়াত ২ ঃ ১১৬-১১৭) দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে। ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ ইবরাহীম ও ইয়া'কূব (আ)-এর সহিত তাহাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রহিয়াছে এইরূপ ঘোষণা দান করিলেও এই আয়াতে অবশেষে ইবরাহীম ও ইয়া'কূব (আ)-এর প্রসঙ্গ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ পূর্বক ইহা দেখান হইয়াছে যে, তাঁহারা উভয়ই তাঁহাদের বংশধর ও উত্তরাধিকারিগণকে একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁহার নিকট সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করিতে নির্দেশ প্রদান করেন (আয়াত ২ ঃ ১৩২-১৩৩) এবং এই যুক্তির অনুবৃত্তিক্রমে আয়াত ১৩৫-এ বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ "তাহারা বলে, ইয়াহূদী হও অথবা খৃস্টান হও, তোমরা সঠিক পথনির্দেশ প্রাপ্ত হইবে। বল, বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইবরাহীমের ধর্ম হানীফ অনুসরণ করিব এবং সে অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না"।

এইখানে ও অন্যত্র সমগ্র আলোচনাটি এক আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কে আবর্তিত হইয়াছে। আরববাসী ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর অনুসারীদের জন্য একমাত্র ও স্বতন্ত্রভাবে ইবরাহীম (আ)-এর

সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে এমন দাবি করা হয় নাই। অথচ ইহার বিপরীতে সমগ্র আলোচনার মুখ্য বিষয় হইতেছে যেহেতু ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ নিজেরাই ইবরাহীমের সহিত তাহাদের সম্পর্কের দাবি করে, তাই ইহা কেবল একত্ববাদের প্রতি দৃঢ়রূপে আনুগত্য পোষণ করা তাহাদের জন্য শোভন হয় যাহা ইবরাহীম শিখাইয়াছিলেন ও নিজেই আদর্শের প্রতীকস্বরূপ হইয়াছিলেন। সেই কারণে যখনই তাঁহাকে 'হানীফ' হিসাবে বর্ণনা করা হয় তখনই জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। নবীদের ক্ষেত্রে কোনরূপ অগ্রাধিকার বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কিংবা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নবীদের মর্যাদা খর্ব করিবার জন্য এমন কোন চাতুরী অথবা সুপারিশও নাই যে, একজন নবীর শিক্ষা বা উপদেশ অন্য নবী হইতে ভিন্নতর হইবে। সকল নবীর বাণীর অভিন্নতা ও অবিরাম চলমানতার উপর নিচের আয়াতে (আয়াত ২ ঃ ১৩৬) জোরালোভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে ঃ

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَاۤ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ .

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী"।

ইবরাহীমের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের এইরূপ দাবির অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্বাসী (হানীফ) হিসাবে ইবরাহীমের প্রসঙ্গে অবতারণা করা হইয়াছে। কারণ, আয়াত ৩ ঃ ৬৭ ও ৩ ঃ ৯৫-এ হানীফ শব্দের দুইটি ভিন্ন প্রয়োগে প্রকৃত একত্ববাদের প্রতি তাহাদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই সূরার ৩৩ নং আয়াত হইতে এই যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে যেখানে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ লাভকারী হিসাবে আদম, নূহ ও ইবরাহীম এবং ইমরান-এর পরিবারের উল্লেখ প্রথমে আসিয়াছে। ইহার পর আয়াত ৩৫ হইতে ৬২ পর্যন্ত ঈসা (আ)-এর জন্ম ও ধর্ম প্রচারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই বিবরণীতে ইহার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে যেখানে তিনি ঘোষণা দান করেন, "আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ"।[২৩] ইহাতে আরও গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সর্বশক্তিমানের নিদর্শন হিসাবে আদমের সৃষ্টির ন্যায় ঈসাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।[২৪] অতএব ঈসার অসাধারণ জন্ম তাঁহার

প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করিবার কোন কারণ হইতে পারে না। আয়াত নং ৩ ঃ ৬৪-তে খৃস্টান ও ইয়াহূদী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি এক ঐকান্তিক আহ্বান করা হইয়াছে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

"তুমি বল, হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম" (৩ ঃ ৬৪)।

ইবরাহীম (আ) একজন ইয়াহূদী বা খৃস্টান ছিলেন—এই দাবির অযৌক্তিকতা পরবর্তীতে একটি সরল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে যথাক্রমে তাওরাত ও ইনজীল কিতাব ইবরাহীমের অনেক পরে নাযিল হইয়াছে (আয়াত ৩ ঃ ৬৫-৬৬)। অতঃপর যদি তাহারা ইবরাহীমের সহিত নিজেদেরকে অভিন্নরূপে গণ্য করিতে ইচ্ছুক হয় তবে পরিপূর্ণ একত্ববাদকে মানিয়া লইয়া তাহারা ইহা করিতে পারে। কারণ আয়াত ৩ ঃ ৬৭-এ ঘোষণা করা হয় ঃ

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না"।

পরবর্তী আয়াতেও এই যুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে যাহা নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا . . . .

"নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তাহারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে তাহারা এবং এই নবী ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে..."(৩ ঃ ৬৮)।

যদি কেহ প্রকৃতপক্ষে নিজকে ইবরাহীমের সহিত অভিন্নরূপে গণ্য করিতে চাহে তাহা হইলে একত্ববাদের একই ভাব ও ইবরাহীমের নির্দেশিত পথ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর একইরূপ

গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে যাহা উপরে উদ্ধৃত আয়াতের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতীয়মান। এই একই বিষয় আয়াত ৩ ঃ ৯৫-এ উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা নিম্নরূপ ঃ

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"বল, আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহে" (৩ ঃ ৯৫)।

উপরিউক্ত তিনটি আয়াতে (অর্থাৎ ২ ঃ ১৩৫; ৩ ঃ ৬৭ ও ৩ ঃ ৯৫) তাহারা যে ইবরাহীমের সম্প্রদায়ভুক্ত "ধর্মগ্রন্থের লোকদের" অর্থাৎ কিতাবধারীদের নিজেদের এই দাবির জবাবে একজন হানীফ হিসাবে ইবরাহীমের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি তাহারা তাহাদের দাবির প্রতি সত্যই বিশ্বস্ত থাকে, তাহা হইলে ইবরাহীমের মিল্লাত কঠোরভাবে অনুসরণ করিবার জন্য অতঃপর তাহাদিগকে আহ্বান জানান হয়। মূসা ও ঈসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মোপদেশের উপর অগ্রাধিকার প্রদান বা শ্রেষ্ঠত্ব আরোপের কোন অজুহাত কোথাও করা হয় নাই অথবা এমন কোন সুপারিশও করা হয় নাই যে, ইবরাহীমের সহিত সম্পর্কের দাবি করিবার অধিকার একচেটিয়া কেবল আরবদের অধিকারভুক্ত। অধিকন্তু সকল নবীর সমকক্ষতা ও তাঁহাদের শিক্ষার অভিন্নতা সর্বত্র বিশেষ গুরুত্বের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে।

আয়াত ৪ ঃ ১২৫ (সূরা আন-নিসা)-এ হানীফ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এইখানেও মূলভাব হইতেছে ঃ সম্পূর্ণ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং এর বিপরীতে অংশীবাদের সকল ছায়াকে সঠিকভাবে প্রত্যাখ্যানের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এই সূরার আয়াত ১১৬-তে এই মূল ভাবটি সুনির্দিষ্টভাবে শুরু হইয়াছে। আয়াতটির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "আল্লাহ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়" (৪ ঃ ১১৬)।[২৫]

তারপর আয়াত ১১৭-১২০-এ বর্ণনা রহিয়াছে যে, শয়তানই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে, আর তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। এই মিথ্যা আশা ও প্রতিশ্রুতি এখানে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা পাঠকবর্গ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছে এবং ইহা কুরআনের অন্যত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা সবই পৌত্তলিক আরবদের দাবি ছিল যে, মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিনে[২৬] তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে না এবং তাহাদের দেব-দেবীগণ তাহাদের পক্ষে[২৭] আল্লাহ্র সহিত মধ্যস্থতা করিবে। আর কিতাবধারীদের দাবি যে, তাহারা "আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয়পাত্র"[২৮] এবং তাহাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সময়কালে নরকাগ্নি ভোগ ব্যতীত কোন কষ্টভোগ করিতে হইবে না।[২৯] তারপর একজন ইয়াহূদী বা একজন খৃস্টান ব্যতীত কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।[৩০] এই সূরার ১২১-১২৪ নং আয়াতে পৌত্তলিক আরব ও কিতাবধারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, "তোমাদের

খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কোন কাজ হইবে না"।[৩১] একই সাথে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের নীতির উপর এই বলিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহই ভাল কাজ করিবে এবং যাহার ঈমান আছে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। আর যে বা যাহারা মন্দ কাজ করিবে আল্লাহ্ তাহার বা তাহাদের যথাযথ প্রতিদান প্রদান করিবেন।[৩২] অতঃপর আয়াত ৪ ঃ ১২৫-এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের সর্বোত্তম উপায় হইতেছে উত্তম কাজ করা এবং একজন হানীফ হিসাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করা। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا .

"তাহার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে" (৪ ঃ ১২৫)?

হানীফ শব্দটি দৃশ্যমান এইরূপ কুরআনের ১২টি আয়াতের (৬টি মক্কায় ও ৬টি মদীনায় অবতীর্ণ) একটি বিশ্লেষণ জেফারি-বেল তত্ত্বের অগ্রহণযোগ্যতাকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মহানবী হানীফ শব্দটির অভিব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই তত্ত্বের উপর এক আল্লাহ্র ইবাদতকারীদের সম্পর্কে একটি নূতন ধারণার সূচনা করেন এবং তাঁহার মদীনায় হিজরতের পর তাঁহার ও ইয়াহূদীদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে কেবল ইবরাহীমের ধর্মের সাথে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইয়াহূদী ও খৃষ্ট এই উভয় ধর্ম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ইবরাহীমের স্মৃতি লালনকারী পৌত্তলিক আরবদের উপর স্বীয় ধর্মমতের জয়লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দেখা গিয়াছে যে, মদীনায় হিজরতের বহু পূর্বে এবং মহানবী -এর ধর্মপ্রচারের একেবারে গোড়ার দিকে মক্কাতে হানীফ শব্দের ব্যবহার ও ইবরাহীমের ধর্মোপদেশের প্রসংগ আসিয়াছে। এই মক্কাতেই আবার ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃষ্টধর্মের মৌলিক ও প্রধান মতবাদসমূহের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যুক্তির মুখ্য বিষয় হইতেছে এক আল্লাহ্র ইবাদত। খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ যথা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা শুরু হইতেই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এবং এই প্রত্যাখ্যান মক্কা ও মদীনার সমগ্র কালব্যাপী বারংবার পুনরুক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকই ইহা ছিল একটি কঠোর ও অদম্য একত্ববাদের ভাবধারা যেখানে মক্কী ও মাদানী যুগের সমগ্র আমল ধরিয়া হানীফ পরিভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু মহানবী বহু ঈশ্বরবাদের বিপরীত একটি নূতন ভাবধারায় হানীফ শব্দ ব্যবহার করেন, তাই বেল পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন যে, সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহ্র ইবাদতকারীর ভাবধারায় কুরআনে সর্বত্র হানীফ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। হানীফ শব্দের উপর কোন অসাধারণ ও অজানা ভাবধারা আরোপ না করিয়া মক্কা ও মদীনায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহে ইবরাহীমের কোন উল্লেখ ব্যতিরেকে ইহাকে তাহার বর্গীয় নামে দেখান হইয়াছে। এইরূপ ধারণা করা খুবই অযৌক্তিক হইবে যে, শুধু ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার স্বার্থে এবং তাঁহার ধর্মমতে আনিবার জন্য পৌত্তলিক আরবদের মন জয় করিবার উদ্দেশ্যে মহানবী হানীফ শব্দের একটি নূতন অর্থ তৈয়ার করেন। কারণ তাহা হইলে মহানবী

-এর শত্রুপক্ষ কর্তৃক বিভ্রান্তি সৃষ্টি, সমালোচনা ও ভুল বুঝাবুঝির সমূহ আংশকা থাকিত। তবুও কুরায়শ গোত্রের বিরোধিতাকারী অথবা কিতাবধারী যাহারাই হউন না কেন পবিত্র কুরআনে হানীফ শব্দের প্রয়োগের বিষয়ে তাহাদের নিকট হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে দেখা যায় নাই। আর কল্পনা করুন তো যদি কোন ব্যক্তি ইংল্যান্ডের কোন ইতিহাস প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিকে জ্ঞানীর বিপরীতার্থক শব্দ নির্বোধ নামে অভিহিত করিবার দুঃসাহস দেখায় এবং ইংরেজদিগকে তাহাদের জাতীয় বীরকে নির্বোধ ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণের আহ্বান জানায় তাহা হইলে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে!

প্রকৃত তথ্য হইতেছে কুরআনে একটি নূতন ভাবধারায় হানীফ শব্দটি সরাসরি ইহার বিপরীত ভাবধারায় ব্যবহৃত হয় নাই যদিও আরবগণ এই যাবৎ এই বিপরীত অর্থেই ইহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম ত্যাগ করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীতেও ইহার কোন প্রসংগ উল্লিখিত হয় নাই। মদীনার প্রসংগে ইবরাহীমকে হানীফ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইবরাহীমের সহিত কিতাবধারীদের সম্বন্ধ রহিয়াছে—এইরূপ দাবির প্রত্যুত্তরে ইহার উল্লেখ করা হয়। ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, একজন ইয়াহূদী অথবা একজন খৃস্টান হওয়া তো দূরের কথা, ইবরাহীম (আ) একজন খাঁটি এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী হানীফ ছিলেন, তিনি বহু ঈশ্বরবাদী ছিলেন না। অতঃপর যদি তাহাদের দাবির উপর তাহারা বিশ্বস্ত থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের প্রতি অনুগত থাকিবার আহ্বান জানান হয়। ইহা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআন ও অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ সেই সময়কার ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে একত্ববাদের পরিপন্থী এবং ইবরাহীম (আ) ও অন্যান্য নবীগণের শিক্ষার স্পষ্ট ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচনা করিতেন। ইহা আরও অর্থ প্রকাশ করে যে, ইহা জেফারি-বেল তত্ত্বের বিপরীত। কুরআন কখনও এই সাক্ষ্য দেয় না যে, মুহাম্মাদ ﷺ সমালোচনার ভয়ে ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে একত্ববাদের ধারণা গ্রহণ করেন; বরং তাঁহার প্রচারিত ধর্মীয় বাণী অনেক আগে ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মোপদেশ হইতে গ্রহণ করেন বলিয়া কুরআনে প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিষয়ে কুরআন আরও সাক্ষ্য দেয় যে, ইবরাহীমের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে এইরূপ দাবির জবাবে এবং একত্ববাদ ও ইবরাহীমের ধর্ম শিক্ষার সহিত তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ও অনুশীলনের মধ্যে স্পষ্ট অসঙ্গতির বিপরীতে একজন হানীফ (মুমিন) হিসাবে ইবরাহীমের প্রসঙ্গ কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই কারণে ইহা বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি যেমন বহু ঈশ্বরবাদীদের কেহই ছিলেন না, তেমনি ইয়াহূদী বা খৃস্টানও ছিলেন না। তাই ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করিবার জন্য কিতাবধারীদের প্রতি প্রকাশ্য আহ্বান জানান যায় অথবা অন্তত এমন একটি সাধারণ নিয়ম, যথা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করিবার বিষয়ে একমত হওয়া যায়। ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কোন ধর্মমত অধিকতর পূর্বের বলিয়া

তাহা অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রথম শ্রেণীর, আর অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে পরবর্তী কালের হইলে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর, বিষয়টি তাহা ছিল না। বিষয়টি ছিল স্পষ্টভাবে একত্ববাদ এবং ইহার বিরোধিতা। হানীফ ও মদীনায় ইবরাহীমের কাহিনীর পক্ষে কুরআন ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনার বিরুদ্ধে আদৌ কোন রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাহাদের অভিন্নতার দাবি করে এবং অতঃপর তাহাদের এইরূপ দাবির অসঙ্গতি ও তৎসহ তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণে একত্ববাদের স্পষ্ট অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে ইহা ছিল একটি প্রচণ্ড আক্রমণ।

অনুবাদ ঃ আবু মুহম্মদ

তথ্যসূত্র

১. A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed, 1, Berlin 1861, pp. 45-134.

২. I. Goldziher, Muhammadanische Studien, 1, Halle 1888, pp. 1-39.

৩. দ্র. J. Wellhausen, Reste Arabiscen Heidentums, ২য় সং, বার্লিন ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ২৩৮; D.S. Margoliouth, JRAS, 1903, পৃ. ৪৬৭-৪৯৩; Sir Charles Layall, ঐ., পৃ. ৭৭১-৭৮৪ এবং L. Caetain, Annalli dell' Islam, 1, Milan, ১৯০৫, পৃ. ১৮১-১৯২।

৪. R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (১ম, সং. ১৯০৭), পৃ. মু. ১৯৮৮, পৃ. ১৫০। আরও দ্র. পি.কে. হিট্টি, History of the Arabs (১ম সং. ১৯৩৭), ১০ম সং. ১৯৮৬, পৃ. ১০৭-১০৮।

৫. ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম বরোদায় প্রকাশিত।

৬. A. Jeffery, পূ. গ্র., ১১২-১১৫।

৭. R. Bell, "Who were the Hanifs". The moslem World. ১৯৩০, পৃ. ১২০-১২৪। বেল এইভাবে জেফারির ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, "ডঃ এ. জেফারি "The foreign Vocabulary of the Koran"-এর উপর লিখিত নিবন্ধ আলোচনাকালে এইরূপ মত প্রকাশ করেন এবং ইহা একটি মূল্যবান গ্রন্থ যাহা কোন প্রকাশক কর্তৃক সত্বর প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই ধারণাটি জেফারির আলোচনা হইতে আমি গ্রহণ করিয়াছি"—প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

৯. প্রাগুক্ত বরাত।

১০. প্রাগুক্ত বরাত, পৃ. ১২২-১২৩।

১১. প্রাগুক্ত বরাত, পৃ. ১২৩-১২৪।

১২. প্রাগুক্ত বরাত, ১২৪।

১৩. N. A. Faris and H. W. Glidden, "The development of the meaning of the Koranic Hanif, "Journal of the Palestine Oriental Society," ১৯খ., ১৯৩৯, পৃ. ১-১৩।

১৪. উদাহরণস্বরূপ দ্র. Hitti. পূ. গ্র., ১০৮; Watt, M. at M. পৃ. ১৬২-১৬৩ এবং E.I.. ৩খ., পৃ. ১৬৬, নিচে আরও দ্র. মূল পাঠ।

১৫. E.I., ৩খ., পৃ. ১৬৬।

১৬. বুখারী, নং ৩৯৯ (ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৫৯৮, কিতাবুস সালাত, বাব ৩১); আযরাকী, আখবার মক্কা, ২খ., পৃ. ১৯। এই মর্মে একটি বর্ণনায় আছে যে, হিজরতের মাত্র দুই মাস পরে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে (দ্র. ইব্ন মাজাহ, নং ১০১০, ১খ, পৃ. ৩২২, কিতাব ৫, বাব ৫৬), কিন্তু ইহা সঠিক নয় বলিয়া মনে হয়।

১৭. উদাহরণস্বরূপ দ্র. কুরআনের আয়াত ৬ ঃ ৭৪-৯০; ৭ ঃ ৫৯-৯৩; ৭ ঃ ১০৩-১২৯; ১০ ঃ ১৩, ১০ ঃ ৪৭, ১০ ঃ ৭১-৯২; ১৬ ঃ ৩৬; ১৬ ঃ ৪৩-৪৪; ১৬ ঃ ১২০-১২৩; ১৯ ঃ ১-৫৮; ২০ ঃ ৯-৯৯; ২১ ঃ ২৫; ২১ ঃ ৫১-৯৩; ২৩ ঃ ২৩-৫০; ২৬ ঃ ১০-১৯১।

১৮. দ্র. সূরা ১১২ ও ১৯ ঃ ১৬-৩৫, ৮০, ৮৮-৯৩; ৯৯ ঃ ৬-৮; ১০১ ঃ ৬-১১।

১৯. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ৭খ., পৃ. ১৪৯-১৫০।

২০. উদাহরণস্বরূপ দ্র. সূরা ২য়, আয়াত ১১১ [২ ঃ ১১১]।

২১. মূল পাঠটি নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস করে, যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং খৃস্টান ও সাবিঈন—যাহারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহার প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না"।

২২. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ .

"এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মারয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ"!

২৩. আয়াত ৩ ঃ ৫১।

২৪. আয়াত ৩ ঃ ৫৯।

২৫. আয়াত ৪ ঃ১১৬ ঃ মূলপাঠ নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلاَلاً بَعِيْدًا . ইহা উপরে পাঠের মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৬. আয়াত ১৬ ঃ ৩৮ ঃ وَاَقْسَمُ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ . "উহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন না"। আরও দ্র. ৭২ ঃ ৭।

২৭. উদাহরণস্বরূপ আয়াত ৬ ঃ ৯৪; ১০ ঃ ১৮ ও ৩৯ ঃ ৪৩ দেখা যাইতে পারে।

২৮. আয়াত ৫ ঃ ৮০ ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهٗ.

"ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা বলে, তাহারা আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয়পাত্র"।

২৯. আয়াত ২ ঃ ৮০ ঃ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً . "তাহারা বলে, দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না"। আয়াত ৩ ঃ ২৪ ঃ

قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ .

"এই হেতু যে, তাহারা বলিয়া থাকে, 'দিন কতক ব্যতীত আমাদিগকে অগ্নি স্পর্শ করিবে না"।

৩০. আয়াত ২ ঃ ১১১ ঃ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى "এবং তাহারা বলে, "ইয়াহূদী বা খৃস্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না"।

৩১. আয়াত ৪ ঃ ১২৩ ঃ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ.... "তোমাদের খেয়ালখুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হইবে না; কেহ মন্দ কাজ করিলে তাহার প্রতিফল সে পাইবে....।"

৩২. আয়াত ৪ ঃ ১২২-১২৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রাচ্যবিদগণ ও হানীফ

২. ওয়াট-এর অভিমত

হানীফদের সম্পর্কে ওয়াট-এর অভিমত প্রধানত তাহার রচিত Muhammad at Mecca (১৯৫৩)[১], হানীফের উপর The Encyclopaedia of Islam (১৯৬৬, ১৯৮৬)[২]-এ লিখিত প্রবন্ধ ও তাহার Muhammad's Mecca (১৯৮৮)[৩] গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার বিবরণী অপরিহার্যরূপে জেফারি-বেল তত্ত্ব এবং Hilmi Omar Bey কর্তৃক গৃহীত ধারণার ভিত্তিতে রচিত। এই বিষয়ে বেল-এর নিবন্ধ প্রকাশের কিছুকাল পরেই Hilmi Omar Bey, The Moslem World নামক পত্রিকার কলামে বেলকে সমর্থন করিয়া নিবন্ধ লিখেন। তিনি তাহার নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, যাহাদিগকে ইতিহাসে ও কাহিনীতে হানীফ হিসাবে অভিহিত করা হয়, তাহাদিগকে কুরআনের বর্ণনায় যথাযোগ্য বলিয়া দৃষ্ট হয় না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাহারা একেবারে প্রথম দিকে যেমন হানীফ় পদবী ধারণ করিত না, তেমনি ইবরাহীমের ধর্মের অন্বেষণেও তাহারা বাহির হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী কালের ব্যাখ্যাকার ও কাহিনীকার কর্তৃক এই পদবী আরোপিত হয়। কুরআনে ব্যবহৃত এই পরিভাষাটির বিশদীকরণ ও ইহার যথাযথ তাৎপর্যদানের জন্য তাহারা এইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেন।[৪]

ওয়াট তাহার পূর্ববর্তীগণের অভিমতসমূহ কত ঘনিষ্ঠভাবে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নের তুলনামূলক সারণীতে দেখা যাইবে ঃ

(ক) বেল বর্ণনা করেন যে, হানীফগণ ইতিহাসখ্যাত ঐতিহাসিক কোন সম্প্রদায় বা দল ছিল না, বরং তাহারা ছিল আরবদের ধর্মের আদর্শ অনুসারীভুক্ত।	(ক) বেলের অবিকল শব্দগুলি ওয়াট উদ্ধৃত করিয়া একই মত ব্যক্ত করেন।[৫]
(খ) জেফারীর তত্ত্ব হইতে গ্রহণ করিয়া এবং স্বীয় তত্ত্ব ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বেল অভিমত প্রকাশ করেন যে, হানীফ শব্দটি প্রাচীন সিরীয় ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং ইহা বহুবচনে প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং ইহার অর্থ হইতেছে ধর্মহীন অখৃষ্টান।	(খ) ওয়াট এই মতামত গ্রহণ ও ইহার আরও সম্প্রসারণ করেন।[৬]

(গ) বেল মনে করেন যে, হানীফ শব্দের উপর কুরআন একেশ্বরবাদীর একটি নূতন ও সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ আরোপ করিয়াছে।

(গ) ওয়াট মোটামুটি একই মত পোষণ করেন। প্রাচীন সিরিয়ার কোন কোন অঞ্চলে যে অর্থে একেশ্বরবাদী শব্দ ব্যবহৃত হইত তিনি তাহা ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া 'অপ্রধান অর্থে' ব্যবহার করেন।[৭]

(ঘ) জেফারী হইতে তাহার প্রয়োজনীয় সংকেত গ্রহণ করিয়া বেল মত প্রকাশ করেন যে, কুরআনে হানীফের ব্যবহার ও ইবরাহীমের কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ মদীনাতে সম্পন্ন হয়, যখন ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্ম হইতে বাহির হইয়া আসিবার উদ্দেশ্যে এবং ইয়াহূদীদের সহিত মহানবী ﷺ -এর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

(ঘ) বস্তুত ওয়াট একই প্রবন্ধের পুনঃ অবতারণা করেন। তিনি বলেন যে, হানীফিয়াহ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত ভাবধারা "ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ কর্তৃক মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার প্রতি মুসলমানদের প্রতিরোধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত"। ইহা ছিল ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে কুরআনের কৈফিয়তমূলক অংশবিশেষ।[৮]

(ঙ) পুনঃ জেফারীর সূত্রের বরাতে বেল মত প্রকাশ করেন যে, মহানবী ﷺ -এর ধর্ম প্রাথমিক আমলে এমনকি হানীফিয়াহ নামে অভিহিত হইত এবং ইসলাম ও মুসলিম শব্দের পারিভাষিক ব্যবহার দ্বিতীয় হিজরীর পূর্বে হয় নাই।

(ঙ) ওয়াট একইরূপ মতামত পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, ইসলাম ও মুসলিম শব্দের পারিভাষিক ব্যবহার দ্বিতীয় হিজরীর পরেই হইয়াছে।[৯]

(চ) এই বিষয়ে বেল-এর মতামতকে সমর্থন করিয়া H.O. Bey সংযোজন করেন যে, পরবর্তী কালের মুসলিম ইতিহাসবিদগণ হানীফ শব্দটির কুরআনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে হানীফ হিসাবে অভিহিত করেন। কিন্তু তাহারা নিজেরা এই উপাধি ধারণ করিতেন না।

(চ) ওয়াট তাহা পুনরুল্লেখ করিয়া ঐকমত্য পোষণ করেন।[১০]

এখন এখানে মূল নিবন্ধের চূড়ান্ত অসমর্থনীয়তা দেখা যাইতে পারে যাহাতে হানীফের আশ্রয় গ্রহণ ও ইবরাহীমের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। যেমন ওয়াট বলেন, "মদীনার আমলের প্রথমদিকে ইয়াহূদীদের সহিত যখন মহানবী ﷺ -এর সম্পর্কের টানাপোড়েন চলিতেছিল[১১] এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টান কর্তৃক মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধর্মের উপর বুদ্ধিগত সমালোচনার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ কার্যক্রমের সহিত হানীফিয়ার ভাবধারাকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হইতেছিল"[১২]—তাহা

সবিস্তারে উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, মহানবী ﷺ -এর একেবারে গোড়ার দিকের ধর্ম প্রচারের সময় হানীফ ও ইবরাহীমের প্রসংগ মক্কাতেই ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাহা কোনমতেই ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ছিল না। পক্ষান্তরে কিতাবধারীদের সহিত ইবরাহীমের অভিন্নতার দাবির প্রত্যুত্তরে মদীনাতে হানীফ ও ইবরাহীমের কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুশীলনে একত্ববাদের ত্রুটিসহ তাহাদের দাবির অসঙ্গতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে ইহা করা হয়। যেহেতু কুরআনের অধিকাংশ ভাবাদর্শ ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে—এইরূপ শত্রুতামূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে[১৩] মুসলমানদের নিজেদের রক্ষার ক্ষেত্রে এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে কিনা যে, যেমন ওয়াটের মতে, "তাহারা বলেন, তাহাদের ধর্ম আল্লাহ্র প্রতি খাঁটি ইবাদতের যাহা আল্লাহ তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণ ও মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন"।[১৪] কারণ হানীফিয়াহ ও ইবরাহীমের প্রসংগের অবতারণা মদীনাতেই হয় এবং ইহা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের এইরূপ কোন মতামতের বিপক্ষে ছিল না। তবে তাহা ছিল এক আল্লাহ্র ইবাদতের অপরিহার্য বিষয়সমূহের স্পষ্ট অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে। অথবা ইহাও সত্য নয় যে, "কুরআনের অধিকাংশ ভাবধারা ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে"। প্রাচ্যবিদগণ নিজেরাই এবং স্বতন্ত্রভাবে ওয়াট স্বীকার করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিজে কখনও ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন নাই। ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে[১৫] যে, গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে তিনি খৃস্টতত্ত্বের পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা যেইসব সাধারণ ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—এই তত্ত্বসমূহ সমভাবে অগ্রহণীয় ও অযৌক্তিক। ইহা ছাড়াও কুরআনের মৌলিক শিক্ষাসমূহ ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে একেবারে শুরু হইতেই পৃথক ছিল। ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা খুব জোরালোভাবে মক্কাতেই করা হয়। এমনকি মদীনাতে হানীফ ও ইবরাহীমের কাহিনীর প্রসংগ আমাদিগকে একটি শিক্ষামূলক অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণে সহায়তা করে যাহাতে সেই সময়ে ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কে কুরআনের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা জানা যায়। অতঃপর কুরআনের অধিকাংশ ভাবধারা ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ পক্ষপাতমূলক ধারণা তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বাঞ্ছনীয়। যদি কেহ ইসলাম ধর্মকে মূল্যহীন বিবেচনা করিয়া প্রকৃতপক্ষে জানিতে ও বুঝিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই নিবন্ধে হানীফিয়াহ ও ইবরাহীমের কাহিনীর অবতারণা মদীনাতেই সর্বপ্রথম করা হয় এবং তাহাও ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য যে কোন অবস্থা এইরূপ প্রচারণামূলক বক্তব্য একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তিকর।

প্রাচ্যবিদবর্গ, বিশেষ করিয়া ওয়াট ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের বিপক্ষে কুরআনের কৈফিয়তমূলক বিষয়বস্তুর সন্ধান লাভের চেষ্টা করেন এবং তাহাদের এইরূপ দাবির মধ্যে তাহারা কোন প্রকার অসঙ্গতি দেখিতে ব্যর্থ হন। এইভাবে যদি হানীফিয়াহ শব্দটি এক সময়ে মুহাম্মাদ ﷺ -এর

ধর্মের নামের বেলায় অবশ্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং যদি ইসলাম ও মুসলিম শব্দদ্বয়ের কৌশলগত ব্যবহার হিজরী দ্বিতীয় সনের সমাপ্তির পূর্বে সম্পন্ন না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা একই সময়ে এইরূপ সুপারিশ করা যাইতে পারে না যে, হানীফ ও হানাফীয়াহ শব্দদ্বয়ের ধারণা মদীনার আমলের গোড়ার দিকে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরী সালের দিকে ছাড়া বাস্তবে বিদ্যমান ছিল না, যখন এমন দাবি করা হয় যে, মহানবী ﷺ ইসলাম ও মুসলিম শব্দ দুইটিকে গ্রহণ করেন এবং ইয়াহূদীদের সহিত কলহ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম হানীফ ও হানীফিয়াহ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করেন। তথাপি ওয়াট তাহার পূর্ববর্তীগণের অনুসরণপূর্বক তাহার পাঠকবর্গকে এই জাজ্জ্বল্যমান অসঙ্গতি গ্রহণের জন্য উপহার দিতে পারেন।

পুনঃ ওয়াট স্বীকার করেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে (বস্তুত সর্বদা) কুরআনে হানীফ শব্দটি মুশরিকূন অর্থাৎ অংশীবাদীদের সহিত তুলনামূলক বৈপরীত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ধর্ম হিসাবে বহু ঈশ্বরবাদের বিপরীতে হানীফিয়াহকে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসংগে ওয়াট যেমন বলেন, হানীফিয়াহ-এর বিপরীতে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের দুর্নীতিগ্রস্ত একেশ্বরবাদ।[১৬] তাহা হইলে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এই শব্দটির প্রয়োগের উপর ব্যাখ্যাদানের জন্য ইয়াহূদীদের সহিত অবিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্কের কোন দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। পূর্বসূত্র পুরাদস্তুরভাবে চালু বহু ঈশ্বরবাদ ও প্রতিমা পূজা এই সব কিছুই মক্কাতে বিদ্যমান ছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য তাহা যথেষ্টই ছিল। এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের "দুর্নীতিগ্রস্ত একেশ্বরবাদ"-এর এই ব্যাখ্যা ওয়াট-এর নিজস্ব ভাবনাপ্রসূত। কিতাবধারীদের বিপক্ষে কুরআনে হানীফ ও হানাফিয়াহ শব্দদ্বয়ের ব্যবহার সম্পর্কে বিবেচনা করিতে গেলে ইহা (কুরআন) কিতাবধারীগণকে মু'মিন হিসাবে গণ্য করে নাই, যাহাতে কুরআন তাহাদিগকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য এবং কাহাকেও তাঁহার শরীক না করিবার জন্য আহ্বান জানায়।

প্রকৃতপক্ষে হানীফ ও হানীফিয়াহ-এর ব্যবহার মক্কাতেই হইয়াছিল এবং তাহা হিজরতের ও ইয়াহূদীদের সহিত মতানৈক্য হওয়ার বহু পূর্বেই ঘটিয়াছিল। মুসলিম ও ইসলাম শব্দের সহিত বিনিময় করিয়াও এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ইহা বলা আদৌ সঠিক হইবে না যে, ইসলাম ও মুসলিমের পরিভাষাগত ব্যবহার কেবল হিজরী দ্বিতীয় সালের পরই শুরু হইয়াছিল। বেল-এর বিশ্লেষণের প্রতি যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং কুরআনের আয়াত নাযিলের তারিখ নিরূপণ করা হইলেও (এবং ইহা যথার্থই স্মরণযোগ্য হইবে যে, এই বিষয়ে এমনকি ওয়াট নিজেই বেল-এর মতামত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই) মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের প্রথম দিকের অনেক আয়াত আছে যেখানে পরিভাষাগত দিক দিয়া এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বস্তুত কমপক্ষে তিন ডজন (৩৬টি) মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত[১৭] আছে যেখানে এই দুইটি শব্দের একটি অথবা অন্যটি প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং কখনও পরিভাষাগত ভাবধারায় অথবা পরিভাষাগত ও সাধারণ এই উভয় ভাবধারাতেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মুসলিম শব্দের পরিভাষাগত ব্যবহার সবচাইতে প্রথমে সূরা ৬৮ ঃ ৩৫-৩৬-এ ঘটে। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমানুসারে এই সূরা (আল-কালাম) সবচাইতে প্রথমের। ইহার প্রথম চারটি আয়াত প্রাচীন মুসলিম আলিমগণের (পণ্ডিতগণ) মতানুসারে দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে, এই সূরার অবশিষ্টাংশ ইহার প্রথমাংশ হইতে খুব বেশী পরে অবতীর্ণ হয় নাই এবং তাহা অবশ্যই মক্কাতেই নাযিল হইয়াছিল। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ .

"আমি কি আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদিগের সদৃশ গণ্য করিব? তোমাদিগের কি হইয়াছে? তোমাদিগের এ কেমন (অদ্ভূত) সিদ্ধান্ত?" (৬৮ ঃ ৩৫-৩৬)।

মক্কার অবিশ্বাসীদের মন্তব্য খণ্ডনের জন্য এই ঘোষণা আসিয়াছে যে, যদি মৃত্যুর পর তাহারা আদৌ পুনরুত্থিত হয় তাহা হইলে মক্কার সমাজে তাহারা যেমন সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিল, মৃত্যুর পরেও তাহারা অনুরূপ সুবিধা ভোগ করিবে।[১৮]

কেবল এই একটি আয়াত মুসলিম ও ইসলাম শব্দের পরিভাষাগত ব্যবহার আরম্ভ করা সম্পর্কে তাহাদের ধারণা অপনোদনের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা যায়। অন্যান্য আরও কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা যায় যাহা কেবল মক্কার প্রথমদিকের পরিভাষাগত ভাবধারায় এই শব্দের প্রয়োগের বিষয় বর্ণনার মাধ্যমে নয়, বরং ইহা প্রমাণ করা যে, (ক) হানীফ শব্দের প্রকাশের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি মুসলিম (এবং ইসলাম) শব্দের বেলায়ও ইহা সম্পূর্ণ এক আল্লাহ্র ইবাদতকারীর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহা একজন বহু ঈশ্বরবাদীর বিপরীতে অবশ্যই এবং (খ) ইহা পূর্ববর্তী সকল নবী ও তাহাদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আয়াত হইতেছে ঃ

رُبَمَا يُوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ .

(১) "কখনও কখনও কাফিরগণ আকাঙ্খা করিবে যে, তাহারা যদি মুসলিম হইত" (১৫ ঃ ২)।

বিচার দিবসে কাফিরদিগের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে এই ঘোষণা দান করা হইয়াছে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ .

(২) "যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল (মুসলিম ছিল)......."(৪৩ ঃ ৬৯)।

এখানে পরকালে মুসলিমদের অবস্থান বুঝাইবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰىٓ اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ .

(৩) "বল, 'আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ একই ইলাহ, সুতরাং তোমরা হইয়া যাও এক আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণকারী" (২১ ঃ ১০৮)।

وَمَا اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلاَّ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

(৪) ও (৫) "তুমি অন্ধদিগকে উহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না। তুমি শুনাইতে পারিবে কেবল তাহাদিগকে, যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে। আর তাহারাই আত্মসমর্পণকারী" (২৭ : ৮১ ও ৩০ : ৫৩)।

মক্কার কাফিরদের একগুঁয়ে বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

(৬) "কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (৪১ : ৩৩)।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلاَمِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ .

(৭) "আল্লাহ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের আলোকে আছে........." (৩৯ : ২২)।

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

(৮) "যদি তাহারা তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ, ইহা তো আল্লাহ্রই 'ইলম মুতাবিক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহা হইলে তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবে কি" (১১ : ১৪)?

কুরআন যদি আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ না হয় তাহা হইলে কুরআনের আয়াতের ন্যায় কোন বাণী মক্কার কাফিরগণ তৈয়ার করিতে পারে কিনা এইরূপ চ্যালেঞ্জের এবং চ্যালেঞ্জ মুকাবিলাতে তাহারা অসমর্থ বুঝাইবার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

(৯) "অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে লইতে পার, তোমাদিগের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই, আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহ্র নিকট। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি" (১০ : ৭২)।

নূহ (আ) তাঁহার অনুসারীদের প্রতি আহ্বান জানাইবার জন্য আল্লাহ তাঁহার মুখে এই বাণী (১০ : ৭২) প্রদান করেন।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ .

(১০) "মূসা বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহতে ঈমান আনিয়া থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাহারই উপর নির্ভর কর" (১০ ঃ ৮৪)।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ .

(১১) "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্যদান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদিগের মৃত্যু ঘটাও" (৭ ঃ ১২৬)।

মূসা (আ)-এর অনুসারিগণ আল্লাহ্র নিকট এই মুনাজাত করেন। তাহারা ফিরাউনের অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিল।

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

(১২) "সেখানে যেইসব মু'মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাই নাই" (৫১ ঃ ৩৫-৩৬)।

নবী লূত (আ)-এর লোকদের প্রসংগে ফেরেশতাদের মুখে এই আয়াত উচ্চারিত হয়।

লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, উপরে উল্লিখিত সকল আয়াতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দের অভিব্যক্তি ইহার পরিভাষাগত ভাবধারায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ২, ৭, ৮, ১০ ও ১২ নম্বর আয়াতে মুসলিম শব্দটি অর্থের দিক দিয়া একই সীমানাভুক্ত মু'মিনের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে যেখানে মু'মিন বলিতে যাহার একমাত্র আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস আছে তাহাকে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং আয়াতে ইহা স্পষ্ট করা হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারীদিগকেও মুসলিম অভিধায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই সকল আয়াতের সমস্তই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মহানবী ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর এবং ইয়াহূদীদের সহিত তাঁহার মতপার্থক্যের কারণে ইসলাম ও মুসলিম শব্দের পরিভাষাগত ভাবধারায় ব্যবহার শুরু হইয়াছিল এইরূপ দাবির মত অসত্য ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য আর কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তাহার পূর্বসূরীদের মত ওয়াটও এই ব্যাপারে আত্মবিরোধী ও বিভ্রান্ত। তিনি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে এবং ইয়াহূদীদের সহিত মতপার্থক্যের কারণে মহানবী ﷺ তাঁহার ধর্মের নাম হিসাবে আল-হানীফিয়াহ ব্যবহার করেন। একই সময়ে ওয়াট তাহার পাঠকবর্গকে বিশ্বাস করিতে বলেন যে, আল-হানীফিয়াহ ও ইবরাহীমের কাহিনী অবলম্বন মহানবী ﷺ মদীনাতে ইয়াহূদীদের সহিত বিবাদের পরই কেবল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহানবী ﷺ -এর দৃশ্যে আবির্ভূত হওয়ার প্রাক্কালে প্রকৃত হানীফদের বিদ্যমানতা লইয়া আমাদের মনে প্রশ্ন উঠে। ওয়াট বর্ণনা করেন যে, প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হানীফের সকল প্রকার প্রসঙ্গ

হইতেছে এমন প্রচেষ্টা যাহা কুরআনের বর্ণনা ব্যাখ্যা করে এবং যেহেতু নাম উল্লেখকৃত ব্যক্তিবর্গের কেহই নিজকে হানীফ হিসাবে অভিহিত করেন নাই, তাই তিনি বলেন নাই যে, তিনি হানীফিয়ার সন্ধানে রত আছেন।[১৯] কুরআনের ১২টি আয়াতে যেখানে হানীফের প্রসঙ্গ আসিয়াছে সেখানে বিষয়বস্তুর কোন আলোচনা ছাড়াই ওয়াট বর্ণনা করেন যে, "ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বের অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে কোন হানীফ আন্দোলন হইয়াছে এইরূপ সামান্যতম ইঙ্গিত কুরআনে পাওয়া যায় না"।[২০] তিনি জোর দিয়া বলেন, "এমন কোন প্রমাণ নাই পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক হানীফ নামে অভিহিত কোন ব্যক্তি নিজে এই নাম ব্যবহার করিয়াছে অথবা সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ দ্বারা হানীফ নামে সম্বোধিত হইয়াছে"।......এই হানীফিয়াহ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম পণ্ডিতদের দ্বারা সৃষ্ট।"[২১] তাহার মতানুসারে প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিম পণ্ডিতগণ "কুরআনের কোন কোন আয়াতের পটভূমি বর্ণনার চেষ্টা করেন অথবা সম্ভবত কুরআনের অধিকাংশ ভাব ও ধারণা ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ শত্রুতামূলক প্রচারণার প্রতিবাদ করেন"।[২২] তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছেন, "মুসলিমগণকে নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করিতে হইবে। তিনি বলেন, মুসলমানদের ধর্ম হইতেছে আল্লাহ্র খাঁটি ইবাদত যাহা মুহাম্মাদ ও তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে।[২৩] তবুও কেবল প্রাথমিকভাবে আমাদের মুসলিম পণ্ডিতগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত নাম ও তথ্যাদির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া ওয়াট একই সময়ে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হানীফ নামে অভিহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ "এতদসত্ত্বেও একত্ববাদের প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করে নাই" এবং এই সকল ব্যক্তির প্রকৃত অস্তিত্ব ঐ পথের একটি অতিরিক্ত বিবরণ প্রদান করে যেখানে একত্ববাদ তৎকালীন পরিবেশে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়ে। আর এইরূপ পরিবেশেই মুহাম্মাদ বড় হইয়া উঠেন।[২৪] "এই আন্দোলন ও ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তি একজন হানীফ (ইসলামী ভাবধারায়) এইরূপ কোন নিশ্চিত দাবি পরবর্তী কালের কোন মুসলিম কৈফিয়ত দানকারীর কাজ....."।[২৫]

যেহেতু কুরআনে কোন হানীফ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা নাই এবং হানীফ আন্দোলনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম পণ্ডিতবর্গের সৃষ্টি, তাই ওয়াট এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়া গুরুত্বের সহিত একই সাথে দাবি করেন যে, সেই সময়ে এই আন্দোলন ও হানীফ নামধারী ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান ছিলেন। আর হানীফ ও আল-হানীফিয়াহ আখ্যাদান হইতেছে পরবর্তী কালের মুসলিম কৈফিয়তদানকারীদের কাজ। এইরূপ দৃশ্যমান অসঙ্গতি অথবা বরং হানীফ ও আল-হানীফিয়্যাহ পরিভাষাদ্বয়ের বিষয়ে মূল আপত্তির সহজে ব্যাখ্যা দান করা যাইতে পারে।

যদিও Goldziher উল্লেখ করেন যে, এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আগ্রহশীল কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কথা বলেন, কিন্তু একত্ববাদের প্রতি গড়িয়া উঠা কোন আন্দোলন সম্পর্কে কোন বর্ণনা করেন না। Sprenger-এর মত এই যে, মুহাম্মাদ ﷺ ঐরূপ তত্ত্বের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, যে তত্ত্বে বলা হয় যে, তিনি ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে তাঁহার তথ্য সংগ্রহ করেন। এই ধারণাটি শীঘ্রই আপনা হইতে

প্রকাশ পায় যে, যাহারা একত্ববাদের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন তাহারা ইয়াহূদী ও খৃষ্টধর্ম হইতে একত্ববাদের মূলনীতি আত্মীভূত করেন এবং এই দুইটি ধর্ম দ্বারা একত্ববাদের প্রতি গড়িয়া উঠা ঝোঁক ও আন্দোলনের উন্নতি বিধান ঘটে। মুহাম্মাদ ﷺ কেবল এই দুইটি ধর্ম হইতেও প্রচুর পরিমাণ তথ্য আহরণ করেন নাই, চলমান প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন প্রবণতা হইতেও একত্ববাদের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এইরূপ তত্ত্বের বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি হইতেছে আল-হানীফিয়ার ধারণা এবং প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীমের কাহিনীর প্রসঙ্গের অবতারণা। অতএব ইহা এখন পরিহার করা অথবা হানীফ ও আল-হানীফিয়াহকে স্বস্থান হইতে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাই তাহাদের উপর এই আক্রমণ, যেমন প্রাচ্যবিদগণ ইবরাহীমের কাহিনীর উপর আক্রমণ সূচিত করিয়াছেন।

প্রাচ্যবিদগণ তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ত্রিমুখী কৌশল গ্রহণ করেন। প্রমাণ করিবার জন্য এইরূপ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় যে, হানীফ পরিভাষাটির উৎপত্তি বিদেশে এবং এমনকি যদি আরবদেশে ইহা বর্তমান কালেরও হইয়া থাকে তবুও ইহার অর্থ হইতেছে 'পৌত্তলিক' অথবা প্রাচীন আরবের স্থানীয় ধর্মের অনুসারী। দ্বিতীয়ত, ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় ইয়াহূদীদের সহিত যখন কলহে লিপ্ত হন তখন তাঁহার প্রচারিত ধর্মোপদেশ ইবরাহীমের বলিয়া খুঁজিয়া বাহির করা হয় এবং একত্ববাদের বিপরীত অর্থে তিনি তাঁহার প্রতি হানীফ শব্দটি প্রয়োগ করেন। আর ইহা করা হয় খাঁটি মৌলিক আরব ধর্মের সহিত তাঁহার প্রচারিত ধর্মের অভিন্নতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। আরও উল্লেখ করা হয় যে, হানীফগণ ইতিহাসখ্যাত লোকদের কোন দল বা উপদল ছিল না, বরং তাহারা ছিল মুহাম্মাদ ﷺ -এর অশান্ত চিত্তের ফসল। জেফারী হইতে সংকেত গ্রহণ করিয়া প্রধানত বেলই এই দুইটি কৌশল গ্রহণ করেন। বেল-এর মতামত পুনরাবৃত্তি করিয়া এবং বস্তুত তাহার কথা উদ্ধৃত করিয়া ওয়াট তৃতীয় কৌশল তৈয়ার করেন। তিনি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কুরআনের সমর্থনমূলক তত্ত্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম ইতিহাসবিদগণ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দাবি করেন যে, হানীফের কাহিনী তাহাদের তৈয়ারী অথবা কুরআনের কৈফিয়তমূলক তথ্য সমর্থনের জন্য তাহাদিগকে হানীফ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনি ইহার সহিত আরও যুক্ত করেন যে, এই আন্দোলন ও আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেই সময় বর্তমান ছিল এবং ইহাতে মুহাম্মাদ ﷺ যে পরিবেশে বড় হইয়া উঠেন সেই পরিবেশে একত্ববাদের পরিব্যাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে কার্যত ওয়াট স্প্রেংগারের তত্ত্বকে বেল-এর মতামতের উপর জোড়া দিয়াছেন অথবা ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির ইয়াহূদী-খৃস্টীয় উৎস সম্পর্কিত তত্ত্বের সহিত স্প্রেংগার ও বেল-এর মতামতের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। এই মিশ্রণের বিভিন্ন উপাদান আর যাহা হউক অন্যায়ভাবে আত্মীভূত যাহার প্রত্যেকটি উপাদানের পৃথক পরিমিতি বিদ্যমান। অতঃপর এই বিভ্রান্তিমূলক ও অসঙ্গতিপূর্ণ বিবরণ যে, হানীফ আন্দোলন "সম্পূর্ণভাবে

দ্বিতীয় শতকের মুসলিম পণ্ডিতবর্গের সৃষ্টি" ও "এই আন্দোলন এবং আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান ছিল" ইত্যাদি।

এই সকল কৌশলের মূলগত ধারণা যেমন একত্ববাদের প্রতি সৃষ্ট ঝোঁক ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম কর্তৃক পরিপোষিত হইয়াছে, একটি ভ্রান্তি যাহা মুহাম্মাদ ﷺ ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে তাঁহার সকল তথ্য ও ভাব আহরণ করিয়াছেন—এইরূপ ভ্রান্তির সহিত তুলনীয়। এই পরবর্তী ধারণার চূড়ান্ত অগ্রহণযোগ্যতা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।[২৬] যেহেতু এই দুইটি ধর্ম ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাসবিদগণ কর্তৃক উল্লিখিত তথ্যানুসন্ধানকারীদের মধ্যে একত্ববাদের মূল ভাব জাগ্রত করিতে পারে নাই, তাহা তথ্য সহকারে উপরে সবিস্তার আলোকপাত করা হইয়াছে এবং একই সাথে তাহাদের দ্বারা ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণভাবে ঐ সকল তথ্যানুসন্ধানকারীদের নিকট যখন এই দুইটি ধর্ম ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন তখন তাহাতে যেমন তাহারা অনুপ্রাণিত হয় নাই তেমনি তাহারা এই দুইটি ধর্মের কোনটিকেই গ্রহণ করে নাই। বাস্তবিকই প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধিৎসু মনের কৌতুহল মিটাইবার জন্য বিদ্যমান ধর্মীয় ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও অক্ষমতাকে পূর্বাহ্নে মানিয়া লইতে বাধ্য করে। কারণ ইহা এমন একটি অবস্থা যাহা একটি নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব ও সাফল্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করে। ইবরাহীমের মূল ধর্মকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আকাঙ্খা উপস্থাপিত হয় শুধু ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের ভাবধারা সেই সময়কার পরিবেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ দ্বারা নয়, বরং একদিকে সেই সময়ে বিদ্যমান ব্যাপকহারে প্রতিমা পূজা ও বহু ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে আকস্মিক এক বিরাট পরিবর্তন দ্বারা এবং অপর দিকে ইবরাহীমের ধর্মোপদেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও অবিরাম চলমানতা দ্বারা। ইহা আরবদের প্রতিমা পূজার কারণে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও মহামহিম প্রভু এক আল্লাহ্র নাম ও ধারণা, কা'বা শরীফের পবিত্রতা ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি জাগরুক রাখিয়াছে। কারণ কল্পনার চূড়ান্ত বিস্তার ঘটাইয়াও ইহা বলা যাইবে না এই পরবর্তী ধারণাসমূহ ও কর্মকাণ্ড ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের প্রভাবে জন্মলাভ করিয়াছে অথবা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহার আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না।

ইহাও একটি অন্যায্য দাবি যে, প্রথম আমলের মুসলিম ইতিহাসবিদগণ হানীফের কাহিনী উদ্ভাবন করেন অথবা কুর'আনে উল্লিখিত কাহিনীর উপর গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য এই পদবী বা আখ্যা উদ্ভাবন করেন। এই অভিযোগের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপ অভিযোগ আনয়নের পর প্রাচ্যবিদগণ বস্তুত ইতিহাসবিদদের বিরুদ্ধে দুইটি বক্রোক্তি করেন। যেমন কুর'আনে হানীফের প্রসঙ্গ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি এবং মিথ্যা উদ্ভাবন। যেমন ওয়াট নিজেই উল্লেখ করেন যে, কুরআন কোনভাবেই কোন হানীফ আন্দোলনের কথা বলে না। তাই ইতিহাসবিদগণের গল্পের জন্য হানীফদের খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন প্রয়োজন পড়ে না। অথবা

ইহা বলাও সঠিক হইবে না যে, ঐ সকল ব্যক্তির যাহারা ইবরাহীমের মূল ধর্মের অন্বেষণে রত ছিল তাহারা হানীফ নামে পরিচিত ছিল না অথবা নিজেদেরকে উক্ত নামে অভিহিত করিত না। সূত্রগ্রন্থসমূহে স্পষ্ট করিয়া তাহাদিগকে হানীফ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সূত্রসমূহে আরও উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, তাহারা ইবরাহীমের মূল ধর্ম আল-হানীফিয়াহ-এর অন্বেষণ করিতেছিল। ওয়াট এই প্রামাণিক তথ্য প্রত্যাখ্যান করেন বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, ঐ সকল ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া রচিত কবিতা ও বিবরণী অযৌক্তিক ও অসঙ্গতিতে পূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করিয়া রচিত কবিতাকে প্রামাণিক সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যাহাই ঘটুক না কেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, হানীফ শব্দ ইসলাম-পূর্ব আরবদেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচ্যবিদগণ নিজেরাই ইহা স্বীকার করেন। তবে ইহা ইবরাহীমের মূল ধর্মের স্বীকৃতিমূলক ভাবধারায় ব্যবহৃত হইত। কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ইহার সাধারণভাবে গৃহীত ও বোধগম্য ভাবধারায়, তবে তাহা বিপরীত ও দুর্বোধ্য অর্থে নয়। তাই ইসলাম-পূর্ব আরবে এই শব্দের অবিমিশ্র ব্যবহার হইতেছে একটি চূড়ান্ত প্রমাণ যে, একটি বিশেষ ধরনের ব্যক্তিবর্গের প্রসঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হয়। অতএব এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে যে, ঐ নাম বা আখ্যা দ্বারা কাহাকেও পরিচিত বা অভিহিত করা হইত না—এইরূপ ধারণা করা হাস্যকর প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নহে।

আবার য়াহূদী ও খৃস্টীয় সমালোচনার বিপক্ষে কুরআনের কৈফিয়তমূলক তত্ত্ব যাহার উপর মুসলিম ইতিহাসবিদদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপবাদের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য। এখন প্রাপ্ত তথ্যসমূহের সারসংক্ষেপ করিলে দাঁড়ায় ঃ (ক) শুধু ইবরাহীমের নহে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী সকল নবীর উল্লেখ মক্কাতেই হইয়াছিল এবং তাহা সর্বপ্রথম মদীনাতে হয় নাই। (খ) মক্কাতেই বর্গীয় বা দলগত ভাবধারায় হানীফ শব্দের ব্যবহার হয় এবং তাহাই ইবরাহীমের প্রসংগে এবং সম্পূর্ণরূপে একত্ববাদের অর্থে প্রযুক্ত হয়। (গ) সেই পরিমাণ হানীফ হিসাবে ইবরাহীমের প্রসঙ্গ মদীনাতে এবং কিতাবধারীদের সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছিল যেই পরিমাণে ইবরাহীমের সহিত অভিন্নতার সম্পর্কে তাহাদের দাবির প্রত্যুত্তরে এবং এইরূপ অসঙ্গতি নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সুস্পষ্ট বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত সঙ্গতভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ইবরাহীম বহু ঈশ্বরবাদী (অংশীবাদী) ছিলেন না, যাহাতে যদি তাহারা তাহাদের দাবির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাহা হইলে একত্ববাদের অপরিহার্য বস্তুসমূহকে মানিয়া লওয়া উচিত হইবে। একটি সাধারণ কর্মপন্থায় সকলকে সমবেত হইবার উন্মুক্ত আহ্বান হইতে ইহা মোটামুটি স্পষ্ট হয় যে, সকলে এক আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। তাই কুরআনের পক্ষে কোন কৈফিয়ত প্রদান ও আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বনের প্রশ্ন উঠে না। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিষয় বিবেচনা করা হইলে একজন হানীফ (মু'মিন) হিসাবে ইবরাহীমের প্রসঙ্গ সম্পর্কে কুরআনের মনোভাব হইতেছে

কিতাবধারীদের বহু ঈশ্বরবাদী বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ ও প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন। (ঘ) অথবা এমন নহে যে, কুরআনের যে কোন স্থানে যেমন প্রাচ্যবিদগণের ধারণা মুতাবিক একটি প্রাচীন ও বিশুদ্ধতর একত্ববাদের এমন কোন দাবি করা হইয়াছে। কোন নবীর শিক্ষার জন্য কোন অগ্রাধিকার বা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা হয় নাই। পক্ষান্তরে ইয়াকূব, মূসা ও ঈসা (আ)-সহ সকল নবীর ক্ষমতা ও একত্ববাদের ইবাদতকামিতা এবং তাঁহাদের সকলের ধর্মীয় শিক্ষার অনুবৃত্তি সকল সময় ধরিয়া গুরুত্বলাভ করিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের কাহারও মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় নাই। (ঙ) পর্যায়ক্রমে সর্বশেষ বটে কিন্তু গুরুত্বহীন নহে যে, এই মক্কাতেই ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সকল প্রকার মৌলিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান হইতে একটি স্পষ্ট ব্যতিক্রম সূচিত হয়। অতএব ইহা প্রকৃত সত্যের অপলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না যে, মুহাম্মাদ ﷺ- এর মদীনায় হিজরত করিবার পর তাহার সহিত ইয়াহূদীদের বিবাদ সৃষ্টি হইলে তিনি ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে সরিয়া আসিবার জন্য ইবরাহীমের ধর্ম ও আল-হানীফিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সর্বশেষ বিষয়টি আরও কিছু সতর্ক মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ধরন এই যে, যখনই কোন ব্যক্তি বা কোন দল কোন কিছু সংস্কারের জন্য নূতন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী লইয়া আগাইয়া আসে তখন তাহারা প্রথম যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করে তাহা হইতেছে তাহাদের পরিকল্পনার অভিনবত্ব ও মূলনীতির ব্যাখ্যাদান এবং কেন ইহা প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা ও আচার-অনুশীলন হইতে প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি ভিন্ন তাহা তুলিয়া ধরা। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের পরিকল্পনার সাফল্য এই প্রাথমিক পদক্ষেপের উপরই নির্ভর করে এবং বিশেষত যদি সেই কর্ম-পরিকল্পনা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসের সহিত সম্পর্কিত হইত। অতএব মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ যদি তাঁহার স্বীয় চিন্তা ও প্রস্তুতির এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্বাভাবিক প্রবাহের সহিত কোন পারম্পর্য থাকিত তাহা হইলে ইহা যথার্থই হইত যে, সূত্রপাতেই তিনি প্রচলিত বিশ্বাস ও মতের সহিত তাহার নিজস্ব ভাবধারার বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। বাস্তবিকই মদীনায় হিজরতের পূর্বে তিনি যে সমর্থন লাভ করেন এবং যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন, তাহা কেবল তাঁহার ধর্মপ্রচারের নূতনত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিপরীতে, স্বাভাবিক যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের বিপরীতে এবং সর্বোপরি কুরআন ও ঘটনাপঞ্জীর বিপরীতে প্রাচ্যবিদগণ আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে প্রয়াসী হন যে, মুহাম্মাদ ﷺ ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে কিছু পরিমাণ তথ্য আহরণ করেন এবং তাহাও অপ্রধান সূত্র হইতে সংগৃহীত হয়। তারপর একটি নূতন ধর্মের[২৭] নামে ইহা প্রচার করিতে থাকেন। দীর্ঘ দশ বৎসরের অধিক কাল ধর্ম প্রচার করিবার পর তিনি মদীনায় আগমন করেন এবং ইয়াহূদীদের সহিত বিবাদে জড়াইয়া পড়েন। সেই সময় তিনি অনেক প্রাচীন কোন নবীর শিক্ষার সহিত তাহার নীতিসমূহের অনুসরণের মাধ্যমে ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে

সরিয়া আসেন। ইহা বিস্ময়কর যে, এইরূপ একটি অদ্ভুত হাস্যকর যুক্তি এত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হইয়াছে। কুরআন এবং অতঃপর মহানবী ﷺ খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ, আল্লাহ্‌র পুত্রত্ব, ঈসার উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা আরোপ এবং কিতাবধারীদের এইরূপ অন্যান্য বিশ্বাস একেবারে শুরু হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাদের ইবরাহীমের সহিত অভিন্নতার দাবির উত্তরে যখন একজন হানীফ হিসাবে ইবরাহীমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন মদীনাতে ভিন্ন বিশ্বাস ও ভাবধারার বিরুদ্ধে একই রূপ আক্রমণ চালান হয়। ইবরাহীমের একত্ববাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষক অথবা গঠনমূলক বহু ঈশ্বরবাদের উপর বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের বিপক্ষে পরোক্ষ আপত্তির নিরসন হয় নাই অথবা তারপর হইতে ইহার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহার পরিবর্তে ইহা দাবি করা হয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার সকল ধর্মাদর্শ ও তথ্য ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে আহরণ করিয়াছেন। আরও দাবি করা হয় যে, নবী হিসাবে ১৩ বৎসর ধর্ম প্রচারের পর মদীনায় আসিয়া তিনি ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্ম হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। বলা হয় যে, কুরআন ও অন্যান্য ঘটনার বিবরণে আল-হানীফিয়াহ ও হানীফদের সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা তাঁহার অস্থির চিত্তের অথবা ইতিহাসবিদদের কল্পনার ফসল। স্পষ্টতই কিতাবধারীদের বিশ্বাসের উপর কুরআনের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই সকল তত্ত্ব ছিল উদ্ধৃত ঘোষণা ও কৈফিয়তস্বরূপ।

অনুবাদ ঃ আবু মুহম্মদ

তথ্যসূত্র

১. পৃ. ১৬২-১৬৪ (Excursus C)।

২. E. I., ৩খ., নূতন সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

৩. পৃ. ৩৭-৩৮।

৪. M. W., ১৯৩২; পৃ. ৭২-৭৫।

৫. M. at M., পৃ. ১৬২।

৬. E. I., ৩খ., ১৯৮৬, পৃ. ১৬৬, কলাম ২।

৭. E. I., ৩খ., ১৯৮৬, পৃ. ১৬৬, কলাম ২।

৮. E. I., ৩খ., ১৯৮৬, পৃ. ১৬৫, M. at M., পৃ.১৬২; Muhammad's Mecca, পৃ. ৩৮।

৯. E. I., ৩খ., ১৯৮৬, পৃ. ১৬৫. কলাম ২; Muhammad's Mecca, পৃ. ৩৮।

১০. M. at M., পৃ.১৬২; Muhammad's Mecca, পৃ. ৩৭; E. I., ৩খ., ১৯৮৬, পৃ. ১৬৬।

১১. M. at M., পৃ. ১৬২।

১২. ঐ, পৃ. ১৬৩।

১৩. ঐ।

১৪. Muhammad's Mecca, পৃ. ৩৭।

১৫. Supra, ch. xi, Specially secs.III and IV.

১৬. E. I. ৩খ., নূতন সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ১৬৫।

১৭. দ্র. F. A. Baqi, Al-Mu'jam al-Mufaharas li Alfaz al-Qur'an al-Karim under س-ل-م

১৮. উদাহরণস্বরূপ দ্র. Tafsir al-Baydawi, II. Beirut print, 517.

১৯. M. at M., পৃ. ১৬২; E. I., ৩খ., ১৯৮৬, পৃ. ১৬৬, কলাম ১।

২০. Muhammad's Mecca, পৃ. ৩৭।

২১. ঐ, পৃ. ৩৮।

২২. ঐ, পৃ. ৩৭।

২৩. E. I., III, 1986, p. 166, col. 2.

২৪. M., at M., p. 163.

২৫. E. I., III, 1986, p. 166, col 2.

২৬. উপরে, পরিচ্ছেদ ১১।

২৭. 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দদ্বয় পারিভাষিক অর্থে মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই, এই ধারণা এই অধ্যায়ে ইতোপূর্বে আলোচনা হইয়াছে। উপরিউক্ত বক্তব্য স্পষ্টতই এই তত্ত্বের অসারতা আড়াল করিবার জন্য একটি কৌশলমাত্র।

চতুর্থ ভাগ

RECEIPT OF WAHY AND INCEPTION OF THE MISSION

ওহী লাভ ও ইসলাম প্রচারের সূচনা

ষোড়শ অধ্যায়

আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ (ওহী লাভ) ও ইসলাম প্রচারের সূচনা

এক ঃ আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহীলাভ

সন্দেহ নাই যে, হানীফ হিসাবে যাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন মহানবী ﷺ -এর সমসাময়িক এবং যাহারা মক্কার অধিবাসী ছিলেন তাহাদের কাহারও সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। তাহাদের অনেকেই তাঁহার আত্মীয় ও পরিচিত ছিলেন। যেমন যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ। সূত্রসমূহ তাঁহার এইরূপ যোগাযোগ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে নাই অথবা একের উপর অন্যের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ইংগিত দেয় নাই। কিন্তু এইরূপ সংযোগের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন ইহা স্পষ্ট যে, মহানবী ﷺ খাঁটি ধর্মের অনুসন্ধানে সিরিয়ার মত দূরদেশে ভ্রমণের মাধ্যমে তাহাদের কাহারও অনুকরণ করেন নাই। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতে তাঁহার নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে যাহা জানা যায় তাহা হইতেছে, তিনি ক্রমান্বয়ে নির্জনতা পছন্দ করিতে আরম্ভ করেন এবং একাকী নির্জনে হেরা পর্বতের উপরে অবস্থিত একটি গুহায় ইবাদত ও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। হেরা পর্বতটি কা'বা শরীফের তিন মাইল পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ইহা এখন অবশ্য মক্কা নগরীর সীমানার অন্তর্ভুক্ত। গুহায় এইভাবে নির্জনে অবস্থানকালে তিনি একদিন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহী লাভ করেন। তাঁহার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সবচাইতে বিশ্বস্ত বিবরণ তাঁহার সহধর্মিনী আয়েশা (রা) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে এবং বুখারী (র) কর্তৃক সংকলিত সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। এই ঘটনাটি তাঁহার ভাগিনা উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র (মৃ. ৯৪ হি.) কর্তৃক প্রচারিত হয়। তাঁহার নিকট হইতে ইব্ন শিহাব আয-যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.), তাঁহার নিকট হইতে উকায়ল (মৃ. ১৪৪ হি.) এবং তাঁহার নিকট হইতে আল-লায়ছ (মৃ. ১৭৫ হি.), তাঁহার নিকট হইতে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (মৃ. ২৩১ হি.) এবং তাঁহার নিকট হইতে ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে এই ঘটনা বর্ণিত হয়। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

"আয়েশা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সূচনা হইয়াছিল ঘুমের মধ্যে সুস্বপ্নের[১] মাধ্যমে। তারপর হইতে তিনি যে স্বপ্ন দেখিতেন তাহাই উষার আলোকের ন্যায় ইহা উষাকালে ভাস্বর হইয়া উঠিত। তারপর হইতে নির্জনতা তাঁহার আরও প্রিয় হইয়া উঠিল। তিনি হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন অবস্থায় থাকিতেন এবং

আত-তাহান্নুছ অর্থাৎ ইবাদত ও আত্মসমর্পণ (তা'আব্বুদ)[২] করিতেন। এইভাবে গুহাতে একাদিক্রমে অনেক রাত্রি যাপন করিতেন এবং কিছু পরিমাণ খাবার সংগ্রহের জন্য স্ত্রী খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিতেন, তারপর পুনঃ গুহায় প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইভাবে তাঁহার নিকট সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার নির্জনবাস ও ইবাদত চলিতে থাকে। ফেরেশতা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'পড়'। তিনি উত্তর দিলেন مَا اَنَا بِقَارِئٍ "আমি ত পড়ি নাই"। তিনি (মহানবী ﷺ) বলিলেন ঃ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ "ইহাতে ফেরেশতা আমাকে ধরিয়া এমনভাবে চাপ দিলেন যাহা সহ্য করা আমার জন্য কষ্টকর হইয়া পড়ে"। তারপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, "পড়"। আমি বলিলাম, আমি ত পড়ি নাই। তৎকারণে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার সবলে ধরিয়া চাপ দিলেন এবং এই চাপ সহ্য করিয়া থাকিবার পর্যন্ত ধরিয়া রাখিলেন। তারপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "পড়"। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি পড়িতে জানি না'। এইবার তৃতীয়বার আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া চাপ প্রয়োগ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পর ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ বলিলেন, 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে রক্তবিন্দু ('আলাক) হইতে। পড়; এবং তোমার প্রভু বড়ই করুণাময়।[৩] তখন আল্লাহ্‌র দূত ﷺ ইহা লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন (فَرَجَعَ بِهَا)। ভয়ে ও হতবুদ্ধি অবস্থায় তাঁহার হৃদয় তখন ধড়ফড় করিতেছিল (يَرْجُفُ فُؤَادُهُ)। তিনি তখন খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ (রা) -এর নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে চাদর দিয়া ঢাকিয়া দাও, ঢাকিয়া দাও।' তাঁহাকে চাদর দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার ভয় দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তদবস্থায় থাকিলেন। তিনি খাদীজাকে এই ঘটনা সম্পর্কে খুলিয়া বলিলেন এবং ইহার সহিত আরও যুক্ত করিলেন, "আমি আমার জীবনের আশংকা করিতেছি" (অর্থাৎ আমার উপর দুর্ঘটনা ঘটিবার আশংকা করিতেছি)। খাদীজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি (আল্লাহ) কখনও আপনাকে অপমানিত করিবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়দের খোঁজ-খবর রাখেন ও সাহায্য করেন, আপনি দুর্বলের বোঝা বহন করিয়া দেন, আপনি অসহায় নিঃস্ব গরীবদের অর্থ সাহায্য করেন, আপনি অতিথিপরায়ণ ও নিয়তির কষাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আপনি আশ্রয়স্থল।[৪] তখন তিনি তাঁহার এক চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফাল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল 'উযযা'র নিকট তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ওয়ারাকা জাহিলিয়ার যুগে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হিব্রু ভাষায় ধর্মশাস্ত্র লিখিতেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী হিব্রু ভাষায় ইনজীল গ্রন্থের অনুলিপি তৈয়ার করিতেন।[৫] তাহার অনেক বয়স হইয়াছিল এবং তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। খাদীজা তাঁহাকে বলিলেন, 'হে আমার ভ্রাতা! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তখন তাঁহাকে (মহানবী ﷺ) বলিলেন, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি কি বলিতে চাহেন তাহা খুলিয়া বলুন'? তখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যাহা দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। তৎকারণে ওয়ারাকা তাঁহাকে বলিলেন, "ইনি হইতেছেন 'নামূস' (অর্থাৎ বার্তাবাহক ফেরেশতা জিবরীল) যাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা মূসার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হায়! আমি যদি তখন যুবক থাকিতাম! যখন আপনার

লোকেরা আপনাকে তাড়াইয়া দিবে তখন যদি আমি বাঁচিয়া থাকিতাম!" ইহা শুনিয়া আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ জানিতে চাহিলেন, "তাহারা কি সত্যই আমাকে আপনার জন্মস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে?" ওয়ারাকা বলিলেন, "হাঁ! আপনি যে বিষয় লইয়া আসিয়াছেন আমার পূর্বে ইহা লইয়া যাহারাই আসিয়াছেন তাহারাই শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু হইয়াছেন। যদি সেই সময় পর্যন্ত আমি বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে আমার সর্বোত্তম সাধ্যানুযায়ী আমি আপনাকে সাহায্য করিব।' এই ঘটনার কিছুকাল পর ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন এবং ওহী নাযিলে কিছু বিরতি ঘটে"।[৬]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই বর্ণনায় কেবল আয়েশা (রা) ও ওয়ারাকার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, বরং গুহাতে মহানবী ﷺ যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া ফেরেশতা কর্তৃক তাঁহাকে জোরপূর্বক জাপটাইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে তিনবার চাপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিবরণ রহিয়াছে। ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ যে সত্তা মহানবী ﷺ -এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন তিনি শুধু তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাহা নহে, বরং শারীরিকভাবে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং এই বিবরণীতে তাহার উল্লেখ আছে যে, তিনি একজন ফেরেশতা। ইহা ছাড়া এই বিবরণীতে সুস্পষ্টভাবে বেশ কিছু তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়াছে। প্রথমত বলা হইয়াছে যে, হেরা পর্বতের গুহায় ওহী লাভের পূর্ববর্তী সময় ছিল ঊষার পূর্ব মুহূর্ত। প্রথম দিকের এই সময়ে ঘুমের মধ্যে মহানবী ﷺ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখিতেন। প্রাতঃকালীন দিবালোকের ন্যায় উহা খুবই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ছিল। কোন কোন বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ওহী লাভের পূর্ববর্তী এই সময়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬ মাস।[৭] অন্যান্য কিছু সংখ্যক বর্ণনায় দেখা যায় যে, মহানবী ﷺ এই সময় যখন মক্কার রাস্তায় পদচারণা করিতেন তখন আকাশের দিক হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন এইরূপ একটি কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেন। তারপর তিনি যখন উপরের দিকে তাকাইতেন তখন বহু উপরে বেহেশতে অথবা দিগন্তে একটি প্রতিকৃতি দেখিতে পাইতেন এবং ঐ প্রতিকৃতি নিজকে জিবরাঈল নামে পরিচয় প্রদান করিতেন।[৮]

দ্বিতীয়ত, এই প্রারম্ভিক পর্যায়ের পর হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ইবাদত ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকার পর্যায় শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত আত-তাহান্নুছ (اَلتَّحَنُّثُ) শব্দের প্রাচীন আমল এবং তৎসহ আধুনিক আমলের লেখকগণ কর্তৃক নানভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[৯] এই পরিভাষাটির সঠিক অর্থ যাহাই হউক না কেন এই নির্দিষ্ট বিবরণী বিবেচনা করা হইলে সেই অবস্থার ইহা ছিল একটি স্পষ্ট বর্ণনা যাহাতে মহানবী ﷺ নিজে নির্জনে থাকিতে পছন্দ করিতেন। তিনি যখন গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেন সেই প্রারম্ভিক পর্যায় অতিক্রম করিবার পর তাঁহার মধ্যে ক্রমান্বয়ে এই নির্জনবাসের প্রতি আগ্রহ জন্মে। এই বিবরণীতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে, যেমন—পর্বতের গুহায় অবস্থানের উদ্দেশ্যে তিনি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার পরিবারে ফিরিয়া আসিতেন এবং একাদিক্রমে কয়েক দিন ও রাত নির্জনে অবস্থান ও ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন—ইহা উক্ত বিবরণীতে উল্লিখিত হয়।

তৃতীয়ত, গুহার অভ্যন্তরে ইহা এমন একটি নির্জন অবস্থা ছিল যে, এই সময় ফেরেশতার আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি তাঁহাকে আল্লাহ্‌র বাণী হস্তান্তর করেন। মহানবী ﷺ-এর জাগ্রত ও পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ফেরেশতার সহিত তাঁহার অর্জিত অভিজ্ঞতার (অর্থাৎ তাঁহাকে তিনবার জাপটাইয়া ধরিয়া বুকে চাপ দেওয়ার) বিশদ বিবরণী হইতেই ইহা কেবল স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় নাই, বরং এই ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঘুমের মধ্যে পূর্বের কোন স্বপ্ন হইতে এই অবস্থাকে পৃথকভাবে বিচিত্র করা হইয়াছে।

চতুর্থত, তিনি আল্লাহ্‌র যে বাণী প্রাপ্ত হইয়া পর্বত হইতে অবতরণ করেন তাহা এমন একটি বিষয় ছিল না যে, ইহা তাঁহার গভীর চিন্তা ও ধ্যানের ফসল হিসাবে তাঁহার উপর প্রকাশিত হয়। ইহা ছিল একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাণী যাহা একটি প্রত্যক্ষ সূত্র হইতে তাঁহাকে পাঠ করান হইয়াছিল। এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বের সহিত প্রকাশের দাবি রাখে। কারণ ইহার বিপরীতে যেমন গৌতম বুদ্ধের ন্যায় অন্যান্য ধর্মীয় নেতার ক্ষেত্রে এইরূপ গভীর চিন্তা ও ধ্যানের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল তাঁহাদের আধ্যাত্মিক 'জ্ঞানালোক' প্রাপ্তি। কিন্তু মহানবী ﷺ এর ক্ষেত্রে ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহার মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ফল ছিল না, বরং ভিন্ন একটি সত্তা এই বাণী তাঁহাকে সমর্পণ করেন। এই প্রেক্ষিতে বাণীটি নিজেই উপযুক্ত প্রামাণিক সাক্ষ্য বহন করে। কারণ ইহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কিছুরই অর্থ বহন করে না। পক্ষান্তরে ইহা মানুষকে তাহার সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে অবহিত করে এবং মহানবী ﷺ -কে তাঁহার প্রভুর নামে পাঠ করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। বাস্তবিকই পাঠের জন্য এই সনির্বন্ধ প্রণোদনা এই অর্থ সূচিত করে যে, তাঁহাকে যাহা দেওয়া হইতেছিল তাহা ছিল আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং তাহা পাঠ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ ছিল। আল্লাহ তা'আলার বাণীর এই প্রামাণিক তথ্য হইতেছে চূড়ান্ত প্রমাণ যে, ইহা মহানবী ﷺ -এর নিকট হইতে উদ্ভূত হয় নাই এবং বাণীটির সরল অন্তর্নিহিত অর্থ হইতে ইহা আরও প্রমাণিত হয়। বাণীটিতে পাঠের গুরুত্বের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে। আর এই পাঠের অর্থ হইতেছে জ্ঞানার্জন। এই সাধারণ বার্তাটির আদান-প্রদানই যদি মহানবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে নির্জনবাস ও ধ্যানে নিমগ্ন না হইয়াই তিনি তাহা সম্পাদন করিতে পারিতেন এবং তাঁহার পক্ষে সামান্য চিন্তার মাধ্যমেই ইহা সাধন করা সম্ভব হইত।

পঞ্চমত, মহানবী ﷺ -এর এই ঘটনার উপর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল স্পষ্টতই একজন ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া যিনি এই ধরনের ঘটনার জন্য যেমন প্রস্তুত ছিলেন না তেমনি এই ব্যাপারে কোন প্রত্যাশা অথবা কোন পূর্ব অনুমানও করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল আতঙ্কের ও হতবুদ্ধিকর এবং নিজের জীবন সম্পর্কে আশংকার। তাঁহার প্রতিক্রিয়া এই সত্যের দৃষ্টান্ত যে, তিনি যাহা পাইয়াছিলেন তাহা ছিল একটি বাহিরের সূত্র হইতে আগত এবং তাহা নিজের মনস্তাত্ত্বিক কোন নিদর্শন ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন কৌশল অবলম্বন করিয়াই হউক না কেন নবী হিসেবে তাঁহার আত্মপ্রকাশের জন্য কোন

পরিকল্পনা বা উচ্চাকাংখার অনুপস্থিতিই ছিল ইহার প্রমাণ।[১০] এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টি খাদীজার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা আরও জোরালো করা হইয়াছে এবং খাদীজা (রা) ও মহানবী ﷺ কর্তৃক এই বিষয়ে ওয়ারাকার সহিত আলোচনা এবং ওয়ারাকার প্রতিক্রিয়া বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে।

সর্বশেষ হইলেও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নহে যে, এই বিবরণী অন্য দুইটি সত্যকে প্রকাশ করিতেছে। ইহার একটি হইল মহানবী ﷺ -এর পক্ষে পড়িতে পারিবার দক্ষতার অনুপস্থিতি। কারণ জিবরাঈল ﷺ -এর পাঠ করিবার আদেশের উত্তরে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত জবাব ছিল, "আমি সে নই যে পড়িতে পারে"।[১১] অন্য সত্যটি হইল, মহানবী ﷺ -এর সহিত যোগাযোগের মূল বিষয়বস্তু এই পূর্ব ধারণা দেয় যে, মহানবী ﷺ -এর এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহ সম্পর্কে পূর্ব হইতেই জ্ঞান ছিল। আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতি ও স্থিতি সম্পর্কে কোন পরিচিতি ও ব্যাখ্যা প্রদান না করিয়াই 'তোমার প্রভুর নামে' তাঁহাকে পড়িতে আদেশ করা হইতেছিল। ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার প্রভু কে সে সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল।

এই বর্ণনার সহিত বিবরণীটির সমাপ্তি ঘটে যে, হেরা পর্বতের গুহায় প্রথম যোগাযোগের পর ওহী অবতীর্ণ হইতে একটি বিরতি দেওয়া হয়। ইহা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ প্রথম ঘটনাটি অবশ্যই মহানবী ﷺ -কে খুব গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল এবং স্পষ্টতই প্রথম আকস্মিক মানসিক অভিঘাত হইতে নিজকে সামলাইয়া লইবার জন্য তাঁহার জন্য কিছু অবকাশের প্রয়োজন ছিল। একই সাথে তিনি অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে উৎসুক ছিলেন যে, হেরা পর্বতের গুহায় তাঁহার নিকট যোগাযোগের যে প্রথম পাঠ দেওয়া হইয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটুক। আর এইভাবে তিনি পুনঃ নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার লব্ধ অভিজ্ঞতার বাস্তবতা সম্পর্কে। কোন ব্যক্তির যখন কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য বা ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হয় তখন এইরূপ অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক। তিনি সেই স্থানে পুনরায় গমন করিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন এই আশায় যে, তিনি পুনরায় সেখানে একইরূপ অভিজ্ঞতা যেন লাভ করিতে পারেন। অতএব ইহাতে আদৌ অবাক হওয়ার কিছু নাই যে, উৎস গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি বারংবার হেরা পর্বতের গুহায় ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে গিয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে এই আশায় যে, তিনি জিবরাঈল (আ)-এর দ্বিতীয়বার সাক্ষাত লাভ করিবেন। বস্তুতপক্ষে হেরা পর্বতে প্রথম সাক্ষাতের পর খুব বেশি বিলম্ব হয় নাই তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহার সাক্ষাত লাভ করেন। আয-যুহরী তাঁহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

তিনি বলেন, "আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান আমাকে অবহিত করেন যে, জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিরতি সম্পর্কে বলিতে গিয়া বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেন ঃ 'আমি যখন পদচারণা করিতেছিলাম তখন আকাশে একটি কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আমি চোখ তুলিয়া তাকাইলাম এবং দেখিলাম, আল্লাহ্‌র সেই ফেরেশতাকে যিনি হেরা পর্বতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি এখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি

চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ইহা দেখিয়া আমি ভীত হইয়া পড়িলাম এবং আমার পরিবারের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলাম, 'আমাকে ঢাকিয়া দাও'। তখন আল্লাহ্ আমার নিকট অবতীর্ণ করিলেন ঃ "হে বস্ত্রাবৃত! উঠ ও সতর্ক কর এবং ঘৃণিত বিষয় পরিত্যাগ কর"।[১২] ইহার পর নিয়মিত এবং অব্যাহতভাবে ওহী অবতীর্ণ হইতে থাকে"।[১৩]

একটি স্থানে ইমাম বুখারী হেরা পর্বতে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্নের ব্যাখ্যা (তা'বীর) সম্পর্কিত অধ্যায়ে তিনি আয়েশা (রা) ইহা দেখিয়াছেন বলিয়া একটি অতিরিক্ত বর্ণনা ইহার সহিত যুক্ত করিয়াছেন। এই স্থানে তিনি দুইজন বর্ণনাকারী পরম্পরার উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের শেষোক্ত ব্যক্তি হইলেন আয-যুহরী। এই দুইজন হইলেন, (ক) ইয়াযীদ ইব্ন বুকায়র ← আল-লায়ছ ←'উকায়ল ← আয-যুহরী এবং (খ) 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ← 'আবদুর রাযযাক ← মা'মার ← আয-যুহরী। অতিরিক্ত যোজনাটি নিম্নরূপ ঃ

"এবং তারপর ওহী অবতীর্ণ হইতে একটি বিরতি ঘটে এবং এই বিরতিকালে মহানবী ﷺ, যেমন আমাদিগকে অবহিত করা হইয়াছে (فيما بلغنا), তখন তিনি খুবই বিষন্ন ছিলেন এবং একাধিকবার (مرارًا) পাহাড়ের চূড়া হইতে নিজকে নিচে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে গমন করেন। এইভাবে যখনই তিনি পাহাড় হইতে নিচে লাফাইয়া পড়িবার জন্য গিয়াছেন তখন জিবরাঈল (আ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্যই আল্লাহ্র রাসূল"। ইহাতে মহানবী ﷺ-এর মন শান্ত হইত এবং পুনরায় তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিত। কিন্তু ওহী অবতীর্ণ হইতে পুনঃ বিলম্ব হইলে তিনি অনুরূপভাবে পাহাড়ে যাইতেন এবং জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হইয়া একইভাবে আশ্বাস প্রদান করিতেন"।[১৪]

ওহী অবতীর্ণ হইতে বিলম্ব হওয়ার কারণে মহানবী ﷺ চরম হতাশায় ভুগিতেন এবং ইহার ফলে তাঁহার কথিত আত্মহত্যা প্রচেষ্টার কাহিনীর আদৌ কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নাই। ইব্ন হাজার আল-আসকালানী মত প্রকাশ করেন যে, এই কাহিনী আয-যুহরীর সংযোজন ও অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নয়। মহানবী ﷺ নিজে কখনও এইরূপ কোন ঘটনার বর্ণনা প্রদান করেন নাই এবং আয়েশা (রা) বা এমনকি 'উরওয়াহ ইব্ন আয-যুবায়র-এর সূত্রেও এইরূপ ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় নাই।[১৫] মূল ঘটনার সহিত এই অতিরিক্ত সংযোজন মিশ্রিত হইয়া এমনভাবে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে যে, ইহাকে যেন মূল বর্ণনার অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা যে আয-যুহরীর সংযোজন তাহা তাহার মন্তব্য সংবলিত উপবাক্য ঃ من بلغات الزهرى وليس موصولا ("আমাদিগকে অবহিত করা হইয়াছে") হইতে বুঝা যায় এবং তিনি এই উপবাক্য বলিয়া কাহিনী শুরু করেন। যদি ইহা মহানবী ﷺ অথবা আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা হইত তাহা হইলে এই উপবাক্যটি সংযোজনের প্রয়োজন পড়িত না। কারণ বর্ণনাকারিগণের ধারাবাহিক ক্রম শুরুতেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই কাহিনীর দ্বিতীয় প্রয়োগগত ত্রুটি মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী কর্তৃক উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ইহা একটি 'শায' (شاذ = অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক) বিবরণী। বর্ণনাকারিগণের পম্পরার মাধ্যমে ইহাতে মাত্র একবার তাহার নাম আসিয়াছে এবং শেষ হইয়াছে আয-যুহরীকে দিয়া। ইহাদের মধ্যে মা'মার আছেন। যেভাবে এই কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে এবং যদিও বর্ণনাকারীদের মধ্যে মা'মার -এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তবুও কাহিনীর এই অতিরিক্ত সংযোজন মতাবিক কোন কিছুই ঘটে নাই। অথবা হাদীছ বর্ণনাকারীদের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় কাহারও নিকট সাক্ষ্য হিসাবে উদ্ধৃতি দেওয়ার উপযুক্ত বলিয়া এই অতিরিক্ত সংযোজনকে অন্য কোথায়ও ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই।[১৬]

পরিভাষাগত বিবেচনা ছাড়াও মহানবী ﷺ-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তাঁহার পক্ষে এইরূপ আচরণ করা সমর্থন করে না। এই কাহিনীটি বিশ্বাসের একেবারেই অনুপযুক্ত। কারণ ইহাতে শুধু একবার কথিত আত্মহত্যা প্রচেষ্টার কথা বলা হয় নাই, বরং এইরূপ কয়েকবারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যেন জিবরাঈল (আ) কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয়বারের নিশ্চয়তা (অর্থাৎ জিবরাঈলের হেরা পর্বতের গুহায় প্রথম উপস্থিতির পর) মহানবী ﷺ-কে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। একজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই কাহিনীর উদ্ভব এইভাবে হইয়া থাকিতে পারে যে, কেহ হয়ত মহানবী ﷺ -কে বারংবার পাহাড়ে গমন করিতে দেখিয়া বাস্তবে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিরতিকালে তিনি হেরা পর্বতে গিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণায় উপনীত হন যে, মহানবী ﷺ হয়ত নিজকে পাহাড়ের উপর হইতে নিচে নিক্ষেপ করিতে পারেন।[১৭] এইরূপ একটি সন্দেহ একবার যখন প্রচারিত হয়, তখন পরবর্তী কালের বিবরণীসমূহে প্রকৃত তথ্য ও অসত্য ঘটনার আরও মিশ্রণ হইয়া স্বীয় স্থান করিয়া লয়।[১৮]

মহানবী ﷺ -এর আত্মহত্যা প্রচেষ্টার অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন। কিন্তু ইহা সত্য যে, হেরা পর্বতে প্রথম ওহী লাভের কিছু পর তিনি ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর দ্বিতীয়বার সাক্ষাত লাভ করেন। পবিত্র কুরআনে নিম্নবর্ণিতভাবে এই ঘটনার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

ক. وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ .

"সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে" (৮১ ঃ ২৩)।[১৭]

এখানে সে বলিতে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে এবং তাহাকে বলিতে জিবরাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে।

খ.

عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى . ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى . وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى . ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى .

"তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে, অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম" (৫৩ ঃ ৫-৯)।[২০]

এই কাহিনী লইয়া আরও অগ্রসর হওয়ার পূর্বে মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রথম ওহী লাভ সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনা বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হইবে। ইব্ন ইসহাক, ইব্ন সা'দ (অর্থাৎ আল-ওয়াকীদী'র) ও আত-তাবারীর বর্ণনা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

দুই ঃ ইব্ন ইসহাক প্রদত্ত বর্ণনা

বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া ইব্ন ইসহাক প্রথমে বুখারী উদ্ধৃত আয়েশা (রা) -এর বর্ণনার অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। উপরে যেভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেইভাবে ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ ঘুমের মধ্যে চমকপ্রদ স্বপ্ন দেখিতেন এবং তাহা যেন ভোরবেলার আলোর মত উদ্ভাসিত হইত। তারপর নির্জনতা তাঁহার নিকট প্রিয় হইয়া উঠে এবং উহা এতই প্রিয় ছিল যে, উহার চাইতে আর কিছুই তাঁহার প্রিয় ছিল না।[১৯] এই পর্যন্ত আসিয়া ইব্ন ইসহাক ঘটনাটির বর্ণনায় ক্ষান্ত দিয়াছেন এবং 'যে সমস্ত লোক জানে' তাহাদের জানার ভিত্তিতে তিনি আরেকটি ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। যেমন বৃক্ষাদি ও পাথরসমূহ সম্ভাব্য রাসূল ﷺ -কে সালাম করিতেছে।[২২] তারপর ইব্ন ইসহাক আরেকটি বর্ণনার ভিত্তিতে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কাহিনী শুরু করিয়াছেন। তিনি ওয়াহ্ব ইব্ন কায়সান (মৃ. ১২৭ হি.)-এর নিকট হইতে এই বর্ণনা গ্রহণ করেন। বলা হইয়া থাকে যে, এই ওয়াহ্ব ইব্ন কায়সান এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়রকে উবায়দ ইব্ন উমায়র ইব্ন কাতাদা আল-লায়ছী[২৩] (মৃ. ৬৮ হি.)-এর মাধ্যমে বলিতে শুনিয়াছেন যেখানে 'উবায়দ ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেন ঃ

"আল্লাহ্র রাসূল ﷺ প্রতি বৎসর এক মাসের জন্য হেরা পর্বতের গুহায় (يُجَاوِرُ) নির্জনে সময় কাটাইতেন। জাহিলিয়া যুগে কুরায়শগণ এইরূপ এক মাস ধরিয়া তাহান্নুছ-এ সময় কাটাইতে অভ্যস্ত ছিল।[২৪] সুতরাং আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বৎসরের ঐ সময় নির্জনতায় অতিবাহিত করিতেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী গরীবদিগকে তিনি আহার করাইতেন। যখন আল্লাহ্র রাসূল ﷺ মাসব্যাপী সময় যাপন সম্পন্ন করিতেন তখন বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তিনি প্রথম যে কাজটি করিতেন তাহা হইতেছে, কা'বাঘরে গিয়া ইহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিতেন অথবা আল্লাহ যতবার চাহিতেন ততবারই তিনি ইহার তাওয়াফ করিতেন। এই অভ্যাস তিনি ঐ মাস পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছিলেন যে মাসে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সম্মানিত করিতে ইচ্ছা করেন। বৎসরের ঐ মাসে আল্লাহ্ তাঁহাকে নবুওয়াত দান করেন এবং সেই মাসটি হইতেছে রমযান (রামাদান)। সুতরাং আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বরাবরের ন্যায় হেরা পর্বতের উদ্দেশে গমন করেন এবং তাঁহার পরিবার তাঁহার সাথে ছিল। সেখানে তাঁহার অবস্থিতিকালে এক রাত্রে আল্লাহ

তাঁহার বাণী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন এবং এইভাবে তাঁহার বান্দাগণকে সৌভাগ্যে ভূষিত করেন। আল্লাহ্র আদেশে জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট আসেন। আল্লাহ্র রাসূল বলেন, "জিবরাঈল আমার নিকট আসেন, আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম। তাহার হাতে লিখনসহ একটি রেশমী কৌটা ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন, 'পড়'। আমি (মহানবী ﷺ) বলিলাম, 'আমি পড়িতে পারি না।' ইহাতে তিনি আমাকে এত সজোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমার মনে হইতেছিল আমি মরিয়া যাইব। তারপর তিনি আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিলেন, 'পড়।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি পড়িতে পারি না।' ইহাতে তিনি পুন অত্যন্ত শক্তভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আমার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার আদেশ করিলেন, 'পড়'। তখন আমি বলিলাম, 'আমি কী পড়িব?' ইহাতে আবারও তিনি জোরে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, "পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে। পড়, এবং তোমার প্রভু মহা মহিমান্বিত; যিনি শিক্ষা দিয়াছেন কলমের সাহায্যে; শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না"।

মহানবী ﷺ বলেন, 'অতঃপর আমি ইহা পাঠ করিলাম।' তাহার পর ইহার সমাপ্তি ঘটিল, তিনি আমাকে ছাড়িয়া গেলে আমি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলাম। আমার নিকট এইরূপ বোধ হইতেছিল যেন একটি বিরল লিখন আমার হৃদয়ে অংকিত হইয়া গিয়াছে। তারপর আমি গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। পর্বতের মাঝামাঝি জায়গায় থাকাকালে আকাশ হইতে একটি কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম এবং কে যেন বলিতেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি জিবরাঈল।' আকাশের দিকে তাকাইবার জন্য আমি মাথা উপরের দিকে উঠাইলাম এবং স্পষ্টভাবে মানুষের আকৃতিতে জিবরাঈলকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার দুই পা দিগন্তে বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি জিবরাঈল।' ইহাতে আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম এবং সামনে বা পিছনে না গিয়া একভাবে স্থির হইয়া থাকিলাম। তাহার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আমি দিগন্তে দৃষ্টি স্থাপন করিলাম এবং আমি যেদিকেই তাকাই না কেন তাহাকে একই অবস্থানে দেখিতে পাইলাম। সামনে বা পিছনে এক চুলও না নড়িয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং আমার খোঁজে খাদীজা তাহার লোক প্রেরণ না করা পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকিলাম। খাদীজার লোকেরা মক্কার উচ্চ অঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া গেলেও আমি ঐ স্থানে পূর্ববত দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর জিবরাঈল আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।"

"আমি স্থানটি ত্যাগ করিয়া আমার পরিবারে ফিরিয়া আসিলাম এবং খাদীজাকে স্পর্শ করিয়া ও তাহাকে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি (খাদীজা) বলিলেন, 'হে আবুল কাসিম! আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনার অনুসন্ধানে আমার লোকদের মক্কার উচ্চ এলাকায় প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু তাহারা আপনাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে'। তখন আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সবিস্তারে তাহার নিকট বর্ণনা করি। ইহাতে খাদিজা বলিল, "হে আমার পিতার

ভ্রাতুষ্পুত্র! তাঁহার (আল্লাহ্‌র) শপথ যাঁহার হাতে খাদীজার জীবন! আমার মনে হয় আপনি এই সকল লোকের নবী হইবেন"।

"তারপর তিনি উঠিয়া পোশাক পরিধান করিলেন এবং ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফাল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল 'উয্‌যা ইব্‌ন কুসায়্যি-এর নিকট গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁহার চাচার পুত্র এবং খৃস্টান। তিনি বাইবেল পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাওরাত ও ইনজীল গ্রন্থের পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন এবং যাহা তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন খাদীজা অবিকল তাহা ওয়ারাকাকে বিবৃত করেন। ইহা শুনিয়া ওয়ারাকা বলিয়া উঠেন ঃ পবিত্র, পবিত্র, যাঁহার হাতে ওয়ারাকার জীবন সেই পরম সত্তার শপথ! হে খাদীজা, যদি তুমি সত্য বলিয়া থাক তবে অবশ্যই সেই মহান নামূস (জিবরাঈল) যিনি মূসার নিকট আসিতেন, তিনি মুহাম্মাদের নিকট আসিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি এই লোকদের নবী। সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বল।"

তারপর খাদীজা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল-এর সহিত আলোচনার বিষয়বস্তু তাঁহাকে অবহিত করেন। তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তাঁহার বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া (جوارة) কা'বাঘরে গমন করেন এবং কা'বাঘরে যে কাজ করিতে অভ্যস্ত অর্থাৎ কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। সেখানে কা'বাঘর প্রদক্ষিণকারী ওয়ারাকার সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। ওয়ারাকা তাঁহাকে বলেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ তাহা আমাকে বল"। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তাহাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলিলেন। ওয়ারাকা তাঁহাকে বলিলেন, "যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ! তুমি প্রকৃতই এই লোকদের নবী এবং মূসার নিকট যিনি আসিয়াছিলেন সেই মহান নামূস তোমার নিকট আসিয়াছেন। তোমাকে লোকেরা বিশ্বাস করিবে না, তোমাকে কষ্ট দেওয়া হইবে, তুমি নিজ জন্মস্থান হইতে বিতাড়িত হইবে এবং তোমার সহিত যুদ্ধ হইবে। আমি যদি সেই পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহা হইলে, যেমন আল্লাহ জানেন, আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্য করিব"। তখন ওয়ারাকা মহানবী ﷺ -এর দিকে স্বীয় মাথা ঝুঁকাইয়া তাঁহার কপালের মধ্যখানে চুম্বন করিলেন। তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন"।[২৫]

ইহা স্পষ্টভাবে বোধগম্য যে, এই ঘটনা বুখারী শরীফে প্রদত্ত ও ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা হইতে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। এই বিভিন্নতা প্রকৃত তথ্যের বিচ্যুতি, অতিরিক্ত সংযোজন এবং ঈষৎ পরিবর্তনের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তথ্যের বিচ্যুতি প্রসঙ্গে ইব্‌ন ইসহাক প্রদত্ত বিবরণে হেরা পর্বতের গুহায় মহানবী ﷺ -এর তাহান্নুছ পালন কালের পূর্বে উত্তম ও প্রকৃত স্বপ্ন দেখিবার সময়ের কোন উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়ত, জিবরাঈল (আ) -এর সহিত সাক্ষাত ও অভিজ্ঞতার পরিণতির প্রেক্ষিতে মহানবী ﷺ-এর মধ্যে সৃষ্ট ভীতি ও হতভম্ব হওয়ার কোন

ইঙ্গিত দেখা যায় না। সর্বশেষ হেরার গুহায় প্রথম ওহী লাভের পর পরবর্তী ওহী লাভে যে বিরতি ঘটে সে সম্পর্কেও কোন উল্লেখ নাই।

অতিরিক্ত বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইতেছে, এই বিবরণে হেরা পর্বতের গুহায় মহানবী -এর সাময়িক অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে এবং তাহা ছিল প্রত্যেক বৎসর রমযান মাসে কুরায়শগণ কর্তৃক মহানবী -এর অনুরূপ তাহান্নুছ পালনের প্রথা। ইহাতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, মহানবী ইহা প্রতি বৎসরই পালন করিতেন। দ্বিতীয়ত, আরও বলা হইয়াছে যে, মহানবী যখন গুহা হইতে নিচে নামিয়া আসিতেছিলেন এবং পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছাইলে জিবরাঈল (আ) আকাশে পুনঃ আবির্ভূত হইলেন এবং মহানবী -কে নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল । তৃতীয়ত, বিবরণীটি উল্লেখ করে যে, হেরা পর্বত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি প্রথম যে কাজটি করেন তাহা হইল, কা'বাঘরে গমন ও ইহার প্রদক্ষিণ। অবশেষে ওয়ারাকার সহিত খাদীজার সাক্ষাতকার এবং কা'বার চত্বরে ওয়ারাকা মহানবী -এর সহিত কথোপকথনে ইতোপূর্বে খাদীজার নিকট যে মতামত প্রকাশ করেন তাহাই এখানে পুনর্ব্যক্ত করেন। এই বিষয় বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও লক্ষণীয় যে, ইহার পরিবর্তনসমূহ যাহা আয়েশা (রা)-এর বর্ণনাতে যে সকল তথ্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা এই বিবরণীতে আসিয়াছে। প্রথমত উল্লেখ করা যায় যে, তাহান্নুছ-এর জন্য মহানবী যখন হেরার গুহায় গমন করেন তখন তাঁহার সহিত তাঁহার পরিবারবর্গ ছিলেন। দ্বিতীয়ত এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহানবী হেরার গুহায় যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন তখন জিবরাঈল (আ) আসিয়া তাঁহাকে ওহী প্রদান করেন। ইহাতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আ) মহানবী -কে চারবার সজোরে আলিঙ্গন করেন। অন্য বিবরণীতে তিনবারের উল্লেখ আছে এবং দুইবার মহানবী জিবরাঈল (আ)-কে বলেন যে, তিনি পড়িতে জানেন না এবং দুইবার জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি কী পড়িবেন। তৃতীয়ত, এই বিবরণীতে খাদীজা (রা) একাকী ওয়ারাকার নিকট গিয়া তাঁহার স্বামীর ঘটনার বিষয়ে ওয়ারাকার মতামত প্রার্থনা করেন।

এখানে লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয় হইবে যে, এই বিবরণীর চূড়ান্ত প্রামাণ্য সাক্ষী হইতেছেন 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়র ইব্ন কাতাদা যিনি একজন তাবিঈ। তিনি কিন্তু তাঁহার বর্ণিত তথ্যের কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। বিবরণীটি তাই যুক্তির দিক হইতে মুরসাল অর্থাৎ মহানবী -এর পর কেবল দ্বিতীয় স্তরের। ব্যাখ্যা প্রদানের ইহা একটি স্বীকৃত নীতি যে, যদি একটি মুরসাল বিবরণ এমন একটি বিবরণের সহিত ভিন্নতর হয় যাহার ইসনাদ মহানবী পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতা ও ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে নাই (মাওসূল, মারফূ) তাহা হইলে শেষোক্তটি গ্রহণযোগ্য হইবে। অতঃপর ইব্ন ইসহাক কর্তৃক উদ্ধৃত 'উবায়দ ইব্ন উমায়র-এর বর্ণনাটির বুখারী শরীফে উল্লিখিত

বর্ণনাটির সহিত ভিন্নতা রহিয়াছে এবং সেই ক্ষেত্রে বুখারী শরীফের বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্যতা পাইবে। যাহাই হউক না কেন, মহানবী ﷺ-এর নিদ্রিত অবস্থায় হেরা পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী লাভ এবং সেই সময় তিনি স্বপ্নাবস্থায় ছিলেন এইরূপ বিবরণী আয়েশা (আ)-এর স্পষ্ট বর্ণনার প্রেক্ষিতে কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ-এর জাগ্রত অবস্থায় এবং পূর্ণ সচেতনতায় প্রথম ওহী নাযিল হইয়াছিল। কোন কোন ভাষ্যকার অবশ্য এই দুইটি ঘটনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, প্রথমে স্বপ্নে এবং পরে জাগ্রত অবস্থায় ওহী গৃহীত হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যায় যদিও হেরা গুহায় ওহী লাভ করিবার পূর্বেকার সময়ে সুস্বপ্ন দেখার তথ্যের সহিত কিছু পরিমাণ মিল রহিয়াছে তবুও এই তথ্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র এই স্বপ্নের ঘটনাটি হেরার গুহার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত বিবেচনাধীন বর্ণনাটি মহানবী ﷺ -এর প্রাথমিক পর্যায়ের স্বপ্ন দেখার সহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্জন ইবাদত ও ধ্যানের (তাহান্নুছ) সহিত তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত হইয়াছে। তাহা হইল, মহানবী ﷺ -এর জাগ্রত ও পূর্ণ সচেতন অবস্থায় হেরা পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হইয়াছিল। ঘটনাটির আরেকটি প্রেক্ষিতে তথ্যের এই মিশ্রণ মোটামুটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহাতে দেখা যায় যে, মহানবী ﷺ কথিত স্বপ্ন দেখিবার পরপরই তিনি গুহা হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং পর্বতের মাঝামাঝি স্থানে আসিবার পর তিনি জিবরাঈল (আ)-কে আকাশে দেখিতে পান। তবে অন্য বর্ণনামতে ইহা প্রথম ওহী নাযিলের বিরতির পরে ছিল না।[২৬]

অবশ্য ইহাও সঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না যে, কুরায়শগণ প্রতি বৎসর রমযান মাসে তাহান্নুছে নিজদিগকে নিমগ্ন রাখিত এবং কুরায়শদের এই প্রথার অনুকরণে মহানবী ﷺ নিজকে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানে নিরত রাখিতেন। তদুপরি তিনি তাঁহার পরিবারসহ নির্জনে কাল কাটাইতেন—এই বক্তব্য নির্জনে অবস্থান ও ইবাদতের ধারণার সহিত সঙ্গতিহীন। কারণ নির্জনে গভীর ধ্যান ও ইবাদত তাহান্নুছের একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্য আর একটি বিবরণী যথা খাদীজা (রা) মহানবী ﷺ-এর অনুসন্ধানে তাঁহার লোকদের প্রেরণ করেন এবং তিনি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা অবস্থায় আকাশে অবস্থানকারী জিবরাঈল (আ)-এর দিকে তাকাইয়াছিলেন, ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। এই বর্ণনা হইতে এমন ধারণা করা যায় যে, মহানবী ﷺ যখন গুহায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার পরিবার পর্বতের আরেকটি অবস্থানে ছিলেন। এই অবস্থানস্থলটি পর্বতের ব্যাপ্তি বা আকার দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয় না তেমনি জনহীন পর্বতে তাহাদিগকে টানিয়া আনিবার কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এমনকি তারপরও ইহা অসম্ভব যে, খাদীজা (রা) যদি আদৌ পর্বতে গিয়া থাকেন তবুও মহানবী ﷺ-এর অবস্থান সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। স্পষ্টতই এখানে একটি ঘটনাকে মিশ্রিত করিয়া ফেলা হইয়াছে যাহা আরেকটি প্রসঙ্গে ঘটিয়াছিল। ইহা খুব সম্ভব ওহী নাযিলের বিরতিকালে মহানবী ﷺ-এর হেরা পর্বতে যাতায়াতকালে ঘটিয়া থাকিতে পারে।

বিবরণীতে এই সকল অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও ইহা আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের মূল সত্যকে সাধারণভাবে সমর্থন করে। যেমন ঃ (ক) মহানবী ﷺ জিবরাঈল (আ)-এর নিকট হইতে হেরা পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী লাভ করেন; (খ) পরবর্তীতে মহানবী ﷺ আকাশে জিবরাঈল (আ)-কে আবির্ভূত হইতে দেখেন এবং শুনিতে পান যে, জিবরাঈল (আ) নিজকে জিবরাঈল বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিশ্চয়তার বাণী শুনাইতেছেন যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্র রাসূল ﷺ; এবং (গ) ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল যখন হেরা পর্বতের ঘটনা জানিতে পারেন তখন তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই ফেরেশতাই (নামূস) আল্লাহ তা'আলার বাণী লইয়া মূসা (আ)-এর নিকট আসিতেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র নিকট হইতে এরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছেন।

তিন ঃ আল-ওয়াকিদী প্রদত্ত বর্ণনা

সময়ের প্রেক্ষিতে পরবর্তী বর্ণনা হইতেছে আল-ওয়াকিদীর (মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার (১২০-২০৭ হি.) যাহা তাঁহার সচিব মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (১৬৮-২৩০ হি.)-এর মাধ্যমে আসিয়াছে।

১. আল-ওয়াকিদী বুখারী শরীফে উল্লিখিত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার প্রথম দিকের অংশবিশেষ প্রথমে উদ্ধৃত করেন, তবে ভিন্ন সনদে অর্থাৎ মা'মার ইব্ন রাশিদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ সূত্রে। বস্তুত হাদীছের এই অংশটি বুখারী শরীফে প্রদত্ত হাদীছের অনুরূপ। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ প্রথমদিকে কিছু দিন সুস্বপ্ন (অথবা সত্য) দেখিতেন এবং ইহার পর তাঁহার নিকট নির্জনতা এতই পছন্দনীয় হইয়া উঠে যে, ইহার চাইতে আর কিছুই তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল না। তাঁহার পর হেরা পর্বতের গুহায় একটানা কয়েক দিন ধরিয়া তাহান্নুছে নিজকে নিয়োজিত রাখেন। খাবার সংগ্রহের জন্য তিনি মাঝে মাঝে পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিতেন যাহাতে গুহায় নির্জনবাস করা সম্ভবপর হয়। তাঁহার নিকট সত্য না আসা পর্যন্ত এইভাবে তাঁহার গুহাবাস চলিতে থাকে।[২৭]

(২) এই বিষয়ে আল-ওয়াকিদী আরেকটি হাদীছের অবতারণা করেন, যাহা তিনি ইবরাহীম ইব্ন ইসমা'ঈলের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। হাদীছটি ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈ'ল পান দাঊদ ইবনুল হুসায়ন হইতে। ইহার পর ইহা ধারাবাহিকভাবে 'ইকরিমা এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সংগৃহীত হয়। বলা হইয়া থাকে যে, ইব্ন আব্বাসের বর্ণনামতে মহানবী ﷺ আজয়াদে যখন ঐরূপ অবস্থায় (অর্থাৎ সম্ভবত ওহী الحق। প্রাপ্তির পরবর্তী) ছিলেন তখন আকাশের দিগন্তে একজন ফেরেশতাকে এক পায়ের উপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রাখিয়া বসা অবস্থা দেখিতে পান। তিনি নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন এবং নিজকে জিবরাঈল বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মহানবী ﷺ ভীত হইয়া পড়েন এবং আকাশের অন্যান্য দিকে তাকাইতে থাকেন। কিন্তু তিনি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই এই ফেরেশতাকে দেখিতে পান। এই কারণে মহানবী ﷺ দ্রুত বাড়ী ফিরিয়া খাদীজা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং নিজের আশংকার

কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি হয়ত একজন ভবিষ্যৎবক্তা হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন যাহা তিনি সবচাইতে বেশি অপছন্দ করেন। মেধা ও মননের যে গুণাবলী তাঁহার রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া খাদীজা (রা) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তিনি ওয়ারাকার নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। ওয়ারাকা বলেন যে, ইনি হইতেছেন মহান নামূস যিনি তাঁহার স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং ইহা তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক পর্যায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার স্বামীর ভাল ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তার প্রয়োজন নাই।[২৮]

৩. আল-ওয়াকিদী পরবর্তীতে অন্য দুইটি বিবরণী পরপর উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি ইহা ভিন্ন ভিন্ন ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। এই দুইটি বিবরণীই উল্লেখ করে যে, মহানবী ﷺ কখনও কখনও জ্যোতি দেখিতেন ও শব্দ শুনিতেন এবং স্ত্রীর নিকট তাঁহার ভীত হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া আশঙ্কা করিতেন যে, তিনি সম্ভবত কোন ভবিষ্যৎবক্তা আখ্যায়িত হইতে পারেন। খাদীজা (রা) তাঁহার মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। এই বিবরণীর একটিতে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি হয়ত পাগল হইয়া যাইতে পারেন—এইরূপ ভীতির কথা তাঁহার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া খাদীজা (রা) ওয়ারাকার নিকট গমন করিলে তিনি বলেন যে, তাহার স্বামীর নিকট যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন তিনি হইতেছেন 'নামূস' এবং তাহার স্বামী নবী হইবেন। ওয়ারাকা যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বামীকে সাহায্য করিবেন।[২৯]

৪. ইহার পর ওয়াকিদী তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হইতে সংগৃহীত তিনটি পৃথক হাদীছ পেশ করেন। ইহাদের দুইটির বিবরণ এইরূপ ঃ প্রথম যে বিষয়টি মহানবী ﷺ এর নিকট প্রকাশিত হয় তাহা ছিল সূরা 'আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত। আল-ওয়াকিদী উল্লেখ করেন যে, হেরা পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের দিন ইহা সংঘটিত হয়।[৩০] তৃতীয় হাদীছটি দাউদ ইবনুল হুসায়ন-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি গাতাফান ইব্ন তারীফ-এর নিকট হইতে এবং গাতফান ইব্ন আব্বাসের নিকট হইতে হাদীছটি সংগ্রহ করেন। হাদীছটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হেরার গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর মহানবী ﷺ বেশ কয়েক দিন জিবরাঈল (আ)-কে দেখিতে পান নাই। এই কারণে তিনি বিষন্ন হইয়া পড়েন এবং নিজকে পর্বতের উপর হইতে নিচে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে বারবার ছাবীর ও হেরা পর্বতে গমন করেন। একবার তিনি যখন কোন একটি পর্বতে যাইতেছিলেন তখন তিনি আকাশ হইতে একটি কণ্ঠস্বর শুনিতে পান। তিনি আকাশের দিকে তাকাইলে জিবরাঈল (আ)-কে একটি চেয়ারে এক পা আরেক পায়ের উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া বসিয় থাকিতে দেখেনে। তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্যই আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি জিবরাঈল"। মহানবী ﷺ তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার মন শান্ত হইল। ইহার পর হইতে কোন বিরতি ছাড়া নিয়মিত ওহী নাযিল হইতে থাকে।[৩১]

এখন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতবর্গ আল-ওয়াকিদীর বিশ্বাসযোগ্যতাকে খুব নিম্ন পর্যায়ের বলিয়া রায় দিয়াছেন। কিন্তু কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতিরেকে এই হাদীছে যেসব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিচে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমত, ইহা বলা হইয়া থাকে যে, প্রকৃত স্বপ্নের একটি প্রাথমিক পর্যায় ছিল সত্য স্বপ্ন এবং যাহার পরে মহানবী নির্জনে কালাতিপাত করিতে পছন্দ করিতে শুরু করেন।

দ্বিতীয়ত, উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহানবী একটানা বেশ কিছুদিন হেরা গুহায় নির্জনে সময় অতিবাহিত করিতেন এবং খাবার-দাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করিতেন। এই হাদীছে ইহার উল্লেখ নাই যে, মহানবী -এর পক্ষে এই তাহান্নুছ পালন কুরায়শদের সামাজিক প্রথার অনুকরণ ছিল এবং ইহাতে এমন কোন ইঙ্গিত নাই যে, মহানবী -এর পরিবার তাঁহার সহিত পাহাড়ে গিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত, ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হেরা পর্বতের গুহাতেই প্রথম ওহী নাযিল হয় এবং এই ওহীতে সূরা 'আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফেরেশতা কিভাবে হেরা গুহায় উপস্থিত হইলেন এবং কুরআনের প্রথম পাঠ শুনাইলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণের কোন উল্লেখ নাই। একই সাথে এমন কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই যে, মহানবী -এর নিদ্রিত অবস্থায় (স্বপ্নযোগে) এই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল।

চতুর্থত, আল-ওয়াকিদীর একটি হাদীছের বর্ণনানুযায়ী দিগন্তে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-কে দেখিতে পাওয়ার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ইহা আজয়াদে ঘটে। পক্ষান্তরে তাঁহার আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী -এর ছাবীর ও হেরা পর্বতে বারবার যাতায়াতকালে ইহা ঘটিয়াছিল। প্রথম ওহী নাযিলের পর বেশ কিছু দিন ফেরেশতার আবির্ভাব না ঘটায় মহানবী বারংবার পর্বত দুইটিতে আসা-যাওয়া করিতেন। এই তথ্যটি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিরতির সত্যকে সমর্থন করে।

পঞ্চমত, মহানবী -এর পর্বতের উপর হইতে নিচে নিজকে নিক্ষেপ করিবার কথিত অভিপ্রায় প্রসঙ্গে অভ্রান্তভাবে ইহা দেখা যায় যে, বর্ণনাকারীর ইহা ছিল অনুমানমাত্র এবং এই ক্ষেত্রে তাহা হয় ইব্ন আব্বাসের অথবা তাঁহার পরবর্তী অন্য কোন বর্ণনাকারীর হইতে পারে।

ষষ্ঠত, ওয়ারাকার সহিত আলোচনার প্রসঙ্গে আল-ওয়াকিদীর একটি হাদীছ মোতাবেক বর্ণিত আজয়াদে ফেরেশতাকে দেখিবার পর এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে অন্য হাদীছ মতে মহানবী -এর কখনও কখনও জ্যোতি দেখিতে ও শব্দ শুনিতে পাওয়ার পর ইহা ঘটিয়াছিল। এই দুইটি শেষ পয়েন্ট (অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ) ব্যতিরেকে আল-ওয়াকিদী যেভাবে তথ্য উপস্থাপন করিয়াছেন উহার আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ও বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

চার ঃ আত-তাবারীর বর্ণনা

আল-ওয়াকিদীর রচনার এক শত বৎসরের ও অধিক কাল পরে আত্‌-তাবারী (২২৪–৩১০ হি.) ইব্‌ন ইসহাকের বিবরণী পুনরোল্লেখ করেন যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনরোল্লেখের সময় শব্দের ঈষৎ পরিবর্তন এবং মূল পাঠের সামান্য সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়। অন্যথায় তাহার নাম উল্লেখসহ যথাসাধ্য মূল পাঠের কাছাকাছি থাকিয়াছেন।[৩২] ইব্‌ন ইসহাকের বিবরণীর উপর তাহার বর্ণনা প্রকাশ করিবার পূর্বে আত্‌-তাবারী যাহা হউক ঘটনাটির আর একটি বিবরণ উপস্থাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, তিনি ইহা আহমাদ ইব্‌ন 'উছমান (আবূ জাওরা')-এর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীছটি সংগ্রহের পরম্পরা হইতেছে ঃ ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন জারীর হইতে আহমাদ ইব্‌ন 'উছমান, ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন জারীর তাহার পিতা জারীর হইতে, জারীর নু'মান ইব্‌ন রাশেদ হইতে, রাশেদ আয-যুহরী হইতে, তিনি 'উরওয়া হইতে, আর 'উরওয়া আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাকের বিবরণী হইতে এই বিবরণীকে এরূপ তথ্য দ্বারা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় যে, পরবর্তী ব্যক্তির বিবরণীর সূত্র যেখানে উবায়দ ইব্‌ন উমার পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে তাহা হইলে তাহা মুরসাল বলিয়া পরিগণিত হইবে। আত্‌-তাবারীর হাদীছটি আয-যুহরী ও 'উরওয়া-এর মাধ্যমে আয়েশা (রা) পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই হাদীছের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) হাদীছের প্রথম অংশে বর্ণিত তথ্যসমূহ বুখারী শরীফে উল্লিখিত হাদীছের তথ্যের সহিত অবিকল মিল রহিয়াছে। যেমন ঃ সত্য ও উত্তম স্বপ্ন দোখিবার প্রারম্ভিক কাল, ইহার পর মহানবী ﷺ-এর নির্জনবাসের প্রতি অনুরাগ, তাঁহার একাকী ইবাদত এবং হেরার গুহায় একটানা কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার অবস্থান, গুহায় একাকী অবস্থানের উদ্দেশ্যে পরিবারের নিকট হইতে মাঝে মাঝে খাবার সংগ্রহের জন্য আগমন এবং তাঁহার নিকট সত্য উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার এই সকল কার্যক্রম। এই বিষয়টির আলোকে বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছের সহিত ইহার যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় উহা নিম্নরূপ ঃ মহানবী ﷺ বলিয়াছেন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে ঃ

(খ) অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলিলেন, 'ইহা শুনিয়া আমি যদিও দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। তারপর আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিলাম এবং আমার হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিতেছিল। আমি খাদীজার নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আমাকে ঢাকিয়া দাও, আমাকে ঢাকিয়া দাও। আমার ভীতি দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি কম্বলে ঢাকা অবস্থায় রহিলাম। তখন তিনি (ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। মহানবী ﷺ বলেন, 'ইহাতে আমার বোধ হইতেছিল যে, আমি যেন নিজকে পর্বতের উপর হইতে নিচে নিক্ষেপ করিতেছি এবং আমি যখন তেমনই করিতে চাহিলাম তখনই তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আমি জিবরাঈল এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।'

তখন তিনি আমাকে আদেশ করিলেন, "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন"। অতঃপর আমি পড়িলাম। তারপর আমি খাদীজার নিকট আসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আমি আমার জীবন সম্পর্কে শংকিত হইয়া পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন ....."।

(গ) এই দফা হইতে বর্ণনাটি পুনঃ বুখারী শরীফে উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ অর্থাৎ মহানবী ﷺ -এর প্রতি খাদীজার সান্ত্বনাসূচক কথাবার্তা, তাঁহাদের ওয়ারাকার নিকট গমন, ওয়ারাকার অভিমত যে, জিবরাঈল ফেরেশতা (নামূস) আল্লাহ্‌র ওহী লইয়া আসিয়াছিলেন, মহানবী ﷺ -এর নিজের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে ইত্যাদি এবং বর্ণনার শেষে রহিয়াছে ওয়ারাকার মন্তব্য যে, তিনি সেই সময় পর্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি মহানবী ﷺ -কে সর্বোতভাবে সাহায্য করিবেন।

এই হাদীছটি যদিও আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে শুরু হইয়া আয-যুহরী ও 'উরওয়া'র মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে তবুও নিম্নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হাদীছের সহিত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় ঃ

১. ইহাতে বলা হইয়াছে যে, হিরা গুহায় মহানবী ﷺ -কে ফেরেশতা প্রথম যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেছে তিনি (মহানবী ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল।

২. গুহা হইতে মহানবী ﷺ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পর ফেরেশতা পুনঃ আবির্ভূত হন এবং বলেন যে, তিনি (মহানবী ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল।

৩. ফেরেশতার দ্বিতীয়বার উপস্থিত হওয়ার এবং মহানবী ﷺ -কে দ্বিতীয়বার আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে অভিহিত করিবার পর তিনি (মহানবী ﷺ) নিজকে পাহাড়ের উপর হইতে নিচে নিক্ষেপ করিবার বিষয়ে চিন্তা করেন।

৪. তিনি যখন প্রায় নিজকে নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হন তখন জিবরাঈল ফেরেশতা তৃতীয়বার উপস্থিত হইয়া নিজকে জিবরাঈল বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং মহানবী ﷺ -কে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁহাকে সূরা 'আলাক -এর প্রথম আয়াত পাঠ করান।

৫. মহানবী ﷺ যে পড়িতে অক্ষম ছিলেন ইহার কোথাও কোন উল্লেখ নাই।

৬. ওহী নাযিল হওয়ার বিরতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।

অতএব ইহা এখন স্পষ্ট যে, আয়েশা (রা) অথবা এই বিষয়ে আয-যুহরী একই ঘটনার উপর দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণী দিতে পারিতেন না। যদি এখানে বর্ণিত তথ্য সত্য হইয়া থাকে এবং তাহা যে কোনভাবেই হউক না কেন বাদ পড়িয়া গিয়া অথবা তাহাদের চক্ষু এড়াইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের তাহাদের তথ্য সংগ্রহের সূত্রের উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু এই বিষয়ের কিছুই এখানে অথবা অন্য কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। এমনকি আয-যুহরী যেমন অনুমান করেন সে অনুযায়ী বুখারী শরীফে উল্লিখিত কথিত আত্মহত্যা প্রচেষ্টার

ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে এখানে বলা হইয়াছে। এইরূপে আয-যুহরী হয়ত উল্লেখ করিতে পারিতেন যে, ওহী নাযিল হইতে বিলম্বের কারণে মহানবী ﷺ পাহাড়ের উপর হইতে নিচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং মহানবী ﷺ তাহা করিতে নিজকে নিরস্ত্র করেন যখন জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। পক্ষান্তরে বর্তমান বিবরণীটি কেবল ওহী নাযিল হওয়ার বিরতির কোন উল্লেখই করে নাই, ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছে যে, মহানবী ﷺ আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফেরেশতা জিবরাঈল দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হইয়া মহানবী ﷺ -কে নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। এই বিবরণীর চরম অযৌক্তিকতা ছাড়াও ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আয-যুহরী নিজে ঘটনাটির কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে এই ধরনের পরস্পরবিরোধী ও বিপরীতধর্মী বর্ণনা দিতে পারিতেন না।

তাই উহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আয-যুহরীর পরবর্তী বর্ণনাকারিগণ অথবা তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের মাধ্যমে আত-তাবারীর নিকট এই বিবরণী পৌঁছিয়াছে, তাহারা শুধু আয-যুহরীর নিজের বর্ণনাকেই তালগোল পাকাইয়া ফেলে নাই, বরং অন্য বিষয়ের সহিত মূল ঘটনাটিকে মিশাইয়া ফেলিয়াছে। বস্তুত কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মতামত সম্পূর্ণ এক নয়। উহাহরণস্বরূপ নু'মান ইব্ন রাশেদের নাম করা যাইতে পারে। বলা হইয়া থাকে যে, তিনি আয-যুহরীর নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছেন। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক যোগ্য পণ্ডিত নু'মান ইব্ন রাশেদকে খুবই 'দুর্বল ও বিভ্রান্ত' বলিয়া অভিহিত করেন। কারণ তিনি প্রচুর ভুল ও ভিত্তিহীন অনুমান করিতেন। এমনকি ইহাও বলা হয় যে, তিনি নিন্দনীয় ও অর্থহীন বিবরণ দিয়াছেন এবং তাহাকে পরিহার করা বাঞ্ছনীয় হইবে।[৩৩]

অনুরূপভাবে জারীরকেও (ইব্ন হাযম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শুজা আল-আযদী) প্রচুর ভুল করা, তাহার বর্ণনাকৃত হাদীছের সহিত স্বীয় অনুমানের মিশ্রণ, ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার মধ্যে পরিবর্তন সাধন এবং এমনকি নিন্দনীয় বিবরণীর জন্য নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় না।[৩৪] বলা হইয়া থাকে যে, তিনি আন-নু'মান ইব্ন রাশেদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পুত্র ওয়াহ্বও ভুল করিতেন এবং তিনি তাহার পিতার নিকট হইতে কোন নজীর হিসাবে বিবরণী গ্রহণ করিতেন। জানা যায় যে, যাহাদের নিকট কোন হাদীছ শুনেন নাই তাহাদের নামে তাহার বর্ণনার উৎস হিসাবে উল্লেখ করিতেন। "শু'বা হইতে" তিনি এরূপ প্রায় চার হাজার হাদীছ বর্ণনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেইসব বর্ণনা ছিল আবদুর রহমান আর-রাসসাসী-এর।[৩৫]

স্পষ্টতই এরূপ বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা আবশ্যক এবং হাদীছ ব্যাখ্যার স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী এই সকল বর্ণনাকে একই বিষয়ের উপর বর্ণনাকারীদের উপরে কোন মতেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে না।

আত্-তাবারীর পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থাবলীতে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনুসরণ করিবার তেমন কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ মূল কাহিনীতে কোন কিছু নূতন বা নির্ভরযোগ্য

তথ্য সংযোজনে তাহাদের করণীয় কিছু নাই। সবকিছু বিচার করিয়া মহানবী ﷺ -এর উপর প্রথম ওহী নাযিলের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আয়েশা (রা) দিয়াছেন এবং তাহা বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপরে যে সকল বর্ণনা লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহা এবং এই বর্ণনা হইতে নিচের তথ্যসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্যে তাহারা যেসব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন তাহা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

১. তাহার আহ্বানের প্রাক্কালে মহানবী ﷺ চমকপ্রদ স্বপ্ন দেখিবার একটি প্রারম্ভিক পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই স্বপ্ন তাঁহার নিকট ভোরবেলার সূর্যালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইত।

২. ইহার পর তিনি নির্জনবাস পছন্দ করিতে শুরু করেন এবং হেরা পর্বতের উপরে অবস্থিত গুহায় তিনি একাকী ইবাদত ও গভীর ধ্যানে একটি সময় অতিবাহিত করেন।

৩. হেরা পর্বতের গুহায় জিবরাঈল ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া প্রথম ওহী নাযিল করেন।

৪. হেরার গুহায় প্রথম সাক্ষাতের পরপরই মহানবী ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে আকাশে আবির্ভূত হইতে দেখেন এবং জিবরাঈল (আ) তাঁহার নাম ধরিয়া আহ্বান করত স্বীয় পরিচয় প্রদান এবং তিনি (মহানবী ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল তাহার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

৫. মহানবী ﷺ জিবরাঈল ফেরেশতার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করেন তাহা বাহিরের কোন বিষয়। বাহিরের সূত্র হইতে প্রাপ্ত ইহা ছিল একটি সুস্পষ্ট পাঠ এবং ইহা তাঁহার স্বীয় ধ্যান বা চিন্তা-প্রসূত কোন ফসল ছিল না। হেরা পর্বতের অনন্য অভিজ্ঞতা তাঁহার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কোন দৃশ্য ছিল না।

৬. আল্লাহ্র তরফ হইতে নাযিলকৃত ওহী লাভের পর মহানবী ﷺ-এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল একজন ব্যক্তির যিনি জীবনে এইরূপ ঘটনার কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার নূতন অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে তিনি প্রথমদিকে নিশ্চিত ছিলেন না। ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল-এর সহিত তাঁহার আলোচনার পর তাঁহার চিত্ত স্থিরতা লাভ করে।

৭. আল্লাহ্র ওহী লাভের পূর্বে মহানবী ﷺ একজন নবীর ভূমিকা পালনের জন্য কোনরূপ চিন্তা বা পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

৮. হেরার গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের পর ওহী প্রাপ্তিতে একটি বিরতি ঘটে। ওহী লাভের এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইবার জন্য ইহা ছিল একটি দম ফেলার অবসর মাত্র।

পাঁচ ঃ প্রথম প্রত্যাদেশ বা ওহী নাযিলের তারিখ

নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতবর্গ সাধারণভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হেরা পর্বতে মহানবী ﷺ যখন প্রথম ওহী লাভ করেন তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।[৩৬] একজন বিশেষজ্ঞ

পণ্ডিতের মতে[৩৭]. কুরআনের ৪৬ ঃ ১৫ নং আয়াতে এই তথ্য সম্পর্কে একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহা মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভের জন্য একজন বান্দার আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপযুক্ত সময় বলিয়া বিবেচিত হয়। বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ রবীউল আওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ভিত্তিতে হিসাব করিলে তাঁহার বয়সের চল্লিশতম বৎসর ঐ সালের ঠিক ঐ মাসেই পূর্ণ হয়। যদি তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার সময় তিনি তাঁহার চমকপ্রদ ও প্রকৃত স্বপ্ন দেখিবার প্রারম্ভিক কাল আরম্ভ হয় এবং যদি হেরা পর্বতের গুহায় তাঁহার তাহান্নুছ পালনকাল হিসাবে গণ্য করা হয় তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহী লাভের ঘটনা ঘটে।[৩৮] কবুআনের আনুপূর্বিক বর্ণনার সহিত ইহার চমৎকার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। যেমন কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয় (অর্থাৎ রবীউল আওয়ালের পর ষষ্ঠ মাসে)। কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ .

"রামাদান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে" (২ ঃ ১৮৫)।

কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্য এই আয়াতে 'ফী' (فى) অব্যয়টি 'সম্বন্ধে' এই ভাবধারায় ব্যাখ্যা করেন এবং তাহারা বলেন যে, আয়াতটির অর্থ হইতেছে রমযান 'বিষয়ে' কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে (এবং এই মাসে রোযা রাখিতে হইবে)।[৩৯] লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট অব্যয়টি 'সম্বন্ধ' বা 'বিষয়ের' ভাবধারায় কখনও কখনও ব্যবহৃত হইলেও এই ভাবধারায় ইহার অর্থটি এখানে অতি দূরবর্তী ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। কারণ আয়াতটিকে মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসাবে কুরআনকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, আয়াতটির অর্থগত সমগ্র দায়িত্ব রমযান মাসের উপর নয়, কুরআনের উপর অর্পিত হইয়াছে। অবশ্য এইরূপ একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করান হইলে তাহা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ, যথা তাওহীদ, সালাত ও যাকাত-এর প্রাসঙ্গিক গুরুত্বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না। কুরআনে এই বিষয়সমূহের উপর সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যদি কোন একটি একক বিষয়কে চিহ্নিত করিয়া যাহার সম্বন্ধে কুরআন নাযিল হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে সেই বিষয়টি হইবে তাওহীদ। কারণ সমগ্র কুরআন যে কোনভাবে হউক ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত। অবশ্য সালাত ও যাকাতের উপর কুরআনে বারবার ও বিশেষ জোরের সহিত গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। তবুও কুরআনের কোথাও আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই না যে, এই বিষয়সমূহের যে কোন একটির প্রেক্ষিতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব ইহা আয়াতটির বর্ণনা প্রসঙ্গ এবং কুরআনের সামগ্রিক বিষয়বস্তুর সহিত সঙ্গতিহীন হইত যদি সংশ্লিষ্ট আয়াতটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কুরআন রমযান সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে বলা হয়।[৪০]

যাহা হউক, ইহা কেবল উপরোল্লিখিত আয়াতটিতেই নয়, বরং কুরআনের অন্য দুইটি আয়াতেও সুনির্দিষ্টভাবে রমযান মাসে কুরআন নাযিল হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হওয়া এবং মাসটির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী অংশকে বুঝান হইয়াছে। আয়াত দুইটি নিম্নরূপ ঃ

حٰمٓ . وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ . اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ . . . .

"হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের! আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে... (৪৪ ঃ ১-৩)"।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ . . .

"আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে..." (৯৭ ঃ ১)।

এই দুইটি আয়াত, বিশেষ করিয়া প্রথমটি সুস্পষ্টভাবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছে। কারণ আয়াতের ঠিক পূর্বে (অর্থাৎ ৪৪ ঃ ২) বিশেষভাবে কিতাবের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য উপরে উদ্ধৃত উভয় আয়াতের সুস্পষ্ট সংশ্লিষ্টতা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রারম্ভকে প্রকাশ করে। কারণ ইহা সুপরিচিত যে, সমগ্র কুরআন মহানবী ﷺ-এর নিকট তেইশ বৎসর ধরিয়া কিস্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আরও উল্লিখিত হইতে পারে যে, কুরআন ও কিতাব পরিভাষাদ্বয় কুরআনের সর্বত্র 'সমগ্র ও ইহার অংশবিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এইভাবে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, মহানবী ﷺ -এর নিকট রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে ইহা 'শক্তির রাত্রে' অথবা 'মহিমান্বিত রাত্রে' অবতীর্ণ হইয়াছিল।[৪১] বেশ কিছু সংখ্যক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, এই রাতটি রমযান মাসের শেষ দশ দিনের কোন একটি রাত হইবে।[৪২] একটি বিবরণে নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় যে, রমযান মাসের ২১ তারিখে মহানবী ﷺ -এর নিকট প্রথম ওহী নাযিল হয়।[৪৩] অন্য আরও একাধিক বিবরণীতে উল্লেখ দেখা যায় যে, মহানবী ﷺ বলেন, তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই সোমবারেই প্রথম ওহী লাভ করেন।[৪৪] একটি সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে, রমযান মাসের ২০ তারিখের পর প্রথম সোমবার মহানবী ﷺ -এর বয়সের ৪১তম বৎসর ২১ রমযান হয়। অতঃপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, হেরা পর্বতে নাযিলকৃত প্রথম ওহী মহানবী ﷺ -এর ৪১ বৎসর বয়সে (৬১০ – ৬১১ খৃস্টীয় বৎসর) ২১ রমযানের রাত্রে আসে। এই প্রসঙ্গে ৩টি বিবরণীর নজীর উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেখানে যথাক্রমে ১৭, ১৮ ও ২৪ রমযানকে প্রথম ওহী নাযিলের তারিখ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪৫] লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই বিবরণসমূহের কোনটিই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ এই সকল হাদীছ বর্ণনাকারীদের কেহই মহানবী ﷺ-এর সময়কার নহেন এবং তাহাদের ধারাবাহিক ক্রমে হয় অপরিচিত (مجهول) নতুবা অবিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাই এই সকল বর্ণনাকে পূর্বোল্লিখিত নির্ভরযোগ্য হাদীছের উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না।

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ওহী নাযিলের শুরু বর্ণনা করিতে গিয়া ইব্‌ন ইসহাক উদ্ধৃতি দিয়াছেন, উপরে উল্লিখিত আয়াত ছাড়াও ৮ ঃ ৪১ (সূরা আনফাল)-এ বলা হইয়াছে, "...... যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাহাতে যাহা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম যখন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল..."। ইব্‌ন ইসহাক সম্ভবত "যাহা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়া ছিলাম" ইহার অর্থ করিয়াছেন, মহানবী -এর নিকট কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি এবং চিহ্নিত করিয়াছেন যে, এখানে যে দিনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বদর যুদ্ধের এবং এই যুদ্ধ ১৭ রমযান শুক্রবার (২ হি.) অনুষ্ঠিত হয়।[৪৬] এই হাদীছের সমর্থনে আত-তাবারীও এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়াছেন যাহাতে প্রথম ওহী নাযিলের তারিখ ১৭ রমযান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৪৭] তাহাদের অনুসরণ করিয়া কিছু সংখ্যক আধুনিক পণ্ডিত এই আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, রমযান মাসের ১৭ তারিখে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। অধিকন্তু আয়াত ৪৪ ঃ ৩ ও ৯৭ ঃ ১ - এ যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত তারিখের সমতা রাখিবার জন্য অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ঐ বৎসরে 'মহিমান্বিত রাত্রি' বা 'শক্তির রাত্রি' ১৭ রমযান তারিখে ছিল।[৪৮]

এখন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আয়াত ৮ ঃ ৪১-এ বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আয়াতের "যাহা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম পার্থক্য করিবার দিনে ......" ইত্যাদি এই অর্থ করে না যে, ইহাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হইয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তুর সহিত উহা প্রাসঙ্গিকও নয়। ইহার অর্থ হইতেছে মহানবী -এর প্রতি ঐদিন আল্লাহ প্রেরিত অদৃশ্য সাহায্য আসিয়াছিল। বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল বিতরণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে যে আদেশ জারী করেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে সংশ্লিষ্ট বিবরণীটি কেবল একটি দীর্ঘ আয়াতের সমাপ্তিকালীন অংশ যাহা বিষয়টির নিয়ম-কানুনের বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারা শুরু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রণীত হইয়াছে তাহা মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া "যদি তোমরা বিশ্বাস কর" ইত্যাদি শব্দাবলী যুক্ত করা হইয়াছে। কুরআনের স্বীকৃত তাফসীরকারদের মধ্যে কেহই চিন্তা করেন নাই যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রতি এখানে পরোক্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আত-তাবারীসহ[৪৯] তাহাদের সকলেই সেই দিনে আল্লাহ্‌র সাহায্য (ফেরেশতাদের প্রেরণ ইত্যাদি) এবং যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল বিতরণের নির্দেশ এই অর্থে সংশ্লিষ্ট ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৫০] ইহাও লক্ষণীয় যে, আয়াত ৮ ঃ ৪১-এ ব্যবহৃত পরিভাষাটি হইতেছে ইয়াওম (দিন); এবং যদিও আরবী ভাষায় ইয়াওম বলিতে দিনের সহিত রাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু যেখানে নির্দিষ্টভাবে রাতের উল্লেখ করা হয় সেখানে শুধু রাতকেই বুঝান হয় এবং ইহার সহিত দিন অন্তর্ভুক্ত হয় না। প্রথম ওহী নাযিলের সময় আয়াত ৪৪ ঃ ৩ ও ৯৭ ঃ ১-এ সুনির্দিষ্টভাবে রাতের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই ঘটনার প্রসঙ্গে ইহার সহিত দিন যুক্ত করা হয় নাই। এই

যুক্তিতেও প্রথম ওহী নাযিলের তারিখের সমর্থনে আয়াত ৮ ঃ ৪১-এর বিবরণ নজির হিসাবে উল্লেখ করা যথাযথ হইবে না।

ওহীর (প্রত্যাদেশ) ধারণা ও ইহার প্রকৃতি নির্দিষ্ট করিয়া কুরআনের ওহীর ধরন সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিবে। এখানে একেবারে প্রথম দিকের প্রত্যাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হইবে এবং এই আলোচনায় ঐ সকল প্রত্যাদেশের প্রধান প্রধান উপদেশসমূহও স্থান পাইবে।

ছয় ঃ প্রথম দিকের প্রত্যাদেশসমূহ ও ঐগুলির শিক্ষা

ইহা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হেরা পর্বতে প্রথম ওহী নাযিলের পর মহানবী ﷺ -এর নিকট পরবর্তী ওহী আসিতে একটি বিরতি ঘটে। এই বিরতির সময়সীমা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বেশ কিছুদিন ধরিয়া এই বিরতি চলিতে থাকে, তবে তাহা চল্লিশ দিনের বেশি ছিল না। আবার কাহারও মতে এই বিরতির পরিমাণ ছিল কয়েক মাস এবং অন্যান্য অনেকের মতে ইহার বিস্তৃতি ছিল দুই বা তিন বৎসর।[৫১]

প্রথম মতটি সম্ভবত সঠিক হইবে। কারণ মহানবী ﷺ-এর অপ্রত্যাশিত নূতন অভিজ্ঞতার প্রাথমিক ধাক্কা সামলাইয়া লইবার জন্য এই বিরতি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদান করা হয়। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এই নূতন অভিধায় অভিষিক্ত হওয়ায় নিজকে শান্ত করিতেও এই বিরতির প্রয়োজন ছিল। তাই এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হইবে যে, দুই বা তিন বৎসরের মত দীর্ঘ সময় ব্যাপী তাঁহার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ আকাশে ফেরেশতা জিবরাঈলকে দেখিতে পান এবং তাহার পর তিনি দ্বিতীয়বার ওহী লাভ করেন। দুইটি নির্ভরযোগ্য বিবরণীর এই তথ্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, হেরা গুহা হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কিছু পরেই ইহা ঘটিয়াছিল এবং এই ঘটনার পর বৎসর বা মাস অতিক্রান্ত হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না।[৫২]

তৃতীয়ত, ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মহানবী ﷺ -এর ইসলাম প্রচারের প্রথম তিন বৎসরে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি নিয়মিত ইবাদত (সালাত) করিতে আরম্ভ করা এবং জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইতে থাকেন। তাই ইহা একেবারেই ধারণাতীত যে, তিনি এই সময়ের মধ্যে কোন ওহী লাভ না করিয়া এই সকল কাজ সম্পাদন করেন।

চতুর্থত, কুরআনের মক্কী অংশের প্রায় অর্ধাংশ সূরা আন-নাহল অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই নাযিল হইয়াছিল। এই সূরাতে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিষয়ে একটি দিকনির্দেশনা ছিল। আর আবিসিনিয়ায় হিজরত ধর্ম প্রচারের পঞ্চম বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল। তাই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, কুরআনের মক্কী অংশের প্রায় অর্ধেক ধর্ম প্রচারের প্রথম চার বৎসরের মধ্যে অবতীর্ণ

হইয়াছিল। অতএব ইহা একটি অসম্ভাব্য বিষয় যে, নবুওয়াতের প্রথম তিন বৎসর মহানবী ﷺ -এর নিকট কোন ওহী নাযিল হয় নাই। তাই বলা যায় যে, ওহী বিরতির মেয়াদ সর্বাধিক কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার ছিল মাত্র।[৫৩] এই সময় শেষ হইলে মহানবী ﷺ একদিন জিবরাঈল (আ)-কে আকাশে দেখিতে পান এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া বাড়ীতে আসেন এবং তাঁহাকে আবৃত করিবার জন্য স্ত্রীকে বলেন। তাহার পর পরবর্তী ওহী নাযিল হয়। এই ওহীতে সূরা আল-মুদ্দাছছির (৭৪)-এর প্রথম ৫টি আয়াত ছিল। তৎপরবর্তী কালে কোন বিরতি ছাড়াই নিয়মিত ওহী নাযিল হইতে থাকে।[৫৪]

ওহী নাযিলের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে নানা ধরনের বর্ণনা ও মতামত রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও পণ্ডিতগণের মধ্যে একটি সাধারণ ঐকমত্য রহিয়াছে যে, সূরা আল-'আলাক (নং ৯৬), আল-মুদ্দাছছির (নং ৭৪), আল-কালাম (নং ৬৮) ও আল-মুয্যাম্মিলের (নং ৭৩) প্রথম কয়েকটি আয়াত একেবারে গোড়ার দিকে নাযিল হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অন্তর্গত প্রমাণ হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, এই আয়াতগুলিও অবশ্য খুব বেশি পরবর্তী কালের নয়। ইহার মধ্যে সূরা মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াতটি (৭৩ঃ২০) অবশ্য ব্যতিক্রম, ইহা মদীনাতে অবতীর্ণ হয়।[৫৫] অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, সূরা আল-ফাতিহা (নং ১), আদ-দুহা (নং ৯৩) ও আলাম নাশ্রাহ্ (নং ৯৪) বেশ প্রথম দিকের। কাহারও মতে সূরা নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুসারে সূরা আল-ফাতিহা একেবারে প্রথম। যাহা হউক ওহী নাযিলের সাধারণভাবে গৃহীত ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রথম ১০টি সূরার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ[৫৬]

১. আল-'আলাক (নং ৯৬); ২. আল-মুদ্দাছছির (নং ৭৪); ৩. আল-কালাম (নং ৬৮); ৪. আল-মুয্যাম্মিল (নং ৭৩); ৫. আল-ফাতিহা (নং ১); ৬. আল-মাসাদ (নং ১০১); ৭. আত-তাকবীর (নং ৮১); ৮. আল-আ'লা (নং ৮৭); ৯. আল-লায়ল (নং ৯২); এবং (১০) আল-ফাজ্র (নং ৮৯)।

এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ঐ সকল সূরার কোন কোনটিতে মক্কার কাফিরদের প্রতিক্রিয়ার পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার অর্থ দাঁড়ায়, মহানবী ﷺ সূরাতুল মুদ্দাছছিরের ২ নং আয়াতের আদেশ (قُمْ فَاَنْذِرْ) "উঠ ও সতর্ক কর" লাভ করিবার সাথে সাথেই তাঁহার প্রচারকার্য শুরু করেন এবং কাফিরদের বিরোধিতা একই সাথে আরম্ভ হয়।[৫৭] উপরে উল্লিখিত সূরাসমূহ ছাড়াও আরও বহু সংখ্যক সূরা আছে এবং তাহাতে কাফিরদের প্রসঙ্গে এমন কোন পরোক্ষ উল্লেখ নাই। যেমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন[৫৮] যে, এই সকল সূরা অবশ্যই প্রথমদিকে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবে এবং তাহা খুব সম্ভবত সূরা আল-'আলাক, আল-কালাম, আল মুদ্দাছছির ইত্যাদির পরবর্তী অংশের পূর্বেই নাযিল হইয়াছে। যাহা হউক, এই ধরনের সূরাসমূহের কথা বাদ দিলেও কেবল উপরে বর্ণিত ১০টি সূরাকে বিবেচনায় রাখিয়া ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একেবারেই গোড়ার দিকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলি অপরিহার্য

উপাদান হিসাবে প্রথমেই প্রচার করা হয়। নিম্নবর্ণিত শিরোনামসমূহে এই সকল মূল শিক্ষাকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে ঃ

১. তাওহীদ (একত্ববাদ) ঃ ইহার সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ (স্রষ্টা ও সংরক্ষণকারী ইত্যাদি হিসাবে আল্লাহ্‌র পরম একত্ব ও স্বাতন্ত্র্য); তাওহীদুল 'উলূহিয়াহ (ইবাদত ও সনির্বন্ধ মিনতির লক্ষ্যবস্তু হিসাবে আল্লাহ তা'আলার পরম একত্ব ও স্বাতন্ত্র্য); এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত (অনুপম নাম ও গুণাবলী)।[৫৯]

২. পবিত্রতার (তাহারাত) সহিত নামায (সালাত)।

৩. রিসালাত অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ -এর রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি।

৪. আল-আখিরাত অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ (পুনরুত্থান, বিচার, পুরস্কার ও শাস্তি)।

৫. বিচার দিবসে ব্যক্তিগত জওয়াবদিহিতা।

৬. ধনবান ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব ও অন্ধ জড়বাদ পরিহার।

৭. মহানবী ﷺ এর প্রতি বিশেষ নির্দেশাবলী ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সান্ত্বনা।

১. তাওহীদ ঃ একত্ববাদ হইতেছে মূল বিষয়বস্তু যাহার চারিদিকে ইসলামের সমগ্র শিক্ষা , উপদেশ ও নির্দেশাবলী আবর্তিত হইতেছে। একেবারে প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করিলে সূরা আল-'আলাকের প্রথম দুইটি আয়াতে ব্যবহৃত রব ও খালাক শব্দ দুইটির দ্বারা এই মূল বিষয়বস্তু প্রতিভাত হয়। অন্য কোন ভাষার কোন একটি একক শব্দ দ্বারা 'রব' শব্দের অর্থ প্রকাশ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজীতে ব্যবহৃত লর্ড বা প্রভু শব্দের উল্লেখ করা যায়। কারণ আরবীতে 'রব' শব্দের উপর সেই পরম এককের একটি ব্যাপক গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে। সেই পরম একক সত্তা হইতেছেন তিনি যিনি সৃষ্টি সংরক্ষণ, পরিপোষণ ও উন্নয়ন সাধন করেন এবং যিনি মহান উদারতা ও যত্নের সহিত কোন বস্তুর ক্রমবৃদ্ধি, ক্রমবিকাশ ও চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করেন।

অতএব ওহী অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অধিকতর যথোচিত একটি শুরুর চাইতে স্রষ্টা ও সংরক্ষক হিসাবে আল্লাহ্‌র এই গুণাবলীর উপর গুরুত্বারোপ করার মত আর কিছুই হইতে পারে না। এই আয়াতের প্রথম সূরাতে ব্যবহৃত 'খালাক' (সৃষ্টি) শব্দটি দ্বারা ইহা মোটামুটিভাবে সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ক্রিয়ার প্রতি কোন বস্তুর অনির্দিষ্টতা তাৎপর্যপূর্ণ। সামগ্রিক বিচারের 'সৃষ্টি' অর্থে নিখিল বিশ্ব এবং ইহার মধ্যে যাহা বর্তমান তাহা ধারণ করে এইরূপ ধারণা প্রদান করে। সাধারণভাবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গের অবতারণার পর নির্দিষ্ট করিয়া মানব সৃষ্টির উল্লেখ করিতে হয়। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কিভাবে সেই মহান্ সত্তার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত

হয়। এই সূরার প্রথম দুইটি আয়াত তাই নিখিল বিশ্ব এবং তৎসহ মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে। এই আয়াতদ্বয় সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সহিত দাবি করে যে, নিখিল বিশ্বে যাহা কিছু বর্তমান তাহা আল্লাহ্ নিজেই সৃষ্টি, বিন্যাস ও গঠন করিয়াছেন। পরিণতি স্বরূপ এই আয়াতে কোন নাস্তিকের এই ধারণাকেও নাকচ করিয়া দেয় যে, নিখিল বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টি একটি দৈব ঘটনা এবং তাহা স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর জন্ম, ক্রমবিবর্তন, পরিপূর্ণতা ও ফলপ্রাপ্তির ভাবধারায় এবং একটি প্রজাতির অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরে নহে, বিবর্তনের ধারণাটি স্বীকৃত। বাস্তবিকপক্ষে 'রব' এই পরিভাষাটির মধ্যে ইহা সহজাতভাবেই বর্তমান। 'রব' শব্দটির মধ্যে ভরণপোষণকারী, সংরক্ষণকারী ইত্যাদি ভাবধারাও অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে তাহা হইতেছে কোন বস্তু বা প্রাণীর জন্ম, ক্রমবিবর্তন, পরিপূর্ণতাও, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার পরম অনুগ্রহ কাজ ও তাঁহার উদার দানশীলতার দৃষ্টান্ত। এই প্রেক্ষিতে তিনি "পরম দানশীল" আল-আকরাম। এই গুণের একটি ব্যাখ্যা হইতেছে যে, তিনি এই গুণটি মানুষকে দান করিয়াছেন যাহা মানুষকে সর্বোচ্চ উন্নতির পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহার প্রভাবে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, বোধশক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এই মৌলিক মানসিক শক্তির বলেই মানুষ কলমের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন, সংরক্ষণ ও হস্তান্তরকরণের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে এবং তাহা একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলার দান।

তাওহীদুর রুবুবিয়াহ-এর ধারণাটি সূরা আল-'আলাকের প্রথম আয়াতে এমন জোরালোভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে যাহা সূরা আল-ফাতিহাতে আরও সহজবোধ্য ও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সূরার প্রথম আয়াতটিতে বলা হইয়াছে, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, তিনি বিশ্বজগতের রব অর্থাৎ প্রভু"। এখানে "বিশ্বজগতের" (আল-'আলামীন) কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতা এবং তৎসহ সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস বা প্রাণীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। কারণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে ইহা যে কোন ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতিটি একক বস্তুর বা বিষয়ের উপর পৃথক একটি জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একজন মানব অথবা একটি নক্ষত্রপুঞ্জের কথা বলা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে সূরা আল-ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্র অপার করুণা ও অনুগ্রহগুণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, 'তিনি সর্বজনীনভাবে করুণাময় (আর-রাহমান), মহত্তমভাবে দয়ালু' (আর-রাহীম)। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ-এর একইরূপ ধারণা ৮৭ঃ২-৩ (সূরা আল-আ'লা) আয়াতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। উহা এইরূপ ঃ "যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন" (৮৭ ঃ ২-৩)।[৬০]

তাওহীদুর রুবুবিয়াহ-এর ধারণা বারংবার পুনরাবৃত্তি করার সহিত তাওহীদুল উলুহিয়াহ-এর মূল সুরও হাজির করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদুল উলূহিয়াহ হইতেছে তাওহীদুর রুবুবিয়াহ-এর একটি স্বাভাবিক পরিণতি। যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং স্রষ্টা, সংরক্ষক ইত্যাদি, অতএব মানুষের উচিত আল্লাহ্র ইবাদত এবং একমাত্র তাঁহার নিকট মিনতি সহকারে মুনাজাত করা। ইহার সহিত কোন

মানুষ, প্রাণী বা বস্তুকে শরীক না করা। বস্তুতপক্ষে একত্ববাদের এই শেষোক্ত বিষয়টি সমসাময়িক আরবীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তথায় যদিও বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা অবাধে চলিতেছিল তবুও পরম স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান হিসাবে আল্লাহ্র ধারণা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সহিত মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারী হিসাবে দেব-দেবীদিগকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাওহীদুল উলুহিয়াহ-এর গুরুত্ব অর্থাৎ অন্যান্য সকল সত্তা ও দেবত্বকে পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ততা ছিল অপরিহার্য। এই ধারণাটি আয়াত ১ ঃ ৪-এ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি"।[৬১] এই একই ধারণা আয়াত ৭৩ ঃ ৯-এ অভ্রান্তভাবে জ্ঞাপন করা হইয়াছে ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً .

"তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রব। তিনি ব্যতীত আর কাহারও বান্দার ইবাদত গ্রহণের হক নাই। সুতরাং তাঁহাকে তোমাদের অভিভাবক-তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গ্রহণ কর"।[৬২]

২. **সালাত** ঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহ-এর ব্যবহারিক বাস্তবায়ন হইতেছে সালাত আদায় ও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। প্রথম দিকের নাযিলকৃত ওহীসমূহের মধ্যে ইহার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। সালাতের নির্দেশ সংক্রান্ত একেবারে প্রথম আয়াত হইতেছে ৭৩ ঃ ২; ইহাতে মহানবী ﷺ -কে আদেশ করা হইয়াছে (قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً) "রাত্রের কিছু সময় ব্যতীত সালাতে নিরত হও"। সকল ভাষ্যকার "রাত্রিতে দাঁড়াও" -এর অর্থ সালাতে দাঁড়ানোর কথা বলেন। অনুরূপভাবে ৭৪ঃ ৪২– ৪৩ আয়াত ইহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, এই আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে সালাত আদায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বিচার দিবসে গুনাহগার বান্দাগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে কি কারণে তাহাদিগকে দোযখে প্রেরণ করা হইয়াছে? তাহারা উত্তরে বলিবে ঃ

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ .

"যাহারা সালাত আদায় করিয়াছে আমরা তাহাদের দলে ছিলাম না"।

বিপরীত দিকে ৮৭ ঃ ১৪–১৫ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى .

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে। এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে" (৮৭ ঃ ১৪-১৫)।

সবচাইতে ইতিবাচক ও সন্দেহাতীত আয়াতগুলি হইতেছে ৯৬ ঃ ৯–১৯। এইগুলির মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে একজন ইসলাম ধর্ম বিরোধীর প্রসঙ্গ আসিয়াছে যে আল্লাহ্র বান্দা (عبدا)

(অর্থাৎ মহানবী ﷺ)-কে সালাত আদায় করিতে নিষেধ করে। তখন আয়াত ১০–১৮-তে সেই বিরোধী ব্যক্তি সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে এবং ইহার শেষ আয়াতে বিশেষভাবে প্রণোদিত করা হইয়াছে এইভাবে ঃ "না, তাহাকে কখনও অনুসরণ করিও না; বরং প্রণত হও এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ কর"।[৬৩] এই আয়াতসমূহের অনুক্রম চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, "আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিজে নতজানু হও এবং আল্লাহ্র নৈকট্যে আস" এই ভাব প্রকাশ দ্বারা ইসলামের শত্রুদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া সালাত আদায়ের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য সালাত হইতেছে সর্বোত্তম মাধ্যম।

বাস্তবিকই নবুওয়াত লাভের পর মহানবী ﷺ -কে প্রথম যে কাজটি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতেছে সালাত আদায়। বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ একদিন যখন মক্কার উচ্চ ভূমি এলাকায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উযূ সম্পাদন করেন যাহাতে ইহা দেখিয়া মহানবী ﷺ কিভাবে উযূ করিতে হয় তাহা শিখিতে পারেন। তারপর জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে-সহ দুই রাক্আত সালাত আদায় করেন এবং সালাতশেষে প্রস্থান করেন। মহানবী ﷺ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিভাবে উযূ করিয়া সালাত আদায় করিতে হয় তাহা খাদীজা (রা)-কে দেখাইলেন। খাদীজা (রা) তদনুযায়ী উযূ করিয়া সালাত আদায় করেন।[৬৪]

৩. রিসালাহ (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ এর নবুওয়াত ও রিসালাত ঃ একেবারে প্রথম দিকের ওহীসমূহে তৃতীয় যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহা হইতেছে মুহাম্মাদ ﷺ -কে আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হিসাবে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান। ইসলামী বাচনভঙ্গীতে একজন নবী (পয়গাম্বর) ও একজন রাসূল (বার্তাবাহক)-এর মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য এই যে, নবী ও রাসূল উভয়ে আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহী লাভ করেন, কিন্তু রাসূলকে তাহা মানুষকে অর্পণ ও প্রচারের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সূরা আল-মুদ্দাছছির-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল করিয়া মুহাম্মাদ ﷺ -কে এই বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মুহাম্মাদ ﷺ -কে সম্বোধন করিয়া নাযিলকৃত আয়াতটি (নং৭৪ ঃ ১–৩) এইভাবে শুরু হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَاَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ .

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর" (৭৪ ঃ ১– ৩)।

এখানে একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতেছে জনগণকে তাহাদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা এবং নাযিলকৃত ওহীতে যে সকল নির্দেশ রহিয়াছে তাহা জানান। বাস্তবিকপক্ষে একেবারে প্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি এখানে বিশেষভাবে

উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতেছে, "এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর"। ইহার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (আল্লাহু আকবার = اَللّٰهُ اَكْبَرُ) এই ঘোষণা জনসমক্ষে প্রচারের জন্য মহানবী ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। অন্য কথায় তাঁহাকে ঘোষণা করিতে হইত যে , কল্পিত দেব-দেবীসহ অন্য সব কিছুই আল্লাহ্র অধীন। ইহা তাওহীদ সংক্রান্ত আদেশও বটে। সকল ভাষ্যকার (তাফসীরকারবৃন্দ) এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের উপরিউক্ত আয়াতে মহানবী ﷺ -কে সুনির্দিষ্টভাবে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার সহিত সংযোজন করা যাইতে পারে যে, রিসালাত-এর ভাবধারাটি অন্তর্নিহিত এবং এমনকি নাযিলকৃত প্রথম ওহীতেও বর্তমান। কারণ 'পড়িবার' জন্য নির্দেশ দান এবং কলমের প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে উক্ত ভাবধারাটি রহিয়াছে যাহাতে মহানবী ﷺ একটি আসমানী কিতাব প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে রহিয়াছেন এবং এই কিতাব তিনি জনসমক্ষে প্রচার করিবেন। তিনি এই কিতাব সংরক্ষণ করিয়া ইহার জ্ঞান কলমের সাহায্যে প্রচার করিবেন।

আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ -কে যে দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে সূরা আল-মুয্যাম্মিলের ১৫ নং আয়াতে সরাসরি তাহার উল্লেখ দেখা যায়।

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً .

"আমি তোমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছি এক রাসূল তোমাদিগের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন সাক্ষী পাঠাইয়াছিলাম ফিরআওনের নিকট" (৭৩ ঃ ১৫)।

এই আহ্বান স্পষ্টতই মুহাম্মাদ ﷺ -এর সমকালীন ব্যক্তি এবং তৎসহ পরবর্তী মানবগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে করা হয়। ফির'আওনের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল অর্থাৎ মূসা (আ)-এর সহিত এখানে যে তুলনা করা হইয়াছে তাহা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার মত মুহাম্মাদ ﷺ -ও একজন রাসূল বা বার্তাবহক যাঁহাকে আল্লাহ্র কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং এই কিতাবে নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশাবলী ও মানব আচরণবিধি অন্তর্ভুক্ত আছে।

আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ -এর দায়িত্ব প্রাপ্তি এবং তাঁহার ভূমিকা সম্পর্কে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আয়াত ৭৪ ঃ ৫২–৫৪ (সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির), ৮১ ঃ ১৫–১৯ (সূরা আত-তাকবীর) ও ৮৭ ঃ ১৮–১৯ (সূরা আল-আ'লা)-তে আলোচিত হইয়াছে। আয়াত ৭৪ ঃ ৫২–৫৩-তে মক্কার কাফিরদের বিরক্তিকর উত্যক্তকারী দাবির প্রসঙ্গটি আসিয়াছে। তাহাদের দাবি যে, তাহাদের প্রত্যেককে নাযিলকৃত ওহীর প্রকাশ্যে লিখিত কাগজ (صحف منشرة) দেওয়া হউক এবং আয়াতগুলি গুরুত্বারোপ করে যে, ইহা কখনও হইতে পারে না এবং মহানবী ﷺ তাহাদিগকে যাহা অর্পণ করিতেছেন তাহা (كلا انه تذكرة) "নিশ্চিতভাবে একটি স্মারক চিহ্ন"। অনুরূপভাবে আয়াত ৮১ ঃ ১৫ – ২৯ কাফিরদের নানাবিধ অভিযোগের মুকাবিলায় ঘোষণা করে যে, মহানবী

وَمَا هُوَ ﷺ নিজে যেমন ভূতাবিষ্ট (مجنون) হন নাই তেমনি তিনি কোন শয়তানের কথাও بِقَوْلِ شَيْطَانٍ ঘোষণা করিতেছেন না; বরং তিনি ফেরেশতার মাধ্যমে যে ওহী লাভ করেন তাহাই জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছেন। তিনি ফেরেশতাকে আকাশের স্পষ্ট দিগন্তে (بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ) দেখিতে পান এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ছিল প্রত্যাদেশ (ওহী)। (اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ) এই আয়াতে তাই মহানবী ﷺ যে ওহী লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি জনগণের নিকট প্রচার করেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্টভাবে আয়াত ৮৭ ঃ ৯-এ মহানবী ﷺ -কে আদেশ করা হইয়াছে। উহা এইরূপ ঃ

فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى .

"অতএব উপদেশ দাও, যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়" (৮৭ ঃ ৯)।

৪. মৃত্যু পরবর্তী জীবন (আখিরাত) ঃ এই বিষয়টি প্রথম দিকের নাযিলকৃত ওহীসমূহে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিবেচনাধীন ১০টি সূরার সবগুলিতেই ইহার প্রাধান্যপূর্ণ উল্লেখ দেখা যায় এবং ইহা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে, মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে সূরা আল-'আলাক-এ উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানেও মানুষের শেষ গন্তব্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে— "নিশ্চয় তুমি তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে" (اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى) এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি একটি মূল সত্যকে তুলিয়া ধরে। তাহা হইতেছে পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব। ইহার বিপরীতে মানুষের পরকালীন জীবন অর্থাৎ আল-আখিরাতকে সর্বোত্তম ও অধিকতর স্থায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى "অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী" (৮৭ ঃ ১৭)।[৬৫] পরকালীন জীবনের শুরু হইতেছে ইহজগতের সমাপ্তি। ইহার পর মানুষের পুনরুত্থান (আল-বা'ছ) ও বিচারের দিন (আল-কিয়ামাহ; ইয়াওমুদ্দীন) কিয়ামতের দিনের একমাত্র মালিক হইবেন একমাত্র আল্লাহই। ঐ সকল অনিবার্য ঘটনাবলীর কিছু সংখ্যক স্পষ্ট বিবরণী প্রদান করা হইয়াছে।[৬৬] উদাহরণস্বরূপ আয়াত ৮১ ঃ ১–১৪ (সূরা আত-তাকবীর), ৭৩ ঃ ১২–১৪ (সূরাতুল মুয্যামমিল), ৭৪ ঃ ৮–১০, ২৬ – ৩১, ৩৫–৫১, ৫৩ (সূরাতুল মুদ্দাছ্ছির), ৮৭ ঃ ১২ – ১৩ (সূরাতুল আ'লা), ৮৯ ঃ ২১ – ৩০ (সূরাতুল ফাজ্র) ও ৯২ ঃ ১৩–১৮ (সূরাতুল লায়ল)-এ এই বিষয়ে বিধৃত হইয়াছে। উদাহরণের জন্য প্রথমে উল্লেখকৃত আয়াতটির উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ . وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ . وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ . وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ . وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ . وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ . وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ . وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ . بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ . وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ . وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ . وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ . عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ .

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ হইবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে, পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে, যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে, যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে, সমুদ্র যখন স্ফীত করা হইবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হইবে, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল? যখন 'আমলনামা উন্মোচিত হইবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে, জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে, এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে" (৮১ঃ১-১৪)।

বস্তুত মহানবী ﷺ-এর উপর অর্পিত আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হইতেছে মানুষকে তাহার পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দেওয়া, পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর বিচারের দিনের এবং গুনাহগার বান্দাদিগের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা। একই সাথে তিনি নেক বান্দাগণকে অনন্ত কালব্যাপী পরম সুখের জীবনের সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তাই কুরআনে তাঁহাকে প্রায়ই বাশীর ও নাযীর (যথাক্রমে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী) হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫. **ব্যক্তিগত জবাবদিহি** ঃ শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী ও ব্যক্তিগতভাবে তাহার কাজের জন্য দায়ী থাকিবে। সেই দিন সে ব্যতীত অন্য কেহ তাহার পক্ষে মধ্যস্থতাকারী অথবা প্রায়শ্চিত্যকারী হিসাবে কোন কাজে আসিবে না। পৃথিবীতে স্বীয় কাজের ফলাফল অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি পুরস্কৃত অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। উপরে উদ্ধৃত সূরার শেষ আয়াতে স্পষ্টভাবে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সহিত আয়াত ৭৪ ঃ ৩৮-এও উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ .

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের (ভালমন্দ) দায়ে আবদ্ধ"।

৬. **ধনবানদের সামাজিক দায়িত্ব** ঃ পার্থিব জীবনে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকা এবং অন্ধ বস্তুবাদের অনুসরণ ও অত্যধিক ধনলিপ্সা হেতু মানুষ পারলৌকিক জীবন ও আল্লাহ্র অবদান সম্পর্কে বিস্মৃত হইয়া পড়ে। ইহা তাহাকে শুধুমাত্র দুর্ভাগা স্বগোত্রীয়দের প্রতি স্বার্থপর, উদ্ধত ও নিষ্ঠুরই করে নাই, এমনকি তাহাকে নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও নিষ্ঠুর করিয়াছে। এই সর্বনাশা সামাজিক ও নৈতিক ব্যাধি সম্পর্কে প্রথম দিকের ওহীসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে এবং মানুষকে ইহার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হইয়াছে। আয়াত নং ৮৭ ঃ ১৬[৫৯]-তে মন্তব্য করা হইয়াছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا .

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী"।[৬৭]

অতঃপর ধন-সম্পদের সহিত যে প্রভূত সামাজিক দায়িত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা হয় যে, পরকালে সে একটি সফল ও সুখী জীবন

লাভ করিতে পারিবে যদি সে তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। ৯২ ঃ ৫-১১ নং আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى . فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى . وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى . فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى . وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰى .

"সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে এবং যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিলে, আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ (একত্ববাদের[৬৮])। এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে, আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে, তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পরিণামের পথ। এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে" (৯২ ঃ ৫ -১১)।

এই ভাবধারাকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া এই একই সূরাতে আরও বলা হইয়াছে, যাহারা তাহাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তাহারা প্রকৃতপক্ষে দুর্ভাগা (اَلْاَشْقٰى) এবং তাহারাই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা আত্মশুদ্ধিকল্পে আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের সম্পদ ব্যয় করিবে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রতি সবচাইতে বেশি উসর্গীকৃত (اَلْاَتْقٰى) হিসাবে গণ্য করা হইবে। وَلَسَوْفَ يَرْضٰى "এবং তাহারা শীঘ্রই সুখী ও সন্তুষ্ট হইবে"।[৬৯]

সমৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ তাআলার অনুগৃহীত ব্যক্তি হিসাবে নিজকে মনে করিয়া ইহা লইয়া গর্বে স্ফীত হওয়া তাহার উচিত নয় কিংবা দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া পড়িলেও আল্লাহ সম্পর্কে হতাশ হওয়া ঠিক নয়। মানুষের ধন-দৌলতের দাস হওয়া উচিত নয় এবং ভাগ্যে যাহা তাহার প্রাপ্য নয় তাহার জন্য অন্যায়ভাবে দাবি করাও অনুচিত; বরং দরিদ্র, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্যার্থে তাহার সর্বদা দায়িত্ব সচেতন হওয়া কর্তব্য। মানুষের জন্য করণীয় এই শিক্ষাগুলি খুবই কার্যকরভাবে আয়াত ৮৯ ঃ ১৫ – ২৩-এ বিধৃত হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْ اَكْرَمَنِ . وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْ اَهَانَنِ . كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ . وَلَا تَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ . وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا . وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا . كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا . وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا . وَجِاْىْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ . يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى .

"মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন'। এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার জীবন উপকরণ সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার

প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন'। না, কখনও নহে; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস; ইহা সংগত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হইবে এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও। সেই দিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, তখন এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?" (৮৯ ঃ ১৫–২৩)?

৭. মহানবী ﷺ-এর প্রতি বিশেষ নির্দেশাবলী ঃ প্রথম দিকের ওহীসমূহের অন্য আরেকটি বিষয় ছিল মহানবী ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাসূচক বাণী ও বিশেষ নির্দেশসমূহ। এই প্রসঙ্গে প্রথম যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহা হইতেছে, একেবারে প্রথম দিকের দুইটি ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ -কে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ভাষায় আহ্বান জানান হইয়াছে। সূরাতুল-মুদ্দাছছির (সূরা ৭৪) ও সূরাতুল মুয্যামমিল (সূরা ৭৩)-এর প্রথম কয়েকটি আয়াতে ইহার প্রমাণ মিলিবে। মহানবী ﷺ -কে আহ্বানের ভাষার বহিঃপ্রকাশ যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ "হে মুহাম্মাদ" অথবা হে নবীর পরিবর্তে "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!" এবং "হে বস্ত্রাবৃত!" বলা হইয়াছে। এই সূরা দুইটির আয়াত নাযিলের প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আকাশে জিবরাঈল (আ)-কে তাহার মূল আকৃতিতে দেখিয়া মহানবী ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন এবং দ্রুত বাড়িতে ফিরিয়া চাদর বা কম্বল দ্বারা নিজকে ঢাকিয়া রাখেন। তাই এই ধরনের আহ্বান জানান হইয়াছে। কিন্তু ঘটনা বা অবস্থা যাহাই হউক না কেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আহ্বানের এই সুনির্দিষ্ট ধরন ছিল মহানবী ﷺ -এর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও সদয় বিবেচনা প্রকাশ করা এবং সর্বত্র স্নেহপূর্ণ আচরণই তাঁহার সহিত করা হইয়াছে। আর তাঁহাকে নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে যে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র মনোনীত।

এই সূরাতুল মুদ্দাছছিরে (অর্থাৎ ইহার প্রথম ৭টি আয়াতে) মহানবী ﷺ -এর প্রতি দুইটি বিশেষ নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা ধর্ম প্রচারের কাজের সহিত সম্পর্কিত। ইহার দ্বিতীয় আয়াতে এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উহা নিম্নরূপ ঃ "অনুকম্পা প্রদর্শন করিও না, এই আশায় যে, প্রতিদান কালে ইহার বৃদ্ধি ঘটিবে"। অন্য কথায়, যদিও এই ওহী যাহা প্রকাশের জন্য মহানবী ﷺ -কে দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে, মানবজাতির জন্য এক মহা আশীর্বাদ ছিল। মহানবী ﷺ তাঁহার কাজের জন্য পার্থিব সুখ-সুবিধার আশা করিতে পারেন না। একেবারে শুরু হইতেই এইরূপ গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ -এর ধর্ম প্রচারের কাজ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, ইহাতে তাঁহার কোন ব্যক্তিস্বার্থ বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল না।

নির্দেশের দ্বিতীয় বিষয়টি ৭ নং আয়াতে বিধৃত হইয়াছে। উহা নিম্নরূপ ঃ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "এবং তোমার প্রভুর (কারণে) জন্য সহিষ্ণু হও ও অবিচলিত থাক"। ইহা ছিল খুবই সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এবং তৎসহ আগামীতে আসিতেছে এই বিষয়সমূহ গঠন সম্পর্কে পূর্ব

সতর্কবাণী। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, যে দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে (অর্থাৎ প্রচার ও সতর্কীকরণ) তাহা পালন করিতে তাঁহাকে প্রচণ্ড কষ্টস্বীকার, বিরোধিতা ও অন্যের শত্রুতার মুকাবিলা করিতে হইবে। আর এই সকল প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া উঠিবার জন্য তাঁহাকে আল্লাহ্‌র নিমিত্ত পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই একই সতর্কতামূলক নির্দেশ আয়াত ৭৩ ঃ ৫-এ দেখা যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে, اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً "শীঘ্রই আমি তোমার নিকট গুরুভারসম্পন্ন বাণী প্রেরণ করিব"।

অন্য যে সকল নির্দেশ ও সান্ত্বনামূলক বাণী প্রথম দিকের নাযিলকৃত সূরাসমূহে রহিয়াছে তাহা কাফিরদের বিরোধিতা ও অবাধ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যখন এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইবে তখন ইহা বিবেচনা করা হইবে। এখানে শুধুমাত্র ইহাই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরে উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল ১০টি সূরার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে এবং ইহা এই অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, কুরআনে বিধৃত বিষয়বস্তুর বেশির ভাগ অংশ হইতে এই একই উপদেশ বাণী ও নির্দেশাবলী গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহে প্রচুর সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বর্ণনা দ্বারা তাহা পুনরাবৃত্ত ও বিশদীকৃত হইয়াছে।

মহানবী ﷺ কিভাবে ধর্ম প্রচারের কার্যাবলী শুরু করেন এবং তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল তাহা দেখিবার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সাধারণভাবে ওহী সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতবর্গের মতামত ও ধারণাসমূহ সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা যথাযথ হইবে বলিয়া মনে করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. আরেকটি বর্ণনায় আছে ঃ 'আর-রু'য়া আস-সাদিকা' (সত্য স্বপ্ন)।

২. ব্যাখ্যামূলক বাক্যটি ইমাম যুহরীর নিজস্ব।

৩. এইগুলি হইতেছে প্রথম নাযিলকৃত ৩টি আয়াত যাহা সূরা 'আলাকের অন্তর্গত। আরেকটি বিবরণে ইহার সহিত আরও ২টি আয়াত যুক্ত হইয়াছে এবং শেষ হইয়াছে ঃ "মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না" আয়াত দ্বারা।

৪. এই বিবরণীর আরও একটি ভাষ্যে আর কিছু বর্ণনা সংযোজিত হইয়াছে।

৫. এই বিবরণীর আরও একটি ভাষ্যে রহিয়াছে-তিনি আরবী ভাষায় ইনজীল লিখিতেন।

৬. বুখারী, নং ৩; এই বর্ণনা এবং ইহার অংশ শাব্দিক পরিবর্তনসহ এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। দ্র. ৩৩৯২, ৪৯৫৩, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৪৯৫৭, ৪৯৫৭ এবং ৬৯৮২।

৭. দ্র. ফাতহুল বারী, ১ খ., পৃ. ৩৬।

৮. আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ., পৃ. ১৪৩ ও নিচে দ্র.।

৯. উদাহরণস্বরূপ দ্র. M. J. Kister, "Al-Tahannuth, An enquiry into the meaningof a term", B.S.O.A.S. XXXI (1968), 233 – 236.

১০. উপরে, পৃ. ২৩৩ – ২৪০

১১. উপরে দ্র. পৃ. ১৭৯ – ১৮১ ও ২৪১ – ২৫০।

১২. কুরআন, ৭৪ ঃ ১-৫।

১৩. বুখারী, নং ৪, তাফসীর অধ্যায়ে পুনরুক্ত, নং ৪৯৫৪।

১৪. বুখারী, নম্বর ৬৯৮২।

১৫. ফাতহুল বারী, ১২খ., ৩৭৬।

১৬. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, দিফা 'আনিল হাদীছিন নাবাবিয়্যা ওয়াস-সীরাহ (মিশক, ১৩৮৮ হি.), ৪০-৪২।

১৭. মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ ফী দাওইল কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ, ১খ., দামেস্ক ১৪০৯/১৯৮৮, পৃ. ২৬৬।

১৮. দ্র. মুসনাদ, ২খ., ২৩২ – ২৩৩; আবূ নু'আয়ম, দালাইল, ৬৮ – ৬৯; আল-বায়হাকী, দালাইল, ১খ., পৃ. ৩৯৩ – ৩৯৫।

১৯. দ্র. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৮ খ., ৩৬১ – ৩৬২।

২০. দ্র. ঐ, ৮ খ., ৪১৯ – ৪২২।

২১. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ২৩৪।

২২. ঐ, ২৩৪–২৩৫।

২৩. তিনি একজন তাবিঈ ছিলেন। দ্র. তাহযীবুত তাহযীব, ৭খ., ৭১ (নং ১৪৮); তাকরীবুত তাহযীব, ১খ., ৫৪৪, নং ১৫৬১।

২৪. ইব্‌ন ইসহাক আত-তাহান্নুছ সম্পর্কে আবূ তালিব-এর দুইটি চরণ এখানে উপস্থাপন করিয়াছেন। আত-তাহান্নুছ শব্দটির উপর ইব্‌ন হিশাম এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

২৫. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ২৩৪ – ২৩৭।

২৬. নিচের মূল পাঠ দ্র.।

২৭. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৯৪।

২৮. ঐ, পৃ. ১৯৪ – ১৯৫।

২৯. ঐ, পৃ. ১৯৫।

৩০. ঐ, পৃ. ১৯৬।

৩১. ঐ।

৩২. আত্-তাবারী, তারীখ, ২খ., ৩০০ – ৩০২ (১/১১৪৯ – ১১৫৩)।

৩৩. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, ১০খ, হায়দারাবাদ ১২২৭ হি., পৃ. ১৫২, নং ৮১৯, সমালোচনার অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

قال على ابن المدينى ذكره يحى القطان فضعفه جداً وقال عبد الله بن احمد سألت ابى عنه فقال مضطرب الحديث وروى احاديث مناكير وقال ابن معين ضعيف وقال مرّة ليس يشئ وقال البخارى وابو حاتم فى حديثه وهم كثير....."

৩৪. ঐ, ২খ., ৭১ – ৭২; নং ১১১।

৩৫. ঐ. ১১খ., ১৬১ – ১৬২, নং ২৭৩।

৩৬. ইব্ন হিশাম, ১খ., ২৩৩; ইব্ন সা'দ, ১খ., ১৯০, ১৯৪; আত্-তাবারী, তারীখ, ২খ., ২৯০–২৯২ (১/১১৩৯–১১৪১)। আত-তাবারী অবশ্য তিনটি বিবরণ দিয়াছেন (প্রকৃতপক্ষে ২টি, কারণ এই ২টি বর্ণনা একই ব্যক্তি অর্থাৎ সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব-এর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে)। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ -এর ৪৩ বৎসর বয়সে প্রথম ওহী নাযিল হইয়াছিল (আত-তাবারী, তারীখ, পূর্বোক্ত, ২৯২)। যাহা হউক এই বিবরণসমূহ সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয় এবং তাহা মহানবী ﷺ-এর প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার ও কুরায়শদের সহিত তাঁহার বিরোধের সময় হইতে শুরু হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়।

৩৭. মুহাম্মাদ ইযযাত দারওয়াযাহ, সীরাতুর রাসূল, ১খ., বৈরুত, তা. বি. (১৪০০ হি.) পৃ. ১২৯–১৩০।

৩৮. দ্র. ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৩৬; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ., ১৪৩।

৩৯. দ্র. আল-বায়দাবী, তাফসীর, ১খ., পৃ. ১০৫। আলোচনার জন্য দ্র. আকরাম খান, পূর্বোক্ত পৃ. ৩১১–৩১৩।

৪০. তাহারা এই দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করেন যাহারা মনে করেন যে, মহানবী ﷺ -এর বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরপরই তাঁহার নিকট ওহী নাযিল হয়। ইহা রবীউল আওয়াল মাসের ৮ তারিখে, কিন্তু রমযান মাসে নয়। তবে এইরূপ মত পোষণ কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী।

৪১. আয়াত ৪৪ ঃ ৩-এ উল্লিখিত মহিমান্বিত রাত সম্পর্কে কোন কোন ব্যক্তি মধ্য শা'বান মাসের কোন এক রাত বুঝাইয়াছেন। এইরূপ মতের পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নাই। অধিকন্তু এইরূপ মত ৪৪ ঃ ৩ ও ৯৭ ঃ ১ আয়াত দুইটিকে পরস্পর মুখামুখি দাঁড় করাইয়া দেয়। কারণ 'শক্তির রাত' হিসাবে (রমযান মাস) হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নাই। যেহেতু এই উভয় আয়াতই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাই ইহাতে দুইটি তারিখ হওয়ার কোন সুযোগ নাই।

৪২. উদাহরণস্বরূপ দ্র. ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৮ খ., ৪৬৮ – ৪৭০।

৪৩. আল-হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩খ., ১৪৩।

৪৪. ইব্ন সা'দ, ১খ., ১৯৩ –১৯৪; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ২৯৩ (১/১১৪১–১১৪২)।

৪৫. ইব্ন সা'দ, ১খ., ১৯৪; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ২৯৩–২৯৪ (১/১১৪২–১১৪৩)।

৪৬. ইব্ন হিশাম, ১খ. পৃ. ২৪০।

৪৭. আত্-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ২৯৪।

৪৮. উদাহরণস্বরূপ দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, সীরাতুর রাসূল ফী দাওয়িল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, ১খ., দামেশ্ক ১৪০৯/ ১৯৮৮, পৃ. ২৫৯ – ২৬০।

৪৯. আত-তাবারী, তাফসীর, ১০খ., ৮–৯।

৫০. এই আয়াতের (৮ ঃ ৪১) উপর বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের ভাষ্য দ্র., যথা ইব্ন কাছীর, আল-কুরতুবী, আয-যামাখশারী, আল-বায়দাবী, আশ-শাওকানী, আল-বাগাবী, আস-সুয়ূতী ও ইবনুল জাওযী।

৫১. দ্র. ফাতহুল-বারী, ১খ. পৃ. ৩৬– ৩৭; ১২খ., পৃ. ৩৭৬ – ৩৭৭।

৫২. বুখারী, নং ৪৯২২, ৪৯২৪।

৫৩. ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৩৬ – ৩৭; ১২ খ., পৃ. ৩৭৬ – ৩৭৭; ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৯১, ১৯৬। আরও দ্র. মুহাম্মদ ইয্যাত দারওয়াজাহ, পূ. গ্র. ১খ., পৃ. ১৩৭–১৩৮; মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, পূ. গ্র. ১খ., পৃ. ২৬৪। শা'বীর বর্ণনা "ইসরাফীল ফেরেশতা বিভিন্ন বিষয়ে মহানবী ﷺ -কে তিন বৎসর ধরিয়া নির্দেশ প্রদান করেন"– নির্ভরযোগ্য নয়।

৫৪. বুখারী, নং ৪, ৩২৩২, ৪৯২৫, ৪৯২৬, ৪৯৫৪।

৫৫. উদাহরণস্বরূপ দ্র. এই সূরার উপর তাফসীর, আল-বায়দাবী ও আল-জালালায়ন।

৫৬. এম. খালীফা কর্তৃক প্রদত্ত সারণী দ্র. "The Sublime Quran and Orientalism", লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯৮৩ খৃ., পরিশিষ্ট ২, পৃ. ২২৪–২২৭ এবং ইয্যাত দারওয়াজাহ, পূ. গ্র., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫–১৪৯।

৫৭. নিচে দ্র. অধ্যায় ২১, বিভাগ ১, প্রথম ৩ বৎসরে গোপন ধর্ম প্রচারের তত্ত্বের উপর আলোচনা।

৫৮. মুহাম্মাদ ইযযাত দারওয়াজাহ, পূ. গ্র., ১খ., পৃ. ১৩৪।

৫৯. অমুসলিম, বিশেষ করিয়া খৃষ্ট সম্প্রদায় এক আল্লাহ্র ইবাদতের এই বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিল বলিয়া দেখা যায় না। তাহারা সাধারণত প্রথম উল্লেখকৃত বিষয়ের উপর কেবলমাত্র মনোযোগী হয় এবং ইহাতে তাহারা মনে করে যে, ইহাই একত্ববাদের একমাত্র ধারণা। তাহাদের ভ্রান্তিসমূহ একত্ববাদের অন্য বিষয়ে তাহাদের বোঝাপড়ার অভাব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিষয়টি, যথা তাওহীদুল উলূহিয়াহ অথবা আল্লাহ্র পরম স্বাতন্ত্র্য যাঁহাকে ইবাদতের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি না করার জন্য।

৬০. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً .

৬১. মূল পাঠ হইল ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ .

৬২. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ اَلَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى . وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى .

৬৩. মূল পাঠ এইরূপ ঃ كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ .

৬৪. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৪৩–২৪৪; মুসনাদ, ৪খ., ১৬১; আথ-তাবারী, ২খ., ৩০৭ (১/১১৫৭)।

৬৫. ৮৭ ঃ ১৭ (সূরাতুল আ'লা)।

৬৬. ১ ঃ ৪ (সূরাতুল ফাতিহা)।

৬৭. আয়াত ৮৭ ঃ ১৬ (সূরাতুল আ'লা)।

৬৮. উদাহরণস্বরূপ দ্র. তাফসীরুল বায়দাবী ও তাফসীরুল জালালায়ন।

৬৯. সূরাতুল লায়ল (৯২ ঃ ১৫ – ২১)।

সপ্তদশ অধ্যায়

ওহী এবং প্রাচ্যবিদগণ

১. মুইর ও মারগোলিয়থ-এর অভিমত

মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট ওহী নাযিল হওয়া ছিল তাঁহার জীবনের মূল বিষয়। নবুওয়াত ও আল্লাহ্‌র রিসালাতের প্রতি তাঁহার দাবি, আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে কুরআনের অকৃত্রিমতা এবং আল্লাহ্‌র মাধ্যমে প্রাপ্ত ধর্ম হিসাবে ইসলামের মর্যাদা, সব কিছুই এই বিষয়ের উপর স্থাপিত। স্বাভাবিকভাবে ওহীর বিষয়টি তাই প্রাচ্যবিদগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এই বিষয় সম্পর্কে তাহারা স্বীয় ধারণা পরিগ্রহ ও তত্ত্ব লইয়া বেশ কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণভাবে এই সকল তত্ত্ব ও পরিগ্রহকৃত ধারণার লক্ষ্য হইতেছে ঃ যে কোন কৌশল অবলম্বন করিয়াই হউক না কেন ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, কুরআনের মূল পাঠ মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজস্ব রচনা। নিরপেক্ষতার দাবিদার বৈষয়িক প্রাচ্যবিদগণ বড়জোর ইহা স্বীকার করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসের উপর খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তৎসত্ত্বেও ওহী হিসাবে ইহার মূল পাঠকে তিনি যে ওহী হিসাবে ঘোষণা দান করেন তাহা তাঁহার স্বীয় মনন ও চিন্তার ফসল।

ইহা বোধগম্য যে, কোন ইয়াহূদী বা খৃস্টান অথবা এই ব্যাপারে একজন অমুসলিম স্বীয় দৃঢ় বিশ্বাসকে বিসর্জন না দিয়া অথবা স্বীয় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সন্দিহান না হইয়া বিবেকবুদ্ধি সহকারে স্বীকার করিতে পারে না যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং কুরআন হইতেছে আল্লাহ্‌র বাণী। যাহা হউক প্রাচ্যবিদগণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র আদেশ লাভ করিয়াছেন—এই তথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাহারা আরও অগ্রসর হইয়া ইসলামী সূত্র ও গ্রন্থাদি হইতে ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই ছিল ঘটনা। যতদূর পর্যন্ত তাহারা এই পথ অবলম্বন করেন না কেন তাহারা কার্যত তাহাদের স্বীয় ধর্মমত প্রচারকের ভূমিকাই গ্রহণ করেন এবং তাহাদের লিখিত গ্রন্থাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণার ছদ্মাবরণে অতি সূক্ষ্মভাবে ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমান ও পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে মহানবী ﷺ -এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের মতামত পর্যালোচনা করা হইয়াছে। প্রাচ্যবিদগণের নিজেদেরই বিভিন্ন যুক্তি ও বিচারসমূহকে বিশ্লেষণ করিবার জন্য একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা করিতে গিয়া তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, তাহারা তথ্যকে কিভাবে বিকৃত করিয়াছে তাহাদের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং মূল বিষয়ের কিভাবে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে মুইর ও মারগোলিয়থের মতামত ও ধারণাসমূহকে লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং

ওয়াট সম্ভবত তাহাদের মতামত ও ধারণাসমূহ তাহাদের নিকট হইতে সরাসরি গ্রহণ করেন নাই, বরং ইহা তাহার গুরু বেল (Bell)-এর নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। কাজেই ওয়াট কিভাবে বিষয়টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিবার পূর্বে বেল বিষয়টিকে কী দৃষ্টিতে দেখেন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করা হয়।

এক ঃ মুইর-এর ধারণা

মুহাম্মাদ ﷺ উচ্চাকাংখী ছিলেন এবং তাঁহার স্বগোত্রীয় লোকদের হীনমন্যতার দ্বারা হতোদ্যম হইয়া তিনি হেরা পর্বতে অবস্থান করিয়া গভীর ধ্যান ও মানসিক চেতনার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন—এই মূল ধারণা লইয়া মুইর সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছেন। মুইর বর্ণনা করেন যে, ক্রমান্বয়ে তাঁহার (মুহাম্মাদ ﷺ) আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উত্তেজনার চরমে পৌঁছে এবং এমন সময় তাঁহার মনে একটি চমৎকার ভাবের উদয় হয়। তাহা হইতেছে, আল্লাহ্ই একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। ধর্মহীনতা ও প্রতিমা পূজার জঘন্যতা, পুনরুত্থান, বিচার অনুষ্ঠান, ভাল ও মন্দ কাজের তুল্য বিনিময় প্রদান এবং মৃত্যুর পর জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ও সুনিশ্চিত চিত্র তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। এক "অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ ও আবেগমণ্ডিত ভাষায়" তিনি তাঁহার এই উপলব্ধির ও "সত্যের প্রতি তাঁহার অভ্যন্তরীণ" সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তাঁহার এই ভাষা প্রয়োগ প্রায়শই অসংলগ্ন শপথ দ্বারা জোরদার করা হয় যাহাতে "কবিতার অসম্পূর্ণ অংশ" এবং "মানবজাতির অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির হতাশাময় অভিব্যক্তি" ও "পরিপূর্ণ স্বগতোক্তি" রহিয়াছে এবং তিনি পথনির্দেশনার জন্য তাহা উপাসনায় ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম দিকের নাযিলকৃত সূরাসমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াতকে মুইর খণ্ডাংশ নামে অভিহিত করেন এবং উদাহরণ হিসাবে তিনি তাঁহার অনূদিত সূরাতুল আসর (১০৩ নং) ও সূরাতুল 'আদিয়াত (১০০ নং)- এর উল্লেখ করেন। আর স্বগতোক্তি ও উপাসনার উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি যথাক্রমে সূরাতুল কারি'আহ (১০১ নং) ও সূরাতুল ফাতিহা (১ নং)-এর উদ্ধৃতি দেন।[১] মুইর অবশ্য স্বীকার করেন যে, এইগুলি "অসাধারণ শক্তিতে ও সৌন্দর্যে পূর্ণ শব্দাবলী" দ্বারা রচিত হইয়াছে। মুইর আরও বলেন যে, কখনও কখনও এই "দৈববাণী" সরাসরি ঈশ্বরের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ঈশ্বর নিজেকে "আমরা" এবং মুহাম্মাদকে "তুমি" হিসাবে সম্বোধন করিয়াছেন।[২] এই সম্বোধন সম্পর্কে একটি উদাহরণ হিসাবে তিনি সূরা আত-তীন (৯৫ নং) -এর অনুবাদের উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

তবুও মুইর মনে করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ অনুপ্রেরণা দ্বারা এই দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করেন নাই, "একটি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা" ভোগের পর তিনি ইহা লাভ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি "ভর্ৎসনা ও ভীতির বাণী", যেমন সূরাতুল হুমাযাতে রহিয়াছে (১০৪), উচ্চারণ করেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি আরব ও ইয়াহূদীদের প্রাচীন কাহিনী এবং তৎসহ "জাতীয় অলৌকিক

ঘটনাবলী" ও ভাবপ্রবণতা সম্পর্কে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেন। ইহাদের উদাহরণ দিতে গিয়া সূরাতুল ফাজ্‌র (৮৯ নং)-এর অংশবিশেষ এবং সূরাতুল ফীল (১০৫ নং) ও সূরাতুল কুরায়শ (১০৬ নং)-এর সম্পূর্ণটাই অনুবাদের মাধ্যমে উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩] মুইর বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ তখনও অন্ধের ন্যায় সত্য খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন এবং এই তথ্যের সমর্থনে সূরাতুল বালাদ (৯০ নং)-এর সম্পূর্ণটাই অনুবাদ সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন।[৪]

মুইর-এর মতানুসারে মুহাম্মাদ ﷺ -এর একজন "ঐশী শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার" গ্রহণের পূর্বে তিনি বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার "ভাবাবেগকে কবিতার মাধ্যমে" প্রকাশ করিতে থাকেন।[৫] এই সময়কালে একটি ক্ষুদ্র দল, যেমন ওয়ারাকা, আলী, খাদীজা ও আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহার অনুসারী হিসাবে পরিগণিত হন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যেহেতু "মুহাম্মাদ নিজে লিখিতে জানিতেন না" তাই প্রথমোক্ত তিনজন একেবারে গোড়ার দিকের নাযিলকৃত সূরাগুলি লিখিয়া রাখিতেন।[৬] মুইর আরও বলেন যে, এই ক্ষুদ্র দলটির বাহিরে তাঁহার "সতর্কতাসূচক বাণী ও মৃদু ভর্ৎসনা লজ্জাকর অজ্ঞতা ও বিরক্তির অন্ধকারে" তলাইয়া যাইত। তাঁহার স্নেহশীল চাচা আবূ তালিব তাঁহার এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া মৃদু হাসিতেন, তাঁহার আর এক চাচা আবূ লাহাব তাঁহাকে উপহাস করিত। পক্ষান্তরে কুরায়শ সর্দার আবূ জাহ্‌ল্‌ ও তাহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত। আর সাধারণভাবে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা ছিল তাঁহার প্রতি "অমনোযোগী ও উদাসীন"।[৬]

মূইরের বর্ণনামতে, এইরূপ অবস্থায় একজন নবী হিসাবে আবির্ভূত হইবার প্রয়োজনীয়তার নিরীখে মুহাম্মাদ ﷺ -কে আনয়ন করা হয় যখন তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিতে গিয়া জনগণের মধ্যে "অধিকতর সংবেদনশীল ব্যক্তিবর্গ" উল্লেখ করে যে, তাহারা পবিত্র জীবনযাপন করিবে যদি তাহাদের মধ্যে একজন নবীকে প্রেরণ করা হয়, যেমন পূর্বে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই বর্ণনার সমর্থনে মুইর কুরআনের[৭] ৩৫ ঃ ৪২ নং আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করেন এবং বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ "প্রত্যুত্তর দানের" তাড়না অনুভব করেন। তিনি স্বীয় অন্তরে ইহার গভীর অনুসন্ধানে রত থাকেন যাহার দ্বারা তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় যে, এই "দহনকর চিন্তার ধারা," "বাকপটুতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং পবিত্র বক্তৃতা" যাহা তিনি এই যাবত প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন তাহার সব কিছুই "একটি অলৌকিক আহ্বান, একটি ঐশী মিশন"[৮] পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়। নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক মানসিক বিক্ষেপের ও গভীর বিষণ্নতার এইরূপ একটি অবস্থায় মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুনঃ নিশ্চয়তা লাভের জন্য প্রার্থনা করেন যাহা আল্লাহ তা'আলা অতীতে তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন এবং ইহা সূরা আদ-দুহা (৯৩ নং) ও সূরা ইনশিরাহ (৯৪ নং)-তে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।[৯] তৎসত্ত্বেও তাঁহার মানসিক পীড়ন এতই অসহনীয় হইয়া উঠে যে, তিনি কয়েকবার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কারণ কুরআন ঘোষণা করিয়াছে যে, "আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলার" চাইতে ভয়ংকর পাপ আর কিছুই নাই। তাই

একদিন তিনি একটি খাড়া পাহাড়ের চূড়া হইতে নিজকে নিক্ষেপ করিবার এক হঠকারী চিন্তা করেন, কিন্তু কোন এক"অদৃশ্য" প্রভাব তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করে। তিনি তখনও নিশ্চিত ছিলেন না যে, ঐ অদৃশ্য প্রভাবটি ঐশী অথবা শয়তানসুলভ ছিল কিনা। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী খাদীজা (রা) "আত্মাকে পরীক্ষা করিয়া" তাঁহাকে নিশ্চয়তা দান করেন যে, তাঁহার "আগন্তুক" কোন দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন না, বরং'নিষ্পাপ ও ধার্মিক' ছিলেন। ইহার পর ঐশী মিশনের প্রতি "উচ্চাকাঙ্খা মিশ্রিত বিশ্বাস" তাঁহার অন্তরে পুনঃ জাগরিত হয় এবং তিনি একটি একতাবদ্ধ জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন দেখিতে থাকেন যাহারা শপথ গ্রহণ পূর্বক প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিবে।[১০] তিনি অবশ্য মূসা (আ) ও অন্যান্য ইয়াহূদী গোষ্ঠীপতিদের উদাহরণ সম্পর্কেও চিন্তা করেন এবং নিজের মধ্যে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করেন যে, "শত্রুতা ও বিরোধে ক্লান্ত" সিরিয়া, পারস্য, মিসর, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশের জনগণ তাঁহার নিকট দলে দলে আসিয়া মিলিত হইবে যদি তিনি নিজকে আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে ঘোষণা করেন যাহা তিনি নিশ্চিতভাবে অনুভব করিতেছিলেন।[১১] শেষ পর্যন্ত তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যেমন মুইর বলেন, এক "পরম আনন্দদায়ক ভাবাবেশ" দ্বারা নিশ্চিত হয় এবং তিনি "কল্পনায় দেখিতে পান" যে, তিনি একটি মিশন প্রত্যক্ষ করিতেছেন।[১২] পবিত্র আত্মার প্রণোদনা দানকারী প্রভাবের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে থাকেন।

এইরূপ মানসিক অবস্থায় তিনি যখন হেরা পর্বতের চূড়ায় বসিয়া অথবা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে "এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটে"। তাঁহার খুব "নিকটে ও স্পষ্টভাবে দৃষ্টির সম্মুখে" আসিয়া জিবরাঈল (আ) দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার ও মুহাম্মাদ ﷺ -এর মধ্যকার দূরত্ব "দুইটি ধনুকের সমান" ছিল। জিবরাঈল (আ) তাঁহার প্রভুর (আল্লাহ তা'আলা) নিকট হইতে সূরা আল-'আলাক-এর সেই স্মরণীয় নির্দেশ লইয়া আসেন।[১৩] মুইর "এইভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে", এইভাবে মুহাম্মাদ ﷺ সন্দেহ ও দ্বিধার একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবার পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে সরাসরি প্রতিবিধানাদির ব্যবস্থাসমূহ লাভ করেন। এখন হইতে ভবিষ্যতে তিনি আক্ষরিক অর্থে আল্লাহ্‌র নামে কথা বলিতে শুরু করেন। তিনি এই বিষয়ে এতই সতর্ক ছিলেন যে, কুরআনের প্রতিটি বাক্যের প্রারম্ভে আল্লাহ্‌র আদেশের বিষয়টি যুক্ত করা হইয়াছে এই বলিয়া ঃ বলুন অথবা বল। এই আদেশ উল্লিখিত না হইলেও ইহা রহিয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া লওয়া হয়"।[১৪] ইহার পরও তাঁহাকে কবি, যাদুকর অথবা অপদেবতা ভর করিয়াছে বলিয়া উপহাস করা হয়। অতঃপর শেষ পন্থা হিসেবে তিনি তাঁহার উপর আরোপিত দায়িত্বের প্রতি নির্ভর করেন এবং হতবুদ্ধি হইয়া তিনি নিজে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পোশাকাদি গায়ে জড়াইয়া তিনি পরম ভাব-বিহ্বল অবস্থায় আবিষ্ট হন। জিবরাঈল ফেরেশতা "নিকটেই" ছিলেন এবং সূরাতুল মুদ্দাছছির-এর পুনঃ সঞ্জীবিতকারী বাণী দ্বারা তিনি মহানবী ﷺ-কে নৈরাশ্য হইতে জাগ্রত করিয়া "কর্ম উদ্দীপনায়" যুক্ত করেন।[১৫]

মুইর দাবি করেন যে, কুরআন হইতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি মহানবী ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬] তারপর আল-ওয়াকিদী প্রধানত

যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন মুইর তাহা পুনঃ উপস্থাপন করিয়া একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করিয়াছেন। আর তিনি ইহাকে প্রথাগত বিবরণ হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে মতামত দান করেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময়কার অবস্থা সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি ইহাকে মহানবী ﷺ -এর "ভাবাবেশকর সময়" বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তাহা ছিল গভীর ধ্যানের ভাবাচ্ছন্নতা অথবা মূর্ছা যাওয়া যাহার সহিত শারীরিক বা মানসিক ধাচের এক অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনা সম্পৃক্ত আছে। বিভিন্ন সময় বা অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই অবস্থার তারতম্য ঘটে।[১৭]

এই সকল বিষয়ের নিহিতার্থ হইতেছে, মহানবী ﷺ -এর স্বীয় মনন ও চিন্তা হইতে ওহী উদ্ভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার সহিত তাঁহার মানসিক চেতনা ও গভীর ধ্যানের ফলাফল যুক্ত রহিয়াছে। ইহা মোটামুটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। মুইর তাই জিবরাঈল (আ)-এর দর্শনের বিষয়টিকে 'অপচ্ছায়া'[১৮] অথবা 'ছায়ামূর্তি' হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মহানবী ﷺ -এর ওহী প্রাপ্তিকে "ভাবাচ্ছন্নতা"[১৯]এবং ওহী গ্রহণকালে মহানবী ﷺ কখনও কখনও যে শারীরিক কঠিন চাপ অনুভব করিতেন তাহাকে "ভাববিহ্বলতা"[২০] অথবা "মূর্ছা"[২১] ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন।

মুইর কর্তৃক ব্যক্ত মতামতের শেষ উল্লিখিত এই বিষয়টি তাহার অন্যান্য ধারণার একটি সম্প্রসারণ মাত্র। মহানবী ﷺ -এর শৈশবকালের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি উপরিউক্ত ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, শৈশবকালে মহানবী ﷺ সন্যাসরোগ অথবা মূর্ছারোগে আক্রান্ত হন। এই বিষয়টি লইয়া ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।[২২] এইখানে শুধু ইহাই উল্লেখ কর। যাইতে পারে যে, পরবর্তী কালের লেখকগণ যদিও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গে সন্যাসরোগ বা মৃগী রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কিত ভাষা প্রয়োগ এড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয় তবুও মূল উপাদান হিসাবে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে তাহারা মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিবর্তিত বিন্যাসে তাহারা "আত্ম-সম্মোহন", "প্রত্যাদেশের জন্য প্ররোচনা" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

আরও একটি অভিমত এইরূপ যে, ওহী অবতীর্ণ হওয়া মহানবী ﷺ -এর নিকট বাহির হইতে আসা কোন বিষয় নহে, বরং ইহা মহানবী ﷺ-এর সচেতনতা ও ব্যক্তিত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে– সকল প্রাচ্যবিদের লেখনীতে এই অভিমত সাধারণভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। অতএব এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করা যাইবে যখন অন্যান্যদের মতামত ও যুক্তিসমূহ পর্যালোচিত হইবে। এখানে মুইর-এর অন্যান্য মতামতসমূহ আলোচিত হইতে পারে।

মুইর-এর প্রাথমিক ধারণা হইতেছে, মুহাম্মাদ ﷺ উচ্চাকাংখী ছিলেন এবং একজন নবীর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবুও ইহা বলা হয় যে, অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য তাঁহার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয় নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ সময় ব্যাপী

"মানসিক যন্ত্রণায়" ভুগিয়াছেন এবং "সত্যানুসন্ধানে কঠোর সংগ্রামে" লিপ্ত হইয়াছেন। আরও বলা হয় যে, ঐশী শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার 'ভাবাচ্ছন্নতার' প্রকাশ ঘটান। স্পষ্টত এই দুইটি প্রবল প্রচেষ্টাই পরস্পর বিরোধী। যদি মহানবী ﷺ প্রকৃতপক্ষে উচ্চাকাংখী হইতেন এবং নবী হইবার জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবার এবং স্বীয় কার্যক্রমে নিজকে স্থির করিবার পর পর্যন্ত তিনি তাঁহার পরিকল্পনা মাফিক কাজ করিতেন না। পক্ষান্তরে তাঁহার গভীর ধ্যান, ভাবাবেশ ও সত্যের জন্য সৎ প্রচেষ্টার কারণে যদি কোন মহৎ চিন্তা তাঁহার সম্মুখে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিত তাহা হইলে মহানবী ﷺ পূর্ব-পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি অনুসারে স্পষ্টতই কোন কাজ করিতেন না। বস্তুত মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধর্মোপদেশ শ্রবণকারী কিছু সংখ্যক অনুসারী যখন তাঁহাকে বলেন যে, যদি একজন নবী তাঁহাদের মধ্যে প্রেরণ করা হইত তাহা হইলে তাহারা এক বিশুদ্ধতর জীবনযাপন করিতে পারিত—মুইর-এর এই তত্ত্ব তাহার নিজেরই প্রদত্ত মহানবী ﷺ -এর উচ্চাকাংখা ও প্রস্তুতি সম্পর্কিত তত্ত্বের পরস্পর বিরোধী।

প্রকৃত সত্য হইতেছে, বিষয়টি যেমন মোটেই কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ফলাফল ছিল না, তেমনি তাহা গভীর ধ্যান ও ভাবাবেশপ্রসূত বিষয়ও ছিল না। অবশ্য মহানবী ﷺ অবশ্যই নির্জনে ইবাদত ও গভীর ধ্যানে নিজকে নিয়োজিত রাখিতেন। তবে তিনি নাযিলকৃত ওহীর যে বিষয়বস্তু তাঁহার লোকদিগকে শুনাইতেন তাহা তাঁহার ধ্যানের কোন ফল ছিল না। তাঁহার নিকট ইহা ছিল সম্পূর্ণভাবে বাহিরের আরোপিত বিষয় এবং তিনি ইহার সম্বন্ধে পূর্বে যেমন কোনভাবে চিন্তা করেননি তেমনি তাঁহার কোন প্রত্যাশাও ছিল না। এই কারণে ঘটনার আকস্মিক পরিবর্তনে তিনি হতভম্ব ও ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং প্রথামিক পর্যায়ে তাঁহার এই নূতন অবস্থানের জন্য তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তাঁহার এই অনিশ্চয়তা সুস্পষ্টভাবে তাঁহার পক্ষে কোন পরিকল্পনা এবং উচ্চাকাঙ্খার অনুপস্থিতির কারণে ঘটিয়াছিল এবং ঘটনাবলীর আকস্মিকতায় ও অপ্রত্যাশিত অবস্থায় ইহার অভ্যুদয় ঘটে। ইহা আরও প্রমাণ করে যে, ওহী হিসাবে তিনি যে ঐশী আদেশ লাভ করেন তাহা তাঁহার চিন্তা বা গভীর ধ্যানের ফল ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাথমিক অনিশ্চয়তা ও হতবুদ্ধিতার প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন সেই অবস্থা সুনিশ্চিতভাবে "কয়েক বৎসর" ধরিয়া স্থায়ী ছিল না এবং ইহা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উপর প্রথম ওহী নাযিলের ফল এবং সেই সময়কার অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। মহানবী ﷺ -এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও ইহার প্রাক-অবস্থা হিসাবে মুইর এই ফলাফলকে ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে সকল উৎস গ্রন্থে ঘটনা সম্পর্কে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুইর বলেন যে, মহানবী ﷺ অনুপ্রাণিত হইবার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করেন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না মানসিক অশান্তি ও অনিশ্চয়তার এক প্রলম্বিত সময় অতিবাহিত করেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া "ঐশী শিক্ষক" হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নাই। তবুও মুইর আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করেন যে, মহানবী ﷺ তৎসত্ত্বেও "তাঁহার ভাবধারা" অদ্ভূত কল্পনাশ্রয়ী ও

আবেগপূর্ণ ভাষায়, কবিতা ও অন্যবদ্ধ আবেগ বিহ্বল সঙ্গীতের "খণ্ড খণ্ড" রচনার মাধ্যমে প্রচার করেন এবং তাঁহার লোকদিগকে আল্লাহ্‌র বাণী গ্রহণের জন্য এমনভাবে আহ্বান জানান যে, কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার অনুসারী হন। কিন্তু সাধারণভাবে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও তাঁহার বিরোধিতা করে। এখন এই বিবরণের যে কোন পাঠকের নিকট যে সকল প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উত্থাপিত হয় তাহা হইতেছে ঃ

(ক) ইহা কি কল্পনীয় যে, একজন ব্যক্তি যিনি তাঁহার স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নন এবং এমনকি তাঁহার প্রদত্ত বাণীর প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহার কোন ধারণা নাই, তিনি একই সময়ে কিভাবে প্রকাশ্যে ধর্মান্তরণের জন্য আহ্বান জানান এবং ইহার ফলে অপমান ও বিরোধিতার মুখামুখি হন?

(খ) ইহা ধারণা করা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, একদল লোক তাহারা যতই সংখ্যায় নগণ্য হউক না কেন তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার প্রচারিত বাণীর সত্যতা ও ঐশী উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত না হইবে এবং ধর্ম প্রচারকারী নিজেই বাণী ও ইহার প্রকৃতি সম্পর্কে যেখানে নিশ্চিত নন বলিয়া ধরা হয় সেখানে সেই ক্ষুদ্র দলটি কিভাবে সন্দেহের নিরসন করিবে?

(গ) এইরূপ চিন্তা করা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, কুরায়শ গোত্রের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ধর্ম প্রচারকের বিরুদ্ধে চলিয়া যাইবে যদি না তিনি তাঁহার নবুওয়াতের দাবি ও ধর্ম প্রচারের বিষয়ে আন্তরিক হন?

মুইর অবশ্য নিজেকে এই সকল স্বাভাবিক প্রশ্নের মুখামুখি দাঁড় করান নাই, কিন্তু তাহার পাঠকবর্গ এই সকল অযৌক্তিকতা গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

একদিকে এই মতামতে অসঙ্গতির চূড়ান্ত পরিণতি এইভাবে বিদ্যমান যে, মুহাম্মাদ বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া দ্বিধান্বিত অবস্থায় এবং সত্যানুসন্ধানে রত না থাকা পর্যন্ত 'প্রভুর নামে' কোন আহ্বানের ঘোষণা প্রদান করেন নাই। অন্যদিকে এই বিবরণীতে সেই প্রারম্ভিক পর্যায়ে সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কখনও কখনও "ওহী" অবতীর্ণ হইয়াছে এবং সেখানে নিজকে 'আমরা' ও মুহাম্মাদকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এখন যে কেহ স্পষ্টতই বুঝিতে সক্ষম হইবে না যে, কিভাবে এই ধরনের মতামত পরবর্তীতে "প্রভুর নামে" প্রদত্ত মতামত হইতে ভিন্নতর হয়? বাস্তবিকপক্ষে মুইর-এর মূল অসঙ্গতি এই তথ্যের মধ্যে এমনভাবে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি সর্বাধিক ১৮টি সূরার উদ্ধৃতি দিয়াছেন যেইগুলি সম্পর্কে তিনি ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, ঐগুলি ওহী-পূর্ব অথবা মহানবী -এর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বেকার প্রদত্ত মতামত!

এই কাহিনীর মূল অযৌক্তিকতাকে বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতপক্ষে এই সকল অসঙ্গতিকে লইয়া ভেলকিবাজি করা হইয়াছে। যেমন নবী হিসাবে নিজকে ঘোষণাদানের প্রয়োজনীয়তা মুহাম্মাদ -এর স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যখন তাঁহার ধর্ম প্রচারকালে "সবচাইতে

সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক" সকল উল্লেখ করে যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট পূর্বে যেমন নবী আসিয়াছে তেমনি কোন নবী আবির্ভূত হইলে তাহারা বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিবে। তাহার পর আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তখন তাঁহার অবস্থানকে পুনর্বিবেচনা করেন এবং গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হন যে, তিনি এমনিভাবে অনুপ্রাণিত এবং শেষ পর্যন্ত জিবরাঈল (আ)-কে 'ধারণায়' আনয়ন করিতে সক্ষম হন যিনি তাঁহাকে "প্রভুর নামে" আবৃত্তি অর্থাৎ প্রচারের জন্য নির্দেশ দিতেছেন।

এখন একজন ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করুন যিনি তাঁহার লোকদের নিকট একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে উপস্থিত হইয়াছেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া ধর্ম প্রচারের পর, তাঁহার অধিকাংশ লোকদের বিরোধিতা ও উপহাস সহ্য করিবার পর তাহাদের কাহারও মন্তব্য শুনিতে হইয়াছে যে, যদি তাহাদের নিকট একজন নবী প্রেরিত হন তাহা হইলে তাহারা তাঁহার উপদেশ শুনিবে। সেই কারণে ধর্ম প্রচারক তাঁহার ভূমিকার পুনর্বিন্যাস সাধন করেন এবং তাঁহার লোকদের নিকট পুনঃ উপস্থিত হইয়া বলিতে থাকেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নবুওয়াত লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে তাহাদের অনুসরণ করা উচিত। যাহার মধ্যে এক বিন্দু পরিমাণ সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে সে কখনও এইরূপ বোকার মত কাজ করিয়া নিজকে হাস্যস্পদ করিয়া তুলিবে না। তবুও মুইর মহানবী ﷺ -এর উপর এইরূপ অর্বাচীন ভাব আরোপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বরং পাঠকদিগকে ইহা বিশ্বাসও করাইতে চাহিয়াছেন।

একদিকে প্রকৃত তথ্যের বিকৃতি সাধন ও ইহার সহিত অসত্যের মিশ্রণ ঘটাইয়া হাস্যকর গল্পের অবতারণা করা হয়, অন্যদিকে মূল পাঠের অপব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমত, মুইর সুস্পষ্টভাবে সর্বজনবিদিত মূল বিষয়ের বিকৃতি সাধন করিয়াছেন। বিষয়টি হইতেছে, একটি বিশেষ অবস্থায় মহানবী ﷺ যখন প্রথম ওহী লাভ করেন তখন তিনি যেভাবে বিস্ময়াভিভূত, শঙ্কিত ও অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা মুইর বিকৃত করেন। তিনি মহানবী ﷺ -এর বিস্ময়ে হতবাক হইয়াও অনিশ্চয়তার আশংকাকে ওহী নাযিলের বিরতি বা 'ফাতরাহ'-এর সময়ের সহিত ঘোলাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার দ্বিতীয় বিকৃতি সাধন এই তথ্য সম্পর্কে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি এমন একটি ধারণা প্রদান করেন যে পর্যায়ে মহানবী ﷺ তাঁহার নিজের মধ্যে সংগ্রামে রত ছিলেন বলিয়া দাবি করা হয় সেই পর্যায়কালের সহিত 'ফাতরাহ'-এর কালকে একই সময়ের আওতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি সেই সময় এক প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিলেন যে, তিনি নিজকে নবী হিসাবে ঘোষণা করিবেন এবং প্রভুর নামে কথা বলিবেন কিনা তাহা লইয়া সংশয় ছিল। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য সকল বিবরণীতে ফাতরাহ-এর প্রকৃতি সম্পর্কে যেইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মুইর আমাদিগকে যাহা বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। যদিও ইহার স্থিতিকাল লইয়া বিবরণীসমূহে বিভিন্নতা রহিয়াছে, তবুও তাহা এক কথায় বলা যায় যে, এই সময়ে ওহী অবতীর্ণ হইবার একটি বিরতি ছিল

এবং ইহা ওহী অবতীর্ণ হইবার পূর্বেকার কোন সময় ছিল না। মহানবী ﷺ ঐ সময়ে অবশ্যই ব্যাকুল ও অস্থির ছিলেন। কিন্তু সূত্র গ্রন্থসমূহে এমন কোন অভিমত ব্যক্ত করা হয় নাই যে, তাঁহার এই অস্থিরতা মানসিক উদ্বেগের কারণে সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই উদ্বেগ তিনি প্রভুর নামোল্লেখ করিয়া কোন প্রচার করিবেন কিনা তাহার সহিত সম্পর্কিত ছিল। তবুও মুইর এই বিষয়টির উপর অনধিকারযুক্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, এই সময়ে মহানবী ﷺ মানসিকভাবে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেন। তাঁহার মধ্যে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলিবার মত ভীষণ পাপ কাজে তিনি রত হইবেন কিনা এবং তিনি বেশ কয়েকবার আত্মহত্যা করিবার জন্য চিন্তাও করেন। মুইর এখানে এই প্রকৃত ঘটনারও বিকৃতি সাধন করেন।

কথিত আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সম্পর্কিত বর্ণনা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে, যেমন পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পটি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও উৎস গ্রন্থসমূহে অথবা পণ্ডিতগণের মধ্যে এমন কোন অভিমত পাওয়া যায় না যে, কথিত আত্মহত্যা প্রচেষ্টার কারণ নিহিত ছিল মহানবী ﷺ-এর এইরূপ মানসিক উদ্বেগের মধ্যে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নামে কোন মিথ্যা আরোপ করিয়া প্রচার করিবেন কিনা। তাঁহার উদ্বেগ ও মানসিক পীড়নের কারণ এই ছিল যে, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরতি থাকিত তাহা হইতে দীর্ঘতর বিরতি হইবার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘটনাক্রমে 'ফাতরাহ' সম্পর্কিত বিবরণী এবং মহানবী ﷺ -এর এই বিষয়ে ব্যাকুলতা ও মানসিক চাপের সমগ্র বিষয়টি প্রকৃত তথ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ যে, ওহীর বিষয়টি মহানবী ﷺ -এর নিজের মধ্য হইতে উদ্ভূত হয় নাই অথবা ইহা সকপোল কল্পিত ছিল না।

প্রকৃত ঘটনার এইরূপ বিকৃতি সাধনের সহিত মূল পাঠের অপব্যাখ্যাকে মিশ্রিত করা হইয়াছে এবং এইরূপ বিভ্রান্তিকর বর্ণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত টানা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ -এর নবুওয়াত লাভ করিবার যেইসব পর্যায়ের বর্ণনা রহিয়াছে তাহা কুরআন হইতে "বিভিন্ন ইঙ্গিত" গ্রহণের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হইবে যে, মুইর যে সকল 'পদক্ষেপের' সন্ধান পাইয়াছেন—মহানবী ﷺ -এর উদ্বেগ ও হতবুদ্ধিতা, কথিত আত্মহত্যা প্রচেষ্টার কাহিনী এবং 'ফাতরাহ'-এর ঘটনা অথবা ওহী অবতীর্ণ হইবার বিরতি ইত্যাদি, এই বর্ণনাসমূহে শুধু যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা আদৌ কুরআনের নহে। আর কুরআনের বর্ণনাসমূহ যাহা মুইর তাহার কল্পিত ধারণার সমর্থনমূলক সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করেন, তাহা মুইর-এর অপব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুইর-এর পক্ষে কুরআনের প্রথম উল্লেখযোগ্য অপব্যবহার হইতেছে—আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা বলার পাপ সম্পর্কিত বিবরণী। কুরআন অবশ্য সবচাইতে জঘন্য পাপ হিসাবে প্রকাশ্যে ইহার নিন্দা করিয়াছে এবং তাহা শুধু একবার নহে, কমপক্ষে দশটি স্থানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।[২৩] এই সকল আয়াতের প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টি দিলে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, কাফিরদের অভিযোগ খণ্ডন করিবার জন্য এই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে

যেমন তাহারা বলিত, মহানবী ﷺ তাঁহার লোকদের নিকট যাহা ঘোষণা করিতেন তাহা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে নাই কিংবা কিতাবধারী কিছু লোকের রীতিকে প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ বলিয়া প্রচার করেন। মুইর ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের এই বর্ণনা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে একটি প্রশ্ন সম্পর্কে নিজের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া থাকিবেন। তাহা হইতেছে, তিনি আল্লাহ্‌র নামে কোন মিথ্যাচার করিবেন কিনা। কুরআনে এইরূপ ধারণা পোষণ করার কোন বিষয়ই নাই। এই ধারণা পোষণ করিয়া কার্যত মুইর কাফিরদের অভিযোগকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ যাহা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হয় নাই, যদিও তিনি নিজকে বিশ্বাস করাইয়াছেন যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তাহাই ছিল।

মুইর-এর দ্বিতীয় মারাত্মক অপব্যাখ্যাটি করা হইয়াছে ৯৩ নং (সূরা আদ-দুহা) ও নং ৯৪ (সূরা ইনশিরাহ) সূরাকে লইয়া। তিনি প্রমাণ হিসাবে হেরার উদ্ধৃতি দিয়াছেন যেখানে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার মানসিক উদ্বেগ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যে কথিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তাহা হইতেছে—তিনি আল্লাহ্‌র নামে জনগণের মধ্যে মিথ্যাভাবে কোন প্রচার কার্য চালাইবেন কিনা এবং তিনি নিজকে এইভাবে নিশ্চিত করিয়াছেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরে উল্লিখিত দুইটি সূরা অবশ্য মহানবী ﷺ -এর উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রহিয়াছে ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু সূরা দুইটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সূরা দুইটিতে অথবা বিবরণীতে কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য ইহাতে বলিবার কিছু নাই যে, মহানবী ﷺ তাঁহার উপর আল্লাহ তা'আলার অতীত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেন এবং তিনি মানসিক উদ্বেগ হইতে নিজকে মুক্ত করেন যাহাতে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা বলিতে না হয় অথবা নিজের মধ্যে এই প্রত্যয়ের সৃষ্টি করা যে, তিনি জনগণকে যাহা বলিতেছেন তাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে মুইর-এর কল্পনাপ্রসূত যাহার কোন ভিত্তি কুরআন অথবা বিবরণীতে নাই।

কুরআনের ৩৫ ঃ ৪২ সংখ্যক আয়াত প্রসঙ্গে তৃতীয় অপব্যাখ্যাটি করা হইয়াছে। আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে....".[২৪] মুইর ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে, মহানবী ﷺ যখন ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন কাফিররা তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করে এবং কাফিরদের এইরূপ মন্তব্যের কারণে তিনি নিজকে নবী হিসাবে ঘোষণা দানের বিষয় চিন্তা করেন। এইরূপ ধারণার প্রতি কোন সমর্থন কুরআন বা হাদীছে নাই। মহানবী ﷺ -এর নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পূর্বেই কোন ধর্ম প্রচারের কাজ চালাইয়া যাওয়ার চরম অযৌক্তিকতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উদ্ধৃত বিবরণীটি কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় কুরায়শ কর্তৃক বর্ণিত

হইয়াছে এবং তাহা মহানবী ﷺ -এর প্রতি আরোপ করা হয় নাই, বরং এই দৃশ্যপটে তাঁহার উপস্থিত হইবার বহু পূর্বেই এবং এইরূপ বর্ণনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইহা তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল যেখানে ইয়াহূদী ও খৃস্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের নবীদের সহিত মিথ্যাচার এবং নবীদিগকে অমান্য করিয়াছিল।[২৫]

সর্বশেষে মুইর সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝিয়াছেন অথবা সূরা আল-'আলাক-এর প্রথম আয়াতকে ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, যেহেতু এই আয়াত মহানবী ﷺ -এর প্রতি আদেশ, "পড় তোমার প্রভুর নামে", ইহার পূর্বে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া থাকিবেন এবং তাহা প্রভুর নামে ছিল না! বাস্তবিকই ইহা এই আয়াতের এবং উপরোল্লিখিত ৩৫ ঃ ৪২ নং আয়াতের একটি মস্তবড় অপব্যাখ্যা। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া মুইর তাহার তত্ত্ব দাঁড় করাইয়াছেন যাহাকে তিনি পর্যায় বা পদক্ষেপ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহার মতে, মুহাম্মাদ ﷺ ইহার প্রেক্ষিতে একজন ঐশী শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। আর এই তত্ত্বকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তিনি ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, আল্লাহ্র নিকট হইতে নবুওয়াত লাভ ও ওহী প্রাপ্তির দাবি করিবার পূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ অন্যূন ১৮টি অথবা ততোধিক সংখ্যক সূরার ঘোষণা প্রদান করেন।

মুইর উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতসমূহ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন ইতোপূর্বে উল্লেখিত তাহার তত্ত্বের নানা বিষয়ের চরম অসামঞ্জস্যতা ও অসঙ্গতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও মুইর-এর মতামতসমূহ তাহার উত্তরাধিকারী প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক যে কোন একটি রীতিতে গৃহীত হইয়াছে। এখানে লক্ষণীয় যে, ওহী-পূর্ব আমলের অথবা মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রাক-কুরআন মতামত প্রদানের সময়কার তাহার তত্ত্ব বেল পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন, যদিও তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মুইর তত্ত্বের মূল মুখবন্ধের সহিত মহানবী ﷺ -এর কর্মজীবনের ধারা ও মতবাদের ক্রমান্বয় অগ্রগতিকে ওয়াট গ্রহণ করিয়া একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে লইয়া গিয়াছেন। কিছু পরেই ইহা দেখা যাইবে যে, ওয়াটের মতে মহানবী ﷺ এক আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া প্রথমে আরম্ভ করেন নাই, বরং চার অথবা পাঁচ বৎসর ধরিয়া একটানা প্রচারকার্য চালাইবার পর ইহা ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিকট গৃহীত হয়। কিন্তু মুইর-এর অব্যবহিত পরের বুদ্ধিজীবী উত্তরাধিকারী মারগোলিয়থ কি মতামত পোষণ করেন তাহা প্রথমে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

দুই ঃ মারগোলিয়থের ধারণাসমূহ

মুইর-এর ন্যায় মারগোলিয়থ ওহী সম্পর্কিত বিষয়ের উপর যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতেছে মুহাম্মাদ ﷺ -এর উচ্চাকাংখা ও পরিকল্পনার একটি সম্প্রসারিত মূল ভাবধারা মাত্র। কিন্তু মারগোলিয়থ সম্ভবত মুইর-এর অসঙ্গতিসমূহ লক্ষ্য করিয়া তাহা পরিহার করেন যদিও এই বিষয়টির উপর আলোচনাকালে তিনি নূতন করিয়া অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতার মধ্যে নিজকে

নিপতিত করিয়াছেন। তিনি সরাসরি ধারণা করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ অতিমাত্রায় উচ্চাকাংখী হইয়া যে ভূমিকা পালন করিতে চাহেন তাহার জন্য নিজকে সতর্কতার সহিত প্রস্তুত করেন এবং যখন তাঁহার পরিকল্পনাসমূহ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তখন তিনি খুবই দক্ষতার সহিত তাহা বাস্তবায়ন করেন। মারগোলিয়থ মনে করেন যে, ওহী সংক্রান্ত সমগ্র বিষয়টি ছিল প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত "ছলনা" ও "প্রতারণা" মাত্র। এইরূপ দাবি করা হয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্য জগত হইতে বাণী সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রচারের একটি "মাধ্যম"[২৬] হিসাবে স্বীয় ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁহার সাফল্য নিশ্চিত করিবার জন্য তিনি ঐ সকল সংগৃহীত বাণীর "আকার" ও "বিন্যাস" এবং প্রক্রিয়াকে এমন কৌশলে উপস্থাপন করেন যে, তাহা যেন কোন "অতিপ্রাকৃতিক উৎস" হইতে আবির্ভূত হইয়াছে।[২৭] এইরূপে একটি ঐশী প্রত্যাদেশ উপস্থাপন করিতে গিয়া, মারগোলিয়থের ভাষায়, তিনি সহজাত প্রেরণায় এক "প্রচণ্ড উত্তেজনার" মধ্যে পতিত হইতেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করিত[২৮] এবং তিনি কম্বল দ্বারা নিজকে আবৃত করিয়া ফেলিতেন। ইহার ফলে তাঁহার শরীরে প্রচুর ঘাম সৃষ্টি হইত এবং তাঁহার এই অবস্থায় বাণী প্রস্তুত থাকিত।[২৯] কম্বল দ্বারা নিজকে এইভাবে আবৃত করার অভ্যাস তিনি "প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত" বজায় রাখিয়াছেন বলিয়া বলা হইয়া থাকে।[৩০] আরও দাবি করা হয় যে, মহানবী ﷺ "কোন এক সময়ে" মৃগী রোগের খিচুনি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, কোন প্রকার "সামান্যতম প্রস্তুতি" ব্যতিরেকে "নাক ডাকা ও মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ" করিয়া তিনি "কৃত্রিমভাবে" এই খিচুনি তৈয়ারী করিতেন।[৩১] মারগোলিয়থ বলেন যে, এইরূপ অবস্থাকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির "স্বাভাবিক অবস্থা হিসাবে স্বীকার করিয়া" লওয়া হইয়াছে।[৩২] মহানবী ﷺ এই বিষয়ে এতই সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া কথিত হয় যে, মারগোলিয়থের মতে "তিনি যখন আহার করিতেন সেই সময়ে তাঁহাকে সম্বোধনকৃত কোন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়ার কালে তিনি ঐশী আদেশ লাভ করিতেন। জবাব দেওয়া সমাপ্ত হইলে তিনি আহার পর্ব সমাধা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। কিন্তু তিনি বাধাগ্রস্ত হইলে এই খাবার তাঁহার হাতে ধরা থাকিত অথবা তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়ান অবস্থায় তাঁহাকে কোন প্রশ্নের জবাব দানকালে ওহী অবতীর্ণ হইত"।[৩৩]

ওহীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে মারগোলিয়থ তাহার প্রিয় পক্ষপাতপূর্ণ তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করেন যে, মহানবী ﷺ -এর প্রচুর পরিমাণে কথা বলিবার না থাকিলে তিনি "ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের" সাহায্য গ্রহণ করিতেন।[৩৪] কথিত হয় যে, তিনি ইহাকে মু'জিযা হিসাবে দাবি করেন—তিনি যে কিতাব কখনও পাঠ করেন নাই তাহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি বলিয়াছেন যে, "তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মিতার মধ্যে এই মু'জিযার রহস্য নিহিত রহিয়াছে"।[৩৫] যাহা হউক, মারগোলিয়থ বলেন যে একেবারে গোড়ার দিকে অবতীর্ণ ওহীর খণ্ডাংশসমূহ কুস্‌স ইবন সাইদা-এর ন্যায় ধর্মীয় বিষয়ে পুনরভ্যুদয়ের সমর্থকদের ধর্মীয় বাণী উচ্চারণের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।[৩৬] আরও দাবি করা হয় যে,

মহানবী ﷺ স্বাভাবিক আরবী বাগ্মিতার ধরনকে অনুকরণ করেন যাহা কিছু পরিমাণে কবিতার অনুরূপ কিন্তু ইহার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহার কমই জানা ছিল।[৩৭]

ছলনা ও প্রতারণার মূল সুরটিকে বিশদ করিবার জন্য মারগোলিয়থ মহানবী ﷺ-এর চরিত্র ও সততার স্বীকৃত বিশুদ্ধতাকে হেয় করিবার অপচেষ্টা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আধ্যাত্মিকতার উপর লিখিত F. Podmore-এর গ্রন্থের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, একজন সম্মানিত ব্যক্তি একই সময়ে তাহার অনুসারীদিগকে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিতে এবং তারপর তাহার "কৌশল" দেখাইতে পারে। মারগোলিয়থ বলেন, " Podmore-এর অবধারণা অনুযায়ী মুহাম্মাদ একই প্রকার সুবিধা লাভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে অনুগামীদের হৃদয় জয় করিয়াছেন"।[৩৮] তৎসত্ত্বেও মারগোলিয়থ বলিতে থাকেন যে, মহানবী ﷺ -এর একজন ওহী লেখক "এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সে ইহাকে প্রতারণা বলে এবং ফলে ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে"।[৩৯] যাহাই ঘটুক না কেন মারগোলিয়থ উপসংহারে বলেন যে, "অতিপ্রাকৃত প্রত্যাদেশের রাজনৈতিক কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণে কোন মাধ্যমের আন্তরিকতা"র খুব কমই গুরুত্ব রহিয়াছে।[৪০]

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রারম্ভ প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ বলেন যে, অনুকূল মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা মহানবী ﷺ -এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই অধিকাংশ "মাধ্যমের" ন্যায় তিনি "পুরাতন ও নূতন জীবনের মধ্যস্থিত ক্রান্তিকালের সদ্ব্যবহার করেন"।[৪১] মর্মন (Mormon) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা যোসেফ স্মিথ-এর সহিত একটি উপমা উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয়, তিনি প্রথমে বনে-জঙ্গলে পরিভ্রমণরত ছিলেন। তারপর লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি বিভিন্ন বাণী উচ্চারণ করেন এবং ঘোষণা দান করেন যে, দেবদূত কর্তৃক এই ঐশীবাণী তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। মারগোলিয়থ ইহা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির জীবন নির্জনতার মাধ্যমেই শুরু হইয়াছিল। মারগোলিয়থ বলেন যে, বৎসরের একটি নির্দিষ্ট মাস ধরিয়া মক্কাবাসিগণ 'তাহান্নুছ' নামে অভিহিত একটি ধর্মানুষ্ঠান পালন করিত। ইহা ছিল এক ধরনের কঠোর তপশ্চর্যা। এই মাসে "মুহাম্মাদ ﷺ হেরা পর্বতের একটি গুহায় অবস্থানের একটি নিয়ম পালন করিতেন"। উক্ত মাসের কোন এক সময়ে তিনি যখন হেরা পর্বতে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন তখন "দেবদূতের (অথবা ইহার তুল্য কোন কিছুর) আবির্ভাব ঘটে" যাহাকে তিনি ঐশীদূত বলিয়া আখ্যায়িত করেন। মারগোলিয়থ আরও বলেন যে, এই বিষয়ে হাদীছের বর্ণনানুযায়ী জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে। এই ফেরেশতাই বার্তা প্রদান করিতেন বলিয়া নিউ টেস্টামেন্টে (New Testament) উল্লেখ আছে। কিন্তু "কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেই পৃথিবীতে নামিয়া আসেন" বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তিনি মহানবী ﷺ হইতে দুইটি ধনুকের পাল্লারও কম দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মহানবী ﷺ -কে সম্বোধন করেন। মারগোলিয়থ বলেন যে, মহানবী ﷺ -এর ধর্মতত্ত্বের উন্নয়নের কারণে পরবর্তী কালে জিবরাঈল স্থলাভিষিক্ত হন।[৪২]

ওহী এবং মহানবী ﷺ-এর একজন ধর্মীয় শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ সম্পর্কে মারগোলিয়থের ইহাই প্রধান অভিমত। মহানবী ﷺ-এর উচ্চাকাংখা ও প্রস্তুতি সম্পর্কিত মূল ভাবধারা হিসাবে মুইর যাহা উল্লেখ করেন মারগোলিয়থ তাহাই স্পষ্টভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুইর-এর অসঙ্গতিসমূহ পরিহার করিয়া তাহার পরবর্তীতে ব্যাপ্তি দান করেন। তিনি মৃগীরোগ ও "ভাবাবেশ" সংক্রান্ত দাবিকেও গ্রহণ করেন এবং ইহাকে তিনি মহানবী ﷺ -এর ছলনা ও প্রতারণা তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রয়াস পান। ইহা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, মহানবী ﷺ কৃত্রিমভাবে এই সকল লক্ষণ তৈয়ার করিতেন। সর্বোপরি মুইর যেভাবে স্বীয় মতামত পেশ করিয়াছেন মারগোলিয়থও তেমনি জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, কুরআনের মূল পাঠ অথবা সাধারণভাবে ঐশী প্রত্যাদেশসমূহ মহানবী ﷺ -এর নিজস্ব রচনা। সকল প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনায় মারগোলিয়থের পূর্বসূরী যে পথ তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে তিনি সরিয়া আসেন নাই। তবে তিনি অবশ্যই তাহার কিছু নূতন ধারণা ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন যাহা বর্তমানে বিবেচনা করা হইবে।

যাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, একদিকে উচ্চাকাংখা ও নবীর প্রস্তুতির এবং অন্যদিকে মৃগীরোগের অভিযোগ। এই দুইটি অভিযোগের কথা বাদ দিলেও মারগোলিয়থের প্রধান অভিযোগ হইতেছে মহানবী ﷺ -এর প্রতারণা। তাহার মতে মহানবী ﷺ প্রত্যাদেশের গঠন, বিন্যাস ও ধরনকে এমনভাবে পরিকল্পনা করিয়াছেন যে, ইহা যেন কোন অতিপ্রাকৃত উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। এমনকি ইহাও বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ -এর জীবনের গোড়ার দিকে কথিত মৃগীরোগের যে খিচুনি হইত সেই দৃশ্য হইতে মহানবী ﷺ তাঁহার সংকেতসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং তারপর তিনি ঐ সকল দৃশ্য—যেমন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় পতিত হওয়া, নাক ডাকা ও মুখমণ্ডলের রক্তিমবর্ণ ধারণ, প্রচুর পরিমাণ ঘাম নিঃসরণ অথবা কম্বল দ্বারা নিজকে আবৃতকরণ প্রভৃতির পুনর্গঠন করিয়াছেন। আরও বলা হইয়াছে যে, "অনুপ্রেরণার স্বাভাবিক ধরন হিসাবে ইহাকে স্বীকৃতি দানের" জন্য আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু মারগোলিয়থ যে সকল উদাহরণের উদ্ধৃতি দিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি নাই, বরং মহানবী ﷺ-এর নিকট ওহী নাযিল হওয়ার বিভিন্ন ধরনের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল প্রক্রিয়ার (ধরনের) অধিকাংশ স্পষ্টতই প্রতারণার তত্ত্বের সহিত খাপ খায় না। তাই ঃ

(ক) ওহী নাযিল হওয়ার আরম্ভ সম্পর্কে এবং তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য ইহা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারিত বলিয়া মারগোলিয়থ স্বীকার করেন যে, মহানবী ﷺ হেরা উপত্যকায় সম্পূর্ণ একাকী থাকিবার অবস্থায় ওহী লাভ করেন। সেখানে ওহী নাযিল হওয়ার ধরন ও প্রণালী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার আর কেহই উপস্থিত ছিল না। অবশ্য মারগোলিয়থ যেমন দাবি করেন নাই তেমনি উৎস গ্রন্থসমূহেও কোন ইঙ্গিত নাই যে, ওহী নাযিল হওয়ার সময় ভাবাবিষ্ট ইত্যাদি হওয়ার ন্যায় কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

(খ) মহানবী ﷺ যখন আহার করেন অথবা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া যখন ভাষণ দেন সেই অবস্থায় তাঁহার উপর ওহী নাযিল হওয়ার উদাহরণের উল্লেখ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহে প্রকৃতপক্ষে উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, মহানবী ﷺ নাক ডাকা, মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ, ভাবাবেশে মগ্ন হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন।[৪৩] অধিকন্তু এই সকল উদাহরণের সহিত কুরআনের ওহী নাযিলের কোন সম্পর্ক নাই। মহানবী ﷺ সময়ে সময়ে অন্যান্য ধরনের যে সকল ওহী লাভ করিতেন তাহার সহিত কুরআনের ওহীকে সর্বদা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে।

(গ) মারগোলিয়থ আরও দাবি করেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার মিত্রদিগকে জিবরাঈলের ভূমিকা পালন অথবা তাঁহার অনুসারীদের কিছু সংখ্যককে তাঁহার পক্ষে জিবরাঈলের সহিত আলোচনাকারীর ভূমিকা পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[৪৪] এইরূপ দাবি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয়। কিন্তু জিবরাঈল সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে যে সকল উদাহরণের উদ্ধৃতি রহিয়াছে তাহাতে সুস্পষ্টভাবে এই পরোক্ষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে, জিবরাঈল কখনও কখনও মানুষের অবয়বে আবির্ভূত হইয়া মহানবী ﷺ -কে ওহী প্রদান করিতেন। তিনি যেমন একজন বহিরাগত ব্যক্তি অথবা মহানবী ﷺ-এর সাহাবী দিহ্য়া আল-কালবীর বেশে উপস্থিত হন। যাহাই হউক না কেন, জিবরাঈলের এই অবয়ব ধারণ কুরআনের মূল পাঠের অতিপ্রাকৃত উৎস সম্পর্কে দর্শনকারীদের কোনমতেই সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ইহা ছিল কথিত প্রতারণা তত্ত্বকে প্রকাশের একটি কৌশল মাত্র। কারণ জিবরাঈল যে ব্যক্তির কথিত রূপ ধারণ করিবেন তাহাকে মহানবী ﷺ-এর সহিত অধিকাংশ সময় অবস্থানকারী সাহাবীগণ (অনুসারীবৃন্দ) ছাড়িয়া দিবেন না, ইহাই স্বাভাবিক ছিল। এই সকল ক্ষেত্রেই মহানবী ﷺ -এর কৃত্রিমভাবে মুর্ছা যাওয়াকে ভাবাবিষ্ট হইবার "স্বাভাবিক আচরণ বলিয়া দাবি করা হয়"। এইভাবে মারগোলিয়থ নিজে যে সকল উদাহরণের উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা কোন মতেই মহানবী ﷺ-এর পক্ষে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণের দাবিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করে না।

দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ-এর নির্জনে ইবাদত ও হেরা পর্বতের গুহায় একাকী অবস্থান (তাহান্নুছ) সম্পর্কে মারগোলিয়থ যে ধারণা পোষণ করেন তাহাতে অসঙ্গতি রহিয়াছে। মারগোলিয়থ মনে করেন যে, অধিকাংশ "মাধ্যমের" ন্যায় মহানবী ﷺ ইহাকে পুরাতন ও নূতন জীবনের মধ্যবর্তী একটি ক্রান্তিকাল হিসাবে পরিকল্পনা করেন। যাহা হউক, একই তত্ত্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসীরা প্রতি বৎসর রমযান মাসে এই ধর্মানুষ্ঠান পালন করিত এবং এই মাসে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে অবস্থান করা মুহাম্মাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। এখন মক্কাবাসীদের রমযান মাসে তাহান্নুছ পালন সম্পর্কিত বর্ণনা ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।[৪৫] কিন্তু এই প্রশ্নকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া মারগোলিয়থের ন্যায় এইরূপ ধারণা পোষণ করা স্পষ্টতই পুরাতন জীবন পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরনের জীবনে সন্নিবিষ্ট হইবার জন্য তাহান্নুছ -এর সময়কে একটি পরিকল্পিত ক্রান্তিকাল হিসাবে অভিহিত করা অসঙ্গত হইবে। একই সঙ্গে

ইহাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, হেরার গুহায় তাহান্নুছ পালনকালে মহানবী ﷺ প্রতি বৎসর মক্কাবাসীদের পালনকৃত ধর্মানুষ্ঠানকে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, মারগোলিয়থ এখানে আর একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারণা দ্বারা নিজকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন, মহানবী ﷺ নবুওয়াত লাভের পূর্বেই পৌত্তলিক মক্কাবাসীদের ধর্মকে অনুসরণ করিতেন এবং এমনকি তিনি তাহাদের দেব-দেবীদের উপাসনা পর্যন্ত করিতেন।[৪৬] মারগোলিয়থ এই ভ্রান্ত ধারণায় এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তিনি অসতর্কভাবে ইহা এখানে উপস্থাপন করেন। কিন্তু তিনি খেয়াল করিয়া দেখেন নাই যে, তাহার ধারণামতে মহানবী ﷺ কর্তৃক পরিকল্পিত ক্রান্তিকালের মতবাদের সহিত ইহা সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গতিপূর্ণ। মারগোলিয়থ তাহার উপরোল্লিখিত ধারণামতে এখানে যে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাহার সংযোজনকৃত তথ্য হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি বলেন, "মহানবী ﷺ তাঁহার পরিবারবর্গকে তাঁহার সহিত লইয়া যাইতেন বলিা অনুমিত হয়; তবুও সম্ভবত তাহাদের আল-লাত অথবা আল-'উযযা-এর দৈনন্দিন পূজা-অর্চনার কাজটি এইরূপ অবস্থায় সম্পাদিত হইত না"।[৪৭] ইহাতে অবশ্যই পুনর্বার জোর দেওয়া হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ এবং তাঁহার পত্নী কখনও তথাকথিত আল-লাত ও আল-'উযযার উপাসনা করেন নাই এবং পূর্বে যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে[৪৮] তাহা এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থের বর্ণনা সংশ্লিষ্ট হাদীছের অর্থ না বুঝিয়া একটি চরম ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখানে তিনি কার্যত তাহার একটি ভ্রান্ত ধারণাকে আর একটির বিপক্ষে দাঁড় করাইয়াছেন।

ওহীর ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ অসঙ্গতি মারগোলিয়থের ধারণাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এইভাবে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মিতাকে একটি মু'জিযা[৪৯] হিসাবে দাবি করেন। ইহার পর মারগোলিয়থ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বর্ণনা করেন যে, সাধারণ আরববাসী কবিতার ছন্দে যে বাকপটুতা প্রদর্শন করিত তিনি (মহানবী ﷺ) কেবল তাহারই অনুকরণ করিতেন, "যদিও তিনি ইহার অর্থ বুঝিতেন না"।[৫০] পুনশ্চ ওহীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে মারগোলিয়থের পর্যবেক্ষণ এই যে, মহানবী ﷺ -কে ইহার জন্য ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের আসমানী কিতাবের উপর নির্ভর করিতে হইত এবং এই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত তিনি উক্ত কিতাবসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিতেন।[৫১] মারগোলিয়থ তাহার ধারণাকে বিশদীকৃত করিয়া আরও বলেন, "মুহাম্মাদ যখন রাষ্ট্রের কর্ণধার তখন তাঁহার অনেক কিছুই বলিবার ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রারম্ভে বিদ্যমান অবস্থা তাঁহাকে অনুরূপ কোন ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেয় নাই"। অতএব "তিনি পুরাতন ও নূতন বাইবেল হইতে তথ্য ধার করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন"।[৫২]

ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কিতাব হইতে তথ্য ধার করিবার অভিযোগটি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।[৫৩] এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মারগোলিয়থ কার্যত আর একটি চরম অসঙ্গতি দ্বারা এখানে তাঁহার স্বীয় অভিমতকে বাতিল করিয়াছেন। এইরূপে

উপরিউল্লিখিত মন্তব্য করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করেন এবং বলেন যে, মহানবী ﷺ ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কিতাব হইতে তথ্য আহরণের এই "নিরাপদ পদ্ধতি" অবলম্বন করেন যখন তিনি ক্রমবৃদ্ধিগত পরিমাণে প্রত্যাদেশসমূহ উপস্থাপন করিতে অবস্থাগত কারণে বাধ্য হন। কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকের প্রত্যাদেশের টুকরা টুকরা অংশসমূহ কুস্‌স ইব্‌ন সা'ইদা [৫৪]-এর ন্যায় পুনরুজ্জীবনবাদী ধর্মপ্রচারকের উক্তিসমূহের অনুকরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপে এক নিঃশ্বাসে মারগোলিয়থ আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, প্রারম্ভিক পর্যায়ে যখন মহানবী ﷺ -এর তেমন বেশি কিছু বলিবার ছিল না তখন তিনি ইয়াহূদী -খৃস্টানদের কিতাব হইতে প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত বিষয়ে সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং তিনি যথেষ্ট পরিমাণে কথা বলিতে পারেন। তারপর পুনঃ আমাদের বিশ্বাস করিতে হয় যে, মহানবী ﷺ হয়ত এই "নিরাপদ পদ্ধতি" অবলম্বন করেন যখন অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং ইহা তাঁহার জন্য আবশ্যক হয় যে, তিনি বেশি পরিমাণে প্রত্যাদেশ প্রকাশ করিতে পারেন! মারগোলিয়থের পক্ষে একটি সতর্কতা অবলম্বনের কারণে এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে যে, তথাকথিত একেবারে প্রথম প্রত্যাদেশের "খণ্ডাংশসমূহ" প্রকৃতপক্ষে পুরাতন ও নূতন বাইবেলের বিষয়বস্তুর সহিত তেমন কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না এবং কুরআনের যে অংশসমূহের সহিত ইহাদের যে কোনভাবে একটি মিল রহিয়াছে তাহা মহানবী ﷺ -এর নিকট প্রাথমিক পর্যায়ের ওহী ছিল না। কুস্‌স সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কাহিনী প্রসঙ্গে এবং উকায মেলায় তাহার সহিত মহানবী ﷺ -এর কথিত বাক্যালাপ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে যাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫৫] কিন্তু এমনকি এই বর্ণনাটিকে যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও তাহার এই কথিত কথাবার্তার সহিত প্রথমদিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহের সাদৃশ্য খুবই ক্ষীণ। পক্ষান্তরে প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাসমূহের বিষয়বস্তুর একটি ক্ষুদ্র অংশেরও তাহাদের আলোচনার সহিত সাদৃশ্য দেখা যায় না।

প্রচুর পরিমাণে তথ্য বিকৃতি দ্বারা এই সকল অসঙ্গতির উপর প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে মহানবী ﷺ -এর উপর লিখিত উৎস গ্রন্থসমূহের যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ ওহী লাভ করিবার সময় শারীরিক কষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করেন—এই তথ্যটি তাঁহার মধ্যে মৃগীরোগের লক্ষণ রহিয়াছে বলিয়া বিকৃত করা হইয়াছে। এই রোগ সম্পর্কে যাহাদের ধারণা আছে তাহারা অবগত আছেন যে, ইহা রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। তাহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে, মহানবী ﷺ -এর বিষয়টি ঐ রোগ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই একই বিষয়ের উপর দ্বিতীয় বিকৃতি সাধন হইতেছে পূর্ব অনুমান অর্থাৎ মহানবী ﷺ কৃত্রিমভাবে মৃগীরোগের লক্ষণ সৃষ্টি করিতেন যদিও উৎস গ্রন্থসমূহে এমন কোন ইঙ্গিত নাই যে, তিনি প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা বহু সংখ্যক অনুসারী ও সাহাবী যাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া খুবই ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিতেন তাঁহারা কখনও এইরূপ কোন ঘটনার কথা চিন্তাও করিতে পারেন না। একই বিষয়ের উপর তৃতীয় বিকৃতিসাধন

হইতেছে দৃঢ় দাবির যাহাতে বলা হইয়াছে যে, কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কথিত উপসর্গসমূহ তাঁহার ভাবাবেশের স্বাভাবিক ধরন; যদিও বিভিন্ন সূত্র হইতে আহৃত তথ্যানুযায়ী ইহা নিতান্তই স্পষ্ট যে, শারীরিক যন্ত্রণার ঘটনা তৎসহ ওহী প্রাপ্তি ছিল এক বিরল ও অনন্যসাধারণ বিষয় যাহা কদাচিৎ ঘটিত।

অনুরূপভাবে জিবরাঈলের ঘটনাটি যিনি কখনও কখনও মানুষের অবয়বে মহানবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হইতেন, বিকৃত করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, মহানবী ﷺ তাঁহার সঙ্গীদিগকে জিবরাঈলের ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইতোপূর্বে যেভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, এইরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ কেবল প্রতারণাটিকেই প্রকাশ করিয়া দেয় এবং ওহী নাযিলের সময় উপস্থিত জনতার উপর যে ঐশী প্রভাব পড়ে তাহা প্রতারণা দ্বারা সম্ভবপর হয় না। মারগোলিয়থের পক্ষে এই নির্দিষ্টকর বিকৃতির প্রয়াস বেশ অস্বাভাবিক। কারণ তিনি একই সাথে উল্লেখ করেন যে, জিবরাঈল একজন ঐশীদূত, "তিনি নূতন নিয়মে (বাইবেল) বার্তাবাহক হিসাবে অভিহিত"।[৫৬] কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবার জন্য প্ররোচনা বোধ করিতে পারেন ঃ নূতন বাইবেলের ক্ষেত্রে নবীদের জন্য জিবরাঈল কর্তৃক বার্তা বহনের বিষয়টি যদি অস্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে অন্য নবীর ক্ষেত্রে তাহা অস্বাভাবিক হইবে কেন? পরবর্তীজনের ক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয়টি প্রমাণ করিবার জন্য নূতন বাইবেলের নবীদের উদ্দেশ্যে ঐশীদূত কর্তৃক বার্তা বহনের প্রকৃত পদ্ধতির উল্লেখ করা আবশ্যক। মারগোলিয়থ অথবা তাহার বুদ্ধিজীবী শিষ্যদের মধ্যে যাহারা তাহার মতামত গ্রহণ করেন তাহারা কেহই ইহা সম্পাদন করেন নাই।

মূল গ্রন্থ বা পাঠের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ তথ্যের বিকৃতি ঘটানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ দুইটি অপব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য একটি রেখা টানিয়া দেওয়া প্রায়শ কঠিন হইয়া পড়ে। কমপক্ষে একজন ওহী লেখকের এইরূপ একটি ঘটনা আছে যে শপথপূর্বক ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়। কারণ তাহার এইরূপ প্রতীতি জন্মায় যে, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় হইতেছে একটি জালিয়াতি।[৫৭] বস্তুত মারগোলিয়থ কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীছটিতে বলা হইয়াছে যে, মহানবীর জন্য যে ব্যক্তি ওহী লিখিবে এবং পরে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মক্কার বিরোধী দলের সাথে যোগদান করিবে তাহার জন্য রহিয়াছে জঘন্য পরিণাম। তাহার ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া মার্গোলিয়থ বলেন যে, মহানবী ﷺ নিজে ওহী লেখককে ওহী লিখিবার নির্দেশ প্রদান করিতেন কিন্তু ওহী লেখক তাহা ভিন্নভাবে লিখিত। তাহাকে ভুল সংশোধনের জন্য বলা হইলে সে যাহা লিখিয়াছে তাহা পরিবর্তন করিতে অস্বীকৃতি জানাইত। সুতরাং মারগোলিয়থ বলেন যে, মহানবী ﷺ উক্ত ওহী লেখককে তাহার ইচ্ছানুযায়ী ওহী লিখিবার অনুমতি প্রদান করিতেন। এইরূপ একাধিকবার ঘটিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়।[৫৮]

এখন ইহা স্পষ্ট যে, এই বর্ণনা এইরূপ এক ব্যক্তির যে শত্রুতে পরিণত হয়। ইহাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। বর্ণনার মূল বিষয়বস্তু পরীক্ষা করিলে

ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি এক ছদ্মবেশী শত্রু যে ইসলামের নামে মিথ্যা ঘোষণা দিয়া মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। ইসলাম ও ওহীর মূল পাঠকে ধ্বংস করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহাই হউক না কেন, সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তিতে উক্ত ব্যক্তির ঘোষণাকে কখনও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ কোন যুক্তিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও তাহার কর্মচারী বা অনুসারিগণকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী লিখিবার অনুমতি দিতে এবং তাহাদের লিখিত বিষয়কে ওহী হিসাবে ঘোষণা করিতে পারেন না। আর একজন ধূর্ত ও সুনির্দিষ্ট ভণ্ড ব্যক্তির বেলায় তো ইহার প্রশ্নই উঠে না। এই বিবরণী সুস্পষ্টভাবে ইহাকে একটি মিথ্যা অভিযোগ হিসাবে উল্লেখ করে এবং ইহার ক্ষতিকর ফলাফলের বর্ণনা দেয় যাহা ইহার কুৎসা রটনাকারীর উপরই বর্তায়। মারগোলিয়থ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া ইহাকে সাক্ষ্য হিসাবে ভূয়া অভিযোগ দাঁড় করাইয়াছেন এবং তারপর ইহার বিকৃতি সাধনে রত হইয়াছেন। অধিকন্তু বিবরণীটিতে কোথাও উল্লেখ নাই যে, মহানবী ﷺ কৃত্রিমভাবে রোগের উপসর্গ তৈয়ার করিয়াছেন যাহা মারগোলিয়থ কথিত প্রতারণার চিহ্ন হিসাবে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, মহানবী ﷺ -এর হাজার হাজার বুদ্ধিমান ও সুবুদ্ধিপূর্ণ অনুসারীদের উদাহরণ হইতে তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সকল অনুসারী তাহাদের সারা জীবন মহানবী ﷺ -এর প্রতি ছিলেন চির অনুগত ও উৎসর্গীকৃত। আর মারগোলিয়থের দৃষ্টিতে ইহারা হইয়া গেলেন মহানবী ﷺ -এর ছলনা ও প্রতারণার শিকার!

তিন ঃ সূরা আন-নাজমের আয়াত ৫৩ঃ ৪-১০-এর মারগোলিয়থের অপব্যাখ্যা

মারগোলিয়থের আনুপূর্বিক বর্ণনা হইতেছে তাহার সবচাইতে বড় ভুল ব্যাখ্যা এবং তাহা হইতেছে মুইর-এর অনুমানের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আর ইহা হইতেছে, কুরআনে বলা হইয়াছে দুইটি ধনুকের পাল্লা হইতেও কম দূরত্বে অবস্থান করিয়া আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মহানবী ﷺ -কে ওহী প্রদান করিতেছেন এবং পরবর্তী সময়ে জিবরাঈল ওহী প্রদানকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। মারগোলিয়থ যদিও সুনির্দিষ্টভাবে ইহা উদ্ধৃত করেন নাই, তবুও কুরআনের আয়াত ৫৩ ঃ ৪-১০ (সূরাতুন নাজ্ম)-এর প্রসঙ্গে ইহা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই আয়াতটি বিবেচনা করিবার পূর্বে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মারগোলিয়থের এই অনুমানও তাহার সাধারণ মতবাদের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি সব সময় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার পূর্ববর্তী নবীদের কেবল অনুকরণ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সকল ভাবধারা ও তথ্য পুরাতন ও নূতন বাইবেল হইতে আহরণ করিয়াছেন। আর তিনি যোসেফ স্মিথ (Joseph Smith)-এর ন্যায় দায়িত্ব পালন করিয়াছেন যিনি "দেবদূতগণের পথ-নির্দেশনায়" মর্মনদের কিতাব (Book of Mormon) উদ্ধার করিয়াছেন। তারপর নূতন বাইবেলেই জিবরাঈলের কথা বলা হইয়াছে, যিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী লইয়া তাঁহার নবীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মারগোলিয়থ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন

যে, কুরআনের প্রমাণকে ভিত্তি করিয়া দাবি করা হয় যে, মহানবী ﷺ প্রারম্ভে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহী লাভ করেন বলিয়া উক্তি করেন। কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই কেন? মুহাম্মাদ ﷺ পূর্ববর্তী সকল নবীর রীতি হইতে অস্বাভাবিকভাবে দূরে সরিয়া যাইবেন? পূর্ববর্তী নবীগণ ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী লাভ করেন এবং তিনি তাহাদিগকে শুধু অনুকরণ করেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। অন্য কাহারও কর্তৃক অদৃশ্য ও অলক্ষ্যভাবে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট হইতে বাণী লাভ এবং ওহী প্রদানকারী ফেরেশতার দীর্ঘকালব্যাপী দৃশ্যপট হইতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিতি সবচাইতে সঠিক পদ্ধতি হইবে কিনা তাহা মারগোলিয়থ আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর ধর্মোপদেশের অতি প্রাকৃত উৎস সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার ও ইহা গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক ছিলেন।

বরং কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মারগোলিয়থ তাহার অনুমান দাঁড় করাইয়াছেন। আলোচ্য আয়াতগুলি এইভাবে অগ্রসর হইয়াছে ঃ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى . عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى . ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى . وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى . ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى . فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى .

"তোমাদিগের সংগী (Prophet বা রাসূল) বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাহাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে, অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম। তখন আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিবার তাহা প্রত্যাদেশ করিলেন" (৫৩ ঃ ২-১০)।

যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই আয়াতগুলি নাযিল হয় তাহা বুঝিতে হইবে এবং কুরআনের অন্য আয়াতসমূহে (আয়াত নং ৮১ ঃ ১৯-২৮, সূরাতুত তাকবীর) ইহার প্রসঙ্গ আসিয়াছে, যাহাতে একই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন রচনাবলীর পণ্ডিতবর্গ, তৎসহ প্রাচ্যবিদগণের মতানুসারে এই পরবর্তী আয়াতগুলি (৮১ ঃ ১৯-২৮) ওহী নাযিলের ক্রমানুসারে ৫৩ ঃ ২-১০ আয়াতসমূহের পূর্বেকার।[৫৯] এই উভয় সূরার আয়াতসমূহ মহানবী ﷺ যে আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে ওহী লাভ করেন কাফিররা তাহা বিশ্বাস করিতে অস্বীকৃতি জানাইবার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়। কাফিররা দাবি করে যে, মহানবী ﷺ একটি দুষ্ট আত্মার প্রভাবে মোহাবিষ্ট ছিলেন অথবা তিনি উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য এই আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছিল। সূরাতুত তাকবীর-এর আয়াতসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ . ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ . مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ . وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ . وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ . وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ . فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ . اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ .

"নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন। এবং তোমাদিগের সাথী (রাসূল) উন্মাদ নহে, সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে, সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে। এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে। সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ? ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ" (৮১ ঃ ১৯ – ২৭)।

এই উভয় সূরার মধ্যকার সাধারণ বিষয়টি উল্লিখিত হইতে পারে। প্রথমত, উভয় সূরাই মহানবী ﷺ -এর দিগন্তে একটি সত্তার দৃশ্য দেখিবার বর্ণনা প্রদান করিয়াছে। ওহী নাযিলের ক্রমানুসারে অধিকতর পূর্বের ৮১ ঃ ২৩ নং আয়াতে এই সত্তাকে সুস্পষ্টভাবে একজন সম্মানিত বার্তাবাহক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বার্তাবাহক একজন ফেরেশতা। তিনি নিজে আল্লাহ নহেন।

দ্বিতীয়ত, এই সূরাতে (৫৩ ঃ ২–১০) ইহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই যে, এই সত্তা একজন "বার্তাবাহক", তবুও সেখানে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সূরা ৮১ ঃ ১৯–২৭-এ প্রদত্ত বিবরণের প্রায় অনুরূপ। পক্ষান্তরে সূরা আত-তাকবীরে যখন তাহাকে একজন শক্তিশালী (ذِىْ قُوَّةٍ) ও আল্লাহ্র আরশের নিকটে অবস্থানকারী একজন সত্তা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তখন সূরা ৫৩ ঃ ২–১০-এ তাহাকে খুবই শক্তিশালী (شَدِيْدُ الْقُوٰى) এবং শারীরিক ও মানসিক তেজসম্পন্ন ব্যক্তি (ذُوْ مِرَّةٍ) হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে।

তৃতীয়ত, উভয় সূরাই মক্কার কাফিরদের অভিযোগ খণ্ডন করিয়া মহানবী ﷺ -কে "তোমাদের সাথী (صاحبكم) বলিয়া উল্লেখ করে"। কারণ তিনি প্রকৃতই তাহাদের একজন ছিলেন এবং তাহাদের নিকট এক অতি সুপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হইতেন।

চতুর্থত, উভয় সূরাতে জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ -কে কোন অপশক্তি আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই (৮১ ঃ ২২) কিংবা তিনি সঠিক পথ বিচ্যুত হইয়া বিচার-বুদ্ধিহীনের কাজ করেন নাই (৫৩ ঃ ২)।

পঞ্চমত, উভয় সূরাতেই বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ তাঁহার জনগণের মধ্যে যাহা ঘোষণা করিতেছিলেন তাহা একজন সম্মানিত বার্তাবাহক কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত বাণী (قول) বিশেষ ছিল এবং "সে একটি শক্তিশালী সত্তা" (৫৩ ঃ ৫) ইহা তাঁহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

সর্বশেষে, এই উভয় সূরাতেই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ-এর নিকট ইহা ছিল আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত ওহী (৫৩ ঃ ৪) এবং তাহা কোন অপশক্তির কথা ছিল না, বরং সারা পৃথিবীর সমস্ত লোকের জন্য তাহা ছিল আল্লাহ্র বাণীর বর্ণনা (৮১ ঃ ২৫, ২৭)।

এইভাবে উভয় সূরাতে একই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং মক্কার কাফিরদের একই অভিযোগের একই জবাব দেওয়া হইয়াছে। আর একইরূপ বাক্যাংশ ও বিশেষণ দ্বারা দিগন্তে দৃশ্যমান সত্তাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূরা দুইটির প্রতিটিই ব্যাখ্যামূলক ও একে অপরের সম্পূরক এবং যেহেতু প্রথম উল্লিখিত (৮১) সূরাটিতে সুনির্দিষ্টভাবে দৃষ্ট সত্তাকে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে, তাই ইহা ধারণা করা যাইতে পারে না যে, পরবর্তী সূরাতে এই বার্তাবাহককে স্বয়ং আল্লাহ হিসাবে দাবি করা হইবে যিনি নিচে অবতরণ করিয়া আসিয়া মহানবী ﷺ -কে কুরআনের বাণী হস্তান্তর করিবেন। এই একই বিষয়টি সত্য হইবে এমন কি যদি এই দুইটি সূরার নাযিল হওয়ার ক্রমটি পাল্টাইয়া দেওয়া হয়। কারণ মহানবী ﷺ যদি এতই আত্মবিরোধী হইয়া পড়েন যে, তিনি কোন একটি সূরাতে আল্লাহ্‌র বাণী বহনকারীকে আল্লাহ হিসাবে অভিহিত করিবেন এবং তাহাকে অন্যত্র ফেরেশতা বলিবেন তাহা হইলে কাফিরদের দ্বারা তিনি নিদারুণভাবে অপদস্ত হইতেন এবং তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয়টি সংশোধনাতীতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত।

এমনকি যদি ৫৩ ঃ ২ – ১০ আয়াতসমূহকে ৮১ ঃ ১৯ – ২৭ আয়াতসমূহের প্রতি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া স্বাধীনভাবে বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইত না যে, এই প্রসঙ্গটি আল্লাহ সম্পর্কিত। কারণ এই আয়াতে ইহার বিপরীতে চূড়ান্ত অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এইভাবে এই সত্তাকে প্রচুর শক্তির অধিকারী (شديد القوى) হিসাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এখন আল্লাহ তো অবশ্যই সর্বশক্তিমান ও মহাক্ষমতাশালী, কিন্তু কুরআনে তাঁহাকে কোথায়ও 'শাদীদুল কুওয়া' বা 'খুবই শক্তিশালী' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। এই বাক্যাংশটি স্পষ্টভাবে আপেক্ষিক শক্তির নির্দেশক এবং সর্বোচ্চ শক্তির নহে। অতএব, ইহা কখনও আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা হইতে পারে না। অনুরূপভাবে 'যু-মিররাহ' শব্দটি মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণ অথবা শারীরিক ক্ষমতা কিংবা উভয় প্রকাশ করে। এই শব্দটি কেবল সৃষ্টিজীবের বেলায় প্রযোজ্য হয়, স্রষ্টার ক্ষেত্রে নহে। তাহা ছাড়া কুরআনের কোথাও ইহাকে আল্লাহ্‌র বর্ণনা অথবা তাঁহার গুণের উল্লেখরূপে বর্ণনা করা হয় নাই। তৃতীয়ত, এই একই সূরার আরও কিছু পরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ ঐ একই সত্তার প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেন এবং তারপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে যে, তিনি যাহা দিগন্তে অবলোকন করেন তাহা তাঁহার মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ছিল (من ايات ربه الكبرى)।[৬০] অতঃপর মহানবী ﷺ এই উভয় ঘটনার ক্ষেত্রে যাহা অবলোকন করিয়াছিলেন তাহা ছিল একটি নিদর্শন অর্থাৎ তাঁহার প্রভুর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি—জিবরাঈল ফেরেশতা এবং তিনি মানুষের প্রকৃত অবয়ব ও গঠনে হাজির ছিলেন। আর তিনি স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন না।

আয়াত নং ৫৩ ঃ ১০ (فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى) -এর বর্ণনা দ্বারা মারগোলিয়থের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। এই আয়াতের অর্থ বুঝিবার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

প্রথমত, আরবী হরফ 'ফা' দিয়া আয়াতটি শুরু হইয়াছে এবং ইহার দুইটি ভাবার্থ রহিয়াছে–ইসতিকবালিয়াহ্ অর্থাৎ অনুবর্তিতা যাহার অর্থ করা হয় 'তখন' শব্দটি দ্বারা; এবং তাফসীরিয়াহ্ অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক; ইহার অর্থ 'এইরূপে' অথবা 'অতএব' কিংবা 'সুতরাং'।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইতেছে আয়াতের 'আবদিহি' শব্দটি। ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাকে বুঝায় এবং ইহা হয় মহানবী ﷺ -কে অথবা ফেরেশতা জিবরাঈলের প্রসঙ্গে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, ইহা স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, আরবী ভাষায় একটি সর্বনাম হয় স্পষ্ট অথবা একটি ক্রিয়াপদের সহিত উহ্য থাকিতে পারে এবং তাহা সব সময় অব্যবহিত পূর্ববর্তী সর্বনাম-এর (বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে না। কিন্তু ইংরেজিতে বরং কর্তৃকারকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে অথবা বিষয়বস্তুটি রচনার কোন অংশের বর্ণনা হইতে বোধগম্য হয়।

মনের মধ্যে এই তিনটি বিষয় ধারণ করিয়া ৫৩ ঃ ১০ নং আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা যাইতে পারিবে। 'ফা' হরফটি যাহার সহিত শুরু হইয়াছে তাহা যদি অনুবর্তিতার ভাবধারায় গৃহীত হয় তাহা হইলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে ঃ "তখন তিনি (ফেরেশতা) তাঁহার (আল্লাহ তা'আলার) বান্দার (অর্থাৎ মহানবী ﷺ) সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবেন যাহা তিনি (আল্লাহ অথবা মহানবী ﷺ) প্রকাশ করিয়াছিলেন"। পক্ষান্তরে, ফা হরফটিকে যদি ব্যাখ্যামূলক ভাবধারায় গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে অর্থ হইবে ঃ "এইরূপে অথবা সুতরাং (ফেরেশতার সহায়তায়) যিনি (আল্লাহ্) নিশ্চয়ই তাঁহার বান্দার সহিত যোগাযোগ করেন যাহা তিনি প্রকাশ করিতে চাহেন"।

উপরে যে সকল অভ্যন্তরীণ প্রমাণ উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা স্পষ্টতই ভুল হইবে। তাহা ছাড়া বিষয়বস্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গ ও একটি আয়াতের সহিত অন্য আয়াতের সম্পর্ক, ৮১ ঃ ১৯ – ২৭, এবং 'আবদিহি' (عبده) শব্দের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ইহা ধরিয়া লওয়া যে, আয়াতটিতে দিগন্তে দৃশ্যমান আল্লাহ নিজেই কথা বলিতেছেন অতঃপর মহানবী ﷺ -এর নিকট অবতরণ করিয়া তাঁহাকে ওহী প্রদান করিতেছেন—প্রভৃতি সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণা।

মারগোলিয়থ ধারণা পোষণ করেন যে, মহানবী ﷺ-এর প্রথমদিকের দাবি—আল্লাহ নিজেই তাঁহাকে কুরআনের বাণী প্রদান করেন—ইহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। ইহার অগ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও মারগোলিয়থের ধারণা তাহার উত্তরসুরি কর্তৃক গৃহীত ও পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। ফলে তাহারা মারগোলিয়থের অন্যান্য ধারণার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যে, পরবর্তী কোন এক সময়ে ওহীর বাহক হিসাবে জিবরাঈল স্থলবর্তী হন। মারগোলিয়থের প্রধান তত্ত্ব যে মুহাম্মাদ ﷺ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ও চক্রান্তপরায়ণতার সহিত একজন নবীর ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি যে অন্যভাবে একজন প্রতারক তাহা নূতন কিছুই নহে। ইসলাম সম্পর্কে মধ্যযুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের এই যে

ধারণা তাহা বাস্তবিকপক্ষে পুনরাবৃত্তি। সাম্প্রতিক কালের ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য অবশ্য মহানবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে এইরূপ গায়ে পড়িয়া অভিযোগ করিবার ব্যাপারে কিছু পরিমাণ লজ্জাবোধ করে। কিছু পরেই দৃশ্যমান হইবে এইরূপ সাম্প্রতিক কালের কোন পণ্ডিত ব্যক্তি যখন মহানবী ﷺ -এর প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত লক্ষণাদির[৬১] প্রবর্তনের উপর কথা বলেন তখন তাহা বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রতিধ্বনি হিসাবেই বিবেচিত হয়।

আরেকটি ক্ষেত্রে মারগোলিয়থকে একটি নূতন পথের নির্দেশ দিতে দেখা যায়। তাহা হইতেছে ইসলামী প্রত্যাদেশের দৃশ্য ব্যাখ্যাকল্পে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের উপর প্রণীত আধুনিক গ্রন্থাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা। এইভাবে তিনি যখন আধ্যাত্মিকতার উপর Podmore-এর গ্রন্থকে ব্যবহার করিয়া এই ধারণা দেন যে, মহানবী ﷺ সৎ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলেও তিনি তবুও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওয়াট অতীন্দ্রিয়বাদের উপর A. Poulin-এর গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষে ওহী হইতেছে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বাচনভঙ্গি।[৬২]

অনুবাদক ঃ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

টীকা

১. Muir, Life etc. ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৫–৩৯।

২. ঐ, পৃ. ৩৯।

৩. ঐ. পৃ. ৩৯–৪০।

৪. ঐ. পৃ. ৪১।

৫. ঐ।

৬. ঐ।

৭. পৃ. ৪২।

৮. ঐ, পৃ. ৪২ – ৪৩।

৯. ঐ. পৃ. ৪৩, এইখানে পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

১০. ঐ, পৃ. ৪৪। মুইর ১১০ নং সূরা উদ্ধৃত করিয়া এই বর্ণনা সমর্থন করেন।

১১. ঐ, পৃ. ৪৪–৪৫।

১২. ঐ, পৃ. ৪৫।

১৩. ঐ, পৃ. ৪৫–৪৬। মুইর সমগ্র সূরাটি অনুবাদ করিয়া ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

১৪. ঐ, পৃ. ৪৬। মুইর সূরাতুল ইখলাস (১১২ নং) পাদটীকায় উল্লেখ করিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

১৫. ঐ, পৃ. ৪৭ – ৪৮। মুইর সূরাটির কিছু অংশ বাদ দিয়া ইহার অনুবাদ উদ্ধৃত করেন।

১৬. ঐ, ৪৮।

১৭. ঐ, পৃ. ৫১।

১৮. "দৃষ্টিপথে আসা, বিশেষ করিয়া একটি প্রেতাত্মা বা মৃত ব্যক্তির আত্মা"-এর অর্থ। Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (সম্পা. A.S. Hornby), ১৯শ মু., ১৯৮৪।

১৯. "স্বপ্নময় আনন্দদায়ক চিন্তার মধ্যে হারাইয়া যাওয়ার অবস্থা"-এর অর্থ, ঐ।

২০. "ঘুম ঘুম অবস্থা; অস্বাভাবিক স্বাপ্নিক অবস্থা, সম্মোহিত অবস্থা"-এর অর্থ, ঐ।

২১. "মৃগীরোগের আক্রমণ"-এর অর্থ, ঐ।

২২. পূ. গ্র., পৃ. ১৫৬-১৫৯।

২৩. উদাহরণস্বরূপ দ্র. ৩ ঃ ৯৪, ৬ ঃ ২১, ৬ ঃ ৯৩, ৬ ঃ ১৪৪, ৭ ঃ ৩৭, ১০ ঃ ১৭, ১১ ঃ ১৮, ১৮ ঃ ১৫, ২৯ ঃ ৬৮ ও ৬১ ঃ ৭। বর্ণনার সাধারণ স্বরূপ ছিল ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ .

২৪. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ...

২৫. দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১৪খ., ৩৫৬; আল-বায়দাবী, তাফসীর, ২খ., ২৭৫; আস-শাওকানী, তাফসীর, ৪খ., ৩৫৫-৩৫৬।

২৬. 'মাধ্যম' হিসাবে মহানবী (স)-এর এইরূপ চরিত্রায়ণ Tor Andrae এবং Maxim Rodinson-এর মত ব্যক্তিগণও গ্রহণ করেন। M. Rodinson মাধ্যমকে "মেগাফোন"-এ বিস্তৃত করেন।

২৭. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ৮৪।

২৮. ঐ, ৮৫ (উদ্ধৃতি আত-তাবারী, তাফসীর, ২৮ খ., ৪)।

২৯. ঐ।

৩০. ঐ, ৮৬।

৩১. ঐ (উদ্ধৃতি মুসনাদ, ৪খ., ২২২)।

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ (উদ্ধৃতি মুসনাদ, ৬খ., ৫৬ ও ৩খ., ২১)।

৩৪. ঐ, পৃ. ৮০, ৮৬।

৩৫. ঐ, ৮৭।

৩৬. ঐ।

৩৭. ঐ. ৮৮।

৩৮. ঐ, পৃ. ৮৮-৮৯।

৩৯. ঐ, ৮৯।

৪০. ঐ।

৪১. ঐ, পৃ. ৯০।

৪২. ঐ, পৃ. ৯০-৯১।

৪৩. দ্র. মুসনাদ, ৩খ., ২১ এবং ৬ খ., ৫৬ (যথাক্রমে আয়েশা (রা) ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) -এর হাদীছ দ্র.)।

৪৪. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ৮৮ (উদ্ধৃতি ইব্‌ন সাদ, ২খ., পৃ. ৫২০)।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬, ৩৭৯–৩৮০।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫–২০৩।

৪৭. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ৯১। মারগোলিয়থ এখানে মুসনাদ-এর উদ্ধৃতি দিয়াছেন, ৪খ., পৃ. ২২২।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫–২০৩।

৪৯. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ৮৭।

৫০. ঐ, ৮৮।

৫১. ঐ, ৮০।

৫২. ঐ, ৮৬।

৫৩. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ১১।

৫৪. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ৮৭।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০–২৪১।

৫৬. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ৯১।

৫৭. ঐ।

৫৮. মুসনাদ, ৩খ., ১২০–১২১।

৫৯. মুসলিম পণ্ডিতবর্গের মতানুসারে আত-তাকবীর ও আন-নাজ্‌ম সূরা দুইটি ওহী নাযিলের ক্রমানুসারে যথাক্রমে ৭ম ও ২৩তম অবস্থানে রহিয়াছে। Rodwell, Jeffery, Muir ও Nöldeke ইহাদিগকে যথাক্রমে ৩২তম ও ৪৬তম, ২৪তম ও ২৭তম, ২৭তম ও ৪৩তম এবং ২৭তম ও ২৮তম অবস্থানের বলিয়া মনে করেন।

৬০. কুরআন, ৫৩ ঃ ১৩, ১৮।

৬১. নিম্নে দ্র., অধ্যায় ২০, ২য় অংশ।

৬২. ঐ , ১ম ও ২য় অংশ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ওহী এবং প্রাচ্যবিদগণ

২. বেল্-এর ধারণাসমূহ

ওয়াট-এর মনোভাব আলোচনা করার পূর্বে এই বিষয়ে রিচার্ড বেল্-এর ধারণাসমূহ বিবেচনায় আনা দরকার। ইহা এইজন্য যে, যদি মারগোলিয়থ কুরআনের সূরা আন্-নাজ্ম-এর ২-১০ (৫৩ ঃ ২-১০) আয়াতকে ভিত্তি করিা তাহার ধারণা ব্যক্ত করেন এবং এই বিষয়ের উপর নূতন যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং ওয়াট যদিও কতিপয় নূতন যুক্তি উপস্থাপন পূর্বক আলোচনায় অগ্রসর হন, তবুও অপরিহার্যরূপে তিনি রিচার্ড বেল্-এর ধারণার উপর তাহার আলোচনার উপসংহার টানেন। এইভাবে রিচার্ড বেল মারগোলিয়থ ও ওয়াট-এর মধ্যে একটি যোগসূত্র মাত্র।

রিচার্ড বেল্ এই সম্পর্কে তাহার ধারণাসমূহ ১৯৩৪ সালের "দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড" নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত একটি সাময়িকীর পর পর দুইটি সংখ্যায় দুইটি নিবন্ধে তুলিয়া ধরেন।[১] ঐ নিবন্ধ দুইটিতে তিনি নিম্নলিখিত (বিভ্রান্তিকর) যুক্তি পেশ করেন ঃ

(ক) ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছগুলি পরবর্তী কালের উদ্ভাবন এবং এইগুলি কুরআনের সূরা আন্-নাজ্ম-এর ১-১৮ নং (৫৩ ঃ ১-১৮) আয়াতের ভিত্তিতে উদ্ভাবন করা হয়।

(খ) রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াতে (৫৩ ঃ ১-১৮) বর্ণিত "দৃষ্ট বস্তু" বা বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করার পূর্বে তিনি কতিপয় পদ্ধতির কথা বলেন; কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়া অথবা রচনা করার কথা বলেন নাই।

(গ) ওহী পরিভাষাটি কুরআনের মূল পাঠের মৌখিক ভাষাগত যোগাযোগের অর্থ বহন করে না, বরং কুরআন "রচনা" করার "পরামর্শ", "প্রণোদনা" অথবা "প্রেরণা" দানের অর্থ বহন করে।

(ঘ) কুরআনের সূরা আন্-নাজম-এর ১-১৮ নম্বর (৫৩ ঃ ১-১৮) আয়াতের মর্ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি যেমন অধিকতর ভালভাবে অবহিত হন এবং তিনি যেসব রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা বলেন, সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন আপত্তি (বিরোধিতার) মুকাবিলা করেন এবং কুরআনের আয়াতসমূহ পরিমার্জিত করিয়া ইহাদের মধ্যে "আধ্যাত্মিক দৃশ্যে"র ধারণা প্রদান করেন।

(ঙ) পরবর্তী সময়ে তিনি ফেরেশতার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হন। তিনি এই সম্পর্কে সূরা আত্-তাকবীর (৮১)-এ পুনঃ জোর দাবি করেন যে, তিনি সংবাদবাহক ফেরেশতাকে পরিষ্কার দিগন্তে দেখিয়াছেন।

(চ) ইহার আরও পরে তিনি মদীনায় জিবরাঈল (আ)-কে ওহীর বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেন।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত যুক্তিগুলির মধ্যে কেবল ২টি, যেমন 'ক' ও 'গ'-এ বলা হইয়াছে যে, ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছসমূহ পরবর্তী কালের উদ্ভাবন এবং 'গ'-এ বলা হইয়াছে, ওহীর অর্থ "ধারণা" অথবা "প্রণোদনা", কুরআনের মূল পাঠের প্রত্যাদেশ নহে; এই ২টি যুক্তি সম্ভবত রিচার্ড বেল্-এর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত, যদিও তাহারা (রিচার্ড বেল্, মারগোলিয়থ, ওয়াট প্রমুখ) অন্য ৪টি যুক্তি সম্পর্কেও অনুরূপ পরোক্ষ মতামত পোষণ করেন। যাহা হউক, এই ধারণাগুলির মধ্যে ৪টি ধারণা মৌলিকভাবে মূর ও মারগোলিয়থ কর্তৃক বর্ণিত। অনুরূপভাবে 'খ'-এ বর্ণিত যুক্তি, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন নাযিলের পূর্বে তাঁহার 'বক্তব্য' বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিতেন, কুরআন ছিল সেইসব কথার পুনরাবৃত্তি। এই সম্পর্কে মূর, রাসূলুল্লাহর ﷺ -এর প্রাক-ওহী অথবা কুরআন নাযিল-পূর্ব কথাবার্তার কথা বলেন।[২] অনুরূপভাবে 'খ', 'ঙ' ও 'চ'- এ বর্ণিত ধারণাসমূহ মারগোলিয়থ কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাহা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে দাবি করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে ফেরেশতা জিবরীল (আ)-কে ওহী'র বাহকরূপে উপস্থাপন করেন।[৩] এখন তাহাদের দ্বারা বর্ণিত যুক্তিগুলি আমরা একের পর এক পর্যালোচনা করিব।

এক ঃ ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছ সম্পর্কে

ওহী অবতরণ সংক্রান্ত হাদীছসমূহ সম্পর্কে রিচার্ড বেল্-এর আপত্তি প্রথম হইতেই চলিতে থাকে এবং চূড়ান্তভাবে তাহা শেষ হয় (রিচার্ড বেল্-এর) অপর একটি ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া। ঐ ধারণাটি এই যে, (রিচার্ড বেল্-এর মতে) কুরআনের ৫৩ ঃ ১-১৮ আয়াতসমূহের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে দাবি করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার ঐ দাবির সংশোধন করেন। উভয় ধারণার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যেমন তিনি ইতোমধ্যে (আল্লাহ্কে) দেখিয়াছেন এবং পরে তাহা স্পষ্ট করা হয় অর্থাৎ সংশোধন করা হয়, এই বক্তব্য যথার্থতার অনেক দূরে। কিন্তু ইহা ছাড়াও ওহী আগমন সংক্রান্ত বিষয়ের হাদীছসমূহের বর্ণনাকে বর্জন করার জন্য রিচার্ড বেল্ নিম্নোক্ত কারণগুলি বর্ণনা করেন ঃ

(এক) তিনি বলেন যে, হযরত আয়েশা (রা) যিনি এই সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনার মূল উৎস, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক এই হাদীছ বলার সময় "জন্মগ্রহণই করেন নাই। তিনি বড়জোর এই ঘটনার বর্ণনা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন মাত্র"। তদুপরি পরবর্তী কালে "এই বক্তব্যটি তাঁহার প্রতি আরোপিত করা হইয়াছে, যাহা সম্ভবত তিনি কখনও বলেন নাই"।[৪]

(দুই) যে বর্ণনাটি আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহার "প্রাচীনতম বর্ণনা" ইব্ন ইসহাক/ ইব্ন হিশাম সেখানে হযরত আয়েশা (রা)-কে উহার "প্রথম অংশের জন্য দায়বদ্ধ করিয়াছেন"। অর্থাৎ

আল্লাহ্র রাসূল নিদ্রাবস্থায় সত্য দৃশ্যাবলী দেখিতে শুরু করেন। ঐ দৃশ্যগুলি তাঁহার নিকট প্রত্যূষের আলোকের মত ভাস্বর হইয়া উঠে এবং ফলে তিনি নির্জনতা পছন্দ করিতে শুরু করেন। ঘটনার শেষদিকের বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা তুলনামূলকভাবে অনেক কম অনির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে"।[৫]

(তিন) এই বর্ণনা, যাহা তাহান্নুছ (تَحَنُّثٌ) নামে অভিহিত (হেরা গুহায় নির্জন অবস্থান ও প্রার্থনা), তাহা ছিল প্রাক্-ইসলামী যুগের কুরায়শদের সাধনা রীতি, ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় যেমনটি বলা হইয়াছে, তাহা সঠিক নহে। "এই ধরনের সাধনার কঠোর যোগ-তপস্যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্বভাবে পুরোপুরি বেমানান ছিল" এবং "উপবাসব্রত সহযোগে" ইহা করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কোন সমর্থন মিলে না। "মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাদানী জীবনের পূর্বে উপবাসব্রত বা সাওম পালনের রীতি প্রবর্তিত হয় নাই, বরং তাহা ইয়াহূদীদের অনুকরণে প্রবর্তিত হয়"।[৬]

(চার) উল্লিখিত Nâmûs (নামূস) শব্দটি গ্রীক পরিভাষা nomos হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ 'ইয়াহূদী আইন'। এই কথিত শব্দটি ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁহার কথিত আলাপ-আলোচনার সময় ব্যবহার করেন নাই। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের শব্দ নাই। এবং রিচার্ড বেল্-এর মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ধর্মীয় কৌশলগত পরিভাষা "ধার করিতে আগ্রহী ছিলেন। ইহা মনে করা সঙ্গত যে, তিনি যদি শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হইতেন তাহা হইলে ইহা ব্যবহার করিতেন, বিশেষ করিয়া ওয়ারাকা যদি ইহা তাঁহার জীবনের সেই বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্তে ব্যবহার করিতেন"। অতএব ঐ সময় হইতে "পুরা বর্ণনা পরবর্তী যুগের উদ্ভাবন"।[৭]

এই শেষ যুক্তি প্রদর্শনে (চার) সুস্পষ্টভাবে দাবি করা হয় যে, অপর তিনটি যুক্তি প্রমাণ করার পূর্বে এই চতুর্থ যুক্তিটি সঠিক যুক্তি হিসাবে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। ঐ যুক্তিগুলি হইল ঃ (ক) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই কুরআন রচনা করেন; (খ) তিনি বিজাতীয় ধর্মীয় কৌশলগত পরিভাষা ধার করিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং (গ) যে সকল অপরিচিত পরিভাষা (غرائب) হাদীছ সাহিত্যে দৃষ্ট হয় এইসব শব্দ অপরিবর্তনীয়রূপে কুরআনে পাওয়া যাইত। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধারণাগুলির একটিও প্রতিষ্ঠিত নহে এবং গ্রহণযোগ্যও নহে। বিশেষ করিয়া সম্পূর্ণ যুক্তি-তর্কের মধ্যে বিভ্রান্তিকর বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই কুরআন রচনা করিয়াছেন, এই বক্তব্যটি এই বিষয়ের সবচাইতে গুরুতর দিক। অতএব ইহা কেবল ঘটনা হিসাবে প্রথম ধারণাগত বিষয় নহে। এই ঘটনাকে সপ্রমাণের কেন্দ্রবিন্দু করা প্রয়োজন নাই। রিচার্ড বেল্ এই ক্ষেত্রে মনে হয় A. Jeffery-এর ধারণার উপর নির্ভর করিয়াছেন।[৮]

প্রকৃতপক্ষে Nâmûs সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি রিচার্ড বেল-এর উপরই প্রতিক্ষিপ্ত হয় এবং এই ধারণা তাহার গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে ধ্বংস করে। কারণ তিনি মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছ পরবর্তী কালের উদ্ভাবন। যদি Nâmûs শব্দটি গ্রীক ভাষাভুক্ত হয়, যেমনটি রিচার্ড বেল্ বলেন এবং অর্থ হয় 'ইয়াহূদী আইন' এবং যদি রাসূলুল্লাহ

ﷺ এই মিথ্যা গল্পটি বানাইয়া (অথবা অন্য কেহ) বলিয়া থাকেন, যখন অভিযোগের বর্ণনায় বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন বলিয়া যে দাবি করা হয়, তাহা পরে অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ফেরেশতাকে ওহী প্রদানকারী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বর্ণনায় অপরিচিত শব্দের পরিবর্তে সুনির্দিষ্টভাবে ফেরেশতা অথবা জিবরাঈল পরিভাষাটি ব্যবহার করিতেন। Nâmûs শব্দটির যে অর্থ করা হইয়াছে তাহা শব্দটির প্রকৃত অর্থের সঙ্গে বেমানান। অনুরূপভাবে রিচার্ড বেল তাহার নিজস্ব মতে Nâmûs শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত নহে বলিয়া মনে করেন যে সময় হইতে ইহা হাদীছে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। যদিও শব্দটি গ্রীক ভাষার মূল শব্দ, ইহার অর্থ ইয়াহূদী আইন (ইহা স্মরণযোগ্য যে, বিদেশী ভাষার মূল শব্দ অন্য ভাষায় গৃহীত হওয়ার পদ্ধতিতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে এবং অন্য ভাষার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লয়)। তদুপরি হাদীছে শব্দটির (Nâmûs) ব্যবহার হইয়াছে ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল-এর বক্তব্যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা হযরত আয়েশা (রা)-এর বক্তব্যে নহে। ইহাই এই শব্দটির সঠিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

রিচার্ড বেল্-এর ১ নং যুক্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা অবশ্যম্ভাবীরূপে সত্য যে, হযরত আয়েশা (রা) ঘটনার বর্ণনা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইহা ঠিক যে, তাঁহার নামে (হযরত আয়েশা'র) পরবর্তী কালে কতিপয় বিষয় চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা সম্ভবত তিনি কখনও বলেন নাই। হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত সকল হাদীছকে সন্দেহযুক্ত মনে না করিয়া কেবল ইহার সনদের অধিকতর সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবি রাখে। রিচার্ড বেল্ সম্পূর্ণ বর্ণনাকে অস্বীকার করিতে চাহেন এই ভিত্তিতে যে, তাহান্নুছ প্রাক-ইসলামী যুগের কুরায়শদের সাধনা রীতি ছিল না, যেমন ইব্‌ন ইসহাকের রচনার বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা উপবাসব্রতও ছিল না, যাহা এতদসঙ্গে ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে। এই রীতি মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় নাই। এক্ষণে কোন আলোচনা ছাড়াই বলা যায় যে, হয় প্রাক-ইসলামী আরবে উপবাসব্রত অপরিচিত থাকুক, নয়তো ইয়াহূদীদের অনুকরণে প্রবর্তিত হউক, তাহান্নুছ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-র বর্ণনা, যাহা বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বর্ণনায় ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই যে, হয় প্রাক-ইসলামী যুগের কুরায়শদের সাধনারীতি ছিল, অথবা উপবাসব্রতের অপরিহার্য অংশ হিসাবেও ইহাকে পরোক্ষভাবেও বর্ণনা করা হয় নাই। ইহাও উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন ইসহাকের রচনায় বর্ণনাকারিগণ তাহাদের বর্ণনার বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়াও দাবি করেন নাই। এইভাবে রিচার্ডের যুক্তি-তর্ক দ্বৈত পদ্ধতিগত ত্রুটি দ্বারা আক্রান্ত। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন নাই এমন এক বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া যে বর্ণনাটির কোথায়ও হযরত আয়েশা (রা) দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দাবি করা হয় নাই এবং আরও একটি বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া যাহা তিনি নিজে (রিচার্ড বেল্) স্বীকার করেন যে, "ঐ সনদ অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ছিল"।

আরও দেখা যায়, মনে হয় রিচার্ড বেল হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার প্রথম অংশের যথার্থতা সমর্থন করেন যাহা ইব্‌ন ইসহাকের রচনায় পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ বেল্- এর

মতে, এই বর্ণনাটি এইখানে "প্রাচীনতম কাঠামোতে" পাওয়া গিয়াছে। এই বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যেমন বেল্ বর্ণনাটির বিবরণ দেন, "আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাঁহার নিদ্রাবস্থায় সত্য দৃশ্য দেখিতে শুরু করেন। তিনি দেখেন যে, তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যূষের আলোর মত আসে এবং তিনি নির্জনতা পছন্দ করিতে শুরু করেন"।[৯] বেল্ জোর দিয়া বলেন, এই প্রাচীনতম ভাষ্যটি অন্য যে কোন ভাষ্যের জন্য তাঁহাকে (আয়েশাকে) দায়ী করে না। ইহা বলা যায় যে, বেল্ হাদীছের এই অংশ اَلرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ (আর-রুইয়া আস্-সাদিকা)-এর সম্পূর্ণ নির্ভুল অনুবাদ করিতে পারেন নাই। তিনি ইহার অনুবাদ করেন, "সত্য দৃশ্য"। ইহার সঠিক অর্থ হইল, "সত্য স্বপ্ন," রু'ইয়া ইন স্লিপ -এর অর্থ স্বপ্ন, দৃশ্য নহে। বেল্ নিম্নলিখিত বক্তব্যটিরও যথার্থ অনুবাদ করিতে পারেন নাই, যেমন তিনি جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ -এর অনুবাদ করেন, "তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যূষের আলোর ন্যায় আসে"। ইহার সঠিক অর্থ হইল, "তাহারা ভোরের আলোর মত সত্য হইয়া আসে"। উহা এমন হইতে পারে, এই বর্ণনা সম্পর্কে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। (এক) ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার একটি অংশ মাত্র, ইহার সম্পূর্ণ অংশ নহে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করিয়াছিলেন অথবা তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) নির্জনতা অবলম্বন করার পর তাঁহার কী হইয়াছিল, ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া হযরত আয়েশা (রা) আকস্মিকভাবে থামিয়া যান নাই। তিনি সম্ভবত বর্ণনা ধারায় এবং ঘটনা বর্ণনার সমাপ্তিতে ইহা বলিয়াছিলেন। (দুই) নিদ্রার মধ্যে রু'ইয়া (اَلرُّؤْيَا) -এর ধরন যাহাই হউক না কেন, এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে ঐ প্রেক্ষাপটে কোনও কিছু অস্তিত্বশীল বস্তুর উপস্থিতির সংকেত ছিল না। বেল্ অনুমান করিতে পারেন নাই যে, কোন বিষয়টিকে তিনি visions (দৃশ্যাবলী) অর্থে অনুবাদ করিবেন। যাহা তিনি ধারণা করেন, তাহাই কুরআনের আয়াতে (৫৩ ঃ ১ – ১৮) বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা যদি কেবল নিদ্রাবস্থায় দৃশ্য অবলোকন করার বিষয় হইত অর্থাৎ একটি স্বপ্ন হইত, তাহা হইলে কেহই ইহা লইয়া বিতর্ক করার অথবা ইহা অস্বীকার করার বিষয়ে মাথা ঘামাইত না। প্রত্যেকের নিদ্রাবস্থায় অসাধারণ যে কোন স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে। সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, দৃশ্য (vision) শব্দটিই বিতর্কের বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পাইয়াছে কুরআনের ঃ ৫৩ ঃ ১–১৮ আয়াতে, যাহা অবশ্যই নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখার (দৃশ্যাবলী; 'visions') চাইতে ভিন্ন এবং ইহা উপরোল্লিখিত সূরার আয়াতের বর্ণনায় স্থান পাইয়াছে।

এই ক্ষেত্রে সাধারণত যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহা এই যে, কী করিয়া এবং কখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন যাহা তিনি জনসাধারণ্যে প্রকাশ করেন এবং যাহা সমালোচনার জন্ম দেয়, ঐভাবে আয়াতের মর্মে উত্থাপিত প্রশ্ন তাঁহার জন্য বর্ণনা করা" এবং সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে। বেল কখনও নিজে এই প্রশ্ন করেন নাই, কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর যে বর্ণনা ইব্ন ইসহাকের রচনায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং বেল্-এর নিজস্ব তত্ত্ব এই দুইটিই এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, এই বর্ণনার সমাপ্তিলগ্নে আরও কিছু বলার বাকী

আছে। ঐ আরও কিছু বলার বিষয় বাকী থাকার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত যাহা বুখারী শরীফে নির্ভুল ও পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইব্ন ইসহাকের রচনায় ইহা ভিন্নভাবে এবং অনির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে এমন বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে দেওয়া যাহাদের অন্তত ন্যূনতম এই সততাটুকু ছিল যে, তাহারা এই বিবরণের সূত্র হিসাবে হযরত আয়েশা (রা)-র নাম উল্লেখ করেন নাই।

তাহান্নুছ সম্পর্কিত ঘটনার সম্ভাবনা বাতিল এবং ওয়ারাকার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথোপকথনের সম্ভাবনা বাতিল করার সময় বেল্ তাহার বক্তব্যের কোথায়ও ওয়ারাকার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যোগাযোগ করার সম্ভাবনার কথা বাতিল করেন নাই এবং একইভাবে খৃস্টবাদের জ্ঞানসম্পন্ন ও ইহার ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ অন্যান্য মানুষের সঙ্গেও তাঁহার (রাসূলের) যোগাযোগের কথা বাতিল করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের যোগাযোগের বিষয় বেল্-এর অপর এক থিসিস "The Origin of Islam in its Christian Environment" -এ সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১০] যাহা হউক, সম্ভবত এখানেও তিনি এই ইঙ্গিত দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নবুওয়াতী জীবনধারার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন, তিনি যদি এই রকম ঘটনার উপলক্ষ না হইতেন অর্থাৎ তাঁহার যদি এই রকম ঘটনার অভিজ্ঞতা না থাকিত, তাহা হইলে এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার কোন প্রয়োজন হইত না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কাহার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, ইহা যদি না হয়, যেমন তাঁহার স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা) এবং তাহাদের আত্মীয় ওয়ারাকা, যিনি সর্বতোভাবে অন্যতম একজন হিসাবে সহানুভূতি ও মনোযোগের সঙ্গে তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। হেরা পর্বতের গুহায় তাহান্নুছ-এর অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তীতে ওয়ারাকার সঙ্গে আলোচনা এই উভয় ঘটনাই হযরত আয়েশা (রা)-র বর্ণনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইভাবে এই বিষয়ের মূল প্রকৃতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্বোপরি বেল্-এর নিজস্ব যুক্তি-পদ্ধতির সঙ্গে ইহার মিল রহিয়াছে।

দুই ঃ কুরআন-পূর্ব বক্তব্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা

দ্বিতীয় ধারণা সম্পর্কে বলা যায় যে, কুরআনের ৫৩ ঃ ১-১৮ আয়াত-এ "দৃশ্য" (visions) সম্পর্কে বর্ণনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় পদ্ধতির কথা বলেন, কিন্তু কুরআনের বক্তব্য প্রকাশ করা অথবা কুরআনের "রচনা" সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। এই সম্পর্কে বেল্-এর যুক্তিগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

(ক) কুরআনের আয়াতে বর্ণিত 'ইয়ানতিকু' يَنْطِقُ (আয়াত ৩) একটি সাধারণ শব্দ এবং শব্দটি কুরআনের আবৃত্তির ক্ষেত্রে কোন অনুষঙ্গ নহে"। (খ) 'কুরআন' শব্দটি সিরীয় ভাষার শব্দ Qeryånå হইতে উদ্ভূত। ঐ সময় হইতে কুরআন সরবরাহের ধারণা ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা উপস্থাপিত, খৃস্টান চার্চে বাইবেল পাঠ হইতে এই ধারণা গ্রহণ করা হয়। এইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন

পাঠের পূর্বেই লোকজনের সম্মেলন ঘটাইয়াছিলেন। (গ) আওহা (أَوْحَىٰ) শব্দটি কুরআনের সূরা আন্-নাজ্ম-এর ৪নং আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা অপরিহার্যভাবে কুরআনের শব্দাবলী বুঝায় না।[১১] উপরন্তু ওহী, (وحى) শব্দের বহুমুখী ব্যবহার কুরআনে দেখানো হইয়াছে। যেমন ইহার অর্থ "ধারণা দেওয়া", "বিস্মৃত শব্দ জাগাইয়া দেওয়া", "উদ্বুদ্ধ করা"।[১২]

এক্ষণে বেল্-এর শেষ যুক্তি (গ) প্রধানত তাহার তৃতীয় ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাহা উপরে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের ওহী (وحى) -এর প্রকৃতি। অতএব এই যুক্তি পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হইবে। বেল্-এর প্রথম যুক্তি (ক) সম্পর্কে, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল বিভিন্ন পন্থায় কথা বলিতেন, কুরআন অবতরণের কথা বলিতেন না এবং তিনি একদল লোক সংগ্রহ করার পর কুরআন অবতরণের কথা প্রকাশ করেন। ইহা মূইর-এর ধারণার সরল পুনরাবৃত্তি মাত্র, যাহা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ঐ ধারণার ত্রুটিসমূহ নির্দেশ করা হইয়াছে।[১৩] এই সম্পর্কিত বর্ণনায় বেল-এর নিজস্ব যৌক্তিকতা যতটুকু বর্ণিত হইয়াছে সেই দিক হইতে ইহা বলা যায় যে, তিনি সূরা আন্-নাজ্ম-এর ৩ নং আয়াতে (৫৩ ঃ ৩) দৃষ্ট ইয়ানতিকু (يَنْطِقُ) শব্দটির অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ভুল অর্থ করিয়াছেন এবং আয়াতের সার্বিক অবস্থা হইতে এই শব্দটিকে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছেন। আয়াতের নির্ভুল অন্তর্নিহিত অর্থে অবিশ্বাসীদের আপত্তির কারণে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়—ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের নিকট যে ঘোষণা দেন তাহা আল্লাহ্র কথা ছিল না, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজের কথা ছিল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নিজ ইচ্ছা হইতে কিছু বলেন না। ইহা আর কিছুই নহে, বরং আল্লাহ্র ওহী যাহা তাঁহার নিকট পৌঁছানো হয়"। কুরআনের বক্তব্য মা ইয়ানতিকু' (مَا يَنْطِقُ) -এর অর্থ 'তিনি বলেন না', শুধু ইয়ানতিকু (يَنْطِقُ) নহে, ইয়ানতিকু-এর অর্থ 'তিনি বলেন'। এই বিষয় সংক্রান্ত বর্ণনায় ইহা একটি যথাযথ ভাষার প্রকাশভঙ্গি বা বাগ্বৈশিষ্ট্য। ইহা কেবল সাধারণ ধারণা প্রকাশ করণার্থে "বক্তব্য" প্রদানে ব্যবহৃত হয় না, যেমন বেল্ আমাদেরকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন এবং ইহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "কেবল কতিপয় পদ্ধতি সম্পর্কে কথা বলিয়াছেন"। ইহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার বক্তব্যে দাবি করেন যে, আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ রহিয়াছে, অথচ অবিশ্বাসিগণ তাঁহার এই দাবি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে। ফলে কুরআনের আয়াত এই অভিযোগ পর্যায়ক্রমে খণ্ডন করিয়া ইহা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মন হইতে কিছু বলেন না—এই বর্ণনা তাঁহার খেয়ালী কোন অদ্ভুত কল্পনা হইতে জন্মলাভ করে নাই, কিন্তু ওহী হইল আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ যাহা তাঁহার নিকট নাযিল করা হইয়াছে। বেল্ এই বক্তব্যের সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা করিয়া আয়াতের আলোচ্য বিষয় হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছেন। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দাবি না করিতেন যে, তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আল্লাহ্র কথা—কুরআন, তাহা হইলে অবিশ্বাসীদের আপত্তি উত্থাপনের কোন কারণ থাকিত

না। সুতরাং এই আপত্তির বিরুদ্ধে পাল্টা জওয়াব দেওয়ার প্রয়োজন হইত না, যেমনটি এই আলোচ্য আয়াতে প্রশ্নাতীতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেল্ নিজেও এই ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের বর্ণনা-বিশ্লেষণে কিছুটা দ্বিধান্বিত ও স্ববিরোধী। তিনি এই সম্পর্কিত বিষয়ে অনুমিত কুরআন-পূর্ব বক্তব্যে বলেন যে, ওহী শব্দের অর্থ "প্রত্যাদেশের মূল পাঠের শাব্দিক বিবরণ" নহে, বরং ইহার অর্থ "পরামর্শ দেওয়া" "প্রণোদিত করা" অথবা "উদ্বুদ্ধ করা" ইত্যাদি যাহা কোন ব্যক্তির মনে তাহার নিজস্ব সত্তার বাহির হইতে আসে"।[১৪] তিনি আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিষয়ে আয়াত অবতরণের পূর্বে, কেবল "ওহীর মাধ্যমেই কথা বলেন এক স্বর্গীয় ব্যক্তিত্বের পরামর্শক্রমে" যাহাকে তিনি দেখিয়াছিলেন। বেল্ সুস্পষ্টভাবে এই বিবরণ দেন কুরআনের আয়াতের প্রামাণ্য সংশ্লেষ পরিহার করার মাধ্যমে, যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ করেন তাহা তাঁহার নিজের বক্তব্য ছিল না, বরং তাঁহার নিকট অবতীর্ণ ওহী ছিল। বেল্ এইরূপে জোরপূর্বক ওহীর ব্যাখ্যা দেন, ওহীকে তিনি বলেন, কুরআন-পূর্ব বক্তব্য। কিন্তু বেল্-এর এই ব্যাখ্যার ফলে কুরআন-পূর্ব বক্তব্য এবং ওহী অবতরণের মাধ্যমে যে কুরআন গঠিত হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দূর করে। এইভাবে বেল্ দ্বিধান্বিত ও স্ববিরোধী। তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক কুরআন-পূর্ব বক্তব্য সম্বলিত তাহার ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেন।

এই সম্পর্কে বেল্-এর অন্যান্য ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াতের ধারণা খৃস্টান চার্চে বাইবেল পাঠ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি কেবল এই "তিলাওয়াতের" চিন্তা উদ্ভাবন করেন, যখন তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত সাহাবীদের মধ্যে প্রকাশ্যে (তিলাওয়াত) করেন। ইহা কেবল একটি অযৌক্তিক প্রস্তাব, যাহা তিনি সুস্পষ্টরূপে যুগপৎ মূর-এর অযৌক্তিক ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া করিয়াছেন। ওহী-পূর্ব অথবা কুরআন-পূর্ব উচ্চারণ তত্ত্ব অনুযায়ী মূর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার একদল অনুসারী সংগ্রহের পর নিজেকে একজন রাসূল হিসাবে পরিচিত করেন এবং আল্লাহ্র নামে কথা বলেন।[১৬] অনুরূপ আপত্তি বেল্-এর ব্যাপারেও প্রযোজ্য। ইহা তো চিন্তা করাই অযৌক্তিক যে, একদল মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণের জন্য আসিবে এবং তাহারা তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কে অর্থাৎ একজন স্বর্গীয়ভাবে প্রেরিত শিক্ষক এবং তাঁহার শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী না হয়। তদুপরি, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাবেশে বক্তব্য পেশ সংক্রান্ত ধারণা খৃস্টান চার্চে বাইবেল পাঠ হইতে পাইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার জন্য অপরিহার্য নহে যে, তিনি তাঁহার চতুর্পার্শ্বে অনুসারীদের একত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন যতক্ষণ না তিনি তাঁহার হস্তে প্রস্তুত এক প্রস্থ (স্বর্গীয়) বাণী পাইতেন।

পরিশেষে বেল্-এর বিবরণ, যাহা কুরআনের আয়াত ৫৩ ঃ ১-১৮-এর "দৃশ্য" (vision) পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার অগ্রবর্তী বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন যে, ৫৩ ঃ ১-১৮ আয়াতসমূহ কুরআনের সর্বপ্রথম অবতরণকৃত আয়াতসমূহের অংশবিশেষ। যাহা

হউক, ঐ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। ওহী অবতরণের ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনার পার্থক্য সত্ত্বেও এই তথ্য হাদীছ দ্বারা সমর্থিত নহে। এমনকি ইহা প্রাচ্যবিদদের নিজেদের দ্বারাও সমর্থিত নহে। এমনকি রিচার্ড বেল নিজেও এই ধারণার উপর দৃঢ় থাকেন নাই এবং তিনি দ্বিধান্বিত হইয়া কিছু দিন পূর্বে বলেন, "যদি মুহাম্মাদ ﷺ কুরআন উপস্থাপনে (আবৃত্তিতে) প্রেরিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 'পড়' (ইক্‌রা - Recite) এই নির্দেশটি স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে আসার কথা। ঐ যুক্তি হয়ত এক্ষণে সমালোচনামূলক মনোভাবের আবেদন সৃষ্টি করে এবং বাস্তবিকভাবে অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিত এই আয়াতসমূহ সর্বপ্রথম অবতরণকৃত আয়াতের অন্যতম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।[১৭] প্রকৃতপক্ষে বেল্ বলিতেছেন যে, ৫৩ ঃ ১-১৮ আয়াতসমূহ অবতরণের পূর্বে কুরআনের اِقْرَأْ (পড় - Recite) আয়াত নাযিল হইয়াছিল। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ শুধু এক পদ্ধতিতে কথা বলিতেছিলেন না, বরং কুরআন উপস্থাপন করিতেছিলেন ৫৩ ঃ ১-১৮ আয়াতের "দৃশ্য" (vision) সম্পর্কে তথাকথিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পূর্বেই।

তিন ঃ ওহী সম্পর্কে বেল্-এর ধারণা

এই আলোচনা আমাদিগকে বেল-এর ধারণাসমূহের ধারাবাহিকতায় তৃতীয়টিতে পৌঁছায় অর্থাৎ ওহীর প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্পর্কে তাহার ধারণা। তিনি ওহী সম্পর্কিত অনেক ধারণার মধ্যে কতিপয় ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইহাদের মধ্যে একটি পরিভাষা হইল 'ওহী' ও ইহার দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়ের কুরআনে প্রয়োগ এবং এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি জোর দেন যে, এই শব্দটির সাধারণ অর্থ "পরামর্শ", "প্রণোদনা" অথবা "উদ্বুদ্ধকরণ"। তিনি ওহীর কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করেন, সেই উদাহরণসমূহে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলগণকে কতিপয় বিশেষ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দান করেন। যেমন হযরত নূহ (আ)-কে নৌকা নির্মাণ করিতে বলেন, হযরত মূসা (আ)-কে বলেন তাঁহার উম্মতসহ রাত্রিকালে যাত্রা করিবার জন্য এবং তাঁহার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার জন্য এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম অনুসরণ করার জন্য। এই সমস্ত ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া আল্লাহ্‌র ওহী তাঁহার রাসূলগণের নিকট আসে। উপসংহারে বেল্ বলেন যে, ওহীর অর্থ "কর্মক্ষেত্রে পথ দেখানোর জন্য পরামর্শ অথবা প্রণোদনা দান করা"।[১৮] এখানে ওহীর সাধারণ অর্থ এবং কুরআনের ওহীর বিশেষ অর্থ আলোচনার পূর্বে বেল্-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কতিপয় বিশেষ ত্রুটি বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমেই বলা যায়, তিনি যখন যুক্তি দেখান যে, ওহীর অর্থ কর্মক্ষেত্রে পথ দেখানোর জন্য পরামর্শ দান করা, তখন আমরা বুঝি যে, বেল্ সঠিকভাবে সঠিক পথে অগ্রসর হন নাই এবং তিনি এই কথা ব্যাখ্যা করেন নাই যে, কিভাবে পরামর্শ অথবা প্রণোদনা যে কথাটি তিনি অগ্রাধিকার দেন, কেমন করিয়া রাসূলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাইত? তদুপরি তিনি যদি "পরামর্শ" ও "প্রণোদনা" এই পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করিতে অতি মাত্রায় অভ্যস্ত না হইতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই দেখিতে পাইতেন, যে বিষয়গুলি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সবগুলিই আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট "নির্দেশনা" এবং তাঁহার রাসূলগণের প্রতি সরাসরি আদেশ এবং ইহা কোনক্রমেই পরামর্শ নহে। এইসব নির্দেশনা ও

আদেশ কার্যকরভাবে পথ দেখানোর জন্য। ইহাও বলা দরকার যে, এই শব্দটি আল্লাহ্র বিধিবদ্ধ শব্দ। إِقْرَأْ (পড় Recite), এই নির্দেশ সূচক শব্দটিও আল্লাহ কর্তৃক ব্যবহৃত, বেল্ ইহাকে কুরআনের সর্বপ্রথম শব্দ বলিয়া নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।

বেল্ মনে হয় এই বিষয়টি স্বীকার করেন যখন তিনি বলেন যে, "কার্যকরী পরামর্শ অনেক সময় বাস্তবসম্মতভাবে সরাসরি বক্তব্য তৈয়ার করে" এবং অনেক "বিষয় রহিয়াছে যাহার নিয়মনীতি পথ দেখানোর চাইতে মতবাদের উৎস হইতে পারে"।[১৯] তাহা সত্তেও তিনি জোর দেন যে, এইসব নিয়মাবলী "সব সময় খুব সংক্ষিপ্ত এক প্রস্থ বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বক্তব্য হইয়া থাকে....., যাহা অবশ্যম্ভাবীরূপে কোন বিষয়ের পর্যালোচনা করিয়া কোন প্রশ্ন বিবেচনার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে আলোর ঝলক সৃষ্টি করে"।[২০] কেহ এই ক্ষেত্রে মন্তব্য করিতে পারে যে, যদি চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় ওহী অর্থ হয় "বাগ্‌বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দগুচ্ছ" যাহা কোন বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিষয়বস্তুর পর্যালোচনার পর কোন ব্যক্তির মনে আলোর ঝলক সৃষ্টি করে তখন এই ক্ষেত্রে আর আল্লাহ্র প্রসঙ্গ টানিয়া আনার অথবা কোন বাহ্যিক অস্তিত্বকেও দৃশ্যপটে স্থাপন করার এবং কোন ধারণা যোগ করার দরকার নাই। যেমন বেল্ পরে কতিপয় বাক্য এই বিষয়ে লিখেন, ওহীর অর্থ "পরামর্শ", প্রণোদনা" অথবা "উদ্বুদ্ধকরণ" যাহা "কোন ব্যক্তির মনে সম্ভবত বাহির হইতে" আসে।[২১] প্রকৃত বিষয় এই যে, ওহী শব্দটি ইহার পারিভাষা হিসাবে ভাষায় পরামর্শ, প্রণোদনা অথবা উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি অর্থ বহন করে না, কোন ব্যক্তির প্রজ্ঞা এবং কোন বিষয় বিচার-বিবেচনার পর উপসংহারে উপনীত হওয়ার অর্থও প্রকাশ করে না, বরং ইহা আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁহার নবী-রাসূলগণের যোগাযোগের অর্থ বহন করে।

নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অব্যাহত রাখিয়া বেল্ বলেন, ওহীর অর্থ হইল, "যে কোন অবস্থায় কুরআনের প্রাথমিক অংশ", এমন নহে যে, ইহা শাব্দিকরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে; বরং "কুরআন রচনার ধারণা" এই যে, কুরআন সম্পর্কে তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বেল্ পরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর "ওহীর তত্ত্ব উন্নতি লাভ করে"। তিনি "এই শব্দের গুরুত্ব সম্প্রসারিত করেন মৌখিক পদ্ধতিতে যোগাযোগের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দীর্ঘ বিষয় সম্বলিত সূরার (passage) মাধ্যমে"। এইজন্য "কতিপয় সূরায় এই বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্নিহিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে"। যেমন ১১ ঃ ৪০, ১২ ঃ ১২০, ১৮ ঃ ২৭, এবং ২০ঃ ৪৫।[২২] এইভাবে বেল্ পরামর্শ দিতে আবির্ভূত হন যে, কুরআনের অংশবিশেষ আল্লাহ্র শাব্দিক যোগাযোগের মাধ্যম এবং বাকী অংশ তাহা নহে। কিন্তু তিনি নিজে বাস্তবিকপক্ষে ঐ প্রতিশ্রুত অবস্থানে থাকেন নাই। উপরের বর্ণনা প্রদান করিয়া তিনি ইহার ফলাফল এই বলিয়া সমন্বয় করিতে চেষ্টা করেন যে, কুরআনের যে সূরাগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, "সেইগুলি সম্ভবত অনেক পরে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের সবগুলির মধ্যে প্রকৃত শাব্দিক রূপ দেওয়ার বিষয়টি পরিহার করার চেষ্টা করা হইয়াছে"।[২৩] সুস্পষ্টভাবে এই ক্ষেত্রে বেল্ তাহার চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "প্রকৃত শাব্দিক ধারণার অর্থ প্রদান" সংক্রান্ত

বিষয়টিকে যে কোন মূল্যে "পরিহার" করেন। হয়ত কেহ ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিতে পারে যে, ইহা অবশ্যই বিকৃত বা "পরিহার" করা সম্ভব। কিন্তু ঐ অর্থ "তাহাদের প্রকৃতিগত অন্তর্নিহিত বিষয়", যেমন বেল্ স্বীকার করেন, সম্ভবত অসতর্কভাবে।

এই ব্যাপারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যখন কুরআনের কোন আয়াত তাহার ধারণার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন বেল্ হয় ইহাকে বিলম্বিত সময়ের, নয়ত অতি প্রাচীন বলিয়া অভিহিত করেন, অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য সাধনে যখন যাহা সমীচীন মনে হয় তখন তাহাই বলিয়া থাকেন। উপরে যেসব আয়াতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সবগুলিই মক্কায় অবতীর্ণ, এমনকি যদি যুক্তি প্রদর্শনের কারণে ইহা স্বীকার করা হয় যে, এইসব আয়াত "সম্ভবত যুক্তিসঙ্গতভাবে বিলম্বিত। বেল তাহার দাবিতে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহী অবতরণ তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটাইয়া ওহী শব্দের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন শব্দিক বিষয় বুঝানোর জন্য। তাহার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ৪২ ঃ ৫০ আয়াত (প্রকৃতপক্ষে ৪২ ঃ ৫১) উদ্ধৃত করেন। এই আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ "কোন মানুষের সঙ্গেঁ আল্লাহ্ কথা বলেন না, একমাত্র ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার আড়াল হইতে অথবা তিনি দূত প্রেরণ করেন, যিনি তাঁহার (আল্লাহ্‌র) ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার নিদের্শমত যোগাযোগ করেন..."।[২৪] এই আয়াতের প্রেক্ষিতে বেল্ বলেন, ওহী পরিভাষার মাধ্যমে শাব্দিক যোগাযোগের ধারণা প্রদান করা "অসম্ভব ব্যাপার"।[২৫] ইহার কিছু সময় পরেই তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, অন্ততপক্ষে যে কেহ মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট কিভাবে ওহী আসে সেই সম্পর্কে মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধারণা বুঝিতে পারে, যাহা আমাদের দৃষ্টি সমক্ষে প্রতিভাত হয়...।[২৬] এইভাবে বেল্ আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহী সংক্রান্ত ধারণা উন্নতি লাভ করিয়াছে, তিনি ইহার অর্থ সম্প্রসারিত করিয়া ইহাকে শাব্দিক যোগাযোগের অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। একই সময়ে আবার তিনি (বেল্) বলেন যে, ওহীর অর্থ শাব্দিক যোগাযোগ হইতে পারে না।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, না রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ববিরোধী ছিলেন, না কুরআন পরিবর্তনশীল। বেল্ স্বয়ং কুরআন প্রদত্ত ওহীর ধারণা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ৪২ ঃ ৫১ আয়াতের অর্থ বুঝিতেও ভুল করেন। ইহা এই অর্থ বুঝায় না যে, ওহী কোনক্রমেই শাব্দিক যোগাযোগ হইতে পারে না। ইহা তো শুধু আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো তথা যোগাযোগের রীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করে। ইহা অনুমিত হয়, যেমন কুরআনের আয়াত বলে যে, আল্লাহ্ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না, অর্থাৎ মুখোমুখী কথা বলেন না। বেল্ ওহীর অর্থ করেন, ইংরেজী গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী, আল্লাহ্‌র "পরোক্ষ বক্তব্য"।

বেল্-এর ইংরেজী গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী (ওহীকে) "পরোক্ষ বক্তব্য" বলার পর এই বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, পরবর্তীতে তিনি তাহা প্রত্যক্ষণ করেন এই বলিয়া, ৪২ ঃ ৫১ আয়াত এই স্বীকৃতি দেয় যে, যে কয়টি আয়াতে আল্লাহ্ সরাসরি (প্রত্যক্ষ) বক্তব্য দেন সেইখানে

তিনি "প্রথম পুরুষ এক বচন" অনুযায়ী কথা বলেন, যাহা ভুল। বেল্ লিখেন, "কুরআন শরীফ এক অথবা দুইটি আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার নিজস্ব প্রথম পুরুষ একবচন অনুযায়ী কথা বলেন, তু. ৫১ ঃ ৫৬-৫৮, ৭৪ ঃ ১১-১৫। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি আল্লাহ্র এই সরাসরি বক্তব্য ভুল হইয়া থাকে, যেমন উপরের আয়াতে স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে ইহার চাইতে আরও কঠিন যে দাবি করা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তিনি (রাসূল) আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন, তাহা কিভাবে সম্ভব"।[২৭]

ইহা এক্ষণে বলা উচিত যে, কুরআনের আয়াত ইহা বলে নাই যে, ওহী শাব্দিক যোগাযোগ হইতে পারে না। ইহা স্বীকার করা যে, কুরআনের বর্ণনা সরাসরি আল্লাহ্র বক্তব্য (ইংরেজী গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী), এই কথাটি ভুল। বেল-এর সার্বিক ধারণা এই যে, কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজস্ব রচনা, তাহা ভুল এবং এটিই আলোচনার বিষয়। এইখানে কেবল একটি অথবা দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করা হয় নাই। এমনকি ঐ আয়াতগুলি যে শাব্দিক যোগাযোগের অর্থে প্রকাশ করে, তাহা বেল্ দ্বারা সমর্থিত নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ কুরআন, চাই কোন আয়াত "প্রত্যক্ষ বক্তব্য" অথবা "অপ্রত্যক্ষ বক্তব্য"-এর ধারণায় বিন্যস্ত হউক অথবা না হউক, কুরআন আল্লাহ্র বাণীর শাব্দিক যোগাযোগ (নিঃসন্দেহে)। আরেকটি ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাথমিক অবস্থায় দাবি করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখিয়াছেন, ইহাও ভুল। যাহা হউক এই ধারণা গ্রহণ করার পর ইহা দেখিতে বাকী রহিল যে, প্রকৃতপক্ষে ওহীর তাৎপর্য কি যাহা স্বয়ং কুরআন হইতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে এবং বেল্ ভুল চিন্তা করিয়া বলেন, ওহীর অর্থ "পরামর্শ" অথবা "প্রণোদনা" অথবা "উদ্বুদ্ধকরণ"।

চার ঃ কুরআনে ওহী এবং কুরআনিক ওহী

ইহা এক সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, কুরআনের সত্তর-এরও অধিক স্থানে ওহী শব্দটি (ইহার ভিন্ন ভিন্ন শব্দরূপ অনুযায়ী) উল্লিখিত হইয়াছে। কুরআনের মূল পাঠ ও বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ওহী শব্দটি বিস্তৃত বহুমুখী অর্থ ও ধারণা বহন করে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রত্যেক ভাষায়ই কতগুলি বিশেষ শব্দ রহিয়াছে, যে শব্দের প্রত্যেকটি বহুমুখী অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে একটি শব্দ সরাসরি অন্য শব্দের বিপরীতমুখী অর্থ প্রকাশ করে। এই ধরনের অবস্থায় একটি শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ বাহির করা সহজসাধ্যও নহে, এমনকি সম্ভবত প্রত্যাশিতও নহে অথবা এমন অর্থ নিশ্চিত করা যাহা সকল প্রেক্ষিত ও অবস্থায় ইহার ব্যবহারের সঙ্গে যথার্থ হইবে। বেল্ ওহীর পরিভাষা সম্পর্কে ঐ রকম কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি কুরআনের কতিপয় আয়াতের উদাহরণ উল্লেখ করেন যেসব আয়াতে ঐ ধরনের শব্দ দৃষ্ট হয়, যেমন মধু মক্ষিকার প্রতি ওহী, এক শয়তানের অন্য শয়তানের প্রতি ওহী, পৃথিবীর প্রতি ওহী ইত্যাদি। এবং পরে তিনি বলেন, এই সকল উদাহরণের ভিত্তিতে ওহী পরিভাষার শুদ্ধ ইংরেজী রূপান্তর হওয়া উচিত "পরামর্শ", "প্রণোদনা" অথবা "উদ্বুদ্ধকরণ"।

কুরআন সম্পর্কে যাহাদের মোটামুটি জ্ঞান আছে তাহাদের সকলের নিকট ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়া উচিত যে, কুরআনের শব্দ ব্যবহার রীতি সম্পর্কে বেল্-এর জরিপ কোনভাবেই বুদ্ধিমত্তাপূর্ণও নহে, এমনকি বস্তুনিষ্ঠও নহে। তিনি তাহার আলোচনার মূল বিষয়ের সহায়তার জন্য এমন কিছু আয়াত নির্বাচন করিয়াছেন, যে ক্ষেত্রে সেই শব্দটি মূল পাঠের শাব্দিক যোগাযোগের অর্থ বুঝায় না। এইজন্য সে বিষয়টি তিনি "পরিহার" করার ইচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রেও ঐ ধারণা একটি "স্বাভাবিক" বিষয়। ইহার পরেও তিনি তাহার বক্তব্যে যে অর্থ উপস্থাপন করিয়াছেন সেই অর্থ তাহার উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের ব্যাপারে যথেষ্টও নহে এবং যথাযথও নহে। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিলের দৃষ্টান্ত যাহাকে তিনি বাস্তব আচরণের দিক বলেন, যাহা প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে, এই পরিভাষার অর্থ সেই রকমই হওয়া উচিত যেমন আদেশ অথবা নির্দেশনা এবং কেবল পরামর্শ অথবা প্রণোদনার অর্থ নহে। আরও বলা যায় যে, 'ইক্‌রা' সূরায় ওহী শব্দটি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বেল্ নিজে এই সূরা 'ইকরা'-কে ওহীর অংশ হিসাবে স্বীকার করেন এবং এইখানে ওহীর অর্থ (অর্থাৎ 'ইকরা'র অর্থ করেন আদেশ, পরামর্শ নহে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীকে প্রেরিত শেষ বিচারের দিন সম্পর্কিত ওহীর অর্থ পরামর্শ অথবা প্রণোদনা হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রিচার্ড বেল্ এই বলিয়া একটি ভুল করেন যে, পৃথিবী (মাটি) ইহার মধ্যস্থ মরদেহগুলি বাহির করিয়া দিতে প্রণোদিত হইবে—৯৯ ঃ ৪-৫ আয়াতের অর্থ, "ঐ দিন সে ইহার বিষয়গুলি সম্পর্কে বলিতে থাকিবে। কারণ তোমার প্রভু ইহার নিকট ওহী প্রেরণ করিবেন"। এইখানে সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, আল্লাহ্ পৃথিবীকে আদেশ করিবেন, একই সাথে পৃথিবীকে ইহার বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলার ক্ষমতাও দান করিবেন। এইখানে ওহী দ্বৈত অর্থ বহন করে। প্রত্যেকেরই এই কথা জানা আছে যে, পৃথিবী বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাহাতে ইহার কথা বলার ক্ষমতা নাই এবং কেবল কোন পরামর্শ অথবা প্রণোদনা ইহাকে কথা বলাইতে পারিবে না। এই ক্ষেত্রে বেল্-এর জরীপের বাহিরে কেবল একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, "ঐগুলি অদৃশ্য সংবাদের মধ্য হইতে কতিপয় বিষয় যাহা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করিয়াছি"। ৩ ঃ ৪৪ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ...।[২৮] এইখানে 'ওহী' পরিভাষাটির সুস্পষ্ট অর্থ হইল, কতিপয় বিষয় সম্পর্কে যোগাযোগ অথবা তথ্যগত বর্ণনা অদৃশ্য (অজ্ঞাত) বিষয় সম্পর্কে এবং ইহা কোনক্রমেই অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া অথবা উদ্বুদ্ধ করা নহে। অথচ বেল্ কর্তৃক কথিত অর্থ বর্ণিত বিষয়ের সঠিক ধারণা যথাযথভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে না, যদিও উদাহরণস্বরূপ তিনি ইহার দৃষ্টান্তসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে যদি আরবী 'ওহী' শব্দের তুল্য ইংরেজী শব্দের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পরামর্শ, প্রণোদনা ইত্যাদি শব্দের চাইতে এই শব্দ হওয়া উচিত "যোগাযোগ" (Communication)। এই শব্দটি সকল অবস্থায় যথাযথ হইবে।

যে সময় হইতে ওহী শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন বিষয় ও পরিস্থিতি বুঝাইতে, ইহার দ্বারা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের অর্থ বুঝাইতে হইলে ইহার ব্যবহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে

একমাত্র ঐ নির্দিষ্ট বিষয়েই ব্যবহার করিতে হইবে। ঐ বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলাম ধর্মীয় আলাপ-আলোচনায় ওহী পরিভাষাটি কেবল আল্লাহ্ তাঁহার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যোগাযোগের বিষয় বুঝাইতে প্রযোজ্য। অন্য কথায় বলা যায়, ওহী শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ইহার সাধারণ অর্থ হইতে পৃথক। ইহার অর্থ আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁহার রাসূলগণের যোগাযোগ এবং তদ্রূপ ইংরেজী শব্দ Communication। ওহীর অর্থ যোগাযোগের কাজ অথবা যোগাযোগের পদ্ধতি—এই উভয়টিই (ক্রিয়া অনুযায়ী) হইতে পারে এবং অনুরূপভাবে যাহা যোগাযোগ স্থাপন করে (অর্থাৎ যোগোযোগের বিষয়বস্তু)। এইভাবে ওহী শব্দটি ইহার যোগাযোগের ধরন অথবা পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকারভেদ ব্যবহার হইতে পারে। এমনকি বিষয়বস্তুর প্রকৃতিভেদে ব্যবহারবিধি ভিন্নও হইতে পারে।

উপরোল্লিখিত পবিত্র কুরআনের ৪২ঃ৫১ আয়াতে রাসূলগণের নিকট ওহী আগমনের ধরন অথবা পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এই আয়াত তিনটি পদ্ধতি নির্দেশ করে, এই পদ্ধতিতেই আল্লাহ্র বাণী তাঁহার নির্বাচিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায়। যেমন পদ্ধতি ৩টি এই ঃ (ক) প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে, (খ) পর্দার আড়াল হইতে এবং (গ) দূত প্রেরণের মাধ্যমে ফেরেশতা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে যিনি "আল্লাহ্র আদেশ ও আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী যোগাযোগ (Communication) করেন"। ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, প্রথম পদ্ধতির ওহীর ধরনের কথা এখানে আর বিস্তারিত বলা হয় নাই। সুস্পষ্টভাবে ইহার মধ্যে অপর দুইটি পদ্ধতি ছাড়া বাকী সকল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা অনুযায়ী, ওহী কোন কোন সময় তাঁহার নিকট ঘন্টাধ্বনির মত প্রতিধ্বনিত হইয়া (صلصلة الجرس) আসিত এবং ইহা এমন একটি পদ্ধতি ছিল যাহা তাঁহার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হইত।[২৯] এই পদ্ধতিকেই প্রথম পদ্ধতি হিসাবে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। ওহীর দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি উদাহরণ হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্র কথোপকথনের ঘটনা, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া কথা বলেন। ওহী অবতরণের তৃতীয় পদ্ধতি, স্বব্যাখ্যা প্রদানযোগ্য বিষয় এবং এই পদ্ধতি নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে যোগাযোগের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া ওহী বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে এবং এই বিভিন্ন পদ্ধতি বিষয়বস্তু অনুযায়ী হয়। ওহীর একমাত্র বিশেষ পদ্ধতিতে বাইবেল বিন্যস্তকৃত অথবা পঠন (Recitation) পদ্ধতি হইতে (وَحي مَتْلُوْ) কুরআন বিন্যস্ত (কুরআন) অনুরূপ হযরত মূসা (আ)-কে যখন বাস্তব জীবনের একটি আচরণ অনুসরণ করিতে বলা হয়, যেমন তাঁহার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করা, উহা অবশ্যই ওহী ছিল, কেবল তাওরাত নহে। উহা একমাত্র তাহাই যাহা সুনির্দিষ্টভাবে তাওরাত হিসাবে যোগাযোগযোগ্য ছিল এবং উহা তাওরাতই ছিল। তেমনি অনেক ধরনের ওহী কেবল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট আসিয়াছে, যাহা কুরআন হিসাবে যোগাযোগযোগ্য এবং তাহা কেবল কুরআনই এবং এই পদ্ধতির

ওহীকেই 'কুরআনিক ওহী' বলা হয়। এই কারণে যে, যখন কুরআনের প্রতিটি শব্দ সন্দেহতীতভাবে ওহী। তবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট আগত প্রতিটি ওহীই কুরআন নহে। তাঁহার প্রতি অবতারিত এই ধরনের অনেক কুরআন বহির্ভূত ওহীর উদাহরণ রহিয়াছে, যেমন হাদীছে কুদ্সী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরতের স্থানের ধরন সম্পর্কে স্বপ্নে তাঁহাকে জানানো সংক্রান্ত ওহী ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, কুরআনিক ওহীর ধরন বুঝিতে হইলে আমাদের মনোযোগ কেবল কুরআনের সেই আয়াতের প্রতি নিবদ্ধ করা দরকার যে আয়াতে ওহীকে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আল্লাহ্‌র যোগাযোগ' বলা হয় এবং সেই আয়াতসমূহ নহে যে আয়াতে ওহী পরিভাষাটি ইহার সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। যদি আমরা এইরূপ করি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কুরআন অবতরণের কথা বলা হইয়াছে এবং সেই সকল আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে ওহী পরিভাষাটিও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এমন অনেক সংখ্যক আয়াত রহিয়াছে যেইগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নিকট কুরআন আগমন সম্পর্কে বলা হইয়াছে, কিন্তু ওহী পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি পরবর্তী সময়ে নাযিলকৃত আয়াত, সে সব আয়াত কুরআনের ওহীর ধরন সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্বলিত।

পবিত্র কুরআনের প্রায় ৪০টি আয়াতে ওহী পরিভাষাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী নাযিল সম্পর্কিত বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সকল আয়াতের বেশীরভাগে কুরআনের ওহীর ধরন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত নাই। অন্ততপক্ষে এক ডজন আয়াত ওহীর ধরন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা সম্বলিত। এইসব আয়াত পর্যালোচনা করিয়া নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছা যায় ঃ

(এক) স্বয়ং কুরআন ওহী এবং অন্য কিছু নহে, যাহা আবৃত্তি/পঠিত হয়।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ...

"এইভাবে আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু জাতি গত হইয়াছে, উহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবার জন্য, যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি" (১৩ ঃ ৩০)।

এইখানে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, ইহা ঐ ধরনের ওহী যাহা পঠিত বিষয়। উহার অর্থ এই যে, ইহা পাঠযোগ্য বিষয়ের আঙ্গিকে বিদ্যমান এবং ইহা কেবল একটি পরামর্শ নহে যাহা কার্যে পরিণত করা হয় এবং ইহা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও স্পষ্ট। কারণ এই ধরনের ওহী তিলাওয়াত করা হয় এবং পড়া হয়, ইহার অপর নাম কুরআন, পাঠ করা অথবা আবৃত্তি করার বস্তু।

(দুই) ইহা একটি ধর্মগ্রন্থ (পুস্তক), যাহা ওহী করা হইয়াছে অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে আসিয়াছে এবং যাহা পাঠযোগ্য।

وَاتْلُ مَا أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ... (١٨ : ٢٧)

"তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে আবৃত্তি কর। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহই নাই" (১৮ ঃ ২৭)।

أُتْلُ مَا أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ... (٢٩ : ٤٥)

"তুমি তোমার প্রত্যাদিষ্ট কিতাব হইতে আবৃত্তি কর" (২৯ ঃ ৪৫)।

وَالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ... (٣٥ : ٣١)

"আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য" (৩৫ ঃ ৩১)।

এইভাবে যে বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যোগাযোগ (ওহীর মাধ্যমে) করা হয়, তাহা একটি গ্রন্থ। এমন নহে যে, তাঁহাকে একটি পুস্তক রচনার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও উল্লেখ্য যে, এই সূরার প্রথম আয়াতে কুরআনের ওহীকে "আল্লাহ্র কথা" (কালিমাতিহি = كلمته) বলা হইয়াছে। জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কথা পরিবর্তন করার শক্তি কাহারও নাই।

(তিন) যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা "পঠিত, পাঠযোগ্য/আবৃত্তি-কুরআন" এবং ইহা এক বিশেষ ভাষাশৈলীর মাধ্যমে।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا... (٤٢ : ٧)

"এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায়" (৪২ ঃ ৭)।

এইভাবে "পঠিত/ আবৃত্তিকৃত" বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী করা হইয়াছে, এমন নহে যে, পাঠযোগ্য কিছু রচনা করার জন্য তাহাকে ওহী করা হইয়াছে।

(চার) রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে শুনিয়া লইতেন তাঁহার নিকট কী ওহী করা হইল? ওহীর মাধ্যমে যোগাযোগ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তিনি ইহা পুনরাবৃত্তি/আবৃত্তি করার জন্য তাড়াহুড়া করিতেন না।

وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ... (٢٠ : ١١٤)

"তোমার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না" (২০ ঃ ১১৪)।

(পাঁচ) উহা কুরআনিক ওহী এবং কেবল সাধারণ কুরআন (পাঠযোগ্য) নহে, ইহা বর্ণনা/ বিবরণ সম্বলিত।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ... (١٢ : ٣)

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া" (১২ ঃ ৩)।

এই আয়াতে" উত্তম বিবরণসমূহ" (the best of narrative = اَحْسَنَ الْقَصَصِ) হইল ওহীর বর্ণনা যাহা কুরআন হিসাবে যোগাযোগযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে উল্লিখিত শব্দ نَقُصُّ (আমরা বর্ণনা করি) এবং اَوْحَيْنَا (আমরা ওহী প্রেরণ করি) শব্দ দুইটি মোটামুটি একই পরিধিযুক্ত।

(ছয়) একই বাস্তবতায় আয়াতসমূহে কুরআনের ওহীই বর্ণিত এবং কেবল কুরআনের সাধারণ বর্ণনা নহে, বরং এই কুরআনের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের সংবাদ/বর্ণনা সম্বলিত।

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ... (١١ : ٤٩)

"এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি" (১১ ঃ ৪৯)।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ... (١٢ :١٠٢)

"ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ—যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি" (১২ ঃ ১০২)।

(সাত) সর্বশেষ, তবে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে যে, কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজের রচনা নহে এবং ইহা তাহার জন্য কোন গুরুতর পাপকাজ হইবে যদি তিনি ইহাকে আল্লাহ্র বাণী হিসোবে ঘোষণা করেন—যাহা তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করা হয় নাই।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ... (٦ :٩٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট ওহী হয়, যদিও তাহার প্রতি নাযিল হয় না এবং সে বলে, আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ নাযিল করিব—তাহার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে" (৬ ঃ ৯৩)!

উপরে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে কুরআনিক ওহীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঃ (ক) ইহা কতিপয় সুনির্দিষ্ট মূলপাঠ যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে; (খ) উহা এমন এক গ্রন্থ যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা আল্লাহ্র বাণী (কালিমাতিহি); (গ) ইহা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হইয়াছে; (ঘ) রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত পুনরাবৃত্তি করার আগে ওহী মনোযোগ দিয়া শুনিতেন; (ঙ) কোন কোন সময় ওহী

'বর্ণনা' এবং "প্রতিবেদন" সম্বলিত হইত; (চ) এই ওহী রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের রচনা নহে। রাসূলের জন্য ইহা হইতে অধিক গুরুতর কোন পাপ হইত না যদি তিনি কোন পাঠ নিজে তৈরি করিয়া ইহা আল্লাহ্র বলিয়া ঘোষণা করিতেন। সকল ঘটনা বর্ণনায় নির্ভুলভাবে গ্রন্থের মূল পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শাব্দিক যোগাযোগের বিষয়ে জোর দেওয়া হইয়াছে এবং সকল ধারণাগত যোগাযোগ সম্পর্কে অথবা চিন্তা-ভাবনাগত বিষয়ে জোর দেওয়া হয় নাই, সর্বোপরি ওহীকে "পরামর্শ", "প্রণোদনা", "উদ্বুদ্ধকরণ" "অনুভূতি" ইত্যাদি বলা হয় নাই।

এই ঘটনাবলী কেবল ঐ ধরনের আয়াতসমূহ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যেইগুলি 'ওহী' পরিভাষা সম্বলিত (ইহার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের পদ্ধতি অনুযায়ী)। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ সংক্রান্ত ঘটনাবলী। যাহা হউক, এই আয়াতসমূহ অত্যন্ত জোরালোভাবে সম্পূরক এবং সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে সমর্থনকারী অসংখ্য আয়াত দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এই আয়াতগুলিও একই বিষয় আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু ওহী পরিভাষাটি ব্যবহার করে নাই এবং সুস্পষ্টভাবে এই বিষয়টি দেখাইয়াছে যে, কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আক্ষরিক এবং সুনির্দিষ্ট মূল পাঠ আকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল আয়াত পরবর্তী সময়ে ওয়াট-এর ধারণাসমূহের উপর আলোচনার সময় পর্যালোচনা করা হইবে। তখন ইহা দেখা যাইবে যে, ওয়াট তাহার নিজস্ব ধারায় এই বিষয়টিতেই বেল্-এর ধারণা প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, বেল্-এর বিভ্রান্তি ও ভুল-ভ্রান্তি নিম্নোক্ত বিষয়ে ধরা পড়িয়াছে ঃ

(ক) কুরআনের পরিভাষার সাধারণ ব্যবহারের উপর তাহার মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া; (খ) তিনি এই কথা প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হন যে, যে অর্থ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বক্তব্যের ধারণা বা অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশ করে না, এমনকি তিনি যে বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই বিষয়েও নহে (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ওহী অবতরণ বিষয়ে); (গ) তাহার এই পরিভাষা সাধারণ ধারণার বা অর্থ ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে না পারা; (ঘ) তাহার একদিকে কুরআনের ওহী এবং অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতারিত কুরআন বহির্ভূত আরেক ধরনের ওহীর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করিতে না পারা; (ঙ) তিনি ঐসব আয়াতের যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই যে সব আয়াতে ওহী পরিভাষাটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরআনের অবতরণের কথা বলা হইয়াছে এবং সর্বশেষ (চ) তিনি অনুরূপ বিষয়ের বহু সংখ্যক আয়াত বিবেচনায় আনেন নাই যেসব আয়াতে ওহী পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয় নাই কিন্তু 'ওহী' শব্দটি ছাড়া অন্য শব্দ প্রয়োগ ও ব্যবহার করিয়া কুরআনের 'ওহীর' প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বিশদ বলা হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায়, কেহ বিশ্বাস করুক বা না করুক, কুরআন আল্লাহ্র বাণী। কিন্তু যদি কেহ কুরআনের উদাহরণের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার প্রকৃত মতামত ঘোষণা করার চেষ্টা করে

তাহা হইলে তাহাকে ইহার উদাহরণসমূহের সার্বিক বিষয় বিবেচনায় আনিতে হইবে এবং নিজেকে কেবল ঐ সব বিষয়ের দ্বারা সন্তুষ্ট করা উচিত হইবে না যাহা যথাযথ নহে। এবং আরও বলা যায়, "স্বভাবজাত" ধারণার যে কোন বক্তব্য অথবা বর্ণনা গ্রহণ করার পরিবর্তে বিকৃতি সাধন বা ভুল অর্থ করা উচিত নহে।

পাঁচ ঃ আল্লাহ্‌কে চাক্ষুস দেখা সম্পর্কে বেল্-এর থিওরী

পবিত্র কুরআনের ৫৩ ঃ ১-১৮ (সূরা আন্-নাজ্‌ম)-এর বক্তব্য সম্পর্কে বেল্-এর ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে দাবি করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন। ইহা মারগোলিয়থের ধারণার একটি বিশদ ব্যাখ্যা মাত্র। আর এই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল এই আয়াতের দৃঢ় ও অন্তর্নিহিত অর্থ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩২] এইখানে বেল্-এর যুক্তি-তর্ক ও পর্যবেক্ষণসমূহ বিবেচনায় আনা হইল ঃ

বেল্ সূরা আন্-নাজ্‌ম-এর ৪ নং আয়াতের (عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى) অর্থ করিয়াছেন ঃ

"There taught him (or it) one strong in power".

"তাঁহাকে (অথবা ইহাকে) শিক্ষা দিয়াছেন একজন ক্ষমতায় শক্তিশালী"।

এই আয়াতের সরল অনুবাদ হওয়া উচিত ঃ

"One strong in power taught him".

"একজন ক্ষমতায় শক্তিশালী তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন"। আয়াতের অর্থ করার সময় বাক্যের শুরুতে "There" শব্দটি প্রবিষ্ট করার প্রয়োজন নাই। তিনি যাহা বলেন, তাহার বর্ণনার জন্য "দৃশ্য" শব্দটি পরবর্তী আরও দুইটি আয়াতে আসিয়াছে অর্থাৎ ৭-৯ নং আয়াতে। যাহা হউক, বেল-এর মূল যুক্তি সূরার ১০ নং আয়াতকে কেন্দ্র করিয়া বর্ণিত ঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى। তিনি মুসলিম ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা এই বলিয়া বাতিল করেন যে, আওহা (awha = اَوْحٰى) ক্রিয়ার কর্তা জিবরাঈল, পক্ষান্তরে 'আবদিহি (عبده=abdihi) -এর সহিত সংযুক্ত সর্বনাম আল্লাহ্‌কে নির্দেশ করে এবং ইহা একটি "ভাষার অস্বাভাবিক ব্যবহার"। তিনি স্বীকার করেন যে, কার্যত 'আবদিহি শব্দের মধ্যে আল্লাহ্ সর্বনাম এবং পরে তিনি বলেন যে, ইহা এই অর্থ নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ শব্দটি ক্রিয়ার কর্তা এবং প্রকৃতপক্ষে সবকিছু অনুরূপভাবে বলা হইয়াছে।[৩৩]

এই স্থানে এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার যে, ইহা ইংরেজীতে অসদৃশ, আরবী সর্বনামসমূহে সব সময় ইহা যথা পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নহে এবং একক বাক্যের সকল ক্রিয়ার ব্যাপারে একই উদ্দেশ্যের মধ্যে ধারণা করা যায় না। সর্বনামের এই ধরনের উদাহরণ আধুনিক আরবীতেও প্রচুর। এমকি ইংরেজীতেও এই বিশেষ ব্যাকরণগত নিয়ম সব সময় সঠিকভাবে পরিলক্ষিত হয় না এবং কোন বক্তব্যের অর্থ কেবল ইহার মূল পাঠের সম্পর্কের

মাধ্যমে এবং ঘটনাবলীর পটভূমি সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে যথাযথভাবে বোধগম্য হইতে পারে।[৩৪] যাহা হউক, যতদূর আরবী ভাষার সম্পৃক্ততা রহিয়াছে এই ক্ষেত্রে "ভাষার অস্বাভাবিক ব্যবহার" হয় নাই। প্রশ্নাধীন আয়াতে আওহা (awha=اوحى) ক্রিয়ার জন্য প্রশ্নাধীন একটি সর্বনাম এবং অপর একটি সর্বনাম 'আবদিহি (Abdihi =عبده) শব্দে রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অস্তিত্বের উল্লেখ যে ৫-৯ নং আয়াতে রহিয়াছে তাহা বর্ণনার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বুঝা উচিত, একমাত্র ১০ নং আয়াতের ভিত্তিতে নহে। এই বিষয়টি ৫-৬ নং আয়াতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "একজন ক্ষমতায় শক্তিশালী" এবং "জ্ঞানে ভূষিত (অথবা মানসিক ও শারীরিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন)।" বেল্ নিজে স্বীকার করেন যে, ৬ নং আয়াতে 'মির্‌রা' পরিভাষাটি 'ফিটনেস' (যোগ্যতা) অর্থে নেওয়া হইয়াছে, এই 'ফিটনেস' (যোগ্যতা) হয় শারীরিক অথবা জ্ঞান-বুদ্ধির দিক হইতে যোগ্যতা।[৩৫] যেমন ইতোপূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,[৩৬] এইসব বিশেষণ স্পষ্টতই বৈশিষ্টগতভাবে আপেক্ষিক। কোনরূপ কল্পনায়ও এইগুলিকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কুরআনের কোথায়ও আল্লাহকে এই ধরনের পরিভাষায় ও গুণাবলীর দ্বারা বর্ণনা করা হয় নাই। অপরদিকে ফেরেশতাদেরকে, অন্যান্যদের মত 'শাদীদ' এবং ইহার বহুবচন' শিদাদ' বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩৭] এইভাবে যদি এই বিষয় সম্পর্কিত হাদীছসমূহ এই আয়াতের আলোচনায় না আনাও হয় তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরীণ প্রমাণ নিশ্চিতভাবে যে কোন ধরনের প্রতিকূলে শক্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িবে, যেক্ষত্রে অস্তিত্ব বলিতে আল্লাহ্‌কে বুঝানো হইয়াছে। ইহার বিপরীতে বর্ণনামূলক বাগ্‌বিধি মনে ধারণ করিয়া এবং এই বর্ণনাকে একই সূরার ১৮ নং আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করিলে যাহা তিনি দেখিয়াছেন, সেই সম্পর্কে এই আয়াত কথা বলে, যেমন—"তাঁহার প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন," এবং প্রভু নিজে নহেন, অপরিহার্য অর্থ এই যে, কথিত অস্তিত্বশীল সত্তা হইল ফেরেশতা। পরবর্তীতে এই বিষয়টি কুরআনের ৮১ ঃ ১৯-২৭ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্ট করা হইয়াছে, যে আয়াতসমূহ ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।[৩৮] এই আয়াতসমূহ এই আলোচনার মধ্যে বিবেচনায় আনা দরকার। এই আয়াতে অস্তিত্বশীল সত্তা বলিতে "মহৎ দূত" বুঝানো হইয়াছে, যদিও তাঁহাকে একজন "ক্ষমতাশালী" (ذى قوة) সত্তা হিসাবেও বর্ণনা করা হইয়াছে। বেল্ পরামর্শ দেন যে, সূরা আন-নাজ্‌ম-এর ১৮ নং আয়াত, ৮১ ঃ ১৯-২৭ (সূরা আত-তাকবীর) নং আয়াত এবং ফেরেশতা জিবরাঈল সব কিছুই পরবর্তী পটভূমিকা হিসাবে বর্ণিত। কিন্তু যে পটভূমিতে এই ধারণাসমূহ তৈয়ার করা হইয়াছে, এই সব কিছুই অসমর্থনীয় যেমন শীঘ্রই দেখা যাইবে।

বেল্ তাহার ধারণা এমন বক্তব্যের দ্বারা সমর্থনযোগ্য করিতে চাহেন, যে বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন, পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন এবং তিনি এই বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তির মুখোমুখিও হন। এই ঘটনার প্রামাণ্যতার অভাবজনিত "অস্বস্তিকর" ও "আপত্তিকর" অবস্থার প্রেক্ষিতে বেল্ ১৭ ঃ ৬০ (৬২) আয়াত উদ্ধৃত করেন যাহা বেল-এর অনুবাদ অনুযায়ী পাঠ করা যাইতে পারে ঃ "আমরা এমন একটি দৃশ্য

(vision) প্রদর্শন করিয়াছিলাম যাহার মধ্যে আমরা তোমাকে মানুষের জন্য কেবল একটি পরীক্ষাস্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি"।[৩৯]

বেল্ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, এই আয়াত ইস্রা এবং মি'রাজের প্রতি ইঙ্গিত করে না যাহা ১৭ ঃ ১ আয়াতে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন—মুসলিম ভাষ্যকারগণ ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু সূরা আন-নাজ্ম-এ "দৃশ্য" (vision)-এর বর্ণনা করা হইয়াছে। বেল্-এর মতে ১৭ ঃ ১ আয়াত কোন "দৃশ্য"-এর কথা বলে নাই।[৪০] যাহা হউক বেল্-এর এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নহে, ১৭ ঃ ১ আয়াত "দৃশ্য" (vision) সম্পর্কে বলে এবং এই "দৃশ্য"-কে আল্লাহ্র কতিপয় 'নিদর্শন' হিসাবে চিহ্নিত করে لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا "এইভাবে আমরা অবশ্যই তাহাকে আমাদের নিদর্শনসমূহের মধ্যে কতিপয় নিদর্শন দেখাইব"। এমনিভাবে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বেল্ সূরা আন-নাজ্ম-এর "দৃশ্য (vision) সম্পর্কে তাঁহার যে "অস্বস্তিকর" ও "আপত্তিকর" ধারণা বিনির্মাণ করেন তাহা ভুল।

বেল্-এর এই দুইটি ভুল ধারণার ভিত্তিতে আরও অগ্রসর হইয়া বলা যায় , যেমন একটি ভুল ধারণা এই যে, সূরা আন-নাজ্ম-এ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আল্লাহকে দেখার দাবি করিয়াছিলেন এবং ঐ দাবির ফলে "অস্বস্তিকর" ও "আপত্তিকর" পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। বেল্ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তী সময়ে তাঁহার অবস্থান সংশোধন করেন এবং এই সংশোধন সূরার ১১-১৮ নং আয়াতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেল্ সূরার ১১ নং আয়াত مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى -এর এইভাবে অনুবাদ করেন ঃ "The heart did not falsify what it saw". "অন্তর যাহা দেখে তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না"। এবং তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইভাবে তাঁহার "আধ্যাত্মিক প্রকাশ"-এর ধারণা প্রদানের চেষ্টা করেন।[৪১]

বেল্ পুনরায় সর্বনাম সম্পর্কে ভুল করিয়াছেন مَا رَاٰى -এর ক্রিয়াপদের মধ্যস্থ সর্বনাম সন্দেহাতীতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ, 'ইহা' নহে অর্থাৎ অন্তর নহে। স্বাভাবিক কারণ এই যে, ইহা বাস্তবিকভাবে এই ধারণা সৃষ্টিপূর্বক বলে না যে, অন্তর কখনও কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না অর্থাৎ দৃশ্যকে উন্মোচিত করে মাত্র, যদি ইচ্ছার উপর জোর দিয়া বলা হইত যে, ইহা ছিল কেবল মানসিকভাবে দৃশ্য অবলোকন। ইহার বিপরীতে বলা হইয়াছে যে, যে সময় হইতে 'দৃশ্য' (ভিশন) অত্যন্ত বাস্তব ছিল, তখন ইহাকে জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, অন্তর ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নাই অর্থাৎ ইহা ভুল ধারণা ছিল না, এমনকি অবিমিশ্র ধারণাও নহে। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার দিক হইতে ইহা অলীক অস্তিত্বে বিশ্বাস নহে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দৃশ্য দর্শন (vision) রহস্যপূর্ণ নহে, তাঁহার এতদসংক্রান্ত বর্ণনা এইখানে কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই জোরালো করিয়া তোলে। এই অর্থে مَا رَاٰى-এর মধ্যস্থিত সর্বনাম রাসূলুল্লাহ ﷺ। ইহা ছিল একক ধরনের চাক্ষুস দর্শনের অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা পুনরায় ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে

যাহা আর একটি "অবতরণের" কথা বলে। এবং পরবর্তী ১৭ নং আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে "بَصَرُ" (চক্ষু) শব্দটি উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা দেখার বা দর্শন করিবার একটি অঙ্গ। এইখানে যদি রহস্যপূর্ণ করার অথবা সংশোধন করার তাহার কোন ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তথাকথিত সংশোধনী বিবৃতিতে দ্বিতীয় "অবতরণ অথবা চক্ষু"-র আদৌ উল্লেখ করিতেন না। অভিযোগে বর্ণিত সংশোধনী সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এবং ১৩, ১৭, ও ১৮ নং আয়াত কোন কিছুকেই সংশোধন করে নাই।

তদুপরি যে বিষয়টি ইতোমধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সূরা ৫৩ ঃ ১-১৮ (আন-নাজ্‌ম)-কে ৮১ ঃ ১৯-২৭ (সূরা আত-তাকবীর)-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, যে আয়াত "সম্মানিত দূত" অর্থাৎ একজন ফেরেশতা সম্পর্কে বলিয়াছে, যিনি ওহী বহনকারী ছিলেন।[৪২] বেল্ পরামর্শ দান করেন যে, এই আয়াত দ্বারা ৫৩ ঃ ১-১৮ আয়াতের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করার বিষয়টি মানিয়া নেওয়া উচিত নহে। তাহার এই পরামর্শ দানের কারণগুলি এই ঃ (ক) মদীনার জীবনকাল শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হযরত জিবরাঈলের উল্লেখ করা হইত না; (খ) যখন মক্কার অবিশ্বাসিগণ আপত্তি উত্থাপন করে, বেল্-এর মতে "একজন ফেরেশতাকে রাসূল হিসাবে পাঠানো উচিত ছিল অথবা অন্ততপক্ষে একজন ফেরেশতাকে যুগ্মভাবে তাঁহার (মুহাম্মাদের) সঙ্গে পাঠানো উচিত ছিল"। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উত্তর ছিল, কোন ফেরেশতা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার (রাসূলুল্লাহ্‌র) নিকট ওহী লইয়া আসেন না, বরং তাঁহার পূর্ববর্তী রাসূলগণও মানুষই ছিলেন (১৬ ঃ ৪৩); অথবা যদি একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হইত তাহা হইলে ঘটনার শেষ পর্যায়ে এবং তখন সেই ক্ষেত্রে কোন অবকাশ থাকিত না (৬ ঃ ৮)।[৪৩] বেল্ পরবর্তী পর্যায়ে বলেন, ফেরেশতাদের "সম্পূর্ণ নূতন পরিমণ্ডল" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনেক পরে "উন্মুক্ত হয়"। তিনি যেমন পছন্দ করেন, তেমন তিনি তাঁহার নূতন সৃষ্টিতে সংযোজন ঘটান। যেমন সম্ভাব্য বর্ণনা এই যে, "যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছিল তাহা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট নূতন ছিল"।[৪৪] এইভাবে যুক্তি প্রদর্শনের পর বেল উপসংহার টানিয়া বলেন, "৮১ নং সূরায় বর্ণিত দূত ফেরেশতা, ৫৩ নং সূরায় বর্ণিত দূত ফেরেশতার বর্ণনার পরবর্তী বর্ণনা এবং ইহার ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করার বিষয়টি অনুমোদন করা উচিত নহে"।[৪৫]

এক্ষণে এই ক্ষেত্রে বেল্ তাহার সকল ধারণায় সম্পূর্ণ ভুল, যেমন—(ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজম তিলাওয়াতের পরবর্তী সময়ে ফেরেশতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন; (খ) মক্কার অবিশ্বাসিগণের একজন দূত ফেরেশতার দাবির প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা এবং (গ) এই রকম ধারণা করা যে, জিবরাঈল কেবল মদীনায় ওহী অবতরণকারী হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন।

প্রথম ধারণা সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা যুক্তিতর্ক দ্বারা চূড়ান্তভাবে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে, যাহা বেল্ নিজে তাঁহার অভিসন্দর্ভে স্বীকার করিয়াছেন। ঘটনা এই যে, মক্কাবাসী দূতরূপে একজন ফেরেশতা অথবা রাসূলের সঙ্গে একজন ফেরেশতাকে তাঁহার সহকারী হিসাবে দেখিতে চাওয়ায়

(প্রমাণিত হয় যে), মক্কার অবিশ্বাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা বাদ দিলেও ফেরেশতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সূরা আন্-নাজম্-এর তিনটি স্থানে দেখা গিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেরেশতাদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করার জন্য কথা বলিয়াছেন, চেষ্টা করিয়াছেন। অনুরূপ ২১ নং আয়াতে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যেখানে তাহারা বলিয়াছিল যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা।[৪৬] ২৬ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে অনেক ফেরেশতা রহিয়াছেন, তাহাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না, যতক্ষণ আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা ও যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকে অনুমতি না দেন।[৪৭] এবং ২৭ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয় যে, "যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহারা ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়া থাকে"।[৪৮] মক্কায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ কুরআনের এক বিরাট সংখ্যক সূরায় দেখানো হইয়াছে যে, ফেরেশতার অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান বা ধারণা আরবে সুবিদিত ছিল, বিশেষ করিয়া প্রাক-ইসলমী যুগ হইতে মক্কায়।[৪৯] অতএব ইহা সত্য হইতে অধিক দূরে এবং যুক্তির দিক হইতে অধিকতর ভ্রান্তিপূর্ণ যে, মুহাম্মাদের নিকট সূচিত হয় যে, ফেরেশতার অস্তিত্ব তাঁহার জীবনের পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

অনুরূপভাবে বেল্ ১৬ ঃ ৪৫ এবং ৬ ঃ ৮ আয়াতসমূহের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, আয়াতগুলি অবিশ্বাসীদের এমন দাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত যাহাতে অবিশ্বাসীরা দাবি করে যে, ফেরেশতা তাহাদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইতে পারে। উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা তাহাদের দাবির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বিষয় লইয়া কুরআনের এই দুইটি আয়াতই কেবল আলোচনা করে না, এতদ্সম্পর্কিত বিষয়ে কমপক্ষে আরও ১০টি আয়াতে আলোচনা রহিয়াছে।[৫০] এইসব আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ফেরেশতা আছে কি না, একজন ফেরেশতা তাঁহার নিকট আল্লাহ্র বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন কিনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই প্রশ্ন পরিহার করেন ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে। এইসব আয়াত লক্ষ্য করিলে বিষয়টি নির্ভুলভাবে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে যে, অবিশ্বাসীদের দাবি তাহাদের দিক হইতে দুইটি ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া উত্থাপিত হইয়াছে। তাহারা ইহা বিশ্বাস করিতে অস্বীকার করে যে, তাহাদের মত একজন মানুষ আল্লাহ্র রাসূল হইতে পারেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই বলিয়াও ব্যর্থ হিসাবে চিহ্নিত করিতে চাহে যে, যদি সত্যই একজন ফেরেশতা আল্লাহ্র বাণী তাঁহার নিকট নাযিল করিয়া থাকেন তাহা হইলে ফেরেশতা রাসূলের নিকট আগমন না করিয়া তাহাদের নিকট আসিলেন না কেন? অথবা অন্ততপক্ষে মুহাম্মাদ ﷺ -এর সঙ্গে একজন সহ-সতর্ককারী প্রেরিত হইলেন না কেন? ইহা বলা আবশ্যক যে, মক্কার অবিশ্বাসীরা তাহাদের প্রতি একজন ফেরেশতা দূত হিসাবে প্রেরিত হইবেন, এমন ধারণা তাহারা নিজেরাও পোষণ করিতে পারে নাই। কারণ ঐ সময় পর্যন্ত তাহারা কেবল এই ধারণাই পোষণ করিত যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা এবং তাহাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্ ও মানবজাতির সঙ্গে মধ্যস্থতা করা। এই ধারণা যে, একজন ফেরেশতা আল্লাহ্র দূত হিসাবে প্রেরিত হইতে পারেন, সুতরাং এই ঘটনাটি তাহাদের কাছে তখনই প্রকাশিত হইল যখন মুহাম্মাদ ﷺ দাবি করিলেন যে, একজন ফেরেশতা বাস্তবিকই তাঁহার নিকট আল্লাহ্র বাণী

পৌঁছাইয়াছেন। যে কোন বিচারে তাহাদের এই দাবি ছিল সুস্পষ্টভাবে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দাবি যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃপ্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়।

অবিশ্বাসীদের আপত্তি ও চ্যালেঞ্জের ধরন ২৫ : ৭ (সূরাতুল ফুরকান) এবং ১৫ : ৬-৭ (সূরাতুল হিজ্‌র) হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে আয়াতগুলি উদ্ধৃত করা হইলঃ

وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ لَوْلاَ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا .

"এবং তাহারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তাহার নিকট কোন ফেরেশতা নাযিল করা হইল না কেন যে তাহার সংগে সতর্ককারীরূপে থাকিত" (২৫ : ৭)?

وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ . لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

"তাহারা বলেন, ওহে যাহার প্রতি কুরআন নাযিল হইয়াছে—নিশ্চয় আপনি একজন উন্মাদ। তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদের নিকট ফেরেশতাদিগকে উপস্থিত করিতেছ না কেন" (১৫ : ৬-৭)?

প্রথম আয়াতে এই কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, একজন মানুষ যে আল্লাহ্‌র রাসূল হইতে পারেন, অবিশ্বাসীদের মনে এই প্রত্যয় জন্মায় নাই। দ্বিতীয় আয়াত অবিশ্বাসীদের দাবির সমুচিত জওয়াব প্রদান করিয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতে অবিশ্বাসীদের বক্তব্যের ধরন প্রকাশিত হইয়াছে "ওহে যাহার প্রতি কুরআন নাযিল হইয়াছে", এই বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার আর কোন বিকল্প নাই যে, এই কথায় অর্থাৎ রাসূলের উপর যে কুরআন নাযিল হইয়াছে তাহার উপর তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে। ইহা কেবল এক উপহাসপূর্ণ দ্বিরুক্তি যাহা তাহারা বলিয়াছে, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী তাঁহার প্রতি "প্রেরিত" হয়।[৫১]

নুয্‌যিলা (نُزِّلَ) শব্দটির অর্থ "নাযিল করা হইয়াছে"। এই শব্দটি এমন অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে যাহাতে কুরআন অবতরণকারীর কতিপয় মাধ্যম চিহ্নিত করা হইয়াছে। পরবর্তী আয়াত (১৫ : ৭)-এর দ্বারা ইহা স্পষ্ট হয়। এই আয়াতে দাবি করা হইয়াছে যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার এই দাবিতে "সত্যবাদী" হন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সঙ্গে কেন একজন ফেরেশতা রাখেন না। অর্থাৎ তিনি যদি তাঁহার বর্ণনা সত্য বলিয়া উল্লেখ করেন যে, একজন ফেরেশতা তাঁহার নিকট পবিত্র কুরাআন লইয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাবির ধরন, সমুচিত জওয়াব দেওয়ার ধরন হইতে পার্থক্য করা বা উপলব্ধি করার যোগ্য। নিশ্চিতভাবে অবিশ্বাসীরা তাহাদের নিকট ফেরেশতা আসার কামনা করে নাই। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে এই কথা বলিতেন

যে, তিনি কুরআনের আয়াত সরাসরি আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। অনুরূপ কুরআনের আয়াত বেল্ -এর উত্থাপিত দুইটি ধারণাকেই নিশ্চিতভাবে ভুল প্রমাণ করে। একটি ধারণা এই ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাথমিক পর্যায়ে এই দাবি করিয়াছিলেন যে, তিনি সরাসরি আল্লাহ্র নিকট হইতে কুরআন প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় ধারণাটি এই—তিনি শুধু নবী জীবনের পরবর্তী সময়ে ফেরেশতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন।

অবিশ্বাসীদের দাবির প্রেক্ষিতে দুইটি উত্তর প্রদান করার পর বেল্ এই আলোচনার সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় সংক্রান্ত অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই যাহা তাহার উদ্ধৃত পরবর্তী আয়াতেই বর্ণিত হইয়াছে, যেমন ৬ ঃ ৯ আয়াত। এই আয়াতে বলা হইয়াছে, যদি একজন ফেরেশতা মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয় তবে তিনি অবশ্যই একজন মানুষের আকৃতিতে প্রেরিত হইবেন এবং ঐ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ কোনক্রমেই হ্রাস পাইত না। তাহাদের মূর্খতাপূর্ণ দাবি পরবর্তী পর্যায়ে ১৭ ঃ ৯৫ আয়াতে বিশ্লেষণ করা হয়। এই আয়াতে বলা হয়—যদি পৃথিবীতে ফেরেশতাগণ শান্তি ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত তাহা হইলে আমি আকাশ হইতে কোন ফেরেশতাকেই পয়গাম্বর করিয়া প্রেরণ করিতাম। এইসব আপত্তি খণ্ডনে যাহা বলা হইতেছে তাহা এই নহে যে, ফেরেশতা আছেন কিনা বরং যদি একজন ফেরেশতা বাস্তবিকই আল্লাহ্র বাণী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট প্রদান করেন তাহা হইলে কেন একজন ফেরেশতা শারীরিকভাবে মানুষের নিকট আল্লাহ্র দূত (রাসূল) হিসাবে উপস্থিত হন না অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে অন্ততপক্ষে সহ-দূত হিসাবে আগমন করেন না? অন্য কথায় মুহাম্মাদ ﷺ একজন ফেরেশতাকে তাঁহার অনুকূলে সাক্ষীরূপে তাঁহার অনুসারীদের নিকট অগমনের জন্য কেন বলেন না?

এইরূপ ধারণা করা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাথমিক অবস্থায় দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন, কারণ তিনি ঐ অবস্থায় ফেরেশতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং ৫৩ ঃ ১-১৮ নং আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী অর্থাৎ এই আয়াতসসূহ এই ধরনের "দৃশ্য"-এর তথ্য সম্পর্কিত এবং ইহার পরবর্তী "সংশোধনীসমূহ" সম্পূর্ণরূপের অন্যায্য ও অসমর্থনযোগ্য।

যাহা হউক, এই বিশেষ ধারণা পরিত্যাগ করার পূর্বে বেল্-এর আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছসমূহ পরবর্তী কালের উদ্ভাবন। বেল্ একই সময়ে এই বিষয়ে বুখারী শরীফে[৫২] উদ্ধৃত জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা)-এর ব র্নার দ্বারা তাহার ধারণার স্বপক্ষে সাহায্য লওয়া হইতে বিরত থাকেন নাই। তিনি বলেন, জাবির (রা)-এর বর্ণনা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, ঐ দৃশ্য ছিল এক আল্লাহর, তিনি ইহার মধ্যে যোগ করেন, যেমন ইহা "গোঁড়া অনুভূতির বিরোধী"। ইহা "নিশ্চিতভাবে গোঁড়া ঐতিহ্য নির্দ্ধারিত হওয়ার পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করে"।[৫৩] বেল্ এই কথা বলেন নিম্নোক্ত হাদীছের বক্তব্যের ভিত্তিতে যাহা বর্ণনায় উল্লিখিত হয় ঃ

فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ .

তিনি উক্ত বাক্যের অনুবাদ করেন এইভাবে ঃ "And there He was sitting upon the Throne". "এবং সেইখানে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন" এবং তিনি যুক্তি দেখান যে, "সিংহাসন" আল্লাহ্‌র জন্যই প্রযোজ্য"।[৫৪]

এক্ষণে ইহা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, বর্ণনায় 'কুরসী' শব্দটি অনির্দিষ্ট আকারে আসিয়াছে। ইহার অর্থ "একটি চেয়ার" এবং নির্দিষ্ট ফর্মে নহে যাহার অর্থ "চেয়ারটি"। বেল্ ইহার ভুল অনুবাদ করেন। এইরূপে ইহা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য "প্রযোজ্য" হওয়ার ব্যাপারে কোন যুক্তি নাই। এই বিষয়ে আরও বলা আবশ্যক যে, বুখারী শরীফে একই ধরনের বর্ণনায় দুইটি অংশে (অর্থাৎ ৪৯৯৪ নং এবং ৪৯৯৫ নং) ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি যে সত্তাকে দেখিয়াছিলেন, তাহা ছিল "এই সেই ফেরেশতা যে হেরা গুহায় আমার নিকট আসিয়াছিল" فاذا الملك الذى جاءنى بحراء। বেল এই ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত। কিন্তু তিনি ইহাকে এই বলিয়া অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথমেই এই বিবরণ স্বচ্ছভাবে লইয়া আসেন।[৫৫] ইহা একটি অবাঞ্ছিত বিবরণ। তিনি এখনও এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন নাই যে, প্রথমে স্বচ্ছভাবে (Fairly early)-এর দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চহিয়াছেন। তিনি কি ইহা বলিতে চাহেন যে, এই ঘটনাটি হযরত জাবির (রা)-এর সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আসার পূর্বে ঘটিয়াছে? কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা সব সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। হযরত জাবির (রা) একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন (মৃ. ৭৪ হি.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর তিনি তাঁহার সান্নিধ্যে আসেন। জাবির (রা) সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তিনি তাঁহার তথ্যাবলী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এক্ষণে বেল্ যেমন বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপত্তির মুখে "দৃশ্য" (ভিশন) সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণার বর্ণনা সংশোধন করেন এবং এই ঘটনা সুস্পষ্টভাবে মক্কায় সংঘটিত হয়, তিনি আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন এই ধরনের কোন ধারণা জাবির (রা)-কে প্রদান করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে জাবির (রা)-এর বর্ণনার কোন অংশই এই অর্থ প্রকাশ করে না যে, "দৃশ্যটি" এক আল্লাহ্‌র ছিল। বেল্-এর বর্ণনা ছিল তথাকথিত "গোঁড়া হাদীছ" যাহা জাবির (রা)-র বর্ণনার পরে আসিয়াছে এবং ঐ বর্ণনায় জিবরাঈল (আ)-কে Fairly early হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা স্ববিরোধী ও সন্দেহপূর্ণ। বেল্-এর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে তাঁহার অবস্থান সংশোধন করেন। ঐ সময় হইতে তথাকথিত গোঁড়া বর্ণনা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই যাহা পরবর্তী সময়ে জাবির (রা)-এর বর্ণনার পরে আসিয়াছে। জাবির (রা)-র ৪টি বর্ণনা একসঙ্গে করিলে ইহা পরিষ্কার হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সত্তাকে দেখিয়াছিলেন তিনি হযরত জিবরাঈল (আ), আল্লাহ নহেন।

ছয় ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে ধারণা

রিচার্ড বেল্-এর ৫ম ধারণা, যেমন ৮১ ঃ ১৯-২৭ নং আয়াত তাহাকে (জিবরাঈলকে) একজন "মহান দূত" বলা হয়, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নবী জীবনের পরবর্তী সময়ে

জিবরাঈল (আ)-কে ওহী আনয়নকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এবং এইজন্য ৫৩ ঃ ১-১৮ আয়াতের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করার উচিত নহে যাহা ইতোমধ্যে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। দুইটি ভিত্তির উপর বেল-এর এই ধারণা দাঁড় করানো আছে। যেমন (এক) রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাথমিক অবস্থায় ফেরেশতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; (দুই) তিনি অবিশ্বসীদেরকে এই কথাটি বলা পরিহার করিতেন যে, একজন ফেরেশতা তাঁহার নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছান, এই কথা সম্পূর্ণ ভুল। এইজন্য ৫২ ঃ ১-১৮ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য ৮১ ঃ ১৯-২৭ আয়াত আলোচনায় আনা হইয়াছে।

বেল্-এর ধারণাসমূহের শেষ প্রকারটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করে, যেমন জিবরাঈল (আ) ওহী আনয়নকারী হিসাবে কেবল মদীনায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই বিষয়টি নিম্নের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাইতে পারে ঃ

(ক) ফেরেশতারা মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার সমসাময়িকদের নিকট তাঁহার মিশনের শুরুতেই পরিচিত ছিলেন।

(খ) তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে দৌত্যকর্ম পালনকারী হিসাবে আখ্যায়িত হইতেন।

(গ) মক্কায় ইহা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল যে, একজন "মহান দূত" ওহীকৃত মূল পাঠ (কুরআন) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট লইয়া আসিতেন।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দাবি করার পর মক্কার অধিবাসীরা এক বিপরীত দাবি নিয়া দৃশ্যপটে আসে এবং বলে যে, একজন ফেরেশতাকে দূত হিসাবে অথবা মুহাম্মাদ ﷺ -এর সঙ্গে একজন সহকারী দূত হিসাবে প্রেরণ করা উচিত।

(ঙ) ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছ এবং সুনির্দিষ্টভাবে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী আনয়নকারী হিসাবে চিহ্নিত করার বিষয়টি পরবর্তী কালের উদ্ভাবন নহে, যেমন বেল্ মনে করেন।

(চ) এমনকি মক্কায়ও আরবের যে কোন স্থানে বসবাসকারী খৃস্টানরা বিশ্বাস করিত এবং জানিত যে, জিবরাঈল (আ) একজন ফেরেশতা যিনি আল্লাহ্‌র ওহী তাঁহার রাসূলদের নিকট লইয়া আসিতেন।

এইসব প্রামাণ্য ঘটনার আলোকে ইহা বলা সমীচীন নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমনের পরই জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট পরিচিত হন।

জিবরাঈল (আ) তাঁহার এই 'জিবরাঈল' নামের দ্বারা পবিত্র কুরআনে তিনবার চিহ্নিত হন এবং এই তিনটি স্থানই মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত, যেমন ২ ঃ ৯৭; ২ ঃ ৯৮ এবং ৬৬ ঃ ৪। এই তিনটি স্থানের কেবল একটি স্থানে (২ ঃ ৯৭) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে ওহী অবতরণকরী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই্ আয়াতের শব্দ প্রয়োগে ইহা সুস্পষ্ট যে, কতিপয় বিষয়ে জিবরাঈলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জিবরাঈল সম্পর্কে

কতিপয় বক্তব্য এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সূরায় ওহী অবতরণ সংক্রান্ত সকল বর্ণনা এই বিবরণের সঙ্গে একমত যে, যখন মদীনায় ইয়াহূদীরা এই কথা জানিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যৌক্তিক দাবি করেন যে, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট ওহী লইয়া আসেন, তখন তাহারা ফেরেশতা জিবরাঈলের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করিল এবং বলিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি এই কথা বলেন যে, ফেরেশতা হযরত মীকাঈল ওহী আনয়নকারী ছিলেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) অনুসরণ করিবে। এই কারণে ইয়াহূদীদের আপত্তির উত্তর এই আয়াতে প্রদান করা হইয়াছে।[৫৬] এই আয়াত ও ইহার প্রেক্ষাপট, যাহা বর্ণনা দ্বারা জানা গেল তাহা এই তথ্য নির্দেশ করে না যে, জিবরাঈল (আ)-এর নাম এই স্থানেই প্রথমবারের মত ওহী আনয়নকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

তদুপরি প্রকৃত ঘটনা এই যে, জিবরাঈল (আ) তাহার এই নামে আখ্যায়িত হওয়ার কথা কেবল মাদানী সূরায় উল্লিখিত হওয়া এই কথা বুঝায় না যে, মক্কী সূরায় তাঁহার (জিবরাঈল) সম্পর্কে কোন তথ্যনির্দেশ নাই। প্রকৃতপক্ষে 'রাসূল কারীম' (একজন মহান/সম্মানিত দূত) অভিধাটি যে ৮১ ঃ ১৯ আয়াতে এবং 'শাদীদুল কুওয়া' (ক্ষমতায় শক্তিশালী একজন) অভিধাটি ৫৩ ঃ ৩ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, সকল তাফসীরকার এই দুইটি অভিধার দ্বারা জিবরাঈল (আ)-কে বুঝান। ইহার দ্বারা মনে হয় যে, 'শাদীদুল কুওয়া' এবং জিবরাঈল পরিভাষা দুইটি সমার্থক। কাহারও মতে 'জিবরাঈল' একটি যৌগিক শব্দ, যাহা জাব্র এবং ইল শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত, ইহার অর্থ "আল্লাহ্‌র সাহসী বীর" অথবা "আল্লাহ্‌র দাস"। জাব্র শব্দটি হিব্রু ভাষায় Geber যাহার অর্থ "একজন দাস/চাকর" এবং Il-এর অর্থ "শক্তিশালী" "ক্ষমতাশালী" অর্থাৎ আল্লাহ।[৫৭] অনুরূপ রূহ্ আল-কুদ্স (পবিত্র আত্মা)[৫৮] অভিধাটি ১৬ ঃ ১০২ আয়াতে এবং আর-রূহুল আমীন (বিশ্বস্ত আত্মা) ২৬ ঃ ১৯৩ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুইটি শব্দের দ্বারাও মুফাসসিরগণ সর্বসম্মতভাবে জিবরাঈলকে বুঝাইয়াছেন। ইহাও বলা আবশ্যক যে, 'নামূস' পরিভাষাটি হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার অর্থ বিশ্বস্ত অথবা গোপনীয় ফেরেশতা।[৫৯] এইভাবে কুরআন ও হাদীছ এই বিষয়ে কোন পার্থক্য করে না। উভয়টিতে জিবরাঈল (আ)-কে নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে প্রেরণের মিশন শুরু হওয়ার পর হইতে ওহী আনয়নকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

অনুবাদক ঃ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তথ্যসূত্র

১. রিচার্ড বেল, "Mohammed's call", The Moslem World, জানুয়ারী ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৩-১৯ এবং "Mohammed's Visions", প্রাগুক্ত, এপ্রিল ১৯৩৪, পৃ. ১৪৫-১৫৪; জার্নালের শিরোনামে "Moslem" পরিভাষাটি পরবর্তী কালে সংশোধনপূর্বক "Muslim" করা হয়।

২. দ্রষ্টব্য Supra, পৃ. ৪০২-৪০৪।

৩. দ্রষ্টব্য Supra, পৃ. ৪১৮-৪২২।

৪. The Moslem World, জানুয়ারী ১৯৩৪, পৃ. ১৪।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Quran, বরোদা ১৯৩৮ খৃ.। বেল অবশ্য এই রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে দেখিয়াছিলেন।

৯. M. W., ১৯৩৪, পৃ. ১৪।

১০. লণ্ডন, ১৯২৬ খৃ.।

১১. The Moslem World, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৪৬।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

১৩. Supra, পৃ. ৪০২-৪১০।

১৪. The Moslem World, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৪৮।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. দ্রষ্টব্য Supra, পৃ. ৪০২-৪০৬।

১৭. The Moslem World, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৭।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

২২. প্রাগুক্ত, বাঁকা অক্ষরে লিখা শব্দসমূহ আমার নিজস্ব।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَائِىْ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ اِنَّهٗ عَلِىٌّ حَكِيْمٌ .

"মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন; তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়"।

২৫. The Moslem World, ১৯৩৪, পৃ. ১৪৮।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

২৭. প্রাগুক্ত।

২৮. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ১২ ঃ ১০২।

২৯. বুখারী, নং ২।

৩০. অনুরূপ ঘটনা অন্য স্থানে জোর দিয়া বলা হইয়াছে যেখানে 'আওহায়না' (اَوْحَيْنَا) -এর পরিবর্তে 'আনযালনা' (اَنْزَلْنَا) পরিভাষাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্র. কুরআন, ১২ ঃ ২।

৩১. Infra, পৃ. ৫০৩-৫১২।

৩২. Supra, পৃ. ৪১৮-৪২২।

৩৩. M.W., ১৯৩৪, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

৩৪. ঘটনার জন্য নিম্নোক্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভবত তাঁহার (আয-যুবায়রের) হযরত খাদীজা (রা)-এর সঙ্গে আত্মীয়তা তাঁহার পিতার মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর সঙ্গে আত্মীয়তা তাঁহার মাতার মাধ্যমে, যাহার ফলে তাঁহার মুসলমান হওয়া সহজ হইয়া যায়" (Watt, M. at M., 92)। কেহই ঘটনা জানে না। সম্ভবত বাক্যের শেষে বর্ণিত "his" -এর দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে বুঝানো হইয়াছে এবং "Mother" বলিতে তাঁহার মা-এর কথা বলা হইয়াছে, আয-জুবায়র-এর নহে যাহা এইখানে বুঝানো হয়।

৩৫. M. W., ১৯৩৪, পৃ. ১৪৫, নং ৪।

৩৬. Supra, পৃ. ৪২০-৪২১।

৩৭. দ্রষ্টব্য কুরআন, ৬৬ ঃ ৬ এবং ৭২ ঃ ৮।

৩৮. Supra, পৃ. ৪১৯-৪২০।

৩৯. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ.... .

"আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য...."।

৪০. M. W., ১৯৩৪, পৃ. ১৫১।

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. Supra, পৃ. ৪১৯-৪২০।

৪৩. M. W., ১৯৩৪, পৃ. ১৪৯।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৪৬. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى .

"তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য"?

৪৭. মূল পাঠে আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

وَكَمْ مِّنْ مَلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لاَ تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى .

"আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে! উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমতি না দেন" (৫৩ ঃ ২৬)।

৪৮. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى .

"যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফেরেশতাদিগকে"।

৪৯. উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য ঃ কুরআন, ৬৯ ঃ ১৭; ৭০ ঃ ৪; ৭৪ ঃ ৩১; ৮৯ ঃ ২২ এবং ৯৭ ঃ ৪। অনুরূপ ৫০টি আয়াতের মধ্যে এই কয়টি উল্লেখ করা হইল।

৫০. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য ঃ কুরআন, ৬ ঃ ১১১; ৬ ঃ ১৫৮; ১৫ ঃ ৭-৮; ১৬ ঃ ৩৩; ১৭ ঃ ৯৫; ২৩ ঃ ২৪; ২৫ ঃ ৭; ২৫ ঃ ২১-২২; ৪১ ঃ ১৪; ৪৩ ঃ ৫৩।

৫১. আরও দ্রষ্টব্য ৩৮ ঃ ৮, যাহা বলে ঃ

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا .

"আমাদের মধ্য হইতে কি তাহারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হইল"?

৫২. বুখারী, হাদীছ নং ৪৯৯২-৪৯৯৫।

৫৩. M. W., ১৯৩৪, পৃ. ১৭-১৮।

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৫৬. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য আত্-তাবারী, তাফসীর, ২খ., পৃ. ৩৬ এবং তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১খ., পৃ. ১৮৫-১৯১।

৫৭. William Geseneus, হিব্রু-ইংরেজী অভিধান, মালিক গোলাম ফরিদ কর্তৃক "The Holy Quran English Translation and Commentary" গ্রন্থে উদ্ধৃত, রাবওয়াহ (পাকিস্তান) ১৯৬৯, পৃ. ৪৬, নং ১২৩।

৫৮. 'পবিত্র আত্মা' নহে; কারণ বাক্যে গঠনপ্রণালীতে মুদাফ-মুদাফ ইলায়হি (مُضَاف-مُضَاف اليه) সিফাত-মাওসূফ (صفة-موصوف) নহে।

৫৯. Nâmûs পরিভাষাটি 'লিসানুল আরাব' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ অধ্যায়

ওহী এবং প্রাচ্যবিদগণ

৩. আয্‌-যুহ্‌রীর রিওয়ায়াত সম্পর্কে ওয়াট-এর পর্যালোচনা

ওয়াট তাহার পূর্বসূরীদের নিকট হইতে তত্ত্ব গ্রহণ করেন, বিশেষ করিয়া মারগোলিয়থ এবং বেল্‌-এর নিকট হইতে এবং প্রধানত তাহাদের ধারণাসমূহ সমর্থন করার চেষ্টা করেন। এই মতে তিনি তাহার পূর্বসূরীদের মতের পুনরাবৃত্তি করেন ঃ (ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাথমিক অবস্থায় দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন; (খ) হযরত জিবরাঈল ('আ) শেষ পর্যায়ে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাদানী জীবনে) ওহী আনয়নকারী হিসাবে আবির্ভূত হন; (গ) ওহীর অর্থ মূল পাঠের শাব্দিক প্রত্যাদেশ নহে, বরং "পরামর্শ" অথবা "উদ্বুদ্ধকরণ"-এর দ্বারা আচরণের বাস্তব পথ অনুসরণ করা অথবা সংবাদ জ্ঞাপন করা এবং (ঘ) কুরআনের ওহী কোন না কোনরূপে মুহাম্মাদ ﷺ -এর সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

যাহা হউক, ওয়াট তাহার পূর্বসূরীদের ধ্যান-ধারণা পুনঃ উপস্থাপনের মাধ্যমে সব সময় তাহাদের সূত্র ও মতের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। এইখান হইতে তাহার বর্ণনা কোন কোন সময়ে অবিমিশ্র ও প্রামাণ্যরূপে উপস্থাপিত। এই আলোচনা বুঝিতে আরও সুবিধা হইবে ঐ সকল পণ্ডিতের আলোচনার মাধ্যমে যাহারা তাহার পূর্বসূরীদের রচনা সম্পর্কে আলোচনা করেন, বিশেষ করিয়া মারগোলিয়থ ও বেল্‌ সম্পর্কে। ওয়াট প্রধানত তাহাদের ধারণাসমূহ উপস্থাপন করেন, তিনি সব সময় উৎস ব্যবহারে তাহাদেরকে অনুসরণ করেন নাই। পক্ষান্তরে বেল্‌ ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছসমূহ সম্পূর্ণ বাদ দেন এই অভিযোগে যে, এইসব হাদীছ পরবর্তী কালের বানোয়াট এবং তিনি এইসব হাদীছ এতদসংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ বিবেচনায় আনেন নাই। ওয়াট এই রকম করেন নাই। তিনি বরং মারগোলিয়থ ও বেল্‌-এর ধারণাকে সমর্থন করেন কুরআন ও হাদীছ এই উভয়ের ভিত্তিতে। যাহা হউক, এইভাবে কাজ করিয়া তিনি কেবল তাহার চিন্তাধারার সহায়ক এই ধরনের হাদীছসমূহ বাছাই করেন। এই ধরনের বিষয়ে তিনি কোন বিশেষ হাদীছের বিশুদ্ধতার প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি দেন নাই। তিনি কেবল বিষয়টি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিন্যস্ত করেন এবং ইসনাদ সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা কোন কৃতিত্ব দেখান নাই। এমনকি তিনি সার্বিকভাবে তাহার পছন্দমত বর্ণনার অংশে যে তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে তাহাও সব সময় মানিয়া চলেন নাই, বরং বর্ণনার যে অংশ তাহার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক ছিল, তিনি কেবল তাহাই গ্রহণ করেন এবং যে অংশের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল তাহা বাদ দেন। তিনি মারগোলিয়থ ও বেল্‌-এর তত্ত্ব সমর্থন করার জন্য কতিপয় যুক্তি উপস্থাপন করেন যাহা তাহার নিজস্ব ছিল না। অনুরূপভাবে

তিনি ওহী আগমন সংক্রান্ত হাদীছ ও কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত আর্-রূহ এবং আল্-হাক্ক শব্দগুলি ব্যবহার করেন এবং এই শব্দগুলিকে আল্লাহ্র সঙ্গে একই সীমানা অর্থাৎ মর্যাদাবিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। মারগোলিয়থ যখন Podmore-এর লেখনীর অনুসরণ করেন ওয়াট তখন Poulain-এর সহায়তা গ্রহণ করেন ওহীর ধরন সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক বা অতীন্দ্রিয়বাদীর ব্যাখ্যা প্রদর্শনের জন্য।

ওয়াট-এর মনোভাবের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ধর্মতাত্ত্বিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহে তাহার পূর্বসূরীদের মনোভাব পরিহার করিয়া নিরপেক্ষতার সহিত সুনির্দিষ্টভাবে সমালোচনা উপস্থাপন করেন। এমনকি তিনি পূর্বের ইউরোপীয় লেখকদেরকে ইসলাম ও ইসলামের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সহানুভূতির অভাবের জন্য ব্যাপকভাবে নিন্দা করেন। এই ধরনের পক্ষপাতহীনতা ও নিরপেক্ষতার ঘোষণা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও তাহার আবেদনের বাস্তব ধারার সঙ্গে অনিবার্যভাবে পরস্পর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রধানত তাহার পূর্বসূরীদের ধ্যান-ধারণার পুনরুল্লেখ করেন এবং ইসলাম ও ইসলামের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ব্যাপকতর সহানুভূতির মাত্রার প্রভেদ করা অসম্ভব।

এক ঃ আয্-যুহ্রীর রিওয়ায়াত

ওয়াট ওহী আগমন সম্পর্কে তাহার আলোচনা শুরু করেন, আয-যুহরীর রিওয়ায়াত সম্পর্কে তিনি যাহা বলেন সেই উদ্ধৃতির মাধ্যমে। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে আয়েশা (রা)-এর এই বর্ণনা আয্-যুহ্রীর মাধ্যমে আসিয়াছে এবং ইহা বিভিন্ন গ্রন্থে ঈষৎ পরিবর্তনসহ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা ইতোপূর্বে বুখারীর বর্ণনা ও তাবারীর বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি এবং কেন আত-তাবারীর বর্ণনা বুখারীর বর্ণনার তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায় নাই সেই কারণগুলিও বর্ণিত হইয়াছে।[১] যাহা হউক, ওয়াট আত-তাবারীর বর্ণনাটিকে এই জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য বলেন যে, ইহা পুনঃ লিখিত নহে, যেমনটি ইব্ন হিশামের বর্ণনা,[২] যদিও তিনি এই সম্পর্কিত বিষয়ে বুখারীর কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা বলা প্রয়োজন যে, বুখারীর সংকলন আত্-তাবারীর সংকলনের তুলনায় প্রাচীন। পরবর্তী রচনায় আয-যুহ্রীর বর্ণনা তিনটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত। প্রথম দুইটিতে ধারাবাহিক বর্ণনা রহিয়াছে এবং প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদ বর্ণনার পরপরই তৃতীয় একটি নিরপেক্ষ বিবরণ যাহা আত্-তাবারী কর্তৃক দুই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

ওয়াট এই বর্ণনাটি তাহার নিজস্ব অনুবাদের মাধ্যমে উল্লেখ করেন। এই রকম করার পর তিনি তিনটি অনুচ্ছেদকে ভাঙ্গিয়া ১২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন এবং বর্ণনাক্রম অনুসারে A হইতে L পর্যন্ত নম্বর প্রদান করিয়া বলেন যে, তিনি "সুবিধার জন্য" তাহা করিয়াছেন এবং "এই শ্রেণী বিভাগ আয্-যুহ্রী প্রদত্ত তথ্যে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, যেমন বর্ণনাকারীর পরিবর্তনের তথ্যনির্দেশে রহিয়াছে।[৩] পাঠকের অসুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া ওয়াট-এর বিশ্লেষণ বুঝার সুবিধার

জন্য আমরা পাদটীকায় তাবারীর মূল পাঠ উল্লেখ করিলাম। ওয়াট কর্তৃক আত-তাবারীর পূর্ণ আরবী উদ্ধৃতিটির ১২টি ভাঙ্গা অংশ তৃতীয় বন্ধনীর মাধ্যমে যথাক্রমে 'A' হইতে 'L' পর্যন্ত দেখানো হইল।[৪] ওয়াট কিভাবে তাহার নিজস্ব স্টাইলে তাবারী কর্তৃক উর্দ্ধত আয্-যুহ্রীর বর্ণনার অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

A : এই প্যারায় ওয়াট আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার প্রথম অংশটি উল্লেখ করেন। এই অংশে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ওহী আগমনের শুরুটা ছিল সত্য স্বপ্ন যেটিকে তিনি "true vision" বা "সত্য দৃশ্য" বলিয়া অনুবাদ করেন ঃ "ইহা উষার আলো প্রকাশ হওয়ার মত আসিত"।

B : দ্বিতীয় প্যারায় ওয়াট উপরোল্লিখিত "A" অংশের পরবর্তী অংশ বিন্যস্ত করেন, যেখানে বর্ণনাকারী বলেন যে, ইহার পর নির্জনতা রাসূলুল্লাহ -এর নিকট প্রিয় হইয়া উঠে এবং তিনি তাহান্নুছ করার জন্য হেরা গুহায় চলিয়া যান। বর্ণনার শেষদিকে বলা হয়, "দীর্ঘ সময়ের পর অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার নিকট সত্য আসিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল"।

C : তৃতীয় প্যারায় ওয়াট যে অংশ বিন্যস্ত করেন তাহাতে আল্লাহ্র রাসূল বলেন যে, তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করেন, ইহার পর তিনি হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট যান এবং তাঁহাকে কাপড় (কম্বল) দ্বারা ঢাকিয়া দিতে বলেন যাহা প্রতিপালন করা হয় তাঁহার মধ্য হইতে আতঙ্ক বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত। এই অংশের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয় এইভাবে, "ইহার পর তিনি আমার নিকট আসেন এবং বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল"।

D : চতুর্থ প্যারায় যে বক্তব্য বিন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই অংশে আল্লাহর রাসূল বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, তিনি (জিবরাঈল) নিজেকে একটি পর্বত চূড়ায় অবস্থানপূর্বক সেই পর্বত চূড়া হইতে পরোক্ষভাবে কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন অধিক কাছে কথা বলিতেছিলেন, তখন "তিনি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি জিবরাঈল এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল"।

E : ৫ম প্যারায় আল্লাহ্র রাসূলকে বলা ফেরেশতার বক্তব্য স্থান পাইয়াছে ঃ "পড়ুন"; ইহার উত্তরে রাসূল বলেন, "আমি পড়িতে পারি না (অথবা "আমি কি পড়িব"। ইহার পর ফেরেশতা তাঁহাকে তিনবার দৃঢ়ভাবে আকঁড়াইয়া ধরেন এবং বলেন ঃ "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি পাঠ করিলাম"।

F : ৬ষ্ঠ প্যারায় স্থান পাইয়াছে, আল্লাহ্র রাসূল খাদীজা (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন, তাঁহার উদ্বেগের কথা খাদীজার নিকট প্রকাশ এবং তাঁহার প্রতি খাদীজার সান্ত্বনাসূচক কথাবার্তা। এই বর্ণনা শেষ হয় নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ঃ "আপনি দুর্দশায় সাহায্যকারী সত্যের প্রতিনিধি"?

G : ৭ম প্যারায় স্থান পাইয়াছে হযরত খাদীজা (রা) তাঁহার স্বামীকেসহ ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল-এর কাছে গমন, ওয়ারাকা কর্তৃক আল্লাহ্র রাসূলের নিকট হইতে অভিজ্ঞতার কথা শ্রবণ

করা ওয়ারাকার মন্তব্য ঃ "ইনি নামূস, যাঁহাকে মূসা ('আ)-এর নিকট প্রেরণ (অবতরণ) করা হয়"। ওয়ারাকা তাঁহার এই বক্তব্যের সঙ্গে আরও যোগ করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাঁহার গোত্রের লোকদের দ্বারা বহিষ্কৃত হইবেন। ওয়ারাকার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ইত্যাদি। ওয়ারাকার এই মন্তব্যের দ্বারা বর্ণনাটি শেষ হয় যে, তিনি যদি দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে সাহসিকতার সঙ্গে সহায়তা করিতেন।

H : ৮ম প্যারায় স্থান পাইয়াছে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বিবরণ দিতে গিয়া বলেন যে, কুরআনের প্রথম যে অংশ তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হয় তাহা ছিল সূরা ৯৬ ('আলাক), সূরা ৬৮ ঃ ১-৫ (আল্-কালাম), সূরা ৭৪ ঃ ১-২ (আল্-মুদ্দাছ্ছির) এবং সূরা ৯৩ ঃ ১-২ (আদ্-দুহা)।

I : ৯ম প্যারায় স্থান পাইয়াছে ওহী অবতরণে বিরতি সম্পর্কে আয্-যুহ্রীর বর্ণনা যাহা আত-তাবারী কর্তৃক পরপর দুই পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বর্ণনায় তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ওহী অবতরণে বিরতিতে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করেন। তিনি প্রায়শ পর্বত চূড়ায় আরোহণ করিতেন নিজেকে পর্বত চূড়ার শীর্ষ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করার জন্য। "কিন্তু তিনি যখনই পর্বতশীর্ষে পৌছেন তখন জিবরাঈল ('আ) তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন এবং বলেন, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। ইহার ফলে তাঁহার অস্থিরতার অবসান ঘটে"।

J : ১০ম প্যারায় যে অংশ সন্নিবেশ করা হয় তাহাতে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ওহী অবতরণে বিরতি সম্পর্কে বলেন ঃ "একদিন আমি যখন হাঁটিতেছিলাম তখন আমি ফেরেশতাকে দেখিলাম যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট আসিয়াছিলেন, তিনি পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী স্থানে এক সিংহাসনে (কুরসীতে) উপবিষ্ট। আমি তাঁহার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম এবং খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, "আমাকে ঢাকিয়া দাও"।

K : ১১শ প্যারায় স্থান পাইয়াছে, অতএব আমরা তাঁহাকে ঢাকিয়া দিলাম অর্থাৎ আমরা একটি দাছার (dathar) পরিধান করাইলাম... এবং মহান আল্লাহ প্রেরণ করিলেন, "হে বস্ত্রাবৃত!... তোমার পরিধেয় পরিচ্ছন্ন রাখ"।

L : ১২শ প্যারায় যুহ্রীর বর্ণনা সন্নিবেশ করা হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হয় তাহা ছিল,"পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন... যাহা সে জানিত না" পর্যন্ত।

ওয়াট ওহী অবতরণে বিরতি এবং সূরা আল্-মুদ্দাছ্ছির-এর প্রথম অংশ অবতরণ সম্পর্কে জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) হইতে আয্-যুহ্রীর বর্ণনার সারাংশও প্রদান করেন। এইভাবে যুহ্রীর বর্ণনা প্রদান করিয়া ওয়াট "এই হাদীছের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই করিতে" অগ্রসর হন এবং উহাকে তিনি বলেন, "এই ঘটনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য"। এই সম্পর্কে আলোচনা

করার জন্য তিনি আলোচ্য বিষয়টিকে সাতটি উপ-শিরোনামে এবং একটি চূড়ান্ত পর্বে বিন্যস্ত করেন। উপ-শিরোনামগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) "মুহাম্মাদ ﷺ-এর দৃশ্য অবলোকন"।

(খ) "হেরায় গমন ঃ তাহান্নুছ"।

(গ) "আপনি আল্লাহ্র রাসূল "।

(ঘ) "আবৃত্তি করুন/পড়ুন"।

(ঙ) " সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির; ফাত্রাহ" (ওহী আগমনে বিরতি)।

(চ) "মুহাম্মাদ ﷺ -এর ভয় এবং হতাশা"।

(ছ) "খাদীজা ও ওয়ারাকার নিকট হইতে উৎসাহ লাভ"।

চূড়ান্ত পর্বের শিরোনাম ঃ মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবীসুলভ সচেতনাতার ধরন"। এই বিষয়গুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

দুই ঃ "মুহাম্মাদ ﷺ-এর দৃশ্য অবলোকন

ওয়াট তাহার প্রথম উপ-শিরোনামযুক্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন আয্-যুহ্রীর বর্ণনার সেই অংশের বরাতে যে অংশটি তিনি তাহার প্যারা 'A' -তে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর রাসূল হিসাবে অভিজ্ঞতা শুরু হইয়াছিল "সত্য দৃশ্য" অবলোকন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, এই বিষয়ে সন্দেহ করার কোন সঠিক ভিত্তি নাই। ইহা স্বপ্ন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং দৃশ্য (vision) সম্পর্কে প্যারা B ও J-তে উল্লেখ আছে (জিবরাঈলের উপস্থিতির বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে প্যারা D ও I -এ রহিয়াছে)।[৫]

ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বলা প্রয়োজন যে, ওয়াট এইখানে "আর-রু'ইয়া আস্-সাদিকা" উদ্ধৃতিটিতে কেবল বেল্-এর অনুবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এই উদ্ধৃতির, যাহার সম্পর্কে ইতোমধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে,[৬] অর্থ "সত্য স্বপ্ন", "সত্য দৃশ্য" নহে। ইহা স্মতর্ব্য যে, বুখারী শরীফে বর্ণিত আয্-যুহ্রীর অথবা হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায়, যাহা বেল্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সত্য স্বপ্ন" (true dreams)-এর পর "ঘুমন্ত অবস্থায়" (in sleep) শব্দ রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট রিওয়ায়াতে আত-তাবারীর ভাষ্য যাহা সম্পূর্ণ সঠিক নহে এবং যাহা ওয়াট উদ্ধৃত করেন, উহাতে অবশ্যই In Sleep শব্দটি নাই। কিন্তু ইহা এমনকি এই ভাষ্যের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে স্পষ্ট যে, 'আর-রু'ইয়া আস্-সাদিকা' যাহা রাসূল হিসাবে অভিজ্ঞতার শুরুতে বর্ণিত সম্পূর্ণরূপে একটি বিশেষ পর্যায়। ইহার পূর্বে তিনি একটি বিষয় অনুসরণ করেন, যেমন হেরা গুহায় তাহান্নুছ অবলম্বন এবং এই অভিজ্ঞতা যাহা জাগ্রত অবস্থায় আসিয়াছিল। রিপোর্টের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা যাহা ওয়াট তাহার প্যারা "B" -এর শুরুতে উল্লেখ করেন তাহা এই ঃ "ইহার পর তাঁহার নিকট

নির্জনবাস প্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহান্নুছ-এ নিমগ্ন হওয়ার জন্য তিনি হেরা গুহায় গমন করেন..."। ওয়াট এই বর্ণনায় উল্লিখিত দুই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করার বিষয়টি উপেক্ষা করেন, হয় ভুলবশত অথবা বেল্-এর অনুবাদের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুঁকিয়া পড়ার কারণে এবং এইভাবে আর-রু'ইয়া আস্-সাদিকা বক্তব্যটিকে তাহার প্যারা "B" এবং 'J' -এ বর্ণিত অন্যান্য ধরনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেন। এইভাবে তিনি অবস্থার তীব্রতা এবং মূল পাঠের মর্ম উদ্ধার করার রীতি অবলম্বন করেন। তাহান্নুছ-পূর্ব অভিজ্ঞতা হাদীছের কোথায়ও বর্ণিত হয় নাই। এমনকি কুরআনেও আর্-রু'ইয়া আস-সাদিকার কথা বর্ণিত হয় নাই। মুহূর্তকালের চিন্তা ইহাকে স্পষ্ট করিয়া তোলে যে, আর-রু'ইয়া কর্মের সঙ্গে আস্-সাদিকা বিশেষণের সংযোজন এই বিষয়টি নির্দেশ করে যে, ইহা এমন এক ধরনের অবলোকন যাহা সাধারণত এবং স্বাভাবিকভাবে "সত্য" নহে অর্থাৎ স্বপ্ন। সম্ভবত কেহই "সত্য" বিশেষণটি কাহারও চাক্ষুষ দেখার সঙ্গে সংযোজন করার জন্য মাথা ঘামান না।

যাহা হউক, ওয়াট-এর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সূরা আন-নাজ্ম-এ বর্ণিত তথাকথিত "দর্শন" (vision) বিষয়টি আলোচনায় লইয়া আসেন এবং পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত মারগোলিয়থ বেল্-এর থিওরী সমর্থন করেন। অতএব উপরে উল্লিখিত বর্ণনার পর পরই ওয়াট "দর্শন" (vision)-এর প্রমাণ সমর্থনকারী হিসাবে ঐ সূরা উদ্ধৃত করেন এবং তাহার নিজস্ব অনুবাদে (১১ ও ১২ নং আয়াত বাদ দিয়া) সূরার ১৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেন। তারপর তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন, এই বিষয়টি মনে করার কারণ রহিয়াছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ মূলত এই সব বিষয়কে নিজ হইতেই আল্লাহ্র দর্শন হিসাবে ব্যাখ্যা করেন।[৭] ওয়াট ইহার কারণ বা ভিত্তিগুলিকে নিম্নে চিহ্নিত করেন ঃ

(১) মাদানী জীবনকালের পূর্বে কুরআন শরীফের কোথায়ও জিবরাঈল ('আ)-এর উল্লেখ নাই।

(২) সূরা আন-নাজ্ম-এর ১০ নং আয়াতের ক্রিয়ার কর্তা হওয়া উচিত 'আল্লাহ', অন্যথায় বাক্যবিন্যাস 'বেমানান' হইবে।

(৩) প্যারা 'B'-এর শেষে বর্ণিত বাক্যটি 'সত্য তাঁহার নিকট অসিল এবং তিনি বলিলেন...' -এর সমান অর্থ প্রকাশক, যেমন "সত্য হইল আল্লাহ্র দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার পন্থা"।[৮]

(৪) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-র হাদীছ যাহা বেল্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন (বেল্-এর অনুবাদ অনুযায়ী) "...আমি আমাকে ডাকিবার একটি শব্দ শুনিলাম এবং আমি চতুর্দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরে আমি আমার মাথার উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন"।[৯]

সূরা আন্-নাজ্ম-এর আয়াতের অনুবাদে ওয়াট বেল্-এর 'ওহী' এবং 'আওহা' শব্দের একই অর্থ করিয়াছেন, যেমন "পরামর্শ" এবং "পরামর্শকৃত"। এই অর্থসমূহ, যেমন পূর্বের অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, ইহা কুরআনিক ওহীর জন্য সঠিক অর্থ নহে। দ্বিতীয়ত, ওয়াট-এর বর্ণনা ঃ "মুহাম্মাদ

এইগুলি অর্থ করিয়াছেন" ইত্যাদি দুইটিই কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্য সম্বলিত। ইহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, "দর্শন" বাস্তব ছিল না, বরং কিছুটা মানসিক বিষয় ছিল, এই ধারণাই ওয়াট সর্বোতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহাও বলা যায় যে, সূরা আন্-নাজ্ম-এর আয়াতকে ভিত্তি ধরিয়া ওয়াট সুস্পষ্টরূপে তাহার বর্ণনা এইভাবে দেন যে, ইহা এমন একটি "ব্যাখ্যা" যাহা মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক রচিত। এই ধারণা সকল প্রাচ্যবিদের, যদিও ওয়াট ইহাকে খোলাখুলি সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন নাই।

ওয়াট কর্তৃক বর্ণিত ৪টি ভিত্তির মধ্যে তৃতীয়টি ছাড়া বাকীগুলি তাঁহার নিজস্ব, তৃতীয়টি বেল কর্তৃক বর্ণিত। তাহার এই পূর্ব-ধারণাগুলি এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল সূত্রসমূহ ইতোমধ্যে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং ইহা দেখানো হইয়াছে যে, প্রত্যেক ধারণার দফাগুলি অসমর্থনীয়।[১০] ৪র্থ অবস্থা বর্ণনায় ওয়াট সুনির্দিষ্টভাবে বেল্-এর ভুল দাবির পুনরাবৃত্তি করেন নাই, "The throne" (সিংহাসন) শব্দটি আল্লাহ্র জন্য প্রযোজ্য এবং ইহা বুঝার দায়িত্ব পাঠকদের উপর ছাড়িয়া দেন। এই বিশেষ ধারণায় ভুল করার বিষয়টিও ইতোমধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে।[১১] জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-র বর্ণনা যাহা ওয়াট নিজেই উদ্ধৃত করেন।[১২] ইহাও বলা লক্ষণীয় যে, ইহা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র রাসূল "ফেরেশতাকে দেখিয়াছিলেন" যিনি হেরা গুহায় তাঁহার নিকট আসিতেন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায়।

যুক্তি প্রদর্শন তালিকায় ওয়াট-এর নিজস্ব যুক্তির সঙ্গে যোগকৃত বিষয়, যেমন উপরে ৩. (iii) নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই স্থানের দুইটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, বুখারী শরীফে উল্লিখিত আয্-যুহ্রীর বর্ণনা এবং এই বিষয়ে কিছুটা ভিন্নধর্মী অপর একটি রচনা। বর্ণনাটি এই ঃ

حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ...

"হেরা গুহায় অবস্থানকালে শেষে তাঁহার নিকট সত্য আসিল, তাঁহার নিকট ফেরেশতা আসিয়া বলিল..."।

তাবারীর বর্ণনা যাহা ওয়াট উল্লেখ করেন ঃ

فَجَاءَهُ الْحَقُّ فَاَتَاهُ فَقَالَ .

"সুতরাং তাঁহার নিকট সত্য আসিল, তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন ..."।

এইভাবে جَاءَهُ শব্দটির স্থলে فَجَاءَهُ আছে এবং এই বর্ণনায় ফেরেশতার কথা উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, فَجَاءَهُ الْحَقُّ একটি বাক্য এবং فَاَتَاهُ فَقَالَ আর একটি বাক্য। যাহা হউক, বর্ণনার এই অংশটি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুবাদ করেন নাই। তিনি দুইটি বাক্যকে একটি

বাক্যে একীভূত করেন এবং এইভাবে অনুবাদ করেন "At length unexpectedly the Truth came to him and said..." (অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার নিকট সত্য আসিল এবং বলিল...")। এই অনুবাদের আরবী সমতুল্য বর্ণনা হইবে ঃ فَجَاءَهُ الْحَقُّ وَقَالَ ; ওয়াট তাহার অনুবাদে দুইটি বাক্যকে একটি বাক্যে একীভূত করেন فَأَتَاهُ বাক্যাংশটি বাদ দিয়া যাহা একটি স্বতন্ত্র বাক্যের প্রারম্ভিক অংশ। তিনি "truth শব্দের প্রথম অক্ষরটিতেও Capital letter ব্যবহার করেন যাহাতে ইহার অর্থ অবশ্যই তাহার ধারণা অনুযায়ী হয়। যদি ইহা না করা হইত এবং যদি সুনির্দিষ্টভাবে মূল পাঠের দুই স্থানে ফেরেশতার উল্লেখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইত যাহা মূল পাঠে অব্যাহত আছে, কিন্তু ইহাকে ওয়াট "সুবিধার জন্য" ৭টি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, فَأَتَاهُ ক্রিয়ার কর্তা ফেরেশতা। এমনকি ধারাবাহিক মূল পাঠে এই ধরনের বিভক্তির পরও ওয়াট স্বীকার করেন যে, ফেরেশতা জিবরাঈল তাহার নিজ নামে উল্লিখিত হন যাহা এই অংশ হইতে দূরে নহে অর্থাৎ যাহা তিনি প্যারা 'D'-তে উল্লেখ করিয়াছেন।

পুনরায় ইহা লক্ষণীয় যে, ধারাবাহিক মূল আরবী পাঠে অস্তিত্বশীল বস্তু সম্পর্কে তিনবার উল্লেখ করা হইয়াছে এইভাবে ঃ "অতঃপর তিনি তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন..." فَأَتَاهُ فَقَالَ... "অতঃপর তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন..." ثُمَّ أَتَانِيْ فَقَالَ "অবিলম্বে তিনি আমার সম্মুখে আসিলেন ...তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি জিবরাঈল..." فَتَبَدَّى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَا جِبْرِيْلُ। ফা, ছুম্মা ও ফা অব্যয়সমূহ ক্রিয়ার পূর্বে বসিয়া এই উপসংহারমূলক বর্ণনা প্রদর্শন করে যে, ইহা একটি অব্যাহত বিবরণ এবং সর্বক্ষেত্রে একই সত্তার কথা বলা হইয়াছে। এই সীমা পর্যন্ত বর্ণনায় কোন বিরতি নাই, বর্ণনাকারীরও কোন পরিবর্তন নাই। এইখানে একমাত্র বর্ণনাকারী হইলেন হযরত আয়েশা (রা) যিনি কখনও তাঁহার নিজ ভাষায় বর্ণনা করেন, কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষায় বর্ণনা করেন। ওয়াট নিজে এই ঘটনার স্বীকৃতি দেন যখন তিনি বলেন ঃ প্যারা 'A' হইতে 'H' পর্যন্ত বর্ণনা প্রমাণহীনভাবে স্বীকৃত যে, ইহা অব্যাহতভাবে আয্-যুহরীর বর্ণনায় বর্ণিত। কিন্তু সবগুলি বর্ণনা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে আসার প্রয়োজন ছিল না।[১৩] এই কৌশল এমনভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে, হযরত আয়েশা (রা) যে একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী সেই বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রমাণযোগ্য নহে। প্যারা 'H' অবশ্য আত্-তাবারীতে একটি পৃথক প্যারাগ্রাফে অসিয়াছে এবং ইহা তাহার (আয়েশার) নিকট হইতে আসে নাই। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, প্যারা 'H' -এর পূর্বের প্যারা একটি অব্যাহত বর্ণনা এবং ইহার একমাত্র বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা)। ওয়াট এই ক্ষেত্রে আর একটি সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিন বলেন যে, ঘটনায় ইব্ন ইসহাক, হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় বিরতি দেন, [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নির্জনবাস প্রিয় হওয়ার পর] প্যারা 'B' -এর প্রথম বাক্য সম্ভবত তাহার অন্য অংশের অবশিষ্ট অংশ, সেটিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঐ স্থানে উৎসের কোন বিরতির কথা উল্লেখ করেন

নাই।[১৪] এই মন্তব্য কৌতুহলপূর্ণ, কারণ ইব্ন ইসহাকের "অন্য ভাষ্যের" "অগ্রাধিকার দেওয়া ঐ স্থানের উৎসে অপরিহার্যরূপে কোন বিরতি নির্দেশ করে না"। তাই কেন আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় তাহার বিরতি দেওয়ার উপর জোর দিব? এই মন্তব্যও যথাযথ নহে। কারণ এই স্থানে আত্-তাবারীতে প্রদত্ত হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার সঙ্গে (আয্-যুহ্রীর) বর্ণনা সম্পৃক্ত, ইব্ন ইসহাকের ভাষ্যের সঙ্গে নহে যাহা ওয়াট নিজে উদ্ধৃত করেন নাই। কারণ তাঁহার মতে, ইহা পুনর্লিখিত। আয্-যুহ্রীর বর্ণনা, বর্ণনাকারীর পরিবর্তনের ফলে তিনি যাহা বলেন, সেই বিষয়বস্তুকে বিরতির ভিত্তিতে আয্-যুহ্রীর বর্ণনা যখন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়, একই সময়ে তিনি ঐ ঘটনা গোপন করিতে পারেন না। কারণ বাস্তবিকপক্ষে ইহার বৃহত্তর এবং অত্যন্ত মৌলিক অংশের বর্ণনায় কোন বিরতি নাই, নাই সেখানে কোন বর্ণনাকারীর পরিবর্তন এবং তাহার দ্বারা কৃত বিভক্তি খামখেয়ালীপূর্ণ। ইহা তাহার উত্থাপিত ভিত্তি অনুযায়ী হয় নাই।

ইহা অনুমিত হয় যে, ইহার কিছু পরেই প্রকৃতপক্ষে তিনি আয্-যুহ্রীর বর্ণনা বিভিন্ন পৃথক অংশে টুকরা টুকরা করেন। মুহাম্মাদ ﷺ -কে বক্তব্য প্রদানকারী প্যারা 'B' -এর বক্তব্য হইল "সত্য" (the truth), 'C' অংশে "একমাত্র তিনিই" এবং 'D' ও 'I' অংশে 'জিবরাঈল'।[১৫] ওয়াটের উদ্দেশ্য হইল এই কথা বলা যে, জিবরাঈল উল্লিখিত দুই অংশে স্বনামে উক্ত হইয়াছেন, উহা মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি ওহী অসার আলোচনায় লইয়া আসার প্রয়োজন নাই। ইহা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত যে, আয্-যুহ্রীর বর্ণনা অব্যাহত এবং বিভক্তি সত্ত্বেও ওয়াট কর্তৃক উদ্দেশ্যপূর্ণরূপে প্রবর্তিত ফা, ছুম্মা ও ফা অব্যয়ের ক্রিয়ার সঙ্গে অস্তিত্বপূর্ণ বাক্য "فَجَاءَهُ الْحَقُّ" এই অর্থ প্রকাশ করে যে, ইহাও একই সত্তা অর্থাৎ জিবরাঈল যাঁহার সম্পর্কে সর্বত্র বলা হইয়াছে এবং যিনি শেষ পর্যন্ত স্বনামেই চিহ্নিত হন। বর্ণনার ধারাবহিকতা এমনকি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী জিবরাঈলকেই فَأَتَاهُ -এর মধ্যস্থ ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত যাহার মাধ্যমে বর্ণনা শুরু হইয়াছে এবং যাহা ওয়াট তাহার অনুবাদে বাদ দিয়াছেন।

তৃতীয় বিষয় যাহা এই সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা হইল, বাক্যের সম্পর্ক فَجَاءَهُ الْحَقُّ "হঠাৎ তাঁহার নিকট সত্য আসিল," মূল পাঠে যাহা অনুসরণ করা হইয়াছে। এমনকি এই বক্তব্যের অর্থ হইল আল-হাক্ক (الحق)। ইহা পুনরায় এইভাবে স্মরণ করা যায় যে, এই সংক্রান্ত বর্ণনার অপর ভাষ্যের বক্তব্য হইল, "অতঃপর তাঁহার নিকট সত্য আসিল"। যাহা হউক, বাক্-পদ্ধতির পার্থক্য হইলেও অর্থের কোন পার্থক্য নাই যাহা মূল পাঠে অনুসৃত ও বর্ণনায় বিধৃত যে, কিভাবে "সত্য" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসিল? কিন্তু এইখানে আল-হাক্ক-এর অর্থ আল্লাহ নহে, উপরে যেমনটি বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবর্তী বর্ণনার ক্রিয়াপদের উদ্দেশ্যও নহে। ওয়াট উপরের বক্তব্যে উল্লিখিত 'God' শব্দের অর্থ প্রয়োগ করেন। কারণ তাহার মতে, "আল্লাহ্র প্রতি ইঙ্গিত করার ইহাই একটি পদ্ধতি"।[১৬] তাহার এই কারণ বর্ণনা গ্রহণযোগ্যতা পায় নাই এই

জন্য যে, আরও বিভিন্ন ধারণায় এই বক্তব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কার্যত ইহা কুরআন শরীফে অনধিক ২৬০ বার দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে ২০বার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।[১৭] যাহা হউক কুরআনের কোথায়ও আল্লাহ্কে বুঝাইতে আল্-হাক্ক শব্দটি এককভাবে আসে নাই। ইহা কেবল ৯টি স্থানে আল্লাহ্র গুণ হিসাবে আসিয়াছে, কিন্তু সব সময় আল্লাহ অথবা রাব্ব্ (رَبٌّ) শব্দের সঙ্গে উল্লিখিত হয়। যেমন ২০ ঃ ১১৪ এবং ২৩ ঃ ১১৬ নম্বর আয়াতে فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ; ১০ ঃ ৩০ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ ২৫ ঃ ২৪ ; فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ৩২ ঃ ১০ ; وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ الْحَقُّ। ইত্যাদি।[১৮] অপরদিকে ইহা কুরআনিক ওহী অর্থে পঞ্চাশাধিক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।[১৯] বৃহত্তম একক সংখ্যাগরিষ্ঠ উদাহরণে ইহা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই ব্যবহার প্রায় সব সময় "جَاءَ" ক্রিয়ার সঙ্গে হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল ঃ

(١) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١٠:٧٦) .

"অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার পক্ষে হইতে সত্য আসিল তখন উহারা বলিল, ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু" (১০ ঃ ৭৬)।

(٢) لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (١٠ :٩٤) .

"তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট 'সত্য' অবশ্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না" (১০ ঃ ৯৪)।

(٣) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلاَ أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسٰى (٢٨:٤٨)

"অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদিগের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিতে লাগিল, মূসাকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে সেরূপ দেওয়া হইল না কেন" (২৮ ঃ ৪৮)?

(٤) بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلاَءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ (٤٣:٢٩) .

"বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে দিয়াছিলাম ভোগের সামগ্রী, অবশেষে উহাদিগের নিকট আসিল সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল " (৪৩ ঃ ২৯)।

(٥) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهٖ كَافِرُوْنَ (٤٣:٣٠) .

"যখন উহাদিগের নিকট সত্য আসিল উহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি" (৪৩ ঃ ৩০)।

(٦) اَلَّذِيْ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ (٣٤ : ٦) .

"তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য" (৩৪ ঃ ৬)।

(৭) وَالَّذِیْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ (٣٥ : ٣١) .

"আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য" (৩৫ ঃ ৩১)।

অনুরূপভাবে কুরআনের একটি উদাহরণ (এমনকি হাদীছের উদাহরণ) এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, কুরআনে ওহীর অর্থে আল্-হাক্ক (اَلْحَقُّ) শব্দ বহুল ব্যবহৃত এবং এই পরিভাষা যদিও নিঃসন্দেহে আল্লাহর একটি গুণ, তবুও আল্লাহকে বুঝাইতে এই শব্দটি কখনও এককভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। فَجَاءَهُ الْحَقُّ অথবা فَجَاءَ الْحَقُّ বক্তব্যটি আলোচ্য আয়াতে ওহীর অর্থে ব্যবহৃত, এমন নহে যেমন ওয়াট আমাদেরকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে আল্লাহ্র আবির্ভাব ঘটে। আয্-যুহ্রীর বর্ণনা এবং সূরা আন্ নাজ্ম-এর বর্ণনার দ্বারা ওয়াট দেখাইতে চাহেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্র "দর্শন" লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। ওয়াট সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আরও বলেন যে, ইহা যদি আল্লাহকে মুহাম্মাদের দেখার মূল ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা কদাচিৎ তাঁহার চূড়ান্ত দাবি হইবে। ইহা ৬ ঃ ১০৩ নং আয়াতের সঙ্গে মতপার্থক্যের সৃষ্টি করে। ঐ আয়াতে বলা হয়, "দর্শন" তাঁহার পর্যন্ত পৌঁছে না"। এই সম্পর্কে ওয়াট সূরা আন্-নাজ্ম-এর ১১ নম্বর আয়াতের উদাহরণ দেন, যাহা তিনি বেল্-এর অনুবাদ অনুযায়ী উদ্ধৃত করেন, যেমন, "ইহা যাহা দেখিয়াছে অন্তর, তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না"। এবং তিনি বলেন যে, এই আয়াত "সম্ভবত পরবর্তী সময়ের সংযোজন"।[২০] যে কেহ ইহা সহজেই চিহ্নিত করিতে পারিবে যে, এইখানে ওয়াট কেবল বেল্-এর ধারণাসমূহ উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ প্রথমে আল্লাহকে দেখার দাবি করেন এবং পরে তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অবস্থান সংশোধন করেন এবং এই সূরার আর একটি আয়াত উল্লেখ করিয়া (চাক্ষুষ দর্শনের পরিবর্তে) আধ্যাত্মিক দর্শনের অথবা মানসিক দর্শনের ধারণা প্রদান করেন।[২১] যে সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এইসব ধারণা করা হইয়াছে, তাহা ইতোমধ্যে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সমর্থন অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছে।[২২] ইহা পুনরায় জোর দিয়া বলা যায় যে, না আয্-যুহ্রীর বর্ণনা, না সূরা আন্-নাজ্ম "আল্লাহ্র দর্শন" সম্পর্কে বলিয়াছে। সুতরাং কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে এই ব্যাপারে মতপার্থক্যের কোন অবকাশ নাই, যেমন ৬ ঃ ১০৩ নং আয়াতে সূরা আন্ নাজ্ম-এর পরবর্তী আয়াতে কোন সংশোধন নাই। "আল্লাহর দর্শন" কথাটি একটি ভিত্তিহীন অনুমান যাহার উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তী অশুদ্ধ ধারণার বিতর্ক এবং পরবর্তী সংশোধনের অনুমান করা, ইহার সবকিছুই ভ্রান্ত এবং সমর্থন অযোগ্য।

ইহা পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে যে,[২৩] সূরা আন্-নাজ্ম-এর ১৮ নং আয়াত যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বচক্ষে দেখার কথা বলে। "তাঁহার প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন", ইহা মানসিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন ও আল্লাহ্র দর্শন-এর বিরোধী তত্ত্ব হিসাবে প্রচলিত। বেল্ যখন এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন তখন নীরবে এই আয়াত উপেক্ষা করেন। যাহা হউক, ওয়াট বেল্-এর

উপস্থাপনার ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার ইচ্ছা করেন এবং এই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক দর্শন-এর তত্ত্ব সম্বলিত আয়াত আনার চেষ্টা করেন। এই সময় হইতে আয়াতের উদাহরণ তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, "অবশ্যই ইহা এই অর্থে লওয়া হয় যে, যাহা মুহাম্মাদ ﷺ দেখিয়াছিলেন তাহা ছিল ঔজ্জ্বল্য ও আল্লাহ্র মহিমার নির্দশন অথবা প্রতীক"। তখন তিনি ইহাকে ১১ নং আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন ("তিনি যাহা দেখেন, অন্তর ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নাই") এবং বলেন যে, "যখন চক্ষুসমূহ নিদর্শন অথবা প্রতীক প্রত্যক্ষ করে তখন অন্তর প্রতীকী বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে"। এইভাবে ওয়াট যদিও হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর মূল ব্যাখ্যা "দর্শন হইল সরাসরি আল্লাহ্কে দেখা" সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না, প্রত্যাশিতভাবে তিনি ভুল করেন না। সম্ভবত আয়াতের অনুবাদ এইভাবে করা যাইতে পারে ঃ "সে, লোকটি যাহা দেখিয়াছে সেই সম্পর্কে অন্তর ভুল করে নাই।[২৪]

উপরের মন্তব্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "মৌলিকভাবে দর্শন (vision) -কে আল্লাহ্কে সরাসরি দেখা হিসাবে ব্যাখ্যা করেন"। তিনি এইরূপ ব্যাখ্যাও করেন নাই এবং সূরা আন্-নাজ্ম-এর আয়াতও ঐরূপ অর্থ বহন করে না। অতএব সূরার আয়াতসমূহের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই এবং তাই উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার মত ব্যাখ্যা লইয়া অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনও নাই যাহাতে প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাখ্যা ১১ নং আয়াতের একটি অন্যায্য ও বিকৃত অর্থ করে। কারণ ওয়াট বলেন, "যখন চক্ষুসমূহ নিদর্শন অথবা প্রতীক প্রত্যক্ষ করে, অন্তর যে প্রতীকী বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে" তাহাই আল্লাহ। আয়াত কোন প্রকারেই এই অর্থ বহন করে না যে, চক্ষু একটি জিনিস অর্থাৎ আল্লাহ্র একটি নিদর্শন দেখিয়াছে এবং অন্তর দেখিয়াছে বা ধারণ করিয়াছে অন্য জিনিস অর্থাৎ আল্লাহকে। আয়াতের সরল অর্থ এই যে, অন্তর ও চক্ষু ছিল ঐক্যবদ্ধ—ইহা অন্তরের ভুল ছিল না অর্থাৎ তিনি (রাসূলুল্লাহ) তাঁহার চক্ষু দ্বারা যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে তিনি কোন ভুল ধারণা করেন নাই। যেমন ওয়াট ইহার বিকল্প অনুবাদ করেন এইভাবে, "অন্তর ভুল করে নাই", "তিনি যাহা দেখিয়াছেন"। মানুষ দেখিয়াছে এই ক্ষেত্রে মানসিক অথবা আত্মিক বিষয়ের পরস্পরবিরোধী শব্দাবলীর ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হইয়াছে।

ওয়াট-এর উদ্দেশ্য হইল এই ধারণার মধ্যে বিকৃতি প্রদান করা। যেমন তিনি সাধারণভাবে বলেন, "ইহাকে জিবরাঈলের দর্শন (vision) হিসাবে চালাইয়া দেওয়ার বিষয়টিকে পরিহার করা। যাহা ইতিহাসের পরিপন্থী হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং তিনি ইসলামিক প্রগাঢ় নিষ্ঠাপূর্ণ ধারণা সম্পর্কিত মতপার্থক্যকে পরিহার করিয়া বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্কে দেখেন নাই।[২৫] এইখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ঃ ইহা প্রমাণ করার জন্য এই আগ্রহ কেন সৃষ্টি হইল যে, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি জিবরাঈল ছিলেন না। যদি সূরা আন্-নাজ্ম-এর আয়াতের পরিষ্কার অর্থ তাহাই হয়, যাহা ওয়াট ও বেল্ আমাদেরকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ মূলত ভুল করিয়া ইহাকে সরাসরি আল্লাহ্র দর্শন বলিয়া

মনে করেন এবং পরবর্তী কালে এই ভুল সংশোধন করিয়া মানসিক দর্শন সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করেন? ওয়াট-এর সত্য বলিয়া ঘোষিত স্বীকৃতির উদ্দেশ্য বরং তাহার প্রকৃত ঘটনার সতকর্তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এইজন্য যে, তিনি সূরা আন-নাজ্ম-এর আয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাহা ইহার সরল অর্থ নহে। আরও যে কারণ বলা হইয়াছে, যেমন জিবরাঈলকে দেখা "ইতিহাস পরিপন্থী হইবে" এই বক্তব্যটি পরিষ্কারভাবে পুরানো যুক্তিভিত্তিক। কারণ কুরআনের মক্কী সূরাসমূহে জিবরাঈলকে নাম দ্বারা চিহ্নিত করা হয় নাই। যে যুক্তি ইতোমধ্যে দেখানো হইয়াছে অসমর্থনীয় এবং ভুল।[২৬] এই যুক্তি ওয়াট-এর দিক হইতেও অসঙ্গতিপূর্ণ যাহা বেল্-এর মত নহে। তিনি এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন না যে, এই ব্যাপারে বিবেচনার জন্য হাদীছ দ্বারা যুক্তি প্রদান করা উচিত নহে অর্থাৎ হাদীছ বিবেচ্য। ওয়াট স্বীকার করেন যে, আয্-যুহরীর বর্ণনায় জিবরাঈল-এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বিশেষ করিয়া তাঁহার 'D' এবং 'I' প্যারায় উল্লেখ করেন। ওয়াট প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে জিবরাঈলের উল্লেখ সম্পর্কিত সন্দেহ দূর করেন। এইভাবে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন যে, বর্ণনাসমূহের ঐ অংশগুলি পরবর্তী কালের বর্ণনাকারীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এই ধরনের প্রয়োগও অসঙ্গতিপপূর্ণ এই কারণে, যাহা তিনি আয্-যুহরীর বর্ণনায় অগ্রাধিকার প্রদান করেন। যেমন ইব্ন হিশামের বর্ণনার মত ইহা পুনর্লিখিত হয় নাই। যদি পরবর্তী কালের বর্ণনাকারীগণ বর্ণনার ঐ অংশ সংশোধন করিয়া থাকেন। তাহারা সম্ভবত ইহার প্রাথমিক অংশও সংশোধন করিয়া থাকিবেন, যে বর্ণনায় সত্য আসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ওয়াট-এর মতে, উহার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে আল্লাহ্র আবির্ভাব এবং ইহা ঐ বক্তব্যের বিপরীত যাহা তিনি ইসলামিক মৌলিক বিষয়ে বলেন । প্রকৃত বিষয় এই যে, বর্ণনার ঐ অংশে যে জিবরাঈলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালের প্রক্ষেপণ নহে এবং সত্য আসার অর্থ আল্লাহ আবির্ভূত হওয়াও নহে। আরও স্মরণ করা যাইতে পারে যে, সূরা আন্-নাজ্ম-এর এই আয়াতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী আসার একমাত্র কুরআনী সংবাদ তথ্য নহে এবং এই আয়াত বুঝার জন্য কুরআনের অপর অনুরূপ আয়াতসমূহের সঙ্গে একসঙ্গে বুঝিতে হইবে, বিশেষ করিয়া ৮১ ঃ ১৯-২৩ আয়াত যাহা ইতোপূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২৭]

ওয়াট এই বিষয়ের কুরআনের অন্যান্য আয়াতের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক। তিনি ঐসব আয়াতের ব্যাপারে কি মত পোষণ করেন তাহা জানার পূর্বে সূরা আন-নাজ্ম-এর আয়াতের তাহার উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, "ইসলামের গোঁড়া ধ্যান-ধারণার বিতর্ক এড়ানোর জন্য (এইরূপ বলা) যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্কে দেখেন নাই"। এই রচনার পূর্বের অধ্যায়ের পাঠকারী যে কোন পাঠক তাৎক্ষণিকভাবে এই স্বীকৃতি প্রদান করিবে যে, ওয়াট-এর এই বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে বেল্-এর ভিত্তিহীন ধারণাপ্রসূত, যাহা তথাকথিত গোঁড়া ইসলামিক বিশ্বাস এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ের পরবর্তীতে এক উন্নতির লক্ষণ ছিল এবং ইহা কুরআনের প্রামাণ্য বিষয়ে বেল্-এর চিন্তায় পার্থক্য সৃষ্টি করে, যাহার ফলে তিনি মনে করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ মূলত আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন বলিয়া দাবি

করেন। এই প্রশ্নটি এইভাবে পুনরায় সূরা আন-নাজ্‌ম-এর ব্যাখ্যার উপর মোড় নেয় এবং ইহা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত যে, বেল্‌ ও ওয়াট কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা ভুল।

ওয়াট সূরা আন্‌-নাজ্‌ম-এর আয়াতের সমার্থক কুরআনের অন্যান্য আয়াতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্তক ছিলেন যাহা ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি কার্ল এহ্‌রেন্স (Karl Ahrens)-এর মতামতের দ্বারা এইগুলি বিন্যস্ত করেন। কার্ল বলেন যে, কুরআনের মক্কী সূরায় জিবরাঈলের কথা উল্লেখ নাই, কেননা মূলত রাসূলে করীম ﷺ-ই আর-রূহ নামে ৮১ ঃ ১৯ আয়াতে চিহ্নিত হইয়াছিলেন এবং ফেরেশতারা মক্কী সূরাসমূহে একমাত্র বহুবচন-এর মাধ্যমে উল্লিখিত হন। ওয়াট এই ব্যাপারে ২৬ ঃ ১৯৩ আয়াতের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে বলেন যাহার মাধ্যমে বিশ্বসী আত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল আসিয়াছে। এবং তিনি বলেন, ইহা এই ক্ষেত্রে যে ধারণা উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হইবে"[২৮] উহাই হইল ঐ ধারণা, যাহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করেন।

কার্ল এহ্‌রেন্স এই কথা বলার ক্ষেত্রে সঠিক যে, রাসূলে করীম ﷺ ৮১ ঃ ১৯ আয়াতে আর্‌-রূহ্‌ নামে চিহ্নিত (যেমন ৯৭ ঃ ৪ আয়াতে চিহ্নিত)। কিন্তু ইহা নির্ভুল নহে যে, আর্‌-রূহ্‌ অথবা আর্‌-রূহ আল্‌-আমীন (বিশ্বাসী আত্মা) জিবরাঈল ছাড়া অন্য কেহ অথবা ইহা আল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক দর্শন ছাড়া অন্য কিছু ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইহাও ভ্রান্ত যে, ফেরেশতারা একমাত্র কুরআনের মক্কী সূরাসমূহে বহুবচন দ্বারা উল্লিখিত।[২৯]

এক্ষণে আমরা কুরআনের ৩টি আয়াত বিবেচ্য হিসাবে উদ্ধৃত করি (আর্থাৎ ৮১ ঃ ১৯; ৯৭ ঃ ৪ ও ২৬ ঃ ১৯৩)। উদ্ধৃত ১ম আয়াত[৩০] সম্পর্কে ৪টি বিষয় সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

(ক) এই আয়াতে রাসূলে করীম ﷺ বিশেষত কুরআনের ওহী প্রকাশকারী হিসাবে উল্লিখিত হন।

(খ) বাস্তব ঘটনা এই যে, তিনি একজন আদর্শ দূত হিসাবে বর্ণিত যিনি আল্লাহ্‌র দ্বারা চিহ্নিত বা পরিচিত হওয়া ছাড়াও আল্লাহ্‌র আনুকূল্যে শক্তিসম্পন্ন। তিনি কেবল আল্লাহ্‌র দূত।

(গ) এই আয়াতের অব্যবহিত পরের আয়াতেও তাঁহার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা জোর দিয়া বলা হইয়াছে (৮১ ঃ ২০)। আয়াতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, "তিনি তাহার অবস্থানে আছেন প্রভুর সিংহাসনের সন্নিকটে"। উহার অর্থ এই, তিনি কোনক্রমেই "সিংহাসনের প্রভু" (আল্লাহ) বলিয়া গণ্য করা হইবে না। এই আয়াত সম্পর্কে আরও বলা যায় যে, তিনি "শক্তির অধিকারী" (ذِىْ قُوَّةٍ)। এই প্রবাদ বাক্যের অনুরূপ সূরা আন্‌-নাজ্‌ম-এ বর্ণিত বর্ণনা "ক্ষমতায় শক্তিশালী" (شَدِيْدُ الْقُوٰى) লক্ষণীয়।

(ঘ) তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করেন (৮১ ঃ ২১), যেমন "যাহার অনুসরণ করা হয় (مُطَاعٍ) এবং " বিশ্বাসী" (اَمِيْنٌ)। যেমন, তিনি সিংহাসনের প্রভু নহেন। বক্তব্য হইল এই, "অন্যরা তাহাকে অনুসরণ করে", অবশ্যই তাহার মত অন্যের প্রতি ইঙ্গিত করা, যে তাহাকে

অনুসরণ করা হয়, অর্থাৎ কেবল তাঁহারই রহিয়াছে মূখ্যতম স্থান তাঁহার সহযোগী ফেরেশতাদের মধ্যে। অন্য কথায় বলা যায়, তিনি তাঁহার সমকক্ষদের মধ্যে এক "বিশেষ" স্থানের অধিকারী। ইহাও উল্লেখ্য যে, আমীন (امين) শব্দটি লক্ষণীয়ভাবে ২৬ ঃ ১৯৩ আয়াতে বর্ণিত আর্-রূহ শব্দের অনুরূপ, আর্-রূহ্ আল্-আমীন শব্দের অর্থ "বিশ্বাসী আত্মা"। কার্ল এহ্রেন্স এবং তাঁহার সঙ্গে ওয়াটও একমত এই বলিয়া যে, ৮১ ঃ ১৯ আয়াতে বর্ণিত 'রাসূল কারীম' শব্দদ্বয় আর্-রূহ-কে নির্দেশ করে। এইরূপে ৮১ ঃ ১৯ আয়াতের অভ্যন্তরীণ প্রমাণে এবং তাহাদের স্বীকারোক্তিতে রাসূল কারীম আর্-রূহ্ আল্-আমীন একই ব্যক্তি এবং তিনি আল্লাহ্ নহেন। অধিকন্তু তিনি ওহী বার্তাবহ।

দ্বিতীয় আয়াত সম্পর্কে বলা যায়, যেমন ৯৭ ঃ ৪-এর বক্তব্য হইল কেবল আর্-রূহ্, যাহা আল্-মালাইকা (ফেরেশতাগণ) শব্দের সঙ্গে উল্লিখিত। কার্ল এহ্রেন্স এবং ওয়াট পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন যে, 'আর্-রূহ' 'আল্-মালাইকা' হইতে প্রকৃতিগতভাবে পৃথক, কিন্তু উহা সঠিক নহে। ইহা আরবী ভাষার একটি স্বীকৃত পদ্ধতি যে, বিশেষ একটি বিষয়কে একটি বিশেষ গ্রুপের সাধারণ বিষয়াদির মধ্য হইতে পৃথক (খাস) করিয়া চিহ্নিত করা হয়, যখন সেই বিষয়সমূহ একত্রে উল্লেখ করা হয়। খাস-এর এই ধরনের উদাহরণের পৃথক উল্লেখ সাধারণ বিষয়াদির সঙ্গে ('আম্ম) করার মত অসংখ্য উদাহরণ আরবী সাহিত্যে বিদ্যমান। কিন্তু ভাষার এই নিয়ম-কানুনের বাহিরে আয়াতের অভ্যন্তরস্থ প্রমাণ ইহা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে যে, আর্-রূহ আল্লাহ হইতে পৃথক সত্তা। উদাহারণস্বরূপ বাক্যে বলা হয় যে, ফেরেশতাগণ (আল্-মালাইকা) এবং আর-রূহ "তাহাদের প্রভুর অনুমতির মাধ্যমে" (باذن ربهم) অবতরণ করেন। সুতরাং ফেরেশতাগণ এবং আর্-রূহ উভয়ই আল্লাহ হইতে পৃথক। এইখানে আর-রূহ সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে অভিন্ন নহে এবং তিনি (আর-রূহ) বিশেষত ফেরেশতাদের দ্বারা চিহ্নিত। তিনি (আর্-রূহ্) এবং তাহারা সকলে তাহাদের প্রভুর অনুমতির মাধ্যমে অবতরণ করেন। অপরিহার্য অর্থ এই যে, তিনি (আর-রূহ্) তাহাদের মধ্য হইতে বিশেষ একজন এবং যেহেতু ৮১ ঃ ১৯ আয়াতে 'রাসূল কারীম' বলিতে বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত এবং ওহী বাহক হিসাবে চিহ্নিত এবং কার্ল এহ্রেন্স ও ওয়াট উভয়ে এই বক্তব্যে একমত যে, 'রাসূল কারীম' আর-রূহ অভিধা দ্বারা চিহ্নিত অভিন্ন সত্তা, যিনি ওহী লইয়া আসেন এবং যিনি একজন ফেরেশতা। ইহা লক্ষণীয় যে, সাধারণভাবে বার্তাবাহক হইলেও শুধু একজনকে ওহীর বার্তাবাহক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 'রাসূল কারীম' অর্থ 'ফেরেশতা' হওয়ার বিষয়টি ৩৫ ঃ ১ আয়াত সমর্থিত, যেখানে আল্লাহ্ কর্তৃক ফেরেশতাগণের মধ্য হইতে দূত (رُسُلً) নিয়োগের কথা বলা হইয়াছে। মনে রাখা দরকার যে, উক্ত আয়াতে যখন সাধারণভাবে ফেরেশতাগণকে দূত হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেখানে একবচনে (رَسُوْلٌ) একজন বিশেষ হইবেন যিনি সর্বদা 'ওহীর বাহক' হিসাবে কথিত হন।

অনুরূপভাবে তৃতীয় আয়াত (২৬ ঃ ১৯৩) সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলে, " বিশ্বাসী আত্মা", ইহা এমন এক সত্তা যিনি ওহী লইয়া আসেন (نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ)। এই একই কারণে, যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে, এই 'আর্-রূহুল আমীন' হইলেন 'রাসূল কারীম'-এর সাথে অভিন্ন সত্তা, যিনি 'আমীন' (বিশ্বসী) বলিয়া এবং ওহীবাহক হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার অন্তস্থ প্রমাণ এই ক্ষেত্রে 'আর্-রূহুল আমীন'-কে আল্লাহ হইতে পৃথক করে। যেমন পূর্ববর্তী ২৬ ঃ ১৯২ আয়াতে কুরআন (অথবা কুরআনীয় ওহীকে) বলা হইয়াছে 'তান্যীল' আর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্তা প্রভু কর্তৃক অবতারিত কিছু। 'তানযীল' শব্দের কার্যকারণ প্রকৃতি প্রদর্শন করে যে, আল্লাহ ইহা (কুরআন) অবতরণ করান, এমন নহে যে, তিনি নিজে ইহার সঙ্গে অবতরণ করেন। পরবর্তী ২৬ ঃ ১৯৩ আয়াত পরের অবস্থা স্পষ্ট করিয়া দেয় এবং বলে যে, ইনি 'রূহুল আমীন' যিনি ওহী লইয়া আসেন।

এমনিভাবে 'রাসূল কারীম' এবং 'আর-রূহুল আমীন' এই দুইটি অভিধাই ওহী বাহক হিসাবে চিহ্নিত; উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন ফেরেশতা, যিনি ঃ (ক) অন্যান্য ফেরেশতাদের মধ্যে বিশেষ একজন হিসাবে আর-রূহ নামে চিহ্নিত (৭০ ঃ ৪; ৭৮ ঃ ৩৮ এবং ৯৭ ঃ ৪); (খ) ফেরেশতাদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক দূত হিসাবে নিয়েজিত হন (৩৫ ঃ ১); (গ) ওহী আনয়নকারী বা বাহক হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব একজন আর্দশ দূত অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্য হইতে বিশেষ একজন যিনি দূত হিসাবে মনোনীত; (ঘ) তাহাকে সুনির্দিষ্টভাবে জিবরাঈল নামে ২ ঃ ৯৭ আয়াতে ওহী অবতরণকারী বলা হইয়াছে এবং (ঙ) তাঁহাকে হাদীছ ওহী অবতরণকরী হিসাবে স্বনামে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনের মাদানী সূরায় কেবলমাত্র তিনবার 'জিব্রাঈল' নামটি দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা এই কথা বুঝায় না যে, মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে তাহার সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নাই। উহাও নহে যে, মক্কী সূরায় তাহাকে ওহী অবতরণকারী বলা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ এক বিবেচনায় 'আর্-রূহ' অথবা 'আর্-রূহুল অমীন, 'রাসূল কারীম' বলা হয় নাই, খৃস্টান আধ্যাত্মিক ধারণা অথবা পবিত্র আত্মিক ধারণা হইতে এই জোরালো ধারণা নেওয়া হইয়াছে, যাহা মনে হয় ওয়াটও ধারণা করেন। "আর্-রূহ, আর্-রূহুল আমীন এবং রূহুল কুদুস" অভিধাসমূহ পবিত্র কুরআনে একুশবার উক্ত হইয়াছে।[৩১] ২১ স্থানের কোথায়ও ঐ অভিধাসমূহ আল্লাহ্কে অথবা আল্লাহ্র গুণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় নাই। ২১ স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে এই অভিধা (আর-রূহ্ অথবা আর-রূহুল অমীন) হযরত ঈসা ('আ) এবং তাঁহার মাতা হযরত মারয়াম ('আ)-কে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।[৩২] কিন্তু ঐ সকল স্থানের প্রত্যেকটিতে ইহার অর্থ, হয় জীবনের উদ্দীপনা বা কর্মশক্তি অথবা ইহার অর্থ ফেরেশতা (জিবরাঈল)। যে কোন অবস্থায় ঐ স্থানসমূহের কোথায়ও এই শব্দটি আল্লাহ্র সত্তার সঙ্গে একই অর্থবিশিষ্ট নহে। কারণ নির্ভুল মর্মার্থ এবং প্রত্যেক আয়াতের অন্তর্হিত অর্থ ত্রিত্ববাদের ধারণা অস্বীকার করে এবং হযরত ঈসা ('আ)-এর ঐশ্বরত্বকেও অস্বীকার করে।[৩৩]

তিন ঃ হেরা গুহায় অবস্থান ঃ তাহান্নুছ

"মুহাম্মাদ ﷺ-এর দৃশ্য অবলোকন" সম্পর্কে ওয়াট যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাঁহার সেই ধারণাসমূহ উপস্থাপনের পর তিনি দ্বিতীয় উপ-শিরোনাম "হেরা গুহায় অবস্থান ঃ তাহান্নুছ"-এর দিকে অগ্রসর হন। ইহা কিছুতেই মনে করা উচিত নহে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক আল্লাহ্কে দেখার (দৃশ্য অবলোকন) বিষয়টি ত্যাগ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সর্বক্ষেত্রেই এক নিরবচ্ছিন্ন ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে এবং সব সময় ওয়াট-এর উদ্দেশ্য হইল "দৃশ্য" (vision) সম্পর্কে আলোচনা করা, বিশেষত ওহী সম্পর্কে। তাহার মতে ওহী হইল ধরনগত দিক হইতে মানসিক, মনোবৈজ্ঞানিক অথবা মনো-বুদ্ধিগত বিষয়।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেরা গুহায় গমন বা অবস্থান এবং তাহান্নুছ সম্পর্কে ওয়াট তাহার গুরু রিচার্ড বেল হইতে ভিন্নমত পোষণ করেন। বেল্ এতদসংক্রান্ত বিষয়সমূহের বর্ণনাগুলির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেন। ওয়াট বলেন যে, "মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেরা গুহায় গমন সম্পর্কে কোন অসম্ভাব্যতা নাই"।[৩৪] তিনি তখন এমন বিষয় উপস্থাপন করেন যাহা একজন পণ্ডিত অত্যন্ত সংগতভাবেই বলেন, "অন্যদের ধারণাসমূহের ইহা একটি মিশ্রণ মাত্র"।[৩৫] ওয়াট বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেরা গুহায় গমনের কারণ "মক্কার উত্তপ্ত অবস্থা হইতে নিজেকে বাঁচানোর পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। কেননা মক্কার জীবন তাঁহার জন্য অপ্রীতিকর ছিল, যিনি সেই সময় তায়েফ-এ গমনের সঙ্গতি রাখিতেন না। এই কথা বলার পরপরই ওয়াট নিম্নোক্ত বক্তব্য যোগ করেন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেরায় অবস্থান (ধ্যান করার বিষয়টি) ইয়াহূদী-খৃস্টীয় প্রভাবের ফল, যেমন মঠবাসী ভিক্ষুদের উদাহরণ অথবা ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা "মুহাম্মাদ ﷺ প্রদর্শন করিয়াছেন", তাঁহার নির্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা ও ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে।[৩৬]

উপরে ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত দুইটি বাক্যে প্রকৃতপক্ষে দুইটি ভিন্ন ধারণা বর্ণনা করা হইয়াছে। (এক) হেরা গুহায় প্রায়শই যাওয়ার বিষয়টি দরিদ্র লোকের গ্রীষ্ম অবকাশ যাপনের মত কিছু। এই ধারণাটি প্রথমে এলয় স্প্রেংগার (Aloy Sprenger) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপস্থাপন করেন।[৩৭] যাহা হউক, যে সময় হইতে তিনি এই ধারণা প্রদান করেন সেই সময় কোন ইউরোপীয় লেখক এই ধারণার সৃষ্টি করেন নাই অথবা এই সম্পর্কিত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা হিসাবে ইহাকে গণ্য করেন নাই। ওয়াট কোনভাবেই স্প্রেংগারের বরাত না দিয়া এই ধারণা অবলম্বন করেন এবং ইহা হুবহু পুনঃ উপস্থাপন করেন। স্প্রেংগার ও ওয়াট এই দুইজনের কেহই নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করেন নাই যে, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠে, হেরার আবহাওয়া সার্বিকভাবেই গ্রীষ্মকালে মক্কা শহরের আবহাওয়া হইতে ভিন্ন ছিল কিনা এবং পার্শ্বে এত পাহাড়-পর্বত থাকা সত্ত্বেও হেরা পর্বত গুহা কেন গ্রীষ্মকালে আশ্রয় বা সাধনার জন্য পছন্দ করা হয়? যদি তাহারা নিজেদেরকে মক্কার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে এই প্রাথমিক প্রশ্ন করিতেন তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই তাহাদের এই ধারণা সম্পর্কে বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করিতেন।

(দুই) ইয়াহূদী-খৃস্টীয় প্রভাব, বিশেষ করিয়া খৃস্টান সাধুদের উদাহরণ, তাহাদের ধারণা "নির্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা ও ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে কার্যত এই ধারণা ওয়াট-এর পূর্ববর্তী একদল পণ্ডিত পোষণ করিতেন, যেমন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন জে. হার্সফিল্ড (J. Herschfield)[৩৮] এবং আরেকজন টর আণ্ড্রে (Tor Andrae)।[৩৯] কিন্তু ওয়াট তাহাদের কাহাকেও এই ব্যাপারে উদ্ধৃত করেন নাই। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর চিন্তাধারার বিবর্তনের উপর ইয়াহূদী-খৃস্টীয় প্রভাবের সাধারণ ধারণাটি ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কথা ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে।[৪০] যাহা হউক, এইখানে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় যে, যে দুইটি ধারণা এই মতে বিবেচনার জন্য দুইটি ধারাবাহিক বাক্যে উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহা পরস্পর বিরোধী। যদি হেরা গুহায় গমন করা গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের মত মনে করা হইত তাহা হইলে এই ব্যাপারে ইয়াহূদী-খৃস্টীয় প্রভাব সাহায্যের জন্য টানিয়া আনার প্রয়োজন হইত না। পক্ষান্তরে যদি ইহা খৃস্টান সাধুসন্তদের প্রথার অনুকরণে হইত তাহা হইলে এই গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায়।

হেরা গুহায় গমন সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মন্তব্য করার পর ওয়াট তাহান্নুছ পরিভাষাটির অর্থ ও উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেন। এই সম্পর্কে তিনি বেল্ এবং হার্সফিল্ড-এর ধারণার সাধারণভাবে অনুসরণ করেন। যেমন পরিভাষাটির অর্থ হয় 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের জন্য আল্লাহ্র ইবাদত করা' নতুবা "পাপকার্য বা অপরাধমূলক কার্য হইতে বাঁচার জন্য কোন কাজ করা"। ওয়াট তখন "কল্পনায় পরিপূর্ণ" ধারণার মাধ্যমে অগ্রসর হন, যেমন তিনি বলেন, যেসব বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ প্রথম জীবনে মক্কার সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যাসমূহের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। তিনি একজন ইয়াতীম হওয়ার কারণে ঐসব সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি "মক্কার অত্যন্ত আলোকিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রাপ্ত অস্পষ্ট একত্ববাদ"-কেও আত্মস্থ করিয়াছিলেন। তিনি কতিপয় সংস্কারের জন্যও সচেষ্ট ছিলেন "এবং সকল প্রেক্ষাপট এই ধারণা দেয় যে, এই সংস্কার প্রাথমিকভাবে অবশ্যই ধর্মীয় সংস্কার হইবে"। তাঁহার মনের এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি ধীর ও স্বর্গীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নির্জনবাস অবলম্বন করেন এবং ইবাদতের কতিপয় কার্যাবলী পালন করেন সম্ভবত গুনাহ্ হইতে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে।[৪১]

ওয়াট এইভাবে ইতোপূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক গ্রীষ্মে অবকাশ পালন এবং খৃস্টান সাধু-সন্তদের সাধনা পদ্ধতিকে তাঁহার সম্ভাব্য অনুকূল করা সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়াছিলেন তিনি নিজেই তাহা কার্যত নাকচ করিয়া দেন। কারণ তিনি যদি মক্কায় কতিপয় সংস্কারকার্য করিতে চাহিতেন এবং যদি "সকল প্রেক্ষাপট এই ধারণা দেয় যে, এই সংস্কারকার্য অবশ্যই প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় হইবে" এবং এইজন্য তিনি ধীর ও সতর্কভাবে ঊর্ধ্বজাগতিক বিষয়াদির বিকাশের জন্য নির্জনবাস অবলম্বন করেন" ইত্যাদি। এই উভয় অনুমান বা ধারণা তাঁহার হেরা গুহায় নির্জনবাস-এর বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য অপ্রয়োজনীয়। যাহা হউক, এইখানে ওয়াট-এর মন্তব্য

তাহার দুইজন বিখ্যাত পূর্বসূরী উইলিয়াম ম্যুর ও মার্গোলিয়থ-এর ধারণার ভিত্তিতে করা হইয়াছে। প্রথমজন এই ধারণা দেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উচ্চাকাঙ্খা ও প্রস্তুতি ছিল একজন রাসূল-সংস্কারকের ভূমিকা পালন করা।[৪২] অপরজন এই তত্ত্ব দেন যে, আরবে ও আরবের প্রতিবেশী খৃস্টান বায়যান্টাইন রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এই ধারণা দেয় যে, ধর্মীয় দিক হইতে গভীর চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা প্রসূত একটি সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত এবং এই কারণে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ একজন রাসূলের ভূমিকা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এমনকি ইহাও লক্ষণীয় যে, তিনি হেরা গুহায় নির্জনে ধ্যান করিতে গমন করিয়া সম্ভবত এমন কিছু কাজ করেন, যাহা "পাপের ক্ষমার জন্য" ছিল, তাহা ছিল তাঁহার (মুহাম্মাদ ﷺ) পূর্বের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চা সম্পর্কে ম্যুর, মার্গোলিয়থ-ওয়াট-এর ধারণার স্মৃতিচারণ।[৪৩]

এই সকল বক্তব্য সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্য হেরা গুহায় গমন করেন ঊর্ধ্বজাগতিক বিষয়াদির ব্যাপারে গভীরভাবে ধ্যান করার জন্য। কিন্তু সেইখানে কোন উৎস সম্পর্কে কোন নির্দেশনা ছিল না যে, তিনি এরূপ করিয়াছিলেন তাঁহার গভীর ধ্যান প্রসূত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের গঠন কাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ্যে। ওয়াট-এর বর্ণনা যাহা তিনি নিজেই বিস্তারিত বলেন, তাহা ছিল কল্পনা প্রসূত এবং আমরা যেমন ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার পূর্বসূরীদের ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে। হেরা গুহায় নির্জনে ধ্যানে মগ্ন হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাঁহার নিকট ওহী আনার বিষয়টি সর্বোতভাবে ছিল কিছুটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। হেরা গুহায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে তাঁহার হতবাক হওয়া এবং পরবর্তীতে ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল-এর সঙ্গে পরামর্শ করা—তাঁহার দিক হইতে কেবল অপ্রত্যাশিত ও অপ্রস্তুত অবস্থাকে জোরালোভাবে প্রমাণিত করে। এইসব কারণ এইভাবে সরাসরি গভীর চিন্তা প্রসূত সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার উচ্চাকাঙ্খা এবং প্রস্তুতির ধারণার কার্যত সম্পূর্ণ পরিপন্থী। গভীরভাবে চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে সংস্কার তত্ত্বকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ বিষয়টির আকস্মিকতা এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করিয়া দেয় অথবা ইহার ব্যাপারে কমপক্ষে সন্দেহ সৃষ্টি করে। ওয়াট যাহা ইচ্ছা করেন বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে তাহাই। এইভাবে বর্ণনাটি কাল্পনিকতায় পরিপূর্ণ হওয়ার পরপরই তিনি লক্ষ্য করেন যে, যদিও গতানুগতিক বর্ণনা "এই ধারণা দেয়, দৃশ্যসমূহ (তাঁহার) নির্জনবাস-এর সময় আসে (দৃষ্টিগোচর হয়)। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বর্ণনায় বিভিন্ন দৃশ্যপট-এর তুলনামূলক তারিখ অনির্দিষ্ট ছিল। অনেক সময় দৃশ্যমান দৃশ্যপটকে অপ্রত্যাশিত বলা হইয়াছে এবং কোন কোন সময় হযরত খাদীজা (রা) খুব দূরে থাকিতেন বলিয়া মনে হইত না।[৪৪]

ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত যে, "ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপটের তুলনামূলক তারিখ-এর বক্তব্যের ব্যাপারে যাহা বলা হইয়াছে সেই সম্পর্কে যতই অনিশ্চয়তা থাকুক, ইহার মূল দৃশ্যপটের নির্দেশনার ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা নাই, এমনকি ইহার আকস্মিকতা ও অপ্রত্যাশিতব্যতা সম্পর্কেও কোন অনিশ্চয়তা নাই। সার্বিকভাবে এই 'ডাক' (আহবান) হেরা গুহায় গমনের পর,

নির্জন ধ্যানের সময় জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয় এবং (ফেরেশতার) "উপস্থিতি" বা দর্শন অথবা "দৃশ্যপট" অবলোকন ছিল অবিচ্ছিন্নভাবে, প্রকৃতপক্ষে আহ্বানের এক নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্য। হযরত খাদীজা (রা) হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে ছিলেন যেমন ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার গৃহে হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট ছিলেন, যেমন ওয়াট কর্তৃক উদ্ধৃত আয্-যুহ্রীর বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে। জিবরাঈলের "উপস্থিতি" প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ইহা "কোন কোন সময়ে" নহে যে, উপস্থিতিকে অপ্রত্যাশিত বলা হইয়াছে। বর্ণনায় ইহা সবসময় অপ্রত্যাশিত। "আহবান" (call) ও "দৃশ্য প্রদর্শন"-এর আকস্মিকতা ও অপ্রত্যাশিত হওয়ার উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় অবিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছে, তাহাদের বর্ণনার বিস্তারিত বিষয়বস্তুর পার্থক্য সত্ত্বেও। ওয়াট নিজে "সত্যের" এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যমানতার কথা ব্যবহার করেন তাহার "আল্লাহ্র দর্শন"-এর ধারণা (তত্ত্ব)-কে সমর্থন করার জন্য যাহা একটু আগেই আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু তিনি এক্ষণে ইহা অনুধাবন করিতে পারেন যে, "আহবান" (call) ও দৃশ্যমানতা-এর আকস্মিকতার বিষয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিক হইতে পরবর্তীতে হতবিহ্বল হওয়া বা বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা তাঁহার সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা তত্ত্বের প্রচণ্ড বিরোধী। এই সময় হইতে ওয়াট "আহবানের" আকস্মিকতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন এবং তিনি ইহা দেখাইতে চাহেন যে, ইহা "দৃশ্যমানতার" কিছু অমুখাপেক্ষিতা ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ের উপর ওয়াট তাহার আলোচনার বাকী অংশগুলিতে "আহবান" (call) হইতে "দৃশ্যমানতা" (vision)-কে পৃথক করেন এবং ধারণা দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাদেশ (ওহী) প্রাপ্ত হইতেছিলেন এবং প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া এই সকল প্রত্যাদেশ জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। ওহী অবতরণের বিরতিকালের পর তিনি ওহী জনসাধারণ্যে প্রকাশ করেন এবং তিনি যখন "গোপনে" প্রচার করিতেছিলেন তখন "দৃশ্যাবলী" অবলোকন করেন অথবা প্রথম "দৃশ্য" অবলোকন করেন।[৪৫]

চার ঃ আপনি আল্লাহ্র রাসূল

ওয়াট এইভাবে তাহার উপরোল্লিখিত তৃতীয় উপশিরোনামের অধীনে "আহবান" (call) এবং "দৃশ্যাবলী" (vision)-এর বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। "তিনি আয্-যুহরীর প্যারা"-এর B. C. D এবং I-এ এই বলিয়া শুরু করেন, "আপনি আল্লাহ্র রাসূল", এই বক্তব্যটি চারবার উক্ত হইয়াছে। প্রথম বক্তব্যে "সত্য", দ্বিতীয় বক্তব্যে "একমাত্র তিনিই" এবং শেষ দুইটি বক্তব্যে 'জিবরাঈলকে' বুঝানো হইয়াছে। তিনি তখন বলেন যে, ৪টি প্যারায় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত বিদ্যমান এবং এইখানে হয়ত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এইগুলি একটি ঘটনারই ৪টি ভাষ্য। কোন না কোনভাবে অথবা অন্য কোন পন্থায় বিভিন্ন দৃশ্যপটে উন্নীত হয়? ওয়াট লক্ষ্য করেন যে, "এই প্রাথমিক পর্যায়ে" জিবরাঈলের উল্লেখ "সন্দেহপূর্ণ"। এই সময় হইতে তিনি কুরআনে উক্ত হন নাই, অনেক পরে তাহার উল্লেখ না হওয়া পর্যন্ত এবং আরও যোগ করিয়া বলেন যে, সূরায় যে

অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয় তাহা দুই ধরনের—প্রথম দুইটিতে (প্যারা B ও C) মুহাম্মাদ ﷺ-কে "মূল আহবানে একজন দূত (রাসূল) হিসাবে বর্ণনা করা এবং অপর দুইটিতে (প্যারা D ও I) উদ্বিগ্নতার সময়ে তাহাকে উপস্থিতির পুনঃ নিশ্চয়তার মাধ্যমে নিশ্চয়তা দান করা।[৪৬]

ইহা পুনরায় লক্ষণীয় যে, ওয়াট আয্-যুহরীর রিওয়ায়াতকে অবলম্বন করিয়া যাহা বলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে তিনি আয্-যুহরীর ধারাবাহিক বর্ণনা হইতে বর্ণনা তৈরী করিয়া বলেন। মূল পাঠে এই ধরনের বিভক্তি সৃষ্টি করিয়া ওয়াট চিন্তা করেন অথবা ইহা দেখাইতে চাহেন যে, প্যারা B এবং D-ও পরবর্তীতে "বক্তাগণ" ভিন্ন ভিন্ন, যেমন উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিপ্রেক্ষিত এবং ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনের কোনটিই এই ধারণাকে সমর্থন করে না। পুরা অংশে জিবরাঈল হইলেন বক্তা। অনুরূপভাবে এই যুক্তি যে, এখানে জিবরাঈলের উপস্থিতি সন্দেহজনক, কারণ তিনি কুরআনে শেষ পর্যায় ছাড়া উল্লিখিত হন নাই, ইহাও অসমর্থনীয়। ইহাও ওয়াট-এর নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি একমাত্র আত্-তাবারীর ভাষ্য অবিকল উপস্থাপন করেন। আয-যুহরীর বর্ণনায় অন্য সকল ভাষ্য বাদ দিয়া এই যুক্তিতে যে, ইহা "পুনঃলিখিত" হয় নাই অর্থাৎ অন্যান্যদের দ্বারা পরিমার্জিত হয় নাই। এই ভাষ্যের অংশবিশেষের উপর তাহার সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে এবং কার্যত জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে তাহার বিশ্বাস হইল কুরআনের প্রমাণ, যাহা তিনি ভুল ধারণা করেন, তাহা সুস্পষ্টভাবেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

যাহা হউক, ওয়াট-এর উদ্দেশ্য হইল "দৃশ্য" (vision) হইতে "আহবান" (call)-কে পৃথক করা। উপরোল্লিখিত বর্ণনা প্রদানের পরপরই তিনি আর একটি অনুচ্ছেদ প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করেন ঃ যদি প্যারা B মূল আহবানের দিকে নির্দেশ করে তাহা হইলে "দৃশ্য" (vision)-এর সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি? প্রশ্নটি সুস্পষ্টরূপে বিভ্রান্তিপূর্ণ। প্যারা B-এ যেমন ওয়াট এই পর্যন্ত বলিয়াছেন, "উপস্থিতি" অথবা "দৃশ্য" বর্ণনা করেন এবং তিনি কিছু আগে এই ধারণা দিতে চেষ্টা করেন যে, ইহার মধ্যে উল্লিখিত "সত্য" শব্দটির অর্থ আল্লাহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে তিনি ঐ অবস্থান হইতে সরিয়া আসেন এবং এই ধারণা দিতে চাহেন যে, ঐ আয়াত একমাত্র মূল আহবানকে দূত হিসাবে বর্ণনা করে। পরোক্ষভাবে ইহা বলা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে "দৃশ্য" (vision) হইতে পৃথক। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটি নির্দিষ্ট করা উচিত। ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বলা উচিত যে, "Original call" (মূল আহবান) -এ তিনি কী বলিয়াছেন বা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিবেচ্য নহে, বরং "দৃশ্য" (vision)-এর মধ্যে কী ঘটিয়াছে তাহাই প্যারা B-এ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রশ্ন বাস্তবিকপক্ষে এই অদ্ভুত প্রশ্নের রূপ নেয় যে, "দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যের সম্পর্ক কি"?

উপরোল্লিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ওয়াট সূরা আন-নাজ্ম-এর আয়াতের উদ্ধৃতি দেন এবং ইহার ফলে এই সম্পর্কে বেল্ কি বলেন তাহা পুনর্ব্যক্ত করেন। যেমন ওহীর বিশুদ্ধতার বিরুদ্ধে মক্কার অবিশ্বাসীদের আপত্তি উত্থাপনের জওয়াবে ঐ সূরায় "প্রথম দৃশ্যমানতা" সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয় এবং এইজন্যই অন্ততপক্ষে এক বা একাধিকবার ওহী নাযিলের ঘটনা ঐ সূরায় "দৃশ্য"

(vision) -এর বর্ণনা করার পূর্বেই প্রচার করা হয়। ওয়াট পরে আবার বলেন, দৃশ্য যাহা বর্ণিত হইয়াছিল ওহী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে "কোন কিছু অবশ্যই করিতে হইবে"। তাহা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সূরা/ আয়াতসমূহের প্রাপ্তির সঙ্গে কোন দৃশ্য (vision) প্রদর্শিত হয় নাই।[৪৭]

এই শেষ বিবরণ তৈরী করিতে ওয়াট সুস্পষ্টরূপে তাহার ক্ষেত্র পুনরায় পরিবর্তন করেন এবং উহা দুইভাবে করেন। (এক) তিনি কুরআনিক সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে সরিয়া আসেন এবং একমাত্র তাহার উদ্ধৃত বর্ণনার প্রমাণের উপর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন বলিয়া মনে হয়। (দুই) তিনি ইহাও বলেন যে, বর্ণনার প্যারা B 'দৃশ্য' (vision) -এর কথা বর্ণনা করে, কিন্তু ইহা কোন নির্দিষ্ট সূরা অবতরণের কথা নির্দেশ করে না। অন্যথায় উদাহরণস্বরূপ তাহার এই বর্ণনা তৈরী করার কোন ক্ষেত্র নাই। কেননা "দৃশ্য" (vision) সহকারে কোন নির্দিষ্ট সূরা প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি তিনি দেখাইতে পারিবেন না।

এক্ষণে মূল পাঠ, যাহাকে ওয়াট প্যারা B-এর জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং যেইটি সম্পর্কে তিনি এই ধারণা পোষণ করেন এবং সেই সত্তা সম্পর্কে বলেন যে সত্তা মুহাম্মাদ ﷺ -কে উদ্দেশ্য করিয়া সম্বোধন করেন, "আপনি আল্লাহ্র রাসূল (দূত)" এবং কুরআনের কোন নির্দিষ্ট সূরা নাযিল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন না। কিন্তু যাহা ইতোমধ্যে বলা হইয়াছে, ওয়াট-এর প্যারাসমূহ 'A' হইতে 'G' পর্যন্ত সবগুলিই আত্-তাবারীতে বর্ণিত আয্-যুহ্রীর ধারাবাহিক বর্ণনায় উদ্ধৃত এবং প্যারা 'E' পর্যন্তকার বর্ণনায় বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী "আহবান" (call)-এর উল্লেখ এবং সূরা ইকরা-এর অবতরণ সম্পর্কে বলা হয়। ওয়াট-এর নিজের অনুবাদ অনুযায়ী প্যারা 'E' এইভাবে শুরু হইয়াছে, "তখন তিনি বলেন, পড়। আমি বলিলাম, আমি পড়িতে পারি না...."। "Then he" এই বক্তব্যটি নির্ভুলভাবে জিবরীলের দিকে ইঙ্গিত করে যিনি পূর্বে উল্লিখিত প্যারা 'D'-তে উক্ত হইয়াছেন। ওয়াট অবশ্য এই ক্ষেত্রে জিবরাঈলের প্রতি ইঙ্গিত করার বিষয়টি সন্দেহ করেন। কিন্তু তিনি (ওয়াট) ইহা অস্বীকার করেন না বা করিতে পারেন না যে, প্যারা 'D' "উপস্থিতি" অথবা "দৃশ্য" (vision) সম্পর্কে বলে এবং উভয় প্যারা 'D' এবং 'E' একসঙ্গে দৃশ্য (vision) সম্পর্কে বলে এবং সূরা ইকরা-এর অবতরণ সম্পর্কে বলে যাহা সর্বত্রই ওয়াট স্বীকার করেন যে, কুরআনের প্রথম সূরা হিসাবে ইকরা অবতারিত।[৪৮] এইরূপে তাহার বর্ণনা এই যে, "এমন কোন তথ্য নাই যে, নির্দিষ্ট সূরা যাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রাপ্ত বা অবতারিত ছিল, তাহার 'দৃশ্য' (vision)-এর কথা ছিল" এই বক্তব্যটি অসমর্থনীয় এবং তাহার নিজেদের প্রমাণের পরিপন্থী।

এই বর্ণনা কুরআনের প্রমাণেরও বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ বেল্ ও ওয়াট-এর সূরা আন-নাজ্ম-এ বর্ণিত "দৃশ্যমান" সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা যাহাই হউক না কেন, এই সূরায় পর্যায়ক্রমে বলা হইয়াছে যে, ইহা ছিল ঐ সত্তা যিনি 'শাদীদুল কুওয়া' এবং 'যু মিররা', যিনি "দুইটি ধনুকের দূরত্বের " চাইতেও অধিকতর কাছে টানিয়া নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নাযিল করেন যাহা তাঁহাকে ওহী হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে" (আয়াত ৪-১০)। একই বিষয়ে জোর দিয়া বলা হইয়াছে ৮১ ঃ ১৯-২৩ আয়াতে। ঐ আয়াত বলে যে, ইহা হইল "বক্তব্য",

একটি পাঠযোগ্য (বক্তব্য), যাহা "একজন আদর্শ দূত কর্তৃক অবতারিত, যাহাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ "পরিষ্কার দিগন্তে" দেখিয়াছেন। উভয় আয়াত অতীত ঘটনা সম্পর্কে বলে এবং তাহাদের বরাত সুস্পষ্টভাবে ওহী অবতরণের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে, যে ওহী রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচার করেন এবং উভয় সূরায় অবতারিত আয়াতে সেই সত্তার উপর জোর দেওয়া হয় যে সত্তাকে তিনি দেখিয়াছেন।

আয্-যুহরীর বর্ণনার অন্যান্য ভাষ্য, বিশেষ করিয়া বুখারী শরীফে সুস্পষ্টভাবে জিবরাঈল কর্তৃক সূরা ইকরা নাযিল সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যিনি এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে আবির্ভূত হন। ওয়াট তাহার পাঠকদেরকে এই ভাষ্য সম্পর্কে এবং বর্ণনার অন্যান্য ভাষ্য সম্পর্কে অবহিত রাখিতে চাহেন। প্রকৃতপক্ষে এহেন কার্যের দ্বারা এবং অন্যান্য সকল কলাকৌশল দ্বারা বিধি-বহির্ভূতভাবে বা খামখেয়ালীভাবে ভাষ্যটিকে বিভক্ত করেন যাহা তিনি কয়েকটি কৃত্রিম বিভাজনের অংশে উদ্ধৃত করেন, 'দৃশ্য' (vision) হইতে 'আহবান' (call) পৃথক করার মাধ্যমে, অদ্ভুত ও সন্দেহজনক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ইহাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন এবং অসমর্থনীয় বর্ণনা তৈরী করিয়া এমন বিবরণ দেন যে, কোন সুস্পষ্ট ও সঠিক পাঠ দৃশ্যমানতার সময় অবতীর্ণ হয় নাই। ওয়াট ও তাহার পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মতে মূল তত্ত্ব এই যে, কুরআনের ওহী মৌখিক ছিল না, কেবল পরামর্শ আকারে ছিল অথবা এই ধারণাসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসিয়াছে। ইহার পর তিনি পুনরায় বলেন যে, "দৃশ্যের বাস্তব ফলাফল" সম্ভবত কোন কিছু "দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের মত যে, সূরা বা আয়াতগুলি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সংবাদস্বরূপ ছিল" এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ "এই সংবাদসমূহ জনসাধারণ্যে প্রচার করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন"।[৪৯]

বক্তব্যের আলোচনা "সূরাসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সংবাদস্বরূপ ছিল" অর্থাৎ সূরাসমূহ উহাদের আঙ্গিকের দিক দিয়া আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ছিল না, কেবল ইহাদের মর্মবাণীসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ছিল। ইহা ওয়াট কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয় নাই যে, কিভাবে মর্মবাণী "দৃশ্য" (vision)-এর পূর্বে প্রাপ্ত হন। তাহা না হইলে কেন এবং কিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ ওহী প্রাপ্তির পূর্বে নিশ্চিত হন যে, এইগুলি আল্লাহ্র নিকট হইতে আসিয়াছিল? ইহাদিগকে কি সূরায় সুসংবদ্ধ দান করেন কেন? ওয়াট এই ধরনের কোন প্রাক্-দৃশ্য সম্বলিত সূরার উল্লেখও করেন নাই। তিনি কেবল তাহার ধারণার স্বপক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করেন। যেমন, যে সময় হইতে এই 'দৃশ্য' এই প্রত্যয় জ্ঞাপন করে যে, "সূরাসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সংবাদস্বরূপ ছিল", এই বিষয়টি পূর্ব ধারণা দেয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ ইতোমধ্যে কতিপয় ওহী লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ওহীর ধরন বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। "এক্ষণে তিনি জ্ঞাত হইলেন অথবা তাঁহাকে উহার সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করা হইল"।[৫০] যে কেহ সহজেই বিষয়টি চিহ্নিত করিতে পারে যে, ইহা কেবল ম্যূর-মার্গোলিয়থ-বেল কর্তৃক পুনরায় বর্ণিত আর এক ফর্মূলা, যে ফর্মূলায় তাহারা বলেন যে, সূরা ইকরা নাযিল হওয়ার পূর্বে কুরআনের অন্য আরও কতিপয় সূরা নাযিল হইয়াছে এবং তিনি পরবর্তী সময়ে ঐগুলিকেও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ওহীকৃত বলিয়া মনে করেন।

ওয়াট বিকল্প পদ্ধতিতে তাহার আলোচনা অব্যাহত রাখেন, "দৃশ্যকে অবশ্যই ওহী পাওয়ার আহবান হিসাবে মনে করিতে হইবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ সম্ভবত তাহাদেরকে প্ররোচিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানিতেন"। ওহীর জন্য "প্ররোচিত" তত্ত্বটি, স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ইহা মূলত মার্গোলিয়থের তত্ত্ব।[৫১] তিনি ইহাকে অবশ্য কায়িক কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী আসার সময় প্রকাশ পাইত।

ওয়াট মার্গোলিয়থের বরাত দেন নাই এবং তিনি প্রথম সুযোগেই তাহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া "আহবান" (call) এবং "দৃশ্য" (vision)-এর প্রারম্ভেই এক অসম্ভব প্রয়োগের অবতারণা করিয়া বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ কদাচ তাঁহার মিশন শুরু করার পূর্বেই ওহী অবতরণের জন্য "প্ররোচিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইতেন"।

যাহা হউক, ওয়াট এই ধারণা এইখানে প্রকাশ করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ আমরা বর্তমানে দেখিতেছি, তিনি অবশ্য পরবর্তী কালে ইহার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন।[৫২] সাধারণ যুক্তি প্রদর্শনের পর তিনি লক্ষ্য করেন যে, "পূর্বে উল্লিখিত বিকল্পসমূহ" অর্থাৎ দৃশ্যের ফলাফল কেবল এই প্রত্যয় জন্মায় যে, "সূরাসমূহ " ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সংবাদস্বরূপ, যাহা "অধিকতর সম্ভাব্য"; ইহা এই ধারণা সংশ্লিষ্ট এবং ওয়াট এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বেল্‌-এর উদ্ধৃতি দান করেন "যাহা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল অথবা তাঁহাকে ধারণা দান করিয়াছিল তাহা ছিল বাস্তব পথনির্দেশনা, যাহা তিনি প্রকৃতপক্ষে অনুসরণ করেন"।[৫৩] ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বলা প্রয়োজন যে, ইহা কেবল বিশেষ কোন বক্তব্য নহে, বরং সার্বিকভাবে একটি তত্ত্বগত বিষয় যে, কুরআনের ওহী মূল পাঠের শাব্দিক যোগাযোগের অর্থ বুঝায় না, বরং 'ধারণা' অথবা "উদ্বুদ্ধকরণ" ইত্যাদি বুঝায় যাহা বেল এবং অন্যান্যদের ধারণা এবং যাহা ওয়াট কেবল সাধারণভাবে কতিপয় অর্থ বা অন্যান্য বিষয় দ্বারা তাহার ধারণাকে প্রমাণ করিতে চাহেন। যাহা হউক, এই বিশেষ ধারণার যতটুকু সম্পৃক্ততা রহিয়াছে, ইহার অসম্ভাব্যতা অনেক পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।[৫৪]

পরিশেষে ওয়াট বলেন যে, vision-এর মর্ম যদি মোটামুটি সাধারণ দৃশ্য হয় তাহা হইলে ইহা প্যারা B-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তখন বলেন যে, এই বক্তব্য "আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল" সম্ভবত "বাহ্যিক বাচনভঙ্গি ছিল না", এমনকি ধারণাগত বাচনভঙ্গিও ছিল না, বরং একটি বুদ্ধিভিত্তিক বাচনভঙ্গি"। ইহার অর্থ এই যে, ইহা ছিল একটি "যোগাযোগ" যাহা তৈরী হইয়াছিল "শব্দ" ছাড়া। "শব্দের গঠন সম্ভবত প্রকৃত দৃশ্যের অনেক পরে হয়"।[৫৬]

প্রকৃতপক্ষে এই বিবরণ ওয়াট-এর দিক হইতে একটি স্বীকারোক্তি যে, "মূল আহবান" এবং "দৃশ্য" (vision) বাস্তবিকপক্ষে দুইটি পৃথক ঘটনা নহে। যেমন তিনি এই সময়ে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন, কিন্তু অনুরূপ ঘটনার উদ্দেশ্যের বর্ণনা করা হয় প্যারা B-এ। উহার স্বীকৃতি দেওয়ার পর তিনি বুঝিতে পারেন যে, "আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল " এই বক্তব্যটি যদিও কুরআনের আয়াত

নহে, তৎসত্ত্বেও ইহা একটি "শব্দাবলী" সম্বলিত বর্ণনা যাহা প্যারা B-এ "দৃশ্য" (vision)-এর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অবতীর্ণ হয়। ইহার পর ওয়াট জুড়িয়া দেন যে, এইসব শব্দ সম্ভবত "একটি বুদ্ধিভিত্তিক বাচনভঙ্গি এক্ষণে তাহার অদ্ভুত যুক্তি লক্ষ্য করুন। তিনি জোর দিয়া বলেন যে, কোন প্রমাণ নাই—যে কোন শাব্দিক পাঠ-এর দৃশ্য (vision) -এর সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তিনি করিতে পারেন না যে, Passage B-এ যাহা তিনি অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন তাহাও কিছু শাব্দিক অবতারণের কথা বলেন। তাই তিনি তাহার পাঠকদের বলেন যে, এই সমস্ত "শব্দাবলী" কোন "শব্দাবলী ছাড়া" যোগাযোগকৃত এক বুদ্ধিভিত্তিক বাচনভঙ্গি। প্রকৃত ঘটনা এই, তাহার বর্ণনা এই যে, এই যোগাযোগের কোন নির্দিষ্ট মূল পাঠ নাই , এই মিথ্যা ধারণা জন্মায় এবং তাহার Passage B-এর পরিপন্থি। তদুপরি তাহার এই কথার দ্বারাও বির্তক সৃষ্টি হয়, যেখানে তিনি বলেন, "শব্দের সুসংবাদ সম্ভবতঃ প্রকৃত দৃশ্যের অনেক পরে তৈরী হয়"। তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে ইচ্ছামত এক ধারণা পোষণ করেন যাহার যথার্থতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই প্রমাণ করে না। এহেন কার্য করার পরও তিনি Passage B-এর বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সন্দেহপোষণ করেন। যেমন আমরা দেখিয়াছিলাম যে, তিনি Passage B এবং D -এ সন্দেহ পোষণ করেন, কারণ ঐ সব Passage -এ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, যে বিষয় তাহার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নহে। এক্ষণে তিনি Passage B-এর প্রতিও অশুদ্ধতার ইঙ্গিত করেন, কারণ Passage B-এ শাব্দিক অবতারণের ইঙ্গিত রহিয়াছে "আপনি আল্লাহ্র রাসূল" ইহার বাস্তবতা তাহার অন্য ধারণার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। তাহা সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, তাহার ধারণাসমূহ এই সকল Passage দ্বারা সমর্থিত।

এমনকি এই ধরণের কৌশল সত্ত্বেও ওয়াট বাস্তবতা এড়াইতে পারেন নাই যে, সূরা ইকরা, তাহার Passage D এবং E সহ সর্বোতোভাবে 'দৃশ্য' (vision)-এর সময়ে অবতীর্ণ হয়। ইহার পর তিনি এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাহার ৪র্থ উপ-শিরোনামের দিকে অগ্রসর হন। যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

পাঁচ ঃ আবৃত্তি করুন (পড়ুন)

এই উপ-শিরোনামে ওয়াট তিনটি বিষয় পর পর তিনটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি সূরাতুল আলাক নাযিল হওয়া সম্পর্কে হাদীছের অনেকগুলি ভাষ্য উল্লেখ করেন এবং পরে আয্-যুহরীর বর্ণনার রেফারেন্স সহকারে বলেন যে, মা আক্রাউ (مَا اَقْرَءُ) শব্দটি হাদীছে দৃষ্ট হয়, যাহা অবশ্যই অনুবাদ করিতে হইবে, আমি পড়িতে (অথবা আবৃত্তি করিতে) পারি না"। উদাহরণ স্বরূপ এই স্থলে একটি পার্থক্য রহিয়াছে, যেমন অন্যান্য ভাষ্যে বলা হইয়াছে, মা আনা বি কারিইন (مَا اَنَا بِقَارِئٍ) এবং কারণ এই যে, ইব্ন হিশাম মা আক্রাউ এবং মা যা আক্রাউ (مَا اَقْرَاءُ - مَا ذَا اَقْرَءُ) -এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। দ্বিতীয় ভাষ্যটির অর্থ

"আমি কী আবৃত্তি করিব?" ইহা বলিয়া ওয়াট জোর দিয়া উল্লেখ করেন, "পরে উল্লিখিত ভাষ্যটির অর্থ অধিক বাস্তবসম্মত, প্রথমে উল্লিখিত 'মা আক্‌রাউ'-এর তুলনায়"। এই বর্ণনার সমর্থনে তিনি হাদীছ বর্ণনাকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, "ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, পরবর্তী কালের মুহাদ্দিছগণ উল্লিখিত শব্দসমূহের স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত অর্থ পরিহার করিয়াছেন"। এই মতবাদ তুলিয়া ধরার জন্য বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ লিখিতে পারিতেন না যাহা ছিল কুরআন শরীফের অলৌকিক প্রকৃতির প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ"।[৫৬] তিনি এই সম্পর্কে আত্-তাবারীর তাফসীরে প্রদত্ত আবদুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদের বর্ণনাও উদ্ধৃত করেন।[৫৭] তিনি বলেন যে, মূল পাঠ-এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন যে, মা (مَا) শব্দটি 'কী' (what) অর্থে লওয়া হইয়াছে। কেননা ইহার পূর্ববর্তী শব্দ হইল "এবং"।

ওয়াট তখন দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বেল্-এর ধারণা পুনরুল্লেখ করেন যে, 'কারাআ' এবং 'কুরআন' (قُرْاٰنٌ-قَرَأَ) শব্দ সিরীয় খৃস্টানদের ধর্মীয় শব্দাবলী হইতে লওয়া হইয়াছে এবং কুরআন শব্দের অর্থ "পড়া, পাঠ করা" এবং "ধর্মশাস্ত্র পাঠ"।[৫৮] ইহা বলার পর ওয়াট আরও বলেন যে, 'ইকরা' (اِقْرَأْ) ক্রিয়াটির পরবর্তী শব্দরূপের অর্থ 'পড়'। এই সূরায় সম্ভবত ইহার অর্থ "স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করা বা পড়া"। যেমন এমন স্মৃতি হইতে যাহা আলৌকিকভাবে তাঁহার নিকট অবতীর্ণ করা হইয়াছে।[৫৯]

ইহার পর ওয়াট তাহার এই উপ-শিরোনামের আলোচ্য বিষয়ের শেষ অনুচ্ছেদে বলেন যে, মুসলিম পণ্ডিতদের সার্বজনীন ধারণার ব্যাপারে কোন কার্যকর আপত্তি নাই যে, "ইহাই কুরআনের ওহীকৃত প্রথম সূরা"। তিনি তখন ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, এই সূরা "প্রার্থনা করার একটি নির্দেশনা" এবং তিনি বেল্-এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করিয়া (যিনি বলেন যে, সূরাটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় অনুসারী একত্র করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন) বলেন যে, "ইহা সম্ভবত একটি ভাল পর্যায় বা সময় ছিল, যখন তিনি ইহা অন্যদের নিকট প্রচার করিতে শুরু করেন"। তাহা সত্ত্বেও ওয়াট দৃঢ়তা সহকারে বলেন, এই সম্ভাব্যতা কোনক্রমেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতোমধ্যে আরও বাণী লাভ করিয়াছিলেন যাহা তিনি কুরআনের অংশ হিসাবে গণ্য করেন নাই। হাদীছে ইহার একটি উদাহরণ রহিয়াছে, "আপনি আল্লাহ্র রাসূল"।[৬০]

এক্ষণে প্রথম আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইহা পরিষ্কার যে, ওয়াট এই সম্পর্কে যাহা কিছু বলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল ইহা নস্যাত করা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়িতে বা লিখিতে জানিতেন না। তাঁহার লেখা-পড়া না জানার বিষয়টি এবং প্রাচ্যবিদদের এই সম্পর্কিত ধারণা ইতোমধ্যে আলোচিত হইয়াছে।[৬১] এই ব্যাপারে এইখানে কেবল ইহাই বলা যায় যে, পরবর্তী কালের মুহাদ্দিছগণের যুক্তি প্রদর্শনের বিষয় পরিহার করা হইয়াছে যেখানে 'মা আক্‌রাউ' শব্দের "'স্বাভাবিক অর্থ" করা হইয়াছে যাহা সম্পূর্ণ অন্যায্য। ইহাও সত্য নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

লেখাপড়া না জানা সম্পর্কিত তথাকথিত মতবাদ পরবর্তী কালের উদ্ভাবন। পবিত্র কুরআন এই সম্পর্কে বলে ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذاً لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ .

"তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে" (২৯ ঃ ৪৮)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লেখাপড়া না জানা সম্পর্কিত "মতবাদ"কে কি বলা হয়, অনুরূপভাবে ইহার উপর ভিত্তি করিয়া এবং কুরআনের অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনার ভিত্তিতে বলা হয় এবং ইহা পরবর্তী কালের উদ্ভাবন নহে। তদুপরি ইহা বলা সঠিক নহে যে, পরবর্তী কালের মুহাদ্দিছগণ শব্দসমূহের তথাকথিত স্বাভাবিক অর্থ পরিহার করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই বিভিন্ন ভাষ্য বিবেচনা করিয়াছেন এবং ভাষ্যগুলির অর্থের নির্দেশ করিয়াছেন। ওয়াট শব্দসমূহের স্বাভাবিক অর্থের ব্যাপারে যে জিদ করিয়াছেন তাহার সম্ভবত দুইটি ভাষ্যে উদ্ধৃত 'মা' (مَا) শব্দটি 'না'বোধক নাকি 'প্রশ্নবোধক' এই ব্যাপারে তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন।

ওয়াট তাহার প্রথম অনুচ্ছেদে যাহা বলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'ইক্‌রা' শব্দের মূল উৎস ও অর্থ সম্পর্কে তাহার আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা এই প্রশ্নের উপর আলোচনা দীর্ঘ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না, যে প্রশ্নের ভাষ্যে বলা হইয়াছে—ইক্‌রা' এবং 'কুরআন' শব্দ দুইটি সিরীয় খৃস্টানদের ধর্মীয় শব্দভাণ্ডার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এমনকি বেল-এর মতে যাহাকে ওয়াট উদ্ধৃত করেন, 'কুরআন' অর্থ "পড়া" অথবা "ধর্মীয় পাঠ"। কিন্তু যদি, যেমন ওয়াট আমাদের বিশ্বাস করাইতে চাহেন, 'ইক্‌রা' ক্রিয়াপদ একমাত্র পরবর্তীতে "পড়" অর্থে আসে এবং যদি এই সূরা আল-'আলাক-এর আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ আকারে বলা হয় "পড়ুন আপনার স্মৃতি হইতে" যাহা অতিপ্রাকৃতভাবে তাহার নিকট অবতারিত হইয়াছিল। পরে ওয়াট-এর পূর্বের সকল মন্তব্য, বিশেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লেখাপড়া না জানা এবং মুহাদ্দিছগণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন, এই উভয় বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ পড়া অথবা লেখার সক্ষমতার প্রয়োজন হয় না, যদি স্মৃতি হইতে কেবল আবৃত্তি করার কাজ হয়। সুস্পষ্টরূপে ওয়াট প্রথমে ধারণা করেন, পড়ার অর্থকে ক্রিয়া হিসাবে গণ্য করেন এবং ঐ ভিত্তিতে তাহার উপরোল্লিখিত মন্তব্য করেন। পরে তিনি তাহার অবস্থান পরিবর্তন করেন, শব্দের ঐ অর্থ বাতিল করেন এবং এই ধারণা দেন যে, ইহা কেবল স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করার নির্দেশ-এর অর্থ বুঝায় ইত্যাদি। পুনরায় বলা যায়, তিনি ইহা ব্যাখ্যা করেন নাই যে, কখন এবং কিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ সূরা 'ইকরা'-এর মাধ্যমে যোগাযোগের পূর্বে অতিপ্রাকৃতিক অবতরণ গ্রহণ করেন এবং ইক্‌রা সূরার পূর্বের সম্ভাব্য ঐ সূরাগুলি কি ছিল অথবা সূরাসমূহের জন্য কি সংবাদ ছিল এবং সেইগুলি কি আবৃত্তি করার প্রয়োজন ছিল? সুস্পষ্টরূপে ওয়াট এইখানে যাহাকে "দৃশ্য" (the vision) বলা হইয়াছে

তাহার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ওহী লাভ করিয়াছিলেন তাহার সেই পুরানো ধারণার পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছা করেন।

কিন্তু পুনরায় আরেকবার ওয়াট তাহার তৃতীয় অনুচ্ছেদে কিছুটা বিরোধিতা করেন যাহা তিনি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেও বলেন। তিনি বলেন যে, এই ধারণার ক্ষেত্রে কোন কার্যকর আপত্তি নাই যে, সূরা ইক্‌রা ছিল কুরআনের সর্বপ্রথম ওহীকৃত অংশ। এই বিবরণের কঠোর অনুষঙ্গ এই পরামর্শ বাতিলের প্রয়োজন বলিয়া মনে করে। কারণ সেইখানে বলা হইয়াছে যে, সূরা ইক্‌রা-এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অন্য সূরা নাযিল হইয়াছিল, ওয়াট তাহার এই শেষ বর্ণনার ব্যাপারে উত্থাপিত সমস্যার কথা মনে হয় স্বীকার করেন। অতঃপর তিনি তাহার আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষদিকে দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, "মুহাম্মাদ ﷺ ইতোপূর্বে অবশ্যই অন্যান্য সংবাদ প্রাপ্ত হন, যেগুলিকে তিনি কুরআনের অংশ হিসাবে গণ্য করেন নাই"। যেমন উহার একটি উদাহরণ নিম্নোক্ত শব্দসমূহ, "আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল"।[৬২] এই শেষ বক্তব্যটি আলোচ্য বিষয়টিকে কেবল ভিন্ন পথে সরাইয়া নেওয়ার প্রচেষ্টামাত্র। এইখানে 'ইকরা'-পূর্ব অন্য সূরা প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা অথবা সূরা ইক্‌রা-পূর্ব সংবাদ যাহা কুরআনের অংশবিশেষ গঠন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সূরা ইকরা-এ স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করার জন্য বলা হয় এবং এই সম্পর্কে নহে, যে ক্ষেত্রে ওয়াট নিজে ইহাকে (ইকরা-পূর্ব সংবাদ) কুরআনের অংশ নহে বলিয়া স্বীকার করেন। তদুপরি যদি ওহী, যেমন তিনি ও তাহার শিক্ষক বেল্ মনে করেন, কেবল বাস্তব চরিত্রের জন্য "উদ্বুদ্ধকরণ" বা "পরামর্শ" হইত যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতপক্ষে অনুসরণ করেন এমনভাবে যে, যাহা হইতে এমন কিছু বাহির হয় না, যে প্রণোদনায় "তিনি স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতে পারেন"। যাহা হউক এই বিরোধিতার পরিণতিতে পরবর্তী দুই পৃষ্ঠায় লিখেন, যেখানে ওয়াট বলেন যে, "দৃশ্য" (vision) এবং এই সম্বোধন "আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল" এই দুইটি ঘটনা "মূল আহবানের" প্রায় তিন বৎসর পর সংঘটিত হইয়াছিল।[৬৩] যেমন (ওয়াট এইখানে বলেন) এই বর্ণনাটি আয্-যুহরীর বর্ণনায় ওয়াট তাহার প্যারা B-এ বর্ণনা করেন।

ছয় ঃ সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ঃ বিরতি কাল

ওয়াট এখন তাহার ৫ম উপ-শিরোনামের উপর আলোচনা করেন। তিনি তাহার অনুচ্ছেদে জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ আল্-আনসারী (রা)-র বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করেন। সেই হাদীছে বলা হইয়াছে, আল্-মুদ্দাছ্ছির-এর প্রথম আয়াত ছিল প্রথম নাযিলকৃত ওহী। ওয়াট বলেন যে, ইহা কেবল এমন হইত যে, "যদি মুহাম্মাদ ﷺ কোন প্রস্তুতিকাল ছাড়া তাঁহার কোন প্রকাশ্য দীনের দাওয়াত দিতে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করিতেন"। কেননা এই সূরা নিম্নবর্ণিত শব্দ সম্বলিত যেমন, "উঠ এবং সতর্ক কর", যে ক্ষেত্রে সূরা ইক্‌রা এই ধরনের কোন নির্দেশনা-সম্বলিত নহে এবং এইজন্য পরোক্ষভাবে প্রকাশ্য দীনের দাওয়াতের কথাও বুঝায় না।

. সুতরাং তিনি লক্ষ্য করেন যে, "অত্যন্ত সম্ভাব্য ধারণা" হইল, এই সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির-এর আয়াত দ্বারা প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াতের সূচনা হয়। এই বিবরণের সমর্থনে তিনি ইব্ন ইসহাকের উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার তিন বৎসরের মিশন সম্পন্ন করার পর আল্লাহ্র নিকট হইতে তাঁহার কাছে যাহা আসিয়াছিল সেই বিষয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশিত হইয়াছিলেন।[৬৪] ওয়াট অপর একটি প্রমাণ হাদীছের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেন। ঐ হাদীছে বলা হয় যে, প্রথম তিন বৎসরের জন্য ফেরেশতা "আস্রাফিল" (ইসরাফীল), ওয়াট-এর শাব্দিক উচ্চারণ মতে, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী আনয়নের "মাধ্যম" হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সম্পর্কে ওয়াট 'ফাত্রাহ্' (ওহী অবতরণে বিরতি)-এর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, আয্-যুহ্রী এই ফাতরাহ-এর কথা উল্লেখ করিয়া এই হাদীছের সমন্বয় সাধন করেন এই ধারণার মাধ্যমে যে, সূরা আল-'আলাক প্রথম নাযিল হয়।[৬৫] ওয়াট কর্তৃক দীনের প্রকাশ্য দাওয়াত ও অপ্রকাশ্য দাওয়াত-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সুস্পষ্টভাবে মুসলিম পণ্ডিতদের নবুওয়াত (Call to Prophethood)এবং রিসালাত (Commission to preach)-এর মধ্যে পার্থক্যকে ভিত্তি করিয়াই করা হইয়াছে। মুসলিম পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামতও কম-বেশী সর্বসম্মতভাবে এই বলে যে, সূরাতুল মুদ্দাছ্ছির-এর প্রথম আয়াত রিসালাতের সূচনা নির্দেশ করে। কিন্তু এই পার্থক্যের নির্দেশকে ইব্ন ইসহাক প্রকাশ্য প্রচার সম্পর্কে যাহা বলেন, সেই ব্যাপারে এবং ইসরাফীল সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা নবুওয়াত ও রিসালাতের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে করা হয় নাই, বরং এমনভাবে করা হইয়াছে যাহা তিনি প্রাথমিক সময়ে এমন ধারণায় করিয়াছেন, যাহা সহজে নজরে পড়ে না অথবা গোপন প্রচারের মাধ্যমে যাহার অনুবর্তীতে প্রকাশ্য প্রচারকাল শুরু হয়। প্রচারের কাজ উভয় সময়ে প্রকাশিত হয়। তিনি সূরাতুল মুদ্দাছ্ছির -এর নাযিল হওয়ার সঙ্গে তাহার বর্ণনাকে সম্পৃক্ত করেন না, বরং কুরআনের অপর দুইটি সূরার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন।[৬৬] ইহা বলা উচিত যে, তাহার প্রাথমিক সময়কালের বৈশিষ্ট্য, যাহা গোপন প্রচারকাল, ইহা কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করিয়া নহে, বরং একটি অস্পষ্ট প্রামাণ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া, "যাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি" (فِيْمَا بَلَغَنَا)। তাহার বর্ণনার উভয় উদ্দেশ্য যেমন প্রচারের প্রাথমিক সময়ের ধরন এবং ইহার প্রলম্বিত অবস্থা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর আলোকে পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন।[৬৭]

ওয়াট ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে একটি ভুল করেন। যেমন অপ্রকাশ্য দাওয়াত এবং প্রকাশ্য দাওয়াত কাহাকে বলে, ইহার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে তিনি ভুল করেন। এই চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে উত্থাপিত অসুবিধা মনে হয় তিনি বুঝিতে পারেন। তাই তিনি বলেন যে, দুইটির মধ্যে অর্থাৎ অপ্রকাশ্য(non public) দাওয়াত এবং প্রকাশ্য দাওয়াত (public ministry)-এর মধ্যে পার্থক্যকরণ অত্যন্ত দুরূহ। যেহেতু প্রথম দীক্ষাগ্রহণকারীরা প্রথম সময়কালের মধ্যেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে কোন অসুবিধা নাই। অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে ওয়াট-এর নিজের ত্রুটিপূর্ণ চিহ্নিতকরণের কারণে এবং বৃহত্তর অর্থে

প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক পরিভাষা নবুওয়াত ও রিসালাত-এর অসতর্ক ইংরেজী অনুবাদ 'অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য দাওয়াত' করার কারণে। ইহা বলা প্রয়োজন যে, নবুওয়াত শব্দের অর্থ দাওয়াত নহে। এই পরিভাষার ব্যবহারে যে খৃষ্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষাসমূহকে ইসলামিক পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি রহিয়াছে তাহারই দৃষ্টান্ত বহন করে।

এই সম্পর্কে হাদীছে ইসরাফীলের উল্লেখ যথাযথ নহে। আলোচ্য হাদীছটি যাহাই হউক, প্রশ্ন হইল ইহার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? হাদীছটি নবুওয়াত ও রিসালাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর ব্যাপারে সম্পর্কিত নহে, এমনকি গোপন প্রচারের সময়কাল বলিতে কি বুঝায় তাহাও নির্দেশ করে না। ইহা বর্ণনাকে বিভ্রান্ত করে, যেমন ওয়াট করিয়া থাকেন, ফেরেশতা ইসরাফীল মধ্যস্থতা করিতেন অর্থাৎ তিনি তাঁহার মিশনের প্রথম তিন বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সংবাদ বহন করিতেন, ওহী নিয়া অসিতেন। হাদীছের মূল পাঠ কেবল ইহাই বলে যে, ইসরাফীল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে 'সংযুক্ত' ছিলেন। ঐ ফেরেশতা যে কোন ওহী লইয়া আসিতেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার বিপরীতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী আসার পূর্বে ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন (قَرَنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُوْحٰى اِلَيْهِ)।[৬৮] যাহা হউক, হাদীছটি মুরসাল অর্থাৎ ইহার বর্ণনাধারা (সনদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। আল্-ওয়াকিদী যিনি এই হাদীছ উল্লেখ করেন পর্যায়ক্রমিক বর্ণনায় বলেন যে, ইহা নির্ভরযোগ্য নহে।[৬৯]

এইভাবে "অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য দাওয়াত"-এর মধ্যকার পার্থক্যের কথা বলার পর ওয়াট আল-মুদ্দাছ্‌ছির শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শব্দটি সাধারণত এই অর্থে লওয়া হয় ঃ 'দিছার বা দাছার জড়ানো' অর্থাৎ "কম্বলে/আলখিল্লায় মোড়ানো" অর্থাৎ ইহা একটি আলখিল্লা বিশেষ এবং ইহার সঙ্গে ওহী প্রাপ্তির সম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন এরূপ তিনি লক্ষ্য করেন, মোড়ানোর কাজটি হয় ওহীর জন্য প্ররোচিত করে নতুবা অধিকতর সম্ভাব্যতা এই যে, ইহা স্বর্গীয় দূতের আগমনের বিপদ হইতে গ্রহণকারী ব্যক্তিকে রক্ষা করে। অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে ইহা বলা উচিত যে, কোন হাদীছেই মোড়ানোর কাজ বর্ণিত হয় নাই, যাহার অর্থ বলা হইয়াছে "ওহীর জন্য প্ররোচিত করা" অথবা "স্বর্গীয় উপস্থিতির বিপদ হইতে গ্রহণকারী ব্যক্তিকে রক্ষা করা"। ওয়াট সাধারণভাবে এই পরিভাষাটি বিকৃত করিয়াছেন, ইহার মধ্যে "ওহীকে প্ররোচিতকরণ' তত্ত্বের এবং "আল্লাহ্র দর্শন" তত্ত্বের আমদানী করার জন্য।

ওয়াট-এর আল্-মুদ্দাছ্‌ছির-এর রূপক শোভিত অর্থ সম্পর্কিত ধারণা অধিকতর অদ্ভুত। তিনি বলেন যে, ইহার অর্থ "এমন একজন দুর্বোধ্য মানুষ এবং যাহার খ্যাতি নাই" এবং তিনি এই প্রয়োগের সারমর্মে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন, তাহার কথিত বক্তব্যের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলেন, "এমন স্ট্যাণ্ডার্ড যাহা ধনী মক্কাবাসিগণের নিকট বিচার্য ছিল"। রাসূলুল্লাহ ﷺ "তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন"।[৭০] উল্লিখিত বিষয় সুস্পষ্টভাবে কুরআনের

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যাহা دُثُورٌ (দাছূর)। এই শব্দরূপ কোন কোন সময় অখ্যাত ব্যক্তির অর্থ বহন করে।[৭১] কিন্তু ইহা হইবে ভাষার নিয়ম-কানূনের লঙ্ঘন মাত্র। বিশেষ করিয়া একটি ধারণাকে অন্য একটি ধারণায় উৎপন্ন করা, যেমন মুদ্দাছছির। স্ট্যাণ্ডার্ড কোন আরবী অভিধানেই এই শব্দরূপের এমন অর্থ করা হয় নাই। তদুপরি ইহা সাধারণ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত যে, উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ তাঁহার রাসূল ﷺ -কে এই ধরনের মানহানিকর পরিভাষায় সম্বোধন করিবেন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পরিভাষা তাঁহার নিজের প্রতি প্রয়োগ করিবেন।

এইভাবে তিনি অপ্রকাশ্য (non public) এবং প্রকাশ্য দাওয়াত (public ministry)-এর আলোচনা ফাত্‌রাহ্ (বিরতি) এবং আল্-মুদ্দাছছির-এর অর্থ সম্পর্কে ওয়াট নিম্নবর্ণিত "চিত্র"-এর সারমর্ম পেশ করেন। তিনি বলেন যে, তখন মুহাম্মাদ ﷺ রাসূল হিসাবে তাঁহার ক্যারিয়ার গঠনের প্রস্তুতির পর্যায়ে ছিলেন। এই সময়কাল তিন বৎসর স্থায়ী ছিল। এই সময়কালে তিনি সূরাতুল 'আলাক-এর প্রথম অংশ, সূরাতুদ দুহা এবং "অধিকতর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ" অন্যান্য ওহী প্রাপ্ত হন। ওয়াট পুনরায় এইখানে হাদীছে ইসরাফীল উল্লেখ করেন। তিনি তখন বলেন যে, ফাত্‌রাহ্ (বিরতি) এই সময়কালের শেষদিকে সংঘটিত হয় এবং উহার পরে "দৃশ্যাবলী" (visions) অথবা এই সম্পর্কে প্রথম দৃশ্য সংঘটিত হয়। অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র রাসূল " এই উপাধি প্রদান এবং সূরাতুল মুদ্দাছ্‌ছির-এর অবতরণ একসঙ্গে সংঘটিত হয়।[৭২]

এইভাবে ওয়াট সম্পূর্ণরূপে, যাহা তিনি যেইভাবে শুরু করিয়াছিলেন, তাহা উল্টাইয়া দেন। তিনি এই বলিয়া শুরু করেন যে, 'আর্-রু'ইয়া আস্-সাদিকা' হেরা-পূর্ব সময়ের ঘটনা ছিল যাহা "দৃশ্য" (vision)-এর অনুরূপ ছিল, যেমন এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেন। পরে ওয়াট বলেন যে, হেরায় প্রত্যক্ষ "দৃশ্য" (vision) যাহা আয্-যুহরীর বর্ণনার প্যারা 'B'-এ বর্ণনা করা হয়, ইহা ছিল "আল্লাহ্‌র দর্শন"। কারণ অন্যান্য বস্তুর মধ্যে ঐ সম্পর্কিত বর্ণনায় আল্-হাক্ক-এর উল্লেখ ছিল। তখন তিনি বলেন যে, প্যারা 'B' মূল আহ্‌বান (original call) বর্ণনা করে এবং এই অর্থ প্রকাশ করে যে, "দৃশ্য"(vision) ছিল আহ্‌বান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। পরবর্তী সময়ে ইহা সংঘটিত হয় এবং ইহার মর্মার্থ ছিল কতক সাধারণ। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নূতন অবস্থান পুনরায় জোর দিয়া বলেন এবং তাঁহাকে এই প্রত্যয় জ্ঞাপন করেন যে, "সূরাসমূহ ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সংবাদ"। তাহা সত্ত্বেও তাহার " দৃশ্য" (vision) -এর মর্মার্থের ভিত্তিতে ওয়াট বলেন যে, ইহা প্যারা B-এর সঙ্গে ভালভাবে মানানসই। এইভাবে পুনরায় এই অর্থ প্রকাশ করে যে, ঐ প্যারার বিষয়বস্তু হইল "দৃশ্য" (vision) এবং ইহা ছিল "মূল আহবান"-এর আনুষঙ্গিক বিষয়। ইহার ভিত্তিতে তিনি জোর দিয়া বলেন, কিছুদিন পূর্বে এই সম্বোধন "আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল" ছিল কুরআন বহির্ভূত ওহী যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ইকরা নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রাপ্ত হন এবং এক্ষণে ওয়াট সম্পূর্ণরূপে মত পরিবর্তন করিয়া বলেন যে, যদিও "প্রথম" দৃশ্য রাসূল হিসাবে তাঁহার নবুওয়াতী জীবনের ক্যারিয়ারের তিন বৎসর পর সংঘটিত হয় এবং তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উপাধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ এই যোগাযোগ "আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল" সূরা ইকরা নাযিলের পূর্বে সংঘটিত হয় নাই, বরং ইহার অনেক পরে।

এই সন্দেহ এবং অসঙ্গতি সহজে পরিহার করা যাইতে পারে যদি ওয়াট তাহার মন প্রথম হইতে এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য নিবদ্ধ না করিতেন যে, তথাকথিত "দৃশ্য" (vision)-ও ওহীর মত যাহা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনোগত ও বুদ্ধিগত বিষয়। এই উদ্দেশ্যের জন্য ওয়াট আয্-যুহ্‌রীর ক্রমাগত বর্ণনাকে কৃত্রিম অনেক প্যারায় বিভক্ত করেন এবং অন্যান্য আরও কৌশলের মধ্যে একটি এই যে, তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দাওয়াতে সমীকরণ করেন, পূর্বের বিষয়টিকে তথাকথিত গোপন প্রচারকালের সঙ্গে চিহ্নিত করেন যাহা ইবন ইসহাক কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইসরাফীলের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী হওয়ার সময়কালের সন্দেহপূর্ণতার সঙ্গেও তিনি সমীকরণ করেন। ইহা এই ভুল চিহ্নিতকরণের কারণে যে, ওয়াট ইহার প্রকৃত ধরন বুঝিতে খুব অসুবিধা বোধ করেন, যে কারণে তিনি ইহাকে অপ্রকাশ্য দাওয়াতের সময়কাল বলিয়া অভিহিত করেন। কারণ সেইখানে ছিল "কিছু বৈপরীত্য এইজন্য যে, মুহাম্মাদ ﷺ জনসাধারণ্যে এই দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। এবং তাহার নিজের সৃষ্ট অসুবিধার কারণে ওয়াট সন্দেহপূর্ণতাকে বরণ করিতে অগ্রসর হন, যাহা অতিমাত্রায় আরোপিত হইয়াছে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের হাদীছ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহে"।[৭৩] যদি ওয়াট অপব্যাখ্যা না করিতেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, বর্ণনাসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও "আহবান" (the call) এবং "দৃশ্য" (the vision) ক্রমাগতভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, কুরআনের ওহী ছিল সুনির্দিষ্ট মূল পাঠ-এর শাব্দিক অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম। ওহী আগমনে ফাত্‌রাহ (বিরতি) অথবা সাময়িক ও আকস্মিক বিরতি ওহী নাযিল হওয়ার প্রাথমিক কালের একটি ঘটনা মাত্র। এই ধরনের বিরতি বৎসরকাল ধরিয়া চলে নাই, বরং কয়েক দিন বা সপ্তাহ ধরিয়া চলে, যেমন তিনি নিজে ইহা স্বীকার করেন[৭৪] এবং রিসালাত অথবা ধর্ম প্রচারের মিশন এবং সূরা আল্-মুদ্দাছ্ছির নাযিল হওয়া এবং অন্যান্য সূরা নাযিল হওয়ার ঘটনা মূল আহবানের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার খুব বেশী দিন পরে সংঘটিত হয় নাই। এইভাবে কোন বৈপরীত্য সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই যাহা ওহী নাযিলের প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল অথবা অনুরূপ কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুওয়াতী জীবনে ঘটিয়াছিল।

সাত ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভয় ও হতাশা

ইহার পর ওয়াট উল্লিখিত ৬ষ্ঠ উপ-শিরোনামের আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি এই বলিয়া শুরু করেন, "এই প্যারাগুলি আয্-যুহ্রী হইতে"। তিনি দুই ধরনের ভয় ও হতাশার কথা বলেন ঃ "প্রথমে ভয়ের কথা, তাঁহার সম্মুখে মহান সত্তা আল্লাহ্র প্রকাশিত হওয়া বা উপস্থিতির কারণে ভয় (C. F. J) এবং হতাশা, যাহা তাঁহাকে আত্মহত্যার চিন্তার দিকে লইয়া যায়" (D, I)।[৭৫]

ওয়াট-এর ব্যাপারে আরও সম্মুখে আগ্রসর হওয়ার পূর্বে এই বিষয়ে অন্যান্য বর্ণনা আরম্ভ করার সময় ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, প্যারাসমূহ, যদিও এইগুলি নিঃসন্দেহে "ভয়" সম্পর্কে বলা হয়, ইহা কোনক্রমেই মহান সত্তা আল্লাহ্র উপস্থিতি অথবা আবির্ভাবের কথা বুঝায় না। উদাহারণ স্বরূপ প্যারা 'J', যাহা ওয়াট এইখানে এমনভাবে উল্লেখ করেন যেমন ইহা মহান সত্তার (আল্লাহ) প্রকাশিত বিষয়টি নির্দেশ করিতেছে। দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বলেন, যাহা ওয়াট-এর নিজস্ব অনুবাদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হইল, "...আমি ফেরেশতাকে দেখিলাম, যিনি আমার নিকট হেরায় আসিতেন, একটি সিংহাসনে (কুরসী) উপবিষ্ট অবস্থায়। সিংহাসনটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ব্যাপিয়া ছিল। আমি তাহার ভয়ে ভীত হইলাম"।[৭৬] সুতরাং ইহা ছিল ফেরেশতা দর্শন, আল্লাহ তা'আলার দর্শন নহে যাহা ভয়ের কারণ ছিল। ইহা প্রমাণ বা নজীরস্বরূপ উল্লেখ করিলে স্পষ্টত অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে অর্থাৎ "প্রকাশিত হওয়া" অথবা "উপস্থিতির" স্বপক্ষে প্যারাসমূহকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা অসঙ্গতিপূর্ণ হইবে এবং তখন প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ প্যারা-এর স্পষ্ট বর্ণনাকে উপেক্ষা করিয়া বলা যে, যে সত্তা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা অন্য কিছু ছিল।

দ্বিতীয়ত, সূরাতুন নাজ্ম-এর আয়াত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া ওয়াট বলেন, যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর চক্ষু "তাঁহার প্রভুর অন্যতম বৃহত্তম চিহ্ন" দেখিতে পাইল তখন তাঁহার "হৃদয় প্রতীকী বস্তু উপলব্ধি করিল"। আমরা পূর্বেই এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভুল চিহ্নিত করিয়াছি। কিন্তু ওয়াট-এর নিজস্ব স্বীকারোক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার চক্ষু দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ছিল আল্লাহ্র নিদর্শন বা "প্রতীক", আল্লাহ নিজে নহেন। ইহা ছিল এই বিষয়ের বাহ্যিক দিক, আল্লাহ্র নিদর্শনের এই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ফেরেশতার দর্শন, যাহা ভয়ের কারণ। সর্বোপরি যাহা আধ্যাত্মিক অথবা বুদ্ধিভিত্তিক বা যাহা হৃদয় উপলব্ধি করে তাহা ভয়ের বস্তু হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, বেল এবং ওয়াট বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী লাভের পর ভুলক্রমে দাবি করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র "দর্শন" লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার অবস্থান সংশোধন করিয়া কেবল সূরা নাজ্ম-এ নহে, বরং সর্বত্রই এই ধারণা পোষণ করেন যে, মানবীয় দৃষ্টি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। যদি ইহা তাহাই হইত তবে তিনি পরবর্তী সময়ে তাহা কোনক্রমেই এই ধারণা দিতে পারিতেন না যে, তিনি আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন।

এক্ষণে আয্-যুহরী হইতে বর্ণিত প্যারা, যেগুলিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর অথবা অন্য কাহারও বর্ণনা হিসাবে গণ্য করা হয়, সুস্পষ্টরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক কথিত অবস্থান পরিবর্তনের পরের ঘটনা। এই সময় হইতে হযরত আয়েশা (রা) এবং পরবর্তী কালের অন্য কোন বর্ণনাকারী বলিতে পারেন না যে, দর্শন (vision) কোনভাবেই আল্লাহ্র। এই প্যারা-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এইরূপ ধারণা দেওয়া (আল্লাহ্র দর্শন) একান্তই কাল নিরূপণে ভ্রান্তিমূলক।

ওয়াট-এর অন্যান্য বর্ণনা সম্পর্কে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ভয়ের কারণ সম্বলিত এই প্রশ্ন সম্পর্কে বলা যায় যে, মহান সত্তার আবির্ভূত হওয়া অথবা উপস্থিতির কারণে মুহাম্মাদ ﷺ -এর মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি বলিয়া ওয়াট বলেন যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের (আদিপুস্তকের) প্রত্যয়ন অনুসারে মাহান সত্তার নিকট উপস্থিতির ভয়ের একটি গভীর বদ্ধমূল ধারণা সেমেটিক ধ্যান-ধারণায় বিদ্যমান আছে। 'C' এবং 'J' প্যারা এই ভয়ের কথা উল্লেখ করে। "মূলত মনে হয়" তিনি মন্তব্য করেন যে, সূরা আল-মুযযাম্মিলের (৭৩ ঃ ১) শব্দের ব্যাখ্যায় এই ভয়ের উল্লেখ রহিয়াছে এবং এইগুলি ধারণা দেয় যে, "পরবর্তী তাফসীরকারগণ কেবল কুরআনের সমর্থনে ভয়ের উপস্থিতির সিদ্ধান্ত দেন এবং কুরআন ব্যতিরেকে এই সম্পর্কে আর কোন তথ্য নাই"।[৭৭] ওয়াট পুনরায় বলেন যে, অপ্রতিভ সংক্রমণ মুযযাম্মিল হইতে মুদ্দাছ্ছির পর্যন্ত এই বুঝায় যে, তাফসীরকারগণ আল্-মুয্যাম্মিলের সংশ্লিষ্টতার সিদ্ধান্ত দেয় যাহা মূলত মুহাম্মাদ ﷺ -এর 'আহবান'-এর বর্ণনার অনুরূপ ছিল না। যদি এই ক্ষেত্রে ওয়াট যুক্তি প্রদর্শন করেন, "ইহা মনে হয় এইসব পরবর্তী তাফসীরকারগণ স্বাভাবিক, মুয্যাম্মিলকেও এই ব্যাখ্যার আওতায় লইয়াছেন। এই ভয় হইল মহান সত্তার অবির্ভাবের কারণে এবং ইহা ছিল ব্যাপক" এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ "সম্ভবত ইহা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন"।[৭৮]

এক্ষণে ওয়াট বলেন যে, পরবর্তী সময়ের ব্যাখ্যাকারগণ এই সিদ্ধান্ত দেন যে, "ভয়ের উপস্থিতি কুরআন হইতে এবং কুরআন ব্যতিরেকে এই সম্পর্কে আর কোন তথ্যসূত্র নাই"। যাহা হউক, ভয় সম্পর্কে কুরআনে কোন নির্দেশনা না থাকুক। সূরা আল-মুয্যাম্মিল এবং সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির সহ সকল সূরা এই নির্দেশনা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইসব উপাধি দ্বারা সম্বোধিত হন এবং হয় ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া রাত্রে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য অথবা উঠিয়া মানুষকে সর্তক করার জন্য ইত্যাদি। এমকি সূরাতুন-নাজ্ম, যে সূরা দর্শন-এর কথা বলে, এই সূরায়ও এমন কোন নির্দেশনা নাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও সময়েই ভয়ে ভীত ছিলেন। কিভাবে পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ তখন এই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন যে, ভয়ের উপস্থিতি কুরআন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, যদি তাহারা "কুরআন ব্যতিরেকে এই ব্যাপারে কোন তথ্য না পাইয়া থাকেন"? প্রকৃত বিষয় এই যে, এইখানে ওয়াট সন্দেহাতীতভাবে রিচার্ড বেল্-এর ধারণা এড়াইয়া যান যে, কুরআনের বর্ণনা ব্যাখ্যা করার জন্য পরবর্তী যুগে হাদীছসমূহ উদ্ভাবন করা হয়। একই সময়ে ওয়াট ভয়ের ঘটনার উপর তাহার মন্তব্য পান। এই সংক্রান্ত তথ্য কেবল হাদীছের মাধ্যমেই সরবরাহ করা হয়, কুরআনের মাধ্যমে নহে। যাহা হউক, ওয়াট-এর যুক্তিসমূহ

প্রতারণাপূর্ণ এবং চক্রাকারে আবর্তিত। ইহা ছিল পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ যাহাদের ভয় সম্পর্কিত বিষয়ে কোন তথ্য জানা ছিল না। যিনি এই সম্পর্কে কুরআন হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর "আহবান" সংক্রান্ত বর্ণনার মধ্যে মুযযাম্মিল বক্তব্য সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তাহারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত দান করেন, "মহান সত্তার প্রচণ্ডতার ভয়" অবশ্যই "বিস্তৃত ও ব্যাপক" ছিল এবং ইহা যেমন বিস্তৃত ছিল, মুহাম্মাদ ﷺ সম্ভবত ইহার মধ্যে অংশীদার বা প্রভাবিত ছিলেন। সুস্পষ্ট বিষয় এই যে, এইখানে ওয়াট প্রথমে একটি অন্যায্য ও অশুদ্ধ ধারণার অবতারণা করেন এবং তখন ঐ ধারণার ভিত্তিতে পশ্চাদমুখী যুক্তি প্রদর্শন করেন "প্রচণ্ড" ভীতির বহু বিস্তৃতির অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য অথবা মহান সত্তার 'নিকটবর্তিতা' প্রমাণ করার জন্য, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজেরও সম্পৃক্ততা আছে। এইভাবে যুক্তি উপস্থাপন করার পর ওয়াট ইহার ফলে তাহার শিক্ষক বেল্-এর আলোচনার মোড় উল্টাইয়া দেন। কেননা সাম্প্রতিক কালে বেল আমাদেরকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার "অজ্ঞতার কারণে প্রথমিক অবস্থায় "দাবি" করিয়াছিলেন, তিনি আল্লাহ্র দর্শন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ওয়াট এক্ষণে আমাদেরকে বলেন যে, মহান সত্তার প্রচণ্ড উপস্থিতি অথবা নিকট সান্নিধ্যের ধারণা এবং উপস্থিতির ভয় ছিল "বহু বিস্তৃত" এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু ইহাতে অংশগ্রহণ করেন বা প্রভাবিত হন।

যাহা হউক, আমরা এইখানে এতদসম্পর্কিত বিষয়ে আদিপুস্তকের (Old Testament) তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই। আমাদের কেবল ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, ইসলামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে যখন ব্যাখ্যাকারগণ স্বপক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য হাদীছ উদঘাটন করিয়া হাদীছের মাধ্যমে কুরআনের বর্ণনার ব্যাখ্যা করেন, তথাকথিত আদিপুস্তক (Old Testament)-এর ধারণা এবং মহান সত্তার আজমত (মাহাত্ম্য) সম্পর্কে ভয়-এর কথা ইসলামী অঞ্চলে (দেশে) আদৌ প্রচলিত ছিল না, বহু বিস্তৃত তো দূরের কথা। যে কারণসমূহের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ্র দর্শন (vision) সম্পর্কিত ধারণা পোষণ করিতেন না। বিশেষ করিয়া যখন বেল এবং ওয়াট উভয়ে সতর্কতার সঙ্গে বলেন যে, ইসলামিক অর্থোডক্সী (ইসলামী গোঁড়াপন্থীগণ)-এর ধারণা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। কেহই কল্পনার মাধ্যমে তৃতীয় শতাব্দীর এই বিস্তৃত ব্যাখ্যার বিষয়কে ঐ যুগের অব্যবহিত পূর্ব যুগে ব্যাখ্যা করেন নাই।

দ্বিতীয় ধারণা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ "হতাশা" যাহা তাঁহাকে "আত্মহত্যার চিন্তার" দিকে চালিত করে, ওয়াট ইহার সমপর্যায়ের ধারণা খুজিয়া পান "আদিপুস্তকের (Old Testament) রাসূলগণের এবং খৃস্টান সাধুদের জীবন হইতে"। এই সমান্তরাল দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি A. Poulain কর্তৃক Avila-এর St. Teresa-র অনুভূতির অবিকল প্রতিরূপ পুনউপস্থাপন করেন, "যে বাচনভঙ্গি" তিনি প্রাপ্ত হন "শয়তানের নিকট হইতে অথবা কল্পনা হইতে" ইত্যাদি।[৭৯] ওয়াট পরে লক্ষ্য করেন যে, আত্মহত্যার চিন্তা মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি আরোপ করা যাইত না "যদি না তিনি এই বিষয়ে কিছু বলিয়া থাকিতেন যাহা ইহার

জন্য একটি ভিত্তি হইত" এবং অনুরূপভাবে "হতাশ হওয়ার সময়টি ছিল ওহী অবতরণের বিরতিকালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ"।[৮০]

যে উপমা বা উদাহরণ এইখানে ওয়াট উল্লেখ করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থতা বর্জিত। উদাহরণস্বরূপ Avila-এর St. Teresa-র বর্ণনা যাহা তিনি A. poulain-এর রচনা হইতে উদ্ধৃত করেন। এই বর্ণনায় কেবল তাহার (স্ত্রীলিঙ্গ) বিশ্বাস ও সন্দেহের দোলাচলে ঝুলিতে থাকা সম্পর্কে বলা হয়, যেমন এই বক্তব্য (বাচনভঙ্গি) কি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে, শয়তানের নিকট হইতে অথবা কল্পনা হইতে? এবং শেষ পর্যন্ত তাহার কল্পনা এই সিদ্ধান্তে আসে যে, ইহারা (বক্তব্যসমূহ) আল্লাহ্র নিকট হইতে ছিল "যাহা রক্ষা করিতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন"। 'হতাশ' হওয়া যাহা এইখানে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা "বাচনভঙ্গির" মূল বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত। অপরপক্ষে মুহাম্মাদ ﷺ -এর এর হতাশ হওয়ার কারণ, তিনি যে ওহী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার মৌলিকত্বের ব্যাপারে কোনক্রমেই কোন সন্দেহের জন্য ছিল না, বরং একান্তভাবেই তাহা ছিল সাময়িকভাবে ওহী অবতরণ বন্ধ হওয়ার কারণে। তাঁহার বিষয়টি Avila-এর St. Teresa হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ওয়াট কর্তৃক আদিপুস্তকে রাসূলদের বর্ণনার সঙ্গে খৃস্টান সাধুদের সাদৃশ্যপূর্ণ যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বর্তমানে দেখিতে পাই, তিনি চূড়ান্তভাবে এই ধারণা দেন যে, ইসলামিক ওহী খৃস্টান রাসূল ও সাধুদের "উদ্বুদ্ধকরণ"-এর সঙ্গে তুলনীয়। তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে উদ্দীপনা (ধারণাসমূহ) প্রাপ্ত হইতেন এবং পরে তাহা তাহাদের নিজের ভাষায় লিখিয়া ফেলিতেন যাহা তাহারা "উদ্দীপনা"র মাধ্যমে বুঝিতে পারিতেন। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কুরআনের ওহীর ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ওয়াট-এর এই উদ্ধৃতিসমূহ A. poulain-এর রচনা হইতে উল্লেখ করা ছিল আর একটি ধাপ যাহাতে তিনি উক্ত লেখকের ধাচে ইসলামের ওহীকে ফেলা যায়। ওয়াট চূড়ান্তভাবে এই কার্যটিই করেন।

এই সম্পর্কিত বিষয়ের মন্তব্যে বলা হয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই এমন কিছু বলিয়া থাকিবেন যাহা তাঁহার সম্পর্কে আরোপিত আত্মহত্যার চিন্তা করার বক্তব্যটির একটি ভিত্তি তৈরি করে। ইহা ইতোমধ্যে বলা হইয়াছে যে,[৮১] আয-যুহরীর এই বর্ণনা তাঁহার পক্ষ হইতে একটি অনুমান মাত্র। এমনকি ওয়াট নিজে এই কথার স্বীকৃতি দিয়াছেন যে, ফাত্রাহ (ওহী অবতরণে বিরতি) সম্পর্কে আয্-যুহরীর বর্ণনা তাহার নিজের অনুমান মাত্র।[৮২] ফাত্রাহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ে হতাশা অবশ্য একটি সঙ্গত কারণ। এই হতাশা সম্পর্কে তাঁহার উল্লেখ এবং পুনরায় ফেরেশতার আবির্ভাব ও ফেরেশতার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় বারবার তাঁহার পাহাড়ের গুহায় গমন সম্ভবত এই অনুমানের ভিত্তি তৈরি করিয়াছে। ফাত্রাহ্র সময়কাল যাহাই হউক না কেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হতাশার ঘটনা যতই গভীর হউক না কেন, তাহারা উভয়ে জোরের সঙ্গে ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, ওহী তাঁহার (রাসূলের) নিজের সজ্ঞান ও সচেতনতা হইতে উদ্ভূত কোন কিছু নহে। ইহা তাঁহার ধারণাগত বা বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বাচনভঙ্গি নহে। ইহা যদি এমন কিছু হইত তাহা হইলে ইহার মধ্যে ফাত্রাহ এবং ফলে কোন হতাশা থাকিত না।

আট ঃ হযরত খাদীজা (রা) এবং ওয়ারাকার নিকট হইতে উৎসাহ লাভ

ওয়াট আলোচনার শেষ উপ-শিরোনামে তাহার আলোচনা শুরু করেন এই বিষয়ের উপর জোর দিয়া যে, "হযরত খাদীজা (রা) কিভাবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে আশ্বাস দেন সেই বর্ণনা বাতিল করার কোন কারণ নাই"। ওয়াট তাহার বক্তব্য অব্যাহত রাখিয়া বলেন, ইহা এই প্রদর্শন যে, "এই পর্যায়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল"। তিনি পরে বেল্-এর ধারণার সঙ্গে এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করিয়া বলেন যে, নামূস সম্পর্কিত প্রকাশভঙ্গির নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পেষণ করার কোন জোরালো কারণ নাই। ওয়াট যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, নামূস শব্দটির ব্যবহার কুরআনে তাওরাতের উল্লেখ, বরং ইহার বিশুদ্ধতার একটি যৌক্তিক উদাহরণ। ওয়াট তখন বলেন যে, ওরাকার নিকট হইতে "পুননিশ্চিতকরণই ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "। ইহা মুহাম্মাদ ﷺ -কে তাঁহার অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেকে উপনীত করার" প্রেরণা লাভ করেন। যেমন ইহা ছিল "তাঁহার অভ্যন্তরীণ উন্নতির ব্যাপারে অনেক গুরুত্ববহ"। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, "তিনি প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিধাপূর্ণ স্বভাবের ছিলেন"। ওয়াট বর্ণনার শেষদিকে এই মন্তব্য করেন, মনে হয় তিনি এই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন যে, ওয়ারাকা কেন মুসলমান হইলেন না, যদিও তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবূওয়াত (অনুমোদন) করিয়াছিলেন।[৮৩]

ইতোমধ্যে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে[৮৪] যে, নামূস শব্দটির ব্যবহার বর্ণনার বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ। ওয়াট ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই, কেন পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ অথবা তথ্য প্রদানকারীগণ ওরাকাকে রক্ষা করার জন্য এত আগ্রহী ছিলেন এবং ইহাও ব্যাখ্যা করেন নাই যে, তিনি (ওয়ারাকা) কেন মুসলমান হন নাই? যদি তাহারা বাস্তবিক বর্ণনার সঙ্গে কিছু যোগ করিতেন অথবা বর্ণনাটির পরিশোধন করিতেন তাহা হইলে তাহারা আরও সঙ্গতভাবেই বর্ণনার ঐসব উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাহা করিতেন, যেমন ওয়াট বর্ণনা করেন, তাহাদের রাসূল ﷺ সম্পর্কে এই বক্তব্যের মাধ্যমে যে, তিনি আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং দ্বিধাপূর্ণ স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, এই বর্ণনার উভয় অংশের কোন একটিও পরবর্তী কালে "অনুমান কল্পনার সংযোজন নহে"। সার্বিকভাবে ঘটনা এই সত্য তুলিয়া ধরে যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর হেরায় নির্জন অবস্থানের পিছনে উদ্দেশ্য যাহাই থাকুন না কেন এবং তাহান্নুছ -এর ধরন যাহাই হউক না কেন, ওহী আগমনের বিষয়টি তাঁহার নিকট অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ছিল এবং তাঁহার লোকজানের নিকট নিজেকে রাসূল হিসাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে তাঁহার না কোন পরিকল্পনা ছিল এবং না কোন প্রস্তুতি ছিল।

বেল্-এর মত ওয়াটও এই চিন্তা করেন যে, নামূস (Nåmus) শব্দটি গ্রীক শব্দ nomos হইতে উদ্ভূত এবং ইহার অর্থ "আইন অথবা ওহীকৃত ধর্মশাস্ত্র"। ওয়াট বলেন, ওয়ারাকার মন্তব্যসমূহ এইভাবে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কথিত ঃ তিনি "ওহী পাইতে শুরু করেন" এবং

তাহারা ইহা বুঝেন যে, তাঁহার নিকট যাহা আসে তাহা ইয়াহূদী এবং খৃষ্ট ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন বা একই শ্রেণীভুক্ত ছিল এবং তিনি একটি সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তনকারী অথবা আইন প্রবর্তনকারী হইতে পারেন।[৮৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ওয়ারাকার মন্তব্য ছিল তাঁহার নিকট প্রথম ওহী আগমনের পর, অনেক কয়টি ওহী আগমনের পরে নহে। যদি তিনি অনেক কয়টি ওহী লাভ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে সেই বিষয়ের সঙ্গে তিনি সম্যক পরিচিত হইয়া যাইতেন। প্রাথমিক আকস্মিকতা অথবা অনিশ্চয়তার সমাপ্তি ঘটিয়া যাইত এবং আলোচনার জন্য তাঁহার ওয়ারাকার নিকট যাওয়ার কোন প্রয়োজন হইত না। পক্ষান্তরে যদি ওয়ারাকা তাহাই বুঝাইতে চাহিতেন যাহা ওয়াট চিন্তা করেন, তাহা হইলে এইরূপ করার গভীর কারণ থাকিত। ইহা কল্পনাতীত যে, ওয়ারাকার মত বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এক স্বল্প পরিচিত ও তাঁহার আত্মীয়ের নিকট হইতে এক অসাধারণ বর্ণনা শ্রবণের পর লম্ফ দিয়া উপসংহারে চলিয়া যাইবেন যে, একটি আইন অথবা ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে ইয়াহূদী ও খৃস্টানের মধ্যে তুলনীয় তাহা তাঁহার নিকট আসিতে শুরু করিয়াছে। ওয়ারাকা তাঁহার উল্লিখিত মন্তব্যের পূর্বেই দুইটি বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে একটি ধারণা প্রাপ্ত ছিলেন যে, ঐ ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্যসমূহ অন্য একজন দূত আগমনের তাহার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ রহিয়াছে। মুহাম্মাদ ﷺ -এর পূর্ব ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান দ্বারা ওয়ারাকার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ একজন দূত (রাসূল) হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। পরে যখন তিনি তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা ওয়ারাকার নিকট প্রকাশ করেন, তিনি দ্রুত উপসংহারে আসিয়া বলেন যে, অতীতের ওহী নাযিল ও একজন রাসূলের আগমন সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হইতে যাহা তিনি জানেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্বাসী, বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্যবাদী হিসাবে আল্লাহ্‌র মিশন ও ওহী লাভ করিয়াছেন।

'নামূস' শব্দটির অর্থ ও উৎস যাহাই হউক না কেন, ইহা যেমনভাবে ওয়ারাকা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না এবং ঐ সম্পর্ক কেবল এই শব্দসমূহের জন্য নহে যাহা তিনি প্রাপ্ত হন, বরং ইহা ছিল এক অসাধারণ ঘটনা ও পরিবেশের জন্যও বটে। এই অসাধারণ ঘটনা ছিল সেই সত্তার উপস্থিতি, যিনি এই শব্দসমূহ অবতরণ করেন। ইহা ছিল এই "উপস্থিতি" যাহা মুহাম্মাদ ﷺ -এর আশ্চর্য ও হতবুদ্ধিতার কারণ ছিল এবং যাহা তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে সম্প্রদায়ের একজন জ্ঞানী লোকের নিকট ইহার ব্যাখ্যার জন্য লইয়া যায়। ইহা যদি মুহাম্মাদ ﷺ -এর শ্রুত শব্দসমূহ হইত অথবা তাঁহার অভ্যন্তরীণ বাচনভঙ্গি হইত ধারণাগত অথবা বুদ্ধিগত, তাহা হইলে ইহা তাঁহার আশ্চর্যান্বিত হওয়ার এবং ভয় পাওয়ার কারণ হইত না। এই "উপস্থিতি" অথবা "দর্শন" এইভাবে আহ্বান শুরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। নামূস এই বৈশিষ্ট্য এবং প্রাপ্ত শব্দসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ওয়ারাকার 'নামূস' শব্দটির ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিক বর্ণনায় ইহা পরিষ্কার যে, প্রথম ব্যক্তিত্ব তাঁহারাই ছিলেন যাহাদের নিকট মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতার

কথা প্রকাশ করেন, তাঁহারা ছিলেন হযরত খাদীজা (রা) ও ওয়ারাকা। তিনি যদি দাবি করিতেন অথবা তাঁহার দর্শনকে আল্লাহ্র দর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন তাহা হইলে ওয়ারাকা তাহার ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা ইহাকে একটি ধারণা হিসাবে এবং ভুল হিসাবে সরাসরি নাকচ করিয়া দিতেন এবং ইহা মুহাম্মাদ ﷺ -এর জন্য অথবা বিংশ শতাব্দীর কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক এই ভুল ধরাইয়া দেওয়ার জন্য রাখিয়া যাইতেন না। ইহার নামূসের উৎস ও অর্থ যাহাই হউক না কেন "আল্লাহ্র দর্শন" অর্থে 'নামূস' শব্দটি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

ওয়ারাকার আশ্বাস বাণীর উপর গুরুত্ব দেওয়ার পর ওয়াট বলেন, "প্রথম" ওহীর উপসংহারমূলক শব্দাবলী, যেমন "যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দেন যাহা সে জানিত না", এই ওহী "পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশে"র প্রতি ইঙ্গিত করে। "পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশ" -এর দ্বারা ওয়াট আদি পুস্তক (Old Testament) এবং নূতন পুস্তক (New Testament) বুঝাইতে চাহেন এবং যুক্তি দিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কথা বলার কোন ক্ষেত্র ছিল না যে, আল্লাহ "কলমের ব্যবহার শিখাইয়াছেন", যদিও তিনি না পড়িতে পারিতেন, না লিখিতে পারিতেন। যেহেতু তিনি ওয়ারাকার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন, যিনি তাঁহার খৃস্ট ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার নিকট হইতে "অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য" শিখিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি যখন এই সূরা পুন উচ্চারণ করেন, ইহা অবশ্যই তাঁহাকে "পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেয় যাহার ব্যাপারে তিনি ওয়ারাকার নিকট ঋণী ছিলেন"। "পরবর্তী ইসলামী ধারণাসমূহ" বর্ণনার পর ওয়াট উপসংহার টানিয়া বলেন, "ইহা ব্যাপকভাবে ওয়ারাকার ধারণাসমূহের ছাঁচে গঠিত অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট আগত প্রত্যাদেশ পূর্বে আগত প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা"।[৮৬]

বলা বাহুল্য, যে কোন প্রাচ্যবিদের জন্য ইহা দুর্লভ সুযোগ, যিনি যখন, রাসূলের ওয়ারাকার সঙ্গে আলোচনার সুপরিচিত বর্ণনা উদ্ধৃত করার সুযোগ পান, তখন তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি জোরদার করিবার জন্য ইহা বলিতে কসুর করেন না যে, কুরআন এবং ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান পেশ করিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কিছুই ওয়ারাকার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্বের ধর্মীয় পদ্ধতি হইতে সাধারণ ধারণা গ্রহণ করা, বিশেষ করিয়া ইয়াহূদীবাদ ও খৃস্টবাদ হইতে ধারণা গ্রহণ করার প্রাচ্যবিদদের দাবি পূর্বে খণ্ডন করাসহ আলোচিত হইয়াছে।[৮৭] এইখানে আমরা কেবল ওয়াট-এর উপরে উল্লিখিত কতিপয় মন্তব্য আলোচনা করিব। এই বক্তব্যটি "যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন" অথবা "যিনি কলম ব্যবহারের শিক্ষা দান করিয়াছেন" (এই দুইটি অনুবাদের মধ্যে অর্থের পার্থক্য খুবই কম) বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রে কেবল জোর দেওয়া বুঝায় না। এই আয়াত সার্বিকভাবে একদিকে এই কথার উপর জোর দেয়, যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, মানুষের মূল উৎস এবং সৃষ্টি সম্পর্কে তাহার মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক উন্নতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা। মানুষের মূল উৎস ও সৃষ্টির জন্য তাহার

ঋণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার চাইতে প্রত্যাদেশের জন্য আর কোন ভাল কিছুই শুরু করার নাই এবং যে গুণ তাহাকে অন্যান্য সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, তাহা হইল একমাত্র আল্লাহ্প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা। এই ধারণায় কলমের উল্লেখের বিষয়টি এইখানে প্রতীকীমাত্র। পক্ষান্তরে ইহা এই গুরুত্বও বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছিল তাহা ছিল ধর্মশাস্ত্রের প্রারম্ভিক বিষয়, তাহা পঠন ও আবৃত্তির মাধ্যমে এবং কলমের সাহায্যে তাহা সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে লিখার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন কি না ইহা বিবেচ্য বিষয় নহে। যাহা হউক, এই ক্ষেত্রেও ওয়াট-এর যুক্তি আমাদেরকে কোন দিকেই অগ্রসর করে না। যেমন ওয়াট ধারণা দেন, যদি সূরা 'ইকরা' কেবল মুহাম্মাদ ﷺ -কে স্মরণ করাইয়া দেয় যখন তিনি ইহা পুনরুল্লেখ করেন, "যাহার ব্যাপারে তিনি ওয়ারাকার নিকট ঋণী", তখন তাঁহার ওয়ারাকার নিকট সম্পূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য যাওয়ার কোন কারণ থাকিত না। পক্ষান্তরে যদি ওয়ারাকা অনেক কিছু বিষয় শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা তিনি করিতেন না। তিনি কেবল ইহাই বলিতেন, ইহা তো যাহা তিনি অনেক পূর্ব হইতে মুহাম্মাদ ﷺ -কে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনি সব কিছুর পর সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ধারণা দেওয়ার সময় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারাকার নিকট হইতে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ওয়াট এবং অন্যান্য প্রাচ্যবিদগণ নিজেদেরকে সহজ প্রশ্নটি করেন না, ওয়ারাকা কেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূতন ধর্মশাস্ত্র ও নূতন ধর্মের পরিকল্পনা প্রণয়নের গোপন সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করেন নাই। তাহারা এই প্রশ্নও পরিহার করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিক হইতে পাঠ শিক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত এবং এইভাবে তাঁহার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁহার নিজের পরিকল্পনাসমূহ ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরে অন্যদেরকে তাঁহার গোপন বিষয়াদি জানানো কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইত না? যদি "পরবর্তী ইসলামিক ধারণাসমূহ" যেমন মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি আগত প্রত্যাদেশ-এর সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশসমূহের সম্পর্ক" ওয়ারাকার ধারণাসমূহের ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। এই ধরনের ধারণাসমূহ পরবর্তীতে তাঁহার পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন হইতে অবশ্যই উদ্ভূত হইত। ইসলামী ধ্যান-ধারণা এইভাবে কেবল বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম-এর শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকিত এবং ঐ বিষয়ে প্রাচ্যবিদগণের এই বিশেষ ধারণার কার্যকারিতা ও সত্যতার স্বীকৃতিদানে কোন অসুবিধা থাকিত না, বিশেষ করিয়া মৌল একত্ববাদ ও সকল প্রত্যাদিষ্ট ধর্মশাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক। যদি "পরবর্তী ইসলামী ধারণার দ্বারা" এই বুঝায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট প্রত্যাদিষ্ট ওহীর সঙ্গে পূর্বে প্রত্যাদিষ্ট ওহীর সম্পর্কের ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ের পরে উন্নতি লাভ করে, তাহা হইলে এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল হইবে। কারণ এই সম্পর্কের কথা স্বয়ং কুরআনে অত্যন্ত জোর দিয়া বলা হইয়াছে এবং উহা অনুরূপভাবে ৮৭ ঃ ১৮-১৯ আয়াতদ্বয়ে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ "ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে, ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে"। পক্ষান্তরে যদি "পরবর্তী"

শব্দটি এই অর্থ বুঝায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তী সময়ে তাঁহার নিকট "প্রত্যাদিষ্ট ওহীকে পূর্ববর্তী ওহীর" সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন, পরে তাঁহার নিকট এই বিষয়টি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় এবং ইহা প্রমাণ করার জন্য এত কষ্ট করার কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্ন সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার অধিকতর প্রয়োজন রহিয়াছে যে, তিনি যাহা দাবি করিয়াছেন তাহা ভিন্ন বা নূতন প্রত্যাদেশ যাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা তিনি দাবি করিয়াছেন যে, যাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও প্রথমে নাযিলকৃত ওহী সম্বলিত ছিল কিন্তু মানবীয় দোষত্রুটি অথবা ভুলের কারণে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অনুবাদ ঃ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তথ্যসূত্র

১. Supra, পৃ. ৩৬৯-৭৫, ৩৮০-৩৮৬।

২. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪০।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. হাদীছের মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

فَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ اَلْمَعْرُوْفُ بِاَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا ابْتُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ كَانَتْ تَجِيْءُ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ بِغَارِ بِحِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيْهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يُّرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ فَاَتَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَثَوْتُ لِرُكْبَتَيَّ وَاَنَا قَائِمٌ ثُمَّ زَحَفْتُ تَرْجُفُ بَوَادِرِيْ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ حَتّٰى ذَهَبَ عَنِّيْ الرَّوْعُ ثُمَّ اَتَانِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَطْرَحَ نَفْسِيْ مِنْ حَالِقٍ مِنْ جَبَلٍ فَتَبَدّٰى لِيْ حِيْنَ هَمَمْتُ بِذٰلِكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَنَا جِبْرِيْلُ وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اِقْرَاْ قُلْتُ مَا اَقْرَاُ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّيَ الْجُهْدَ ثُمَّ قَالَ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ فَقَرَاْتُ فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ

لَقَدْ اَشْفَقْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَاَخْبَرْتُهَا خَبَرِىْ فَقَالَتْ اَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا وَوَاللّٰهِ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتُصَدِّقُ الْحَدِيْثَ وَتُؤَدِّى الْاَمَانَةَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِىْ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِىْ اِلٰى وَرَقَةَ بِنِ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدٍ قَالَتْ اِسْمَعْ مِنْ ابْنِ اَخِيْكَ فَسَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ خَبَرِىْ فَقَالَ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعٌ لَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قُلْتُ اَمُخْرِجِىَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ اِنَّهُ لَمْ يَجِئْ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ عُوْدِىَ وَلَئِنْ اَدْرَكَنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . ثُمَّ كَانَ اَوَّلُ مَا نُزِّلَ عَلَىَّ مِنَ الْقُرْاٰنِ بَعْدَ اِقْرَاْ . نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ . مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ . وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ . وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ . فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ . وَيٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَوَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ فَتَرَ الْوَحْىُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتْرَةً فَحَزِنَ حُزْنًا شَدِيْدًا جَعَلَ يَعْدُ وَاِلٰى رُؤُسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ لِيَتَرَدّٰى مِنْهَا فَكُلَّمَا اَوْفٰى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرَئِيْلُ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ نَبِىُّ اللّٰهِ فَيَسْكُنُ لِذٰلِكَ جَاْشُهُ وَتَرْجِعُ اِلَيْهِ نَفْسُهُ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ يَوْمًا اِذْ رَاَيْتُ الْمَلَكَ الَّذِىْ كَانَ يَاْتِيْنِىْ بِحِرَاءٍ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجَثَوْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ فَزَمَّلْنَاهُ اَىْ دَثَّرْنَاهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَكَانَ اَوَّلُ شَىْءٍ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ حَتّٰى بَلَغَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

"আহমাদ ইব্ন উছমান, যিনি আবুল জাওযা নামে পরিচিত, তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওয়াহ্হাব ইব্ন জারীর হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উছমান ইব্ন রাশিদকে যুহ্রী হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, তিনি উরওয়া হইতে, তিনি আয়েশা (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা ছিল সত্য স্বপ্ন, ইহা তাঁহার নিকট ভোরের ঔজ্জ্বল্যের মত আসে। ইহার পর তাঁহার নিকট নির্জনতা ভাল লাগে, তিনি হেরা গুহার নির্জন স্থানে অবস্থান করেন, এমনকি তিনি তাঁহার স্ত্রী খাদীজা (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কয়েক রাত্রি পর্যন্ত হেরা গুহায় নির্জন

ধ্যানে (তাহান্নুছ) অতিবাহিত করেন। ইহার পর তিনি তাঁহার স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইভাবে তিনি ক্রমাগত এইরূপ করিতেন। হেরা গুহায় যাওয়ার সময় তিনি কিছু খাদ্য সঙ্গে নিয়া যাইতেন। হেরা গুহায় এই নির্জন ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায় তাঁহার নিকট সত্য (ওহী) আসিল। (ফেরেশতা জিবরীল) তাঁহাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি দাঁড়ানো অবস্থা হইতে আমি আমার হাঁটুর উপর বসিলাম। অতঃপর আমি হামাগুড়ি দিয়া কম্পিত অবস্থায় হেরা গুহা হইতে বাহির হইলাম। ইহার পর আমি খাদীজা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমি তাহাকে বলিলাম, আমাকে কম্বল জড়াইয়া দাও, আমাকে কম্বল জড়াইয়া দাও, আমাকে কম্বল জড়াইয়া দাও! এমতাবস্থায় আমার মধ্য হইতে ভীতিপূর্ণ ভাব দূর হইয়া যায়। ইহার পর পুনরায় আমার নিকট সেই ফেরেশতা আসেন এবং বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেন, আমি নিজেকে পাহাড়ের চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতে মনস্ত করিলাম। আমি যখন এই রকম মনোভাব পোষণ করিতেছিলাম তখনই ফেরেশতা আবির্ভূত হইয়া আমাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি জিবরাঈল এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর ফেরেশতা বলেন, আপনি পড়ুন। আমি বলিলাম ঃ আমি পড়িতে পারি না। তিনি আমাকে তাঁহার দিকে টানেন এবং তিনবার সজোরে আলিঙ্গন করিলেন। ফলে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। ইহার পর ফেরেশতা বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ "পড়ুন সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন"। তখন আমি পড়ি...ম। ইহার পর আমি খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, আমি আমার জীবনের শংকা করিতেছি। আমি তাঁহাকে আমার সম্পূর্ণ সংবাদ বলিলাম। খাদীজা বলিল, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কসম আল্লাহ্‌র! আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমানিত করিবেন না। কারণ আপনি নিশ্চয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, আমানত আদায় করেন, মানুষের বোঝা বহন করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা আমাকে নিয়া ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আসাদ-এর নিকট গেলো। তিনি ওয়ারাকাকে বলিলেন, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি সম্পূর্ণ ঘটনা তাহাকে অবহিত করিলাম। ইহা শুনিয়া ওয়ারাকা বলেন, তিনি তো নামূস যিনি হযরত মূসা ইব্‌ন ইমরানের নিকট আসিয়াছিলো। আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, আমি যদি ঐ সময় জীবিত থাকিতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কৃত করিবে, তাহা হইলে আমি তোমাকে সাহায্য করিতাম। আমি বলিলাম, তাহারা কি আমাকে বহিষ্কৃত করিবে? ওয়ারাকা বলিলেন, হাঁ, আমি যদি তোমার নবুওয়াতের সময়কাল পাইতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতাম। অতঃপর সূরা ইক্‌রা-এর পরে আমার উপর কুরআনের যে সূরা প্রথম নাযিল হয় তাহা এই ঃ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ . مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ . وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ . وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ . فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ . يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَاَنْذِرْ . وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى .

"নূন, শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ। তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে"।

"হে বস্ত্র আচ্ছাদিত! ওঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর"।

"শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম"।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল্ আলা আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইব্‌ন ছাওর আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেন মা'মার হইতে, তিনি আয-যুহ্‌রী হইতে, আয্-যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী নাযিলে বিরতি চলে অর্থাৎ তাঁহার নিকট ওহী আসা বন্ধ হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিতেন। তিনি যখনই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিতেন তখনই জিবরাঈল তাঁহাকে দেখা দিতেন এবং বলিতেন, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্‌র নবী। এই কথা শ্রবণ করার পর তিনি প্রশান্তি লাভ করেন এবং প্রাণ ফিরিয়া পান। নবী করীম ﷺ এই সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়া বলেন, একদিন আমি পথ চলিতেছিলাম। এমতাবস্থায় আমি সেই ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম, যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় আসিয়াছিলেন। তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে এক কুরসীতে উপবিষ্ট। আমি তাহার আবির্ভাবে ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, আমাকে কম্বল জড়াইয়া দাও। সুতরাং আমরা তাঁহাকে কম্বল জড়াইয়া অর্থাৎ তাঁহাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলাম। তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَانْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ .وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তেমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ"।

আয্-যুহরী বলেন, তাঁহার উপর সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হইয়াছিল তাহা এইঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ... مَا لَمْ يَعْلَمْ .

৫. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪২

৬. Supra, পৃ. ৪২৬-৪২৮।

৭. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪২

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. Supra, পৃ. ৪২৩-৪২৪।

১১. Supra, পৃ. ৪৩৯-৪৪৬।

১২. Watt, op. cit., পৃ. ৪১, আরও দ্র. আত-তাবারী, তারীখ, পৃ. ১১৫৬। হাদীছের মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ بَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ... .

"তাবারী বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউনুছ ইব্‌ন আবদিল আলা, তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব খবর দিয়াছেন। আমাকে ইউনুছ খবর দিয়াছেন ইব্‌ন শিহাবের নিকট হইতে, তিনি বলেন, আমাকে আবূ সালামা ইব্‌ন আবদির রাহমান খবর দিয়াছেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী আগমনে বিরতি সম্পর্কে ইরশাদ করেন, একবার আমি পথ চলিতেছিলাম। আমি আমার মস্তক উত্তোলন করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার নিকট আসিয়াছিলেন, তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কুরসীতে উপবিষ্ট..."।

১৩. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪১।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১৭. উদাহরণস্বরূপ দ্র. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আর-রাবী, কালিমাতুল হাক্ক ফিল কুরআন, ২খ., ইমাম মুহাম্মাদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ ১৪০৯ হি.।

১৮. অন্যান্য স্থানগুলি হইল, কুরআন ১৮ ঃ ৪৪; ৩১ ঃ ৩৯; ২২ ঃ ৬ এবং ২২ ঃ ৬২।

১৯. আয়াতগুলি হইল, কুরআন ২ ঃ ২৬; ২ ঃ ৪২; ২ ঃ ৯১; ২ ঃ ১০৯; ২ ঃ ১৪৪; ২ ঃ ১৪৬; ২ ঃ ১৪৭; ২ ঃ ১৪৯; ৩ ঃ ৬০; ৩ ঃ ৭১; ৪ ঃ ১৭০; ৫ ঃ ৪৮; ৫ ঃ ৮৭; ৬ ঃ ৫; ৬ ঃ ১১৪; ৭ ঃ ৪৩; ৭ ঃ ৫৩; ৮ ঃ ৬; ৮ ঃ ৩২; ৯ ঃ ৪৮; ১০ ঃ ৭৬; ১০ ঃ ৭৭; ১০ ঃ ৯৪; ১০ ঃ ১০৮; ১১ ঃ ১৭; ১১ ঃ ১২০; ১৩ ঃ ১; ১৩ ঃ ১৯; ১৬ ঃ ১০২; ১৭ ঃ ৫৬; ১৭ ঃ ৮১; ২২ ঃ ৫৪; ২৩ ঃ ৭০; ২৮ ঃ ৪৮; ২৮ ঃ ৫৩; ২৯ ঃ ৬৮; ৩২ ঃ ৩; ৩৪ ঃ ৬; ৩৪ ঃ ৪৩; ৩৪ ঃ ৪৯; ৩৫ ঃ ২৪; ৩৫ ঃ ৩১; ৩৭ ঃ ৩৭; ৪০ ঃ ৫; ৪৩ ঃ ২৯; ৪৩ ঃ ৩০; ৪৩ ঃ ৭৮; ৪৬ ঃ ৭; ৫০ ঃ ৫; ৫৭ ঃ ১৬; ৬০ ঃ ১ = মোট ৫২ স্থানে।

২০. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪৩।

২১. Supra, পৃ. ৪৩৯-৪৪৬।

২২. Supra, পৃ. ৪৪১-৪৪৪।

২৩. দ্রষ্টব্য Supra, পৃ. ৪৪০-৪৪১।

২৪. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪৩।

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. Supra, পৃ. ৪৪৩-৪৪৮।

২৭. Supra, পৃ. ৪২০-৪২২, ৪৩৯-৪৪০।

২৮. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪৩।

২৯. উদাহরণস্বরূপ দ্র. ৬ ঃ ৮; ৯ ঃ ৫০; ১১ ঃ ১২, ৩১; ১২ ঃ ৩১; ২৫ ঃ ৭; ৩২ ঃ ১১; ৫৩ ঃ ২৬; ১৭ ঃ ৯৫ এবং ৬৯ ঃ ১৭৮।

৩০. আরও দ্রষ্টব্য Supra, পৃ. ৪১৮-৪২১, ৪৩৯-৪৪২।

৩১. স্থানগুলি হইল ঃ কুরআন ২ ঃ ৮৭; ২ ঃ ২৫৩; ৪ ঃ ১৭১; ৫ ঃ ১১০; ১৬ ঃ ২; ১৬ ঃ ১০২; ১৭ ঃ ৮৫ (দুইবার); ২৬ ঃ ১৯৩; ৪০ ঃ ১৫; ৫৮ ঃ ২২; ৭০ ঃ ৪;৭৮ ঃ ৩৮; ৯৭ ঃ ৪; ৪২ ঃ ৫১; ১৯ ঃ ৯৭; ২১ ঃ ৯১; ৬৬ ঃ ১২; ৩২ ঃ ৯; ১৫ ঃ ২৯ এবং ৩৮ ঃ ৭২।

৩২. স্থানগুলি হইল ঃ কুরআন ২ ঃ ৮৭; ২ ঃ ২৫৩; ৪ ঃ ১৭১; ৫ ঃ ১১৩; ২১ ঃ ৯১; ৬৬ ঃ ১২।

৩৩. রূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. ইবনুল কাইয়্যিম, কিতাবুর রূহ, হায়দরাবাদ ১৩২৪ হি.। আরও দ্র. M.W. -এ ইহার সারাংশ, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১২৯-১৪৪, তু. D.B. Macdonald, "The development of the idea of Spirit in Islam", M.W., ১৯৩২ খৃ., পৃ. ২৫-৪২ এবং ১৫৩-১৬৮।

৩৪. ওয়াট, মুহাম্মাদ এট মাক্কা, পৃ. ৪৪।

৩৫. দ্র. M. J. Kister, "Al-Tahnnuth : An Enquiry into the meaning of a term", B.S.O.A.S, vol. xxxi, ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২২৯।

৩৬. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪৪।

৩৭. A. Spremger, Das Laben und die Lehre des Mohammed, Berlin ১৮৬০ খৃ., ১খ., পৃ. ২৯৫-২৯৬।

৩৮. H. Herschfield, New Researches into the composition and exigecies of the Qoran, লন্ডন ১৯০২ খৃ., পৃ. ১৯।

৩৯. Tor Andrae, Mohammed, Sein und Glaube, Gottingen ১৮৩২ খৃ., পৃ. ৩৪-৩৫।

৪০. Supra, পরিচ্ছেদ ১১।

৪১. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪৪।

৪২. দ্রষ্টব্য Supra, পরিচ্ছেদ ১০।

৪৩. Supra, পরিচ্ছেদ ৮, সেকশন ৪।

৪৪. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪৪।

৪৫. নিম্নে দ্রষ্টব্য, মূল পাঠ।

৪৬. ওয়াট, Muhammad at Mecca, পৃ. ৪৫।

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. দ্রষ্টব্য, Supra, পৃ. ৪১১।

৫২. Infra, পৃ. ৪৯৮-৫০০।

৫৩. ওয়াট, op .cit., পৃ. ৪৫।

৫৪. দ্রষ্টব্য Supra, পৃ. ৪৩০-৪৩৯।

৫৫. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৪৫৬, তিনি এইখানে A. Poulain -এর রচনার উদ্ধৃতি দেন এবং A. Poulain -এর রচনার সেকশন-৫ -এর উদ্ধৃতি দেন, যেখানে "Intellectual locution" (বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি) ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৫৭. প্রাগুক্ত।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭, উদ্ধৃতি বেল, Origin etc., পৃ. ৯০।

৫৯. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৪৭।

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. দ্রষ্টব্য Supra, পৃ. ৪৪১-৪৫০।

৬২. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৪৭।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮, আরও দ্র., ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৬২।

৬৫. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৪৮।

৬৬. আয়াত দুইটি ১৫ : ৯৪ এবং ২৬ : ২১৪।

৬৭. Infra, পরিচ্ছেদ ২১, সেকশন ১।

৬৮. দ্রষ্টব্য আত-তাবারী, তারীখ (ইতিহাস), ১খ., পৃ. ১২৪৯।

৬৯. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৯১; আরও উদ্ধৃত আত-তাবারী, op. cit.।

৭০. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৪৯।

৭১. দ্রষ্টব্য তাজুল আরূস, ৩খ., পৃ. ২০২।

৭২. ওয়াট, op.cit, পৃ. ৪৯।

৭৩. প্রাগুক্ত।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৭৮. প্রাগুক্ত।

৭৯. প্রাগুক্ত।

৮০. প্রাগুক্ত।

৮১. Supra, পৃ. ৩৭৩-৩৭৫; ৩৮৪-৩৮৫।

৮২. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৪৯।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৮৪. Supra, পৃ. ৪২৫-৪২৬।

৮৫. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৫১।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

৮৭. Supra, পরিচ্ছেদ ১১।

বিংশ অধ্যায়

ওহী এবং প্রাচ্যবিদগণ

৪. বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বাচনভঙ্গির তত্ত্ব

ওয়াট তাহার বিষয়বস্তু আলোচনার চূড়ান্ত পর্বে The form of Muhammad's Prophetic Consciousness (মুহাম্মাদ ﷺ -এর পয়গাম্বরসুলভ সচেতনতার স্বরূপ) শিরোনামের অধীনে তাহার এবং তাহার পূর্বসূরীদের অভিমতসমূহের সারসংক্ষেপ পেশ করিয়াছেন। প্রাথমিকভাবে তিনি পাশ্চাত্যের সতর্কতার কথা তুলিয়া ধরেন, কারলাইল-এর সময় হইতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আন্তরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং রিচার্ড বেল-এর মত জোর দেন এই প্রয়োজন সম্পর্কে, "তাহার নিষ্ঠার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন, যতক্ষণ না বিপরীত বিষয় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়"। নিষ্ঠাবান মুসলিমগণ কুরআন সম্পর্কে যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করেন সেই ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ থাকার কথা প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং আধুনিক খৃস্টানগণ বলে যে, তিনি সৌজন্যমূলকভাবে মুহাম্মাদ বলেন, না বলিয়া "কুরআন বলে" বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যদি "একটি সূরা সম্পর্কে বলেন যাহা মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি নাযিল হইয়াছে"। মুসলিম দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা গ্রহণ করা উচিত নহে এবং পাঠকের উচিত এইভাবে বলা, "মুসলিমগণ যেইরূপ বলিয়া থাকেন অথবা অনুরূপ কিছু বাক্যাংশ"।[১]

এক ঃ ওয়াট-এর মৌল চিন্তা ঃ এ. পৌলেন-এর তত্ত্ব

এই সকল প্রাথমিক আলোচনার পর ওয়াট এ. পৌলেন তাহার 'Graces of Interior Prayer' পুস্তকে "বাচনভঙ্গি" এবং "দর্শন" (vision) সম্পর্কিত যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সূচনা করেন। ঐ লেখকের মতে, ওয়াট বলেন, "বাচনভঙ্গি" এবং "দর্শন"-এর প্রতিটির হয় "বাহ্যিক" অর্থ হইবে নতুবা "অভ্যন্তরীণ" অর্থ হইবে। "বাহ্যিক বাচনভঙ্গি" এমন হইবে যাহার মধ্যে "শব্দসমূহ কানের দ্বারা শ্রুত হয়, যদিও তাহা স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয় না"। অনুরূপভাবে "বাহ্যিক দর্শনসমূহ হইল" বস্তুগত দর্শনসমূহ অথবা যাহা অনুরূপ মনে হয়; যাহা বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। "অভ্যন্তরীণ বাচনভঙ্গি" এবং "অভ্যন্তরীণ দর্শন"-এর প্রতিটিই হয় কল্পনাগত হইবে অথবা বুদ্ধিগত হইবে। "কল্পনাপ্রসূত বাচনভঙ্গি" সাধারণত সরাসরি কানের সহায়তা ছাড়া কল্পনার ধারণার মাধ্যমে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি শব্দ ছাড়া চিন্তার যোগাযোগের এক সাধারণ বিষয় এবং ফলত কোন নির্দিষ্ট ভাষা ছাড়াই তাহা ব্যক্ত হয়"।[৩] এই "উপকরণ"-সহ ওয়াট "কুরআন ও হাদীছের বর্ণনার" দিকে ফিরিয়া যান।

ওয়াট এই উপকরণ বা তথ্যাদি কিরূপে ব্যবহার করেন তাহা দেখার পূর্বে ওয়াট-এর উপস্থাপনা বা বক্তব্য প্রকাশে সহজাত আত্মবিরোধ ও অসঙ্গতির প্রতি ইঙ্গিত করা সময়োপযোগী হইবে। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, তিনি ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবেন এবং যে কোন ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন। কিন্তু এইরূপ বলার পরপরই তিনি তাহার মত পরিবর্তন করিয়া "Mystical theology" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থে বর্ণিত তাহার তত্ত্বকে সত্য ও সঠিক বলিয়া ঘোষণা করেন। এই গ্রন্থে তিনি অপরিহার্যরূপে "খৃস্টান পাদ্রী-পুরহিতদের অভিজ্ঞতাসমূহ ও "অভ্যন্তরীণ" প্রার্থনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এই আলোচনার সূত্র ধরিয়া তিনি কুরআনের ওহী অথবা "মুহাম্মাদ ﷺ -এর পয়গাম্বরসুলভ সচেতনতার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি (ওয়াট) যাহা বলেন সেইসব বিষয় আলোচনা করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি "ইসলামের কোন মৌলিক বিশ্বাসের" বিরোধিতা করিবেন না। যাহা হউক, বাস্তবে তিনি এই ঘোষণার পরপরই ঠিক বিপরীত পথে অগ্রসর হন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ইহা দেখাইতে চাহেন যে, কুরআনের ওহী A. Poulain -এর সজ্ঞা অনুযায়ী "ওহী হইল বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি", নিম্নোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন ঃ ইহা অর্থাৎ কুরআনিক ওহী "শব্দ ছাড়া কেবল চিন্তাগত যোগাযোগ মাত্র" ইত্যাদি। ইহা অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহা অপমানজনক না হইলেও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অস্বীকৃতি। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এই যে, কুরআনের ওহী "কেবল শব্দ ছাড়া চিন্তাগত যোগাযোগের মাধ্যমে" নহে এবং ইহা এমনও নহে যে, ইহা মুহাম্মাদ ﷺ -এর স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় সচেতনতার একটি পদ্ধতি। প্রকৃত বিষয় এই যে, ওয়াট এইখানে A. Poulain-এর তত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া কেবল খৃস্টান মিশনারী এবং প্রাচ্যবিদগণের চিন্তাধারা প্রমাণ করিতে চাহেন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে, তিনি রিচার্ড বেল-এর চিন্তাধারা প্রমাণ করিতে চাহেন, তবে বুদ্ধিজীবীসুলভ পোশাক পরাইয়াছেন মাত্র। ইহা বোধগম্য যে, একজন নিষ্ঠাবান খৃস্টান হইয়াও ওয়াট নীতিবোধ ও নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে মুসলিম চিন্তা-চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে কী করিতে চাহেন সেই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ও সতর্ক হওয়ার পরও ইহা তাহার জন্য ভাল হইত, যদি তিনি নিরপেক্ষ থাকার ওয়াদা না করিতেন এবং ইসলামের মৌলিক কোন বিশ্বাসকে অস্বীকার না করার প্রতিশ্রুত না দিতেন।

দুই ঃ ওয়াট-এর বিবেচ্য তত্ত্বের প্রয়োগ

A. Poulain-এর সংজ্ঞা উল্লেখ করার পর ওয়াট আস-সুয়ূতীর আল-ইতকান গ্রন্থে উল্লিখিত এবং অন্যান্য উৎস হইতে ওহী অবতরণের "অবস্থা" বা "ধরন" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ওহী অবতরণের মূল পদ্ধতি কুরআনের ৪২ ঃ ৫০-৫২ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই আয়াত নিম্নোক্তভাবে অনুবাদ করেন ঃ

It belongeth not to any human being that God should speak to him except by suggestion (wahyan) or from behind a veil, or by sending a massenger to

suggest (fayuhiya) by His permission what He pleaseth... Thus We have suggested to thee a spirit belonging to Our affair (awhayna)".

"কোন মানুষের পক্ষেই ইহা সম্ভব নহে যে, আল্লাহ তাহার সঙ্গে কথা বলিবেন, কেবল তাহাকে কোন ধারণা দেওয়া ছাড়া (Wahyan ; وَحْيًا) অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া অথবা এমন একজন দূত প্রেরণের দ্বারা, তিনি যাহা চাহেন, তাহার অনুমতিক্রমে ধারণা দান (ফাইউহিয়া ঃ فَيُوْحِيَ) করিবে...। এইভাবে আমি তোমাকে ধারণা দান করিয়াছি রূহ তথা আমার বিষয় সম্পর্কে (আওহায়না ঃ أَوْحَيْنَا)"।[8]

ওয়াট তাহার ধারাবাহিক বর্ণনায় আরও বলেন, "সুতরাং ওহী অবতরণের প্রথম পদ্ধতি" "যে ক্ষেত্রে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন"। তারপর তিনি তিনটি বিষয় বর্ণনা করেন ঃ

(এক) তিনি এই ক্ষেত্রে রিচার্ড বেলকে উদ্ধৃত করেন যিনি কুরআনে বর্ণিত ওহী পরিভাষাটির বিভিন্নমুখী ব্যবহারের বিষয়ে অধ্যয়নের পর বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে এই "ওহী" পরিভাষাটি মূল পাঠ-এর মৌখিক যোগাযোগ-এর অর্থ বুঝাইত না, বরং "পরামর্শ", "বিস্মৃত শব্দ জোগাইয়া দেওয়া" অথবা "উদ্বুদ্ধ করা" ইত্যাদি অর্থে যাহা ব্যক্তির মনে উদিত হয়।

(দুই) ওয়াট বলেন, [রাসূল ﷺ -এর] "মক্কী জীবনের অধিকাংশ সময়ে" ওহী ছিল "উদ্দীপনার কাজ"। তাহার এই বর্ণনার সমর্থনে তিনি ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪ আয়াত উদ্ধৃত করেন যাহা তিনি নিম্নোক্তরূপে অনুবাদ করেন ঃ

"Verily it is the revelation (tanzil) of the Lord of the Worlds, With which hath come down (nazala bihi) the Faithful Spirit Upon they heart, that thou mayest be of those who warn".

"এই ওহী অবশ্যই বিশ্বের প্রভুর (আল্লাহ্‌র) নিকট হইতে, যাহা (পবিত্র) বিশ্বাসী আত্মার (نزل به) সঙ্গে নাযিল হয় আপনার অন্তরে, যাহাতে আপনি সতর্ককারীদের মধ্য হইতে একজন হইতে পারেন"।

ওয়াট এইখানে যোগ করেন, এইখানে সংবাদ বহনকারী ফেরেশতার উল্লেখ "সম্ভবত পরবর্তী সময়ের"।

(তিন) তিনি বলেন যে, তিনি যতদূর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যাহা লইয়া আসা হয় তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ "মক্কায় জীবনযাপন কালে" তিনি শ্রবণ করেন, এই সম্পর্কিত কোন উল্লেখ নাই। এই ক্ষেত্রে ওয়াট বলেন, "উদ্দীপনা" মুহাম্মাদ ﷺ -এর অন্তরে অথবা মনে বক্তব্য ছাড়া অন্যান্য কতিপয় পদ্ধতিতে সংবাদ" প্রদান করে এবং এইভাবে ইহা "এক অভ্যন্তরীণ বাচনভঙ্গি এবং সম্ভবত এক বুদ্ধিগত বিষয়ে পরিণত হয়"।[৫]

এক্ষণে ৪২ ঃ ৫১-৫২ আয়াত কার্যত ওহীর প্রকৃত ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করে, যে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ নিজের বক্তব্য মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। এই আয়াতসমূহের যে অনুবাদ ওয়াট করিয়াছেন তাহা যুগপৎভাবে অশুদ্ধ ও বিভ্রান্তিকর। 'ওহী' ও 'আওহা' শব্দদ্বয়ের অনুবাদ

"পরামর্শ" এবং "পরামর্শকৃত" ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে করা সম্পূর্ণ ভুল যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।[৬]

ওয়াট এইখানে বেল-এর রেফারেন্স দিয়াছেন এবং ওহী পরিভাষাটির অর্থ সম্পর্কে তাহার চূড়ান্ত মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ইতোপূর্বে তাহার নিবন্ধের বিশদ আলোচনা করিয়াছি এবং তাহার ধারণা-র "ধারণা" ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই পরিভাষার এই ধরনের অর্থ করা মারাত্মক ভুল এবং কুরআনিক ওহীর ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অপ্রযোজ্য। এই বক্তব্য অর্থাৎ "ধারণা" সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না যেখানে ওহী পরিভাষাটি অথবা ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা এই আয়াত হইতে একটি দৃষ্টান্ত হইবে যে, আয়াত ওয়াট এইখানে অনুবাদ করিয়াছেন। এইভাবে তর্কের খাতিরে আমরা যদি আয়াতে প্রথম অংশের 'ওয়াহ্য়ান' (وَحْيًا) শব্দটির জন্য "Suggestion" প্রতিশব্দটি লই তাহা হইলেও অনুরূপ শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ "Suggestion") আয়াতের একই অংশে উক্ত শব্দ 'ফাইউহিয়া' (فَيُوْحِيَ) -এর অনুবাদ করিলে যথাযথ হইবে না (অর্থাৎ "একজন রাসূল প্রেরণ করিয়া ধারণা বা পরামর্শ দেওয়া (?) তাহার অনুমতিক্রমে...)"। এই পরবর্তী ক্ষেত্রে রাসূল কি করিবেন। কারণ তিনি একজন দূতমাত্র, ডেলিগেট বা প্রতিনিধি নহেন? বাস্তবে ঐ রকম নহে যে, তিনি "ধারণা বা পরামর্শ" দান করেন, বরং একমাত্র আল্লাহ্র ওহী পৌঁছাইয়াছেন অথবা প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে ইউহিয়া يُوْحِيَ শব্দটির এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে "জ্ঞাপন করা" অথবা "প্রকাশ করা", "ধারণা করা" নহে, যেমন ওয়াট অনুবাদ করেন। তিনি ৫২ নম্বর আয়াতের অনুবাদেও দ্বিধান্বিত, যেমন "অনুরূপভাবে আমরা আপনাকে আমাদের বিষয় সম্পর্কে আত্মিক ধারণা দান করিয়াছি"। "আমাদের বিষয়ে আত্মার যুক্ত হওয়া" কিভাবে "ধারণা"-এর অর্থ দিতে পারে তাহা সহজে বোধগম্য নহে। এই বক্তব্যের অর্থ পরিষ্কার নহে। 'মিন আমরিনা' (مِنْ أَمْرِنَا) বক্তব্যটির এইখানে অর্থ হইল "আমাদের নির্দেশবলে"। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা যদি এই বক্তব্যের ওয়াট কর্তৃক কৃত অনুবাদ গ্রহণ করি তবে এইখানে 'রূহ' শব্দটি আওহায়না (أَوْحَيْنَا) ক্রিয়ার কর্ম (object) হিসাবে স্বীকৃত। সুতরাং 'রূহ' এমন কিছু যাহা ইতোমধ্যে ওহীকৃত (Wahy-ied) হইয়াছে। অন্য কথায় বলা যায়, এইখানে 'রূহ' শব্দটির অর্থ ওহী, যাহা কর্ম (object), ক্রিয়া নহে। কর্ম (object)-এর ধরন বা প্রকৃতি আয়াতের উপসংহারমূলক অংশে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যাহার বর্ণনা এইরূপ : "তুমি তো জানিতে না কিতাব কী এবং জানিতে না ঈমান কী! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো, যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি..."।[৭] এই বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা ইহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে যে, পূর্বে উল্লিখিত 'রূহ' হইল গ্রন্থ অর্থাৎ মূল পাঠযোগ্য গ্রন্থ (কুরআন) যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহীকৃত (Wahy-ied)।

ওয়াট-এর দ্বিতীয় যুক্তি-তর্কের বিষয়ে বলেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কী জীবনের অধিকাংশ সময় ওহী ছিল "আত্মার কার্যাবলী" এবং ঐ ফেরেশতাদেরকে দূত হিসাবে উল্লেখ করা

হয় "সম্ভবত" পরবর্তী সময়ে। তিনি দুইটি বিষয়ে ভুল করেন। এই সম্পর্কে তাহার উদ্ধৃত আয়াত ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪-এর দ্বারা দেখা যায় যে, তিনি এই আয়াতের মূল বক্তব্য সার্বিকভাবে অনুধাবনে ভুল করেন এবং "Faithful Spirit"-এর অর্থ নির্ণয়েও (আর-রূহুল আমীন) ভুল করেন। ওয়াট এইখানে ওহীর প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন অর্থাৎ "যেখানে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন" এবং অন্য কোন পদ্ধতি সম্পর্কে নহে। উদাহরণস্বরূপ "পর্দার অন্তরাল হইতে" তাহার কথা বলা অথবা "দূত প্রেরণের" মাধ্যমে কথা বলা। যাহা হউক, আয়াতে বর্ণিত বিষয় শেষে উল্লিখিত পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রথমে উল্লিখিত পদ্ধতির সঙ্গে কোনক্রমেই সম্পর্কিত নহে। ইহা এই বুঝায় যে, ওয়াট এইখানে "The faithful spirit" অংশের অর্থ বুঝাইতে আল্লাহকে বুঝাইয়াছেন। ইহার পর তিনি এই আয়াত উদ্ধৃত করেন ওহীর প্রথম পদ্ধতির উদাহরণ ও বিশ্লেষণ হিসাবে এবং faithful ও spirit শব্দদ্বয়ের প্রথম অক্ষর capital letter-এ লিখেন। এরূপ করার পর তিনি খৃস্টবাদের এক উদ্ভূত ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় আমদানী করেন। তিনি রেফারেন্সে উক্ত প্রথম আয়াতের প্রয়োগ সম্পর্কে বুঝিতে মনোযোগ দিতে পারেন নাই অথবা ব্যর্থ হন। এই আয়াত কুরআনকে 'তানযীল' হিসাবে আখ্যায়িত করে অর্থাৎ কোন কিছু "অবতরণ করান" এবং প্রেরক হইলেন "বিশ্বপ্রভু"। পরবর্তী আয়াত কর্তৃত্ব বা প্রতিনিধিত্বের কথা উল্লেখ করে যাহা অবতরণ করে "যাহার সঙ্গে" (নাযালা বিহি - نَزَلَ بِهِ) "বিশ্বাসী (পবিত্র) আত্মা অবতরণ করেন"। এইভাবে বিশ্বাসী আত্মা হইলেন দূত, যিনি ইহা লইয়া আসেন। আনুষঙ্গিকভাবে ইহা লক্ষণীয় যে, ওয়াট 'তানযীল' শব্দটি অনুবাদ করেন যাহা এইখানে সুস্পষ্টরূপে কুরআনিক ওহীকে বুঝায় "প্রত্যাদেশ" হিসাবে। সম্ভবত এই কারণেই এইখানে যে কোনভাবেই তিনি "Suggestion" শব্দটিকে ধারণা অর্থে প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাহা সত্ত্বেও তাহার শর্ত এই যে, পাঠকের উচিত "তেমন সরবরাহ করা অথবা অনুরূপ যে কোন বাগবৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা, বর্তমান উদাহরণে যাহা অপ্রযোজ্য।

faithful spirit বক্তব্যটি সম্পর্কে বলা যায়, ইহা ইতোপূর্বেই দেখানো হইয়াছে[৮] যে, ইহা ঐ আয়াতের অনুরূপ। যেমন 'রাসূল কারীম' শব্দদ্বয় ৬৯ ঃ ৪০ এবং ৮১ ঃ ১৯ আয়াতসমূহে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরবর্তী স্থানে (৮১ ঃ ২১) তিনি 'আমীন' হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন এবং তিনি অবশ্যই একজন ফেরেশতা। ইহাও ওয়াট-এর দাবিকে অস্বীকার করে যে, "পরবর্তী সময়ে" ফেরেশতাকে দূত হিসাবে বলা হইয়াছে। ইহার পর এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার যে, কুরআনের কোথায়ও 'আল-আমীন' শব্দটি আল্লাহর গুণ অথবা নাম হিসাবে উল্লিখিত হয় নাই, ইহা বিশেষণও নহে। faithful শব্দটি spirit শব্দের মধ্যে প্রয়োগ হয় নাই যাহাকে খৃস্টানগণ "ত্রিত্ববাদ"-এর দৃষ্টিকোণ হইতে মূল্যায়ন করে। 'রূহ' পরিভাষাটি কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, spirit of life, ফেরেশতা, যেমন ৪২ ঃ ৫০-৫২ আয়াতে দৃষ্ট হয়, ওহীর শ্রবণায়।

ওয়াট-এর তৃতীয় যুক্তি এই যে, "রাসূলুল্লাহ (স) -এর মক্কী জীবনে যাহা তাঁহার নিকট অবতারিত হইয়াছিল তাহা 'শ্রবণ করার' কোন উল্লেখ নাই"। অবশ্যই কুরআনের মক্কী সূরাসমূহে

এবং মাদানী সূরাসমূহে এমন কোন উল্লেখ নাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী বা প্রত্যাদেশ "শুনিয়াছিলেন"। ইহা এই কারণে যে, কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক রচিত ছিল না। কিন্তু কেহ যদি বিন্দুমাত্রও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, কুরআনের রচয়িতা হইলেন আল্লাহ নিজে। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এই কথা শিখাইয়া দেন যে, কিভাবে ওহী গ্রহণ করিতে হইবে এবং বারবার বলিয়া দেন, "যে আয়াত তাহার নিকট পাঠ করা হয় তাহা যেন তিনি তাড়াহুড়া করিয়া আবৃত্তি করা ও পনুরাবৃত্তি করার পূর্বে সতর্কতার সঙ্গে শ্রবণ করেন"। "তাড়াহুড়া করিয়া ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সঙ্গে সঞ্চালন করিও না। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর" (৭৫ ঃ ১৬-১৮)।[৯]

অনুরূপ নির্দেশ ২০ ঃ ১১৪ আয়াতে পুনর্বার দেওয়া হয় ঃ "তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না"।[১০] পুনরায় অনুরূপ উদাহরণ হইল ৮৭ ঃ ৬ আয়াত ঃ "নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না"।[১১] এইগুলি হইল মক্কী জীবনের প্রাথমিক সময়ের সূরা এবং এইগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্ভুল প্রেরণা ও পরামর্শসম্বলিত এবং কুরআনের প্রথম শ্রবণযোগ্য আবৃত্তিকৃত আয়াত এবং তখন তিনি ইহা আবৃত্তি করেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন, যেমন রিচার্ড বেল্ এবং ওয়াট ইহা স্বীকার করেন যে, ইহার (কুরআনের) অর্থ পড়া/আবৃত্তি করা। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন কিছুই পড়া অথবা আবৃত্তি করা মনমত হয় না, এমনকি তাহা যদি "স্মৃতি হইতে"ও হয়, কিন্তু তাহা যদি সুনির্দিষ্ট রচনা হইতে হয় তবে সেইটি হৃদয়গ্রাহী হয় এবং আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে কুরআনে বলেন যে, তিনি এই কুরআন "আরবী ভাষায় আবৃত্তি"যোগ্য করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। "নিশ্চয় আমি কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি"।[১২]

ওয়াট মনে হয় এই বক্তব্যটি উল্লেখ করেন, 'আলা কালবিকা' (আপনার অন্তরে) ২৬ ঃ ১৯২-১৯৩ আয়াতে এই কথা বুঝাইতে যে, ওহী ছিল কতক "পরামর্শ" বা ধারণা। প্রশ্নের উল্লিখিত বক্তব্য-এর অর্থ "ধারণা" ছাড়া আর কিছুতেই প্রযোজ্য নহে। এইজন্য অতি তাড়াতাড়ি তিনি যোগ করেন যে, যাহা অবতীর্ণ হয় তাহা এই بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়, ২৬ ঃ ১৯৪), এইভাবে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার ধরন বর্ণনা করিয়া সন্দেহের অপনোদন করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'আলা কালবিকা' বক্তব্যটি জোর দেওয়ার অভিপ্রায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, এইরূপে মূল পাঠ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরকে আকস্মিক আবেগে অবশ করিয়া ফেলে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মনে এবং মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়, ফলে তিনি ইহা ভুলেন নাই। ইহার অনুরূপ ধারণা ৭৫ ঃ ১৭ আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে ("ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই") এবং ৮৭ ঃ ৬ আয়াতে বলা হইয়াছে ("নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না")। প্রকৃতপক্ষে "আন্তরিকভাবে পাওয়া" এই বক্তব্যটি ইংরেজী ভাষার প্রকাশভঙ্গি বা বাগবৈশিষ্ট্য-এর সঙ্গে পরিচিত, যেমন স্মৃতিতে কিছু অর্পণ করা। এইসব কিছু

আমাদের মাতৃভাষার অথবা বৈদেশিক ভাষার জ্ঞান, কোন সুনির্দিষ্ট পাঠ অথবা শব্দগুচ্ছ সম্পর্কে কিছু বলা নহে, ইহার ব্যাপারে পরবর্তী তাত্ত্বিক আলোচনা করা যাহা প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুরূপভাবে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ নিজ ভাষা অথবা ভাষাসমূহের শব্দভাণ্ডারের প্রত্যেকটি শব্দ, যেমন আমাদেরকে অনুভূতিহীন করিয়া তোলে যখন আমরা উহাদেরকে দেখি অথবা ব্যবহার করি। আমরা কেবল ইহাদেরকে আমাদের স্মৃতি হইতে পুনঃ উৎপাদন করি (অর্থাৎ অন্তর হইতে)। 'আলা কালবিকা' বক্তব্যটি যাহা তথ্য হিসাবে আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে আকস্মিক আবেগতাড়িত ধারণা সৃষ্টি করে এবং ইহা "পরামর্শ" -এর ধারণায় অথবা তাহার সঙ্গে ধারণাগত যোগাযোগের অর্থে নহে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ওহীর প্রথম ধরন সম্পর্কে ওয়াট আল-হারিছ ইব্ন হিশামের হাদীছ উদ্ধৃত করেন।[১৩] এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, কোন কোন সময় ওহী তাঁহার নিকট ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় (صَلْصَلَةُ الْجَرَسِ) আসিত। ওয়াট বলেন, ইহা "সম্পূর্ণ সুসঙ্গত" প্রথম ধরন-এর সঙ্গে এবং ইহা ছিল "নিঃসন্দেহে একটি ধারণাগত অভিজ্ঞতা", একটি "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি"। তিনি বলেন, "ঘণ্টাধ্বনির শ্রবণ নিঃসন্দেহে একটি ধারণাগত অভিজ্ঞতা, কিন্তু কেহ এই ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করে নাই অথবা কথিত শব্দসমূহ শুনে নাই, এমনকি ধারণাগতভাবেও নহে। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতার শেষ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল ওহীকৃত শব্দসমূহ যাহা তাঁহার অন্তরে উদিত হয় তাহা উদঘাটন করেন। ইহা চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট যে, ...ইহা একটি বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গিপূর্ণ বর্ণনা"।[১৪]

ইহা তাৎক্ষণিকভাবে খোলাখুলি বলা দরকার যে, ওয়াট যে ওহীকে প্রথম ধরন বলেন, ওহীর এই ধরন বা পদ্ধতিকে সম্পর্কিত বক্তব্যে তিনি সঠিক নহেন। অর্থাৎ ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই ওহী আসে। উদাহরণস্বরূপ বুখারীর অনুরূপ বর্ণনার অন্য একটি ভাষ্যে ইহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এইটিও ওহী নাযিলের একটি পদ্ধতি ছিল যাহা ফেরেশতার দ্বারা নাযিল করা হইত।[১৫] ওয়াট এই বিষয়টিরও ভুল বর্ণনা করেন যখন তিনি বলেন, "ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ হইল নিঃসন্দেহে একটি কাল্পনিক অভিজ্ঞতা..."। ইহা ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণের বিষয় ছিল না, ইহা ছিল ওহী যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘণ্টাধ্বনির মত শুনিতে পান। মিছলা (مثل) শব্দটি সালসালাহ্ শব্দের সঙ্গে একত্রে ব্যবহৃত হইয়া ইহাকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করিয়া দেয়। না ছিল ইহা একটি "কাল্পনিক অভিজ্ঞতা", যেমন ওয়াট ইহাকে সংজ্ঞায়িত করেন। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উল্লেখ করেন, ইহা ছিল "আমার উপর কঠিনতম" এতদসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইহা ছিল তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন এক শারীরিক অভিজ্ঞতা। এই অনুরূপ বিষয়টিতে হযরত 'আয়েশা (রা) আরও জোর দেন যখন তিনি বলেন যে, তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহার নিকট ওহী আসার সময়ে "একটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা দিনেও তাঁহার কপাল দিয়া ঘাম ঝরিয়াছে"। ইহা আশ্চর্য ব্যাপার যে, ওয়াট এই বর্ণনা আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করার পর (উদ্ধৃত শব্দগুলি তাহার নিজের) পরামর্শ দেন যে, ইহা ছিল "একটি কাল্পনিক অভিজ্ঞতা"।

ওয়াটের দ্বিতীয় গুরুতর ভুলটি তাহার বর্ণনায় বিধৃত "...কাহারও শ্রবণ করার কথা উল্লেখ নাই, যে কাহারও বলা অথবা কথিত শব্দাবলী শ্রবণের উল্লেখ নাই, এমনকি কাল্পনিকভাবেও নহে"। এক্ষণে এইখানে হাদীছের সংশ্লিষ্ট একটি অংশ এই ঃ "ওয়াকাদ ওয়াআয়তু 'আনহু মা কালা" (وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ) যাহার অর্থ এই ঃ "এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি স্মৃতিতে ধারণ করিলাম"। ...কোন ঘটনা ঘটার কথা তাঁহার নিকট এইভাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার মাধ্যমে বলা হয়। ওয়াট এই রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করেন এবং জোর দিয়া বলেন যে, এই ঘটনায় "কেহ কথা বলিতেছে" ইহার "কোন উল্লেখ নাই"। তিনি মনে হয় এমন চিন্তা করেন যে, 'ওয়া'আয়তু' ক্রিয়াটি কোন ধারণার অর্থ বহন করে না এবং ইহা কাহারও নিজে নিজে কিছু বুঝিতে পারার অর্থ প্রকাশ করে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। وَعَى/يَعِى ক্রিয়ার প্রাথমিক অর্থ 'মনে করা, অভ্যন্তরে ধারণ করা, স্মৃতিতে ধরিয়া রাখা, মনে রাখা, স্মরণ করা, সতর্কতার সঙ্গে শ্রবণ করা এবং মনে রাখা' ইত্যাদি।[১৬] আরও বিশেষভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, যখন ইহা 'মা কালা' (مَا قَالَ) -এর সঙ্গে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন ইহা অবশ্যই 'সতর্কতার সঙ্গে শ্রবণ করা' এবং 'যাহা বলা হইয়াছে তাহা মুখস্থ' করা' অর্থ প্রকাশ করে। ওয়াট নিজে এই বাক্যাংশটি অনুবাদ করেন এইভাবে ঃ "And I have understood from it what He (or he) said" "...এবং আমি ইহা হইতে তাহাই বুঝিয়াছি, যাহা তিনি বলিয়াছেন"। এমন ইংরাজীতে যখন ইহা বলা হয় তখন এইভাবে বলা হয় ঃ "I have understood what he said" "তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি", ইহা ঐ শ্রবণযোগ্য বিষয়কে বাদ দেয় না যাহা তিনি বলিয়াছেন। যাহা হউক, ওয়াট তাহার উপরোল্লিখিত বর্ণনায় অন্য আর এক ভুল করেন। তিনি মূল পাঠে উল্লিখিত 'আনহু' (عَنْهُ) শব্দটির অনুবাদ করেন "from it" (ইহা হইতে)। তিনি "ইহা" সুস্পষ্টভাবে এই অর্থ করেন যাহা তিনি কল্পনা করেন ঘণ্টাধ্বনি হিসাবে, কিন্তু ঘটনা এমন নহে। هُ (হু) সর্বনামটি এইখানে ফেরেশতাকে বুঝাইয়াছে, সালসাতুল জারাস (صَلْصَلَةُ الْجَرَس) -কে নহে। উদাহরণস্বরূপ ঐ বিষয়ে ইহা স্ত্রীবাচক সর্বনাম ها (হা)-এর সঙ্গে যুক্ত, 'সালসালাহ' শব্দটি স্ত্রীবাচক।

প্রকৃতপক্ষে وعى/يعى ক্রিয়াটি ইহার বিভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতিতে একটি যথাযথ পরিভাষা যাহা হাদীছ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে, 'তিনি যাহা বলিয়াছেন' তাহা মুখস্থ করা এবং "সতর্কতার সঙ্গে" শ্রবণ করা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা বর্ণনা করা। নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ ক্রিয়ার বিশেষ অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে।

(ক) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বিখ্যাত হাদীছে তিনি বলেন ঃ

...مَا كَانَ اَحَدٌ اَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنِّىْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِيَدِهِ وَيَعِىَ بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ اَعِيْهِ بِقَلْبِىْ وَلاَ اَكْتُبُ بِيَدِىْ...

"আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীছ আমার চাইতে আর কেহ বেশী জানে না। কেননা ইহা তিনি স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন এবং অন্তরের দ্বারা মুখস্থ করিতেন। কিন্তু আমি ইহা মুখস্থ করিয়া লইতাম এবং স্বহস্তে লিখিতাম না..."।[১৭]

(খ) খালিদ আল-'আদওয়ানীর হাদীছ ঃ

قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ) حَتّٰى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا مُشْرِكٌ ثُمَّ قَرَأْتُهَا فِى الْاِسْلَامِ...

"তিনি বলেন, আমি তাঁহাকে পাঠ করিতে শুনিলাম ঃ "ওয়াস-সামাই ওয়াত্তারিক' শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠ করিলেন (৮৪ নং সূরা)। তিনি বলেন, সুতরাং আমি জাহিলী যুগে মুশরিক অবস্থায় ইহা স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইহা পাঠ করিলাম (অর্থাৎ তাহার ইসলাম গ্রহণের পর)"।[১৮]

(গ) 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর হাদীছ ঃ

...وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِىْ حَدَّثَنِىْ...

"... এবং আমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এই হাদীছ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি যাহা তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন"।[১৯]

আরও অনেক বর্ণনা এমন রহিয়াছে যাহাতে ক্রিয়াটি সুনির্দিষ্টভাবে "যাহা বলা হইয়াছে তাহা সতর্কতার সঙ্গে শ্রবণ করা এবং স্মৃতিতে ধরিয়া রাখা" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।[২০] ক্রিয়াটির অনুরূপ অর্থ কুরআনের ৬৯ ঃ ১২ আয়াত দ্বারাও সুস্পষ্ট" ঃ

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ .

"আমি ইহা করিয়াছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, যেন শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে" (৬৯ ঃ ১২)।

এইরূপে ওয়াট বর্ণনায় উল্লিখিত 'ওয়া'আয়তু' ক্রিয়াটির অর্থ উপলব্ধি করিতে ভুল করেন এবং এই ধারণায় ভুল করেন যে, এইখানে বলা এবং শ্রবণ করার ব্যাপারে কোন কিছুর উল্লেখ নাই। তদুপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার অভিজ্ঞতার শেষ পর্যায়ে "ওহীর শব্দসমূহ কেবল তাঁহার অন্তরে প্রাপ্ত হইতেন" বর্ণনার ব্যাপারে ওয়াট-এর মূল্যায়নে মৌলিক ত্রুটি এই যে, যখন ইহা ওহী আগমনের একক পদ্ধতির ব্যাপারে কথা বলে, তখন তিনি এই পদ্ধতিকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতায় বিভক্ত করেন—একটি তথাকথিত "কাল্পনিক অভিজ্ঞতা" এবং অপরটি তথাকথিত "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি"। বর্ণনার মূল পাঠ কিছুতেই একক পদ্ধতির এমন বিভক্তিকে সমর্থন করে

না। ওহী আসার পদ্ধতির কথা এইখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা 'কাল্পনিক অভিজ্ঞতা' ছিল না এবং বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গিও ছিল না। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিক হইতে এক রকম শারীরিক অভিজ্ঞতা এবং মূল পাঠের এক মৌখিক যোগাযোগ যাহা তিনি শ্রবণ করেন এবং তাঁহার স্মৃতিতে ধরিয়া রাখেন।

ওহী আগমনের দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সময়, যেখানে আল্লাহ্‌র বক্তব্য "পর্দার অন্তরাল হইতে"-এর ব্যাপারে ওয়াট বলেন যে, এই বক্তব্যটি প্রাথমিক পর্যায়ে ওহী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভিজ্ঞতার উদাহরণ, "যেমন আয্‌-যুহরী হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার Passage 'B'-এ বর্ণিত হইয়াছে"। সেইখানে বলা হইয়াছে, "তাঁহার নিকট সত্য আসিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল"।[২১] ওয়াট পুনরায় বলেন, যেহেতু "পর্দার অন্তরাল হইতে" শব্দসমূহ ধারণা দেয় যে, বক্তাকে দেখা যায় নাই, ইহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, এই ব্যাপারে একমাত্র "শব্দাবলী শ্রুত হইয়াছে এবং এইজন্য ইহা একটি কাল্পনিক বাচনভঙ্গি (অথবা এমনকি এইটি বাহ্যিক বাচনভঙ্গি)"।[২২]

উপরোল্লিখিত বাক্যসমূহে ওয়াট তাহার বক্তব্যের অসঙ্গতি স্বীকার করিয়াছেন (যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই)। তিনি অনেক পূর্বেই Passage 'B'-এর বক্তব্য ব্যবহার করেন, বিশেষ করিয়া "তাঁহার নিকট সত্য আসিল এবং বলিল...", এই বক্তব্য তিনি আল্লাহ্‌র দর্শনের সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করেন অথবা অন্ততঃপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতীক-এর প্রত্যেক্ষ দৃশ্য (অথবা সম্ভবত, যেমন তিনি ধারণা করেন, মানসিক অথবা কাল্পনিকভাবে আল্লাহ্‌কে দেখা)। কিন্তু এখন তিনি সেই Passage-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন আল্লাহ্‌র বক্তব্যের ধরন বিশ্লেষণ করার জন্য অর্থাৎ "পর্দার অন্তরাল হইতে" এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করার জন্য অর্থাৎ না দেখিয়া এবং এই সময় হইতে ইহা ছিল একমাত্র বিষয় যে, দৃশ্য অবলোকন ছাড়া কেবল বক্তব্য শ্রবণ—"একটি কাল্পনিক" অথবা "বাহ্যিক বাচনভঙ্গি"। ইহা কার্যত ওয়াট-এর অসঙ্গতির সহিত তাল মিলাইয়া চলা বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন। একমাত্র উপদেশমূলক দৃশ্য এই যে, তিনি দ্রুত এই পদ্ধতির সংযোগ করেন, "ইহা ধারণাগত দিক হইতে সাধারণ নহে" এবং কল্পনা প্রয়াসে তিনি "হযরত মূসা (আ)-এর বর্ণনা দেওয়ার ইচ্ছা করেন"।[২৩]

ওহী আগমনের তৃতীয় পদ্ধতি সম্পর্কিত বক্তব্যে বলা হইয়াছে, আল্লাহ ওহী প্রকাশের জন্য দূত প্রেরণ করেন। ওয়াট বলেন, মুসলিম পণ্ডিতগণ চিন্তা করেন, এই দূত ছিলেন জিবরাঈল এবং তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি শুরু হইতেই ওহী লইয়া আসিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন যে, মাদানী জীবন শুরু না হওয়া পর্যন্ত কুরআনে জিবরাঈল (আ) তাঁহার নামসহ উল্লিখিত হন নাই। তবে কুরআন ও হাদীছে তিনি "অনেক বেশী উল্লিখিত হন", "ইহা মুসলমানদের সাধারণ ধারণার বিপরীত"। মুসলমানদের ধারণা এই যে, পরবর্তী ঘটনাকে পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।[২৪]

পরবর্তীতে ওয়াট বলেন, মাদানী জীবনকালে ওহী অবতরণের কাজ জিবরাঈল কর্তৃক সম্পন্ন হয় যাহা সাধারণ বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু এমনকি "এই ধরনের বিষয়ে ওহী ছিল ধারণাগতভাবে একটি কাল্পনিক বাচনভঙ্গি"। উদাহরণস্বরূপ, জিবরীলের উল্লেখ আসিয়াছে "একজন মানুষের আকৃতিতে" যাহা এই ধারণা দেয় যে, ইহা ছিল "একটি কাল্পনিক দৃশ্য"।[২৫]

এইখানে ওয়াট একই পুরানো যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন যে, মাদানী জীবন শুরু না হওয়া পর্যন্ত কুরআন শরীফে জিবরাঈল নাম উল্লিখিত হয় নাই এবং ইহার ভিত্তিতে তিনি বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ধারণা পরবর্তী ঘটনাকে পূর্ববর্তী ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করিয়াছে।

এই সুনির্দিষ্ট বক্তব্য যথাযথ পুনরাবৃত্তি, যাহা বেল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন।[২৬] এই মন্তব্য এবং বর্ণনা এই যে, মুসলিম ধারণা ইহার বিপরীত, যাহা কুরআনের ও হাদীছের বক্তব্য সম্বলিত। কুরআন ও হাদীছ সুস্পষ্টরূপে উপরোল্লিখিত যুক্তিভিত্তিক এবং অন্যান্য ধারণাভিত্তিক, উদাহরণস্বরূপ (ক) যেমন, আয্-যুহরীর বর্ণনা "সত্য" (the truth) সম্পর্কে বলেন এবং জিবরাঈল যে ওহী লইয়া আসেন, তাহার উল্লেখ নাই; (খ) যেমন সূরাতুন নাজ্ম-এর আয়াত আল্লাহ্র দর্শন সম্পর্কে কথা বলে; এবং (গ) যেমন, ওহী পরিভাষাটি, যেমন কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা মূল পাঠ-এর মৌখিক প্রত্যাদেশের অর্থ প্রকাশ করে না। এই সকল ধারণা ইতিপূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছে এবং ভুল ও অসমর্থনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।[২৭]

ওয়াট স্বীকার করেন যে, জিবরীলের মাধ্যমে ওহী অবতরণ মাদানী জীবনে একটি সাধারণ বিষয় ছিল। কেন তখন এই একই ফেরেশতা প্রাথমিক সময়ে ওহী অবতরণকারী হইতে পারেন না তাহা ওয়াট ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহার পূর্ববর্তী রিচার্ড বেল অবশ্য ধারণা করেন, যেমন আগে দেখানো হইয়াছে[২৮] যে, জিবরাঈল (আ) মদীনায় পরিচিত হন। কারণ ইহা ছিল কেবল তখনই যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে জানিতে পারেন। এই ব্যাখ্যার অযৌক্তিকতা ইতোপূর্বে নির্দেশ করা হইয়াছে। ওয়াট এই সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অগ্রসর হন নাই, সম্ভবত ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বেল-এর ব্যাখ্যার দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

একদিকে ওয়াট স্বীকার করেন যে, মাদানী জীবনকালে জিবরাঈল (আ) কর্তৃক ওহী অবতরণ একটি সাধারণ বিষয় ছিল। অন্যদিকে তিনি বলেন যে, এই ধরনের ব্যাপারে এইসব বিষয় "ধারণাগতভাবে কাল্পনিক" বাচনভঙ্গি। কারণ হাদীছসমূহ জিবরাঈল (আ)-কে "মানুষের বেশে" উপস্থিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছে। উহা এই ধারণা দেয় যে, তাঁহার উপস্থিতি ছিল "কাল্পনিক দৃশ্য"। এইখানে কেবল এই বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিবরাঈল (আ)-এর আগমন সবসময় তাঁহার জন্য একান্ত গোপন বিষয় ছিল না। যেমন ঈমান ও ইহ্সান সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদীছে উক্ত জিবরাঈল (আ)-এর একজন মানুষের বেশ ধরিয়া আগমন বা উপস্থিতি ছিল এক শারীরিক ব্যাপার যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়টি কেবল এই কথা বলিয়া মীমাংসা হইতে পারে

না যে, ফেরেশতার উপস্থিতি ছিল "সম্ভবত একটি কাল্পনিক দৃশ্য" যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একার জন্য প্রয়োজ্য ছিল।

ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ওহীর ধরন যাহাই হউক না কেন, ওয়াট ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'ইহা হয় একটি কাল্পনিক অথবা একটি বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি'। এইভাবে ওহীর প্রথম ধরন, ওয়াট-এর মতে, ছিল একটি "অভ্যন্তরীণ বিষয়", "সম্ভবত" একটি "বুদ্ধিগত" বাচনভঙ্গি। দ্বিতীয় ধরন, "একটি কাল্পনিক বাচনভঙ্গি (অথবা এমনকি ইহা একটি বাহ্যিক বাচনভঙ্গি)" এবং তৃতীয় ধরন এই যে, "সম্ভবত ইহা একটি কাল্পনিক" বাচনভঙ্গি। সম্পূর্ণ কৌশল এইভাবে পরিচালনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, কুরআনিক ওহী ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মন, "বুদ্ধিমত্তা" ও বিবেকপ্রসূত বিষয়। ইহা যে কোন মূল পাঠ-এর মৌলিক প্রত্যাদেশ নহে, যাহা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে শারীরিকভাবে হয় নাই। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া ওয়াট মনে হয় এই উদ্দেশ্যেও ইসলামিক ওহীকে খৃস্টান ধ্যান-ধারণার "উদ্দীপনা"র সঙ্গে একই পথে লইয়া আসেন। ইহার পর তিনি তাঁহার পাঠকদেরকে "দর্শন" এবং "বাচনভঙ্গি"-এর সঙ্গে অলীক কিছু অস্তিত্বের বিশ্বাসকে বিভ্রান্তিপূর্ণ বলিতে নিষেধ করেন। বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া "বিজ্ঞান" এবং গূঢ় অর্থপূর্ণ ধর্মতত্ত্বের "শৃঙ্খলা" যেমন A. Paulain-এর মত লেখকদের দ্বারা বিকশিত হয় এবং তিনি বলেন যে, ইহা নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক হইবে, যাহাকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর বিষয়কে খৃস্টান সাধু ও সূফীবাদ-এর সঙ্গে তুলনা করেন।[২৯]

ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, ওয়াট কর্তৃক যতদূর কুরআনিক ওহীর "পদ্ধতি" এবং A. Paulain-এর সূফীতাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে যে তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা না যুক্তিনির্ভর, না সমর্থনযোগ্য। কুরআনিক ওহী অবতরণ পদ্ধতি খৃস্টান সাধুতত্ত্ব ও সূফীতত্ত্বের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনীয় নহে, যাহারা "উদ্বুদ্ধ" হন তাহাদের নিজেদের কথিত শব্দাবলীর দ্বারা, যাহা তাহারা "উদ্দীপনা" হইতে উপলব্ধি করেন।

সর্বশেষে, ওয়াট "ওহী প্রাপ্তির সঙ্গে শারীরিক সহযোগ"-এর কথা উল্লেখ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘটনাবলী (দিছার ঃ dithar)-এর উপর প্রয়োগ করেন এবং বলেন, যে সকল অনুষঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে তাহা সন্ন্যাস রোগের সঙ্গে চিহ্নিত নহে, যে অভিযোগ ওয়াট বাতিল করেন এই বলিয়া যে, ইহা "সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিপূর্ণ, অবিশ্রিত অজ্ঞতা ও কুসংস্কারভিত্তিক"। যাহা হউক, এমন মন্তব্য করিয়া তিনি ক্লান্তিকরভাবে আলোচনা করিতে গিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহীর "প্ররোচনা"র পদ্ধতি সম্পর্কে "শ্রুতির" দ্বারা অথবা স্বেচ্ছাঅভিভূত হওয়া অথবা আমরা ইহাকে যাহাই বলি না কেন, ত্রুটিপূর্ণতার কথা বলেন।[৩০] ইহার পরও অভিযোগ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন সংশোধন করার পদ্ধতি জানিতেন, ...সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে জানিতেন, যাহা তাঁহার নিকট অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবতীর্ণ হইত অথবা অশুদ্ধ পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হইত"।[৩১] ইতোপূর্বে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর "ওহী সংশোধনের প্ররোচনা"র প্রচেষ্টা সম্পর্কে

ওয়াট যাহা বলেন, সেই সম্পর্কে তিনি যখন কথা বলেন, তিনি লক্ষ্য করেন যে, "ইহা নিষ্ঠাবান মুসলিম তত্ত্বের একটি অংশ, যাহার কতক ওহী অন্যদের দ্বারা বাতিল হইয়া যায়"।[৩২]

এক্ষণে ইহা বলা উচিত যে, ওয়াট এইখানে তাহার পূর্বসূরীদের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব একটি ধারণার মধ্যে একীভূত করিয়াছেন। তিনি একদিকে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মারগোলিয়থের ওহীর প্ররোচনা তত্ত্বের স্বেচ্ছাঅভিভূত হওয়ার মাধ্যমে ইত্যাদি এবং অপরদিকে তিনি ইহাকে বেল্-এর পুনরাবৃত্তি তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন যে, পুনরাবৃত্তি কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক সংঘটিত হয়। ইহা স্মর্তব্য যে, পক্ষান্তরে মারগোলিয়থ তাহার "প্ররোচনা" তত্ত্বকে "শারীরিক সহযোগে ওহী প্রাপ্তি"—এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বিন্যস্ত করেন। বেল তাহার তত্ত্ব কুরআনের ভাষার আঙ্গিক এবং বাতিল বা রহিতকরণ-এর উপর ভিত্তি করিয়া বিন্যস্ত করেন। সুতরাং শেষোক্ত জন অর্থাৎ বেল্-এর ধারণাসমূহ এই আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, এই ধারণাসমূহ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অযৌক্তিক প্রমাণিত হইয়াছে।[৩৩]

ইহা পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, রহিতকরণ (নাস্খ)-এর ধারণা কুরআনের কোন আয়াতের স্থলে অন্য আয়াতের বা আয়াতসমূহের পুনস্থাপন নির্দেশ করে না, বরং নির্দিষ্ট আদেশ অথবা নির্দেশাবলী এবং হেদায়াতের নিয়ামাবলীর সংশোধনী বুঝায়। ওয়াট দুইটি ধারণাকে "শারীরিক ধারণা সহযোগে"র মাধ্যমে সূক্ষ্ম কৌশলের দ্বারা সংযুক্ত করেন যাহাকে "কৌশল" বলে, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখান হয় যে, তিনি কুরআন সংশোধনের জন্য "শ্রবণ" এবং "বিস্মৃত আয়াতসমূহের" উৎঘাটনে উন্নয়ন সাধন করেন। কটাক্ষের বিষয়টি এই যে, সম্ভবত ওহীর তথাকথিত "প্ররোচনার সংযোগ একদিকে এবং কুরআন সংশোধনের "কৌশল" অথবা কুরআন পুনঃ পরীক্ষণ অপরদিকে অর্থাৎ এই উভয় ব্যাপারে ইহা একটি অভিজ্ঞতা ও কৌশলের বিষয় যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অর্জিত অথবা কৃত্রিমভাবে প্রবর্তিত। ইহা একটি স্বেচ্ছাঅভিভূত হওয়ার ব্যাপার অথবা আমরা ইহাকে যাহাই বলিনা কেন"। ইহা বিচার করা মুশকিল, কিভাবে এই কটাক্ষপাতের বিষয়টি সন্যাসরোগ বা মৃগীরোগের অভিযোগের চাইতে ভাল হইতে পারে যাহা ওয়াট অত্যন্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণভাবে বাতিল করেন। তাহার সন্যাসরোগ তত্ত্ব বাতিল করার মূল কারণের উদ্ভব হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাবমূর্তিকে একটি উত্তম পদ্ধতিতে উপস্থাপনের মনোভাবের দ্বারা তাড়িত হওয়া নহে, বরং মূল বিষয়টি উপলব্ধি করাই আসল কথা। যেমন ওয়াট বিশ্লেষণ করেন যে, "ঐ রোগ অর্থাৎ সন্যাসরোগ একটি মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অধঃপতিত করে, কিন্তু পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ﷺ শেষ পর্যন্ত তাঁহার সকল মানবীয় গুণাবলীসহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন"।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণতার বিকল্প এবং অত্যন্ত বাস্তব প্রতিফলনের উপর আলোকপাত করিতে গিয়া ওয়াট কোন একটি উদাহরণও উল্লেখ করেন নাই, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ "শারীরিক অবয়বসহ" "প্ররোচিত" হন অথবা "কুরআন সংশোধনের" "কৌশল" প্রয়োগ করেন অথবা "বিস্মৃত আয়াতগুলি উদ্ধারে" ব্যাপৃত হন। ওয়াট কেবল অভিযোগ প্রমাণ করার

জন্য তাহার মূল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া বলেন যে, "বিস্তারিত বিষয় অবশ্যই অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু ইহা নিশ্চিত মনে হয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর কুরআন সংশোধনের কতিপয় পদ্ধতি ছিল..." ।[৩৫]

এইরূপে ওয়াট তাহার উপসংহার "আনুমানিক" বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উপস্থাপন করেন এবং যাহা "নিশ্চিত মনে হয়" (তাহার মনে) এমন বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উপস্থাপন করেন। এমনকি তিনি এই অংশটি শুরু করেন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিষ্ঠা ও সততার কথা স্মরণ করানোর মাধ্যমে, "উপসংহারমূলক প্রমাণ হইল আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বিষয় প্রদর্শনের চাইতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়"। সুস্পষ্টভাবে ওয়াট স্বীকৃত উদ্দেশ্যকে বেদীতে উৎসর্গ করেন ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে নহে বরং কুসংস্কার রক্ষা করার ধারণায়।

ওয়াট কিছুটা নরম হইয়া তাহার উপসংহারে এই কথা যোগ করেন, ঘটনা এই যে, "মুহাম্মাদ ﷺ কোন কোন সময় তাঁহার নিকট ওহী অবতরণের অভিজ্ঞতায় প্ররোচিত হন" এই বক্তব্যটি "ধর্মতত্ত্ববিদগণের বৈধতার বিচারে" প্রাসঙ্গিক নহে।[৩৬] বিবরণটি অপ্রয়োজনীয়। কারণ ওয়াট কোন ধর্মতাত্ত্বিক মতামত প্রকাশ না করার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হউক অথবা ধর্মতাত্ত্বিকগণের বিচারের বিষয় হউক, ইহা ঐতিহাসিকগণের সত্য অনুসন্ধানের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অবিমিশ্রভাবে তিনি তাহার পূর্ববর্তীদের ধ্যান-ধারণা নূতন করিয়া গঠন করিয়া বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন সময় প্ররোচিত" হইতেন, অর্থাৎ তিনি কৃত্রিমভাবে ওহী উৎপাদন করিতেন অথবা মন্ত্রমুগ্ধতার দ্বারা অথবা অনুরূপ কোন কিছুর দ্বারা কুরআনের সংশোধন করিতেন। ওয়াট সুস্পষ্টভাবেই তাহার ঐতিহাসিক অবস্থান হইতে পদস্খলিত হন এবং তিনি তাহার শুরুতে যে মানদণ্ড স্থাপন করেন সেই অনুযায়ী কাজ করিতে ব্যর্থ হন।

ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এইখানে ওয়াট একটি অসুবিধার মধ্যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার মনোযোগ A.Poulain-এর "কাল্পনিক" ও "বুদ্ধিগত" বাচনভঙ্গির গঠন কাঠামোর প্রতি "ওহীর অভিজ্ঞতা" উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নিবদ্ধ করেন। অবশেষে তিনি নিজেকে শারীরিক কঠোরতার এবং বৈশিষ্ট্যের ঘটনাবলীর সঙ্গে দ্বন্দ্বমুখর অবস্থায় এমনভাবে পান যে, নিঃসন্দেহে কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী আসার বিষয়ে ওয়াট এই দ্বান্দ্বিকতার কথা উল্লেখ করেন। ওয়াট বুদ্ধিগত অথবা কাল্পনিক বাচনভঙ্গির তত্ত্বে ইহার সমন্বয় অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। ইহার পর হইতেই তিনি কেবল মারগোলিয়থ বেল্-এর ওহীর প্ররোচনা ও কুরআন সংশোধন তত্ত্বকে মনোবেদনায় আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেন। তিনি মনে হয় নিজে নিজে প্ররোচিত হন এবং মনে করেন যে, অতঃপর (সন্যাস) রোগতত্ত্ব কোন কার্যকর কাজ করে না, অর্থাৎ কোন বিবেচনাপূর্ণ কাজ করে না। উদাহরণস্বরূপ কৃত্রিমভাবে লক্ষণসমূহ এবং ওহী অবতরণ প্ররোচিত করে। যদি ওয়াট বাস্তবিকভাবে ও কার্যকরভাবে ঘটনাবলী বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি এই বৈশিষ্ট্য বাদ দিতেন না যে, "শারীরিক অবয়ব সহযোগে ওহী লাভ" যাহা অত্যন্ত বলিষ্ঠতার "সঙ্গে" বুদ্ধিগত অথবা কাল্পনিক বাচনভঙ্গি তত্ত্বের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করিয়াছে। সর্বোপরি খৃষ্টান

সাধু-সন্তদের ব্যাপারে A. Poulain প্রধানত এই ধারণা দেন যে, তাহারা মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী নাযিল হওয়ার সময় "শারীরিক অবয়ব সহযোগে" ওহী নাযিল হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার বিষয়টি খৃস্টান সাধু-সন্তদের হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তাহাদের "অভ্যন্তরীণ প্রার্থনার" প্রকৃতি এবং "প্রেরণা" যাহাই হউক না কেন, তাহাদের অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি স্থানান্তরিত হইতে পারে না।

শারীরিক অবয়ব সহযোগে ওহী প্রাপ্তির উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এমন ঘটনা খুবই কম। সুতরাং যদি ওহী অধিকাংশ সময়ে বুদ্ধিগত অথবা কাল্পনিক বাচনভঙ্গি হইয়া থাকিত, যেমন ওয়াট বলেন, ইহা বোধগম্য নহে, কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ "প্ররোচনা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লক্ষণসমূহ এবং ওহী নাযিলের অবস্থা তৈরী করিতেন। প্ররোচনার বিষয়টির লক্ষণ তখনই উপস্থাপিত হয় যখন লক্ষণসমূহ ক্রমাগত দৃশ্যমান হয় অথবা ওহী আগমনের সহগামী হয়। কিন্তু সর্বোপরি বিষয়টি এমন নহে। অতঃপর লক্ষণসমূহ না রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্ররোচিত ছিল এবং না ওহী আসার বিষয়টি ঐ লক্ষণসমূহ ছাড়া কেবল বুদ্ধিগত অথবা কাল্পনিক বাচনভঙ্গি ছিল।

"কাল্পনিক বাচনভঙ্গি" অথবা "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি" এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে পরিভাষাগত দিক হইতে বিরোধপূর্ণ। "Locution"-এর অর্থ "বক্তব্যের স্টাইল", "শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি", বাক-বৈশিষ্ট্য ও বাগধারা"। A. Poulain বলেন যে, যখন "কাল্পনিক বাচনভঙ্গি" কানের সহায়তা ছাড়া (শ্রবণশক্তির সহায়তা ছাড়া) কাল্পনিক ধারণা দ্বারা প্রাপ্ত হয়, "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি" হইল শব্দাবলী ছাড়া চিন্তার সাধারণ যোগাযোগ এবং ফলত এই যোগাযোগ সুনির্দিষ্ট ভাষা ছাড়া"। এক্ষণে চিন্তা ও ধারণা একটি বিমূর্ত বিষয়, যাহা প্রকাশিত হয় অথবা যোগসূত্র তৈরী করে একমাত্র শব্দাবলীর দ্বারা এবং ভাষার দ্বারা, এইগুলি হইল ইহাদের একমাত্র বাহন। শব্দাবলী এইরূপে চিন্তা ও ধারণা হইতে অবিচ্ছেদ্য। কোন একজন ব্যক্তি, তাহার ভাষা যাহাই হউক না কেন, তাহার চিন্তা ও স্বপ্ন তাহার নিজের ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়, সে ইহাদেরকে মৌখিকভাবে প্রকাশ করুক অথবা না করুক অথবা তাহার বক্তব্য প্রকাশের সময় সে অনুরূপ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করুক অথবা অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করুক বা না করুক। যে কোন ব্যক্তি, যাহার কোন ভাষা নাই, তাহার কোন ধারণা শক্তিও থাকিবে না এবং চিন্তাশক্তিও থাকিবে না। A. Poulain-এর "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি"র সংজ্ঞা "চিন্তার সাধারণ যোগাযোগ"-এর মত যাহা শব্দ এবং ভাষা ছাড়া এমনভাবে উদ্ভূত হয় যাহা উচ্চকণ্ঠযুক্ত অর্থাৎ গলাবাজি অর্থহীন প্রলাপ।

A. Poulain এবং ওয়াট এই বক্তব্যের ধারণা সম্পর্কে যাহাই মনে করুন না কেন, ধারণার বা কল্পনার কিছু কার্যকারিতা আছেই, তাহা বুদ্ধিগত দিক হইতে হউক অথবা কাল্পনিক দিক হইতে হউক। ইহার উপাদানের অস্তিত্বের প্রাক-ধারণাগত বিষয় ব্যক্তির অবচেতন মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্যক্তি অবশ্যই ইহার গভীর অনুভূতি, ধারণা অথবা কল্পনা ইত্যাদি যে কোনভাবে অথবা অন্য যে কোন পর্যায়ে অথবা জীবনেব কোন না কোন স্তরে অর্জন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে

কথা হইল, সকল তত্ত্ব-থিওরীর অবতারণা সত্ত্বেও প্রকৃত বিষয়টি এই যে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল এবং মক্কার বাজারের, এমনকি অন্যান্য স্থানের সাধারণের নিকট হইতে ভাল অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইহা প্রমাণিত হয় নাই যে, তিনি পূর্বেই এইসব ধারণা এবং তথ্যাদি লাভ করিয়াছিলেন কি না, যে বিষয়গুলির কথা কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে অথবা কুরআন সেই বিষয় সম্পর্কে কথা বলিয়াছে। পক্ষান্তরে যদি এই প্রাক-প্রয়োজনীয় জ্ঞান অথবা ধারণা অবচেতন মনে অস্তিত্বপূর্ণ হইত তাহা হইলে তাহা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত, এই বিষয়ে ইহা "অতিন্দ্রীয়" জ্ঞানের ভূমিকার অপরিহার্যতায় পরিণত হইত। ওয়াট অবশ্য এক সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রত্যাদেশ "অতিন্দ্রীয়"ভাবে লাভ করেন"।[৩৭] বুদ্ধিগত এবং কাল্পনিক বাচনভঙ্গি তত্ত্বকে কুরআনের ওহীর ব্যাপারে প্রয়োগ করায় ওয়াট কোন ক্ষেত্রেই "অতিন্দ্রীয়তার" কথা উল্লেখ করেন নাই, এমনকি তিনি ইহার সঙ্গে বুদ্ধিগত ও কাল্পনিক বাচনভঙ্গির পদ্ধতির সম্পর্কের যোগসূত্র চিহ্নিত করেন না। প্রকৃতপক্ষে যদি "অতিন্দ্রীয়তা"র ভূমিকা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সুসামঞ্জস্যতাপূর্ণভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে A. Poulain কর্তৃক সরবরাহকৃত "তথ্যাদি" (equipment) ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হইবে না।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, একদিকে ওয়াট কুরআনিক ওহীর ব্যাপারে বেল্‌-এর ধারণা অনিবার্যভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। শেষোক্ত জনের কুরআনে উল্লিখিত এবং কুরআনের সূরা ৫৩ ঃ ৪-১৪ ও ৪২ ঃ ৫০-৫২-এ উল্লিখিত ওহী পরিভাষার ব্যাখ্যা অবলম্বনে তিনি ইহা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী আসার বর্ণনাকে বিকৃত করিয়া এবং A. Poulain কর্তৃক সরবরাহকৃত "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি"-এর উপকরণ বা তথ্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আলোচনা উপস্থাপন করেন। বেল তাহার ওহী পরিভাষার ব্যাখ্যায় মারাত্মক ভুল করিয়াছেন যাহা কুরআনের কতিপয় আয়াত বিশ্লেষণ করিয়া ইতিপূর্বে দেখানো হইয়াছে[৩৮] যেখানে এই সুনির্দিষ্ট ভাষাটি কুরআনের ওহী নাযিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে ওহী পরিভাষাটি ব্যবহার ছাড়াই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কুরআন নাযিল হওয়ার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে। বেল এবং ওয়াট এই দুইজনের কেহই এই আয়াতগুলিকে বিবেচনায় আনেন নাই। এইসব আয়াত উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করা সময়োপযোগী হইবে।

তিন ঃ কুরআনের ওহীর ধরন সম্পর্কে কুরআনের আরও প্রমাণ

(১) পবিত্র কুরআনের ১২৫টিরও অধিক আয়াতে কুরআন যে নাযিলকৃত সেই বিষটি সম্পর্কে বলা হইয়াছে (তানযীল, تَنْزِيْلٌ/আন্‌যালনা اَنْزَلْنَا, মুনায্‌যাল مُنَزَّلٌ ইত্যাদি)। এইখানে এই বিষয়টি জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রত্যাদিষ্ট বিষয়টি ছিল সুনির্দিষ্ট মূল পাঠ। কোন কোন বিমূর্ত চিন্তা অথবা ধারণা অথবা প্রেরণায় "অবতীর্ণ" হয় নাই। কতিপয় আয়াতে, উদাহরনস্বরূপ ৬ ঃ ৯৩ আয়াতে 'উনযিলা' ও 'আন্‌যালা' এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ 'উহিয়া' ও 'আওহা'[৩৯] শব্দদ্বয়ের সঙ্গে

অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১২৫ অথবা অনুরূপ সংখ্যকবারের মধ্যে কমপক্ষে আরও ৩৪ বার শব্দটি আল্লাহ "ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন" এই অবয়বে উল্লিখিত হইয়াছে (নায্যালা نَزَّلَ এবং আনযালা أَنْزَلَ)।[৪০] পুনরায় আল্লাহ নিজে তাঁহার বক্তব্যে প্রথম পুরুষে কমপক্ষে ৩৪বার বলেন, "আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি" (আন্যালতু أَنْزَلْتُ, আনযালনা أَنْزَلْنَا, নায্যালনা نَزَّلْنَا)।[৪১] কমপক্ষে ৪৪ বার ইহা কর্মবাচ্যে বলা হইয়াছে যে, "ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে" (উনযিলা أُنْزِلَ, উনযিলাত أُنْزِلَتْ, নুয্যিলা نُزِّلَ , নুয্যিলাত نُزِّلَتْ, ইয়ুনায্যালু يُنَزَّلُ, তুনায্যালু تُنَزَّلُ)।[৪২] এবং কমপক্ষে ১৪ বার কুরআন "যাহা নাযিলকৃত" হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে (তানযীল تَنْزِيلٌ, মুনায্যাল مُنَزَّلٌ)।[৪৩] পুনরায় এই সম্পর্কে সকল সন্দেহ দূর করার জন্য আল্লাহ নিজে নিম্নেবর্ণিত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন ঃ

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

"পরন্তু তোমার প্রতি আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তিনি সজ্ঞানে নাযিল করিয়াছেন (এই সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা সহকারে)। আল্লাহ ইহার সাক্ষ্য দেয় এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৪ ঃ ১৬৬)।

(২) অনুরূপভাবে অন্তত পক্ষে এক ডজনবার জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, "যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা আরবী ভাষায় এক সুনির্দিষ্ট শব্দে বলা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا...(١٢ : ٢).

"ইহা আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন" (১২ ঃ ২)।

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ...... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ .

"নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ, ...অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়" (২৬ ঃ ১৯২...১৯৫)।[৪৪]

(৩) এই কুরআন সামগ্রিকভাবে নাযিল করা হইয়াছে, এমনকি কয়েক গণ্ডারও বেশি সংখ্যক আয়াতে ইহা 'কিতাব' (পুস্তক) হিসাবে উল্লিখিত বা বর্ণিত রহিয়াছে।[৪৫] নিম্নে এই ধরনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হইল ঃ

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

"এই কিতা ব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই" (৩২ ঃ ২)।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ . اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ... .

"এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে। আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি..." (৩৯ ঃ ১-২)।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا .

"আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব" (৩৯ : ২৩)।

(৪) ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উপরে উল্লিখিত আয়াতে,যাহা নাযিল করা হইয়াছে সেই বক্তব্যকে "বক্তব্য/বাণী" অথবা "পাঠ" (হাদীছ) হিসাবে অভিহিত করা হয়। অনুরূপ বর্ণনা অন্যান্য আয়াতেও উল্লিখিত হয়। উদাহরণস্বরূপ :

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.... .

"সুতরাং যাহারা এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে আমার হাতে ছাড়িয়া দাও" (৬৮ : ৪৪)।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ.... .

"উহারা যদি সত্যবাদী হয় ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না" (৫২ : ৩৪)।[৪৬]

(৫) একই সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, নাযিলকৃত ওহীকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ (Decree-حكم), তাঁহার আদেশ/নির্দেশ (Amr - امر) হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

"ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করিয়াছেন" (৬৫ : ৫)।

উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা :

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ .

"ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করিয়াছেন" (৬৫ : ৫)।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا .

"এবং এইভাবে আমি উহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক নির্দেশ, আরবী ভাষায়" (১৩ : ৩৭)।

(৬) ইহা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, উহাকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি সূরা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ :

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ .

"ইহা একটি সূরা, ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহার বিধানকে অবশ্য পালনীয় করিয়াছি, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ" (২৪ : ১)।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ... .

"মুনাফিকেরা ভয় করে, তাহাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা অবতীর্ণ না হয়..." (৯ : ৬৪)।[৪৭]

(৭) পুনরায় বলা যায় যে, যাহা "প্রেরিত হইয়াছে", তাহাকে যিক্র পরিভাষায় উল্লেখ করা হয় (উদ্ধৃতি, ঘটনা, বর্ণনা, স্মৃতিচারণ)। উদাহরণস্বরূপ ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ .

"আমিই কুরআন (যিক্র) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক" (১৫ ঃ ৯)।

وَقَالُوْآ يٰاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ .

"উহারা বলে, 'ওহে যাহার প্রতি কুরআন (যিক্র) অবতীর্ণ হইয়াছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ" (১৫ ঃ ৬)।

...وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ .

"এবং আমি তোমার প্রতি কুরআন (যিক্র) অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে" (১৬ ঃ ৪৪)।[৪৮]

(৮) ইহা ছাড়াও "অবতীর্ণ করা বা নাযিল করা" এই পরিভাষার বদলে কুরআনিক ওহী বুঝাইবার জন্য অন্যান্য পরিভাষাও ব্যবহৃত। এই ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হইল 'ইলকা'; ইহার অর্থ 'প্রকাশ করা, নিক্ষেপ করা, সবেগে নিক্ষেপ করা বা উপর হইতে ছুড়িয়া দেওয়া, হুকুম করা' ইত্যাদি, যাহা প্রথমদিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً .

"আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী" (৭৩ ঃ ৫)।

অন্য একটি প্রাথমিক পর্যায়ের আয়াতে এই পরিভাষাটি উল্লিখিত হয় ঃ

ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا .

"আমাদিগের মধ্যে কি উহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে" (৫৪ ঃ ২৫)?

(৯) অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হইল ওয়াস্‌সালনা (وَصَّلْنَا), ইহার অর্থ "আমরা পৌঁছাইয়া দিয়াছি"। এই শব্দটি কুরআনের ওহী নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ঃ

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

"আমি তো উহাদিগের নিকট পরপর বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে" (২৮ ঃ ৫১)।

(১০) অনুরূপভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়াতে 'কাসাস্‌না' (قَصَصْنَا) (আমরা বর্ণনা করিয়াছি) এবং 'নাকুস্‌সু' (نَقُصُّ) (আমরা বর্ণনা করি) শব্দদ্বয় 'আওহায়না' (اَوْحَيْنَا)

(আমরা প্রত্যাদেশ করিয়াছি) এবং 'নূহী' (نُوْحِيْ) (আমরা প্রত্যাদেশ প্রেরণ করি) শব্দদ্বয়ের অনুরূপ অর্থ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا .

"এই সকল জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি" (৭ ঃ ১০১)।

وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ .

"রাসূলদিগের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি" (১১ ঃ ১২০)।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ .

"আমি তোমার নিকট উহাদিগের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি" (১৮ ঃ ১৩)।[৪৯]

ইহা উল্লেখ্য যে, যেসকল আয়াত বর্ণনা করা হইল উহার সব কয়টিতেই এই পরিভাষাটি "বিবরণ / বর্ণনা" ইত্যাদি (নাবা, আন্‌বা) অর্থে প্রযোজ্য।

(১১) আরও অধিকতর তাৎপর্য রহিয়াছে কতিপয় বক্তব্যের মধ্যে, যেমন ঃ نُقْرِئُ, নুকরিউ "আমরা ইহা পাঠ করিয়াছি"; قَرَأْنَا, কারা'না ঃ "আমরা পাঠ করিয়াছি" এবং نَتْلُوْا, নাত্লূ, "আমরা আবৃত্তি করিয়াছি" ঃ نُوْحِيْ (নূহী) এবং اَوْحَيْنَا (আওহায়না) শব্দের পরিবর্তে উপরিউক্ত শব্দগুলি আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى .

"নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না" (৮৭ ঃ ৬)।

فَاذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ .

"সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর" (৭৫ ঃ ১৮)।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ .

"এইগুলি আল্লাহ্র আয়াত যাহা আমি তোমার নিকট পাঠ করিতেছি যথাযথভাবে" (৪৫ ঃ ৬)।[৫০]

ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরে বর্ণিত ৮ ও ৯ ক্রমিক নম্বরে উল্লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী, যাহা কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাকে قَوْلٌ অর্থাৎ আল্লাহ্র বক্তব্য বা কথা/শব্দ বলে।[৫১] এই পরিভাষাটির ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীছের (বর্ণনা, বক্তব্য) এবং কালিমাত (শব্দসমূহ)-এর অনুরূপ তাৎপর্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে قُلْ (তুমি বল), এই বক্তব্যটি কুরআনে কমপক্ষে ৩৩২ বার উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জোর দিয়া বলা যায় যে, আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র পক্ষ হইতেই নির্দেশনা প্রাপ্ত হন।

পুরা বিষয়টির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কমপক্ষে অর্ধ ডজন বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে 'ওহী' শব্দের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কুরআনের ওহী অবতরণকে বুঝাইবার জন্য। এইসব পরিভাষা পুনরায় আলোচনা করা যাইতে পারে ঃ

(ক) আনযালনা (أَنْزَلْنَا) "আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি" ঃ মূল শব্দে বিভিন্ন গঠন কাঠামোয় এবং পুনঃ পুন প্রতিভাত হয় যে, কুরআন একটি "নাযিলকৃত" (তানযীল, মুনায্যাল) বিষয়।

(খ) ওয়াস্‌সালনা وَصَّلْنَا ঃ "আমরা পৌছাইয়াছি"।

(গ) নুক্‌রিউ/কারা'না (نُقْرِئُ/قَرَأْنَا) ঃ "আমরা ইহা পাঠ করিয়াছি"।

(ঘ) নাত্‌লূ (نَتْلُوا) ঃ "আমরা আবৃত্তি" করিয়াছি।

(ঙ) নুল্‌কী (نُلْقِي) ঃ "আমরা নিক্ষেপ করি/পৌছাইয়া দেই"।

(চ) নাকুস্‌সু (نَقُصُّ) ঃ "আমরা বিববরণ দেই/বর্ণনা করি"।

এই শব্দগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, যাহা কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নাযিল হইয়াছিল তাহা ছিল সুনির্দিষ্ট পাঠযোগ্য পদ্ধতিতে, কিন্তু প্রমাণাদি কেবল একটি পরিভাষায় সীমাবদ্ধ নহে। ঐ আয়াতসমূহ 'ওহী' পরিভাষার সঙ্গে অন্যান্য পরিভাষা সম্বলিতও ছিল এবং অনেক বর্ণনায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয় যে, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা ছিল এই যে ঃ

(ক) A Quran, কুরআন (পাঠ/আবৃত্তি)।

(খ) A Kitab, কিতাব (পুস্তক/ধর্মগ্রন্থ)।

(গ) A Surah, সূরা (সূরা, অধ্যায়)।

(ঘ) Hadith, হাদীছ (আল্লাহ্‌র বর্ণনা/বক্তব্য)।

(ঙ) Qawl, কাওল (আল্লাহ্‌র বাণী/বক্তব্য)।

(চ) Kalimat, কালিমাত (আল্লাহ্‌র কথাসমূহ)।

(ছ) Hukm, হুক্‌ম (আল্লাহ্‌র আদেশ/নির্দেশ)।

(জ) Amr, আম্‌র (আল্লাহ্‌র নির্দেশ)।

(ঝ) 'Anba, আন্‌বা (আল্লাহ প্রদত্ত বিবরণ/বর্ণনাসমূহ)।

অবশ্যই উপরিউক্ত পরিভাষা ও শব্দাবলী ছাড়াও কুরআনের ওহী বুঝাইবার জন্য আরও পরিভাষা রহিয়াছে। যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কুরআনের ওহীর ধরন সম্পর্কে কুরআনী সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং ইহার সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের ধারণা পরস্পর বিরোধী। অতএব উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঃ

(ক) কুরআন বলে (এবং প্রামাণ্য বিবরণ অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে পুনঃ বর্ণিত) যে, আল্লাহ একজন দূত-ফেরেশতাকে (জিবরীল) কুরআনের ওহীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করেন। পক্ষান্তরে প্রাচ্যবিদগণ আমাদেরকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফেরেশতার আগমন ছিল "সম্ভবত" একটি "বুদ্ধিগত" বিষয় অথবা তাঁহার পক্ষে একটি "কাল্পনিক" দৃশ্য মাত্র!

(খ) কুরআন বলে যে, কুরআনের ওহী প্রাপ্ত হওয়ার প্রাথমিক স্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী মুখস্থ করার জন্য তাড়াহুড়া করিয়া তাঁহার জিহ্বা বারবার সঞ্চালন করিতেন। কিন্তু তিনি এইরূপ না করার জন্য (আল্লাহ কর্তৃক) নির্দেশিত হন এবং আল্লাহ তাঁহাকে কুরআন স্মরণে রাখা ও আবৃত্তি বা তিলাওয়াত করায় সক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। পক্ষান্তরে প্রাচ্যবিদগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভিজ্ঞতা ছিল "সম্ভবত" একটি 'বাহ্যিক বিষয়' অথবা একটি 'বুদ্ধিগত' বাচনভঙ্গিপূর্ণ বিষয়।

(গ) কুরআন বলে যে, ইহা আল্লাহ্র 'বাণী' (কালিমাত), তাঁহার "বক্তব্য" (কাওল/হাদীছ), 'একটি পুস্তক' (কিতাব), যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং ইহা "সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়" অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে প্রাচ্যবিদগণ জোর দিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কেবল বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি ছিল "শব্দাবলী ছাড়া" এবং এমনকি "কোন সুনির্দিষ্ট ভাষা ছাড়া"! সুস্পষ্টভাবে এইরূপ ধারণার কোন সমর্থন কুরআনে বিদ্যমান নাই, যে কোন "তথ্যাদি" দ্বারা ইহা বিন্যস্ত করা হউক না কেন।

ওহী পরিভাষা ও ইহার সমতুল্য পরিভাষাসম্বলিত আয়াতসমূহ ছাড়া কুরআনে অনেক সংখ্যক এমন ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে যেগুলি সুস্পষ্টরূপে কুরআনের ওহীর ধরন প্রকাশ করে। যেমন ঃ

(১) কুরআন স্বয়ং এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও দৃঢ়ভাবে এবং বারবার অবিশ্বাসীদের এই দাবি অস্বীকার করেন যে, ইহা (কুরআন) তাঁহার নিজের রচনা ছিল। বর্ণিত আছে যে, এমন গুরুতর পাপী কেহ নাই যে নিজ হইতে একটি পুস্তক রচনা করিবে এবং ইহাকে আল্লাহ্র রচিত পুস্তক বলিয়া মিথ্যা দাবি করিবে এবং রাসূলুল্লাহ যদি এমন দাবি করিতেন তাহা হইলে তিনি এমন অপরাধমূলক কাজের জন্য কঠিন শাস্তি এড়াইতে পারিতেন না।[৫২]

(২) ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের পুনঃ পুনঃ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ, যাহার সম্পর্কে কুরআন (এবং এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও) (কুরআনের বিরুদ্ধে) সকল যুগের কুৎসা রটনাকারীদেরকে প্রাপ্ত কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। ইহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, এই চ্যালেঞ্জ পরবর্তী কালে তথাকথিত ইসলামী গোড়াপন্থীদের কোন অনুষঙ্গ নহে, বরং একান্তভাবেই কুরআনের নিজস্ব চ্যালেঞ্জ।[৫৩] এই চ্যালেঞ্জ অদ্যাবধি উন্মুক্ত। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ইহা ঐ সময়কার চ্যালেঞ্জ যখন কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ে 'ইহা তাঁহার রচনা' বলিয়া যে অভিযোগ ছিল তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

(৩) কুরআন আরও বলে যে, ঐ সময়ের অবিশ্বাসী কাফিররা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লয় যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ -এর নিজের রচনা নহে। যখন তহারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল যে, তিনি নিজে এই কুরআন রচনা করিতে অপারগ, তখন তাহারা আর একটি বিকল্প অভিযোগ আনিল যে, অন্য কেহ তাঁহার জন্য এই কুরআন রচনা করিয়া দিয়াছে। ঐ অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান ও খণ্ডন করা হয়।[৫৪]

(৪) কাফিরদের পক্ষ হইতে আর একটি পরোক্ষ স্বীকারোক্তি এই ছিল যে, যদিও তাহারা রাসূলুল্লাহ -এর নিকট কিছু সুনির্দিষ্ট অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনের দাবি করিয়াছিল কিন্তু তাহারা কুরআনের অসাধারণত্ব সম্পর্কে তাহাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার বিষয়টি গোপন করিতে পারে নাই। অতএব যখন কোন একটি সূরা অথবা কোন আয়াত তাহাদিগকে পেশ করা হইত তখন তাহারা মন্তব্য করিত যে, ইহা "একটি সুস্পষ্ট মায়া", "এক সুস্পষ্ট যাদু" (سِحْرٌ مُّبِيْنٌ)।[৫৫] তাহাদের এই কথার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সর্বোপরি তাহারা কুরআনের আয়াতসমূহকে রাসূলুল্লাহ -এর সাধারণ বক্তব্য হিসাবে বিবেচনা করিত না এবং তাহারা আয়াতসমূহকে যে ধরনের রচনা শ্রবণ করিতে অভ্যস্ত ছিল, সেই ধরনের রচনার সঙ্গে তুলনা করার চিন্তাও করিত না।

(৫) ইহা আরও উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসী কাফিররা রাসূলুল্লাহ -কে পুনঃ পুনঃ তাগাদা দিত তাহাদেরকে ভিন্ন ধরনের কুরআন অথবা ইহার পরিবর্তে অন্য কিছু দেওয়ার জন্য। ইহার উত্তরে তিনি তাহাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন যে, তাঁহার কাছে যাহা ওহী করা হয়, এমনকি ইহার একটি শব্দ পর্যন্ত পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই এবং তিনি নিজে অক্ষরে অক্ষরে ইহার অনুসরণ করিতে বাধ্য। অবিশ্বাসী কাফিরদের এই দাবি সম্পর্কে কুরআন বলেঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاىِٔ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ .

"যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, তুমি অন্য এক কুরআন আন ইহা ছাড়া অথবা ইহাকে বদলাও। বল, নিজ হইতে ইহা বদলানো আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি কেবল তাহাই অনুসরণ করি" (১০ ঃ ১৫)।

উপরের আয়াতের শেষ বাক্যটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাহাই নহে, রাসূলুল্লাহ কুরআন রচনা করেন নাই, এমনকি তিনি ইহার একটি শব্দও পরিবর্তন করার এখতিয়ার রাখেন না। ইহার আদেশ ও নির্দেশ মানিয়া চলা তাঁহার নিজের জন্য অপরিহার্য।[৫৬]

(৬) পুনরায়, আল্লাহ্‌র রাসূল -এর রিসালাত-পূর্ব জীবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এই বাস্তব তথ্য তুলিয়া ধরার জন্য যে, কুরআন মোটেই তাঁহার রচনাকর্ম ছিল না। অতএব নিম্নলিখিত আয়াত উপরের বর্ণনার সমর্থন করে ঃ

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ .

"বল, আল্লাহ্‌র সেরূপ অভিপ্রায় হইলে আমিও তোমাদিগের নিকট ইহা পাঠ করিতাম না এবং তিনিও তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না। আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি। তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না" (১০ ঃ ১৬)?

উপরিউক্ত আয়াত প্রকৃতপক্ষে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। (এক) ইহা সাধারণত তাঁহার নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের চরিত্র ও আচার-আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করে, বিশেষ করিয়া তাঁহার সত্যবাদিতা ও সততা সম্পর্কে। এইভাবে ঘটনার প্রতি জোর দিয়া বলা হয় যে, তিনি এমন কোন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট হঠাৎ করিয়া তাঁহার স্বপক্ষে এক মিথ্যা দাবি নিয়া আবির্ভূত হন এবং তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে যে শিক্ষা দেন তাহাও মিথ্যা ছিল না।

(দুই) ইহা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কমপক্ষে তাঁহার চল্লিশ বৎসরের জীবনে তিনি কখনও তাঁহার জনগণের নেতা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, এমনকি তিনি তাঁহার সমাজের সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার সাধনের কোন ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই।

(তিন) তিনটির মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল, তিনি কখনও কোন সাহিত্যিক কৃতিত্ব অথবা উচ্চাকাঙ্খা প্রদর্শন করেন নাই এবং তাঁহার নিকট ওহী আগমনের পূর্বে তিনি আরবী ভাষার একটি বাক্যও রচনা করেন নাই। তিনি বাস্তবতাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করে। উদাহরণস্বরূপ ইহা সাধারণ জানার বিষয় যে, একজন মানুষ, যাহার কোন সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা অথবা প্রশিক্ষণ নাই, তিনি কোনভাবেই একটি প্রথম শ্রেণীর অথবা অতুলনীয় সাহিত্যকর্ম হঠাৎ করিয়া রচনা করিতে পারেন না, এমনকি তিনি যদি অন্য কোন উৎস হইতে সাহিত্য রচনার জন্য ধারণা ও বিষয়বস্তুও প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও সম্ভব নহে।

(৭) কুরআন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ, সাম্প্রতিক কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যাহার অর্থ ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে।[৫৭] এই উদাহরণ ইহা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অথবা তাঁহার অন্য কোন অনুগত সহকারী এই ধরনের কুরআনের মূল পাঠ রচনা করিতে সক্ষম ছিলেন না।

(৮) সর্বশেষ কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, ফাত্‌রাহ অর্থাৎ ওহী আগমনে বিরতি অথবা সাময়িক বিরতির ঘটনা, যাহা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইহা কোনভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিত্বের কারণে হয় নাই এবং এমনকি ইহা তাঁহার কোন সচেতন কর্মকাণ্ডের ফলও ছিল না। ইহা যদি তদ্রূপ হইত তাহা হইলে ওহী আগমনে না থাকিত কোন বিরতি এবং 'ফাত্‌রাহ'র ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঐ সম্পর্কে না থাকিত কোন বিচলিত ভাব ও দুঃখবোধ।

অনুরূপভাবে কুরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে এবং বিভিন্ন পন্থায় কুরআনের ওহী কোন শব্দ ছাড়া অথবা কোন সুনির্দিষ্ট ভাষা ছাড়া কেবল "ধারণা" অথবা "বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি" ধরনের কোন কিছু ছিল এমন বক্তব্য অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে একজন প্রাচ্যবিদ এই বিষয়টিতে মনে হয় মৌলিক বিভ্রান্তিতে ভোগেন। তিনি নিজে স্বীকার করেন যে, তিনি আল্লাহ্য় বিশ্বাসী এবং ফেরেশতা ও ফেরেশতা কর্তৃক আল্লাহ্র বাণী ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেন্ট-এর রাসূল ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের নিকট আনয়নেও তাহার বিশ্বাস রহিয়াছে, কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআন সম্পর্কে চর্চা করিতে গিয়া তিনি তাহার বিশ্বাসী অবস্থান হইতে সরিয়া আসেন এবং একজন ধর্মনিরপেক্ষবাদীর মনোভাব পোষণ করিয়া এই ক্ষেত্রে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আল্লাহ্র বাণী লইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফেরেশতার আগমন অথবা অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় বাণীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণের ধারণা সাধারণ মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত বিষয় নহে। এই ধারণার ভিত্তিতে কুরআন এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর বর্ণনা 'অতিন্দ্রীয়, 'মনোবৈজ্ঞানিক' 'দার্শনিক' তথ্যের সহযোগিতায় ব্যাখ্যা করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, আধুনিক প্রাচ্যবিদরা সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, তিনি নজীরস্বরূপ কুরআনের ওহীর ধরন সম্পর্কে বুঝাইতে কুরআনের এবং হাদীছের প্রামাণ্য যাহা কিছু উপস্থাপন করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই জোরপূর্বক, অস্বাভাবিক এবং মূল কুরআনের এবং ঘটনাবলীর "ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যপূর্ণ আদলে" করা হইয়াছে। ফলত এই দুইটি উৎসই (কুরআন, হাদীছ) অদ্যাবধি তাহার ধারণাকে বিভ্রান্ত করে। ইহার পর এই ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিষ্ঠাবান হওয়ার প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যাহা বলেন, সেই সত্যকে তিনি অস্বীকার করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই নিষ্ঠাবান ছিলেন। বলা হয় যে, তিনি যাহা বলিতেন তাহা সচেতনভাবেই বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, কুরআনের ওহী কুরআনের মূল পাঠ-এর আরবী ভাষায় শাব্দিক প্রত্যাদেশ ছিল। একজন প্রাচ্যবিদ বলেন, "না, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে অনুরূপভাবে চিন্তা করিতেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে কতিপয় ধারণা ও চিন্তাধারা প্রাপ্ত হন—ইহা ছিল কেবল তাঁহার নিজের মন ও বুদ্ধিগত বিষয়, তাঁহার বিশেষ সচেতনতার এক দৃষ্টিভঙ্গি, একটি ধারণাগত অথবা বুদ্ধিগত বাচনভঙ্গি। এমনকি তিনি অনেক সময় এই ধরনের পরামর্শ ও ধারণাসমূহ পাওয়ার জন্য 'প্ররোচিত' হইতেন"। একদিকে কুরআন ও মুহাম্মাদ ﷺ -এর বর্ণনা এবং অপরদিকে আধুনিক প্রাচ্যবিদদের ও অন্যান্যদের বর্ণনায় বিশাল ব্যবধান রহিয়াছে। ইহা দেখা কঠিন যে, কুরায়শ অবিশ্বাসী কাফিররা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওহী সম্পর্কে কি বলিত, সেই বক্তব্যের সঙ্গে এই ধারণাসমূহের কতদূর পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন কুরায়শরা বলিত যে, কুরআনের ওহী ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর "স্বপ্নে দেখা বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রিত রূপ" (আদগাছু আহ্লাম)[৫৮] অথবা উইলিয়াম মূর্ যাহা বলেন যে, ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর "ভাব বিহ্বল বা ভাবে আবিষ্ট হওয়ার পর উচ্চারিত বিষয়" অথবা বেল্ যেমন বলেন

যে, ইহা ছিল প্রকৃতিগত উপসংহার যাহা কাহারও মনে দীর্ঘক্ষণ কোন বিশেষ বিষয়ে কথাবার্তা বলা বা চিন্তা-ভাবনার পর উদিত হয়। অতএব কুরআন এবং কুরআনের ওহীর ব্যাপারে তাহাদের এই ধারণা অর্থাৎ আধুনিক প্রাচ্যবিদদের ধারণা ঐ একই স্তরে রহিয়াছে যে স্তরে ১৪০০ বৎসর পূর্বে মক্কার অবিশ্বাসী কাফিররা দণ্ডায়মান ছিল, যে স্তরে উইলিয়াম ম্যূর ও তাহার সমসাময়িকগণ গত দেড় শতাব্দী পূর্বে ছিলেন।

অনুবাদ ঃ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তথ্যসূত্র

১. Watt. M. at M., পৃ. ৫২-৫৩।

২. লণ্ডন, ১৯২৮ খৃ.।

৩. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৫৪, উদ্ধৃতি A. Poulain, op. cit., পৃ. ২৯৯ প.।

৪. ওয়াট, op.cit., পৃ. ৫৪।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৬. Supra, পৃ. ৪৩০-৪৩২।

৭. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. . . .

"তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি" (৪২ ঃ ৫২)।

৮. Supra, পৃ. ৪১৯-৪২২; ৪৫৪-৪৫৭।

৯. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

لاَ تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ .

"তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না, ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর" (৭৫ ঃ ১৬-১৮)।

১০. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ .

"তোমার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না" (২০ ঃ ১১৪)।

১১. মূল আরবী পাঠ হইল ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى .

"নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না" (৮৭ ঃ ৬)।

১২. ১২ ঃ ২, اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا "ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন"। আরও দ্র. ১২ ঃ ১১৩; ৩৯ ঃ ২৮; ৪১ ঃ ৩; ৪২ ঃ ৭ এবং ৪৩ ঃ ৩।

১৩. বুখারী, হাদীছ নং ২।

১৪. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৫৫-৫৬।

১৫. বুখারী, হাদীছ নং ৩২১৫।

১৬. দ্র. লিসানুল 'আরাব, وعى শিরোনাম অথবা মানসম্পন্ন অন্য যে কোন আরবী-ইংরেজী অভিধান, উদাহরণস্বরূপ, Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (ed. J. Milton Cowan), وَعَى শিরোনামে দ্র.।

১৭. মুসনাদ, ২ ঃ ৪০৩।

১৮. মুসনাদ, ৪খ., পৃ. ৩৩৫।

১৯. প্রাগুক্ত, ৬খ., পৃ. ১৯৪।

২০. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য বুখারী, হাদীছ নং ২০৪৭; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬৫৮; দারিমী, ভূমিকা, পৃ. ২৪; মুসনাদ, ২খ., পৃ. ১৬১, ৪৭৫; ৪খ., পৃ. ১৫৪, ৩৬৬।

২১. ওয়াট, op.cit, পৃ. ৫৬।

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

২৬. দ্রষ্টব্য M.W., ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৪৯।

২৭. Supra, পৃ. ৬০৯-৬২৭, ৬৫০-৬৬২।

২৮. Supra, পৃ. ৪৪২-৪৪৪।

২৯. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৫২।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৩৩. Supra, পরিচ্ছেদ ১, সেকশন ৪।

৩৪. ওয়াট, op. cit., পৃ. ৫৭।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৩৮. Supra, পরিচ্ছেদ ১৮, সেকশন ৪।

৩৯. কুরআনের আয়াত নিম্নরূপ ঃ

وَمَنْ اَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ.... .

"যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট ওহী হয়, যদিও তাহার প্রতি নাযিল হয় না এবং যে বলে, আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ নাযিল করিব, তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে" (৬ ঃ ৯৩)?

৪০. আয়াতগুলি এই ঃ কুরআন ২ ঃ ২৯; ২ ঃ ১৭০; ২ ঃ ২৩১; ৩ ঃ ৪; ৩ ঃ ৭; ৪ ঃ ৬১; ৪ ঃ ১১৩; ৪ ঃ ১৩৬; ৪ ঃ ১৬৬; ৫ ঃ ৪; ৫ ঃ ৪৫; ৫ ঃ ৪৭; ৫ ঃ ৪৮;৫ ঃ ৪৯ (দুইবার); ৫ ঃ ১০৪; ৬ ঃ ৯১; ৬ ঃ ৯৩; ৬ ঃ ১১৪; ৯ ঃ ৯৭; ১৬ ঃ ২; ১৬ ঃ ২৪; ১৬ ঃ ৩০; ১৬ ঃ ১১০; ১৮ ঃ ১; ২৫ ঃ ৬; ৩১ ঃ ২১; ৩৬ ঃ ১৫; ৪২ ঃ ১৫; ৪২ ঃ ১৭; ৪৭ ঃ ৯; ৫৭ ঃ ৯; ৬৫ ঃ ৫ এবং ৬৫ ঃ ৯।

৪১. আয়াতগুলি নিম্নরূপ ঃ কুরআন ২ ঃ ৪১; ২ ঃ ৯৯; ৪ ঃ ১০৫; ৪ ১৭৪; ৫ ঃ ৪৮; ৬ ঃ ৯২; ৬ ঃ ১১৫; ১০ ঃ ৯৪; ১২ ঃ ২; ১৩ ঃ ৩৭; ১৪ ঃ ১; ১৬ ঃ ৪৪; ১৭ ঃ ১০৫; ১৭ ঃ ১০৬; ২০ ঃ ২; ২০ ঃ ১১৩; ২১ ঃ ১০; ২১ ঃ ৫০; ২২ ঃ ১৬; ২৪ ঃ ১; ২৪ ঃ ৩৪; ২৪ ঃ ৪৬; ২৯ ঃ ৪৭; ২৯ ঃ ৫১; ৩৮ ঃ ২৯; ৩৯ ঃ ২; ৩৯ ঃ ৪১; ৪৪ ঃ ৩; ৫৮ ঃ ৫; ৫৯ ঃ ২১; ৬৪ ঃ ৮; ৭৬ ঃ ২৩; ৯৭ ঃ ১।

৪২. আয়াতগুলি নিম্নরূপ ঃ কুরআন أُنْزِلَ = ২ ঃ ৪; ২ ঃ ৯১; ২ ঃ ১৩৬; ২ ঃ ১৮৫; ২ ঃ ২৮৫; ৩ ঃ ৭২; ৩ ঃ ৮৪; ৩ ঃ ১৯৯; ৪ ঃ ৬০; ৪ ঃ ১৬২; ৫ ঃ ৬৭; ৫ ঃ ৭০; ৫ ঃ ৭১; ৫ ঃ ৮৪; ৫ ঃ ৮৬; ৬ ঃ ১৫৬; ৬ ঃ ১৫৭; ৭ ঃ ২; ৭ ঃ ৩; ৭ ঃ ১৫৭; ১১ ঃ ১৪; ১৩ ঃ ১; ১৩ ঃ ১৯; ১৩ ঃ ৩৬; ২৯ ঃ ৪৬; ৩৪ ঃ ৬; ৩৮ ঃ ৮; ৩৯ ঃ ৫৫; ৪৬ ঃ ৩০। أُنْزِلَتْ ৯ ঃ ৮৬; ৯ ঃ ১২৪; ৯ ঃ ১২৭; ২৮ ঃ ৮৭; ৪৭ ঃ ২০। نُزِلَ = ১৫ ঃ ৬; ১৬ ঃ ৪৪; ২৫ ঃ ৩২; ৪৩ ঃ ৩১; ৪৭ ঃ ২। نزلت = ৪৭ ঃ ২০। يُنَزِّلُ = ২ ঃ ১০৫; ৫ ঃ ১০৪;। تنزل = ৯ ঃ ৬৪।

৪৩. আয়াতগুলি নিম্নরূপ ঃ কুরআন ৬ ঃ ১১৪; ১৭ ঃ ১০৬; ২০ ঃ ৪; ২৬ ঃ ১৯২; ৩২ ঃ ২; ৩৬ ঃ ৫; ৩৯ ঃ ১; ৪০ ঃ ২; ৪১ ঃ ৪২; ৪৫ ঃ ২; ৪৬ ঃ ২; ৫৬ ঃ ৮০; ৬৯ ঃ ৪৩; ৭৬ ঃ ২৩।

৪৪. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ১৩ ঃ ৩৭; ১৬ ঃ ১০৩; ১৯ ঃ ৯৭; ২০ ঃ ১১৩; ৩৯ ঃ ২৮; ৪১ ঃ ৩; ৪২ ঃ ৭; ৪৩ ঃ ৩; ৪৪ ঃ ৫৮ এবং ৪৬ ঃ ১২।

৪৫. উদাহরণস্বরূপ আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ২ ঃ ১৭৬; ২ ঃ ২৩১; ৩ ঃ ৩; ৩ ঃ ৭; ৪ ঃ ১৫৫; ৪ ঃ ১১৩; ৪ ঃ ১৩৬; ৪ ঃ ১৪০; ৫ ঃ ৪৮; ৬ ঃ ৯২; ৬ ঃ ১১৪; ৬ ঃ ১৫৫; ৭ ঃ ২; ৭ ঃ ১৯৬; ১৪ ঃ ১; ১৫ ঃ ৬; ১৫ ঃ ৯; ১৬ ঃ ৪৪; ১৬ ঃ ৬৪; ১৬ ঃ ৮৯; ১৭ ঃ ১০৬; ১৮ ঃ ১; ২০ ঃ ২; ২১ ঃ ১০; ২৯ ঃ ৪৭; ২৯ ঃ ৫১; ৩৮ ঃ ২৯; ৩৯ ঃ ৪১; ৪২ ঃ ১৫; ৪২ ঃ ১৭; ৪৫ ঃ ২; ৪৬ ঃ ৩০।

৪৬. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ৭ ঃ ১৮৫; ১৮ ঃ ৬; ৪৫ ঃ ৬; ৫৩ ঃ ৫৯; ৫৬ ঃ ৮১ এবং ৭৭ ঃ ৫০।

৪৭. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ঃ ৯ ঃ ৮৬; ৯ ঃ ১২৭; এবং ৪৭ ঃ ২০।

৪৮. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ৭ ঃ ৬৩; ৭ ঃ ৬৯; ১২ ঃ ১০৪; ২১ ঃ ২; ২১ ঃ ৫০; ২৬ ঃ ৫; ৩৬ ঃ ১১; ৩৬ ঃ ৬৯; ৩৮ ঃ ১; ৩৮ ঃ ৮; ৩৮ ঃ ৪৯; ৩৮ ঃ ৮৭; ৪১ ঃ ৪১; ৪৩ ঃ ৫; ৪৩ ঃ ৪৪; ৫৪ ঃ ২৫; ৬৮ ঃ ৫১; ৬৮ ঃ ৫২ এবং ৮১ ঃ ২৭।

৪৯. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ৪ ঃ ১৬৪; ৬ ঃ ৫৭; ১১ ঃ ১০০; ১২ ঃ ৩; ১৬ ঃ ১১৮; ১৮ ঃ ১৩; ২০ ঃ ৯৯ এবং ৪০ ৭৮।

৫০. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ২ ঃ ২৫২; ৩ ঃ ২৮; ৩ ঃ ১০৮।

৫১. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ১৮ ঃ ৩৯; ২৩ ঃ ৬৮; ৬৯ ঃ ৪০; ৮১ ঃ ১৯সং এবং ৮৬ ঃ ১৩।

৫২. কুরআন ৩ ঃ ৯৪; ৬ ঃ ২১; ৬ ঃ ৯৩; ৬ ঃ ১৪৪; ৭ ঃ ৩৭; ১০ ঃ ৩৭; ১০; ৩৭-৩৮; ১০ ঃ ৬৯; ১১ ঃ ১৩; ১১ ঃ ১৮; ১১ ঃ ৩৫; ১৬ ঃ ১১৬; ১৮ ঃ ১৫; ২১ ঃ ৫; ২৫ ঃ ৪; ২৯ ঃ ৬৮; ৩২ ঃ ৩; ৪২ ঃ ২৪; ৪৬ ঃ ৮; ৬১ ঃ ৭ এবং ৬৯ ঃ ৪৪-৪৭।

৫৩. কুরআন ২ ঃ ২৩; ১১ ঃ ১৩; ৫২ ঃ ৩৪।

৫৪. কুরআন ১৬ ঃ ১০৩; আরও দ্রষ্টব্য, Supra, পরিচ্ছেদ ১১, সেকশন ৪।

৫৫. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য কুরআন ৫ ঃ ১১০; ৬ ঃ ৭; ১০ ঃ ৭৬; ১১ ঃ ৭; ২১ ঃ ৩; ২৭ ঃ ১৩; ৩৪ ঃ ৪৩; ৩৭ ঃ ১৫; ৪৩ ঃ ৩০; ৪৬ ঃ ৭; ৫২ ঃ ২; ৬ ঃ ১৬ এবং ৭৪ ঃ ২৪।

৫৬. আরও দ্রষ্টব্য কুরআন ৬ ঃ ১০৬; ৭ ঃ ২০৩ এবং ৪৬ ঃ ৯।

৫৭. Supra, পরিচ্ছেদ ১২, সেকশন ২।

৫৮. কুরআন ২১ ঃ ৫।

১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬(উন্নয়ন)—৩২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ